

*

পঞ্চম খণ্ড।

ভারতবর্ষ।

(প্রাচীন ভাবতবর্ষ।)

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

প্রকাশক,

শ্রীধীবেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়, হাওড়া (কলিকাতা)।

"পৃথিবীর ইতিহাস প্রিণ্টিং ওয়ার্কস", ২নং অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
লেন, হাওড়া হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর।

Rai Lalit Mohun Singha Ray Bahadur

UDYA PRESS

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

উৎসর্গ।

আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্‌ অশেষগুণসম্পন্ন

রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর

সমীপে।

মহোদয়,

আপনি জগদম্বার সুসন্তান, জনহিতসাধন ব্রতে ব্রতী আছেন, অথচ, সে ব্রত-সাধনে আপনার ঢক্কানিনাদ নাই, আপনি নীরবে আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন। আপনি ভাবুক, ভক্ত ও কবিপ্রতিভাসম্পন্ন। আপনার এবম্বিধ গুণসঙ্ঘ দর্শনে আমি বিমুগ্ধ। আপনি আমার এই খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রকাশে যে সহায়তা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বিশেষরূপ উপকৃত। আপনার মহত্ত্বের প্রতি আমার অনুরাগের ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ এই খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাস" আপনার নামে উৎসর্গীকৃত হইল। আপনি সুখস্বাস্থ্য সহ দীর্ঘজীবন লাভ করুন,—জগদম্বার নিকট এই প্রার্থনা।

হাওড়া,
৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৩ সাল।

আপনার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

সূচনা।

ইতিহাস—প্রতিভার বিকাশ। যে জাতির প্রতিভা নাই, তাহাদের ইতিহাস নাই। প্রতিভার আধার মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়াই ইতিহাসের উপাদান প্রদান করেন। সেই সকল উপাদান লইয়াই ইতিহাস সংগঠিত হয়। জগতে যদি মহাপুরুষগণের আবির্ভাব না হইত, জাতির মধ্যে যদি বরেণ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ না করিতেন, সমাজের মধ্যে যদি শ্রেষ্ঠপুরুষ উৎপন্ন না হইতেন, ইতিহাসের অভা[illegible]নও প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম না। পৃথিবীতে এখনও অ[illegible] বর্ব্বর জাতি [illegible] আছে, যাহাদের ইতিহাস নাই; জগতে এখনও এমন জনপদ অনেক রহিয়াছে, যাহাদের ইতিহাস লিখিতব্য নহে। কি কারণে তাহাদের ইতিহাস লিখিত হয় নাই, অথবা কি কারণে তাহাদের ইতিহাস লিখিতব্য নহে, সামান্য একটু অনুসন্ধান করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের মধ্যে যদি কোনও মহাপুরুষ কখনও জন্মগ্রহণ করিতেন, যদি কোনও প্রতিভা কখনও বিকাশ পাইত তাহা হইলে, কখনই তাহাদের ইতিহাসের অভাব ঘটিত না। কোনও-না-কোনও প্রকারে প্রতিভা আপনার দিব্য প্রভা কোনও না কোনও আকারে নিশ্চয়ই রাখিয়া যাইত। প্রতিভা নানা দিকে নানা ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কোথাও শৌর্য্য-বীর্য্যের মধ্য দিয়া, কোথাও জ্ঞান গবেষণার আকার পরিগ্রহ করিয়া, কোথাও সদ্‌গুণরাজির পরিচায়ক হইয়া, সংসারে সে তাহার প্রভাব প্রকাশ করে। সুতরাং যেখানে মনুষ্যত্ব আছে, যেখানে শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয়; সেখানেই গৌরব-গরিমার নিদর্শন রহিয়া যায়—সেখানেই প্রতিভার লীলা প্রত্যক্ষ করি, আর সেখানেই ইতিহাস স্বতঃপ্রকটিত হইয়া পড়ে।

ইতিহাসের জনয়িতা।

পক্ষান্তরে প্রতিভার পরিচয়—ইতিহাস। মহাপুরুষগণের পুণ্যকাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়াই ইতিহাস গৌরবান্বিত। তাঁহারা কোন্ গুণে গরীয়ান ছিলেন, কোন্ পথে কেমন ভাবে অগ্রসর হইয়া আপনাদের পুণ্যস্মৃতি উজ্জ্বল রাখিয়া গিয়াছেন; ইতিহাস সেই স্মৃতি রক্ষা করে, সেই শিক্ষা প্রচার করে। সুতরাং সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইতিহাস প্রকটন করিতে হইলে, মহাপুরুষগণের মহৎ আদর্শের আলেখ্য লইয়াই ইতিহাস লিখিত হইয়া থাকে। আমরা তাই পূর্ব্বেও বলিয়া আসিয়াছি, আবারও বলিতেছি,—রাজা-রাজ্যের ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সহিত আমাদের এই ইতিহাসের সম্বন্ধ বড়ই অল্প; রাজা-রাজ্যের

আকাঙ্ক্ষা।

ধারাবাহিক বিবরণের মধ্যে যখন যে আদর্শ-চরিত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে, যখন যে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া জগতের গতি-মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই চিত্রপট প্রদর্শনে তৎপদাঙ্কানুসরণে উদ্বোধনাই আমাদের লক্ষ্য। এই খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসে" সেই লক্ষ্যের অনুসরণ পক্ষেই আমরা প্রধানতঃ যত্ন পাইয়াছি। সংসার দুঃখের দহনে অহর্নিশ দগ্ধীভূত হইতেছে। মানুষ যে কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সকলই তাহার সেই দুঃখদূরীকরণ তথা সুখ-সাধন উদ্দেশ্যে বিহিত হয়। সংসারে যত ক্রিয়া-কর্ম্ম আছে, সংসারে যত পুণ্যানুষ্ঠান বিহিত দেখি, সংসারে যত গ্রন্থপত্রের প্রচার বা জ্ঞান-গবেষণার উন্মেষ হয়,—সকলই ঐ এক উদ্দেশ্যে ক্রিয়াশীল। সুতরাং ইতিহাসে দেখাইতে হইলে সেই দৃশ্য প্রদর্শন করাই আবশ্যক,—যদ্দ্বারা মানুষের চরম উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে কিছু সহায়তা হয়। ইতিহাস সে পক্ষে এক প্রকৃষ্ট অবলম্বন। ইতিহাসের জীবন্ত চরিত্র-চিত্রে মানুষ যখন ভগবানের আদর্শ সম্মুখে দেখে, তখন তাহার পাপপরিতপ্ত প্রাণ শান্তি-ধারায় স্নিগ্ধ হয় না কি? শাস্ত্র যে বলিয়াছেন,—

"তস্যাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥"

এই উক্তি সর্ব্বথা স্মরণীয়। কেন-না, তিনি যে আদর্শ রূপ পরিগ্রহণে আদর্শ শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই শিক্ষার অনুধ্যান, সেই শিক্ষার অনুসরণ, সর্ব্বথা প্রয়োজন। তদ্দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সারাজীবন মানুষ যাহার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে; সেই শিক্ষার অনুসরণেই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। ইতিহাসের উহাই সার শিক্ষা।

বলিয়াছি—প্রতিভার বিকাশ ইতিহাস। মানুষের চরিত্রে সে প্রতিভার আংশিক বিকাশ; ভগবৎচরিত্রে পূর্ণ বিকাশ। ভারতের ইতিহাসে ভগবৎ-প্রভাব বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল, সুতরাং ভগবৎ-প্রসঙ্গ বর্জ্জিত ইতিহাস ভারতের ইতিহাস মধ্যে পরিগণিত হইতেই পারে না। ভগবচ্চরিত্রের পূর্ণ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যাঁহাদের চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, ভারতের ইতিহাসে তাঁহারাই চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। নরদেহ ধারণ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়া ভগবান যে শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, "পৃথিবীর ইতিহাস" সেই শিক্ষাই সংসারে প্রচার করুক,—ইহাই ভগবৎ-পাদপদ্মে ঐকান্তিক প্রার্থনা। ইতি—

হাওড়া,
৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৩ সাল।

নিবেদক,
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

নির্ঘণ্ট।

ঈ।

উ।

ঋ।

এ।

ও।

ক।

ভ।

ম।

হ।

সমাপ্ত।

ভারতবর্ষ।

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র।

পরিচ্ছেদ। বিষয়। পৃষ্ঠা।

* * *

ভারতবর্ষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান।

[ইতিহাসের ভিত্তিভূমি,—প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান কি কি আছে,—পাশ্চাত্য মতে ভারতের প্রতিষ্ঠা-বিভাগ ও কাল-নির্ণয়,—পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা;—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত,—অনুসন্ধানে মত পরিবর্ত্তন,—অনুসন্ধানের পর্য্যায় ও সিদ্ধান্ত,—শাস্ত্রীয় ও যুক্তিসঙ্গত মত।]

ইতিহাসের ভিত্তি-ভূমি।

এই স্বর্গাদপিগরীয়সী জন্মভূমি ভারতভূমির পুণ্য-স্মৃতি, কত কোটী কল্প কাল হইতে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। কাল অনন্ত, ব্যবচ্ছেদ দুর্নিরীক্ষ্য, সুতরাং ভারতবর্ষের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠার নিদর্শন, স্থূল-দৃষ্টির অধিগম্য নহে। প্রাচীন-ভারতের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইলে, তাই যে দৃষ্টিতে অধুনা ইতিহাস-সমূহ বিবেচিত হয়, সে দৃষ্টিতে দেখিয়া, ভারতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে গেলে, প্রতি পদে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। এ পর্য্যন্ত যাঁহারাই সে পথে অগ্রসর হইয়াছেন, সদ্বুদ্ধি-পরিচালিত হইলেও, সমদর্শিতার পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শনে প্রয়াস পাইলেও, তাঁহারা কেহই ভ্রম-প্রমাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতের ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে, ভারতের ইতিহাসের উপাদান কি আছে,—তাহা অনুসন্ধান করিতে হয়। সে পক্ষে অনুসন্ধানে অনেকেই অশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সংস্কার বড়ই বিষম বন্ধন!—ছিন্ন করিয়াও তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না! সেই যে এক সংস্কার আছে,—আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমন এবং তাঁহার ও তাঁহার পার্ষদগণের পরিবর্ণিত ভারতবর্ষের বিবরণ;—ইহাই এখন ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে! প্রাচীন ভারতের ইতিহাস প্রণয়নে অধুনা যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই তাই আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমনকে ভারতের ইতিহাসের ভিত্তি বলিয়া কীর্ত্তন করেন, এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাসকে 'এক নিশ্বাসে রামায়ণ বর্ণনার

উপাখ্যানের মত' নিঃশেষ করিয়া লন। পাশ্চাত্য-পদ্ধতিতে যীশুখৃষ্টের জন্ম হইতে অব্দ ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু সে অব্দে যখন কালের কূলকিনারা মিলে না, তখন পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের কল্পনা করা হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আরম্ভ-সম্বন্ধেও অধুনা সেই পদ্ধতিই দাঁড়াইয়াছে। সহসা আর কোনও বিরাম-স্থান না পাওয়ায়, আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমনকেই এখন ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করা হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস— কল্পনার অন্ধকারে নিমজ্জমান থাকে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান কি আছে?—এই বিষয় লইয়া অনেকে অনেক গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। আর সেই গবেষণার প্রভাবেই স্থির হইয়াছে,—খৃষ্ট জন্মের ৩২৬ বৎসর পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডার ভারতে আগমন করেন; তাহার তিন শত বৎসর পূর্ব্বের মাত্র অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬০০ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতের সভ্যতার বা জ্ঞান-গবেষণার কিছু কিছু পরিচয় পওয়া যায়। প্রায় সকল পণ্ডিতেরই এই মত। সেই সকল মতের সার-নির্ঘণ্ট এই,—২০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৈদিক কাল বা বেদ রচনার সময়। তার পর, ১০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৩২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর্য্যগণের ভারতে আগমনের সময়। তৎপরে ৩২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৫০০ পর-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধরাজগণের প্রাধান্যের কাল। তাহার পর, পৌরাণিক যুগ বা পুরাণাদি রচনার সময়--৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই শেষোক্ত কালের মধ্যে বিক্রমাদিত্য, কালিদাস প্রভৃতির এবং শঙ্করাচার্য্যাদির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ খাপন করিয়া যে সকল ইউরোপীয় মনীষী যশস্বী হইয়া আছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই একবাক্যে সমস্বরে এবম্বিধ বাণী ঘোষণা করিয়া থাকেন। কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই বা বলি কেন?— অস্মদ্দেশের যাঁহারা প্রতিষ্ঠান্বিত ঐতিহাসিক, তাঁহারাও ঐ মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। তবে, এই প্রকার সিদ্ধান্তের মধ্যে অল্পবিস্তর মত-পার্থক্য যে ঘটে নাই, তাহা নহে। সে মতান্তর—প্রধানতঃ বেদ-রচনার এবং আর্য্যগণের ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের কাল লইয়া। ভারতের প্রতিষ্ঠা-স্মৃতি অন্তরে অতি দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া যাঁহারা ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের মতেও খৃষ্ট-জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কোনও অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাইবার উপায় নাই। তাঁহারা ঐ সময়কে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা,—

প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান কি আছে?

১। প্রথম বিভাগ,—বৈদিক কাল,—২০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।

এই কালের প্রধান ঘটনা,—

(১)	আর্য্যগণের সিন্ধুনদের উপত্যকা-প্রদেশে বসতিস্থাপন	২০০০—১৪০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে
(২)	ঋগ্বেদের মন্ত্রাবলীর রচনা	

২। দ্বিতীয় বিভাগ, কাব্য-মহাকাব্যের কাল,—১৪০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।

এই কালের প্রধান ঘটনা,—

(১)	আর্য্যগণের গাঙ্গারাষ্ট্রে উপনিবেশ-স্থাপন	...	১৪০০—১০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।
(২)	রাশিচক্র-নির্ণয়, জ্যোতিষ-তত্ত্ব আলোচনা, বেদসংগ্রহ	...	১৪০০—১২০০

(৩) কুরুগণের ও পাঞ্চালগণের প্রতিষ্ঠার দিন ... ১৪০০—১২০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।
(৪) কুরু-পাঞ্চাল যুদ্ধ ... ... ১২৫০ ,,
(৫) কোশল, কাশী এবং বিদেহ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দিন ... ১২০০—১০০০ ,,
(৬) ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন ... ... ১৩০০—১১০০ ,,
(৭) উপনিষৎ প্রণয়ন ... ... ১১০০—১০০০ ,,

৩। তৃতীয় বিভাগ,—জ্ঞানোন্নতির দিন,—১০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৩০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।

এই কালের প্রধান ঘটনা,—

(১) আর্য্যগণের সমগ্র ভারত অধিকার ... ... ১০০০—৩২০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ
(২) যাস্ক ... ... খৃষ্ট-পূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে।
(৩) পাণিনি ... ... খৃষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে।
(৪) সূত্র-সাহিত্যের অভ্যুদয়-কাল ... ... ৮০০—৪০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।
(৫) শুল্ব সূত্র (জ্যামিতি প্রভৃতি) ... ... খৃষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দী।
(৬) কপিল ও সাংখ্য দর্শন ... ... ,, সপ্তম ,,
(৭) অন্যান্য দর্শনের অভ্যুদয় কাল ... ... ৬৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ—প্রথম খৃষ্টাব্দ।
(৮) গৌতম-বুদ্ধের আবির্ভাব . ... ৫৫৭—৪৭৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।
(৯) বিম্বিসার—মগধের অধিপতি ... ... ৫৩৭—৪৮৫ ,,
(১০) অজাতশত্রু— ,, ,, ... ৪৮৫—৪৫৩ ,,
(১১) প্রথম বৌদ্ধ মন্ত্রণা সভা ... ... ৪৭৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।
(১২) দ্বিতীয় বৌদ্ধ-মন্ত্রণা সভা ... ... ৩৭৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।
(১৩) নব নন্দ, মগধের রাজন্যবর্গ ... ... ৩৭০—৩২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।

৪। চতুর্থ বিভাগ,—বৌদ্ধ-যুগ,—৩২০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দ।

এই কালের প্রধান ঘটনা,—

(১) চন্দ্রগুপ্ত, মগধাধিপতি .. ... ৩২০—২৯০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ।
(২) বিন্দুসার, ঐ ... ... ২৯০—২৬০ ,,
(৩) অশোক, ঐ ... ... ২৬০—২২২ ,,
(৪) তৃতীয় বৌদ্ধ-মন্ত্রণা-সভা ... ... ২৪২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ।
(৫) মগধে মৌর্য্য বংশের অবসান ... ... ১৮৩ ,,
(৬) মগধে শুঙ্গ-বংশের অভ্যুদয় ... ... ১৮৩—৭১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ।
(৭) মগধে কণ্ব-বংশ ... ... ৭১—২৬ ,,
(৮) মগধে অন্ধ্র বংশ ... ... ২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ—৪৩০ খৃষ্টাব্দ।
(৯) গুপ্ত-বংশীয় সম্রাটগণ ... ... ৩০০—৫০০ খৃষ্টাব্দ।
(১০) বাকত্রিয় গ্রীকগণের ভারত-আক্রমণ ... — { খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত।
(১১) যুচিগণের ভারত-আক্রমণ ... ... প্রথম শতাব্দী।
(১২) কণিষ্ক— যুচি-বংশীয় কাশ্মীররাজ কর্ত্তৃক শক নামক অব্দ প্রবর্ত্তনা } ... ... ৭৮ খৃষ্টাব্দ।
(১৩) সৌরাষ্ট্রে সাহ-বংশীয় রাজন্যগণের রাজত্ব — ... ১৫০—৩০০ খৃষ্টাব্দ।

(১৪) কাম্বোজগণ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ ... ... তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী।
(১৫) শ্বেত হূনগণ কর্ত্তৃক ভারত-আক্রমণ ... ... পঞ্চম শতাব্দী।

৫। পঞ্চম বিভাগ,—পৌরাণিক যুগ,—৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দ।

এই কালের প্রধান ঘটনা,—

(১)	বিক্রমাদিত্য—উজ্জয়িনীর ও উত্তর ভারতের অধিপতি —	৫০০—৫৫০	খৃষ্টাব্দ।
(২)	কালিদাস, অমরসিংহ, বররুচি প্রভৃতি ...	৫০০—৫৫০	"
(৩)	ভারবি	৫৫০—৬০০	"
(৪)	আর্য্যভট্ট—আধুনিক হিন্দু জ্যোতিষের প্রবর্ত্তক .	৪৭৬—৫৫০	"
(৫)	বরাহমিহির	৫০০—৫৫০	"
(৬)	ব্রহ্মগুপ্ত	৫৯৮—৬৫০	"
(৭)	শিলাদিত্য (দ্বিতীয়)—উত্তর ভারতের সম্রাট ...	৬১০—৬৫০	"
(৮)	দণ্ডী	৫৭০—৬২০	"
(৯)	বাণভট্ট এবং সুবন্ধু, ভর্তৃহরি ও ভট্টিকাব্য	৬১০—৬৫০	"
(১০)	ভবভূতি	৭০০—৭৫০	"
(১১)	শঙ্করাচার্য্য ... —	৭৮৮—৮৫০	"
(১২)	উত্তর ভারতের দুর্দ্দশার দিন — ...	৮০০—১০০০	

প্রধানতঃ এই সিদ্ধান্তের * অনুসরণেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিখিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিভূমি অতি শিথিল, ইহার যুক্তি-পরম্পরা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। আমরা এ সিদ্ধান্তের মূল-বিষয়-সমূহের অসারত্ব তন্ন তন্ন করিয়া প্রদর্শন করিয়াছি। প্রথম,—আর্য্যগণের উপনিবেশ। ভারতবর্ষ আবার আর্য্যগণের উপনিবেশ কি? ভারতবর্ষই তো আর্য্যগণের উৎপত্তি-স্থান! ভারতবর্ষ হইতেই আর্য্যগণের শাখা-প্রশাখা দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল;—তাঁহাদের জ্ঞান-রশ্মি দিকে দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে। † সুতরাং এখানে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। ফলতঃ, প্রাচীন-ভারতের ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে হইলে, আর্য্যগণের ভারতে উপনিবেশ-স্থাপনের কল্পনা অন্তর হইতে একেবারে অন্তরিত করা প্রথম প্রয়োজন। এইরূপ বেদের, ব্রাহ্মণ-আরণ্যকাদির ও উপনিষৎ প্রভৃতির কাল-নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। মানুষ-মাত্রেই মনু-বংশজ। কিন্তু তাই বলিয়া যদি কেহ এখন আত্ম-পরিচয়ে আপনাকে মনুবংশীয় বলিয়া ঘোষণা করেন, আর সেই পরিচয়ের উপর নির্ভর করিয়া যদি কেহ তাঁহার আট দশ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনু মহারাজকে নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পান, তাহা যেমন বিসদৃশ ও হাস্যোদ্দীপক হইবে; শ্রুতি-স্মৃত্যাদির কাল-নিরূপণেও সেই

* *Vide*, R. C. Dutta, *Civilisation in Ancient India*.

† পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আর্য্যগণ যে ভারতেরই অধিবাসী, এবং ভারতবর্ষ হইতেই যে তাঁহাদের শাখা-প্রশাখা অন্য দেশে যায়, তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। সাধারণ দুই একটী দৃষ্টান্তের তুলনায়, সে দিনের দুই-একটী বিষয়ের আলোচনা করিলেই এ ভ্রম উপলব্ধি হইতে পারে।

সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা।

ভারতের ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহে আগ্রহান্বিত হইয়া নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণও কিরূপ ভ্রম-প্রমাদে পতিত হন, প্রথমে তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। পূর্ব্বে (পৃথিবীর ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ডে) আমরা দেখাইয়াছি,—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান-সমূহকে প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার একটী বিভাগ—প্রথম ও প্রধান বিভাগ—দেশীয় সাহিত্যে প্রকাশিত দেশের কিংবদন্তী-সমূহ। * এবম্বিধ বিভাগ-বিষয়ে মতান্তরের কারণ নাই। তবে এইরূপ বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া ঐতিহাসিকগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা কথনই সমীচীন নহে। সিদ্ধান্ত হইয়াছে,—ভারতীয় সাহিত্যে প্রকাশিত কিংবদন্তী হইতে আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন শত বৎসরের অধিক কালের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কিংবদন্তীর অনুসরণে, খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের, ভারতের শ্রী-সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। † কিংবদন্তীর অনুসরণে সত্যসত্য কি খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও তত্ত্বই অবগত হওয়া যায় না? ভারতবর্ষের কিংবদন্তী—যুগ, কল্প, মন্বন্তর,—শাস্ত্রগ্রন্থে কত কাল হইতে বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে। দেশীয় সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে—এমন কিংবদন্তী যদি মানিতে হয়, যুগ-কল্প-মন্বন্তরাদির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় কি? অস্মদ্দেশ-প্রচলিত পঞ্জিকা-গণনায় যুগপ্রবর্ত্তনার ও যুগপরিমাণের বিষয় যাবহমান-কাল হইতে বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে। সাহিত্যে লিপিবদ্ধ কিংবদন্তী মানিতে হইলে, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চারি যুগে সংঘটিত, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদির অন্তর্ভুক্ত, কাল-প্রবাহকে কথনই ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সুতরাং প্রতিজ্ঞায় ও প্রতিপাদ্যে যে প্রমাদ ঘটিয়াছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। দেশীয় সাহিত্যে প্রকাশিত কিংবদন্তী মানিতে হইলে, সেই কল্প, সেই যুগ, সেই মন্বন্তর—সকলই মানিতে হয়; আর তাহাতে ভারতের সভ্যতার স্মৃতি কত দূর অতীতে প্রতিফলিত দেখি, বুঝিতে পারি। ‡ গ্রীস-দেশীয় গ্রন্থকারগণ—টেসিয়াস, হেরোডোটাস বা মেগাস্থিনীস—এই যুগমন্বন্তরাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই বলিয়া, দেশীয় সাহিত্যে—শাস্ত্রগ্রন্থাভ্যন্তরে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই বলিয়া, প্রাচীন-ভারতের পুণ্য-স্মৃতি লোপ পাইবে,—

* ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের উক্তি,—"The sources of, or original authorities for, the early history of India may be arranged in four classes. The first of these is tradition, chiefly as recorded in native literature."

† এ বিষয়ে ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত,—"For the period anterior to Alexander the Great, extending from 600 B. C. to 326 B. C., dependence must be placed almost wholly upon literary tradition, communicated through works composed in many different ages, and frequently recorded in scattered incidental notices."—*The Early Histry of India* by V. A. Smith.

‡ পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে এবং চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে যুগমন্বন্তরাদির বিষয়ে বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। * অথচ, সেই বৈদেশিকগণের অসম্পূর্ণ জ্ঞান-গবেষণার উপর নির্ভর করিয়াই ঐতিহাসিকগণ ভারতের সভ্যতার কাল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ভ্রম-প্রমাদ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনই কারণ নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত ইউরোপের অধিবাসিগণের প্রাচীন ভারতের সভ্যতা বিষয়ে আদৌ অভিজ্ঞতা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ-দার্শনিক গেটে মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের রসাস্বাদ করিতে গিয়া কিরূপ বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। † কিন্তু সেই গেটের বিশ্বাস ছিল,—ভারতের পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতি কৌতূহলোদ্দীপক বটে, কিন্তু সকলই অন্তঃসারশূন্য। এ পর্য্যন্ত ইউরোপের মনীষিগণ অনেকেই সেই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়া আসিতেছিলেন। ‡ কিন্তু এখন সে স্রোত কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যদিও ভ্রম-সংস্কার এখনও দূরীভূত হয় নাই, কিন্তু আলোক-রশ্মি অনুসন্ধিৎসুগণের নয়নে বিচ্ছুরিত হইয়াছে বলিয়া সম্পূর্ণরূপ বুঝা যাইতেছে। পূর্ব্বে যে ঐতিহাসিকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, তাঁহারই কয়েকটী কথার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। তাহাতেই বুঝা যাইবে, স্রোত কেমন ধীরে ধীরে ফিরিতেছে। তিনি বলিয়াছেন,—"যদিও প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ রাজচক্রবর্ত্তীগণের নাম পর্য্যন্ত এখনও অনেক পাঠকের অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে এবং কয়েক জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের মনে ক্বচিৎ সে স্মৃতি প্রতিফলিত হয়; কিন্তু যতই ধারাবাহিকরূপে শ্রেণিবদ্ধভাবে সেই সকল কাহিনী—প্রাচীন ভারতের প্রাচীন বৃত্তান্ত—প্রচারিত হইবে, ততই তাহা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তখন সকলে বুঝিতে পারিবেন, অধুনা যে সকল ঐতিহাসিক-গবেষণায় চিত্ত ন্যস্ত আছে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের জ্ঞাতব্য তত্ত্ব তাহার অপেক্ষা বড় অল্প মূল্যবান নহে। একজন ভারতীয় গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—'পৃথিবীর অজ্ঞতা-নিবন্ধনই ভারতের গৌরব-গাথা—মহাপুরুষগণের মহত্ত্ব গাথা—অবিদিত আছে; নচেৎ, প্রাচীন ভারতের গৌরবের মহত্ত্বের অবধি নাই', ইহা বড়ই সত্য।" ¶ এই বলিয়া—

* ভারতীয় কিংবদন্তী-সমূহ বিশুদ্ধ-ভাবে কোথায় পাওয়া যায়,—এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের কি ভ্রম-ধারণা উপলব্ধি করুন! ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন,—"The purely Indian traditions are supplemented by the notes of the Greek authors, Ktesias, Herodotus, the historians of Alexander, Megasthenes and others."

† পৃথিবীর ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ডে 'ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ' প্রসঙ্গে ৩৩০ পৃষ্ঠা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

‡ "European students, whose attention has been mainly directed to the Graeco-Roman foundation of modern civilisation, may be disposed to agree with the German philosopher in the belief that 'Chinese, Indian and Egyptian antiquities are never more than curiosities; (*The Maxims and Reflections of Goethe*) but however well-founded that opinion may have been in Goethe's day it can no longer command ascent."

¶ "India suffers to-day in the estimation of the world more through that world's ignorance of the achievements of the heroes of Indian history than through the absence or insignificance of such achievements."—C. N. K. Aiyar, *Sri Sancharacharya, his Life and Times.* ঐ উক্তির সার্থকতা মান্য করিয়াও, বড় দুঃখের বিষয়, মিঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের অধিক কালের ইতিবৃত্তের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

এইরূপ অনুরাগ-ভরে ইতিহাস লিখিতে বসিয়াও, তাঁহার ইতিহাসে প্রাচীন-ভারতের পুণ্য-স্মৃতি জাগিয়া উঠিবে—প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্য হইতে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইবে—এই বিশ্বাসে বিশ্বাসবান হইয়াও, খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসরের অধিক পূর্ব্বের প্রাচীন-ভারতের গৌরব-গরিমা তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই! ইহা অবশ্যই ক্ষোভের বিষয়! তবে পূর্ব্বে কেহই কিছু দেখিতে পাইতেন না, এখন কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছেন;—ইহাতে আশা হয়, গবেষণা অব্যাহত থাকিলে, ভবিষ্যতে শনৈঃশনৈঃ প্রকৃত তথ্য অধিগত হইবে।

পাশ্চাত্যের পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত।

ভারতের সাহিত্যের অভ্যন্তরে যে প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান-সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কাহারও অন্যমত হইতে পারে না। সেই সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন—শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহ। শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে পুরাণ-পরম্পরাকে প্রাচীন ইতিহাসের এক প্রকৃষ্ট উপাদান বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাই পুরাণ-পরম্পরার প্রবর্ত্তনার কাল লইয়া প্রায়ই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার পরিচয় পাই। প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠার কাল-নির্দ্দেশ বিষয়ে পূর্ব্বে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাইয়াছি, ৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পুরাণ-রচনার কাল নির্দ্দিষ্ট হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত—অনেক স্থলে এখনও পর্য্যন্ত—এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল। পাশ্চাত্য-দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে যে সকল ইতিহাস পঠিত ও সমাদৃত হয়, তাহার অনেক ইতিহাসেই এখনও এই ভাব পরিব্যক্ত আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রথমে ডক্টর (হোরেস হেম্যান) উইলসন পুরাণ রচনার কাল নির্ণয়ে প্রয়াস পান। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তিনি এই মত প্রচার করেন যে, ১০৪৫ খৃষ্টাব্দের পরে পুরাণ-পরম্পরার প্রবর্ত্তনা হয়। বিষ্ণুপুরাণকে পুরাণসমূহের আদিভূত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া, তিনি বিষ্ণুপুরাণের ঐরূপ কাল নির্দ্দেশ করেন। বহুদিন সেই মতই একবাক্যে মান্য হইয়াছিল। তাঁহার পর ম্যাক্সমূলার (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে) সংস্কৃত-সাহিত্যের পৌর্ব্বাপর্য্যের একটা পরিচয় দেন। তাঁহার এবং তৎসাময়িক পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে ৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পুরাণ-রচনার কাল নির্দ্দিষ্ট হয়। আমাদের রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও এই মতেরই পরিপোষক। স্যর উইলিয়ম হাণ্টার বরাবর পূর্ব্বমতই পরিপোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভারতের ইতিহাসের দ্বাবিংশ সংস্করণে সেই মত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হয়। পরিশেষে, এখন (১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সংস্করণে) মিঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ আরও একটু—একটু কেন অনেক—অগ্রসর হইয়াছেন। * তিনি এখন সিদ্ধান্ত করিতেছেন, পুরাণসমূহ কোন-না-কোনও

* এ বিষয়ে ভিন্সেণ্ট স্মিথের উক্তি,—"I may add that *Purans* in some shape were already authoritative in fourth Century B. C. The author of the *Arthasastra* ranks the *Atharva-veda* and *Itihasha* as the Fourth and Fifth Vedas (Bk. I. ch. 3.); and directs the King to spend his afternoons in the study of *Itihasa* which is defined as comprising six factors, namely, (1) *Purana*, (2) *Itivritta* (history), *Akhhyayika* (tales) (4) *Udaharana* (illustrative stories), (5) *Dharmasastra*, and (6) *Arthasastra* (Bk. I. ch 5)

আকারে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রামাণ্য গ্রন্থ মধ্য পরিগণিত ছিল। কোথায় খৃষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তিকালে একাদশ শতাব্দীতে, আর কোথায় খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে চতুর্থ শতাব্দীতে,—কয়েক বৎসরের গবেষণার ফলে কি মত-পরিবর্ত্তনই সংঘটিত হইয়াছে! পূর্ব্বোক্ত মত-প্রবর্ত্তনার এবং সেই মত-পরিবর্ত্তনের কয়েকটী হেতুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। বিষ্ণু-পুরাণে 'যবন' শব্দ আছে। যবন শব্দে এক অর্থে মুসলমানদিগকে বুঝাইয়া থাকে। মুসলমান-গণের অভ্যুদয় ও ভারতের সহিত সম্বন্ধ-সংশ্রবের কাল—একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণকে (বিষ্ণুপুরাণে 'যবন' শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া) ১০৪৫ খৃষ্টাব্দের বা তাহার সমসময়ের রচনা বলিয়া-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এখন আর এ মতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও আস্থাবান নহেন।

পর্য্যায়ক্রমে অনুসন্ধানের ফলে এখন মত দাঁড়াইয়াছে,—খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পুরাণ-সমূহ প্রমাণ্য-গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত ছিল। প্রাচীন ভারতে ইতিহাস ছিল না বা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নাই বলিয়া এখনও যে একটা আন্দোলন চলিয়া থাকে, অর্থশাস্ত্রের উক্তি স্মরণ করায় সে আন্দোলন অনেকটা নিবৃত্তি হইতে পারে। চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ চাণক্য অর্থশাস্ত্র সঙ্কলন করেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তক্রমেই স্থির হইয়াছে যে, অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর ঘটনা। 'অর্থশাস্ত্রে' যখন লিখিত আছে,—"সাম, ঋক এবং যজুর্ব্বেদই ত্রিবেদ, অথর্ব্ববেদ এবং ইতিহাস বেদ সহ ইহাদিগকে বেদ কহে; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষই অঙ্গ নামে কথিত হয়"; অপিচ, 'অর্থশাস্ত্রে' যখন দেখিতে পাই,—রাজকুমারের দৈনন্দিন কর্ম্ম-নির্দ্ধারণ উপলক্ষে লিখিত রহিয়াছে,—"রাজকুমার প্রাতঃকালে হস্তী, অশ্ব, রথ এবং অস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধ শিক্ষা করিবেন এবং অপরাহ্নে ইতিহাস শ্রবণ করিবেন; পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ইতিহাস নামে খ্যাত;" তখন বুঝা যাইতেছে না কি, ভারতে কি ছিল আর কি না ছিল? বুঝা যাইতেছে না কি,—ইতিহাস ছিল, পুরাণ ছিল, বেদবেদাঙ্গ ছিল,—প্রাচীন সমুন্নত সুসভ্য সমাজের পরিচয়-চিহ্ন সকলই ছিল! খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর গ্রন্থ অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হইল—লোকলোচনের সমক্ষে তাহার পৃষ্ঠাসমূহ উদ্ঘাটিত হইল; তাই এখন খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পুরাণ-সমূহের অস্তিত্বের কাল পিছাইয়া পড়িল! কিন্তু আরও একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকিলে, আরও কত পূর্ব্বে সে অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইত! যাহা হউক, সে আলোচনা পরে করা যাইবে।

অনুসন্ধানে মত-পরিবর্ত্তন।

এখন দেখা যাউক, কি করিয়া ক্রমে ক্রমে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পুরাণ-পরম্পরার বিদ্যমানতা বিষয়ক সিদ্ধান্তে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ উপনীত হইয়াছেন! ১০৩০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক আল্-বারুণি ভারতের এক ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তিনি অষ্টাদশ পুরাণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মৎস্য, আদিত্য ও বায়ু—এই তিন খানি পুরাণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বলিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণু-

অনুসন্ধানের পর্য্যায়।

পুরাণে যে অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন তিনি অন্য নামের পুরাণের পরিচয়ও পাইয়াছিলেন। তাহা হইলেই বেশ বুঝা যাইতেছে, তখনও (১০৩০ খৃষ্টাব্দে) অষ্টাদশ মহাপুরাণের অস্তিত্ব ছিল এবং ঋষি-প্রবর্ত্তিত সেই পুরাণ সমূহ স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া প্রচার ছিল। আল্‌বারুণির পূর্ব্বে পুরাণ-ইতিহাসের বিদ্যমানতার আর এক প্রমাণ—হর্ষচরিতে পুরাণের উল্লেখ। বাণ—হর্ষচরিত গ্রন্থের রচয়িতা। ৬২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। সেই হর্ষচরিতে প্রকাশ,—গ্রন্থকার বাণভট্ট যখন শোণ-নদীর তীরে, বর্ত্তমান সাহাবাদ জেলায়, আপনার বাসগ্রামে গমন করেন, তখন সুদৃষ্টি নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে স্তোত্রের সুরে বায়ু-পুরাণ পাঠ করিতে দেখিয়াছিলেন। বাণভট্ট স্বয়ং অগ্নি, ভাগবত, মার্কণ্ডেয় এবং বায়ুপুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা পুরাণসমূহের অস্তিত্ব আলবারুণির আরও চারি শত বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া সপ্রমাণ হয়। বঙ্গদেশে স্কন্দপুরাণের যে হস্তলিখিত পুঁথি আবিষ্কৃত হয়, সেই পুঁথির বর্ণমালা, গুপ্তবংশীয় রাজগণের সমসময়ে প্রচলিত (অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর) বর্ণমালার অনুরূপ। তাহা হইতে ঐ সময়েও পুরাণ-পরম্পরার অস্তিত্বের বিষয় বেশ প্রমাণিত হয়। * 'মিলিন্দা-পহ্ন'—বৌদ্ধদিগের এক প্রাচীনতম গ্রন্থ। ৩০০ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। মিলিন্দা-পহ্নে বেদ এবং রামায়ণ মহাভারতাদির সঙ্গে পুরাণের উল্লেখ আছে। এতদ্দ্বারা ৩০০ খৃষ্টাব্দে পুরাণাদির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। ডক্টর বুলার সিদ্ধান্ত করেন যে, গুপ্তবংশের রাজত্বকালে পুরাণ পাঠ বিদ্যমান ছিল, কারণ, ভবিষ্য-রাজবংশ-বর্ণন প্রসঙ্গে বায়ুপুরাণে, বিষ্ণুপুরাণে, মৎস্যপুরাণে ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ঐ বংশীয় রাজন্যগণের এবং তাঁহাদের সমসাময়িক রাজন্যবর্গের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াই পুরাণকার বংশ-বর্ণনা শেষ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা, ঐ সময়ের পর্য্যন্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়। মিষ্টার পার্জিটার পুরাণ সমূহের উল্লিখিত বংশপরম্পরার তুলনায় আলোচনা করেন। † সেই আলোচনার ফলে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—প্রথমে 'খারোষ্ঠী' বর্ণমালায় লিখিত প্রাকৃত ভাষার শ্লোকে পুরাণোক্ত বংশাবলী বিবৃত ছিল। অন্ধ্র-বংশীয় রাজা যজ্ঞশ্রীর রাজত্বকালে (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে) সংস্কৃত ভাষায় উহা লিপিবদ্ধ হয়। ঐ ভাষান্তরিত বংশাবলী ২৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভবিষ্যপুরাণ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ৩১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩২০ খৃষ্টাব্দে উহাই পরিবর্ত্তিত আকারে বায়ুপুরাণের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। এবম্প্রকারে ক্রমশঃ ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণে উহা স্থান পাইয়াছে। যাহাই হউক, পার্জিটারের হিসাবে পুরাণের অস্তিত্ব খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে সপ্রমাণ হয়। এখন অর্থশাস্ত্রের আলোচনায়, ভিন্সেণ্ট স্মিথের গবেষণায়, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পুরাণাদির অস্তিত্বের বিষয় সপ্রমাণ হইতেছে। আশা হয়, আবার কিছু দিন পরে আমাদের সিদ্ধান্ত—শাস্ত্রোক্ত মতই—সকলকে একবাক্যে মানিয়া লইতে হইবে।

* *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1903, P. 95.

† *The Dynasties of the Kali Age* by Mr. F. E. Pargiter.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:*:—

অন্যান্য উপাদান-প্রসঙ্গ ও সার-সিদ্ধান্ত।

[পাশ্চাত্যে ভারত-প্রসঙ্গ,—পাশ্চাত্যে প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে ভারতের উল্লেখ;—প্রাচ্যে ভারত-প্রসঙ্গ,—চীনদেশ প্রভৃতির ইতিহাসে ভারতের কথা;—অন্যান্য উপাদান প্রসঙ্গে,—মুদ্রা, খোদিত-লিপি প্রভৃতির আলোচনায়;—শাস্ত্রগ্রন্থে প্রাচীন ইতিহাস;—৩৯ লক্ষ বৎসরের কথা।]

পাশ্চাত্যে ভারত-প্রসঙ্গ।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রধান ও প্রকৃষ্ট যে উপাদান শাস্ত্রগ্রন্থ, তাহার আলোচনায় প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠার নিদর্শন যে কতকাল পূর্ব্বের পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণার অতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই প্রধানতঃ শাস্ত্র-গ্রন্থ সমূহের কাল-নির্দ্দেশে মানুষ বিভ্রমগ্রস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তদনুসারী গণনাও বিভ্রমপূর্ণ হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতের ইতিহাসের যে দ্বিতীয় উপাদান নির্দ্দেশ করেন, তুলনায় তাহা আধুনিক; সুতরাং সাধারণের সহজ-দৃষ্টির তাদৃশ অন্তরায়ভূত নহে এবং সে উপাদান সম্বন্ধে আধুনিক অনেকেই আস্থা-সম্পন্ন। সে উপাদান—বৈদেশিক ভ্রমণকারীর ও বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের রচনায় ভারতের প্রসঙ্গ। বৈদেশিকগণের সহিত—ভারতের সহিত সংশ্রবশূন্য হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন-জনপদবাসী মানবগণ যখন বৈদেশিক সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল তখনকার জনগণের সহিত—ভারতের সংশ্রবের বিষয়, প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের তুলনায় সেদিনের ঘটনা হইলেও, বড় অল্পদিনের কথা নহে। "পৃথিবীর ইতিহাস" চতুর্থ-খণ্ডে আমরা দেখাইয়াছি, ভারতের প্রতি মিশরের, পারস্যের, গ্রীসের লোভলোলুপ দৃষ্টি খৃষ্ট-জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই পতিত হইয়াছিল। সিসোষ্ট্রীস খৃষ্ট-জন্মের পনের শত বৎসর পূর্ব্বে মিশর হইতে, রাজ্ঞী সেমিরামিস খৃষ্ট-জন্মের তের শত বৎসর পূর্ব্বে আসিরীয়া হইতে, দারায়ুস খৃষ্ট-জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে পারস্য হইতে এবং তৎপরে ৩২৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার গ্রীস হইতে ভারতের ঐশ্বর্য্যে প্রলুব্ধ হইয়া ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কতক উপকথাই হউক, কতক সত্য ঘটনাই হউক, সেই সেই উপলক্ষে তত্তদ্দেশের ইতিহাসে বা কিংবদন্তীতে ভারতের ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বের সংবাদ প্রচারিত আছে। এ সকল বিবরণ পূর্ব্বেই আমরা প্রকাশ করিয়াছি। ভারতের প্রতিষ্ঠার ঐ সকল নিদর্শন ভিন্ন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঐ শ্রেণীর আরও কতকগুলি নিদর্শন অধুনা অনুসন্ধান করিয়া পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সেই শ্রেণীর একটী প্রাচীনতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন—পারস্যাধিপ দারায়ুসের খোদিত লিপি। এই দারায়ুস—হিষ্টাস্পেসের পুত্র বলিয়া পরিচিত। পার্সিপোলিসে এবং নাক্স-ই-রস্তমে দারায়ুস যে খোদিত লিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতের প্রসঙ্গ উত্থাপন আছে। ৮৮৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নাক্স-ই-রস্তমের লিপি খোদিত

হইয়াছিল, প্রতিপন্ন হয়। * টেসিয়াস ৪০১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে আর্ত্তাজারাক্সেস মেম্‌ননের দরবারে ভিষকের পদে ব্রতী ছিলেন। তিনি তাৎকালিক ভ্রমণকারিগণের ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া যান। সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে 'পূর্ব্ব-রাজ্যের' কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলী বিবৃত ছিল। তন্মধ্যে ভারতের প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। দারায়ুসের খোদিত লিপিতে ৪৮৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এবং টেসিয়াসের সংগৃহীত কাহিনীর মধ্যে ৪০১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ভারতের উল্লেখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টিগোচর হয়। আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমন হইতেই ইউরোপের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর প্রায় ২০ বৎসর পরে সিরীয়ার ও মিশরের রাজন্যবর্গ যে সকল গ্রীক দূতকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন, মৌর্য্যবংশীয় সম্রাটগণের দরবারে অবস্থিতি-পূর্ব্বক তাঁহারা ভারতের বহু তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই সকল বর্ণনা গ্রীসের ও রোমের ঐতিহাসিক-গণ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। প্রোক্ত গ্রীক দূতগণের মধ্যে মেগাস্থিনীস প্রদত্ত বিবরণের যে সকল অংশ অধুনা রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সন্দেহ নাই। ফিলাষ্ট্রেটাস ভারতবর্ষের বিষয় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সম্রাজ্ঞী জুলিয়া ডোম্‌নার অনুরোধে তিনি আপোলোনিয়াস সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে লিখিত আছে,—আপোলোনিয়াস উত্তর-পশ্চিম ভারতে আসিয়াছিলেন। অধ্যাপক পেট্রি বলেন, আপোলোনিয়াসের সেই ভারতাগমন ঘটনা ৪৩ বা ৪৪ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অনেকে এই ব্যাপারকে কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু তাহা হইলেও পাশ্চাত্যের গ্রন্থে ভারতের উল্লেখ প্রসঙ্গে ফিলাষ্ট্রেটাসের নামও উক্ত হইয়া থাকে। এরিয়ান—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বর্ণনা এবং আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। লাগোস পুত্র টলেমি ভারতবর্ষ বিষয়ে যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, এবং আলেকজাণ্ডারের কর্ম্মচারিগণ যে বিবরণ প্রদান করিয়া যান, প্রধানতঃ সেই সকলের উপর নির্ভর করিয়াই এরিয়ানের গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। ফলতঃ, খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর অবস্থার বিবরণ সমসাময়িক কাগজপত্রে যাহা কিছু পাইয়াছিলেন, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এরিয়ান আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এরিয়ানের পর হেরোডোটাস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া যান। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। পারস্যের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ-সংক্রান্ত বিবরণ তিনি লিপি-বদ্ধ করিয়া যান বটে; কিন্তু দারায়ুসের খোদিত লিপি অপেক্ষা তাহাতে অধিক তথ্য কিছুই পাওয়া যায় নাই। কুইন্টাস কার্টিয়াস প্রমুখ আরও দুই চারি জনের নাম এতৎপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের সম্বন্ধে এবম্বিধ উল্লেখ পাশ্চাত্যদেশের গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

* The earliest foreign notice of India is that in the inscriptions of the Persian King, Darius, son of Hytespes at Persepolis and Naksh-i-Rustam, the latter of which may be referred to the year 486 B.C.—Cf. Rawlinson *Herodotus* and Vincent A. Smith's *Early History*.

ইহার অধিক পূর্ব্বের সভ্যতার ইতিহাস পাশ্চাত্য দেশের নাই; সুতরাং তৎপূর্ব্বের ভারতের কথাও ব্যক্ত করিতে তাঁহারা অসমর্থ। কিন্তু তাই বলিয়া, সেই উপাদান নাই বলিয়া, ভারতের পুণ্য-স্মৃতি কখনই পরিম্লান হইতে পারে না।

পাশ্চাত্যের ন্যায় প্রাচ্য-দেশের গ্রন্থপত্রে ভারতের যে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাতে ৬৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রাধান্যের পরিচয় পাই। চীনদেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রসঙ্গ

প্রাচ্যে ভারত প্রসঙ্গ।

পূর্ব্বেই উত্থাপন করিয়াছি (পৃথিবীর ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য)। ৬৮০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে পর খৃষ্টাব্দের বহুদিন পর্য্যন্ত চীনে জাপানে ভারতবাসীর গতিবিধি সূত্রে ভারতের সভ্যতার ও সমৃদ্ধির বিবরণ প্রাচ্যের ইতিহাসে স্থান পাইয়া আছে। সু-মা-চিন—চীনদেশের আদি-ঐতিহাসিক—ইতিহাস-রচনার পিতৃস্থানীয় বলিয়া অভিহিত হন। । তাঁহার গ্রন্থ ১০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, চীনদেশের প্রাচীনতম ইতিহাসে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উহাই প্রথম উল্লেখ বলিয়া অনেকে মনে করেন। তার পর চীনদেশের ধর্ম্মযাজকগণ একে একে যখন ভারতে আগমন করিতে আরম্ভ করেন, তখন চীন-ভাষার গ্রন্থপত্রে ভারতের পুণ্যস্মৃতি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ফা-হিয়ান চীন হইতে যাত্রা করেন, পনের বৎসর পরে তিনি দেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ভারতের তাৎকালিক সমৃদ্ধির এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ফা-হিয়ানের অনুসরণে আর আর যে সকল ধর্ম্মযাজক ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হুয়েন-সাং আপন ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ৬২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই যোল বৎসরের মধ্যে তিনি ভারতের যে সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলেন, তাৎকালিক ভারতের ইতিহাসের তাহা এক প্রকৃষ্ট উপাদান মধ্যে পরিগণিত। বৈদেশিকগণের গ্রন্থ মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আর আর যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা তুলনায় আরও আধুনিক; সুতরাং এ প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে দিক দিয়া যে ভাবেই বিতর্ক উত্থাপন করা যাউক, এ সকল নিদর্শন দেখিয়া পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠার বিষয় কখনই উপেক্ষিত হইতে পারে না। অন্য দেশের জ্ঞান-গবেষণা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে পৌঁছিতে পারে নাই বলিয়াই যে ভারতবর্ষের মহীয়সী মহিমা খর্ব্ব হইবে, তাহার কোনই কারণ নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে হইলে তাই ভারতবর্ষে প্রাপ্ত উপাদানের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করা আবশ্যক। সে উপাদান—পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ। শাস্ত্র-গ্রন্থ ভিন্ন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রাচীন ইতিহাসের আর আর উপাদান—প্রাচীন মুদ্রা, খোদিত লিপি, স্মৃতি-সৌধ প্রভৃতি। ঐতিহাসিকগণ এ সমুদায়কে তৃতীয় শ্রেণীর উপাদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া

খোদিত লিপি, মুদ্রা প্রভৃতি প্রসঙ্গে।

গিয়াছেন। এ সকল, ইতিহাসের—অল্পদিন পূর্ব্বের ইতিহাসের—উপাদান বটে; কিন্তু প্রাচীনতম ইতিহাসের উপাদান মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। খোদিত লিপি বিবিধ বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের ঘোষণাবাণী এই শ্রেণীর প্রকৃষ্ট প্রাচীনতম নিদর্শন। অশোকের

পূর্ব্ববর্ত্তী কালে প্রবর্ত্তিত ঐ শ্রেণীর লিপি আজি পর্য্যন্ত কোথাও অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই। হয় তো ছিল; লোপ পাইয়াছে,—বিপ্লবে বিধ্বস্ত হইয়াছে; কিন্তু যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন অশোক-প্রবর্ত্তিত লিপি এ পক্ষের আদি প্রমাণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও তৎপূর্ব্বের সভ্যতার বা প্রতিষ্ঠার স্মৃতি কোনক্রমেই মুছিয়া ফেলা যায় না। সুতরাং এবম্বিধ উপাদান প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান নহে। অশোক-প্রবর্ত্তিত ঘোষণা-বাণী ভিন্ন, আর আর যে সকল খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে আজমীঢ় সহরের প্রস্তরগাত্রে খোদিত দুইখানি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের লিপি এবং ঐরূপ প্রস্তরগাত্রে খোদিত ধার-সহরের আর একখানি সংস্কৃত নাটকের লিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিতোরের প্রসিদ্ধ স্তম্ভের গাত্রে যে খোদিত লিপি দৃষ্ট হয়, তাহাও স্থাপত্যের ও কারু-কৌশলের নিদর্শন। এবম্প্রকার যে সকল খোদিত লিপি ভারতবর্ষে পরিদৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় প্রধানতঃ স্মৃতিচিহ্ন, উৎসর্গ বা দানপত্র সংক্রান্ত। স্মৃতিচিহ্ন বা উৎসর্গ-পত্র প্রধানতঃ প্রস্তরের উপর সংস্কৃত কবিতাছন্দে খোদিত। দানপত্র সাধারণতঃ তাম্রফলকে লিখিত। দক্ষিণ-ভারতে খোদিতলিপির প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়; তবে তৎসমস্তই খৃষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তিকালের লিপি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মহীশূর-রাজ্যে প্রস্তর-গাত্রে খোদিত অশোকের প্রবর্ত্তিত লিপি এবং ভট্টিপ্রলু 'কাসকেট' পাত্রাধারে যে সংক্ষিপ্ত উৎসর্গপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তিকালের লিপি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। উত্তর-ভারতের অশোকের লিপিই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এতাবৎকাল প্রাচীনতম লিপি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু অধুনা পিপ্রাওয়াতে বুদ্ধদেবের নামে উৎসর্গীকৃত তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন সম্বলিত যে পাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই পাত্র-গাত্রে খোদিত লিপিই প্রাচীনতম খোদিত লিপি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন, ৪৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ঐ লিপি খোদিত হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণতঃ অশোকের প্রবর্ত্তিত লিপি অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবর্ত্তিত লিপি এ পক্ষে আদি ও প্রামাণ্য লিপি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। কুষণ-বংশের প্রবর্ত্তিত লিপি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লিপি বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং সেই সময়ের ও তাহার পরবর্ত্তিকালের বহু লিপি অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অন্যান্য উপাদান প্রসঙ্গে।

খোদিত লিপি ভিন্ন প্রাচীন ইতিহাসের আর এক উপাদান—মুদ্রা। প্রাচীন মুদ্রাদি সংগ্রহ করিয়া বহু প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বহু গবেষণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে আলোচনায় প্রাচীন ভারতের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠার নিদর্শন তাঁহারা বড় কিছু অনুসন্ধান করিয়া পান নাই। সে সকল মুদ্রায় বাকৃত্রিয়ার, ইন্দোগ্রীকের এবং ইন্দোপার্থিয়ার রাজন্যবর্গের সহিত সম্বন্ধ-সংশ্রব মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ, আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তিকালের কোনও মুদ্রার অস্তিত্ব প্রায়ই স্বীকৃত হয় নাই। প্রাচীন মুদ্রা—প্রতিষ্ঠার এক নিদর্শন বটে; কিন্তু যে জাতি বহুদিন হইতে পরাধীন, তাহাদের দেশের প্রাচীন মুদ্রা অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া একান্ত অসম্ভব। রাজশক্তি পরিবর্ত্তনের সহিত মুদ্রার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। একই বংশের বংশধর যেতার

আমলে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা লোপপ্রাপ্ত হয়। ভারতের উপর বিবর্ত্তনের পর বিবর্ত্তন চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর ইংরাজ আসিয়া এখন প্রাচীন মুদ্রার অনুসন্ধান পক্ষে চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু সে অনুসন্ধান কদাচ সুফলপ্রদ হইতে পারে না। ইংরেজ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আগমন করেন, তখন তাঁহারা যে মুদ্রা চালাইয়াছিলেন, সেই মুদ্রাই এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমানের আধিপত্য—তুলনায় সে-দিনের ঘটনা। কিন্তু সকল মুসলমান নৃপতির প্রবর্ত্তিত মুদ্রাই কি এখন পাওয়া যায়? সুতরাং অধিক পূর্ব্ববর্ত্তি কালের প্রাচীনতম মুদ্রা অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। তবে যে গ্রীস প্রভৃতি দেশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দুই চারিটী মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া অনুসন্ধানের পথ দেখাইয়া দিতেছে, তাহার কারণ অন্যরূপ হইতে পারে। এদেশে ঐ সকল মুদ্রা লোপ-প্রাপ্ত হইলেও বাণিজ্য-ব্যপদেশে পরবর্ত্তিকালে ঐ সকল মুদ্রা এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন, মুদ্রা বিচার প্রসঙ্গে আর একটী কথা উঠিতে পারে। ভারতীয় বর্ণমালা-সংবলিত, ভারতীয় দেবদেবীর বা নৃপতিবর্গের প্রতিকৃতি সমন্বিত, যে সকল মুদ্রা অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহার মধ্যের কোনও কোনও মুদ্রা গ্রীক-বাক্‌ত্রিয় মুদ্রার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াও অনুমান করা যাইতে পারে। যে মুদ্রা সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে, সে সমুদ্রগুপ্ত কোন্ সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন, তাহার মীমাংসা করা সুসাধ্য নহে। ফলতঃ, মুদ্রার দ্বারা আধুনিক বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কিছুকালের তথ্য কিছু কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের সেই প্রাচীনতম ইতিহাসের কোনও তথ্যই তাহাতে মিলিতে পারে না। মুদ্রা ভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের অভ্যন্তরে ইতিহাসের উপাদান কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু সে সাহিত্যের সে ভাবে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং তাহারও অধিকাংশ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে অব্দ গণনার পদ্ধতি নানা আকারে নানারূপে চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কাল-গণনায় স্বতঃই বিভ্রমগ্রস্ত হইতে হয়। কোন নৃপতির প্রবর্ত্তিত অব্দে কোন্ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিতে সমর্থ না হইলে, ভ্রমপ্রমাদ পদে পদেই ঘটিয়া থাকে। ঐ সকল কারণেই সাধারণ মনুষ্যের দৃষ্টি দূর অতীতে পৌঁছিতে পারে না। সুতরাং প্রাচীন ভারতের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গেলে, অভ্রান্ত শাস্ত্র গ্রন্থের সাহায্য ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সর্ব্ববাদিসম্মত মত,—ভারতের ইতিহাসের প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপাদান—দেশীয় সাহিত্যে প্রকাশিত দেশের কিংবদন্তী-সমূহ। ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ সেই সাহিত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন, আর তদন্তর্গত বিবরণ ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সার শ্রেষ্ঠ উপাদান। যে দিক দিয়া যিনি যে ভাবেই বিচার করিয়া দেখুন, শাস্ত্র গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদানকে কেহ উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। পরন্তু, সে উপাদানে ভারতের সভ্যতার ইতিহাস—স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বের ইতিহাস বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। যুগ মন্বন্তরাদির প্রসঙ্গ শাস্ত্র-গ্রন্থের এক প্রধান আলোচ্য বিষয়। কত যুগ কত মন্বন্তর অতীত হইয়া গিয়াছে, শাস্ত্র গ্রন্থ সে স্মৃতি

শাস্ত্রগ্রন্থ
প্রাচীন ইতিহাস

বক্ষে ধারণ করিয়া বিদ্যমান আছেন। শাস্ত্র-গ্রন্থের অস্তিত্বের অপলাপ করিতে সাহস না হইলে, যুগ-মন্বন্তরাদির ইতিকথা অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে পুরাণ-প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তাই এখন পুরাণ-পরম্পরার বিদ্যমানতার কাল খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসরের পূর্ব্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের পূর্ব্বের কোনও নিদর্শন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টিপথের অন্তর্ভুক্ত হইলে, পুরাণ-সমূহের বিদ্যমানতার কাল আরও কত পূর্ব্বে পিছাইয়া পড়িবে! কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মনোমত সে প্রমাণ প্রাপ্তি পক্ষে বিলম্ব ঘটিলেও, পুরাণ-পরম্পরার বিদ্যমানতা মানিতে হইলে, তদুক্ত যুগ-মন্বন্তরাদির বিষয় ও তৎসাময়িক ইতিহাসের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যে যুক্তি-প্রভাবে পুরাণাদির বিদ্যমানতার কাল নির্ণীত হইতেছে, সেই যুক্তির সাহায্যেই পুরাণ বর্ণিত বিবরণ-সমূহের একটা ধারা পাওয়া যাইতেছে। যে হিসাবে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ছয় শত অব্দ হইতে অধুনা ভারতের ইতিহাসের পৌর্ব্বাপৌর্য্য নির্দ্ধারণের প্রয়াস পাইতেছেন, তদ্বিধ যুক্তির সাহায্যেই আমরা ঐ সময়ের প্রায় ৩৯ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস সঙ্কলন করিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারি।

পূর্ব্বের ছয় মন্বন্তরের ইতিহাস বিবৃত করিবার চেষ্টা না করিয়া, বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের অন্তর্গত বর্ত্তমান অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগের অতীত কালের অতি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে গেলেও খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৮ লক্ষ ৯১ হাজার বৎসরের ইতিবৃত্ত বলার আবশ্যক হয়। খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়াই মানুষ বিস্ময়-বিহ্বল; কিন্তু তাহারও পূর্ব্ব-বর্ত্তিকালের—৩৮ লক্ষ ৯১ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কালের—ইতিহাস ভারতের শাস্ত্র-গ্রন্থের অভ্যন্তরে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মন্বন্তরের কথা বলিতে গেলে, আরও প্রায় ১৮৫ কোটী বৎসরের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের—পল্লবগ্রাহী জনের—সে ধারণা সকল সময় সম্ভবপর নহে বলিয়া আমরা এস্থলে সংক্ষেপে সপ্তম মন্বন্তরের অংশ-বিশেষের কয়েকটী বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। সপ্তম মন্বন্তরের বা বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিযুগ এক্ষণে চলিতেছে। সে হিসাবে, অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগের ৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৫ বৎসর এক্ষণে অতীত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সব কথা ছাড়িয়া দিয়া, যদি বৈবস্বত মন্বন্তরের অন্তর্গত অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগের বিষয় বলিতে হয়, তাহা হইলেও অন্ততঃ ৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৫ বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যক হইয়া পড়ে। তাহার সংক্ষিপ্তের সংক্ষিপ্ত-সার প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইলেও সে বিবরণ এইরূপ দাঁড়াইতে পারে; যথা,—

প্রায় ৩৯ লক্ষ বৎসরের কথা।

১। আটত্রিশ লক্ষ একানব্বই হাজার একশত পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।

বৈবস্বত মনুর রাজত্বকাল। সংহিতা-শাস্ত্রোক্ত বিধি-বিধানের প্রবর্ত্তনা। আদর্শ সমাজ, আদর্শ বিধি-বিধান, আদর্শ আচার-ব্যবহার। এই সময় হইতে ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বৎসর কাল সত্য যুগ। সেই যুগে মনু, ইক্ষ্বাকু, বলি, মান্ধাতা, পুরুরবা, ধুন্ধুমার, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি নৃপতিগণ পৃথিবীতে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ঐ সকল নৃপতির সুপ্রতিষ্ঠার

বিবরণ সকল পুরাণেই পরিবর্ণিত আছে। আমরাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসে" সে পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করিয়াছি।

২। একুশ লক্ষ তেষাট্ট হাজার এক শত পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।

এই সময় ত্রেত-যুগের প্রবর্ত্তনা। এই যুগে কুকুৎস্থ, হরিশ্চন্দ্র, দীলিপ, ভগীরথ, দশরথ, শ্রীরামচন্দ্র, লব, কুশ প্রভৃতি নৃপতিগণের প্রভাব পৃথিবী-পরিব্যাপ্ত ছিল। ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বৎসর ত্রেতাযুগের রাজন্যবর্গ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎকালে সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি কিরূপ বিশুদ্ধ-সম্পন্ন ছিল, রামায়ণাদিতে তাহার পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এ কালের বিবরণ পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থেও বিশদভাবে বিবৃত আছে এবং আমরাও যথাসম্ভব সংক্ষেপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসে" তাহা আলোচনা করিয়াছি।

৩। আট লক্ষ সাতষট্টি হাজার এক শত পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।

এই সময়ে দ্বাপর যুগ প্রবর্ত্তিত হয়। এই যুগে বিরাট, শান্তনু, যুধিষ্ঠির, জরাসন্ধ, কংস, উগ্রসেন প্রভৃতি রাজন্যবর্গ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বৎসর কাল দ্বাপর যুগের নৃপতিগণ প্রতিষ্ঠান্বিত থাকেন। এই দ্বাপর যুগের শেষভাগে কুরু-পাণ্ডবের বিরোধ সংঘটিত হয়। মহাভারতে এবং পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে দ্বাপর যুগের চিত্র প্রতিফলিত আছে। আমরাও সংক্ষেপে তদ্বিবরণ পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

৪। তিন হাজার এক শত পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।

এই সময় বর্ত্তমান কলিযুগের প্রবর্ত্তনা হয়। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পরিসমাপ্তি এই যুগের প্রথম ও প্রধান ঘটনা। যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎ, জনমেজয়াদি হইতে বিক্রমাদিত্যাবধি হিন্দু নৃপতিগণ এই যুগে প্রথম প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। তাঁহারাই ক্ষত্রিয়-সমাজের অবিমিশ্র বংশধর ছিলেন। সেই হিন্দু-নৃপতিগণ কিঞ্চিন্ন্যূন তিন হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই ক্রমশঃ মিশ্র জাতির এবং বৈদেশিকগণের আধিপত্য ভারতে বিস্তৃত হইয়া আসে।

* * *

এক নিশ্বাসে রামায়ণ-বর্ণনার একটা প্রবাদ কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু উপরে যে সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করা হইল, তাহাতে নিমেষে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ বা তাহারও অপেক্ষা অলৌকিক অসাধ্য ব্যাপারের উপমাই খাটিতে পারে। এক রাজার দুই এক বৎসরের রাজত্ব-কাহিনী বর্ণন করিতেই রাশি রাশি গ্রন্থ রচনা করিতে হয়; অসংখ্য নৃপতির অসংখ্য বর্ষকালের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় কীদৃশ আয়াস-স্বীকার আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং সে প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাসের স্তর-নির্দ্দেশ।

[ইতিহাসের স্তর-পর্য্যায়,—বিভাগ ও উপবিভাগ;—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরবর্ত্তিকাল—গৌতম-বুদ্ধের আবির্ভাব সময় পর্য্যন্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;—বৈষম্যে সাম্য-স্থাপন ব্যপদেশে স্তর-নির্দ্দেশ,—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর সামাজিক বিশৃঙ্খলার আভাষ ;—বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর হইতে শঙ্করাচার্য্যের জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তিকাল,—সেই সময়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;—সেই কালের বিভাগত্রয় ;—বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইতে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়-কালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;—রাজন্য-বর্গের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল বিষয়ে বিচার-বিতর্ক ;—মৌর্য্য-বংশের প্রতিষ্ঠা-পরিচয়,—অশোক প্রভৃতির প্রসঙ্গ ;—চন্দ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী বৌদ্ধ-নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ,—শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব-কাল পর্য্যন্তের ঐতিহাসিক তথ্য ;—প্রসঙ্গোক্তি।]

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের ইতিহাস,—রাজা-রাজ্যের অভ্যুদয়ে বা বিলোপে নহে। ভারতের ইতিহাস—সাম্য-বৈষম্যের সংঘর্ষের ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস—ধর্ম্মের ইতিহাস। আমরা সেই ভাবেই এই ইতিহাসকে বিভাগ করিবার কল্পনা করিয়াছি। সাম্য-বৈষম্যের দ্বন্দ্ব চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। বৈষম্যে সাম্য-স্থাপনের প্রয়াস আবহমান-কাল প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে; সুতরাং সে ইতিহাস অনন্ত অফুরন্ত। মানুষের সীমাবদ্ধ ধ্যান-ধারণার জন্য সেই অনন্তের অংশ-বিশেষ লইয়া আলোচনা করিবার আবশ্যক হয়। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলির সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া, যদি এই বর্ত্তমান কলিযুগের অংশ-বিশেষের ইতিহাস লইয়াই আলোচনা করি, তাহাতেও সেই সাম্য-বৈষম্যের সংঘর্ষ—অধর্ম্মের বিলোপ-সাধনে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার প্রভাব—প্রত্যক্ষ করি। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চারি যুগের প্রবর্ত্তনার মূলে ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের সংঘর্ষে ধর্ম্মের বিজয়-দুন্দুভি শুনিতে পাই। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সে দুন্দুভির শেষ নিনাদ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর, কলিরাজের প্রভাব-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সমাজ-দেহে নব নব ব্যাধির—নব নব বিপ্লবের সঞ্চার হয়। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয় ;—বৈষম্যে পুনরায় সাম্য-স্থাপনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। হিন্দু তখন হিন্দু ছিল, ব্রাহ্মণ তখন ব্রাহ্মণ ছিল, ক্রিয়া-কর্ম্ম যাগযজ্ঞ তখনও একেবারে লোপপ্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু তাহার মধ্যে বড় অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল—বড় অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল। যে বৈষম্যে সাম্য-স্থাপনের জন্য ভগবান পুনঃপুনঃ অবতীর্ণ হন, সেই বৈষম্য তখন প্রকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। তাই, কলিযুগের প্রবর্ত্তনার কিছু কাল পরেই বুদ্ধ-দেবের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। বলির নামে পশুবলি হইতে নরবলি পর্য্যন্ত আরম্ভ

স্তর-পর্য্যায়।

হইয়া দেশব্যাপী দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে, শ্রীভগবান বুদ্ধরূপ পরিগ্রহ করিলেন; রাজকুমার রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া—রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, বৈষম্যে সাম্য-স্থাপন জন্য উদ্বুদ্ধ হইলেন। মহাপুরুষের মহান্ আত্মত্যাগের ফলে সমাজ-দেহে নূতন বলের সঞ্চার হইল; নূতন সমাজ, নূতন ধর্ম্ম, নূতন রাজ্য-সাম্রাজ্য অভ্যুত্থিত হইয়া ভারতে সাম্য-স্থাপনের অভিনব বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিল। সে হিসাবে, কুরুক্ষেত্র মহ-সমরের পর হইতে বুদ্ধ-দেবের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত সময়কে কলিযুগের এক বিভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সেই এক বিভাগ, আর বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী কাল—এই এক বিভাগ। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তিকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আবশ্যকমত অনেকই লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তিকালের ইতিবৃত্তের উপাদান অল্পরূপ। সেই সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত—প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের ইতিবৃত্তকে প্রধানতঃ চারি উপবিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম—বৌদ্ধ-প্রাধান্য, দ্বিতীয়—পুনঃ ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা, তৃতীয়—ভারতে মুসলমান-দিগের অভ্যুদয়, চতুর্থ—ইংরেজের ভারত আগমন। কুরুক্ষেত্র মহাসমর হইতে বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে এক ভাগে বিভক্ত করিয়া, এবং বুদ্ধদেবের জন্মের পরবর্ত্তিকালকে প্রোক্ত চারি উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া দুই প্রধান বিভাগের এবং শেষোক্ত বিভাগের অন্তর্গত উপবিভাগ-চতুষ্টয়ের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এক্ষণে আমরা প্রদান করিবার চেষ্টা পাইতেছি।

১। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরবর্ত্তিকাল—বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বভাগ।

(৩১০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৬৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।)

৩১০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—কলির প্রবর্ত্তনা। যুধিষ্ঠিরের পর পরীক্ষিতের রাজ্যকাল। বিভিন্ন ক্ষুদ্র শক্তির অভ্যুদয় সত্ত্বেও পরীক্ষিতের একচ্ছত্র প্রভাব। কলির আগমনে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের অধঃপতনের সূত্রপাত; সামাজিক বিশৃঙ্খলা।

৩০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—জন্মেজয়ের রাজত্ব-কাল। তদনুষ্ঠিত সর্পসত্র যজ্ঞ। বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রাজশক্তির অভ্যুদয়। জন্মেজয়ের একচ্ছত্র প্রভাবে সকলের বশ্যতা-স্বীকার। তাঁহার রাজ্যাবসানে পাণ্ডুবংশের প্রভাবের খর্ব্বতা।

১২৮৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—ক্ষেমকের রাজ্যকাল। ক্ষেমক নৃপতির রাজ্যাবসানে পাণ্ডব-বংশের পরিসমাপ্তি। হস্তিনাপুরের প্রভাব বিধ্বস্ত। বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন শক্তির অভ্যুদয়। পূর্ব্বতন করদ-মিত্র রাজগণের স্ব স্ব প্রাধান্য-স্থাপন।

১১৮২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—মগধে জরাসন্ধ বংশের অবসান। ঐন্দ্রবংশের শেষ নৃপতি রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া তাঁহার মন্ত্রী সুনিক আপন পুত্র প্রদ্যোৎকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মগধে প্রদ্যোৎ-বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়।

৬৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—প্রদ্যোৎ-বংশীয় পালক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ পুলক-বংশীয় নৃপতি বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকেন।

৮৫৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—প্রদ্যোৎ-বংশীয় বিশাখযূপ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পঁচিশ বৎসর (মতান্তরে ৫৩ বৎসর) মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৮৩১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—জনক বা অজক রাজ্য-লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মগধে নানারূপ ষড়যন্ত্রের ও গৃহ বিবাদের সূত্রপাত হয়। তিনি ৩১ বৎসর রাজত্ব করেন।

৮০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—নন্দীবৰ্দ্ধন (বর্ত্তিবর্দ্ধন) রাজ্য লাভ করেন। এই নন্দীবর্দ্ধন হইতেই প্রদ্যোৎ-বংশের অবসান হয়। নন্দীবর্দ্ধন কুড়ি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৭৭৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—মগধের প্রদ্যোৎ-বংশের অবসানে শিশুনাগ-বংশের অভ্যুদয়। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ শিশুনাগকে ৬০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের নৃপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মগধের রাজগৃহ তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার এক পুত্রকে তিনি বারাণসী বিভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং রাজগৃহের নিকটস্থ গিরিব্রজে বাস করিতেন। এই শিশুনাগ-বংশীয় নৃপতিগণ ৩৬২ বৎসর কাল মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

৬০২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনিই রাজগৃহে মগধের নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁহার নাম বিন্ধসার, বিবিসার, বিম্বিসার, বিন্ধ্যসেন প্রভৃতি রূপে লিখিত আছে। কিন্তু বিম্বিসার নামেই সাধারণতঃ তিনি পরিচিত। এই বিম্বিসারের রাজত্বকালে বিদেহ-ক্ষত্রিয়গণ মগধ আক্রমণ করেন। এই সময়ে গঙ্গার উত্তর ভাগে লিচ্ছবি রাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা প্রসেনজিৎ কোশল-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শাক্যগণ কপিলাবস্তু নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। শাক্যকুলপতি শুদ্ধোদন তখন পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে, ইন্দ্রপ্রস্থে, দ্বারকায়—ভারতের বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ-শক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। বিম্বিসার ৫২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিম্বিসারের রাজত্ব-কালে ভারতের বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন রাজশক্তির অবস্থা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

কুরুক্ষেত্র মহাসমর হইতে গৌতম-বুদ্ধের আবির্ভাব পর্য্যন্ত সময়কে ভারতের ইতিহাসের এক স্তর বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। অধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটিলে তাহাকে দমন করিয়া সদ্ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা-সাধন—পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ভারতের ইতিহাসের স্তর-পর্য্যায়। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে, অধর্ম্মের বিনাশ সাধনে, যে ধর্ম্ম-ভাবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কালবশে তাহাতে ব্যভিচার ঘটিতে আরম্ভ হয়। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পূর্ব্বে যেরূপ বিশৃঙ্খলার ভাব দেখা দিয়াছিল, গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের সমসময়ে পুনরায় তদ্রূপ ব্যভিচার-বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। তাই অহিংসা-পরম-ধর্ম্ম রূপ নীতি-তত্ত্ব প্রচারের জন্য শ্রীভগবান গৌতম-বুদ্ধ-রূপে আবির্ভূত হন। ইহার পূর্ব্ব

বৈষম্যে সাম্য-স্থাপনে স্তর-নির্দ্দেশ।

বুদ্ধ-প্রচারিত অহিংসা পরম ধর্ম্মের ভিত্তিমূলেও যখন কালকীট আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতের রাজা, রাজ্য বা গৌরবের ইতিহাস, এই এক এক স্তরের অভ্যুদয়ের ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বলিয়া তাই মনে করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার এক নিদর্শন—কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর যুধিষ্ঠিরের ও তদ্বংশীয় রাজন্যবর্গের রাজত্বকাল। কিন্তু যে সনাতন সদ্ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সংঘটিত হয়, কিছুকাল পরে সমাজ তাহার মূল লক্ষ্য ভুলিয়া যায়। সমাজে আবার ব্যভিচার-স্রোত প্রবাহিত হয়। সুতরাং বৈষম্যে সাম্য-স্থাপন জন্য শ্রীভগবানের পুনরাবির্ভাব ঘটে। সে বৈষম্যের প্রথম অঙ্কুর—রাজচক্রবর্ত্তী পরীক্ষিতের শাসন-সময়েই উদ্গত হইয়াছিল। প্রথম—রাজা পরীক্ষিৎ পিপাসার্ত্ত হইয়া ঋষির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন; ব্রাহ্মণ আতিথ্য-সৎকারের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, রাজা পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণের অপমান করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মণের সার-সর্ব্বস্ব ক্ষমাগুণ পরিহার করিয়া ঋষিতনয় রাজাকে অভিসম্পাত প্রদান করেন। সুতরাং, এক পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ-ঘটনাতে সামাজিক বিবিধ বৈষম্যের ও বিশৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রাজচক্রবর্ত্তী পরীক্ষিতের রাজত্ব-কাল মধ্যেই যখন এবম্বিধ বৈষম্যের ও বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত ঘটিয়াছিল, তখন তাঁহার পরবর্ত্তী প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে কি বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা, সহজেই অনুমান হইতে পারে। সেই বিকৃতি বশতঃই পরবর্ত্তিকালে হিন্দু-নৃপতিগণের কাহারও আর ভারতে একছত্র প্রভাব স্থায়ী হইতে পারে নাই। সেই বিকৃতি-বশেই রাজশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আচার-বিচার ধর্ম্ম-কর্ম্ম কলুষিত হইয়া আসিয়াছিল। অধিক কি, নাস্তিক্য মতের উদ্ভাবনা—সেই বিকৃতিরই বিষময় ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ক্রিয়াভ্রষ্ট, আচারভ্রষ্ট, জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া অনেকেই তখন সংসারে বিষম বিষের প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাব—সেই বৈষম্যে সাম্য-রক্ষার চেষ্টা। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে নব-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ভারতের আবার এক নূতন জীবন সঞ্চারিত হয়। সেই নবজীবন প্রভাবে ভারতের বিচ্ছিন্ন রাজশক্তি পুনরায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, ভারতে আবার নূতন রাজশক্তির—নূতন সাম্রাজ্যাদির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল।

২। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইতে শঙ্করাচার্য্যের জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তিকাল।

(৫৬৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৮৮ পর খৃষ্টাব্দ।)

৫৬৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ।—গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে বিবাহ, ২৯ বৎসর বয়সে সংসার-ত্যাগ, ৪৫ বৎসর কাল ধর্ম্মমত প্রচার, ৮০ বৎসর বয়সে ৪৮৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাণ-লাভ। এ হিসাবে, বিম্বিসারের রাজত্ব-কালে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটিলেও বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর রাজত্ব-কালেই গৌতম-বুদ্ধের প্রভাব প্রতিষ্ঠা মগধ প্রদেশে ও অন্যান্য স্থানে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল।

৫৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অজাতশত্রু—গৌতম-বুদ্ধের সমসাময়িক নৃপতি বলিয়া প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। কথিত হয়, পিতা বিম্বিসারের সংহার-সাধন করিয়া তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। বিম্বিসারের রাজত্ব-কালে গৌতম-বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অজাতশত্রুর রাজত্বকালেই তাঁহার প্রসার-প্রতিপত্তি দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। পাটলিপুত্র রাজধানীর ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা—অজাতশত্রুর কীর্ত্তি-স্মৃতি। কোশল-দেশ জয়, লিচ্ছবি-জাতিকে বিধ্বস্ত করা প্রভৃতির জন্য তাঁহার রাজত্ব-কাল প্রসিদ্ধ। অজাতশত্রু ২৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি বৈশালী রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত আপন রাজ্যসীমা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাটলিপুত্রে তিনি একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তাহাতেই পরবর্ত্তিকালে পাটলিপুত্রের প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

৫২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—অজাতশত্রুর লোকান্তরের পর তৎপুত্র দর্শক (দভক) মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজগৃহেই তাঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তাঁহার সমসময়ে বৎসদেশে উদয়ন এবং অবন্তী বা উজ্জয়িনী রাজ্যে মহাসেন রাজত্ব করিতেন। প্রকাশ, তিনি ২৫ বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৫১১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—দর্শক-পুত্র উদয়াশ্ব বা উদায়ী এই সময় মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তৎকর্ত্তৃক পাটলিপুত্র নগরের বহু শ্রী-বৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। তিনি কুসুমপুর নগরকে পাটলিপুত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণের গ্রন্থপত্রে প্রকাশ,—অজাতশত্রুর পুত্র উদায়ীভদ্র ৪১০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে মগধের রাজা হইয়াছিলেন। সে মতে, তিনিই পাটলিপুত্র রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিচিত।

৫০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ।—নন্দীবৰ্দ্ধন রাজা প্রাপ্ত হন। তিনি ৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার আছে। নন্দীবৰ্দ্ধনের পর মহানন্দী রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ৪৩ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া প্রকাশ আছে। এই হইতেই শিশুনাগ-বংশের অবসান হয়।

৪৯০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—কোশলরাজ বিরোধক এই সময় গৌতম-বুদ্ধের স্বজাতিবৃন্দকে ও আত্মীয়-গণকে হত্যা করিয়া কপিলাবস্তু নগরের ধ্বংস-সাধন করেন।

৪৮৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে বা ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে পারস্য-সম্রাট দারায়ুস (হিষ্টাস্পাসের পুত্র) ভারত আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তবে ভারত-সমুদ্রে তাঁহার রণপোত ভাসমান হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। তিনি ভারতবর্ষের অন্তর্গত

(৪৮৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ) আপনার অধিকারভুক্ত প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর করস্বরূপ যে স্বর্ণরেণু পাইতেন বলিয়া উল্লিখিত আছে, তাহা এই সময়েরই ঘটনা। তাঁহার বিদেশ-জয়ে সাহায্যার্থ ভারতীয় তীরন্দাজ সৈন্য-গণের সাহায্য তিনি এই সময় হইতেই পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রচার আছে।

৪৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—গৌতম-বুদ্ধের তিরোভাবের অব্দ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। নৈরঞ্জন নদী-তীরে বোধিবৃক্ষমূলে তাঁহার সিদ্ধিলাভ ঘটে। গৌতম বুদ্ধ আশী বৎসর ইহধামে অবস্থিত করিয়াছিলেন।

৪১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—মহাপদ্মানন্দী রাজ্য প্রাপ্ত হন। ইনি মহানন্দীর শূদ্রাপত্নীর গর্ব্ভজাত এবং ক্ষত্রিয়-কুলের বিনাশক বলিয়া পরিচিত। ইনি এবং ইঁহার আট পুত্র এক শত বৎসর রাজ্যভোগ করেন। এই সময় ব্রাহ্মণ্য-গর্ব্ব বিশেষ-রূপ খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩২৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান। ৩২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে আলেক-জাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্ব্বতে অবস্থিতি করেন। ৩২৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে মাল্লিজাতিকে পরাভূত করিয়া সিন্ধুনদ দিয়া তিনি দক্ষিণাভিমুখে গমন করেন। ঐ অব্দে সিন্ধু-নদে আলেকজাণ্ডারের নৌ-বহর পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ৩২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু ঘটে। ভারতবর্ষে গ্রীসের আধিপত্য স্থাপনের কল্পনা এই হইতেই একেবারে বিলুপ্ত হয়।

৩১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—নন্দ-বংশের উচ্ছেদ-সাধনে কৌটিল্য চাণক্যের ষড়যন্ত্রে মৌর্য্য-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সময়ে মৌর্য্য-বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহাপদ্মানন্দের মুরা নাম্নী দাসীর গর্ভে চন্দ্র-গুপ্তের জন্ম হইয়াছিল। মুরার গর্ব্ভজাত পুত্র বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত ও তদ্বংশীয়গণ মৌর্য্য বলিয়া অভিহিত এবং শূদ্র বলিয়া পরিচিত। চন্দ্রগুপ্ত দাসী-গর্ব্ভজাত পুত্র বলিয়া পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হন। নির্ব্বা-সিত অবস্থায় তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের সহিত সমরায়োজন উপলক্ষে যখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজশক্তি-সমূহ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, সেই সময় চন্দ্রগুপ্ত সৈন্যদল গঠনের চেষ্টা করেন। ফলে, তাঁহার এক মহতী সেনা সংগঠিত হয়। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর সুযোগ বুঝিয়া তিনি মাসিদনীয় শিবির-সমূহ আক্রমণ করেন; আর তাহাতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে তাঁহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। তখন তিনি মগধের দিকে অগ্রসর হন, এবং নন্দবংশীয় শেষ নৃপতির সংহার-সাধন করেন। ফলে, মগধে, অঙ্গদেশে, বারাণসী ক্ষেত্রে, কোশলে এবং অবশেষে, বঙ্গোপসাগর হইতে আরব সমুদ্র পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য-সীমা বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমন এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য প্রাপ্তি—এই হইতে ভারতের ইতিহাসের আর এক নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ এক হিসাবে লোপপ্রাপ্ত বা জটিলতা-প্রাপ্ত বলিয়া তৎপ্রসঙ্গের আলোচনা প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে, কলির প্রবর্ত্তনা হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তির ব্যবধান-কালের ইতিবৃত্ত বা ঐ সময়ের রাজন্যবর্গের রাজ্য-প্রাপ্তির-কাল নিশ্চয়ই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা উপরে যে প্রণালীতে মগধের ও হস্তিনাপুরের রাজন্যবর্গের অভ্যুদয়-কাল নির্দ্দেশ করিলাম, তদ্বিষয়ে অনেক সময়ে অনেকের মতান্তর ঘটিয়াছে; এবং সে মতান্তর যে এখনও না থাকিবে, তাহা নহে। তবে কি কারণে কেন আমরা পূর্ব্বোক্তরূপে কালাদির নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার কয়েকটী স্থূল বৃত্তান্তের আলোচনা করা যাইতেছে। শাস্ত্রমতে এক্ষণে (১৯১৫ খৃষ্টাব্দে) কলির ৫০১৫ বৎসর অতীত হইয়াছে। সুতরাং, যীশুখৃষ্টের জন্মের ৫০১৫ − ১৯১৫ = ৩১০০ বৎসর পূর্ব্বে কলির প্রবর্ত্তনা। এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেও অনেক আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং, এস্থলে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, এই কলির প্রবর্ত্তনার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র মহাসমর এবং শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব ঘটিয়াছিল। যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানও এই সময়ের ঘটনা। সুতরাং, পরীক্ষিতের রাজ্য-কাল—৩১০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ বলিয়াই অবিসংবাদিতরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মগধে জরাসন্ধ-বংশের অবসান—৯১৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহার কারণ,—পুরাণে বার্হদ্রথ-বংশের রাজত্বকাল ৩১৪৪ বৎসর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। জরাসন্ধের পূর্ব্ব-পুরুষ বৃহদ্রথের নামানুসারে জরাসন্ধের বংশ বার্হদ্রথ বংশ নামে অভিহিত। জরাসন্ধের পুত্র সোমাপি (সোমাধি) হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত ঐ বংশের নৃপতিগণ ৩১৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন। রিপুঞ্জয়ের মন্ত্রী শুনিক, রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া, আপন পুত্র প্রদ্যোৎকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই হইতে প্রদ্যোৎ-বংশের প্রতিষ্ঠা। আমরা ৯২৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে যে প্রদ্যোৎ-বংশের মগধে রাজ্যারম্ভ নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহার কারণ,—চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি হইতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজবংশ-সমূহের রাজত্ব-কাল হিসাব করিয়া আসিলেই, নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ৩১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৩২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল নির্দ্দিষ্ট হয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তি-কাল মোটামুটি ৩১৫ খৃষ্টাব্দ ধরিলে, নন্দবংশের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল—৩১৫ + ১০০ = ৪১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ দাঁড়ায়। নন্দবংশের রাজ্য-লাভের পূর্ব্বে শিশুনাগ-বংশ ৩৬২ বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সে হিসাবে শিশুনাগ ৪১৫ + ৩৬২ = ৭৭৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। শিশুনাগের রাজ-লাভের পূর্ব্বে প্রদ্যোৎ-বংশ ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং, ৭৭৭ + ১৩৮ = ৯১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে প্রদ্যোৎ সিংহাসন লাভ করেন। এই সকল রাজ-বংশের কাল-নির্দ্দেশে অনেক মতান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা। নৃপতিগণের নাম সম্বন্ধেও নানা গণ্ডগোল ঘটিয়াছে। বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন প্রকার পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। একই নৃপতির বিভিন্ন নামে পরিচিত হওয়াও অসম্ভব নহে। সময় সময় নামের অংশ-বিশেষ লইয়াও বিভিন্ন ইতিহাসে বিভিন্ন

কাল-নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে।

রূপে একই ব্যক্তিকে পরিচিত করিবার প্রয়াস হইয়াছে বলিয়াও বুঝা যায়। যাহা হউক, সর্ব্ববিধ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিচার করিতে হইলে, কলির প্রবর্ত্তনা হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত আমরা যে সংক্ষিপ্ত-সার বিবরণ প্রদান করিলাম, তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। দুই চারি বৎসরের হিসাবের পার্থক্য অনেক স্থলে ঘটিতে পারে। বহুদিন পূর্ব্বের বিবরণ, বহু স্থানের বিক্ষিপ্ত উপাদান হইতে সংগ্রহ করিতে হওয়ায়, এতদ্রূপ বৈষম্য ঘটা অসম্ভব নহে। তিন চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ঘটনায় দুই চারি বৎসরের এদিক ওদিক ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। তুলনায় সে দিনের ঘটনা—আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমন! তুলনায় সে দিনের ঘটনা—বুদ্ধদেবের আবির্ভাব! আর তুলনায় সে দিনের ঘটনা—শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়! এ সকল বিষয়েই কত মত, কত বিতর্ক চলিয়া থাকে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব সম্বন্ধে কাল-নির্ণয়ে কতই মতান্তর দেখিতে পাই! আলেকজাণ্ডার সম্বন্ধেও সেই বিতণ্ডা; শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধেও সেই বিতর্ক। সুতরাং দুই চারি বৎসরের হিসাবের বৈষম্য লইয়া দূর অতীত ইতিহাসে বিতণ্ডা উপস্থিত করিবার কোনই প্রয়োজন দেখি না।

পূর্ব্বে যে আমরা বলিয়াছি, ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তি অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে; মৌর্য্য-বংশীয় রাজগণের ইতিহাসে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয়। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের অতীত ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে প্রোথিত হইলেও, মৌর্য্য বংশের ইতিহাস আমাদিগকে স্পষ্টই দেখাইয়া দিতেছে, নব-ধর্ম্মের নববলে বলীয়ান হইয়া রাজশক্তি কেমন প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। গৌতম-বুদ্ধের মতানুবর্ত্তী হইয়া অজাতশত্রু নব-রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধের অনুশাসনের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী হওয়ায় রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সেই ভিত্তি-ভূমির উপর বিশাল বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, নবধর্ম্মের নববলে বলীয়ান হইয়া অশোক-প্রমুখ রাজন্যবর্গ যে অভিনব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন, সে সাম্রাজ্য এক দিকে হিমালয়ের পরপারে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, অন্যদিকে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল। সে প্রতাপ সে শৌর্য্য-বীর্য্য আজিও জগৎকে চমকিত করিতেছে। কিন্তু কি কারণে সে গৌরব বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সন্ধান করিয়া দেখিলে, কি তত্ত্ব অবগত হই? দেখিতে পাই—আবার বৈষম্য আসিয়া সেই বিপুল রাজ্য-সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। ফলে, আবার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল; ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের নববলে বলীয়ান্ নৃপতিগণের প্রাধান্যে বৌদ্ধ-প্রাধান্য লোপ-প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে, আমরা চন্দ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী রাজগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিবার প্রয়াস পাইতেছি। তাহাতে, কেমন করিয়া, কি কারণে, বৌদ্ধ-প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং পুনরায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

বৌদ্ধ-প্রাধান্য।

২৯৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—এই সময় চন্দ্রগুপ্ত লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়, কি

(২৯৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ) তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তদ্বিষয়ে মতান্তর আছে। কোনও কোনও হিসাবে, ২৯৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দও চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন-চ্যুতির কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। গ্রীস-দেশীয় ঐতিহাসিকগণ চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের নাম উল্লেখ করেন নাই। অমিত্রঘাত অর্থাৎ শত্রুহননকারী নামধেয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্রের বিষয় তাঁহাদের গ্রন্থপত্রে লিখিত আছে। যাহা হউক, চন্দ্রগুপ্তের শাসন-কালে গ্রীস-দেশের সহিত যে বন্ধুত্ব-বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়, বিন্দুসারের রাজত্ব-কালেও তাহা অব্যাহত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে যেমন মেগাস্থিনীস ভারতবর্ষে দূতরূপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, ডিমাকো নামক গ্রীকরাজদূত বিন্দুসারের রাজত্বকালে সেইরূপভাবে মগধের রাজধানীতে অবস্থিতি করার পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের সময়ের একটী প্রসিদ্ধ প্রধান ঘটনা—সিরীয়ার অধিপতি সেলিউকাস নিকাটরের সহিত চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ। সেলিউকাস নিকাটর (৩০৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) সিন্ধু-নদ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। সেই যুদ্ধের ফলে চন্দ্রগুপ্তের প্রভাব—পারোপানিসাদ (কাবুল তাহার রাজধানী হয়), আরাকোশিয়া (কান্দাহার তাহার রাজধানী), এরিয়া (হীরাট তাহার রাজধানী) এবং পূর্ব্ব-জেড্রোসিয়া প্রভৃতি প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই পরাজয়-সূত্রে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সদ্ভাব-স্থাপনোদ্দেশ্যে, সেলিউকাস আপনার এক কন্যাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দেন। চন্দ্রগুপ্ত যেমন ভারত-সীমান্তে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে রাজ্য-সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন, বিন্দুসারও সেইরূপ দাক্ষিণাত্যে, মাদ্রাজ পর্য্যন্ত, আপনার একছত্র প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

২৭৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—পিতা বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক (অশোকবর্দ্ধন) সিংহাসন লাভ করেন। সে সময় তাঁহার বয়স অল্প ছিল বলিয়া ২৬৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে (কোনও কোনও মতে ২৭৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) মহা-সমারোহে তাঁহার রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ২৬১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ২৫৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) ত্রয়োদশ বর্ষ রাজত্ব-কালে, তনি কলিঙ্গ-রাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ২৫৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গ-রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অশোকের বশ্যতা স্বীকার করে। তবে কলিঙ্গ-দেশের সহিত সংগ্রামে অশোক বিশেষরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে বহু প্রাণ বিনষ্ট হওয়ায়, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল। কথিত হয়, সেই ধর্ম্মানুরাগিতাই পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠার মূলীভূত। কলিঙ্গ-জয়ের অল্প দিন পরেই (২৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে) তাঁহার রাজ্য সীমা

(২৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ) উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ হইতে পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান এবং হিমালয়-সন্নিহিত প্রদেশ-সমূহ (কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি) তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। দক্ষিণে গোদাবরী, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদী অতিক্রম করিয়া পেন্নার নদীর তীর পর্য্যন্ত তাঁহার একছত্র প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ২৫৫-২৫৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার রাজত্বের সপ্তদশ বা অষ্টাদশ বর্ষকালে অশোকের ঘোষণাবাণী-সমূহ প্রচারিত হয়। তাঁহার ধর্ম্মমত ও রাজনীতি-তত্ত্ব তদ্দ্বারা বিঘোষিত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানের প্রস্তর-গাত্রে খোদিত লিপিতে তাঁহার সেই মত-সমূহ প্রকাশ পায়। ২৪৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, প্রায় চতুর্ব্বিংশ বৎসর কাল রাজ্যভোগের পর, অশোক বৌদ্ধ-তীর্থসমূহ দর্শন মানসে যাত্রা করেন। তিনি এই উপলক্ষে পাটলিপুত্র হইতে যাত্রা করিয়া হিমালয়-পাদমূলে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তু দর্শন করিয়া আসেন; বারাণসীর সমীপস্থ সারনাথ—যেখানে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন—দর্শন করেন। পরিশেষে তিনি শ্রাবস্তী, গয়া এবং কুশি-নগর পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। শ্রাবস্তী-নগরে বুদ্ধদেব বহুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন; গয়াতীর্থে বোধি-বৃক্ষমূলে অবস্থান-কালে তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়; কুশিনগরে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। ২২৭ পূর্ব্বে-খৃষ্টাব্দে রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুবর্ণগিরি নামক স্থানে তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। ২২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তর সংঘটিত হয়। এই সময় তাঁহার পুত্র দশরথ সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন।

রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোক যে একছত্র প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ অধিক দিন সে প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। অশোকের মৃত্যুর পর মগধের সিংহাসনে মৌর্য্য-বংশীয় আরও প্রায় সাত জন নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম—সুযশ, দশরথ, সঙ্গত, শালিশুক, সোমশর্ম্মা, শতধন্বা প্রভৃতি। এই সকল নৃপতিগণের নাম ও রাজত্ব-কাল সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। কিন্তু তাহা হইলেও, তাঁহাদের রাজত্ব-কাল ১৮৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের পর স্থায়ী হইতে পারে নাই। মৌর্য্য-বংশের শেষ-নৃপতি বৃহদ্রথ আপন সেনাপতি পুষ্প-মিত্র কর্ত্তৃক নিহত হন। ১৮৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। এই হইতে মৌর্য্য-বংশের অবসানে মগধে শুঙ্গ-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরই পুষ্পমিত্রের রাজধানী ছিল। মৌর্য্য-বংশীয়গণের অধিকাংশ রাজ্য পুষ্পমিত্রের করতলগত হইয়াছিল। মৌর্য্য-বংশের অবসান ও শুঙ্গ-বংশের অভ্যুত্থান—ইহার মূলেও ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সদিচ্ছা-সদ্ভাব-প্রণোদিত হইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাধান্য

মৌর্য্য-বংশের অবসানে।

বিস্তারে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তবে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের প্রতি যেরূপ সমদর্শিতা প্রদর্শন আবশ্যক, তাঁহাতে তাহার অভাব অনুভূত হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে তাঁহার পারিষদগণ ও বংশধরগণ সে অভাব বিশেষরূপে প্রকট করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সূত্রে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। প্রায় শতবর্ষ-ব্যাপী অন্তর্বিপ্লবের ফলে পরিশেষে মৌর্য্য-বংশের অবসানে শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। অশোকের নীতি-সমূহ মূলতঃ শুভসূচক বটে; কিন্তু অশোকের প্রাধান্যে বৌদ্ধগণ অতিমাত্রায় গর্ব্বান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের উপর নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতেই অশোকের বংশ অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জাতীয় প্রজার প্রতি রাজা যদি সমান স্নেহ-করুণা প্রদর্শনে সমর্থ না হন, অল্পদিন মধ্যেই সে রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। মৌর্য্য-বংশের অবসান তাহারই প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শন করিতেছে। অশোকের লোকান্তরের পর তাঁহার বংশ দিন দিন হীনবল হইয়া পড়ে; আর তাঁহারা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কেন্দ্রে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। পুষ্পমিত্রের প্রতিষ্ঠার মূল—রাজচক্রবর্ত্তী অশোক ও তদ্বংশীয়গণের একদেশদর্শিতার ফল ভিন্ন অন্য কিছুই বলিতে পারা যায় না। পুষ্পমিত্র পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আধরোহণ করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি পরিবর্দ্ধন জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। তাহাতে হিন্দু-জনসাধারণের সহায়তা লাভে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-সাধনে সমর্থ হন।

১৮৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—শুঙ্গ-বংশীয় পুষ্পমিত্র পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। দাক্ষিণাত্যে নর্ম্মদা-নদী পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্ব-কালের দুই প্রধান ঘটনা—(১) মেনান্দার কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণ (১৫৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ—১৫৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ) এবং (২) পুষ্পমিত্রের রাজসূয় অশ্বমেধ যজ্ঞ। মেনান্দার—বাক্‌ট্রিয়ার রাজা ইউক্রেটাইড্‌সের জনৈক আত্মীয়। তিনি কাবুল ও পঞ্জাবের কয়েক জন রাজার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, বহু সৈন্যদল সহ, ভারতবর্ষ আক্রমণে অগ্রসর হন। সিন্ধু-নদের ব-দ্বীপ, সৌরাষ্ট্র-উপদ্বীপ এবং পশ্চিমোপকূলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী রাজ্য মেনান্দার কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। মেনান্দার মথুরা অধিকার করেন। তিনি মধ্যমিকা (চিতোরের সন্নিকটস্থ নাগারি) আক্রমণ করিয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক সাকেত নগর অবরুদ্ধ হয়; তাহাতে পাটলিপুত্র রাজধানী পর্য্যন্ত সশঙ্কিত হইয়া উঠে। কিন্তু পুষ্পমিত্র অসীম সাহসে মেনান্দারকে বাধা প্রদান করেন। মেনান্দার পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। আলেকজাণ্ডারের ভারত-বিজয়ের চেষ্টার পর স্থলপথে ইউরোপীয়গণের ভারত-বিজয়ের এই দ্বিতীয় চেষ্টা বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। আনুমানিক ১৫৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, মেনান্দার কর্ত্তৃক এই ভারত-আক্রমণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার পর আর কোনও ইউরোপীয় শক্তি স্থলপথে

১৫৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—ভারত-আক্রমণে সাহসী হইতে পারেন নাই। জলপথে ইউরোপের প্রথম ভারত-অভিযান—১৫০২ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো-ডি-গামা কর্ত্তৃক সূচিত হইয়াছিল। পুষ্পমিত্রের রাজসূয়-যজ্ঞ—মেনান্দারের পরাজয়ের পর অনুষ্ঠিত হয়। ১৪৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে পুষ্পমিত্রের লোকান্তর ঘটে।

১৪৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার জীবিত-কালে অগ্নিমিত্র দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে রাজপ্রতিনিধির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিদিশা (বর্ত্তমান ভিল্‌সা) তাঁহার রাজধানী ছিল। বিদভ (বেরাব) অধিকারে তাঁহার প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হয়। অগ্নিমিত্র অল্পদিন মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুব পর সুজ্যেষ্ঠ (মতান্তরে বসুজ্যেষ্ঠ) সাত বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপবে বসুমিত্র, আদ্রক, পুলিন্দক, ঘোষবসু, বজ্রমিত্র মগধের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল নৃপতিব নাম লইয়াও মতান্তর আছে। এই বংশীয় নবম নৃপতি ভাগবত ৩২ বৎসর রাজত্ব কবেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। দশম নৃপতি দেবভূতি (দেবভূমি) হইতে শুঙ্গ-বংশের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়। দেবভূতি অসচ্চরিত্র ও কদাচারী ছিলেন। ১১২ বৎসর রাজত্বেব পর মগধ হইতে শুঙ্গ বংশের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। দেবভূতির ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বাসুদেব শুঙ্গ-বংশের মূলোৎপাটনের হেতুভূত।

৭৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—দেবভূতির কদাচাবের এবং অসচ্চরিত্রতার জন্য তাঁহার ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বাসুদেব তাঁহার সংহার-সাধন করেন। সেই হইতে বাসুদেবের বংশ মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এই বংশের চারি জন নৃপতি ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাসুদেব কণ্ব-বংশীয় কাণ্বায়ন শ্রেণীব ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া, তদ্বংশীয়গণ কণ্ব-বংশীয় নামে পরিচিত। বাসুদেব নয় বৎসব, ভূমিমিত্র চতুর্দ্দশ বৎসর, নারায়ণ তের বৎসর এবং সুশর্ম্মা দশ বৎসব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুশর্ম্মা হইতেই এই বংশের অবসান হয়।

কুরুক্ষেত্র মহা-সমরের পর ভারতবর্ষে কোনও নৃপতির একছত্র প্রভাবের পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়। বৌদ্ধ গৌরব-রবি যখন মধ্যাহ্ন-গগনে সমুদিত হইয়াছিল, সেই সময়ে, অশোকাদির অভ্যুদয় কালে, ভারতীয় নৃপতির শৌর্য্য-প্রভাব আর একবার দিগন্ত বিস্তৃত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। তার পর, পুনঃ ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠার সময়, পুষ্পমিত্রের অভ্যুদয়-কালে, আর এক বার কিয়ৎ-পরিমাণে ভারতীয় হিন্দু-নৃপতির একছত্র প্রভাবের কতকটা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। কিন্তু শুঙ্গ-বংশীয় পরবর্ত্তী নৃপতিবর্গ সে প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন নাই। ঐ বংশীয় শেষ নৃপতিগণের কদাচারের ফলে মগধ-সাম্রাজ্য শুঙ্গ-বংশের হস্ত হইতে কণ্ব-বংশের হস্তে পতিত হয়। এই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা বড়ই বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত।

বিক্রমাদিত্য।

ইহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন শক্তি শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল। এখন উত্তর-পশ্চিমে বৈদেশিকগণের প্রাধান্য বিস্তৃত হইতে বসিয়াছিল; দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্র-বংশীয়গণ মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিতেছিলেন; রাজপুতানায় বিভিন্ন রাজপুত-শক্তি বলসঞ্চয় করিতেছিলেন। এক দিকে বৌদ্ধগণ, এক দিকে জৈনগণ, এক দিকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতিপোষকগণ,—নানাদিকে নানা জন নানারূপ ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করিতেছিল। সুতরাং এ সময়ের ইতিহাস বড়ই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। এখন নানা দিকে নানা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছিল। বিভিন্ন পুরাণে যে বিভিন্ন রাজবংশের এবং ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় নৃপতির নাম ও পরিচয় প্রাপ্ত হই, বিভিন্ন ঐতিহাসিককে যে বিভিন্ন রাজশক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে দেখিতে পাই; তাহার কারণ—কোনও এক নৃপতির একছত্র প্রভাবের অভাব ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। সময়ানুসরণে রাজা ও রাজ্যের ঘটনাবলি বিবৃত করার পক্ষে তজ্জন্যই নানা অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। সে হিসাবে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর ভারতের এক এক প্রদেশের ইতিহাস স্বতন্ত্র-রূপে লিপিবদ্ধ করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। মধ্যে মধ্যে যদিও কোনও বিশেষ বিশেষ নৃপতি আপনার প্রভুত্ব-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন এবং একছত্র সম্রাট বলিয়া প্রতিষ্ঠান্বিত হইতে পারিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের সে প্রতাপ অল্পদিন মাত্রই স্থায়ী হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের রাজ-শক্তির ইতিহাস বিবৃত করিতে হইলে কোনও এক বিশেষ কেন্দ্রের ইতিহাস বিবৃত করিলে নানা বিরোধ ঘটিয়া থাকে। একটা স্থূল দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। যে সময়ে কণ্ব-বংশ মগধের সিংহাসন লাভ করেন, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্র-বংশ মস্তক উত্তোলন করিতেছিল। সুতরাং কোনও কোনও ঐতিহাসিক ঐ দুই বংশের রাজত্ব-কালের ঘটনাবলী একসঙ্গে মিলাইয়া মিশাইয়া গাঁথিয়া গিয়াছেন। এইরূপে কুষণ-বংশের ও শক-বংশের কীর্ত্তি-কথাও হিন্দু-রাজত্বের সহিত মিশিয়া পড়িয়াছে। রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য ভারতের ইতিহাসের একজন প্রধান নায়ক। তাঁহার পদাঙ্ক-অনুসরণে পরবর্ত্তি-কালে ভারতীয় কত নৃপতি আপনার নামের সহিত "বিক্রমাদিত্য" নাম সংযোগ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজশক্তির বিশৃঙ্খলার জন্য সেই বিক্রমাদিত্যের বিক্রম-বীরত্ব-কাহিনী সময়ে সময়ে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছে। কণ্ব-বংশের সমসময়েই বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব হয়। গৃহ-বিবাদে মগধ যখন হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, অন্তর্বিপ্লবে কণ্ব-বংশ যখন বিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনী নগরে প্রতিষ্ঠান্বিত হন। বিক্রমাদিত্যের প্রভাবে ভারতের সমস্ত বিচ্ছিন্ন রাজশক্তি পুনরায় কেন্দ্রীভূত হইয়া আসে। বৌদ্ধ-প্রাধান্যে অশোকের রাজত্ব কালে ভারতবর্ষ যেমন একছত্র সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, বিক্রমাদিত্যের সময়েও ভারতবর্ষ সেইরূপ আর এক বার সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্যের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কণ্ব-বংশীয় বাসুদেবের পর ভূমিমিত্র ৬৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করেন। সেই সময়েই উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য মস্তক উত্তোলন করিয়াছিলেন। তখন ক্রমশঃ মগধ-রাজ্যও বিক্রমাদিত্যের করদ-মিত্র রাজ্য-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের ও তৎপরবর্ত্তী রাজন্যবর্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপে বিবৃত করা যাইতে পারে।

৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের সুপ্রতিষ্ঠার কাল। এই সময় হইতেই বিক্রম সংবতের প্রবর্ত্তনা। উজ্জয়িনীতে ইঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়। গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে এবং নবদ্বীপের উত্তরে উজানী নামক স্থানে তিনি গঙ্গাবাস করিতেন। অশোকের সময়ে যেমন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা দেশে-বিদেশে উড্ডীন হইয়াছিল, বিক্রমাদিত্যের অভ্যুদয়ে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সেইরূপ বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছিল। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিক্রমাদিত্যের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। বিক্রমাদিত্য—কুষণ ও শক নৃপতিগণকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। হিমালয়-প্রদেশে কাশ্মীরে তাঁহার বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সর্ব্ববিষয়ে উৎকর্ষ-সাধনে তাঁহার প্রাণপণ যত্ন ছিল। সাহিত্যের তিনি যে শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। মহাকবি কালিদাস প্রভৃতি তাঁহারই আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহার পুত্র উভয়ে ৯৩-বৎসর রাজত্ব করেন। শ্রেষ্ঠ হিন্দু-নৃপতি বলিয়া তাঁহার এতদূর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল যে, পরবর্ত্তী কালে সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি রাজন্যবর্গ আপনাদিগকে 'বিক্রমাদিত্য' নামে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন।

৪৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে কণ্ব-বংশীয় নারায়ণ মগধের সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ভূমিমিত্রের উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচিত। তিনি প্রায় বার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর সুশর্ম্মা।

৩৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—সুশর্ম্মা মগধের সিংহাসন লাভ করেন। তিনিই কণ্ব-বংশের শেষ নৃপতি। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মগধে অন্ধ্র-বংশ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল। সে সময়ে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যৈশ্বর্য্য-গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র রাজগণ উত্তর ভারত পর্য্যন্ত আপনাদের প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অন্ধ্র-রাজগণের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। অন্ধ্রগণ দ্রাবিড়-দেশের আদি-অধিবাসী বলিয়া পরিচিত। মৌর্য্য-বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত যখন মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, অন্ধ্রগণ তখনও একেবারে আপনাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। তখন তাহারা একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দাক্ষিণাত্যে বিদ্যমান ছিল। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের রাজত্ব-কালে অন্ধ্রগণ পারিপার্শ্বিক মিত্ররাজ মধ্যে গণ্য হইয়াছিল বটে; রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের অভ্যুত্থান সময়ে অন্ধ্ররাজগণ মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তখনও অন্ধ্রগণের মধ্যে তেজোবীর্য্য সঞ্চিত হইতেছিল। কথিত হয়, চন্দ্রগুপ্তের সমসময়েই অন্ধ্র-রাজ্যে প্রাচীর-বেষ্টিত ত্রিশটী নগরী এবং অসংখ্য পল্লী বিদ্যমান ছিল। এক লক্ষ

অন্ধ্র-রাজবংশ।

পদাতি, দুই সহস্র অশ্বারোহী এবং এক সহস্র গজারোহী সৈন্য অন্ধ্র-রাজ্য রক্ষা করিত। তখন কৃষ্ণা-নদীর তীরস্থিত শ্রীকাকুলাম অন্ধ্র-গণের রাজধানী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত বা বিন্দুসারের শাসন-সময়ে অন্ধ্রগণ তাঁহাদের অধীন জাতি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু অশোকের সময়ে অন্ধ্রগণের একটু তেজোদর্পের পরিচয় পাওয়া যায়। ২৫৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে প্রচারিত অশোকের ঘোষণা-লিপিতে অন্ধ্রগণ সম্রাটের আদেশানুবর্ত্তী সীমান্ত জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তখনও অন্ধ্রগণ স্বায়ত্ত-শাসন-ক্ষমতা পরিচালন করিতেছিলেন বলিয়া উপলব্ধি হয়। অশোকের লোকান্তরের পর তাঁহার বংশধরগণ ক্রমেই হীনবল হইয়া পড়েন। যে কলিঙ্গ-দেশ অধিকারে অশোক অশেষ আয়াস-স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই কলিঙ্গ-রাজ্যও, তাঁহার মৃত্যুর পর, স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং, কলিঙ্গ-রাজ্যের সীমান্তস্থিত অন্ধ্র-রাজ্যও যে তখন সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। শিমুক বা সিপ্রক—অন্ধ্র-রাজগণের মধ্যে প্রথম স্বাধীন রাজা বলিয়া কথিত হন। মৎস্য-পুরাণে সেই প্রথম রাজার নাম—শিমুক; আর বিষ্ণু-পুরাণ মতে সেই প্রথম রাজার নাম—সিপ্রক। ২৪০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই অন্ধ্র-বংশের প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। শিমুক ২৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি আঠার বৎসর রাজত্ব করেন। মৎস্য-পুরাণে এই বংশের ত্রিশ জন রাজার নাম উল্লেখ আছে। বিষ্ণু-পুরাণে এই বংশের মাত্র তেইশ জন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্য-পুরাণ মতে অন্ধ্র-বংশের রাজগণের ও রাজত্ব-কালের পরিচয়—(১) শিমুক, ২৩ বৎসর; (২) কৃষ্ণ, ১৮ বৎসর; (৩) মল্লকর্ণি (বিষ্ণুপুরাণের মতে শান্তকর্ণি), ১০ বৎসর; (৪) পূর্ণোৎসঙ্গ, ১৮ বৎসর; (৫) কন্ধস্তাম্ভী (বিষ্ণুপুরাণে অনুল্লেখ), ১৮ বৎসর; (৬) শতকর্ণি, ৫৬ বৎসর; (৭) লম্বোদর, ১৮ বৎসর; (৮) আপিলক (বিষ্ণু-পুরাণ মতে দীপিলক), ১২ বৎসর; (৯) মেঘস্বাতী, ১৮ বৎসর; (১০) স্বাতী, ১৮ বৎসর; (১১) স্কন্দস্বাতী, ৭ বৎসর; (১২) মৃগেন্দ্র স্বাতিকর্ণ, ৩ বৎসর; (১৩) কুন্তল স্বাতিকর্ণ, ৮ বৎসর; (১৪) স্বাতিকর্ণ, ১ এক বৎসর; (১৫) পুলোমাভি (মেঘস্বাতীর পরবর্ত্তী স্বাতী হইতে পুলোমাভি পর্য্যন্ত ছয় জন নৃপতির নাম বিষ্ণুপুরাণে নাই; ঐ ছয় জনের স্থলে পটুমান নামক একজন নৃপতির নাম দৃষ্ট হয়), ৩৬ বৎসর; (১৬) অরিষ্টকর্ণ (বিষ্ণু-পুরাণ মতে অরিষ্টকর্ম্মা), ৮ বৎসর; (১৭) হাল, ৫ বৎসর; (১৮) মন্তলক (বিষ্ণুপুরাণের মতে পুত্তলক), ৫ বৎসর; (১৯) পুরীন্দ্রসেন (বিষ্ণুপুরাণের মতে প্রবিল্লসেন), ৫ বৎসর; (২০) সুন্দর-শাতকর্ণি, ১ বৎসর; (২১) চকোরশাতকর্ণি, ৮ বৎসর ৬ মাস; (২২) শিবস্বাতী, ২৮ বৎসর; (২৩) গৌতমীপুত্র, ২১ বৎসর; (২৪) পুলুমাভি (বিষ্ণুপুরাণ মতে পুলিমান), ২৮ বৎসর; (২৫) শিবশ্রী (বিষ্ণুপুরাণ মতে শাতকর্ণি শিবশ্রী), ৭ বৎসর; (২৬) শিবস্কন্দ শাতকর্ণি (বিষ্ণুপুরাণ মতে শিবস্কন্দ), ৭ বৎসর; (২৭) যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি (যজ্ঞশ্রী—বিষ্ণুপুরাণে), ২৯ বৎসর; (২৮) বিজয়, ৬ বৎসর; (২৯) পুলোমাভি (বিষ্ণুপুরাণে পুলোমাচি), ৭ বৎসর; (৩০) চন্দশ্রী (বিষ্ণু-

পুরাণ মতে চন্দ্রশ্রী), ১০ বৎসর। পুরাণাদির মতে এই অন্ধ্রবংশ প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসর আপনাদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ইহার মধ্যে ক্বচিৎ কোনও শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিলেও এ বংশ একেবারে নষ্ট-শ্রী হয় নাই। এই বংশের কোন নৃপতি কর্ত্তৃক কণ্ব-বংশীয় সুশর্ম্মা রাজ্যভ্রষ্ট হন, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয় নাই। তবে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৭ বা ২৮ অব্দে অন্ধ্রগণ মগধ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই সময় হইতেই বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পরিপোষকগণের মধ্যে বিদ্বেষভাব পরিপুষ্ট হইতে থাকে। বৌদ্ধগণের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া অশোক ধর্ম্ম-বিদ্বেষের যে বিষ-বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ঐকান্তিক পরিপোষণ-চেষ্টায় পুষ্পমিত্র সে বিষবীজে জলসেচন করিয়া যান। বিক্রমাদিত্যের সহায়তায় সে বীজ অঙ্কুরিত মুকুলিত হয়। খৃষ্ট জন্মের পরবর্ত্তী কালে সেই ধর্ম্ম বিদ্বেষরূপ বিষ-বৃক্ষের বিশাল শাখা-প্রশাখায় দেশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তখন, কখনও বা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পরিপোষকগণ প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হন; কখনও বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সেবকগণ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া উঠেন। এই জন্য পরবর্ত্তী শতাব্দীর ইতিহাসকে শুধুই ধর্ম্ম-বিপ্লবের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। সে সময়ে কখনও বৌদ্ধগণ, কখনও জৈনগণ, কখনও যবনগণ, কখনও বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মানুগত হিন্দুগণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। মৌর্য্য-বংশ প্রধানতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের, শুঙ্গ ও কণ্ব বংশ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন, পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। অন্ধ্ররাজগণকেও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অনুরাগী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই সময়ে আবার জৈনরাজগণের প্রাধান্য বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। কলিঙ্গাধিপতি কারাবেলা ২২৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হয়। সেই কলিঙ্গাধিপতি জৈনরাজ কারাবেলা এক সময়ে মগধ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। কারাবেলার অপর নাম—মহামেঘবাহন। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বহু কৃতিত্বের বিষয় উদয়গিরির খোদিত-লিপিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ, বিভিন্ন সময়ে জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন নৃপতির প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, মগধে অন্ধ্র-বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, অতঃপর সংক্ষেপে এস্থলে তাহারই কিছু আভাষ দেওয়া যাইতেছে।

২৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে হুবিষ্ক ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি কুষণ-বংশীয় নৃপতি বলিয়া পরিচিত। এই কুষণ-বংশীয় কনিষ্ক ১৭৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।* হুবিষ্ক সেই বংশের তৃতীয় নৃপতি বলিয়া পরিচিত। কনিষ্ক ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য-স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে কান্দাহার প্রভৃতি প্রদেশ মাত্র তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। হুবিষ্ক তৎপরিত্যক্ত কিয়দংশ রাজ্য লইয়া রাজত্ব করেন।

---

* কনিষ্কের রাজ্যকাল সম্বন্ধে নানা মত আছে। খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী ১২০০ অব্দ হইতে ৫৮ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যমানতা প্রমাণ হয়। "পৃথিবীর ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ।—এ সময়ে দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্য-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে পাণ্ড্য-রাজ্যের উদ্ভবের বিষয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন। উত্তরে ভেলারু নদী, দক্ষিণে কুমারী অন্তরীপ, পূর্ব্বে করোমণ্ডল উপকূল এবং পশ্চিমে দক্ষিণ-কেরল অর্থাৎ বর্ত্তমান মাদুরা ও তিন্নেভেলি জেলা লইয়া এই রাজ্য সংগঠিত হয়। ২২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বা ২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এই পাণ্ড্য-রাজ্যের রাজার সহিত রোম-সম্রাট অগাষ্টাস সিজারের সখ্যতা-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রথম খৃষ্টাব্দ।—খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে যে বিভিন্ন শক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, খৃষ্টীয় প্রথম অব্দে তাহা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হইয়া পড়ে। এখন যেমন উত্তর ভারতের বিভিন্ন জনপদে সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী সম্প্রদায়-সমূহ মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল, দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জনপদেও সেইরূপ অন্ধ্র, পাণ্ড্য, চোল, কেরল প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছিল।

১৫ খৃষ্টাব্দ।—শক-বংশীয় সোদাস (সুদাস) এই সময় মথুরার শাসন-কর্ত্তা রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার আত্মীয় খাবাওস্তা ১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বন হেতু শকগণ ভারতীয় নৃপতিগণেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন। এই সময়ে মোগা নামক আর একজন নৃপতি উত্তর-পশ্চিম ভারতের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে। তাঁহার পুত্র পতিক তক্ষশীলার 'সাত্রাপ' শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হন।

২১ খৃষ্টাব্দ।—ইন্দো-পার্থিয়ান বংশ-সম্ভূত গণ্ডোফার্ণেস কান্দাহার, সিস্তান এবং কিছুকালের জন্য সিন্ধু-দেশ ও পঞ্জাবের পশ্চিমাংশে আধিপত্য বিস্তার করেন। ৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্জাব শাসন করিতেছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদাগাসেস পঞ্জাবের পশ্চিমাংশে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। তখন আরাকোসিয়া ও সিন্ধু-প্রদেশ আর্থাগ্নেসের অধিকারভুক্ত হয়। ঐ অংশ শেষে পাকোরেস অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

৩৩ খৃষ্টাব্দ।—কুষণ (শক) বংশীয় চতুর্থ নৃপতি বাসুদেব এই সময়ে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি পঞ্জাবের পূর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত পুনরধিকার করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৫০ খৃষ্টাব্দ।—তামিল ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ-পত্রে প্রকাশ,—এই সময়ে চোল, পাণ্ড্য, চেরা প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। চোল-রাজ্যে কারিকল চোল, পাণ্ড্য-রাজ্যে নেরুন্‌জেলিয়ান (প্রথম), চেরা-রাজ্যে আদন (প্রথম ও দ্বিতীয়) প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। কারিকল—ইলাং-জেট্‌সেন্নির পুত্র বলিয়া পরিচিত। তিনি পাণ্ড্যগণের এবং প্রথম

(৫০ খৃষ্টাব্দ) চেরা-রাজ প্রথম আদনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম শতাব্দীর শেষ অংশে তাঁহার পুত্র সেট-সিন্নি-নালান্-কিল্লী চোল-সিংহাসন লাভ করেন। পাণ্ড্য-রাজ প্রথম নেরুন্‌জেলিয়ান দাক্ষিণাত্যের এক যুদ্ধে যশস্বী হন। কথিত হয়, সেই যুদ্ধ উত্তর-ভারতের কোনও আর্য্য-নৃপতির সহিত সংঘটিত হইয়াছিল। ৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বেরিবার্সেলিয়ানও তাঁহার অনুসরণে যশস্বী হইয়াছিলেন। চেরা-রাজ প্রথম আদন পাণ্ড্য-রাজের সহিত মিলিত হইয়া চোল-রাজ কারিকলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ভেন্নিল নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আদন পরাজিত ও আহত হন। পরাজয়ের অপমানে তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। তাঁহার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় আদন কারিকলের কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাদ মিটিয়া যায়। তিনি ৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৬০ খৃষ্টাব্দ।—কুষণ-বংশীয় রাজা কোজুলো-কাদ্‌ফাইসেস, উচী বা তোথারিগণের পাঁচটী প্রদেশ অধিকার করিয়া পার্থিয়া আক্রমণ করেন। কাস্পীয়-সাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে পামীর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হয়; কাবুল তাঁহার অধিকারে আসে। ইতিপূর্ব্বে কাবুল-রাজ্য ইন্দোপার্থীয়গণের অধিকার-ভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ তদ্বংশীয় গণ্ডোফার্ণেস বা তাঁহার কোনও উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে কোজুলো-কাদ্‌ফাইসেস উহা অধিকার করেন। এই কাদ্‌ফাইসেস—প্রথম কাদ্‌ফাইসেস নামে অভিহিত। তাঁহার পুত্র ওয়েমা কাদ্‌ফাইসেস উত্তর-ভারতের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। সেই অংশে তোথারি সর্দ্দারগণ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত আপনাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার আছে।

৭৮ খৃষ্টাব্দ।—অন্ধ্র-বংশীয় বাশিষ্ঠী-পুত্র বিলিবায়কুর সিংহাসন লাভ করেন। কাহারও কাহারও মতে, পুরাণে তিনি চকোরশাতকর্ণি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী মাথারিপুত্র শিবালাকুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কোনও কোনও খোদিত-লিপিতে তিনি 'মাধারিপুত্ত স্বামী শাকসেন' বলিয়া অভিহিত হন। তিনি অন্ধ্র-দেশ, কোলাপুর এবং উত্তর-কোঙ্কণ প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কেহ কেহ পুরাণোক্ত শিবস্বাতি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। শকগণের প্রবর্ত্তিত শকাব্দের গণনা এই সময়ে (৭৮ খৃষ্টাব্দে) আরম্ভ হয়।

১০০ খৃষ্টাব্দ।—চোল-বংশীয় সেটসিন্নি-নালান্-কিল্লী এই সময়ে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। নেরুন্-কিল্লী কর্ত্তৃক যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তিনি দমন করেন। পাণ্ড্য-রাজগণের সহিত যুদ্ধেও তাঁহার অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পরবর্ত্তী পেরুনুনারকিল্লী রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া

(১০০ খৃষ্টাব্দ) যশস্বী হন। পাণ্ড্য-বংশীয় নেরুন্‌জেলিয়ান (দ্বিতীয়) এই সময় সিংহাসন লাভ করেন। চেরা-বংশীয় রাজা কিল্লীবলবন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। সে আক্রমণ দমন করিয়া তিনি চোল-রাজ্য আক্রমণ করেন এবং চোল, চেরা ও অন্যান্য মিলিত-শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। আলাংগা রণক্ষেত্রে তাঁহার জয়লাভ হয়। পরিশেষে তিনি চেরা-রাজ্য লুণ্ঠন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীর নাম—উগ্রপেরু বালুদি। এই বংশের শেষ রাজার নাম—নান্‌মাড়ান। সম্ভবতঃ ১৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তর হয়। এই সময়ে চেরা-রাজ্যে সেনগুট্টুবন (ইমায়বর্ম্মণ) তাঁহার পিতা দ্বিতীয় আদনের পরিত্যক্ত সিংহাসন লাভ করেন। তৎকর্ত্তৃক ভিয়ালুর দুর্গ আক্রান্ত হয়। চোল-রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তিনি প্রথমে কিল্লীবলবনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহ-দমনে সহায়তা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি চোল রাজ্য আক্রমণ করেন। উত্তরাভিমুখে তাঁহার অভিযান চলিয়াছিল। কনক ও বিজয় নামক দুইজন আর্য্য-বংশীয় যুবরাজকে তিনি গঙ্গা-নদীর উত্তর-তীরে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সেনগুট্টুবন রাজসূয় যজ্ঞে আপনার প্রভুত্ব খ্যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজার নাম—ছে (জানাই-কাং-ছে)। তিনি পাণ্ড্যরাজ দ্বিতীয় নেরুন্‌জেলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন; কিন্তু সে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন। চোল-বংশীয় পেরুন্‌নার-কিল্লী সেই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিলেন। সেনগুট্টুবনের উত্তরাধিকারী পেরুঞ্জোরাল-ইরুম্পোরাই ১৫৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

১২৪ খৃষ্টাব্দ।—অন্ধ্র-রাজ গৌতমীপুত্র বিলিবায়কুর, খহার্ত্ত-রাজ নাহাপানকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই অন্ধ্র-রাজ ১০৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন বলিয়া কথিত হয়। গুজরাট, মালয়, মধ্য-ভারত, বেরার, নাসিকের উত্তরাংশ, নাসিক ও পুণা জেলা, উত্তর-কোঙ্কণ প্রভৃতি তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই সকল প্রদেশের অধিকাংশই পুর্ব্বে নাহাপানের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল। অল্পদিন পরেই চৎস্ন কর্ত্তৃক নর্ম্মদা-নদীর উত্তরাংশস্থিত নাহাপানের নষ্ট-রাজ্য-সমূহের পুনরুদ্ধার-সাধন হইয়াছিল। চৎস্ন—শক-বংশীয় সামোটিকের পুত্র বলিয়া পরিচিত। উজ্জয়িনীতে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৪৫ খৃষ্টাব্দ।—অন্ধ্র-রাজ বাশিষ্ঠীপুত্র পুলোমাভি ১৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। মহাক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদমন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছিলেন। এই রুদ্রদমনের পিতার নাম—জয়দমন। রুদ্রদমন চৎস্নের পৌত্র। রুদ্রদমনের সহিত যুদ্ধে পুলোমাভি পরাজিত হন। ফলে, কাথিবার, কচ্ছ, মালয়, সিন্ধু,

(১৪৫ খৃষ্টাব্দ) কোঙ্কণ প্রভৃতি তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। নাগপানের নিকট হইতে বিলিবায়কুর যে সকল রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, এক পুণা ও নাসিক জেলা ভিন্ন, তাহার সমস্তই রুদ্রদমনের অধিকারে আসিয়াছিল। রুদ্রদমন স্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিচিত হন। ১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র দামোঘসদ বা দামোজদশ্রী (প্রথম) ঐ সময় সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম—সত্যদমন।

১৫০ খৃষ্টাব্দ। হইতে ৩১৭ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে একদিকে অন্ধ্র-বংশীয় রাজন্যবর্গ অন্যদিকে কুষণ-ক্ষত্রপগণ মস্তক উত্তোলন করিয়াছিলেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে ও পশ্চিম-ভারতে ঐ দুই শক্তির যে সংঘর্ষ চলিয়াছিল, তামিল গ্রন্থে, মুদ্রাদিতে এবং খোদিত-লিপি প্রভৃতিতে তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দামঘ্সদের পুত্র জীবদমন ১৭৮ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম-প্রদেশে 'মহাক্ষত্রপ' বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। তৎপরে রুদ্রসিং ১৯১ খৃষ্টাব্দে 'মহাক্ষত্রপ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি মহাক্ষত্রপ ছিলেন। ঐ সময় পুনরায় জীবদমন মহাক্ষত্রপ বলিয়া পরিচিত হন। তৎপরে ১৯৯ খৃষ্টাব্দে রুদ্রসেন 'ক্ষত্রপ' পদ প্রাপ্ত হন। ২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি 'মহাক্ষত্রপ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অন্ধ্র-বংশীয় গৌতমীপুত্র যজ্ঞশাতকর্ণির মৃত্যু হয়। তাহাতে পশ্চিম-প্রদেশে সাতবাহন বংশের আধিপত্য লোপ পায়। চুতুঃকুল নামধেয় শাত-কর্ণিগণ অন্ধ্র-দেশে প্রাধান্য লাভ করেন। এই বংশ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ কালে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। ২২২ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীসেন পশ্চিম-দেশের ক্ষত্রপ বলিয়া পরিচিত হন এবং ঐ বৎসরই রুদ্রসিংহের পুত্র সংঘদমন 'মহাক্ষত্রপ' পদ লাভ করেন। তিনি ২৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময় ঈশ্বরদত্ত 'মহাক্ষত্রপ' হইয়াছিলেন। কেহ কেহ ঈশ্বরদত্তকে 'আভীর'-বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। ২৩৯ খৃষ্টাব্দে যশোদমন (প্রথম) 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি লাভ করেন। তৎপরে বিজয়সেন ২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'মহাক্ষত্রপ' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ২৫০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় দামযদশ্রী, ২১৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় রুদ্রসেন, ২৭৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বসিংহ, ২৯৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্বাসন, ২৯৫ খৃষ্টাব্দে ভারত্রিদমন, ৩০৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় রুদ্রসিংহ এবং ৩১৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় যশোদমন প্রভৃতি 'মহক্ষত্রপ' পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর, প্রায় ৩১ বৎসর, কেহ 'মহাক্ষত্রপ' পদ পাইয়াছিলেন বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় না। ক্ষত্রপ, মহাক্ষত্রপ প্রভৃতি পদ—প্রাদেশিক স্বাধীন শাসনকর্ত্তার বিশেষ সম্মান-জ্ঞাপক। 'সাত্রাপ' ও 'ক্ষত্রপ' তুল্য উপাধি। পারসিকগণ, এবং শকগণ ঐ উপাধি-গ্রহণে আপনাদিগের প্রাধান্য খ্যাপন করিতেন।

৩২৯ খৃষ্টাব্দ।—এই সময় হইতে গুপ্ত অব্দের প্রবর্ত্তনা। গুপ্তরাজগণ বঙ্গদেশীয়। তাঁহারা বঙ্গদেশে বহুদিন হইতে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-বংশীয় চন্দ্র-গুপ্ত (প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নামে পরিচিত) সিংহাসনারোহণ করেন। ৩২০ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিচিত হন। সেই সময়েই গুপ্ত অব্দের প্রবর্ত্তনা। সেই সময় হইতেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তিনি আপন বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতে প্রযত্নপর হইয়াছিলেন। ফলে, ভারতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এলাহাবাদ, অযোধ্যা, প্রয়াগ, ত্রিহুত, বেহার প্রভৃতি প্রদেশে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

৩৩৫ খৃষ্টাব্দ।—চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত এই বৎসর সিংহাসন লাভ করেন। মগধ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল বটে; কিন্তু নবদ্বীপ ও তৎসন্নিকটস্থ সমুদ্রগড়েই তাঁহার প্রধান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। সমুদ্রগড় হইতে যুদ্ধযাত্রা করিয়া উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম—ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি আপন বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের নিকট উত্তর-ভারতের বহু নৃপতি পরাজয় স্বীকার করেন। তাঁহাদের নাম,—রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মণ, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দিন, বলবর্ম্মণ ইত্যাদি। দক্ষিণ-দেশে সমুদ্রগুপ্ত যে সকল নৃপতিকে পরাজিত করেন, তাঁহাদের মধ্যে কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কোরেরুর মন্ত্ররাজ, পিথাপুরামের মহেন্দ্র, কর্ত্তুরার স্বামিদত্ত, এরাণ্ডাপাল্লার দমন, কঞ্জেভরমের বিষ্ণুগোপ, অবমুক্তার নীলরাজ, ভেঙ্গীর হস্তিবর্ম্মণ, পালাকার উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের কুবের ও কুস্থলপুরের ধনঞ্জয় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য এক দিকে পূর্ব্বসীমায় কঞ্জেভরম, অন্যদিকে পশ্চিম-সীমায় খান্দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত হিন্দু-রাজন্যবর্গের শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা তিনি আপনার একছত্র প্রভাব খ্যাপন করেন। বহুদিন পরে, বঙ্গাধিপতি সমুদ্রগুপ্তের রাজত্ব সময়ে, হিন্দু-গৌরব আবার ভারতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

৩৪৮ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে তৃতীয় রুদ্রসেন পশ্চিমাংশে 'মহাক্ষত্রপ' বলিয়া পরিচিত ছিলেন বটে; কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের প্রভাবের নিকট তাঁহার গর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিম্লান হইয়াছিল।

৩৭১ খৃষ্টাব্দ।—এ সময়ে বিজয়গড় প্রদেশে বিষ্ণুবর্দ্ধন নামা জনৈক রাজার রাজ্যকালের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পিতার নাম যশোবর্দ্ধন বলিয়া উক্ত আছে।

৩৮০ খৃষ্টাব্দ।—সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাহাতে এই বংশকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নবরত্নের পৃষ্ঠপোষক বিক্রমাদিত্যের বংশের শাখা বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিন্ধুনদের ব-দ্বীপ অতিক্রম করিয়া বাহ্লিক দেশ জয় করিয়াছিলেন। মালয়, গুজরাট, কথিবাড়—তাঁহার অধিকারভুক্ত

(৩৮০ খৃষ্টাব্দ) হওয়ায় আরব-সমুদ্রে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ৪০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পশ্চিম-দেশীয় 'ক্ষত্রপ'-শাসনের মূলোৎপাটন করেন।

৩৮২ খৃষ্টাব্দ।—সিংহসেন 'মহাক্ষত্রপ' রূপে পশ্চিম-প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র রুদ্রসেন (চতুর্থ) উত্তরাধিকার লাভ করেন। কিন্তু পুনরায় কিছুদিন সিংহাসন শূন্য থাকে। অবশেষে সৎসিংহের পুত্র তৃতীয় রুদ্রসিংহ মহাক্ষত্রপ হইয়াছিলেন।

৪০০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে উচ্ছকল্পের (বাঘেলখণ্ডের) মহারাজগণের প্রতিষ্ঠা। ঐ বংশের আদিভূত ওঘদেব প্রভৃতি গুপ্তরাজগণের করদ-নৃপতি মধ্যে গণ্য ছিলেন।

৪১৩ খৃষ্টাব্দ।—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুমারগুপ্ত পিতামহের পদাঙ্কানুসরণে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার আছে। ইঁহার রাজত্বকালে হূনগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া মহা অনর্থ উপস্থিত করিয়াছিল।

৪২৩ খৃষ্টাব্দ।—পশ্চিম মালবে বিশ্ববর্ম্মণ, প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্য অল্প দিন পরেই লোপপ্রাপ্ত হয়।

৪৩০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে ত্রৈকুটক-বংশীয় ইন্দ্রদত্ত দক্ষিণ গুজরাটে এবং কোঙ্কণ-প্রদেশে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অন্য দিকে কুষণ-বংশীয় কিদার গান্ধার-দেশে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁহার পুত্র পেশোয়ারের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৪৩৭ খৃষ্টাব্দ।—বিশ্ববর্ম্মণের উত্তরাধিকারী বন্ধুবর্ম্মণ পশ্চিম-মালবের দাসপুর (মান্দাসার নামক স্থানে প্রতিষ্ঠান্বিত হন। তিনি প্রথম কুমারগুপ্তের অধীন বলিয়া আপনাকে স্বীকার করিয়াছিলেন।

৪৫৫ খৃষ্টাব্দ।—কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। ইনিও 'বিক্রমাদিত্য' বলিয়া পরিচিত হন। কুমারগুপ্তের সময়ে পুষ্পমিত্র-বংশীয় রাজন্যবর্গের সহিত একটী যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। স্কন্দগুপ্ত সেই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি শ্বেত-হূনদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। শ্বেত-হূনগণ প্রথমে কাবুলের কুষণ-রাজ্য অধিকার করিয়া ক্রমশঃ ভারতের দিকে দলে দলে অগ্রসর হইয়াছিল। হূনগণ মধ্য-এসিয়ার পার্ব্বত্য-প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া ভারত-লুণ্ঠন উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। শকগণের সংমিশ্রণে ভারতে যেমন বিভিন্ন মিশ্র-জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল, হূনগণের সংমিশ্রণেও ভারতে সেইরূপ অনেক মিশ্রজাতির উৎপত্তি হয়।

৪৭০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে আক্রমণকারী হূনগণের সহিত স্কন্দগুপ্তের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। হূনগণ গান্ধারের কুষণ-রাজগণকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। হূনগণের এই আক্রমণের সময়েও ত্রৈকুটক-বংশের দারসেন, কোশমের ভীমবর্ম্মণ, অন্তর্বেদীর সর্ব্বনাগ স্কন্দগুপ্তের করদরাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

৪৭৫ খৃষ্টাব্দ।—পরিব্রাজক মহারাজ হস্তিন্ পশ্চিম-চেদিদেশের ত্রিপুরী নামক স্থানে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেন। দেবাধ্যায় ঐ বংশের আদিভূত। ঐ বংশের রাজগণ গুপ্তগণের করদরাজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

৪৮০ খৃষ্টাব্দ।—পুরগুপ্ত, স্কন্দগুপ্তের সিংহাসন লাভ করেন। এই সময়ে গুপ্ত-বংশের এক নূতন শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। কৃষ্ণগুপ্ত সেই শাখার আদিভূত। হর্ষগুপ্ত, জীবিতগুপ্ত, কুমারগুপ্ত প্রভৃতি এই শাখায় অন্তর্ভুক্ত। হরিবর্ম্মণ কর্ত্তৃক এই সময় আর এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। সে বংশ—মাওখারি-বংশ বলিয়া পরিচিত। এই মাওখারি-বংশে আদিত্যবর্ম্মণ, ঈশ্বরবর্ম্মণ, ঈশানবর্ম্মণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এই সময়েই আর এক নূতন রাজবংশ কাথিবাড়ে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল। ভতর্ক সেই বংশের আদিভূত। বল্লভী-দেশের মৈত্রক তাঁহাদের কুলোপাধি। ৪৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভতর্ক সেনাপতি ছিলেন। শেষে তাঁহার বংশ রাজবংশ বলিয়া পরিচিত হয়। তাঁহারা প্রথমে গুপ্তগণের ও পরিশেষে হূনগণের অধীন ছিলেন; শেষে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এই বংশের (প্রথম) ধারসেন, দ্রোণসেন, বৈরাগ্যসেন প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

৪৮৪ খৃষ্টাব্দ।—মধ্য-ভারতে বুদ্ধগুপ্ত রাজত্ব করিতেন। তাঁহার আবার কয়েকটি অধীন রাজা ছিল। সেই অধীন রাজগণের একজন—সুরশ্মিচন্দ্র। তিনি যমুনা ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী স্থানে রাজত্ব করিতেন। অপর অধীন নৃপতিগণের মধ্যে ইরাণ-প্রদেশের মাতৃবিষ্ণু ও তাঁহার ভ্রাতা ধ্যানবিষ্ণু প্রসিদ্ধ।

৪৮৫ খৃষ্টাব্দ।—পুরগুপ্তের পুত্র নরসিংহগুপ্ত (বালাদিত্য) এই সময় সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

৪৯৫ খৃষ্টাব্দ।—শ্বেত-হূনগণের ভীষণ আক্রমণ আরম্ভ হয়। তোরামান এই সময় শ্বেত-হূনগণের পরিচালক ছিলেন। তাঁহার ভীষণ আক্রমণে কিছুকালের জন্য গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়। মালয় প্রভৃতি দেশে তোরামান একছত্র আধিপত্য লাভ করেন।

৫০০ খৃষ্টাব্দ।—ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ কালে বৈজয়ন্তী নগরে কাকুৎস্থবর্ম্মণের ও তদ্বংশীয়-গণের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বংশে বহু ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। এই বংশের ময়ূরশর্ম্মণ প্রথম রাজোপাধি গ্রহণ করেন। পহ্লব-গণের এবং গঙ্গাবংশীয়গণের সহিত বিবাদে এই বংশ যশস্বী হইয়াছিল।

৫১০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময় হূন-সর্দ্দার তোরামানের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র মিহিরকুল (মিহিরগুল), শাকল (শিয়ালকোট) নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া আপনাদের অধিকৃত প্রদেশে শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন।

৫২৮ খৃষ্টাব্দ।—মিহিরকুলকে দমন জন্য এই সময় মগধের নরসিংহগুপ্ত এবং মধ্য-ভারতের যশোধর্ম্মণ সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন। ফলে, ৫২৮ খৃষ্টাব্দে মিহিরকুল পরাজিত ও

(৫২৮ খৃষ্টাব্দ) বন্দী হন। পরিশেষে মিহিরকুলকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করা হয়। তখন মিহিরকুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুযোগ বুঝিয়া শাকল-রাজ্য অধিকার করেন। এই সময়ে কাশ্মীরের অধিপতির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। কিন্তু পরিশেষে তিনি সেই বন্ধুকেই সিংহাসন-চ্যুত করেন এবং গান্ধার অধিকার করিয়া বসেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই মিহিরকুলের সেই ভ্রাতার মৃত্যু হয়।

৫৩২ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে যশোধর্ম্মা উত্তর-ভারতে একছত্র প্রভাব বিস্তারের জন্য বদ্ধপরিকর হন। পূর্ব্ব-সীমায় ব্রহ্মপুত্র, পশ্চিমে আরব-সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে গঞ্জামের মহেন্দ্র-পর্ব্বত পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এই সময়ে (৫৩০ খৃষ্টাব্দে) দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বটে; কিন্তু যশোধর্ম্মণের নিকট তাঁহাকে অবনত হইতে হইয়াছিল।

৫৫০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে পশ্চিম চৌলুক্য-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম পুলোকেশী ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাতাপি (বর্ত্তমান বাদামী) এই বংশের রাজধানী হইয়াছিল। চৌলুক্য দেশের কিংবদন্তীতে প্রকাশ,—এই বংশের উনষাট জন নৃপতি অযোধ্যা প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ষোল জন দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। এই চৌলুক্য-বংশ পরবর্ত্তী চৌলুক্য-বংশ বলিয়া পরিচিত। পুলকেশী-বংশের গর্ব্ব খর্ব্ব হইলে, শেষোক্ত চৌলুক্যগণ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। শিলোধব প্রথম মাধবরাজ এই সময় রাজত্ব করিতেন। তিনি কর্ণসুবর্ণের রাজার (বঙ্গাধিপতির) করদ রাজ মধ্যে গণ্য ছিলেন।

৫৬০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে মাওখাড়ি-রাজগণের মধ্যে ঈশানবর্ম্মণ প্রতিষ্ঠান্বিত হন। কোলচুরি বা কাঠাচুরি রাজবংশে কৃষ্ণরাজ এবং কঞ্জেভরমে সিংহরাজ সিংহবিষ্ণু যশস্বী হইয়াছিলেন। ঈশানবর্ম্মণের সহিত গুপ্তবংশের কুমারগুপ্তের যুদ্ধ হয় (৫৬৪ খৃষ্টাব্দ)। সেই যুদ্ধ উভয়ের পুত্রগণের মধ্যেও চলিয়াছিল।

৫৬৮ খৃষ্টাব্দ।—প্রথম পুলকেশির পুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মণ পশ্চিম-প্রদেশস্থ চৌলুক্য গণের অধিপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি বহু প্রদেশের বহু জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ভর্ত্তুবা, মগধ এবং বৈজয়ন্তী প্রভৃতি দেশের রাজগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হন। মদ্রক, কেরল, গাঙ্গ্য, মুষকনল, মৌর্য্য, কাদম্ব, পাণ্ড্য, দ্রামিল, চোল, আলুপ প্রভৃতি জাতিরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

৫৭১ খৃষ্টাব্দ।—বল্লভীর মৈত্রক রাজা দ্বিতীয় ধারসেন এই সময় সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি গুজরাট-দেশ হইতে মাহী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা গুহসেন ৫৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

৫৮০ খৃষ্টাব্দ।—থানেশ্বরে প্রভাকরবর্দ্ধন, পিতা আদিত্য-বর্দ্ধনের পরিত্যক্ত সিংহাসন লাভ করেন। তিনি হূণগণের এবং গুর্জ্জরগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

(৫৮০ খৃষ্টাব্দ) গান্ধার, সিন্ধু এবং মালবের রাজগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে বুন্দেলখণ্ডে এবং মধ্য-প্রদেশে 'বকাত্তক' বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম প্রবরসেন সেই বংশের আদিভূত। গুজরাটে গুর্জ্জর-রাজবংশের সামন্ত (প্রথম) দদ্দ সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার পুত্র জয়ভট্ট, পৌত্র দ্বিতীয় দদ্দ। বরোচ-নগরে গুর্জ্জরগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্য-গুজরাট এবং দক্ষিণ-গুজরাটের উত্তরাংশ এই গুর্জ্জর-রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল।

৫৯০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে মগধে পূর্ণবর্ম্মণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চীন-দেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন-সাং তাঁহাকে অশোকের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। গুজরাটে এই সময়ে প্রথম চৌলুক্য-বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়সিংহ, গুজরাটে চৌলুক্য-বংশের আদিভূত।

৫৯৭ খৃষ্টাব্দ।—পশ্চিম চৌলুক্য-রাজবংশে মঙ্গলেশ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি কলচুরার বুদ্ধ রাজাকে এবং মতঙ্গগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। চৌলুক্য-বংশের স্বামি রাজা তাঁহার হস্তে নিহত হন এবং তিনি রেবতী দ্বীপ অধিকার করেন।

৬০০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে মহাসেনগুপ্ত মগধে গুপ্ত-বংশের প্রাধান্য রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র মাধবগুপ্ত কনোজাধিপ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। দক্ষিণ গুজরাটে বাগুমরা অঞ্চলে এই সময়েই 'সেন্দ্রক' বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ভানুশক্তি ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্র আদিত্যশক্তি ও প্রপৌত্র নিকুম্ভলশক্তি। এই বংশ প্রথমে কোলচুরিগণের এবং পরিশেষে পশ্চিম দেশীয় চৌলুক্যগণের করদ নৃপতি মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। এই সময়ে মুলতাই (মধ্যভারত) প্রদেশে রাষ্ট্রকুট-বংশীয় দুর্গারাজা, এবং ভেঙ্গীপুরে শালঙ্কায়ন রাজগণ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। শালঙ্কায়ন রাজবংশে চণ্ডবর্ম্মণ, বিজয়নন্দীবর্ম্মণ এবং বিজয়দেববর্ম্মণ প্রসিদ্ধ।

সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে।

ষষ্ঠ-শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিলে, ভারতবর্ষের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের এক বিকট চিত্র নয়নপথে নিপতিত হয়। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সংগঠিত হইয়াছে। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন রাজশক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। এই সময়ে আচার-ব্যবহারের বিপর্য্যয়ে সমাজে ঘোর বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। এ সময়ের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই কত প্রকার! শাখা-প্রশাখার তো কথাই নাই! এক দিকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম আপন প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন পাইতেছে; অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম আপনার প্রসার-প্রতিপত্তি বিস্তারে আগুয়ান হইয়াছে; পার্শ্বে জৈন-ধর্ম্ম মস্তক উত্তোলন করিবার চেষ্টা পাইতেছে; অন্যত্র, বৈদেশিক বিধর্ম্ম-সমূহ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে! শকগণের, হূনগণের এবং তাহাদের সংশ্রবে মিশ্রিত জাতিগণের কত ধর্ম্মমত কতমতেই প্রচারিত হইতেছে! এখন গ্রীকগণের ধর্ম্মমত ভারতে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে; এখন জোরওয়াষ্টার প্রবর্ত্তিত পারসিকগণের ধর্ম্মমত প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছে;

এখন ইসলাম-ধর্ম্মের উদ্দীপনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে। যেমন বিভিন্ন ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তনার চেষ্টা চলিয়াছে; তেমনই বিভিন্ন রাজশক্তির শক্তি-পরীক্ষা চলিয়াছে। যদিও পূর্ব্ব-ভারতে বঙ্গদেশে রাজ্য-বিবর্ত্তন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু পশ্চিম-ভারতে এখন সে বিবর্ত্তন-বিপ্লবের অবধি নাই। উত্তরে, পশ্চিমে, দক্ষিণে—কতমতেই বৈদেশিক জাতিগণের সংশ্রব চলিয়াছে। সুতরাং এ সময়ে সমাজ-বন্ধনের যে কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। এখন, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের মধ্যে অব্রাহ্মণ্য ভাব প্রবেশ করিবার প্রয়াস পাইতেছে; আবার, বৌদ্ধ-গণের অহিংসা-ধর্ম্মের মধ্যেও হিংসার ভাব দেখা দিয়াছে। সপ্তম শতাব্দীতে এই সমাজ-বিপ্লবে, ধর্ম্ম-বিপ্লবে, রাষ্ট্র-বিপ্লবে নব নব শক্তির নব নব প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। এই শতাব্দীর ধর্ম্ম-সংঘর্ষ ভারতের ইতিহাসে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ও মধ্যভাগে ভারত-বর্ষে দুই দিকে দুই জন দেশপতি সম্রাটের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহাদের একজন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রাধান্য-রক্ষা-কল্পে বদ্ধপরিকর ছিলেন; অপর জন তৎক্ষেত্রে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতবর্ষ এই ধর্ম্ম-সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। এই সপ্তম শতাব্দীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের এক দীপ্তপ্রতাপ সম্রাটের শৌর্য্য-বীর্য্য প্রখ্যাত হইয়াছিল। সেই দারুণ বিপ্লব-বিশৃঙ্খলার দিনেও তিনি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সংরক্ষক ছিলেন। তাঁহার নাম—শশাঙ্ক। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া ভারতের পশ্চিম-সীমান্ত পর্য্যন্ত তিনি আপন বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ নরবর্দ্ধন-বংশীয় রাজন্যগণের অধিকারভুক্ত ছিল। নরবর্দ্ধনের প্রপৌত্র প্রভাকরবর্দ্ধন সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে থানেশ্বরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় রাজ্যবর্দ্ধন ৬০৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি প্রতাপশালী ছিলেন। মালয়ের অধিপতি তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। কিন্তু বঙ্গাধিপতি শশাঙ্কের বাহুবলে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বঙ্গাধিপতি শশাঙ্ক, রাজ্যবর্দ্ধনকে সংহার করিয়া থানেশ্বর-রাজ্যকে আপনার বশে আনিয়াছিলেন। এই বঙ্গাধিপতি শশাঙ্ক সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে নানা অত্যাচারের বিষয় লিখিত আছে। বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধনে তাঁহার নানা অপকীর্ত্তির কথা উক্ত হইয়া থাকে। তাহা হইলেও তাঁহার প্রভাব-প্রভুত্বের বিষয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যখন অশোকাদির শাসন-কালে বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গদেশ গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল; সে সময় পুষ্পমিত্রের প্রভাবে সে কবল হইতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পুষ্পমিত্রের পর আবার বিভিন্ন ধর্ম্মের সমবায়ে কলুষিত বৌদ্ধধর্ম্মের কবলে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল। সেই অবস্থায় শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার-সাধন করেন। তবে তিনি দেশপতি সম্রাট হইয়াও কতকটা একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সকল প্রজার সর্ব্ববিধ ধর্ম্মমত তাঁহার নিকট সমানভাবে সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই; রাজশক্তির প্রাণস্থানীয় সাম্য-মন্ত্রের দীক্ষা তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার প্রাধান্য বহুদিন অক্ষুণ্ণ ও চিরস্থায়ী হইতে পারে নাই

তাই থানেশ্বর হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পদিন পরেই রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাই সিংহাসন লাভ করিয়া অল্পদিন মধ্যেই তিনি বিভিন্ন জনপদের রাজন্যবর্গের সহিত সখ্যতা-স্থাপনে প্রযত্নপর হন। কামরূপের অধিপতি ভাস্করবর্ম্মণ তাঁহার সহিত সখ্যতা-স্থাপন করেন;—আর সেই সূত্রে হর্ষবর্দ্ধন গৌড়-আক্রমণে, শশাঙ্কের গর্ব্ব খর্ব্ব-সঙ্কল্পে, বদ্ধপরিকর হইতে পারেন। তবে সে সঙ্কল্প-সাধনেও তিনি সহসা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শশাঙ্কের জীবিতকালে যে তিনি বঙ্গদেশ অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই। ৬১৯ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনও তাঁহার অনেক করদ-মিত্র রাজা বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং মনে হয়, শশাঙ্কের লোকান্তরের পর বঙ্গদেশ কিছুকাল হর্ষবর্দ্ধনের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন আবার বঙ্গদেশ স্বাধীনতা অবলম্বন করে। যাহা হউক, ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে হর্ষবর্দ্ধন যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা প্রোথিত করিয়া আপনার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। পূর্ব্ব-সীমানায় বঙ্গদেশ ও বঙ্গোপসাগর, পশ্চিম সীমায় কচ্ছ, গুর্জ্জর ও আরব-সাগর; উত্তরে পঞ্চনদ প্রদেশ ও জলন্ধর; দক্ষিণে নর্ম্মদা-নদী-প্রবাহ;—এই চতুঃসীমার মধ্যে হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য ইতিহাসে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। শশাঙ্ক যেমন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য হর্ষবর্দ্ধনের প্রয়াসও সেইরূপই দেখা গিয়াছিল।

ধর্ম্ম-সংঘর্ষের ফল।

শশাঙ্কের ও হর্ষবর্দ্ধনের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পরিণতির বিষয় আলোচনা করিলে ধর্ম্ম-সংঘর্ষের অবশ্যম্ভাবী ফল প্রকট প্রত্যক্ষীভূত হয়। যে সাম্য-ভাবের অভাবে শশাঙ্কের সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সাম্যভাবের অভাবেই হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়। যে পুরুষে অভ্যুত্থান, সেই পুরুষেই বিলয়-সাধন। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই দুই বংশের দুই সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ও বিলোপ-সাধন সংসারকে জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিল,—শক্তি-সামর্থ্য সত্ত্বেও সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় না, যদি সাম্যভাবের অভাব ঘটে। এই সূত্রে আরও দেখিতে পাওয়া গেল,—ধর্ম্মভাবের উন্মাদনা বড় বিষম উন্মাদনা। ভারতে যে নব নব রাজ্য-সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ও অধঃপতন ঘটিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ স্থলেই সেই উন্মাদনার পরিচয় পাই। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতের রাজনৈতিক গগনে যে পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে, ধর্ম্মবিপ্লবের প্রকট-ভাবই পরিদৃশ্যমান্ দেখি। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে—অবশিষ্ট পঞ্চাশ বৎসরে—ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক অবস্থার যে এক অভিনব পরিবর্ত্তন জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহারও মূল কারণ,—সেই ধর্ম্মভাবের উন্মাদনা—বৈষম্যে সাম্য-স্থাপনের প্রযত্ন। আমরা পুনঃপুনঃ দেখাইয়া আসিতেছি—"সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্"—অতি-বৃদ্ধি কখনই মঙ্গলপ্রদ নহে; আর, তজ্জন্যই যখনই অতি-বৃদ্ধি হইয়াছে, তখনই পতন ঘটিয়াছে। সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাসে

বিবিধ দৃষ্টান্তে সেই কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গাধিপতি শশাঙ্ক, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনরূপ নীতি-তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছিলেন, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণের প্রতি তিনি সাম্যভাব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই; তাই তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়। শশাঙ্কের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে থানেশ্বরে নব সাম্রাজ্যের ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত হইয়াছিল। সেই অবসরেই হর্ষবর্দ্ধন ভারতের একচ্ছত্র নৃপতি মধ্যে পরিগণিত হন। কিন্তু তাঁহারও রাজ্য-সাম্রাজ্য স্থায়িত্ব-লাভ করিতে পারে নাই। যে কারণে শশাঙ্কের সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য-প্রতিষ্ঠাও সেই কারণেই শ্লথ হইয়া আসে। শশাঙ্ক যেমন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পরিপোষকগণের প্রতি অযথা অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর তজ্জন্যই যেমন অপরাপর ধর্ম্ম-সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; হর্ষবর্দ্ধনও সেইরূপ বৌদ্ধগণের প্রতি অত্যধিক অনুকম্পা প্রদর্শন করায় বৌদ্ধেতর সম্প্রদায়-ভুক্ত জনগণের বিরক্তিভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহারই ফলে, তাঁহার রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। হর্ষবর্দ্ধনের প্রাধান্য সময়ে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কালে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা-নাশ-কল্পে, নানা দিকে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, নানা দিকে নানা ধর্ম্মমত জাগিয়া উঠিয়াছিল। তখন বিকৃতি-বিপর্য্যয়ের আর পরিসীমা ছিল না। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের মস্তকে চারিদিক হইতে কশাঘাত আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতি সে সময়ের অত্যাচারের ইতিহাস—কি ভীষণ—কি লোমহর্ষণ! সহস্র গুণগ্রামের মধ্যে অসংখ্য নরজীবন-হননের বিষম কলঙ্ক-কালিমায় রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের পুণ্যময় জীবন যেমন কলুষিত হইয়াছিল, শত সদ্‌গুণের মধ্যে হর্ষবর্দ্ধনের জীবনও সেইরূপ কলঙ্ক-কলুষিত হইয়া আছে। জীবনের মধ্যাহ্ন দিনে, পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল, হর্ষবর্দ্ধন যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্রতী ছিলেন। সেই দীর্ঘকালে তাঁহার বিপুল বাহিনীর শাণিত তরবারি-মুখে কত নরমুণ্ড লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। অধিক কি, সেজন্য শেষ-জীবনে তাঁহাকে দারুণ অনুতপ্ত হইতে হয়। এ ক্ষেত্রে অশোকের ও হর্ষবর্দ্ধনের উভয়ের জীবনে এক অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে। নব সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার উন্মাদনায় নরশোণিত-স্রোতে দেশ-প্লাবনের ভীষণ দৃশ্য উভয়ত্রই অভিন্ন, আবার অনুতাপের অন্তর্দাহে উভয়ত্রই জ্বালামালা প্রত্যক্ষীভূত! পরিণাম-ফলও উভয়ত্রই সমান দেখিতে পাই। দৃঢ়-ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত অশোকের সাম্রাজ্যও বিধ্বস্ত হইতে তাই বড় বিলম্ব ঘটে নাই; হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য-শ্রীও তাই অল্পদিনেই নষ্ট হইয়াছিল। অত্যাচারের পর অত্যাচারের ফলে, কদাচারের পর কদাচারের প্রভাবে, বসুন্ধরা ব্যাকুলা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং, আর্ত্ত-প্রাণীর উদ্ধারের জন্য আবার শ্রীভগবানের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছিল। সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মকে অপ-ধর্ম্মের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হন। সুপ্ত-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে যেন প্রাতঃসূর্য্যের নবীন আলোকে হিন্দুস্থান পুনরালোকিত হইয়া উঠে। অষ্টম শতাব্দীর ইতিহাসে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব এক বিচিত্র ব্যাপার! তাহাতে কর্ম্মস্রোত পরিবর্ত্তিত হয়; রীতি-ধর্ম্ম অভিনব পন্থা পরিগ্রহ করে, রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের নবীন

অঙ্কুর উদ্গত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসের এই এক বিরাম-স্থান বলিয়া তাই আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি।

৬০৫ খৃষ্টাব্দ।—ষষ্ঠ-শতাব্দীর শেষভাগে শশাঙ্ক বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ৬০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি থানেশ্বর রাজ্য আক্রমণ করেন। সেই আক্রমণে থানেশ্বরের তৎকালিক অধিপতি রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বঙ্গাধিপতির বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়। ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গাধিপতি শশাঙ্কের প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

৬০৬ খৃষ্টাব্দ।—হর্ষবর্দ্ধন থানেশ্বরের সিংহাসন লাভ করেন। প্রথমে তিনি বঙ্গাধিপতির করদ-মিত্ররাজ মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, বুঝিতে পারা যায়। ৬৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হর্ষবর্দ্ধন দেশপতি সম্রাট-রূপে পরিগণিত হন। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের লোকান্তর ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব-কালে চীন-দেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের প্রভাব-প্রভুত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পরিবর্ণিত আছে।

৬১০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে পশ্চিম-দেশীয় চৌলুক্য রাজগণের প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মঙ্গলেশ-পরিত্যক্ত সিংহাসনে দ্বিতীয় পুলিকেশী (কীর্ত্তিবর্ম্মণের পুত্র) আধরোহণ করেন। তিনি বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। পরিশেষে তিনি পহ্লবগণের অধিপতি (প্রথম) নরসিংহ-বর্ম্মণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হন। এই নরসিংহবর্ম্মণের পুত্র মহেন্দ্রবর্ম্মণ (দ্বিতীয়) এবং পৌত্র পরমেশ্বরবর্ম্মণ (প্রথম) প্রসিদ্ধ। এই সময়ে গুজরাটের চৌলুক্য রাজবংশে বুদ্ধবর্ম্মণ এবং রেবতী-দ্বীপে দ্বিতীয় পুলিকেশীর অধীনে সত্যাশ্রয় ধ্রুবরাজ ইন্দ্রবর্ম্মণ রাজত্ব করিতেন।

৬১৫ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে ভেঙ্গীর প্রাচ্য-চৌলুক্য রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। বাতাপীর দ্বিতীয় পুলিকেশীর প্রতিনিধিত্বে দেশ শাসন করিতে গিয়া, কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। প্রথম বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে পরিচিত হইয়া ৬৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম জয়সিংহ ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন।

৬২০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে চৌলুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলিকেশীর নিকট পরাজিত হওয়ায়, হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য-সীমা দাক্ষিণাত্যে নর্ম্মদা-নদীর উত্তর-তীরে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

৬২৫ খৃষ্টাব্দ।—এই সময় রাজপুতানায় বর্ম্মলাত রাজোপাধি গ্রহণ করেন। শ্রীমাল (ভীনমাল) তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার অধীন-নৃপতিরূপে তখন বজ্রভাট, অর্ব্বুদ বা আবু-পর্ব্বত-প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাটে দ্বিতীয় দদ্দ এবং রাজপুতানায় চাপ-বংশীয় ব্যাঘ্রমুখ রাজত্ব করিতেছিলেন। ৬২৯ খৃষ্টাব্দে বল্লভীর মৈত্রক রাজগণের সিংহাসনে ধ্রুবসেন (দ্বিতীয়) অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৬০০ খৃষ্টাব্দ।—কাশ্মীরের কর্কোট-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দুর্ল্লভবর্দ্ধন এই সময় রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী তৎপুত্র দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্য ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন।

৬১৫ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে নেপালের পূর্ব্ব-প্রান্তে লিচ্ছবি রাজ-বংশে শিবদেব (প্রথম) রাজত্ব করিতেছিলেন। পশ্চিম-নেপালের ঠাকুরী-বংশের অংশুবর্ম্মণ তাঁহার সমসাময়িক। এই অংশুবর্ম্মণ ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। শিবদেবের বংশীয় পরবর্ত্তী নৃপতিগণের মধ্যে ধ্রুবদেব, বৃষদেব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এই সময়ে রাজ-চক্রবর্ত্তী হর্ষবর্দ্ধনের নিকট বহ্লবী-রাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেন পরাজিত হন। পরিশেষে হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে জামাতৃরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় প্রকৃতপক্ষে হর্ষবর্দ্ধন আনন্দপুর (বড়নগর), কচ্ছ, দাক্ষিণ কাথিবাড় অধিকার করেন। এই সময়ে ক্রমশঃ তাঁহার রাজ্য সীমা হিমালয়ের পাদ্য প্রদেশ হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মালব, গুজরাট, কাথিবাড় এবং আসাম তাঁহার রাজ্য-সীমান্তর্ভুক্ত হয়। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন গঞ্জাম আক্রমণ করিয়াছিলেন।

৬৩৪ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে সিন্ধু-দেশে শ্রীহর্ষরায় নামা শূদ্র-বংশীয় এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পিতা দিয়াজী (দিবজী) আরব-দেশীয় আক্রমণকারিগণ কর্ত্তৃক মুকরাম সহরে নিহত হন। ভারতে মুসলমানগণের এই প্রথম আক্রমণ।

৬০৫ খৃষ্টাব্দ।—বহ্লবীর মৈত্রক-রাজগণের সিংহাসনে এই সময় চতুর্থ ধারসেন অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুরাজ শ্রীহর্ষরায়ের পুত্র সাহসীরায় আরবগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। সাহসীরায়ের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সাশ সিন্ধুদেশের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্র (চন্দর) ৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে। সাহসীরায়ের মৃত্যুতে মন্ত্রী সাশ যেমন সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন, রাজা হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুতে (৬৪৭ ৪৮ খৃষ্টাব্দে) অর্জ্জুন বা অরুণাসব নামক তাঁহার মন্ত্রীও সেইরূপ সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে চীন-দেশের রাজদূত ওয়ান-হিউয়েন-সু এবং তিব্বতের রাজা শ্রোং-শান-গাম-পো যুদ্ধ-যাত্রা করেন। বঙ্গদেশের নৃপতি তাঁহাদের সহায় হন। ফলে, অর্জ্জুন পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। ৬৫৯ খৃষ্টাব্দে বহ্লবীরাজ চতুর্থ ধারসেন ভৃগুকচ্ছ (ভরোচ) অধিকার করেন। ঐ নগর তখন গুর্জ্জর রাজগণের রাজধানী ছিল।

৬৫০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময় যাদব-বংশীয় সাত্যকি-কুলোদ্ভব প্রথম দন্তিবর্ম্মণ কর্ত্তৃক রাষ্ট্রকূট রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। দন্তিবর্ম্মণের পর তাঁহার পুত্র প্রথম ইন্দ্ররাজ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। এখন (৬৫৩ খৃষ্টাব্দে) বহ্লবীর মৈত্রক

(৬৫০ খৃষ্টাব্দ) রাজবংশের তৃতীয় ধ্রুবসেন রাজত্ব করিতেছিলেন ; এখন (৬৫৪ খৃষ্টাব্দে) লিচ্ছবী-রাজবংশের ধ্রুবদেব পূর্ব্ব-নেপালে, ঠাকুরী-বংশের জিষ্ণু-গুপ্ত পশ্চিম নেপালে এবং বাগমুরায় (দক্ষিণ গুজরাট) সিন্দ্রক-রাজবংশে নিকুম্ভলশক্তি রাজত্ব করিতেছিলেন।

৬৫৫ খৃষ্টাব্দ।—এই সময় পশ্চিম চৌলুক্য-রাজবংশে আর এক বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব হয়। তিনি সাধারণতঃ প্রথম চৌলুক্য বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত। এই বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় পুলিকেশীর পুত্র ও উত্তরাধিকারী। এই বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক পহ্লব, চোল, পাণ্ড্য, কেরল প্রভৃতির বিদ্রোহ দমিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত বিবিধ শক্তিকে পরাস্ত করিয়া, ইনি কঞ্জেভরম্ (কাঞ্চী নগরী) অধিকার করেন। ইঁহার করদ-রাজ মধ্যে সেন্দ্রকের দেবশক্তি-গুজরাটের জয়সিংহবর্ম্মণ (ইনি প্রথম বিক্রমাদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রাদিত্য ৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সাবন্তাদি প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং আদিত্যবর্ম্মণ নামক ইঁহার আর এক ভ্রাতা কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর সঙ্গমস্থলে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। এ সময় পহ্লব-রাজ্যে নরসিংহবর্ম্মণ, বহ্লবীর মৈত্রকরাজবংশে (৬৬০ খৃষ্টাব্দে) ক্ষারগ্রহ এবং লিচ্ছবী-বংশে বৃষদেব (৬৬০ খৃষ্টাব্দে) রাজত্ব করিতেছিলেন। ৬৬১ খৃষ্টাব্দে মেওয়ারে (মিবারে) গুহিল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের প্রথম নৃপতির নাম—অপরাজিত। এই বংশের পরবর্ত্তী প্রধান-প্রসিদ্ধ পুরুষ—বাপ্পারাও। ৬৬৩ খৃষ্টাব্দে চৌলুক্য-রাজবংশের দ্বিতীয় বিষ্ণুবর্দ্ধন, ৬৬৯ খৃষ্টাব্দে বহ্লবীর মৈত্রক-বংশে তৃতীয় শিলাদিত্য এবং গুজরাটে চৌলুক্য-বংশে শ্রয়ঃশ্রয়ো শিলাদিত্য অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৬৩৪ খৃষ্টাব্দ।—আরবগণ স্থলপথে প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন। একদল আরব-সৈন্য মার্ভ হইয়া, কাবুল অধিকার করিয়া, পঞ্জাবে প্রবেশ করে।

৬৭১ খৃষ্টাব্দ।—এই সময় মগধে গুপ্তবংশের আদিত্যসেন রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা মাধবগুপ্তের সিংহাসন তিনি প্রাপ্ত হন। ৬৭২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিষ্ণুবর্দ্ধনের পুত্র মাঙ্গী প্রাচ্য-চৌলুক্য-বংশে অধিষ্ঠিত হন।

৬৮০ খৃষ্টাব্দ।—মগধে এখন দেবগুপ্ত অধিষ্ঠিত। তিনি আদিত্যসেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। পাণ্ডব-বংশোদ্ভব উদয়ন এই সময়ে কোশলে এবং মধ্যপ্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র ইন্দ্রবল, পৌত্র নানাদেব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। পশ্চিম-চৌলুক্য-রাজবংশে এ সময় বিন্ধ্যাদিত্য সিংহাসন লাভ করেন। তিনি প্রথম বিক্রমাদিত্যের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। দিগ্বিজয়ে তিনি পিতার ন্যায় যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি কঞ্জেভরমের পহ্লবগণকে এবং চোল, পাণ্ড্য, সিংহলী, হৈহয় ও মালবগণকে পরাজিত

(৬৭০ খৃষ্টাব্দে) করিয়াছিলেন। আলুভ-রাজ চিত্রবাহু, সিন্দ্রব-রাজ পোজিল্লি তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করেন। গঙ্গাবংশীয় এবং অন্যান্য রাজগণকেও তিনি পরাজিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে (৬৮৯ খৃষ্টাব্দে) রাজপুতানার ঝালরাপাটাম প্রদেশে দুর্গা-গণ রাজত্ব করিতেছিলেন। বল্লবীর মৈত্রক-রাজবংশে চতুর্থ শিলাদিত্য (৬৯১ খৃষ্টাব্দ), পশ্চিম-চৌলুক্য-রাজবংশে বিজয়াদিত্য (৬৯৬ খৃষ্টাব্দ), প্রাচ্য চৌলুক্য-রাজবংশে দ্বিতীয় জয়সিংহ সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

৭০০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময় পূর্ব্ব-ভারতে গঙ্গাবংশীয়গণের প্রতিষ্ঠা হয়। কলিঙ্গ-নগর এই গঙ্গা-বংশীয়গণের রাজত্ব ছিল। বীরসিংহ এই বংশের আদি-পুরুষ। তিনি কোলাহল-পুরের (কোলার) প্রতিষ্ঠাতা অনন্তবর্ম্মণের বংশধর বলিয়া কথিত হন।

প্রসঙ্গোক্তি।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের পশ্চিম-প্রান্তে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতিত হয়, অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহা সিন্ধুদেশ গ্রাস করিয়া বসে। সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—ভারতে মুসলমানগণের আক্রমণ। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে আরবদেশে ইসলাম-ধর্ম্মের দিব্যজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয়। ঐ সময়ে মহাপুরুষ মহম্মদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নবধর্ম্মের নবীন আলোকে আরবের অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল। সেই আলোকের রশ্মি-রেখা—নব-ধর্ম্মের নবীন উন্মাদনা—ভারতের পশ্চিম-প্রান্তে উপনীত হয়। যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রথমে সিন্ধুদেশ গ্রাস করে, কালে তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু ভারতের পুণ্য-পূত ক্ষেত্রে সে অগ্নি বিস্তৃত হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল,—শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবার জন্য আর আর যে সকল আক্রমণকারী ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা কেহই সম্পূর্ণরূপে অভীষ্ট-সাধনে কৃতকার্য্য হয় নাই; পরন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া, ভারতবর্ষের প্রভাবের মধ্যেই তাহারা আত্মলীন হইয়াছিল। সে হিসাবে, সেই সকল আক্রমণকারী ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে পারে নাই, ভারতবর্ষই তাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছিল। তাহারা বিদেশী বিধর্ম্মী হইয়াও এমনভাবে ভারতের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইতে বাধ্য হইয়াছিল যে, শেষে তাহারা ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শুভক্ষণে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল; তাই শক, হুন প্রভৃতি দেশ-লুণ্ঠনকারী দুর্দ্ধর্ষ জাতিকেও বশীভূত হইতে হইয়াছিল। কণিষ্ক প্রভৃতির পরিবর্ত্তনের ইতিবৃত্ত ইতিহাস পাঠক কে না অবগত আছেন? ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া শকগণ ভারতের সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রবশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে ভারত-লুণ্ঠন করিতে আসিয়া, তাহারা আবার ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করিয়াছিল। কি কারণে কেন সে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়? কারণ—তখনও ভারতে ধর্ম্মভাবের প্রবল উন্মাদনা ছিল। সেই উন্মাদনার ফলে, শক, হুন প্রভৃতি জাতিরা, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনাদের পূর্ব্ব-পরিচয় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। আরবের আক্রমণকারী মুসলমানগণ যখন প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন

তাঁহারা তাই তাদৃশ সুবিধা করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্য-রূপ দীপ্ত-সূর্য্যের প্রচণ্ড প্রভায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মেতর ধর্ম্ম-রূপ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীকে পরিম্লান হইতে হইয়াছিল। সুতরাং তখন এক ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মস্তক উত্তোলন করিতে পারে নাই। ষষ্ঠ-শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে প্রবেশ-লাভ করিয়াও মুসলমানাধিপত্য তাই একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতে স্থায়িত্বলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে (৭১০-১১ খৃষ্টাব্দে) আরবগণ দ্বিতীয় বার সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। সেই আক্রমণকারীর নাম—মহম্মদ ইবন্ কাসিম। সিন্ধুদেশে তখন সাশের পুত্র দাহির রাজত্ব করিতেন। দাহির যদিও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন এবং যদিও পারিপার্শ্বিক ব্রাহ্মণগণ ও রাজপুতগণ তাঁহার রাজধানী রক্ষার জন্য দৃঢ়-ব্রত হইয়াছিলেন; কিন্তু তখন পশ্চিম ভারতে বিভিন্ন রাজশক্তির অভ্যুদয়ে তাঁহারা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ছিলেন। সুতরাং মুসলমান-গণের সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। ফলে, সিন্ধুদেশ আরবগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু অধিক দিন আরবগণ সে অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। বলিয়াছি তো, শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে আবার যখন ভারতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছিল, তখন হিন্দুগণ পুনরায় আপনাদের লুপ্তরাজ্য প্রণষ্ট-গৌরব উদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার পর, প্রায় সার্দ্ধ-দ্বিশতাব্দী কাল চেষ্টার উপর চেষ্টা করিয়াও মুসলমানগণ ভারতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রদীপ্ত প্রভাব তখন বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিল। পরিশেষে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল। তখন, আত্মকলহ, গৃহবিবাদ প্রভৃতি অধঃপতনের লক্ষণ-সমূহ প্রকাশ পাইয়াছিল। আর, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়াই, সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়াই ইস্‌লাম ধর্ম্মের অগ্নিকণা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যথাস্থানে তৎপ্রসঙ্গের আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে, সংক্ষেপে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তিকালের অষ্টম শতাব্দীর বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে। ভারতের বিভিন্ন অংশে রাজশক্তি তখন কিরূপ বিচ্ছিন্ন-ভাবে অবস্থিত ছিল, তাহাতে তাহা উপলব্ধি হইবে।

৭০৫ খৃষ্টাব্দ।—ধর্ম্মদেবের লোকান্তরের পর, লিচ্ছবী রাজবংশে এখন তৎপুত্র মানদেব রাজত্ব করিতেছিলেন। নেপালের পূর্ব্বাংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি ৭০৫ হইতে ৭৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

৭০৬ খৃষ্টাব্দ।—গুর্জ্জরে এখন তৃতীয় জয়ভট্ট রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি তৃতীয় দদ্দের পুত্র। ৭০৬ হইতে ৭৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

৭০৯ খৃষ্টাব্দ।—মধ্য-ভারতের মুলতাই প্রদেশ এখন রাষ্ট্রকূট-রাজবংশের শাসনাধীন। এ বংশের নন্দরাজ যুদ্ধাসুর এখন রাজত্ব করিতেছিলেন। পিতা স্বামিকরাজের সিংহাসন তিনি প্রাপ্ত হন। প্রাচ্য চৌলুক্য-রাজবংশে এ সময় কোক্কিলি নামা রাজা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয়

(৭০৫ খৃষ্টাব্দ) জয়সিংহের সিংহাসন তিনি লাভ করেন। তাঁহার ছয় মাস মাত্র রাজত্বের পর তাঁহার ভ্রাতা তৃতীয় বিষ্ণুবর্দ্ধন রাজা হইয়াছিলেন। ৭১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হয়।

৭১০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময় মহম্মদ ইবন্ কাসিম পরিচালিত আরবগণ সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। সিন্ধুরাজ দাহির নিহত ও রাজ্যভ্রষ্ট হন। সিন্ধুদেশ মুসলমানগণের করতলগত হয়। কেবল সিন্ধুদেশ বলিয়া নহে; এই সময় মুলতান প্রদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ভীষণ নরশোণিত-স্রোতে এ সময় ভারতবর্ষ ভাসমান হয়। এ সময় পহ্লব-রাজবংশে নন্দীবর্দ্ধন রাজত্ব করিতেছিলেন। কঞ্জেভরমে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি প্রাচ্য-চৌলুক্যরাজ তৃতীয় বিষ্ণুবর্দ্ধনকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। শবর-রাজ উদয়ন এবং নিষাদ-রাজ পৃথ্বী-ব্যাঘ্র তাঁহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হন। পহ্লব-রাজ নন্দীবর্দ্ধন পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৭১৩ খৃষ্টাব্দ।—এই সময় কাশ্মীরের কর্কোট-রাজ-বংশে বজ্রাদিত্য চন্দ্রাপীড় রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্যের পুত্র। ৭১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্ব-কাল। তাঁহার রাজত্বের পর উদয়াদিত্য, তারাপীড় ও ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

৭২০ খৃষ্টাব্দ।—অন্ধ্র-রাজ্যের পশ্চিমাংশে এই সময় বাণ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। জয়নন্দী বর্ম্মণ এই বংশের আদিভূত। তাঁহার পুত্র বিজয়াদিত্য, পৌত্র মল্লদেব, প্রপৌত্র বাণবিদ্যাধর এবং বাণবিদ্যাধরের পুত্র প্রভুমেরু প্রভৃতি এই বংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রভুমেরু 'দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য' নামেও পরিচিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য নামে, পৌত্র দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য নামে এবং প্রপৌত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত ছিলেন। এই বংশ ৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। এই বংশের প্রথম ও দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাণবিদ্যাধর নামে পরিচিত আছেন।

৭২২-২৪ খৃষ্টাব্দ।—এই সময় বহ্লবীর মৈত্রক রাজবংশে পঞ্চম শিলাদিত্য (চতুর্থ শিলাদিত্যের পুত্র) এবং পূর্ব্ব নেপালের লিচ্ছবী-রাজবংশে দ্বিতীয় শিবদেব রাজত্ব করিতেছিলেন। এই শিবদেব নরেন্দ্রদেবের পুত্র এবং উদয়দেবের বংশধর বলিয়া পরিচিত।

৭৩০ খৃষ্টাব্দ।—মগধে পরবর্ত্তী গুপ্ত-বংশে দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি বিষ্ণুগুপ্তের পুত্র। পশ্চিমের চৌলুক্যগণের করদ-রাজ-রূপে এ সময় (৭৩১ খৃষ্টাব্দে) গুজরাটে জয়াশ্রয় মঙ্গলার্ষ রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি চৌলুক্য-বংশীয় ধারাশ্রয় জয়সিংহ বর্ম্মণের পুত্র।

৭৩৩ খৃষ্টাব্দ।—বিজয়াদিত্যের পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য এ সময় পশ্চিমের চৌলুক্য-বংশে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি পহ্লবরাজ নন্দীবর্ম্মণকে পরাজিত করিয়া কঞ্জেভরম নগরে প্রবেশ করেন। পাণ্ড্য, চোল, কেরল এবং অন্যান্য রাজগণ তাঁহার আক্রমণে বিব্রত হইয়াছিলেন। চৌলুক্য রাজের এই আক্রমণে পহ্লবগণ হীনবল হওয়ায়, চোলগণ পুনরায় মস্তক উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৭৩৮ খৃষ্টাব্দ।—এই সময় পশ্চিমের চৌলুক্যগণের করদ নৃপতিরূপে গুজরাটে পুলকেশী রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি জয়সিংহ বর্ম্মণের পুত্র। আরবগণের আক্রমণে বাধা-প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সুযশ পরিকীর্ত্তিত হয়। এ সময়ে কোটা-রাজ্যে মৌর্য্য-বংশীয় যুবরাজ দাবল রাজত্ব করিতেছিলেন।

৭৪০ খৃষ্টাব্দ।—এ সময় কাশ্মীরে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্যের পুত্র। তাঁহার প্রভূত বাহুবলের পরিচয় পাওয়া যায়। হরিচন্দ্রের উত্তরাধিকারী কনোজরাজ যশোবর্ম্মণ তৎকর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। তুর্কগণের, তিব্বতীয়গণের এবং দরদগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। ঐ সকল জাতির অনুসরণে উত্তরদেশাভিমুখে অভিযান করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ৩৬ বৎসর ৭ মাস তাঁহার রাজত্ব-কাল। এতাদৃশ প্রতাপবান্ ললিতাদিত্য, কিন্তু বাঙ্গালী সৈন্যের নিকট হতমান হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী কর্ত্তৃক কাশ্মীর আক্রমণ—ইঁহার রাজত্ব-কালের এক প্রধান-ঘটনা। * তাঁহার দুই পুত্র; কুবলয়পীড় ও বজ্রাদিত্য বাপ্পিয়ক। তাঁহারা যথাক্রমে এক বৎসর ও সাত বৎসর রাজত্ব করেন। বজ্রাদিত্যের পুত্র পৃথিব্যাপীড় চারি বৎসর, সংগ্রামপীড় (প্রথম) সাত দিন মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে জয়াপীড় (৭৭৯ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যলাভ করেন। এ সময় পূর্ব্ব নেপালে লিচ্ছবী-রাজবংশে মানদেবের পুত্র মাহীদেব অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৭৪৩ খৃষ্টাব্দ।—এই সময় বাণরাজ কর্ত্তৃক গুজরাটে চাপোৎকট্-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বাণরাজ পঞ্চশরের জয়শেখরের পুত্র। এই সময় প্রাচ্য-চৌলুক্য রাজ-বংশে তৃতীয় বিষ্ণুবর্দ্ধনের পুত্র প্রথম বিজয়াদিত্য, এবং পশ্চিম-চৌলুক্য-বংশে দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মণ প্রতিষ্ঠিত হন। এই কীর্ত্তিবর্ম্মণই 'বাদামী' রাজবংশের শেষ নৃপতি। ইনি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পুত্র।

৭৫০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে মিবারে (মেওয়ারে) গুহিলবংশীয় রাজপুত্র বাপ্পারাও অধিষ্ঠিত ছিলেন। অধুনা-আবিষ্কৃত তিনটি খোদিত লিপিতে তাঁহার নামের পর নিম্নলিখিত রাজগণের নাম দৃষ্ট হয়; যথা,—গুহিল, ভোজ, শীল, কাল-ভোজ, মল্লত, ভর্ত্তি-ভট্ট, সিংহ, মহায়ক, খুম্মাণ, অল্লত ইত্যাদি। পাণ্ড্য-

* পৃথিবীর ইতিহাস চতুর্থ খণ্ডে ১৬১ পৃষ্ঠায় বাঙ্গালীর কাশ্মীর আক্রমণের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৭৫০ খৃষ্টাব্দ) রাজবংশে এ সময় তিবরদেব রাজত্ব করিতেন। উদয়ন-বংশোদ্ভব রাজা নান্নদেবের তিনি পোষ্যপুত্র বলিয়া পরিচিত। তিবর-দেবের এক ভ্রাতার নাম—চন্দ্রগুপ্ত। তাঁহার পুত্র হর্ষগুপ্ত এবং পৌত্র শিবগুপ্ত। উদয়নের বংশ ৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে ছত্রিশগড়ে (মধ্য-ভারতে) মহাসুদেব রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা মানমাত্র, পিতামহ—প্রসন্নার্ণব। বুন্দেলখণ্ডে ও মধ্য-ভারতে প্রথম প্রবরসেন কর্তৃক (৫৮০ খৃষ্টাব্দে) যে 'বকাতক' রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই বংশে এখন পৃথ্বীসেন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি, দ্বিতীয় প্রবরসেনের পৌত্র এবং নরেন্দ্রসেনের পুত্র। গঙ্গা-পহ্লব-বংশের প্রথম রাজা দন্তিবিক্রমবর্ম্মণ এই সময় প্রতিষ্ঠান্বিত হন। এই বংশের রাজন্যগণের মধ্যে নন্দীবিক্রমবর্ম্মণ (রাজত্ব-কাল ৬২ বৎসর), নৃপতুঙ্গ-বিক্রমবর্ম্মণ (২৬ বৎসর), অপরাজিত বিক্রমবর্ম্মণ (৮৭৭ খৃষ্টাব্দ), কম্পবিক্রমবর্ম্মণ (২৩ বৎসর), কন্দ-শিষ্য-বিক্রমবর্ম্মণ (১৪ বৎসর), নরসিংহ-বিক্রমবর্ম্মণ (২৪ বৎসর), ঈশ্বর-বর্ম্মণ (১৭ বৎসর) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কঞ্জেভরমের প্রাচীন পহ্লব-বংশের অবসানে এই বংশের অভ্যুত্থান হয়। এই সময় প্রথম শিবমাড় কর্তৃক তালকাড়ের পশ্চিম-গঙ্গাবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম শিবমাড়ের উত্তরাধিকারিগণ;—তাঁহার পুত্র শ্রীপুরুষ, তৎপুত্র রণবিক্রম, তৎপুত্র রাজমল্ল। এই সকল নৃপতি নামান্তরেও পরিচিত আছেন।

৭৫৪ খৃষ্টাব্দ।—এ সময় রাষ্ট্রকূট-রাজবংশে দ্বিতীয় দন্তিবর্ম্মণ অধিষ্ঠিত হন। পশ্চিম চৌলুক্য-বংশের দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মণকে পরাজিত করিয়া দন্তিবর্ম্মণ দাক্ষিণাত্যে একছত্র প্রভুত্ব লাভ করেন। কঞ্জেভরম, কোশল, কলিঙ্গ, শ্রীশৈল, মালয়, লাট এবং টঙ্ক প্রভৃতি দেশ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার পরবর্ত্তী নৃপতিগণের মধ্যে তাঁহার পিতৃব্য প্রথম কৃষ্ণরাজ এবং পুত্র প্রথম কাকরাজ প্রসিদ্ধ। এ সময় পূর্ব্ব-নেপালে লিচ্ছবী-রাজবংশে মাহীদেবের পুত্র বসন্তদেব রাজত্ব করিতেছিলেন।

৭৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দ।—রাষ্ট্র-কূট রাজ-প্রতিনিধি দ্বিতীয় কাকরাজ এ সময় গুজরাট প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। তিনি ধ্রুবরাজের পৌত্র এবং গোবিন্দরাজের পুত্র। রাষ্ট্রকূট-বংশীয় প্রথম কাকরাজের কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া ধ্রুবরাজ পরিচিত। লিচ্ছবি-রাজবংশে এখন দ্বিতীয় শিবদেবের পুত্র জয়দেব পরাচক্রকাম অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি হর্ষদেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। হর্ষদেব বঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। গৌড়, উৎকল, কলিঙ্গ, কোশল, প্রভৃতি রাজ্য বঙ্গাধিপ হর্ষদেবের অধিকারভুক্ত ছিল।

৭৬০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময় কনোজে প্রতীহার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। দেব-শক্তি এই বংশের আদিভূত। তিনি গুর্জ্জরের প্রতীহার-বংশোদ্ভব। রাজপুতানায়

(৭৬০ খৃষ্টাব্দ) অন্তর্গত ভীন্‌মল তাঁহার পূর্ব্ব রাজধানী ছিল। বল্লবীর মৈত্রক রাজবংশে এ সময়ে ষষ্ঠ শিলাদিত্য (পঞ্চম শিলাদিত্যের পুত্র) রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময়ে বঙ্গদেশে পালরাজগণের প্রতিষ্ঠার অঙ্কুর উদ্গত হয়। দয়িত-বিষ্ণু পালবংশের আদিপুরুষ বলিয়া কথিত হন। তাঁহার পুত্র বপ্যট্ট নামে পরিচিত, পৌত্র গোপাল (প্রথম) হাতহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন।

৭৬৪-৬৬ খৃষ্টাব্দ।—প্রাচ্য চৌলুক্য-বংশে এ সময় বিষ্ণুবর্দ্ধন অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রথম বিজয়াদিত্যের পুত্র। এ সময় তালকাড়ের পশ্চিম-গঙ্গাবংশে শ্রীপুরুষ (মুত্তারস) অধিষ্ঠিত হন। তিনি প্রথম শিবমাড়ের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়া রাজ্য-সীমা বিস্তার করেন। বল্লবীর মৈত্রক-রাজবংশে এ সময় সপ্তম শিলাদিত্য অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর, বল্লবীর মৈত্রক রাজ-বংশ প্রকারান্তরে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল। সে উচ্ছেদের কারণ—মুসলমান আক্রমণ। সিন্ধুদেশ হইতে আমর-ইবন-যামল্, মুসলমান-সেনা সহ বল্লবী রাজ্য আক্রমণ করিয়া, মৈত্রক-রাজবংশের প্রতিষ্ঠার মূলোৎপাটন করেন।

৭৭০ খৃষ্টাব্দ।—রাষ্ট্রকূট-রাজবংশে দ্বিতীয় গোবিন্দরাজ এখন অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৭৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি প্রথম কৃষ্ণরাজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। তিনি ভেঙ্গীর রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। পাণ্ড্যরাজ-বংশে এখন জটিলবর্ম্মণ রাজত্ব করিতেন। তিনি মাড়বর্ম্মণের পুত্র। তিনি মারাণ জাদৈয়ান নামে পরিচিত।

৭৭৯ খৃষ্টাব্দ।—বজ্রাদিত্যের পুত্র জয়াপীড় এখন কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৮০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সিংহাসনারোহণের পর তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকারের জন্য অভিযান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অবসর বুঝিয়া তাঁহার সম্বন্ধী যজ্ঞ কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। পরিশেষে তিনি সে সিংহাসন পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক কনোজ-রাজ বজ্রায়ুধ সিংহাসনচ্যুত হন।

৭৮০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে রাষ্ট্রকূট রাজবংশে ধ্রুবরাজ রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি ধোর বা ডোর নামে পরিচিত। আপন জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিতীয় গোবিন্দরাজকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া তিনি রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। প্রতীহার-বংশের বৎসরাজ এই ধ্রুবরাজের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। এই সময় দক্ষিণ-কোঙ্কণে শীলহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। সানফুল্ল ঐ রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথমে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের প্রথম কৃষ্ণরাজের আশ্রিত ছিলেন। ইঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে (পুত্র) ধাম্মিয়ার (পৌত্র) ঐয়াপ-রাজ, (প্রপৌত্র) প্রথম অবসর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এই বংশ ১০০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অবসরের পুত্র আদিত্যবর্ম্মণ, তৎপুত্র দ্বিতীয় অবসর, তৎপুত্র ইন্দ্ররাজ, তৎপুত্র ভীম, তৎপুত্র তৃতীয় অবসর,

(৭৮০ খৃষ্টাব্দ) তৎপুত্র রত্ত এই বংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১০০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বংশের প্রতিষ্ঠা ছিল। তখন ঐ বংশ পশ্চিম চৌলুক্যের সত্যাশ্রয় রাজগণের করদ নৃপতি মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

৭৯০ খৃষ্টাব্দ।—এ সময়ে ভীনমালের প্রতিহার রাজবংশে বৎসরাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন। পিতা দেবশক্তির মৃত্যুর পর ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যলাভ করেন। এ সময়ে কনোজে ইন্দ্রায়ুধ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণ।

৭৯৩ খৃষ্টাব্দ।—রাষ্ট্রকূট-রাজবংশে শঙ্করগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। হায়দ্রাবাদ তাঁহার রাজ্য ছিল। তিনি কাকরাজের পৌত্র এবং নান্নার পুত্র বলিয়া পরিচিত।

৭৯৫ খৃষ্টাব্দ।—রাষ্ট্রকূট রাজবংশে এখনও তৃতীয় গোবিন্দরাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রথম জগৎ-তুঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। পিতা ধ্রুবরাজের মৃত্যুর পর ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। স্তম্ভ বা কাম্বয় নামক তাঁহার এক ভ্রাতা, পারিপার্শ্বিক বার জন রাজপুত্রের সহিত চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা পান! কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফলে, গোবিন্দরাজ গুর্জ্জর, লাট, মালয়, কঞ্জেভরম, ভেঙ্গী প্রভৃতি রাজ্য বিধ্বস্ত করেন। প্রাচ্য চৌলুক্যগণের সহিত তাঁহার ঘোর যুদ্ধ চলিয়াছিল। গোবিন্দরাজ ৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে (৭৯৯ খৃষ্টাব্দে) প্রাচ্য চোলুক্য রাজবংশে দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি চতুর্থ বিষ্ণুবর্দ্ধনের পুত্র। তিনি গঙ্গা-বংশীয় এবং রাষ্ট্রকূট-বংশীয় রাজগণের সহিত বহু যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।

৮০০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময় মালবে প্রমার-বংশের অভ্যুদয় ঘটে। উপেন্দ্ররাজ (কৃষ্ণরাজ) ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশে বৈরীসিংহ (প্রথম), সিয়াক (প্রথম), বাক্‌পতিরাজ (প্রথম), বৈরীসিংহ (দ্বিতীয়); সিয়াক (দ্বিতীয়) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় বৈরীসিংহ 'বজ্রাট' নামে এবং দ্বিতীয় সিয়াক 'হর্ষ' নামে পরিচিত ছিলেন। রাষ্ট্রকূট রাজবংশ এখন মধ্য-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ঐ বংশের তাৎকালিক রাজার নাম জেজ্জা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কর্ণাট-দেশীয় সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করিয়া লাট-প্রদেশ (মধ্য ও দক্ষিণ গুজরাট) অধিকার করেন। এই সময় উত্তর কোঙ্কণে প্রথম কপর্দ্দিন কর্ত্তৃক শিলহার-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার পর, বঙ্গদেশে পাল-বংশের প্রচণ্ড প্রতাপ দৃষ্ট হয়। তখন ধর্ম্মপাল * গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ধর্ম্মপাল, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় আপন বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া কনোজ-রাজ্য অধিকার করেন। কনোজরাজ ইন্দ্রায়ুধ সিংহাসন-চ্যুত হন! চক্রায়ুধ (মহীপাল) কনোজের সিংহাসনে বঙ্গেশ্বরের করদরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

* ধর্ম্মপালের রাজ্যকাল ও প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। তবে, নবম শতাব্দীর

বঙ্গরাজ্য যখন গৌরবের উচ্চ-শিখরে সমাসীন, বঙ্গের প্রতাপ প্রভুত্ব যখন দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত; সেই সময়েই শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে জ্ঞানরাজ্যে তরুণ-অরুণের নবীন কিরণ প্রকাশ পাইয়াছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বহু

ধর্ম্ম সংঘর্ষে।

শতাব্দী-ব্যাপী সংঘর্ষের ফলে, দেশ-মধ্যে বিষম অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল; বাদ-প্রতিবাদের প্রগাঢ় কুহেলিকায়, জ্ঞান-রশ্মি আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যরূপ দিব্য জ্যোতিঃ-প্রভায় সে কুহেলিকা অপসৃত হইল;—অজ্ঞান-আঁধারাচ্ছন্ন জাতির জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিল। তখন, আবার দিকে দিকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের মহিমা বিঘোষিত হইতে লাগিল; তখন, আবার দিকে দিকে দেব-মন্দির-সমূহ মস্তক উত্তোলন করিল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের মধ্যে কলুষ-কল্পনা প্রবেশ করিয়া যে বিকৃতি আনয়ন করিয়াছিল, সে বিকৃতির অপসারণ আবশ্যক হওয়ায় বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন। তখন তাঁহার শুভ-সংকল্পের শুভ-ফল প্রত্যক্ষ করিয়া সংসার তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু কাল-বশে তাঁহার সে পুণ্য-পূত আদর্শ মানুষ ভুলিয়া গেল; হিতে বিপরীত ফল ফলিল। এক বিকৃতির সংস্কার-সাধন করিতে গিয়া বৌদ্ধগণ নূতন বিকৃতি আনয়ন করিলেন। তাহাতে দেশ আবার জ্ঞানহারা ধর্ম্মহারা হইল; সমাজে, ধর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে, ঘোর অনাচার উচ্ছৃঙ্খলা আনয়ন করিল। সেই অনাচার, সেই উচ্ছৃঙ্খলা দূর করিবার জন্যই শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের আবশ্যক হয়; নব-ধর্ম্মের নবীন উন্মাদনায় দেশ পুনরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, মহাপুরুষগণের শুভ উদ্দেশ্য শুভ উপদেশ মানুষ সম্যক অনুধাবন করিতে পারে না,—অধিক দিন স্মরণ রাখিতে সমর্থ হয় না। তাই পরিশেষে হতাশের তপ্ত-শ্বাসে তাহাদিগকে-জর্জ্জরীভূত হইতে হয়। শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের যে নবীন আলোক বিস্তার করিয়া ভারত-বাসীর হৃদয়ের অন্ধকার দূর করেন, কালবশে নানা অপধর্ম্মের কুহেলিকা আসিয়া সে আলোক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। যে তিমিরে আবার সেই তিমিরে সংসার আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। নানারূপ ধর্ম্ম-সংঘর্ষের মধ্যেও শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব প্রায় দুই শত বৎসর কাল ভারতে অক্ষুণ্ণ ছিল। শেষে প্রতিঘাতের উপর প্রতিঘাত আসিয়া সে শক্তি একেবারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

প্রারম্ভে তাঁহার যশঃ-জ্যোতি দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। খালিমপুরের খোদিত লিপিতে এবং গরুড়স্তম্ভ লিপিতে তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান। কোনও মতে ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, কোনও মতে ৮০০ খৃষ্টাব্দে, কোনও মতে ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপালের রাজত্ব-কাল নির্দ্দিষ্ট হয়। তিনি ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার, কীর এবং পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া খালিম-পুরের (ভাগলপুরের নিকটস্থ) লিপিতে লিখিত আছে। সেই লিপির মতে, ধর্ম্মপাল বত্রিশ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বিক্রমশিলার বিশ্ববিদ্যালয় ধর্ম্মপালের অক্ষয় কীর্ত্তি। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

——§ * §——

ভারতের প্রথম বৈদেশিক-সংশ্রব

[আলেকজাণ্ডারের অভিযান ;—বিভিন্ন পার্ব্বত্য-জাতির পরাজয় ;—তক্ষশিলার রাজার আনুগত্য-স্বীকার ;—সুহৃৎ-বিবাদ সূত্রে আলেকজাণ্ডারের ভারতে প্রবেশ ;—রাজা পোরস কর্তৃক আলেকজাণ্ডারের গতিরোধ ;—যুদ্ধ ও সন্ধি ;—আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্ত্তন,—ভারতের তাৎকালিক অবস্থা।]

আলেকজাণ্ডারের অভিযান।

পৃথিবীর যে দেশ যখনই শৌর্য্য-বীর্য্য-বিক্রমে শ্রেষ্ঠ-স্থান অধিকার করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল, সেই দেশ তখনই ভারতের প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়াছিল। সিসোষ্ট্রিস্, সেমিরামিস, দারায়ুস প্রভৃতির অভিযান—সেই লোভ-পরতন্ত্রতারই পরিচায়ক। তাঁহারা ভারতের ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি লোভপরবশ হইয়া, ভারতের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সংকল্প-সাধনে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অধিক বলিতে কি, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩২৬ অব্দের পূর্ব্বে—আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের পূর্ব্বে—বৈদেশিক কোনও শক্তি কখনও যে কোনরূপে ভারতের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, ইতিহাস কখনই সে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে নাই। পারস্য-সম্রাট দারায়ুসের ধনাগারে তাঁহার অধিকৃত ভারতীয় প্রদেশ হইতে কর-স্বরূপ সুবর্ণরাশি প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া প্রচার আছে বটে; কিন্তু মূল তত্ত্ব অনুসন্ধানে আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, দারায়ুসের অধিকৃত সে ভারত-সাম্রাজ্য কল্পিত সামগ্রী ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ভারতীয় নৃপতির অধিকৃত ভারত-সীমান্তে অবস্থিত কয়েকটি প্রদেশ দারায়ুসের অধিকারে আসিতে পারে; আর সেই সকল প্রদেশ হইতে তিনি আশাতীত সুবর্ণ-সম্পৎ উপহার পাইতে পারেন; কিন্তু তাহাতে ভারতের সীমানার মধ্যে আসিয়া তিনি যে কখনও সম্বন্ধ-স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। * সে সম্বন্ধ-স্থাপনের প্রথম নির্দ্দেশ—আলেক্জাণ্ডারের ভারত-আগমন। ডাইওনিসাস্, হিরাক্লেশ, সেমিরামিস প্রভৃতির ভারত-বিজয়ের কল্পনা-কুহক যখন আলেক্জাণ্ডারের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, বাক্ত্রিয়-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তখন ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য তিনি সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। ভারতবর্ষের সীমানা তখনও হিমালয়ের পরপারে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; বর্ত্তমান আফ্‌গনিস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশ-সমূহ তখনও ভারতবর্ষেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। ৩২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের বসন্ত-কালে, পার্ব্বত্য-পথের হিমাদ্রি-রাশি বিগলিত হইলে, আলেক্জাণ্ডার ভারতের দিকে অগ্রসর হন। তাঁহার সঙ্গে সেই সময়ে এক লক্ষ বিশ হাজার পদাতিক এবং পনের হাজার অশ্বারোহী

* "পৃথিবীর ইতিহাস" চতুর্থ খণ্ডে দারায়ুসের রাজ্য-সীমা সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সৈন্য সুসজ্জিত ছিল। সেই সৈন্যদলের মধ্যে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ষাট হাজার নির্দ্দিষ্ট হয়। অবশিষ্ট সৈন্য তিনি মধ্য-এসিয়ার পার্ব্বত্য-জাতিদিগের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের 'খাওয়াক' ও 'কাওশান' পার্ব্বত্য-পথদ্বয় অতিক্রম করিয়া তাঁহার সৈন্যদল প্রথমে 'কো-ই-দামন' নামক অধিত্যকা-প্রদেশে উপনীত হয়। * ঐ পার্ব্বত্য পথ অতিক্রমে আলেক্জাণ্ডারকে দশ দিন কাল অশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। বৈশাখের মধ্যভাগে (এপ্রেলের শেষে, মে মাসের প্রথমে) আলেক্জাণ্ডার সসৈন্যে ঐ অধিত্যকায় উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বাকৃত্রিয়ায় অবস্থিতি-কালে, দুই বৎসর পূর্ব্বে, আপনার নামানুসারে আলেক্জাণ্ডার সেই স্থানে 'আলেক্জান্দ্রিয়া' † নামে একটী নগর প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইলে ঐ নগর প্রথম বিশ্রাম-স্থান মধ্যে গণ্য হইবে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমে যিনি ঐ নগরের অধ্যক্ষ বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অভিযানকালে আলেক্জাণ্ডার তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া তৎস্থলে আপনার বন্ধু পারমেনিয়ানের পুত্র 'নিকানোরকে' শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত করেন; সঙ্গে সঙ্গে নগরের ও দুর্গের দৃঢ়তা সাধিত হয়। ঐ 'আলেকজান্দ্রিয়া' নগর তিনটী পার্ব্বত্য-পথের সঙ্গম-স্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং ঐ নগর তিন দিকের বাধা-বিপত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত গিরিপথ-ত্রিতয়ের পার্শ্বস্থিত এবং কোফেন বা কাবুল নদীর প্রবাহান্তর্গত প্রদেশ-সমূহের রাজস্বাদি সংগ্রহের ও শাসন-কর্ত্তৃত্বের ভার এই সময় 'টাইরিয়াস্পেস্' নামক জনৈক শাসনকর্ত্তার উপর ন্যস্ত হয়। তাঁহাকে 'সাত্রাপ' (শাসনকর্ত্তা) পদে নিযুক্ত করিয়া, আলেক্জাণ্ডার আপনার তাৎকালিক আধিপত্যের বিষয় উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। তখন, তিনি আরও একটু অগ্রসর হইবার চেষ্টা পান। এই সময়, কাবুল হইতে ভারতবর্ষে আসার পথে, বর্ত্তমান জেলালাবাদ সহরের পশ্চিমে 'নিকাইয়া' ‡ নগরে, আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদল উপস্থিত হয়। নিকাইয়া নগরে উপস্থিত হইয়া, আলেকজাণ্ডার আপন সৈন্যদলকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। হেফাইষ্টন্ ও পার্দিক্কাজ্ নামক তাঁহার দুই জন সেনাপতি প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য সহ একদিকে রওনা হন, আর আলেক্জাণ্ডার স্বয়ং অপরার্দ্ধ সৈন্যসহ অন্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেনাপতিদ্বয় সিন্ধুনদের অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য এবং 'পিউকে-

* এই দুই পার্ব্বত্য-পথের নির্দ্দেশ পামীর সীমান্ত কমিশনের রিপোর্টে (Vide, Holdich's *Report of the Pamir Commission*) দ্রষ্টব্য। 'খাওয়াক' পার্ব্বত্য পথের উচ্চতা ১৩,২০০ ফিট্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

† এই আলেক্জান্দ্রিয়া 'পারোপানিসাদাই' প্রদেশের বা ককেশশ্ পর্ব্বতের অন্তর্গত আলেকজান্দ্রিয়া বলিয়া পরিচিত। এখন ঐ নগরের স্থান-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। কাবুলের ত্রিশ মাইল উত্তরে ওপিয়ান বা হুপিয়ান নামক স্থানকে কেহ কেহ প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কেহ বা বামিয়ানকেও ঐ নগর বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন।

‡ নিকাইয়া সহরের অবস্থান সম্বন্ধেও মতান্তর আছে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ পূর্ব্বরূপ স্থানই নির্দ্দেশ করেন। ঐ প্রদেশের সর্দ্দারগণ এবং পিচ্ সহরের সুলতানগণ আপনাদিগকে আলেকজেন্দারের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। (Raverty, Notes on Afghanistan) তদনুসারেও ঐ স্থানই নির্দ্দিষ্ট হয়।

লাউতিস' (পুষ্কলাবতী) নগর অধিকারের জন্য আদিষ্ট হন। তাঁহারা কাবুল-নদীর উপত্যকাভিমুখে সৈন্যদল পরিচালন করিয়াছিলেন বলিয়াই পরিচয় পাওয়া যায়। * সেনাপতিদ্বয় যখন সসৈন্যে সিন্ধুনদ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সীমান্ত সর্দ্দারগণ অনেকেই অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু হস্তী (আস্তেজ) নামক জনৈক সর্দ্দার কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। ত্রিশ দিন তিনি নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। শেষে গ্রীকগণের প্রবল আক্রমণে সে নগর বিধ্বস্ত হয়। এই সময় তক্ষশিলার রাজা স্বেচ্ছায় আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন। সিন্ধু-নদের তীরে তক্ষশিলার ন্যায় সমৃদ্ধিশালিনী ও বহুজনপূর্ণা নগরী আর দ্বিতীয় ছিল না। সিন্ধুনদের পূর্ব্ব-পারে তাঁহার রাজধানী ছিল। তক্ষশিলার রাজা ইচ্ছা করিলে আলেক্‌জাণ্ডারের সেই বিপুল বাহিনীকে বিষম বাধা প্রদান করিতে পারিতেন। কিন্তু, বাধা দেওয়া দূরের কথা, আলেক্‌জাণ্ডারকে এবং তাঁহার সেনাপতিদ্বয়কে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেখা-দেখি, এক রাজা হস্তী ভিন্ন, সিন্ধুনদের পশ্চিম-পারের সর্দ্দারগণ প্রায় সকলেই আলেক্‌জাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন। তক্ষশিলার অধিপতির আর সেই সকল সর্দ্দারগণের সাহায্যে সেনাপতিদ্বয় সিন্ধুনদে নৌ-সেতু-নির্ম্মাণে সমর্থ হন। সেনাপতিদ্বয় যখন সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময় আলেকজাণ্ডার স্বয়ং কাবুল-নদীর উত্তর-তীরস্থিত দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য-জাতিগণকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন। সেই পার্ব্বত্য-বন্ধুর ক্ষেত্রে গ্রীষ্মে মার্ত্তণ্ডের খর-করে, শীতে হিমানির তীব্র দংশনে, অধিকন্তু পার্ব্বত্য-জাতির স্বাভাবিক রণোন্মাদনায়, আলেক্‌জেন্দারকে অনেক সময় বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অদম্য পরাক্রম কিছুতেই পরাভূত হয় নাই।

বিভিন্ন পার্ব্বত্য-জাতিকে দমন করিয়া, তত্তৎপ্রদেশে আপনার বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া, পাঁচ মাসের পর, আলেক্‌জেন্দার 'কুমার' বা 'চিত্রল' নদীর উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হন। এই উপত্যকায় একদল পার্ব্বত্য-জাতি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং তাহাদের বর্শাঘাতে আলেক্‌জেন্দার আহত হন। পার্ব্বতীয়গণের এবম্বিধ আক্রমণে আলেকজান্দারের সৈন্যগণ বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠে। ফলে, সেই পার্ব্বত্য নগরীর চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পায়; বন্দিগণ নৃশংসরূপে নিহত হয়। ইহার পর, আপনার সঙ্গের সৈন্যদলকে আলেকজেন্দার আবার দুই ভাগে বিভক্ত করেন। ক্রেটারোস নামক তাঁহার জনৈক বিশ্বস্ত সৈনিকের উপর একদলের সেনাপতিত্ব অর্পিত হয়। আর, আপনি অন্য দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। ক্রেটারোস পরিচালিত সৈন্যদল কুনার উপত্যকা অধিকারে নিযুক্ত হয়। আর আপনি স্বয়ং 'আস্পাসিয়ান' নামক পার্ব্বত্য-জাতিকে বিধ্বস্ত

ভারতের পথে।

* প্রাচীন কালে 'খাইবার পাস' গিরিসঙ্কটের বিষয় বোধ হয় পাশ্চত্য-জাতিরা অবগত ছিলেন না। গজনীর মামুদ প্রথমে ঐ পথে ভারতে আসেন। তার পর বাবর, হুমায়ুন প্রভৃতি ঐ পথে গতাগতি করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাদীর সা, আমেদ সা আবদালি এবং তাঁহার পৌত্র সা-ই-জমান ঐ পথে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারত প্রদেশের দ্বার সংক্রান্ত গ্রন্থে (Gates of India) এই মত প্রকাশিত।

করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আলেক্‌জেন্দার 'বাজৌর' উপত্যকায় উপনীত হন। এইখানে 'আরিগেইয়ন' নামে একটী নগর ছিল। আলেকজেন্দারের আগমনের সংবাদ পাইয়াই নগরবাসীরা নগরে অগ্নি-সংযোগ-পূর্ব্বক নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। বর্ত্তমান বাজৌর-প্রদেশের রাজধানী 'নওয়াগাই' নগরের সন্নিকটে ঐ নগরী বিদ্যমান ছিল বলিয়া এখন কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। আলেকজাণ্ডার যখন 'বাজৌর' উপত্যকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, 'কুনার' উপত্যকার কাজ শেষ করিয়া ক্রেটারোস সেই সময়ে তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হন। তখন পূর্ব্বভাগে অবস্থিত পার্ব্বত্য-জাতিদিগকে দমন করিবার জন্য একটা পরামর্শ হয়। ভারতবর্ষ অধিকার করিতে হইলে ঐ সকল পার্ব্বত্য-জাতিকে দমন করা তখন একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। এই সময় যে সকল পার্ব্বত্য জাতি আলেক-জান্দারের নিকট পরাজিত বা বশ্যতা-স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আস্পাসিয়ান-গণ, নইসার অধিবাসিগণ, আস্তাকেনোইগণ ও আওরনোজগণ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আস্পাসিয়ান-গণ দ্বিতীয় মহাসমরে পরাজিত হয়। অলেক্‌জেন্দার চল্লিশ সহস্র আস্পাসিয়ানকে বন্দী করেন। সেই সঙ্গে তাহাদের প্রায় আড়াই লক্ষ বলীবর্দ্দ বন্দী হইয়াছিল! সেই সকল বলীবর্দ্দের মধ্য হইতে উৎকৃষ্টতর কতকগুলিকে আলেক্‌-জেন্দার মাসিডোনীয়ায় কৃষিকার্য্যের জন্য প্রেরণ করেন। গ্রীস হইতে ভারত-সীমান্ত পর্য্যন্ত সৈন্যদলের ও রসদাদির গতিবিধির পথ যে তিনি প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে বেশ বুঝিতে পারা যায়। নাইসা-গণের রাজ্য যে প্রকারে আলেক্‌জেন্দারের অধিকারভুক্ত হয়, সে ঘটনা বড়ই কৌতূহলপ্রদ। ঐ রাজ্যের প্রধান নগর 'নাইসা' একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। সেই পাহাড়ের নিম্নে এক খর-স্রোতা নদী প্রবাহমান। সহসা সে নগর অধিকার করা দুঃসাধ্য হওয়ায় আলেক্‌জেন্দার বিষম উদ্বেগে পতিত হইলেন। তখন কি জানি কাহার চক্রান্ত বলে, চক্রান্ত বলিয়াই মনে হয়, নাইসার অধিবাসিগণ অলেক্‌জেন্দারের শরণাপন্ন হইয়া কহিল,—"আমরাও ডাইওনিসাসের বংশ-সম্ভূত; সুতরাং আমরা আপনার আত্মীয় স্থলাভিষিক্ত। গ্রীস-দেশের ন্যায় এ পর্ব্বত দ্রাক্ষাদি লতায় পরিশোভিত; অপিচ, 'মাউণ্ট-মেরোজের' * ন্যায় এখানেও ত্রিচূড় পর্ব্বত অবস্থিত।" এই বলিয়া, অত্মীয়তা জানাইয়া, 'নাইসা'-বাসিগণ যখন আলেক্‌জাণ্ডারের শরণাপন্ন হইল, তখন আলেক্‌জাণ্ডার আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। রণশ্রমে সৈন্যগণ কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং, এই সুযোগে কিছুদিন বিশ্রামের জন্য নাইসা-বাসিগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া আলেক্‌জাণ্ডার আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাইয়া লইলেন। এই নাইসাবাসিগণ আলেক্‌জাণ্ডারের সৈন্যদলে মিলিত হইয়া, পরবর্ত্তিকালে ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

* সুয়াত বা স্বাত উপত্যকায় 'কো-ই-মোর' পর্ব্বত-শৃঙ্গকে 'মেরোজ' (Meros) বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান হয়। 'কো-ই-মোর' পর্ব্বত-শৃঙ্গের নিম্নতম অংশে নাইসা-নগরী অবস্থিত ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন।

করিয়াছিল। নাইসাবাসিগণের সহিত মিত্রতা-স্থাপনের পর আলেক্‌জাণ্ডারকে 'আস্তা-কেনোই' পার্ব্বত্য-জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ঐ জাতির অধীনে বিশ সহস্র অশ্বারোহী, ত্রিশ সহস্র পদাতি এবং ত্রিশটি হস্তী যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল। তাহাদের রাজধানী 'মাস্তাগা' * সুরক্ষিত অবস্থায় আলেক্‌জাণ্ডারকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হয়। কয়েক দিন ঘোর যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে অনেক সময় আলেক্‌জাণ্ডার প্রাণ-সংশয় বিপদে পতিত হন। কিন্তু পরিশেষে ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করেন। সহসা বিপক্ষের বিক্ষিপ্ত অস্ত্র আসিয়া সর্দ্দারকে ভূতলশায়ী করে। সঙ্গে সঙ্গে নগররক্ষকগণ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। আলেক্‌জাণ্ডার নগরী অধিকার করিয়া বসেন। এই বিজয়-ব্যাপারে আলেক্‌জাণ্ডারের এক কলঙ্ক-কাহিনী ইতিহাসের অঙ্ক কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। আস্তাকেনোই-গণ নগর-রক্ষার জন্য ভারতবর্ষ হইতে সাত সহস্র বেতন-ভোগী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনাইয়াছিল। আলেক্‌জাণ্ডার কৌশলে তাহাদিগকে হস্তগত করেন। তাহারা তাঁহার বেতন-ভোগী সৈন্য-রূপে বিদেশ-জয়ে অঙ্গীকার করে। কিন্তু 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্‌' নীতির অনুসরণে আলেক্‌জাণ্ডার তাহাদের দ্বারাই ভারতবর্ষ অধিকারের চেষ্টা পান। সৈন্যদল সে প্রস্তাবে অসম্মত হয়। তখন আলেক্‌জাণ্ডার হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সংহার-সাধন করেন। সে ঘটনা বড়ই লোমহর্ষক। সেই বেতনভুক সৈনিকগণ আলেক্‌জাণ্ডারের শিবিরের প্রায় চারি পাঁচ ক্রোশ দূরে পুত্র-কলত্র লইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। সেই অবস্থায় আলেক্‌জাণ্ডার হঠাৎ গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। তাহাতে স্ত্রী-পুত্রদিগকে মধ্য-স্থলে রক্ষা করিয়া, বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া সৈনিক-পুরুষগণ যেরূপভাবে আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত যুদ্ধে প্রাণ-দান করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে অতি-বড় পাষণ্ডের নয়নও বিগলিত হয়। মাস্তাগা রাজধানী অধিকারের পর আলেক্‌জাণ্ডার 'আওরনোজ'-গণের রাজ্য অধিকার করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হন। ঐ রাজ্য বর্ত্তমান পেশোয়ারের উত্তর-পশ্চিমে সত্তর মাইল দূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এখন ঐ প্রদেশ 'মাহাবান' বলিয়া পরিচিত। যে সময় 'আওরনোজ' আক্রমণের জন্য আলেক্‌জাণ্ডার বদ্ধপরিকর হন, সেই সময়ে 'পিউ-কেলাওতিস' তাঁহার বশ্যতা-স্বীকার করে। সুয়াত ও বুনার পর্ব্বতের অন্তর্গত ওরা, মাস্তাগা, বাজিরা ও ওরবাতি প্রভৃতি নগরে সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক আলেক্‌জাণ্ডার 'আওরনোজ' জাতিকে পরাভূত করেন। সিন্ধু-নদের তীরে এম্বোলিমা নামে তাহাদের যে নগর ছিল, সেই নগর অনেক কষ্টে আলেক্‌জাণ্ডারের অধিকারভুক্ত হয়। পরিশেষে, তিনি ডার্টা নামক আর একটি নগর অধিকার করেন। এইরূপে পার্ব্বত্য-জাতিগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া, আলেক্‌জাণ্ডার সিন্ধুনদের অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা পান। পার্ব্বত্য-জাতিকে বিধ্বস্ত করার সময়, তিনি যে সকল সৈনিকপুরুষের সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একজন হিন্দুর সহায়তা-প্রাপ্তির কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই হিন্দু-সৈনিক-পুরুষ 'শিশিকোট্টাস' † নামে পরিচিত।

* স্বাত-প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী "মান্নাওয়ার" ঐ নামে অভিহিত ছিল বলিয়া বুঝা যায়।

† ভিন্সেণ্ট স্মিথ এই 'শিশিকোট্টাসকে' শশী গুপ্ত নামে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। 'সান্ড্রোকোটাস' হইতে চন্দ্রগুপ্ত নামের সূচনা দেখিয়াই তাঁহার ঐরূপ সিদ্ধান্ত, মনে করা যাইতে পারে।

সিন্ধুনদ অতিক্রমে।

পারিপার্শ্বিক পার্ব্বত্য-জাতিগণকে বশীভূত করিয়া, আলেক্‌জাণ্ডার সিন্ধুনদ অতিক্রম করিবার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করেন। আলেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণের ভয়ে, 'আস্তাকেনিয়ান' ও 'আওগনোজ' প্রভৃতি পার্ব্বত্য-জাতিগণ অনেকেই সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া পরপারে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। 'হাইডাস্‌পেস' (ঝিলাম বা বিতস্তা) ও 'আকেসাইনেজ' (চিনাব বা চন্দ্রভাগা) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে 'অভিসার' নামে এক জনপদ ছিল। পলাতক পার্ব্বত্য-জাতিগণ সিন্ধু পারে সেই রাজ্যে আসিয়া, আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদের অনুসরণে অগ্রসর হইয়া, এক জঙ্গলের মধ্য দিয়া, অলেক্‌জাণ্ডার সিন্ধুনদ অতিক্রমের ব্যবস্থা করেন। আরণ্য-পথে অগ্রসর হইয়া, নৌ-সেতুর সাহায্যে যে স্থানে আলেক্‌জাণ্ডার সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন, সে স্থান 'ওহিন্দ' নামে পরিচিত। বর্ত্তমান আটক সহরের আট ক্রোশ উত্তরে ওহিন্দ চিহ্নিত হয়। সিন্ধুনদের পরপারে উপনীত হইয়া, আলেক্‌জাণ্ডার আপনাদের দেব-দেবীর পূজা প্রদান করেন। সেই উপলক্ষে এবং আনন্দ-উৎসবে প্রায় এক মাস কাল সৈন্যদিগকে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে দেন। ৩২৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে (জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসে) তিনি ওহিন্দ নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইখানে তক্ষশিলার রাজদূত আসিয়া, আলেক্‌জাণ্ডারের সম্বর্দ্ধনা করেন। তক্ষশিলার তাৎকালিক নৃপতির নাম—'অম্ফিস্' * বলিয়া লিখিত আছে। ইঁহারই পিতা ইতিপূর্ব্বে নিকাইয়া নগরে গিয়া, আলেক্‌জাণ্ডারের নিকট বশ্যতা-স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন। পিতার লোকান্তরের পর, পুত্র এখন পিতার পদাঙ্কই অনুসরণ করিলেন। এই উপলক্ষে উপঢৌকন-স্বরূপ সাত শত অশ্ব, ত্রিশটী হস্তী, তিন সহস্র বলীবর্দ্দ, দশ সহস্র মেষ এবং স্বর্ণ-রৌপ্য আদি বহু মূল্যবান সামগ্রী তক্ষশিলার রাজার নিকট হইতে, আলেক্‌জাণ্ডারের শিবিরে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই সময় তক্ষশিলার রাজার সহিত পারিপার্শ্বিক দুই জন রাজার বিরোধ চলিতেছিল; তাঁহাদের মধ্যে অভিসার-রাজ্যের অধিপতি এবং 'পোরস' (পৌরব) বিশেষ প্রতাপশালী ছিলেন। † প্রধানতঃ ঐ দুই প্রতিপক্ষ নৃপতিকে দমন করিবার জন্যই, তক্ষশিলার রাজা অম্ফিস্ আলেক্‌জাণ্ডারের আনুগত্য-স্বীকার করিয়াছিলেন। এই গৃহ-শত্রুর সাহায্য পাইয়াই আলেক্‌জাণ্ডার ভারতবর্ষের সীমানায় পদার্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তক্ষশিলার রাজা সহায় না হইলে সিন্ধুনদের পরপারে আগমন যে সঙ্কটাপন্ন হইত, তাহা কেহই অস্বীকার

* প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিৎ সিল্‌ভেন লেভি ঐ নাম হইতে 'আম্ভি' নামের উৎপত্তি-সাধন করিয়াছেন। কিন্তু দুইরূপ উচ্চারণই সন্দেহজনক। হিন্দু-নৃপতির নাম উচ্চারণের দোষে উভয়ত্রই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

† অভিসার-রাজ্যের এবং রাজা পোরসের নাম ও রাজ্য-সীমা সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে তক্ষশিলার রাজার নাম সম্বন্ধেও মতান্তর দেখিতে পাই। পুরু-বংশীয় বা পৌরব নামা কোনও নৃপতি গ্রীকদিগের উচ্চারণে পোরস নাম পরিগ্রহ করিয়াছেন, মনে হইতে পারে। তাঁহার রাজ্য-সীমা 'হাইড্রাসপেস' হইতে 'আকেসাইনেজ' নদী পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয়। সে হিসাবে এবং প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণা প্রভাবে বর্ত্তমান ঝিলাম, গুজরাট এবং সাহাপুর জেলা প্রভৃতি পোরসের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অভিসার রাজ্য রাজাপুরী বা রাজৌরী বলিয়া পরিকল্পিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান রাওলপিণ্ডী সহরের উত্তর-পশ্চিমে তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ অধুনা চিহ্নিত হয়।

করিতে পারিবেন না। আলেক্‌জাণ্ডারের আগমনের পূর্ব্বে কখনও কোনও বৈদেশিক সিন্ধুনদ পার হইয়া, ভারতে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। তক্ষশিলার অধিপতির সাহায্যেই এই অঘটন সংঘটন হইয়াছিল। দূতমুখে নৃপতির আনুগত্যের সংবাদ পাইয়া, হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে আলেক্‌জাণ্ডার তক্ষশিলার অভিমুখে অগ্রসর হন। নগরে উপনীত হইবার দুই তিন ক্রোশ অবশিষ্ট আছে; এমন সময় আলেকজাণ্ডার দেখিতে পাইলেন, তক্ষশিলার সৈন্যদল তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মন বড় সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হইল। বুঝি বা, মিত্রতার ভাণ করিয়া, তক্ষশিলার অধিপতি তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধন করিতে আসিতেছেন। সন্দেহ আলেক্‌জেন্দারকেও রণসাজে সজ্জিত করিল। তখন বিষম প্রমাদ গণিয়া, রাজা অম্ফিস কয়েকটী মাত্র শরীর-রক্ষক সঙ্গে লইয়া, দ্রুতগতি আলেকজেণ্ডারের সম্মুখীন হইলেন। সকল সংশয় দূরীভূত হইল। সৌহার্দ্দ্যের প্রবল বাত্যায় অবিশ্বাসের গাঢ় মেঘ উড়িয়া গেল। রাজা বুঝাইলেন, আলেক্‌জেন্দারের অভ্যর্থনার জন্যই সৈন্যদল উপস্থিত হইয়াছে। তখন, আনন্দের সহস্রধারা প্রবাহিত হইল, দান-প্রতিদানের উৎস ছুটিল। আলেকজেণ্ডারও অশেষ ধন-রত্ন দানে তক্ষশিলার রাজাকে পরিতুষ্ট করিলেন। তক্ষশিলাধিপতি বিনিময়ে আলেক্‌জেণ্ডারের চরণে আত্ম-বিক্রয় করিলেন।

তক্ষশিলার রাজা কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া, আলেক্‌জেণ্ডার কিছুদিন সসৈন্যে তক্ষশিলায় অবস্থান পূর্ব্বক বিশ্রাম-লাভ করেন। তাঁহার বল-বিক্রমের বিষয় চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হয়।

পোরসের সহিত যুদ্ধ।

অভিসারের রাজা, তক্ষশিলায় আসিয়া, এই সময় আলেক্‌জেণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন। আলেকজেণ্ডার মনে করিয়াছিলেন, রাজা পোরসও ভয় পাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার সে ধারণা ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সংবাদ আসিল,—রাজা পোরস তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য রণসাজে সজ্জিত হইতেছেন। হাইডাস্‌পেস (ঝিলাম) নদীর তীরে পোরসের সৈন্যদল সুসজ্জিত ছিল। তক্ষশিলা হইতে (হাইডাস্‌পেস-তীরস্থিত) ঝিলাম নগর দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল। অতি কষ্টে, এক পক্ষ কাল দারুণ উদ্বেগ সহ্য করিয়া, আলেক্‌জেন্দারের সৈন্যদল সেই ঝিলামে উপস্থিত হয়। গ্রীষ্মের খর-করতাপে তখন পার্ব্বতীয় তুহিন-রাশি দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; প্রাবৃটের জল-কল্লোলে পূর্ণতোয়া নদী প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সুতরাং, সে সময় আলেক্‌জেন্দার সহসা নদী উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। পরন্তু, সংবাদ পাইলেন, নদীর পরপারে পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য সহ রাজা পোরস তাঁহার আক্রমণে বাধা দিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুতরাং বুঝিলেন, সে সময় যদি সেই পথে একমাত্র তাঁহার আশা-ভরসা-স্থল অশ্বারোহী সৈন্যদল নদী পার হয়, তাহাতে দারুণ বিপদের আশঙ্কা আছে। এই হেতু, আলেক্‌জেন্দার একটা কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন। মে মাসের প্রথমে তিনি নদীর তীরে উপস্থিত হন। অক্টোবর-নবেম্বরে নদীর জল কমিবার সম্ভাবনা। নদীর জল না কমিলে, পারাপার অসাধ্য; অপিচ, পারাপারের উপযোগী নৌ-বহরও প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং পারাপারে বিলম্ব আছে—এই কথা

প্রচার করিয়া, তিনি ছলনায় কিছুকাল গয়ংগচ্ছ করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে বিপক্ষের বলাবল পরীক্ষা করিবার জন্য এবং কত দূরে কোন্ অংশে সৈন্যদল পার করাইলে বিপদের আশঙ্কা অল্প—তাহার অনুসন্ধানে, প্রবৃত্ত হইলেন। আলেক্‌জেন্দার বর্ষাপগমে নদী পার হইবেন, পোরসের সৈন্যদল-মধ্যে কৌশলে সেই কথা প্রচার করা হইল; এদিকে নদীর অন্য এক অরক্ষিত অংশ দিয়া গোপনে গোপনে সৈন্যদল পার করাইয়া লইবেন, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। নদী-তীরে নিকটে দুর্ভেদ্য অরণ্য ছিল; আর সেই অরণ্যের পার্শ্বে নদী-প্রবাহ-মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের সঞ্চার হইয়াছিল। গোপনে গোপনে সেই বনপথ দিয়া, আলেকজেণ্ডার সৈন্য-পরিচালনের বন্দোবস্ত করিলেন। পরপারে, যেখানে পোরসের সৈন্যদল অবস্থিত ছিল, তাহার ষোল মাইল উত্তরস্থিত আরণ্য-পথ দিয়া আলেক্‌জেন্দার নিশিযোগে নদী পার হইলেন। কোন্ পথে, কখন মাসিডোনীয় সৈন্যদল নদী উত্তীর্ণ হইবে—তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, অধিকন্তু বর্ষার পর সৈন্যদল অগ্রসর হইবে—এই ছলনায় ভুলিয়া, রাজা পোরস সকল দিকে সমানভাবে দৃষ্টি রাখিতে পারিলেন না। এই সুযোগে অকস্মাৎ একদিন রাত্রিযোগে নদীপার হইয়া, আলেক্‌জেন্দার তাঁহার রাজ্য আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। পোরসকে বড়ই বিব্রত হইতে হইল। শত্রুদলের নদী-পারের সংবাদ পাইয়া, পোরসের পুত্র তাঁহাদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তখন মাত্র দুই সহস্র অশ্বারোহী এবং এক শত কুড়ি খানি যুদ্ধ-শকট ছিল; আর আলেক্‌জেন্দারের সঙ্গে প্রায় দ্বাদশ সহস্র বাছা বাছা সৈন্য সুসজ্জিত ছিল। সুতরাং সে প্রতিরোধের যে ফল অবশ্যম্ভাবী, তাহাই সংঘটিত হইয়াছিল। যখন আলেক্‌জেন্দারের সহিত যুদ্ধে পুত্রের পরাজয়-বার্ত্তা পোরসের নিকট উপস্থিত হয়, তখন পোরসের শিবিরের পরপারে সেনাপতি ক্রেটারোস সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু তাহা না জানিতে পারিয়া, ক্রেটারোসকে বাধা দিবার জন্য কতক সৈন্য রাখিয়া, আলেক্‌জেন্দারকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে, পোরস অগ্রসর হন। আলেক্‌জেন্দারকে বাধা দিবার পক্ষে রাজা পোরসের আয়োজন বড় অল্প ছিল না;—দুই শত ভীষণ হস্তী এবং ত্রিশ সহস্র পদাতিক-সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিল। ডায়ডোরাসের বর্ণনায় প্রকাশ,—যেন দুর্গ-প্রাকার-সমন্বিত একটী বিশাল নগরী আলেক্‌জেন্দারকে গ্রাস করিতে ধাবিত হইয়াছিল। এক শত ফিট্ অন্তরে এক একটী হস্তী এবং তাহার মধ্যস্থলে সৈন্যদল—এইরূপ শ্রেণিবদ্ধ-ভাবে পোরসের বাহিনী যখন অগ্রসর হইয়াছিল, তখন সুসজ্জিত হস্তিগুলিকে দুর্গ-চূড়া এবং তৎপশ্চাতে অবস্থিত সৈন্যদলকে নগর-প্রাকার বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। * কিন্তু আলেক্‌জেন্দারের চক্রান্তের নিকট সকলই ব্যর্থ হইল। বিধাতার কি নির্ব্বন্ধ! জয়লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও বিধির বিপাকে পোরস পর্য্যুদস্ত

* The Indian army presented 'very much the appearance of a city the elephants as they stood resembling its towers, and the men-at-arms placed between them resembling the lines of wall intervening between tower and tower:"—*Diodorus* as quoted in *Vincent Smith's* Early History of India.

হইলেন। পোরস-পরিচালিত সৈন্যদলের আগমন লক্ষ্য করিয়া আলেক্‌জেন্দার আপন সৈন্যদলকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তখন, যুগপৎ পোরসের সৈন্যদলের বামপার্শ্ব ও দক্ষিণপার্শ্ব আক্রান্ত হইল। এদিকে ক্রেটারোশ পরিচালিত সৈন্য-দল নদী পার হইয়া আসিয়া আলেক্‌জেন্দারের সাহায্যার্থ যোগদান করিল। পোরস প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। এক এক বার মনে হইল, যেন বিজয়লক্ষ্মী পোরসেরই অঙ্কশায়িনী হইলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার সকল আশা-ভরসা লোপ পাইল। সারাদিন যুদ্ধের পর তাঁহার দক্ষিণ বাহু গুরুতর আঘাতে আহত হইল। যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন, পোরসের সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু সহসা আততায়িদল তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। এই ভীষণ যুদ্ধে পোরসের পক্ষে দ্বাদশ-সহস্রাধিক সৈন্য নিহত এবং নয় সহস্র সৈন্য বন্দী হয়। আলেক্‌জেন্দারের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ৭০০ পদাতিক ও ২৩০ জন অশ্বারোহী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। পোরসের বীরত্ব-দর্শনে, আলেক্‌জেন্দার বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ, তক্ষশিলার দুই জন রাজ-প্রতিনিধি তাঁহাকে আত্মসমর্পণের জন্য অনুরোধ করিলে, পোরস যে ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি আলেক্‌জেন্দারের মনে বিশেষ শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল। সেইজন্য, পোরস জীবন লাভ করিলে, আলেক্‌জেন্দার তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে যুদ্ধে পোরস আহত ও বন্দী হন, সেই কাল-সমরে পোরসের প্রাণাধিক তিন পুত্র জীবন বিসর্জ্জন দেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পোরস মস্তক অবনত করিতে সম্মত হন নাই। গ্রীক্-বীর যখন তাঁহাকে বশ্যতা-স্বীকারের জন্য জিদ্ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—'এখনও বল, তুমি কি চাও?' পোরস গম্ভীরভাবে মস্তক উত্তোলন করিয়া উত্তর দেন,—'আমি রাজার ন্যায় ব্যবহার চাই।' আলেক্‌জেন্দার তাঁহার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহারই করিয়াছিলেন। বীরত্বের পুরস্কার-স্বরূপ শত্রুর নিকট হইতে পোরস আপন রাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন; অপিচ, আলেক্‌জেন্দার আপন জয়-লব্ধ রাজ্যের অনেক অংশ তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে সহৃদয়তা অপেক্ষা আলেকজাণ্ডারের কূট-রাজনীতি-কৌশলেরই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। পোরসের ন্যায় একজন বীরপুরুষ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে মঙ্গলের আশা আছে—প্রধানতঃ এই মনে করিয়াই, আলেকজাণ্ডার পোরসের সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পোরস অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। আলেক্‌জেন্দারের সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তিনিও শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া বিজয়ী বীরের প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ হন নাই। পোরসের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ আলেক্‌জেন্দার ঐ অঞ্চলে দুইটী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।* সেই দুই নগরীর একটীর নাম নিসিয়া (নিকাইয়া), অন্য নগরীর নাম—বুস্‌ফালা (বুকৈফালা)। যে ক্ষেত্রে পোরস পরাজিত হন, সেই স্থানে নিসিয়া নগরী এবং হাইডাসপেস

* এই যুদ্ধ-জয়ের আর এক নিদর্শন—এক প্রকার পদক—আবিষ্কৃত হইয়াছে। কথিত হয়, আলেক্‌জেন্দার আপন সৈন্যদলে ঐ পদক পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ পদকের একটী বিলাতের 'ব্রিটিশ্-মিউজিয়ম' যাদুঘরে রক্ষিত আছে। পদকের একদিকে বজ্রধারী আলেক্‌জেন্দার পারস্য-দেশীয় শিরস্ত্রাণে সুশোভিত হইয়া দণ্ডায়মান আছেন, আর অপর দিকে অশ্বারোহী সৈন্য কর্ত্তৃক গজারোহী-সৈন্য আক্রান্ত হইয়াছে।

নদীর দক্ষিণ তীরে, তাঁহার পারাপারের স্থানে, বুস্‌ফালা নগরী স্থাপিত হইয়াছিল। কথিত হয়, আলেক্‌জান্দার যে ঘোটকে আরোহণ করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হন, ঐ নদীর তীরে সেই ঘোটকের মৃত্যু হয়; আর তাহারই নামানুসারে বুস্‌ফালা নগরীর নামকরণ হইয়াছিল। এখন আর ঐ দুই নগরীর চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে 'কারী' পার্ব্বত্য-প্রদেশের দক্ষিণে, সুখচইনপুর গ্রামের নিকটে, যুদ্ধক্ষেত্র পরিচিহ্নিত হয় বলিয়া উহারই নিকট নিসিয়া অবস্থিত ছিল মনে করা যাইতে পারে।

সঙ্গোলার যুদ্ধ।

পোরসের রাজ্যে কিছুকাল বিশ্রামের পর, আলেক্‌জেন্দার উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হন। তখন যে জনপদ প্রথমে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে, সেই জনপদ 'গ্নাউসে' বা 'গ্নাউকেনিসি' নামে অভিহিত হয়। ঐ জনপদে বহু নগর ও বহু লোক ছিল। আলেক্‌জেন্দারের নাম শ্রবণেই গ্নাউসে-বাসিগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। সাঁইত্রিশটী নগর ও বহু গ্রাম-সমন্বিত সেই জনপদ অধিকার করিয়া, আলেক্‌জেন্দার পোরসের উপর তাহার শাসনভার অর্পণ করিলেন। ইহার পর, অভিসারের রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। পোরসের এক ভ্রাতুষ্পুত্র 'গান্দারিস'-দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পিতৃব্যের সম্মান-দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া, প্রথমে তিনি আলেক্‌জেন্দারের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু শেষে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে আলেক্‌জেন্দারের শরণ লইতে হয়। যাহা হউক, পোরসের আত্মীয় বলিয়া শেষে তিনি আলেক্‌-জেন্দারের অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। ইহার পর, আলেক্‌জেন্দার আকেসাইনেস (চিনাব) ও হাইড্রাওটিস (রাভী) নদীদ্বয় উত্তীর্ণ হন। এইখানে মাল্লী (মাল্লে) প্রভৃতি তিনটী ক্ষমতাশালী রাজ্য একজোট হইয়া আলেক্‌জেন্দারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। এই বাধায় আলেক্‌জেণ্ডারকে একটু দক্ষিণ দিকে হটিয়া যাইতে হইয়াছিল। সেইদিকে সঙ্গোলা নামে এক সুরক্ষিত নগর ছিল। ঐ নগর বর্ত্তমান লাহোর ও মুলতানের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পরিচিহ্নিত হইয়া থাকে। সঙ্গোলার সন্নিকটে আলেক্‌জেন্দার বিষম বাধা প্রাপ্ত হন। কিন্তু আলেক্‌জেন্দারের প্রধান সহায়-রূপে পাঁচ সহস্রাধিক সৈন্য ও হস্তী প্রভৃতি লইয়া, পোরস যখন তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হন, তখন সঙ্গোলার সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। এই যুদ্ধে আলেক্‌জেন্দারের শত-সংখ্যক সৈন্য নিহত এবং দ্বাদশ শত সৈন্য আহত হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে সঙ্গোলার যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়।* পোরসের বীরত্ব-দর্শনে, আলেক্‌জেন্দার তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন; কিন্তু সঙ্গোলায় তাঁহার মতিভ্রম ঘটিয়াছিল। কেবল সঙ্গোলায় বলিয়া নহে; পোরস ভিন্ন আলেকজাণ্ডারকে যে কেহ যখনই বাধা দিয়াছিল, আলেকজাণ্ডার তাহাদের সম্পূর্ণরূপ উচ্ছেদসাধন না করিয়া নিরস্ত হন নাই। বীরত্বের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের মহত্ত্ব বুঝি এক পোরসেই পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। সঙ্গোলার যুদ্ধে জয়লাভের পর আলেক্‌জাণ্ডার সঙ্গোলা নগরের উচ্ছেদ-

* এ সম্বন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিকের উক্তি—"He (Alexander) disgraced himself by horrible massacre, in which neither age nor sex was spared." *Vide*, Beveridge, *History of India*.

সাধন করেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বালিকা—সঙ্গোলার কাল-সমরে আলেক্‌জেন্দারের মুক্ত-কৃপাণ-মুখে কেহই প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই ভীষণ নরহত্যায় আলেক্‌জেন্দারের হস্ত যেরূপভাবে কলুষিত হইয়াছিল, ইতিহাসের অঙ্কে রক্ত-রাগে তাহা রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

স্বদেশ-যাত্রার আয়োজন।

সঙ্গোলার ভীষণ সমরে জয়লাভের পর, আলেক্‌জাণ্ডার সিন্ধুনদের অপর শাখা 'হাইফাসিস' (বিয়াস) পার হইবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ নদীর পরপারে ধন-ধান্য-সমন্বিত ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে গরীয়ান জনপদ-সমূহ বিদ্যমান ছিল। আলেকজাণ্ডার বড় আশা করিয়াছিলেন, নদী পার হইতে পারিলে তাঁহার আট-বৎসর-ব্যাপী প্রাণ-সঙ্কট পরিশ্রমের সুফল হাতে হাতে লাভ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার পক্ষে এক প্রবল অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না। সেনাপতি কৈনোজ, প্রধানতঃ যাঁহার বাহুবলে তিনি অমিত-বিক্রম পোরসকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—সেই কৈনোজ, তাঁহার প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিলেন। যে সকল গ্রীক ও মাসিডোনীয় বীর, আট বৎসর হইল, জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া মহা-সমরার্ণবে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল, এখন তাঁহারা কোথায় কি ভাবে অবস্থিত? তাঁহাদের অনেকেই এখন কালসমরে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছেন; অনেকেই আহত অকম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন; কেহ বা কঠোর রণশ্রমে পরিক্লান্ত ও ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া হতাশে কালযাপন করিতেছেন। রণক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার বল-বুদ্ধি-ভরসা সকলই এখন লোপ-প্রায়। এবম্বিধ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া কখনই সমীচীন নহে বলিয়া, সেনাপতি কৈনোজ যখন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, সৈনিকদলের ঘনঘন করতালিতে রণস্থল কাঁপিয়া উঠিল। কৈনোজ কহিলেন,—"হে রাজন্! বিজয়মদে উন্মত্ত না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ গুণ। অসমসাহসিক সৈন্যদলের অধিপতিরূপে যদিও আপনি মানুষ-শত্রুর বিভীষিকায় উপেক্ষা-প্রদর্শনে সমর্থ আছেন; কিন্তু স্মরণ রাখিবেন,—বিধিলিপি অলঙ্ঘ্যনীয়; দেবতার নিগ্রহ মানুষের অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ও অসাধ্য।" সৈন্যদল একবাক্যে কৈনোজের অনুসরণ করিল। সৈন্যদলের এবম্বিধ অবাধ্যতারণে আলেকজাণ্ডার মর্ম্মাহত হইলেন। একবার মনে করিলেন,—মাসিডোনীয়ার সৈন্য অকর্ম্মণ্য হয় হউক, বৈদেশিক সৈন্যের সাহায্যেই ভারতবর্ষ জয় করিবেন; কিন্তু পরক্ষণেই সে পক্ষে স্বদেশের গৌরব-হানির চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইল। তিন দিন তিন রাত্রি শিবিরে অবস্থিতি পূর্ব্বক আলেকজাণ্ডার আকাশ-পাতাল ভাবনায় দিন কাটাইলেন। অবশেষে, আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, একান্ত ব্যথিত অন্তরে তিনি স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনে সঙ্কল্প-বদ্ধ হইলেন। হাইডাস্‌পেস নদীর তীরে পূর্ব্ব হইতেই নৌবহর সজ্জিত হইতেছিল। সেই নৌবহরের সহায়তায় আলেক্‌জাণ্ডার সিন্ধু-নদের মোহানার অভিমুখে অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন-কালে আপনার বিজয়-চিহ্নরূপে সেই বিয়াস নদীর তীরে আপনাদের দেব-দেবীর অর্চ্চনার উদ্দেশ্যে, আলেকজাণ্ডার দ্বাদশটী যজ্ঞ-বেদী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। নদী-তীরে বিভিন্ন-স্থানে সেই দ্বাদশটী যজ্ঞ-বেদী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বেদীগুলি প্রকারান্তরে

জয়-স্তম্ভমধ্যে পরিগণিত হয়। সেগুলির ভগ্ন-স্তূপ-সমূহ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আজিও অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। গুরুদাসপুর, হুসিয়ারপুর ও কাঙ্গারা জেলায় বিয়াস নদীর প্রাচীন খাদের পার্শ্বে কয়েকটি বেদী এখনও পরিচিহ্নিত হইয়া থাকে। * বেদী-সমূহ সমচতুষ্কোণ প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার এক একটীর উচ্চতা পঞ্চাশৎ হস্ত পরিমিত। গ্রীকদিগের দ্বাদশটী দেবতার নামে ঐ দ্বাদশটী বেদী উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদল 'আকেসাইনেস' (চিনাব বা চন্দ্রভাগা) নদীর তীরে প্রথমে অগ্রসর হয়। সেখানে সেনাপতি 'হেফাইষ্টন' একটি সুদৃঢ় নগর প্রতিষ্ঠা করেন। সেই নগরে ঐ প্রদেশের বহু লোক আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের যে সকল সৈন্য অকর্ম্মণ্য হয়, তাহারাও ঐ নগরে আশ্রয় লইয়াছিল। চন্দ্রভাগা-নদীর তীরস্থিত ঐ নব-প্রতিষ্ঠিত নগর হইতে আলেকজাণ্ডার সমুদ্র-পথে স্বদেশে যাত্রা করিবার উযোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। এই সময় রাজাওরি, ভীমবার ও হাজারা প্রভৃতি স্থানের সর্দ্দারগণ আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন। অধিকৃত প্রদেশের সহিত স্বদেশের একটা স্থায়ী সম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য এই সময় আলেকজাণ্ডার নানা ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অভিসারের অধিপতি তাঁহার একজন সাত্রাপ (প্রতিনিধি শাসন-কর্ত্তা) নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার উপর 'আর্সাকেজ' (হাজারা) প্রদেশের শাসন-ভার অর্পিত হয়। রাজা পোরস, আলেকজাণ্ডারের একজন প্রধান অমাত্য-রাজ মধ্যে পরিগণিত হন। 'হাইডাস্পেস' ও 'হাইফাসিস' নদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত রাজ্য তাঁহার শাসনাধীনে আসে। গ্লাউসাই, কাথাইয়ৈ প্রভৃতি সাতটী প্রধান জাতি এবং তাহাদের দুই সহস্রাধিক নগর এই সময় রাজা পোরসের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়াছিল। তক্ষশিলার রাজার সহিত পোরসের যে শত্রুতা ছিল, অভিনব বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপনে এখন সে শত্রুতার অবসান হয়। সিন্ধু-নদের ও হাইডাস্পেস নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান তক্ষশিলার রাজার শাসনাধীনে আসে। ইহারা সকলেই আলেকজাণ্ডারের প্রাধান্য স্বীকারে ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-রক্ষণে সম্মত হন। এই সময় আলেকজাণ্ডারের সাহায্যার্থ নূতন দুই দল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। † সেই দুই দলের এক দলে ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং অপর দলে ৭০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল। প্রথমোক্ত সৈন্যদল থ্রেস্ হইতে আসিয়াছিল এবং শেষোক্ত

পথে যুদ্ধ-বিগ্রহ বিপদ-পরম্পরা।

---

* ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ভাইন নামক জনৈক অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত প্রোক্ত কয়েকটি বেদীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন (Vigne, *A Personal Narrative of a visit to Gazni, Kabul and Afghanistan.*)। আলেকজাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত এই বেদীর প্রতি প্রাচীন কালে বহু ভারতীয় নৃপতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মৌর্য্য-বংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ যখন বিয়াস নদী পার হইতেন, আলেকজাণ্ডারের প্রতিষ্ঠিত বেদীর নিকট পূজা প্রদান করিতেন, কিম্বদন্তী আছে। প্লিনি লিখিয়া গিয়াছেন, বিয়াস-নদীর পূর্ব্ব-পারে আলেকজাণ্ডারের বিজয়-স্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক। কারণ, আলেকজাণ্ডার বিয়াস নদী পার হইতেই সমর্থ হন নাই।

† ডায়ডোরসের বর্ণনায় প্রকাশ,—এই সময় ৩০ সহস্র পদাতিক ও ৬ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য আলেকজাণ্ডারের সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইয়াছিল।

সৈন্যদল হার্‌পালোজ নামক তাঁহার এক ভ্রাতা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বাবিলনের সাত্রাপ বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই দুই সৈন্যদলের সঙ্গে বহু অস্ত্র-শস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ আসিয়াছিল। এই সকল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, আলেকজেণ্ডার এক নূতন বলে বলীয়ান হইয়াছিলেন। তখন, স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পথে যে সকল রাজ্য জনপদ পতিত হয়, আলেকজাণ্ডার তৎসমুদায় অধিকার করিতে করিতে অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প করেন। চন্দ্রভাগা নদীর তীর হইতে যাত্রা করিয়া আলেকজাণ্ডার হাইডাস্‌পেস নদীর তীরে উপনীত হন। এই নদীর তীরে, এই স্থানে, পোরসের সৈন্যদল তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। এইখানে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করিয়া আলেকজাণ্ডার আপনার নৌ-বহর সুদৃঢ় ও সুসজ্জিত করিয়া লন। নৌ-বহর প্রস্তুতের জন্য এই নদীর তীরে বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। এইখানে দেশীয় কারিকরের প্রস্তুত জলযান-সমূহে তিনি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। অধিকন্তু, ফিনিসিয়া, সাইপ্রিয়া, কারিয়া এবং ঈজিপ্ত হইতে কারিকরগণ আসিয়া তাঁহার নৌ-বহর নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছিল। ৩২৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের শেষভাগে আলেকজাণ্ডারের স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া যায়। প্রায় দুই সহস্র জলযানে আলেকজাণ্ডারের নৌ-বহর সজ্জিত হয়। এই নৌ-বহর সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে, আলেকজাণ্ডার তিন দল রক্ষি-সৈন্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য সেই নৌ-বহর রক্ষার জন্য নদীর উভয় তীরে সুসজ্জিত ছিল। পশ্চিম-তীরে ক্রেটারোস সৈন্যদল পরিচালন করিতে লাগিলেন; পূর্ব্ব-তীরে হেফাইষ্টন সৈন্যদলের অধিনায়ক হইলেন। শেষোক্ত দলে অধিক সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ রহিল। সেই সৈন্যদলের সঙ্গে দুইশতাধিক হস্তী দিক রক্ষা করিতে লাগিল। ফিলিপ্পোস্ * পশ্চাৎ দিকের রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। নৌ-বহরের পশ্চাদ্বর্ত্তী তিন দিনের পথ পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বারা রক্ষিত হইতে লাগিল। অক্টোবর মাসের শেষভাগে, জলদেবতাগণের যথাবিহিত পূজার ব্যবস্থা করিয়া, জয়ডঙ্কা-নিনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া, নৌ-বহর নোঙ্গর উত্তোলন করিল। দুই সহস্রাধিক সুসজ্জিত জলযান যখন বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া শ্রেণিবদ্ধভাবে সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিল, আর ডঙ্কা-নিনাদে দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল; তখন গ্রাম গ্রামান্তর হইতে কত লোক কত ভাবে সেই অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল; আর সে দৃশ্য দেখিয়া তাহারা বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া গেল। তৃতীয় দিবসে নৌ-বহর একটী স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিল। ঐতিহাসিকগণ সেই বিশ্রাম-স্থানকে 'ভীরা' নামে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। এই বিশ্রাম-স্থানে নদীর দুই পারে যথাক্রমে হেফাইষ্টন ও ক্রেটারোস সৈন্য-সমাবেশ করিয়া, প্রহরীর কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। আর এই স্থান হইতে ফিলিপ্পোসের উপর নদী-তীরে নৌ-বহরের পুরোভাগে গমনের ভার অর্পিত হইয়াছিল। পঞ্চম দিবসে হাইডাস্‌পেস ও আকেসাইনেস নদীর সঙ্গমস্থলে এক বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইল। ঐ দুই নদীর সঙ্গম-স্থলে ভীষণ ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া, নৌ-বহর প্রমাদ গণিল। দুইখানি অর্ণবপোত

* ইনি সিন্ধুনদের পশ্চিম প্রদেশের 'সাত্রাপ' পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল; বহুসংখ্যক নাবিক ও সৈন্য প্রাণদানে বাধ্য হইল। আলেকজাণ্ডারের নিজের তরণীখানিও বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু আপনার অশেষ চেষ্টার ফলে এবং নাবিকগণের প্রাণপাত কৌশলে সে সঙ্কটে তিনি প্রাণলাভ করিলেন। এই বিপদে পরিত্রাণ পাইবার পর আলেক্‌জাণ্ডার 'শিবি' ও 'আগালাস্থি' জাতিকে পরাজিত করেন। কিন্তু মাল্লে-জাতি (মাল্লি) * আলেক্‌জাণ্ডারের বশুতা স্বীকার করিতে সম্মত হয় না। অধিকন্তু তাহারা শিবি ও আগালাস্থি জাতির সহিত যোগদানে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়। সেইজন্য প্রথমেই আলেকজাণ্ডার শিবি ও আগালাস্থি জাতির উচ্ছেদ-সাধনে চেষ্টান্বিত হন। আগালাস্থি জাতিরা ৪০ সহস্র পদাতিক ও ৩ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ তাঁহাকে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু আলেক-জাণ্ডারের বাহুবলের ও কৌশলের নিকট তাহারা বাত্যামুখে ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়া গেল। আগালাস্থি জাতির অধিকাংশই শাণিত কৃপাণ-মুখে প্রাণদান করিল; অবশিষ্ট যাহারা জীবিত রহিল, তাহারা বন্দী হইয়া দাস-রূপে বিক্রীত হইতে লাগিল। প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রের ৩০ মাইল দূরে আগালাস্থি জাতির একটি প্রধান নগর ছিল। সেই নগরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া আলেকজাণ্ডার নগরের বিংশ সহস্র অধিবাসীকে আক্রমণ করিলেন। নগর-রক্ষায় অপারক হইয়া নগরবাসীরা নগরে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দিল এবং বিজাতির কৃপাণ-মুখে স্ত্রী-পুত্রকে অর্পণ করা অতি ঘৃণ্য মনে করিয়া, আপনারা পুত্র-কলত্রের হাত ধরিয়া সেই অনলে ভস্মীভূত হইল। নগরের প্রান্তভাগে তাহাদের যে দুর্গ ছিল, সেই দুর্গে তিন সহস্র যোদ্ধৃ-পুরুষ অবস্থিত ছিল। তাহাদের দুর্গ অধিকারের পর, বিজয়ী বীর তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন বটে; কিন্তু পরজীবনে তাহারা জীবন্মৃত হইয়া রহিল। এই যুদ্ধে মাসিডোনীয়ারও যে অনেক বীরকে জীবন-দান করিতে হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। এই যুদ্ধের পর সংবাদ আসিল,—মাল্লে ও অক্সিড্রেকাই জাতিরা পারিপার্শ্বিক স্বাধীন জাতিগণের সহিত মিলিত হইয়া, আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। আলেকজান্দার তখন নৌ-বহরকে এবং সৈন্য-দলকে, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমস্থলে সম্মিলিত হইতে আদেশ দিলেন; আর আপনি স্বয়ং কতগুলি বাছা বাছা সৈন্যদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া মাল্লে-জাতিকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অক্সিড্রেকাই ও মাল্লে জাতির মধ্যে বহুদিনের শত্রুতা ছিল। এ সময়ে তাহারা সেই পুরাতন শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া, পরস্পর বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইল। এই উপলক্ষে তাহাদের এক জাতি অপর জাতির মধ্য হইতে দশ সহস্র পাত্র ও পাত্রী বাছিয়া লইয়া, বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই জাতির একতা দেখিয়া, আলেকজাণ্ডার বড়ই বিস্মিত হইলেন। দুই জাতি একত্র মিলিত হইলে লক্ষাধিক সৈন্যের সমাবেশ করিতে পারিত। কিন্তু কি বিধি-বিড়ম্বনা!—সামান্য একটা পদমর্য্যাদা লইয়া ঐ দুই জাতির মধ্যে হঠাৎ মতান্তর ঘটিল। সেই মতান্তরের মীমাংসার পূর্ব্বেই আলেকজাণ্ডার তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। মাল্লে-জাতির অনুসরণে আলেকজাণ্ডারকে তিনটি প্রধান যুদ্ধে বিব্রত হইতে হয়।

* মালবের অধিবাসিগণ মাল্লে বা মাল্লি নামে অভিহিত হয়, এইরূপ অনেকের সিদ্ধান্ত।

প্রথমে একটি দুর্গ সহজেই তাঁহার অধিকারে আসে। স্বয়ং সৈন্য-পরিচালনে সেই দুর্গ-রক্ষক দুই সহস্রাধিক সৈন্যকে তিনি নিহত করেন। মাল্লৈদিগের দ্বিতীয় নগর, সেনাপতি পার্দিকাস কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। তাঁহার সৈন্যদলের আগমন-সংবাদ শুনিয়াই, মাল্লৈগণ ঐ নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। তৃতীয় নগরে মাল্লৈদিগের পাঁচ সহস্র সৈন্য প্রাণদান করিয়াছিল। কিন্তু এই নগর অধিকারে আলেকজাণ্ডার বিষম বিপদে পতিত হন। প্রশস্ত প্রাচীর-বেষ্টিত নগরের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করা যখন অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল, আলেকজাণ্ডার তিন জন সঙ্গী * সহ সেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। তাঁহার এই অসমসাহসিকতার ফলে দুর্গরক্ষক নিহত হইল বটে; কিন্তু তাঁহার এক সঙ্গী (আব্রেয়াস) প্রাণ হারাইলেন; অপর সঙ্গী (লিওন্নাটোজ) গুরুতররূপে আহত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আততায়ীর নিক্ষিপ্ত তীর আসিয়া আলেকজাণ্ডারের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল। এই ঘটনা ইতিহাসে † এইরূপ বিবৃত আছে। নগর বিধ্বস্ত হইলে মাল্লৈগণ দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই দুর্গ অত্যুচ্চ সুবিস্তৃত প্রাচীর পরিবেষ্টিত ছিল। আর সেই প্রাচীরের উপর অবস্থিত তীরন্দাজ ও অস্ত্রধারী সৈন্যগণ দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিলে দুর্গ অধিকারের কোনই আশা নাই। কিন্তু কিরূপে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন সম্ভবপর? অধিরোহণী মই সাহায্যে প্রাচীর উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প হইল। কতকগুলি মই-ও আসিয়া জুটিল। কিন্তু সে সুরক্ষিত প্রাচীর-গাত্রে সৈন্যদলের কেহই মই লাগাইতে সাহসী হইল না। এদিকে প্রাচীরের উপর হইতে নিক্ষিপ্ত তীর আসিয়া সৈন্যদলকে বিব্রত করিয়া তুলিল। আলেকজাণ্ডার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি নিজেই একখানি মই ছিনাইয়া লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন করিয়া দিলেন এবং বিপক্ষদলের অস্ত্রের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই মই সাহায্যে প্রাচীরের উপর উঠিয়া পড়িলেন। চারিদিক হইতে আলেকজাণ্ডারের উপর অস্ত্রবর্ষণ হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার তরবারির উজ্জ্বল প্রভায় সকলের নয়ন ঝলসিয়া দিল। রণোন্মাদনায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া আলেকজাণ্ডার সেই প্রাচীর হইতে দুর্গমধ্যে ঝম্প-প্রদান করিলেন। দুর্গরক্ষক সদলে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। একাকী চতুর্দ্দিক রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তখন প্রাচীর-গাত্রে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, আলেকজাণ্ডার তরবারি পরিচালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যুদ্ধ-কৌশলে তরবারির আঘাতে বিপক্ষপক্ষের সর্দ্দার ও তাঁহার সহকারী তিন চারি জন সৈন্য ভূতলশায়ী হইলেন। ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর আসিয়া আলেকজাণ্ডারের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল। বীরপুঙ্গব ভূতলশায়ী হইলেন। এই সময় আলেকজাণ্ডারের তিন জন সহকারী সৈনিক মই সাহায্যে প্রাচীরের উপর উঠিলেন এবং আলেকজাণ্ডারের সাহায্যের জন্য ঝম্প প্রদানে দুর্গমধ্যে পতিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের একজন ঝম্প-মাত্র শত্রুর অস্ত্রে প্রাণ হারাইলেন; অপর জন গুরুতররূপে আহত

* তাঁহার সঙ্গিত্রয়ের নাম—পিউকেষ্টাস্, লিওন্নাটোস, আব্রেয়াস।

† *The Pictorial History of Greece* edited by E. Pococke.

হইলেন। তখন, অধিনায়কের বিপদের বিষয় অনুধাবন করিয়া, সৈন্যদল একযোগে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা পাইল। ফলে, যে অধিরোহণী সাহায্যে তাহারা দুর্গে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, সেই অধিরোহণী ভাঙ্গিয়া গেল। আলেকজাণ্ডার তখন মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন;—নিঃসহায় অবস্থায় শত্রুর দুর্গমধ্যে শায়িত ছিলেন। সে অবস্থায় তাঁহার পুনর্জ্জীবন লাভের আশা কে করিতে পারে? কিন্তু ভগবান যাহাকে রক্ষা করেন, তাহার কি কখনও অপঘাত মৃত্যু আছে? আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে মাল্লৈগণ উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং আততায়ীকে আপনাদের কবলে পাইয়াও গ্রাস করিতে পারিল না। এদিকে শত্রুর দুর্গমধ্যে আপনাদের অধিপতি বিপন্ন হইয়াছেন বুঝিয়া, মাসিডোনীয়গণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য এখন তাহারা আপনাদের প্রাণকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করিল। তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে দুর্গের দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল। মৃতকল্প আহত বীরপুঙ্গব উদ্ধার পাইলেন। সেই অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় আলেকজাণ্ডারকে শিবিরে লইয়া গিয়া সৈন্যগণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিল। অস্ত্র-চিকিৎসার সুকৌশলে বক্ষবিদ্ধ তীর অপসারিত হইল; রক্তস্রাবে বীরদেহ ভাসিতে লাগিল। অন্য কাহারও হইলে সেই দুর্গের সেই শয্যাই শেষ-শয্যা হইত। কিন্তু বিপুল বলশালী ও ধৈর্য্যশালী ছিলেন বলিয়া, চিকিৎসায় আলেকজাণ্ডার প্রাণলাভ করিলেন; যেন মৃতদেহ নব-জীবন ফিরিয়া পাইল।

প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে।

চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া, আলেকজান্দার যখন পুনরায় আপন সৈন্যদলে মিলিত হইলেন, মাল্লৈজাতির নেতৃগণ এবং অক্সিড্রেকাই জাতির সর্দ্দারগণ একে একে আসিয়া সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। নানাবিধ উপঢৌকনে তাঁহার ধনভাণ্ডার পূর্ণ হইল। এই সময় সিন্ধু-নদের তীরে, শাখা-সমূহের সঙ্গম-স্থলে, আলেকজাণ্ডার একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। সেই নগর নানা প্রকারে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সিন্ধু-নদের নামানুসারেই নগরের নামকরণ হয়। সেই নগরে অবস্থান-কালে পারিপার্শ্বিক কয়েকটি স্বাধীন জাতি, (আবাষ্টনৈ, আ্যাথ্রেক্সাই, ওস্যাডিওই প্রভৃতি) তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। ঐ সকল জাতির প্রকৃত পরিচয় এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য। উহারা সিন্ধুনদের উত্তর-তীরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-জাতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ঐ অঞ্চলের আরও কয়েকটি পার্ব্বত্য-জাতি এই সময়ে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের রাজার নাম মিউজিকানাস্। তাঁহার রাজধানী সিন্ধুদেশের প্রাচীন-রাজধানী আরোর-নগরে বা তৎ-সন্নিকটবর্ত্তী কোনও নগরে অবস্থিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্ধারণ করেন। আলেকজাণ্ডারের প্রতাপের বিষয় অবগত হইয়া, রাজা মিউজিকানাস আপনাপনি বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহার যুদ্ধহস্তিগুলি বহু ধনরত্ন সহ আলেকজাণ্ডারকে উপহৃত হয়। প্রথমে ঐরূপ বশ্যতা স্বীকার করিয়াও, পরিশেষে মন্ত্রিগণের পরামর্শে মিউজিকানাস বিদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে ঐ প্রদেশের সাত্রাপ পেথোন কর্ত্তৃক তিনি ধৃত হইয়া প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ নৃসংশরূপে নিহত

হইয়াছিলেন। এই ঘটনার ন্যায় আরও দুইটী ঘটনা প্রায় সম-সময়েই সংঘটিত হয়। অক্সিক্যানোজ ও স্যাম্বোজ নামক দুই জন সর্দ্দার আলেকজাণ্ডারের নিকট বন্দী হন এবং পরে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই বলিয়া, সেই দুই জনপদের প্রায় ৮০, হাজার অধিবাসীকে শত্রুর শাণিত তরবারি-মুখে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। বহুসংখ্যক নর-নারী এই উপলক্ষে ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হইয়াছিল বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার পর শেষ যে জনপদ আলেকজাণ্ডারের অধিকারভুক্ত হয়, সে জনপদ 'প্যাটেলিন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 'পাটল' উহার রাজধানী ছিল বলিয়া অধুনা সিদ্ধান্ত হয়। 'মানসুরিয়ার' তিন ক্রোশ পশ্চিমে, 'বামনাবাদ' নামক স্থানে অধুনা প্রাচীন 'পাটল' নগরের ভগ্নাবশেষ পরিচিহ্নিত হইয়া থাকে। পাটলের রাজা আপনাপনি আসিয়া, আলেকজাণ্ডারের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। পাটল-নগর যুদ্ধ-কৌশল পরিচালনার উপযোগী মনে করিয়া আলেকজাণ্ডার ঐ নগরে দুর্গ-নির্ম্মাণের ও ইন্দারা প্রভৃতি খননের আদেশ দেন। রণতরীসমূহ অবস্থানের উপযোগী বন্দরাদিতে পাটল শোভিত হয়। এই নগর হইতে নদীপথে যাত্রা করিয়া, সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হইবার সময় আলেকজান্দার আর এক নূতন বিপদে পতিত হন। তাঁহার সঙ্গের নাবিকগণ ভূমধ্য-সাগরের প্রশান্ত-বক্ষে নৌ-চালনায় পারদর্শী ছিল বটে; কিন্তু ভারত-মহাসাগরের উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল আবর্ত্ত তাহারা কখনও অতিক্রম করে নাই। সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হইবার সময়, সিন্ধুনদের মোহানায় ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে নৌ-বহর বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। মৃত্যু আবার যেন মাসিডোনীয় বীরকে গ্রাস করিতে বদন ব্যাদান করিয়া আসিল। বহু প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া, অশেষ অন্তরায় সহ্য করিয়া, সে যাত্রাও আলেকজাণ্ডার কোনপ্রকারে প্রাণ বাঁচাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-পথে স্বদেশ-প্রত্যাগমনের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যক্ত হইল। এখন আপন সৈন্যদলকে আলেকজাণ্ডার তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। নৌ-বহর লইয়া, সেনাপতি নিয়ার্কাস জলপথে পারস্যোপসাগরাভিমুখে ইউফ্রেটিস নদীর মোহানা লক্ষ্য করিয়া, অগ্রসর হইলেন। সেনাপতি ক্রেটারোস, আরাকোসিয়া (কান্দাহার) ও ড্রাঙ্গিয়ানা (সিস্তান) দিয়া, কারমানিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ পাইলেন। আর অপনি স্বয়ং জেড্রোসিয়া (মেকরাণ) পথে অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প করিলেন। তখন ভারতের যে প্রান্তভাগ তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল, তাহার শাসনের ভার তিন জন বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর নির্দ্দিষ্ট রহিল। সিন্ধুনদের সঙ্গম-স্থলে যেখানে নূতন নগর (ইণ্ডাস) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার উত্তরাংশে ফিলিপ্পোস্ 'সাত্রাপ' শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত রহিলেন। আজেনোরের পুত্র পেথোন দক্ষিণাংশের সাত্রাপ-পদ প্রাপ্ত হইলেন। পারোপানিসাদাই (কাবুল) প্রদেশের শাসন-ভার অক্সিয়ার্ত্তেস * লাভ করিলেন। পোরসের রাজ্য-সীমা এ সময় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি আলেক্-জাণ্ডারের মিত্ররাজ-মধ্যে গণ্য ছিলেন।

* ইনি বাক্‌ট্রিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত লোক। আলেকজাণ্ডারের পত্নী রোক্সানা ইহার কন্যা। এই হিসাবে 'অক্সিয়ার্ত্তেস' আলেকজাণ্ডারের শ্বশুর।

ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশ-প্রত্যাগমনের পথে আলেক্জাণ্ডার ও তাঁহার সৈন্যগণ বিভিন্ন জনপদে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন বটে; ভারতবর্ষের

অভিযানের পরিণাম।

বাহিরের বহু জনপদ তাঁহাদের গতিবিধি-সূত্রে রক্তস্রোতে ভাসমান হইয়াছিল বটে; কিন্তু ভারতবর্ষের সহিত সম্বন্ধ-সংশ্রব অল্প দিনের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। দেশ-বিজয়ে যাত্রা করিয়া, আলেক্জান্দার বহু জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চলিয়া যাওয়ার পর তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। যেমন মধ্য-এসিয়ায়, তেমনি ভারতবর্ষে— তাঁহার স্বদেশগমনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই—তাঁহার স্মৃতি-মূল উৎপাটিত হইয়া যায়। স্থায়ী সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য আলেক্জান্দার অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিণামে প্রচণ্ড দস্যুর লুণ্ঠন ও নরহত্যার স্মৃতি-চিহ্ন ভিন্ন অন্য কোনও চিহ্ন স্থায়ী হয় নাই। আলেকজাণ্ডার অকারণে অন্যের প্রাণে ব্যথা-প্রদানে অগ্রসর হইয়াছিলেন; তিনি অকারণে নিরীহ-নির্দ্দোষ অসংখ্য প্রাণীর প্রাণনাশ-পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি নরশোণিত-লিপ্সু রাক্ষসের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া শান্তিপ্রিয় সরল-প্রাণ নরনারীকে গ্রাস করিয়া গিয়াছিলেন।* তাই, তিনি যত বড় বীরই হউন না কেন, পৃথ্বী-বিজয়ী বলিয়া তাঁহার যত যশই কীর্ত্তিত হউক না কেন; কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক চিরদিনই তাঁহাকে অতি-বীর্য্যবান অমিতপরাক্রমশালী দস্যু-নামে অভিহিত করিবে। যাহা হউক, আলেক্জান্দারের এই অভিযানে ভারতবর্ষে বৈদেশিক সংশ্রবের প্রথম সূত্রপাত হইলেও, ভারতবর্ষে সে সম্বন্ধ-সংশ্রবের বিশেষ কোনও স্থায়ী নিদর্শন তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে ভারতের দেহে যে শোণিত-পাত হইয়াছিল, সে ক্ষতস্থান অল্পদিনেই আরোগ্য হইয়া আসে। মাসিডনে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বাবিলনে আলেক্জান্দারের মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতে মাসিডোনীয় সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার কল্পনা আকাশে বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া যায়। এদিকে ভারতে নবসম্রাজ্যের নবীন অরুণ প্রকাশ পায়। আলেক্জান্দারের আক্রমণ-রূপ প্রগাঢ় অন্ধকারের পর, সেই আলোক রশ্মি লাভ করিয়া, ভারত সকল ব্যথা ভুলিয়া যায়। রণভূমির শ্মশান-ক্ষেত্র, নব-ধারায় ধৌত হইয়া, আবার জনস্থলীতে পরিণত হয়। বিষম দুর্নদ-প্রবাহের পর বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত জনপদ আবার যেমন নবমুকুল-মুঞ্জরে নবীন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, আর তখন যেমন তাহাকে দেখিয়া

* এ সম্বন্ধে দুই জন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। মিঃ বিভারিজ লিখিয়া গিয়াছেন,—"The Indian expedition of Alexander cannot be justified on moral grounds. It was dictated by a wild and ungovernable ambition; and spread misery and death among thousands and tens of thousands who have done nothing to offend him, and were peacefully pursuing their different branches of industry, when he made his appearance among them like a destroying demon." ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন,—"The campaign although carefully designed to secure a parmanent conquest, was in actual effect no more than a brilliantly successful raid on a gigantic scale, which left upon India no mark save the horrid scars of bloody war."

অতীতের স্মৃতি কচিৎ প্রাণে জাগিয়া উঠে; মাসিডোনীয় অক্রমণের পর, কিছুকাল মধ্যেই ভারতবর্ষ সে বিপ্লবের বিষয় সেইরূপ বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিল। কালের করে ক্রোড়ের শিশুকে সমর্পণ করিয়া আসিয়া, নবশিশু ক্রোড়ে পাইলে জননী যেমন প্রবোধ পায়; মগধে নবসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় আলেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণের ব্যথা ভারতবর্ষ সেইরূপ বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন,—তাই বুঝি হিন্দুগণের, জৈনগণের বা বৌদ্ধগণের কোনও প্রাচীন গ্রন্থে আলেক্‌জাণ্ডারের এই অভিযানের কোনও উল্লেখ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না! *

তিন বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

যাহা হউক, আলেক্‌জাণ্ডার কোনও স্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন রাখিয়া যাইতে সমর্থ না হউন, তিনি যে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য-জাতির আগমনের পথ অনেকটা প্রশস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। পরবর্ত্তিকালে যে কোনও শক্তি যখনই ভারতে আসিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের চেষ্টা পাইয়াছে; তাহাদের অনেককেই আলেক্‌জাণ্ডারের পদাঙ্ক অনুসরণকারী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্যের চক্ষে ভারতের ইতিহাস আরম্ভের তাই ঐ এক সূচনা-ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হয়। সে হিসাবে আলেক্‌জাণ্ডারই ভারতবর্ষের ইতিহাসের আদিভূত। মিঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ বিশেষ গবেষণার ফলে আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের একটি সংক্ষিপ্ত-সার বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কয় বৎসরে, কোন্ সময়ে, কোন্ মাসে, কি ভাবে, আলেক্‌জাণ্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন ও ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য তাহাতে সুন্দরভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের প্রদত্ত সেই বিবরণের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে,—

অভিযানের কাল।

(৩২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৩২৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত)

অগ্রসর হওন—৩২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।

৩২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—মে মাসের প্রথমে।—হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পথ দিয়া খাওয়াক ও কাউসান গিরি-পথে উত্তীর্ণ হন।

জুন মাসে।—বাছা বাছা সৈন্য লইয়া 'নিকাইয়া' (সম্ভবতঃ জেলালাবাদ) হইতে পার্ব্বত্য-জাতিগণকে বশে আনিবার জন্য আলেক্‌জাণ্ডার অগ্রসর হন। এদিকে কাবুল নদীর উপত্যকা দিয়া, অবশিষ্ট সৈন্য সহ হেফাইষ্টন অগ্রসর হইতে থাকেন।

আগষ্ট মাসে।—ত্রিশ দিন অবরোধের পর হেফাইষ্টন কর্ত্তৃক রাজা আস্তেজের (হস্তীর) দুর্গ আক্রান্ত হয়।

---

* ভিন্সেণ্ট স্মিথ এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন,—আমরা প্রোক্ত ছত্রে সেই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিলাম। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে "যবন" প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টে যাঁহারা পুরাণ-রচনার কাল ভারতে মুসলমান আগমনের পরে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ভিন্সেণ্ট স্মিথের উপরোক্ত উক্তিতে তাঁহাদের সে সিদ্ধান্তের অন্তরায় আনিয়াছে। আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-আগমনের অনেক পূর্ব্বে যে পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, এতদ্দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

৩২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—সেপ্টেম্বর মাসে।—আলেক্‌জান্দার আপন সৈন্য-দলকে ভিন্ন ভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া স্বয়ং আস্পাসিয়ান-দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই মাসে গৌরাইওজ (পাঁজকোরা) নদী উত্তীর্ণ হইয়া, আলেক্‌জান্দার সসৈন্যে আস্তাকেনিয়ান-দিগের রাজধানী মাস্তাগা নগর অধিকার করেন। এই সময়ে তাঁহার দ্বারা সাত সহস্র বেতন-ভুক ভারতীয় সৈন্যের হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হয়।

নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে।—আওর্‌নোজ-নগর অবরোধ ও আক্রমণ এই সময়ের ঘটনা।

৩২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ।—জানুয়ারী মাসে।—এই সময়ে আলেক্‌জাণ্ডার সিন্ধুতীরে ওহিন্দের সেতু-সন্নিকটে উপস্থিত হন। এই মাসের শেষ হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ দিন তাঁহার সৈন্যদল পথিমধ্যে বিশ্রাম করিয়াছিল।

ফেব্রুয়ারী বা মার্চ্চ মাসে।—এই সময়ে বসন্তের প্রারম্ভে সিন্ধুনদে পথ প্রস্তুত হয়; আর তক্ষশিলার রাজা কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া এই সময় আলেক্‌জাণ্ডা সসৈন্যে তক্ষশিলায় গিয়া অবস্থান করেন।

এপ্রেল ও মে মাসে।—পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া মে মাসে হাইডাস্‌পেস (ঝিলাম) নদীর তীরে তাঁহারা উপনীত হন।

জুলাই মাসের প্রথম।—হাইডাস্‌পেস নদীর তীরে ভীষণ যুদ্ধ, আর সেই যুদ্ধে পোরসের পরাজয়। এই মাসের শেষে নিকাইয়া ও বুকেফালা নগরদ্বয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। আর আকেসাইনেজ (চিনাব) নদীর নিকটে পর্ব্বত-নিম্নে পথ প্রস্তুত হয়।

আগষ্ট মাসে।—এই মাসে হাইড্রোয়েট্‌স্ (রাভি) নদীর পথ প্রস্তুত হয় এবং কাথিয়ান-দিগের সহিত যুদ্ধ বাধে।

সেপ্টেম্বর মাসে।—হাইফাসিস্ (বিয়াস) নদীর তীরে সসৈন্যে আলেক্‌জাণ্ডার উপনীত হন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইতে চাহে না।

প্রত্যাবর্ত্তন—৩২৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।

সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে।—হাইডাস্‌পেস (ঝিলাম) নদীর তীরে প্রত্যাবর্ত্তন। এই অক্টোবর মাসের শেষে আলেকজান্দার নদীর মোহানার দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। সেই সময় নৌ-বহর রক্ষার জন্য উভয় তীরে সৈন্য সমবেত হয়। (অক্টোবর মাসের শেষে সৈন্যদ্বারা তীরদেশ রক্ষা করিয়া আলেকজাণ্ডার জলপথে অগ্রসর হন।

৩২৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—জানুয়ারী মাস।—মাল্লৈগণের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়। (আলেকজাণ্ডার প্রাণসঙ্কট বিপদ হইতে উদ্ধার পান।)

সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত।—জলযাত্রা চলিতে থাকে। সোগদোই, সাম্বোজ, মৌজিকানোজ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ চলে।

৩২৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—অক্টোবর মাসে।—এই মাসের প্রথমে আলেক্জাণ্ডার জেড্রোসিয়ার পথে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আর এই মাসের শেষভাগে তাঁহার নৌ-সেনাপতি নিয়ার্কাস পারস্য উপসাগর অভিমুখে রণপোত পরিচালনে প্রবৃত্ত হন।

৩২৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—জানুয়ারী মাসের প্রথমে।—আলেক্জাণ্ডার পৌরা (বামপুর) নগরে উপনীত হন। ঐ নগর জেড্রোসিয়া প্রদেশের রাজধানী। ওরা হইতে উহা ৬০ দিনের পথ। জানুয়ারী মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত আলেক্জাণ্ডারের সৈন্যদল পৌরা নগরে অবস্থিতি করে।

ফেব্রুয়ারী মাস।—কারমানিয়ার মধ্য দিয়া আলেকজান্দার প্রায় তিন শত মাইল পথ অগ্রসর হন।

এপ্রেল মাসের শেষে অথবা মে মাসের প্রথমে।—কারমানিয়ার পশ্চিম সীমান্ত হইতে প্রায় ৫০০ শত মাইল পথ অতিক্রমের পর, আলেক্জাণ্ডারের সৈন্যদল পারস্য-রাজ্যের সুসা-নগরে উপনীত হয়।

৩২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।—জুন মাসে।—বাবিলন সহরে আলেক্জাণ্ডারের মৃত্যু হয়।

এই অল্পদিনের মধ্যে, তিন বৎসরের অনধিক কাল সময়ে, বীরপুঙ্গব যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, শত কলঙ্ক সত্ত্বেও তাহা সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। তাঁহার নৃসংশতার বিষয় স্মরণ করিয়া অনেক সময় হৃদয় অশ্রুজলে অভিষিক্ত হয় বটে; আর সেই পাপভারেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ভিত্তি-ভূমি শ্লথ হইয়া গেল বটে; কিন্তু তিনি ভারতবর্ষে উদ্দীপনার এক নবভাব জাগাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশ-যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটিল; তাঁহার আশ্রিত অনুগত 'সাত্রাপ' শাসনকর্ত্তৃগণ স্রোতাবর্ত্তে নিপতিত তৃণখণ্ডের ন্যায় ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া কোথায় চলিয়া গেল। যেন চকিতের ন্যায় সে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইল! বীরপুঙ্গবের মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারতের সীমান্ত-প্রদেশে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল; তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার নবগঠিত সাত্রাপ-সমূহ রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের পতাকা-মূলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তো, আলেক্জাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ-রূপ একটা যেন দুর্দ্দ-বাত্যা ভারতের একটা প্রান্তভাগে প্রবাহিত হইয়াছিল, আর তদ্দ্বারা সেই অংশের প্রকৃতিকে কিছু দিনের জন্য বিপর্য্যস্ত করিয়া গিয়াছিল। শশী যেন মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিল! পরিশেষে নৈসর্গিক নিয়মে মেঘাপসরণে চন্দ্রোদয়ে শোভার অবধি রহিল না। আলেক্জাণ্ডারের অভিযানের পূর্ব্বে ভারতের রাজ-শক্তি বিছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; বুঝি বা, সেই আক্রমণের ফলে সেই বিচ্ছিন্ন রাজ-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দিয়া গেল। নিশান্তে ঊষার তাম্ররাগে দিগন্ত যেমন প্রফুল্ল হয়, আলেক্জাণ্ডারের আক্রমণান্তে নব-সাম্রাজ্যের নূতন বলে ভারতবর্ষ সেইরূপ উৎফুল্ল হইয়াছিল।

নব-ভাবের নবীন বিকাশ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—— § * § ——

পরবর্ত্তী বৈদেশিক সংশ্রব।

[চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ে গ্রীকগণের আধিপত্য লোপ ;—সেলিউকাসের ভারত-অধিকারের চেষ্টা, পরাজয় ও সন্ধি ;—এণ্টিওকাস দি গ্রেট কর্তৃক সীমান্ত-প্রদেশ অধিকার ;—বাক্‌ত্রিয়ার অন্যান্য নৃপতিবর্গের সম্বন্ধ-সংশ্রব ,—মেনান্দার ,—ভারতের ধর্ম্মগ্রহণে তাঁহার পরিণতি ,—পার্থিয়ার অধিপতিগণের ভারতের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন ,—বাক্‌ত্রিয়ার ও পার্থিয়ার রাজন্যগণের ভারতের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধন।]

আলেকজাণ্ডারের আশা-মূল উচ্ছিন্ন।

আলেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণের পর হইতে ভারতবর্ষের উপর বৈদেশিকগণের লোলুপ-দৃষ্টি বিশেষভাবে নিপতিত হয়। তখন, নানা দিক হইতে নানা ভাবে ভারতের উপর আক্রমণের চেষ্টা চলিতে থাকে। যদিও সে চেষ্টা সম্যক ফলবতী হইতে সহস্রাধিক বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু আলেকজাণ্ডারই যে সে চেষ্টার আদিভূত ও পথপ্রদর্শক, তদ্বিষয়ে মতান্তর থাকিতে পারে না। তাঁহার পূর্ব্বে যাঁহারা ভারতবর্ষের ধনৈশ্বর্য্যে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কল্পনা ফলবতী হয় নাই। সে হিসাবে, আলেকজাণ্ডারই প্রথম কৃতকার্য্যতা লাভ করেন বলিতে হয়। আট বৎসরের অভিযানে, তিনি ইউরোপ অতিক্রম করিয়া, এসিয়া-মহাদেশের বক্ষের উপর আসিয়া, আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন ; আর তিন বৎসরের চেষ্টার ফলে তিনি ভারতের সীমান্ত-প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। তেত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সের মধ্যে যে বীর এইরূপে পৃথ্বী-বিজয়ী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন, তিনি যদি আর কিছু দিন জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে না-জানি কৃতিত্বের কি বিজয়-স্তম্ভই সংসারে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন! কিন্তু বুঝি বা তাঁহার অমানুষিক অত্যাচারে সর্ব্বংসহা ধরিত্রী কম্পান্বিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন ; বিধাতা তাই যেন আর সহিতে পারিলেন না ; অমানুষিক বল-বীর্য্য প্রদান করিয়াও, বিপদ-পারাবার হইতে পুনঃপুনঃ উত্তোলন করিয়াও, বিধাতা তাই তাঁহাকে অকস্মাৎ মৃত্যুর করালগ্রাসে নিক্ষেপ করিলেন। প্রাণে কত আশা—কত আকাঙ্ক্ষা ;—আবার ফিরিয়া আসিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রাস করিবেন! কিন্তু তাঁহার সে আশা-মুকুল অঙ্কুরেই ছিন্ন হইল ; বিধাতা তাঁহাকে কালের ক্রোড়ে ভাসাইয়া দিলেন। প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য্য মেঘাবৃত হইল ; কিন্তু মেঘ আর অপসৃত হইল না ;—অন্ধকারের পর অন্ধকার আসিয়া যেন তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আলেক্‌জাণ্ডারের হৃদয়ে পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগরূক ছিল, তাঁহার লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিধাতা সে আশা-আকাঙ্ক্ষার দীপশিখাটি পর্য্যন্ত নিবাইয়া দিলেন। ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার সময় ভারত-সীমান্তে অধিকৃত প্রদেশ-

সমূহের শাসন-ব্যবস্থা আলেক্জাণ্ডার স্থির করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও যেমন ভারতবর্ষের সীমানা ত্যাগ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত উল্টাইয়া গেল। কার্‌মানিয়ায় পৌঁছিয়াই, তিনি নানা বিশৃঙ্খলার সংবাদ অবগত হইতে লাগিলেন। যে সকল সীমান্ত-জাতি, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, এখন তাহারা সকলেই মস্তক উত্তোলন করিল। সিন্ধুনদের পূর্ব্ব-পারের তো কথাই নাই; পশ্চিম-পারেও বিশৃঙ্খলার অবধি রহিল না। তিনি ফিলিপ্পোসকে সিন্ধু-নদের পশ্চিম-তীরস্থিত উত্তর-প্রদেশের 'সাত্রাপ' পদে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। এখন পার্ব্বত্য-জাতিরা ফিলিপ্পোসকে হত্যা করিল। যে দিন সেই হত্যাকাণ্ডের বিষয় আলেক্জাণ্ডারের কর্ণে পৌঁছিল, তিনি সেই দিনই ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সঙ্কল্প তাঁহাকে আর সাধন করিতে হইল না। ফিলিপ্পোসের হত্যার সংবাদেই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইলেন। অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। ফিলিপ্পোসের মৃত্যুর পর ইউডেমাস্ কর্তৃত্ব-পরিচালনে প্রেরিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি নামে মাত্র কিছুকাল সে কর্তৃত্বভার বহন করিতে সমর্থ হন। অল্পদিন পরেই তাঁহাকে এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। আর আর যাঁহারাও সাত্রাপ-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও একে একে ক্ষমতা সম্প্রসারণ করিয়া লইতে হইয়াছিল। প্রধানতঃ দুই কারণে এত অল্প দিনের মধ্যেই এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। প্রথম কারণ,—আলেক্জাণ্ডারের অত্যাচারের বিষয় সীমান্ত-জাতিরা ভুলিতে পারে নাই; তাই তাহারা একটু অবসর পাইবামাত্রই প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। দ্বিতীয় ও প্রধান কারণ,—মগধে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়। চন্দ্রগুপ্ত বুদ্ধি-কৌশলে ও বাহুবলে মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ভারতবর্ষের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভুত্বের ও প্রতাপের নিকট আলেক্জাণ্ডারের প্রতিনিধিগণ কেহই আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারেন নাই। ৩২২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত পঞ্চনদ-প্রদেশ অধিকার করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া পড়ে। ভারতের তাৎকালিক প্রধান প্রধান বীরগণ তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত একচ্ছত্র সম্রাট মধ্যে পরিগণিত হন। ভারতে মাসিডোনীয় সাম্রাজ্য-স্থাপনের আশামূল একেবারে উচ্ছিন্ন হয়।

চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক যখন ভারতে নব-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই সময়ে সেলিউকাস্ ভারতের প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি সঞ্চালন করেন। আলেক্জাণ্ডারের মৃত্যুর পর, তাঁহার দুই জন সেনাপতির মধ্যে এসিয়া-মহাদেশের আধিপত্য সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই দুই সেনাপতির নাম—এণ্টিগোনস ও সেলিউকাস। বিরোধে প্রথমে এণ্টিগোনস্ জয়লাভ করিয়াছিলেন; সেলিউকাসকে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু ৩১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সেলিউকাস্ আপনার নষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। সেই সময় বাবিলন তাঁহার অধিকারে আসে। তিনি 'নিকাটর' বা 'বিজয়ী' নামে পরিচিত হন। ইহার পর, অল্পদিন মধ্যেই সেলিউকাস্ আপনাকে

সেলিউকাসের চেষ্টা।

সিরিয়ার ও মধ্য-এসিয়ার অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষার অবধি নাই! আপনাকে মধ্য-এসিয়ার অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিবার অল্পদিন পরেই, সেলিউকাস্ ভারতবর্ষের অভিমুখে অগ্রসর হন। আলেক্‌জাণ্ডারের ন্যায় বিজয়-খ্যাতি লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ৩০৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সেলিউকাস্ ভারতবর্ষ-জয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ইহাই ভারতের সহিত বৈদেশিকগণের দ্বিতীয় সংশ্রব। যাহা হউক, চন্দ্রগুপ্তের তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। সুতরাং সেলিউকাসের বলবিক্রম স্রোতোমুখে তৃণ-খণ্ডের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়া কোথায় ভাসিয়া যায়। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেলিউকাসের যুদ্ধ হইয়াছিল। * সেই যুদ্ধের ফলে সেলিউকাস্ সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষের সীমানা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন; অধিকন্তু ভারত-সীমান্তে তাঁহার যে 'এরিয়ানা' রাজ্য ছিল, তাহা হইতেও তিনি ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। কেবল এই পর্য্যন্তই এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় নাই; ইহার উপরও 'পারোপানিসাদাই', 'এরিয়া' ও 'আরাকোসিয়া' (কাবুল, হিরাট ও কান্দাহার যথাক্রমে ঐ তিন স্থানের রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত হয়) এই যুদ্ধে সেলিউকাস্‌কে হারাইতে হইয়াছিল। জেড্রোসিয়া অথবা তাহার পূর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধের ফলে, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-সীমা উত্তরদিকে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে বাক্‌ত্রিয়া রাজ্য সেলিউকাসের অধিকারে ছিল; আর তাহার দক্ষিণে হিরাট, কাবুল প্রভৃতি চন্দ্রগুপ্তের অধিকারে আসিয়াছিল। ভারত-সীমান্তের উত্তরে এতাদৃশ আধিপত্য ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মোগল-সম্রাটগণও রাখিতে পারেন নাই। যাহা হউক, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, চন্দ্রগুপ্তকে ঐ সকল প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া, সেলিউকাস্ চন্দ্রগুপ্তের সহিত এক অভিনব মিত্রতা-স্থাপনের কৌশল-জাল বিস্তার করেন। এই উপলক্ষে সেলিউকসের এক সুন্দরী কন্যা চন্দ্রগুপ্তের করে সমর্পিতা হন। কথিত হয়, সেই সেলিউকস-দুহিতাকে, চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করিয়াছিলেন। ফলতঃ, আলেক্‌জাণ্ডার বাহুবলে ভারতের সহিত যে সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, বিজয়ী 'নিকাটর' উপাধিধারী সেলিউকস এখন আততায়ীর হস্তে কন্যা-দানে সেই সম্বন্ধের দৃঢ়তা-সাধনে প্রয়াস পাইলেন। এইরূপে চন্দ্রগুপ্তের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া, সেলিউকস দুইটি উপঢৌকন লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম উপঢৌকন—পাঁচ শত যুদ্ধ হস্তী; দ্বিতীয় উপঢৌকন—চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে দূতরূপে মেগাস্থিনীসের অবস্থান অনুমতি। কন্যা-সম্প্রদানে, আর দূত-রক্ষার ব্যবস্থায়, সেলিউকস্ ভারতের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের যে কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন,

* কোনও কোনও ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন যে, সেলিউকস্ চন্দ্রগুপ্তের প্রাসি-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই 'প্রাসি-রাজ্যের' রাজধানী পালিবোথ্‌রা বলিয়া অভিহিত হয়। পালিবোথ্‌রা—পাটলিপুত্র নামে এক সময়ে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমান পাটনা বা তাহার পারিপার্শ্বিক-স্থানে পাটলিপুত্রের স্থান-নির্দ্দেশ হয়। সেলিউকস প্রাসি-রাজ্য আক্রমণ করেন বলিতে, কেহ কেহ বর্ত্তমান পাটনা পর্য্যন্ত তাঁহার আগমনের কাহিনী ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক। কারণ, অধিক বলিতে কি, সেলিউকস্ সিন্ধুনদ পার হইয়াছিলেন বলিয়াও প্রমাণ নাই। প্রাসি-রাজ্য বলিতে তৎকালে সিন্ধু-নদের পরপার পর্য্যন্ত বুঝাইতে পারে

শত আলেক্‌জাণ্ডারের সহস্র অস্ত্র-মুখেও সে উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারিত না। এই ব্যাপারে বৈদেশিক জাতির পক্ষে ভারতের পথ অনেকটা সুগম করিয়া দিয়াছিল। ৩০৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেলিউকসের এই সন্ধি হয়। এই সন্ধির দুই বৎসর পরে, বাবিলনে প্রত্যাগমনকালে, সেলিউকস কর্তৃক তাঁহার প্রতিযোগী এন্টিগোনস নিহত হন; সেলিউকসের পথের কণ্টক দূরীভূত হয়।

চন্দ্রগুপ্তের সহিত অভিনব জামাতৃ-সম্পর্ক স্থাপনে মেগাস্থিনীসকে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে দূতরূপে অবস্থান করাইয়া, সেলিউকস্ ভারতের সহিত নূতন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করেন।

সম্বন্ধ-বন্ধন ফলে।

সেই সম্বন্ধ-সূত্রে ভারতের সকল আভ্যন্তরীণ তথ্য অবগত হইবার পক্ষে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের দরবারে দূতরূপে অবস্থিতি কালে, ভারতের তাৎকালিক রাজনৈতিক, সমাজ-নৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে মেগাস্থিনীস যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তদ্দ্বারা পাশ্চাত্য-জাতিরা ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হন। সে গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন অংশ-সমূহ—অধুনা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পৎ মধ্যে পরিগণিত। যাহা হউক, অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও, অভ্যন্তরের সংবাদ অবগত হইয়াও, সেলিউকস্ বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ভারতের প্রতি শত্রুভাবে আগুয়ান হইতে সমর্থ হন নাই। ভারতের আভ্যন্তরীণ শক্তি-সামর্থ্যের বিষয় অবগত হওয়ায় বরং তাঁহারা ভারতের প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি-সঞ্চালনে নিরস্ত হইতেই বাধ্য হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ, চন্দ্রগুপ্ত যে প্রতাপ-প্রভুত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সে প্রতাপ-প্রভুত্ব অব্যাহত ছিল; সুতরাং তাঁহাদের তিন পুরুষের মধ্যে বিজাতি বিদেশী কেহই আর ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন নাই। তখন, মিত্রভাবেই বৈদেশিক রাজন্য বর্গের সহিত ভারতীয় নৃপতিগণের ক্রিয়া-কর্ম্ম চলিয়াছিল। তখন, গ্রীসের বা বাকৃত্রিয়ার যাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মিত্রভাবেই সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। অপিচ, তখন ভারতবর্ষ হইতেও ঐ সকল রাজ্যে যদি কেহ গতিবিধি করিতেন, তিনিও মিত্রের ন্যায় সমাদর পাইতেন। এইভাবে প্রায় তিন পুরুষ কাটিয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত, তাঁহার পুত্র বিন্দুসার ও পৌত্র অশোকবর্দ্ধন পাশ্চাত্য-দেশের নৃপতিবর্গের সহিত যেরূপভাবে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, তাহার বহু নিদর্শন ইতিহাসে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। ২৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, সেলিউকসের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র এন্টিওকাস্ সোটর সিংহাসন লাভ করেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার তাঁহাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন এবং সেই সকল পত্রের যে প্রত্যুত্তর পাইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা মাতুল ভাগিনেয়ের সৌহার্দ্দ্য-পরিচয়ই পাওয়া যায়।* মেগাস্থিনীসের ন্যায় ডিমাকো নামক এক গ্রীক-রাজদূত বিন্দুসারের দরবারে অবস্থিতি করিতেন। তদ্ব্যতীত, মিসর-রাজ টলেমি

* একখানি পত্রে ও তাহার উত্তরে প্রকাশ,—বিন্দুসার গ্রীস হইতে ঐ দেশের মদ্য, ডুমুর ও একজন দার্শনিক পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন; এবং তজ্জন্য উচিত মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। গ্রীস-রাজ ডুমুর ও মদ্য পাঠাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু দার্শনিক-বিক্রয় গ্রীস-দেশে নিষিদ্ধ বলিয়া জানাইয়াছিলেন।

ফিলাডেল্‌ফাস, বিন্দুসারের রাজত্বকালে ভারতের রাজদরবারে এক দূত পাঠাইয়াছিলেন বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে। তদ্দ্বারা মিশরের সহিত এবং 'সেলিউকাইড্‌' (সেলিউকসের) বংশের সহিত বিন্দুসারের সৌহার্দ্দ্য সম্বন্ধ বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। * ডাইওনিসাস নামক জনৈক দূত ভারতের বিবরণ সংগ্রহের জন্য তখন মিশর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্বকালে, সম্বন্ধ-সূত্র আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তখন এসিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন রাজশক্তির সহিত তাঁহার মিত্রতা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তখন, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন রাজার রাজ্যে, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। যখন সিরিয়া রাজ্যে এণ্টিওকাস থিয়স্‌, মিশরে টলেমি ফিলাডেলফাস, সাইরিণ-রাজ্যে মাগাস, মাসিডোনিয়ায় এণ্টিগোনাস গোনাটাস এবং এপিরাস রাজ্যে আলেক্‌জাণ্ডার নামা রাজা রাজত্ব করিতেন, তখন সেই সেই রাজ্যে অশোকের প্রেরিত বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য-গণ ও দূতগণ সর্ব্বদা গতিবিধি করিতেন। অশোকের খোদিত-লিপি প্রভৃতিতেই তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে। এদিকে, তখন হিমালয় হইতে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র অশোকের প্রতাপ বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহার দূতগণ ও ধর্ম্মপ্রচারকগণ গতিবিধি করিতেন। তিব্বতে, চীনে, জাপানে, পারস্যে—কোথায় না তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচারকগণের গতিবিধি ঘটিয়াছিল? সুতরাং বুঝিতে পারা যায়,—অশোকের রাজত্বকালে ভারতের সহিত বৈদেশিকগণের সম্বন্ধ-সংশ্রব বেশ দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তবে সে সম্বন্ধ-সংশ্রবের মধ্যে বৈদেশিকগণের শত্রুভাবে ভারতাক্রমণের চেষ্টা যে ছিল না, বন্ধুত্বের মধ্যেই যে সে সম্বন্ধ-বন্ধন দৃঢ় হইয়া আসিয়াছিল, তাহা স্বতঃই উপলব্ধি হয়।

সেলিউকাস্ নিকাটরের পর, ভারতবর্ষে প্রথম যিনি শত্রুভাবে আগমন করেন, তিনি 'এণ্টি-ওকাস্ দি গ্রেট' নামে পরিচিত। অশোকের প্রতাপ কাল-প্রবাহে কিছু খর্ব্ব হইয়া আসিলে,

শত্রুভাবে সম্বন্ধ স্থাপন চেষ্টা।

২০৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে, এণ্টিওকাস্ ভারত-সীমান্তে নিপতিত হন। পার্ব্বত্য-পথে আফগানিস্থানে পতিত হইয়া লুট-তরাজ করিতে করিতে কান্দাহার ও সিস্তান দিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। অল্পদিন মাত্র তিনি ভারত-সীমান্তে অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই তিনি বহু ধন রত্ন এবং কতকগুলি হস্তী অপহরণ করিয়া লইয়া যান। প্রকাশ এই যে, সেই সময়ে কাবুল-উপত্যকায় 'সুভগসেন' রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি রাজচক্রবর্ত্তী অশোক কর্ত্তৃক কাবুল প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এণ্টিওকাস্, ঐ রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া হস্তী এবং ধন-রত্ন প্রভৃতি লইয়া সিরিয়া অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। অধিকন্তু তিনি এণ্ড্রোস্থেনেস্ নামক এক ব্যক্তিকে যুদ্ধে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করিবার জন্য ঐ প্রদেশে রাখিয়া গিয়াছিলেন। এণ্টিওকাস্ কর্ত্তৃক ভারত-সীমান্ত আক্রমণ—আলেকজাণ্ডারের পর দ্বিতীয় আক্রমণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ২০৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এণ্টিওকাসের ভারত-অভিযানের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

---

* টলেমি ফিলাডেল্‌ফাস ২৮৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ২৪৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

বৈদেশিক তৃতীয় আক্রমণকারীর নাম—ডেমিত্রিয়াস। তিনি ইউথিডেমাসের পুত্র এবং এন্টিওকাসের জামাতা। এন্টিওকাস্ যখন বাক্‌ত্রিয়া-রাজ্য অধিকার করিতে যান, তখন বাক্‌ত্রিয়ার পূর্ব্ব রাজবংশের আধিপত্য লোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ম্যাগ্‌নেসিয়া-বাসী ইউথিডেমাস্ তখন ঐ রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। এন্টিওকাসের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়। সেই সন্ধি-সূত্রে ইউথিডেমাস পার্থিয়ার একছত্র রাজা বলিয়া প্রতিপন্ন হন। তাঁহার পুত্র ডেমিত্রিয়াস্ পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়া, ভারতবর্ষ-জয়ে শ্বশুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। কথিত হয়, ১৯০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ডেমিত্রিয়াস্ ভারত-সীমান্তের কিয়দংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাবুল, সিন্ধু-প্রদেশ এবং পঞ্জাবের কিয়দংশ (সম্ভবতঃ সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরের কিছু অংশ) তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। যাহা হউক, ভারতের প্রতি অগ্রসর হওয়ার ফলে, ডেমিত্রিয়াস্‌কে বাক্‌ত্রিয়ার অধিকারটুকু ক্রমশঃ হারাইতে হইয়াছিল। তিনি যখন ভারতের দিকে অগ্রসর হন, সেই সময় ইউক্রেটাইড্‌স বাক্‌ত্রিয়ার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। ১৭৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ইউক্রেটাইড্‌স—গ্রীক-বংশ-সম্ভূত ছিলেন। ইউক্রেটাইড্‌স যখন বাক্‌ত্রিয়া অধিকার করিয়া বসেন, ডেমিত্রিয়াস সে সময়ে আপনাকে 'ভারতের রাজা' বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন। কিন্তু সে নাম-সম্মানও তাঁহাকে অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। অল্পদিন পরেই (১৬০-১৫৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) ইউক্রেটাড্‌ইস তাঁহার সে গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। ডেমিত্রিয়াস ভারতবর্ষের অধিকারটুকু হইতেও বিচ্যুত হন। কথিত আছে, এই যুদ্ধ-ব্যপদেশে ডেমিত্রিয়াস একবার পাঁচ মাস কাল ইউক্রেটাইড্‌স্‌কে একটি দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই দুর্গে ইউক্রেটাইড্‌সের সঙ্গে মাত্র তিন শত সাহায্যকারী সৈন্য ছিল। কিন্তু ষষ্টি সহস্র সৈন্য সহ ডেমিত্রিয়াস সেই দুর্গ আক্রমণ করিয়াও ইউক্রেটাইড্‌সকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই। ভাগ্যলক্ষ্মী যখন সহায় হন, তখন ধূলি-মুষ্টিও স্বর্ণ-স্তূপে পরিণত হয়। ডেমিত্রিয়াস কর্তৃক পূর্ব্বোক্তভাবে আক্রান্ত হইয়াও ইউক্রেটাইড্‌সের বিজয় লাভ—সেই বাক্যই প্রমাণ করিতেছে। ডেমিত্রিয়াসকে পরাজিত করিয়া, বিজয়-মদে উন্মত্ত হইয়া, ইউক্রেটাইডস্ যখন সদলবলে বাক্‌ত্রিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, এই সময় যেন বিনামেঘে তাঁহার মস্তকে বজ্রপাত ঘটিল। ইউক্রেটাইডসের এক পুত্র তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগী রূপে রাজকার্য্য শিক্ষা করিতেছিল। পিতার প্রতিষ্ঠা-প্রভুত্ব দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া, একদিন নিভৃতে পাইয়া, সে পিতার গলদেশে ছুরিকা বসাইয়া দিল। সেই পিতৃঘাতক নৃশংস পুত্র 'আপোল্লোডোটস্' বলিয়া পরিচিত। সেই পিতৃঘাতী নরপিশাচের নৃশংসতার ও পৈশাচিকতার বিবরণে ইতিহাস কি কলঙ্কিত হইয়াই আছে! পিতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া, নরপিশাচ তাঁহার রক্ত-প্রবাহের উপর দিয়া শকট চালাইয়া রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল এবং পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কবর পর্য্যন্ত করিতে উপেক্ষা করিয়াছিল। বিজয়োল্লাসে প্রমত্ত-প্রাণ ইউক্রেটাইড্‌সের এবম্বিধ পরিণাম-প্রদর্শনে, অদৃষ্ট-গতি কি পরিবর্ত্তনশীলা কি বিচক্ষণা; তাহাই বুঝাইয়া দিতেছে। আনন্দে

গ্রীক-বাক্‌ত্রিয় অন্যান্য আক্রমণকারিগণ।

উন্মত্ততা বা বিষাদে অবসাদ—মহাজনগণ তাই মোহজনক বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, সেই নবঘাতক নৃশংস পুত্র যে অধিক দিন বাক্‌ত্রিয়া রাজ্যের বা ভারত-সীমান্তের আধিপত্য-সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাও নহে; পাপের প্রতিফল, সে হতভাগ্যকে হাতে হাতেই ভোগ করিতে হইয়াছিল। হেলিওক্লেস নামক আপন ভ্রাতার হস্তেই আপোলোডোট্‌সের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। পিতৃহন্তা ভ্রাতার সংহারসাধন পূর্ব্বক হেলিওক্লেস্ যখন বাক্‌ত্রিয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন বাক্‌ত্রিয়ার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভারত-সীমান্তে তাঁহার যে রাজ্যটুকু ছিল, সেটুকুও তখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এই সময়ে ইউক্রেটাইড্‌সের বংশের এক ব্যক্তি—প্রথম ষ্ট্রাটো—পঞ্জাব-প্রদেশের আধিপত্যটুকু গ্রাস করিয়া বসিয়াছিলেন। অধুনা সীমান্ত-প্রদেশ হইতে যে সকল প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে গ্রীক্-বাক্‌ত্রিয় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। সেই সকল রাজন্যগণের মধ্যে আগাথোক্লেস, পাণ্টালেওন, এণ্টিয়াল্‌কিডাস প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ। ইউথিডেমাস, ইউক্রেটাইডস, ডেমিত্রিয়াস প্রভৃতির নাম সম্বলিত মুদ্রাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। * সেই সকল মুদ্রার আলোচনায়, সীমান্ত-প্রদেশের তাৎকালিক বিভিন্ন রাজশক্তির বিষয় বেশ উপলব্ধি হয়। তবে তাঁহাদের কাহাকেও আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

সে হিসাবে মেনান্দার (মিনাণ্ডার) চতুর্থ আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন। শত্রুভাবে লুণ্ঠন-ব্যপদেশে ভারতে প্রবেশ করিয়া, তিনি ভারতের সহিত যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনই ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিলুপ্ত হইবার নহে। তিনি শত্রুভাবে ভারতে প্রবেশ করিয়া, এমন-ভাবে ভারতের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া আছেন যে, এখন তিনি ভারতেরই এক পুরুষ রত্ন মধ্যে পরিগণিত হইয়া রহিয়াছেন। মেনান্দার মহাশক্তিশালী ছিলেন। আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-বিজয়ের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিবার জন্য তিনি সঙ্কল্প-বদ্ধ হইয়াছিলেন। ইউক্রেটাইড্‌সের আত্মীয় ও উত্তরাধিকারী বলিয়া, প্রথমে তিনি কাবুল ও পঞ্চনদ প্রদেশের অংশবিশেষ অধিকার করিয়া বসেন, এবং আপনাকে ঐ প্রদেশের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। ভারতবিজয়ের ঐকান্তিক আগ্রহবশে মেনান্দার এক দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল সংগঠন করিয়াছিলেন। সেই সৈন্যদল সাহায্যে তিনি যখন ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হন, সীমান্ত-রক্ষক ক্ষুদ্রশক্তি রাজন্যবর্গ তাঁহার প্রচণ্ড গতির প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া পড়েন। একে একে ভারতের বহু প্রদেশ মেনান্দারের

মেনান্দার।

* বাক্‌ত্রিয়ার বা গ্রীক-বংশ-ভূত এই সকল রাজার রাজত্ব-কালের বিষয় মুদ্রাদির সাহায্যে অধুনা নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে। তদনুসারে আগাথোক্লেস ও পাণ্টালেওন উভয়ে ইউথিডেমাস ও ডেমিত্রিয়াসের সমসাময়িক বলিয়া কথিত হন। আর এণ্টিয়াল্‌কিডাস, এক সময়ে ইউক্রেটাইড্‌স কর্তৃক পরাজিত হওয়ার সংবাদ প্রচার থাকায় তিনও ইউক্রেটাইডসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এই সকল আলোচনায় বুঝা যায়, সীমান্ত-প্রদেশ তখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কতক বা ইউথিডেমাসের, কতক বা ডেমিত্রিয়াসের এবং কতক বা তাঁহাদের প্রতিযোগী ইউক্রেটাইড্‌সের বংশধরগণ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কানিংহাম, র‍্যাপসন, ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতির গবেষণা—আলোচনার বিষয়।

করতলগত হয়। পরন্তু তাঁহার অধিকারে আসে। সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়) উপদ্বীপ তিনি অধিকার করিয়া বসেন, যমুনা নদীর তীরস্থিত পুণ্যপূত মথুরা-নগরী মেনান্দারের আক্রমণে বাধা দিতে অসমর্থ হয়। রাজপুতানার অন্তর্গত মধ্যামিকা * তিনি আক্রমণ করেন, অযোধ্যার দক্ষিণাংশস্থিত সাকেত নগর তৎকর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। এইরূপে মেনান্দার ক্রমশঃ পাটলিপুত্র রাজধানী আক্রমণের জন্যও অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ফলতঃ, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার যাহা পারেন নাই, মেনান্দার সেই অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হইয়া অনেকাংশেই কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। এমন কি, সে সময় মেনান্দারই ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করিলেন বলিয়া দেশব্যাপী একটা বিষম বিভীষিকা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু শুভক্ষণে সেই সময়ে ভারতে এক পরাক্রমশালী হিন্দু নৃপতির আবির্ভাব হয়। তিনি মেনান্দারকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। তখন, মেনান্দারের কবল হইতে যিনি রাজ্য সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি কি মহীয়সী শক্তিরই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন! মেনান্দারের বাধা-প্রদানকারী সেই ভারতীয় নৃপতির নাম—পুষ্পমিত্র। পুষ্পমিত্র ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতিপালক ও অনুসরণকারী ছিলেন। ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া, ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা প্রবাহে ভারতবর্ষকে মাতাইয়া তুলিয়া, তিনি মেনান্দারকে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুষ্পমিত্রের নিকট পুনঃপুনঃ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া, মেনান্দার 'পুংমূষিক ভাব' পরিগ্রহ করেন। মেনান্দারকে ভারত-সীমান্তে বিতাড়িত করিয়া, পুষ্পমিত্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা ভারতের একচ্ছত্র নৃপতি মধ্যে পরিগণিত হন। পুষ্পমিত্র কর্তৃক বিধ্বস্ত বিতাড়িত হইয়া, মেনান্দার নব-ভাব নূতন-প্রকৃতি পরিগ্রহ করেন, পুষ্পমিত্রের সহিত মহাসমরে, অসংখ্য নরমুণ্ডপাতে, তাঁহার প্রাণে অনুতাপের তীব্র অনল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। সে জ্বালার অসহ যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া, মেনান্দার শান্তিবারির অন্বেষণে প্রধাবিত হন। রাজ্যলিপ্সার পরিবর্ত্তে প্রাণে ধর্ম্মলিপ্সা জাগিয়া উঠে। ব্যথিত অন্তরে মেনান্দার পতিতপাবন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারত আক্রমণে তাঁহার শাণিত অসির শোণিত প্রবাহ ভারতবাসীর হৃদয় হইতে তখন অপসৃত হয়। মেনান্দারের মতি পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া, তাঁহাকে ধর্ম্ম-পথের পথিকরূপে পাইয়া, ভারতবর্ষও তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লয়। মেনান্দার 'মিলিন্দ' নামে পরিচিত হন। তাঁহার ধর্ম্মানুসন্ধিৎসা-মূলক প্রশ্নসমূহ, 'মিলিন্দপঞ্হ' নাম পরিগ্রহ করিয়, পালি-ভাষার অক্ষয় ভাণ্ডারে স্থান লাভ করে। † ধর্ম্মপ্রবাহে বিধৌত করিয়া, অতি বড় পাষণ্ড শত্রুকেও ভারতবর্ষ কেমন আপনার জন মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছিল, ভারতের মধ্যকালের ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথম দৃষ্টান্ত। অতি-বড় শত্রুকে আপন করিয়া লওয়ার পক্ষে মধ্যযুগে বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যত্র তাহা বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মেনান্দারের পর হেলিওক্লিস (ইউক্রেটাইডসের পুত্র) বাক্‌ত্রিয়ার

---

* চিতোরের সন্নিহিত বর্ত্তমান 'নাগারী' প্রাচীন মধ্যামিকা বলিয়া উক্ত হয়।

† পালি ভাষা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

সিংহাসন লাভ করেন। তিনিই বাক্ত্রিয়ায় গ্রীক-বংশের শেষ রাজা। হিন্দুকুশের উত্তর সীমানা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য-সীমা বিস্তৃত ছিল, তাহার দক্ষিণে আর তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এদিকে মেনান্দার এমনভাবে ভারতের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশধরগণকে পরিশেষে আর ভারতের বহির্ভাগের লোক বলিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই। মেনান্দার কর্ত্তৃক ভারত-আক্রমণ ও তাঁহার পরাজয়, ভারতবর্ষ-বিজয়ে ইউরোপের চেষ্টার শেষ নিদর্শন। এই ঘটনার পর, দেড়-সহস্রাধিক বৎসরের মধ্যে, ইউরোপ আর ভারতবর্ষ-আক্রমণে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই। ইহার পর, ইউরোপীয়গণের মধ্যে পর্ত্তুগীজ-গণকেই প্রথম ভারত আক্রমণকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পর্ত্তুগীজগণ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সমুদ্রপথে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। সেই সময়, ১৫০২ খৃষ্টাব্দে, পর্ত্তুগীজ ভাস্কো ডি-গামা জলপথে কালিকট সহরে উপনীত হন। মেনান্দারের পর সেই সম্বন্ধই—ভারতীয়গণের সহিত ইউরোপীয়গণের প্রথম সম্বন্ধ এবং সেই চেষ্টাই ভারত-আক্রমণের প্রথম চেষ্টা। মেনান্দারের পর স্থলপথে অগ্রসর হইয়া ইউরোপের আর কোনও জাতিই ভারতবর্ষ আক্রমণে সমর্থ হন নাই।*

বাক্ত্রিয়ার সম্বন্ধ-সংশ্রবের পর, ভারতের সীমান্ত-প্রদেশে পার্থিয়ার সম্বন্ধ-সংশ্রব সংঘটিত হইয়াছিল। পার্থিয়া এক সময়ে পারস্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পার্থিয়া তখন পারস্যেরই একটী অংশ মধ্যে পরিগণিত হইত। পারস্য হীনবল হইলে, পার্থিয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। পার্থিয়ার অধিবাসী পার্থিয়-গণ অসভ্য দুর্দ্ধর্ষ অশ্বারোহী দস্যু-সম্প্রদায় মধ্যে পরিগণিত ছিল। কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে অনুর্ব্বর ভূখণ্ডে তাহারা বসতি করিত। চোরাস্মিয়ে, সোগ্‌ডয়ে, আরিয়ে প্রভৃতি পারস্য সাম্রাজ্যান্তর্ভুক্ত প্রাচীন প্রদেশসমূহ তাহাদের লীলাভূমি ছিল। ঐ সকল স্থান অধুনা খারিজম্, সমরকন্দ এবং হিরাট প্রভৃতি নামে পরিচিত। পার্থিয়ার ও বাক্ত্রিয়ার অভ্যুদয় প্রায় সমসময়েই সংঘটিত হইয়াছিল। পার্থিয়গণ প্রথমে বাক্ত্রিয়-গণের প্রতিদ্বন্দ্বি-রূপেই বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছিল। বাক্ত্রিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তির সময়ে তাহারা তেমন-ভাবে মস্তক উত্তোলন করিতে পারে নাই। কিন্তু বাক্ত্রিয়ার অধিপতি এন্টিওকাস্ থিয়সের

পার্থিয়ার সংশ্রব।

* "From the repulse of Menander in or about 153 B. C. until the bombardment of Calicut by Vasco-da-Gama in A. D. 1502, India enjoyed immunity from European leadership."—V. A. Smith. তবে মেনান্দার যে গ্রীস-দেশ হইতে যাত্রা করিয়া ভারত-বর্ষ জয় করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। হইতে পারে, তাঁহার দূর পূর্ব্বপুরুষ কেহ গ্রীস-দেশীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বা তাঁহার পিতা-পিতামহের গ্রীসের সহিত কোনও সম্বন্ধ ছিল না। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কাবুল-প্রদেশেই কাটিয়াছিল। সুতরাং প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহাকে ইউরোপীয় আক্রমণকারী বলা যায় না। ইউরোপ হইতে যাত্রা করিয়া কেবলমাত্র এক আলেকজান্দারই খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সীমান্তে আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; আর তাহার পর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জলপথে ভাস্কো ডি-গামা প্রভৃতি আসিতে সমর্থ হন। মেনান্দার কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের বিষয় ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তিনি আপোলোডোরাসের নিকট ঐ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে প্রকাশ—আলেকজান্দারের যেখানে গতি রোধ হয়, মেনান্দার সে স্থান (হাইফাসিস) উত্তীর্ণ হন, পাটেলাইন অধিকার করেন, সৌরাষ্ট্র (সারাওষ্টাস) তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। দাক্ষিণাত্যের বারিগাজা প্রভৃতি স্থানে মেনান্দারের মুদ্রা পরবর্ত্তিকালে অনেক দিন পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল। তদ্দরুণ অনেকে মনে করেন, গান্ধার-প্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেও মেনান্দার দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে প্রভুত্ব পরিচালনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে, তাহারা স্বাধীন-জাতি বলিয়া পরিচিত হয়। পরিশেষে বাক্‌ত্রিয়ার গ্রীক-রাজবংশের বিলোপ-সাধন হইলে, বাক্‌ত্রিয়া অধিকারে তাহারা ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা পায়। দুই কারণে তাহাদের সে চেষ্টা প্রকাশ হইয়াছিল। প্রথম কারণ,—বাক্‌ত্রিয়ার প্রাধান্য-লোপে বাক্‌ত্রিয়ার অধিকৃত ভারত-সীমান্ত প্রদেশে আপনাদের প্রাধান্য-খ্যাপনের দুরাকাঙ্ক্ষা তাহাদিগকে ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ,—শকগণের আক্রমণে ও অত্যাচারে আপনাদের জন্মভূমি পরিত্যাগে নূতন আশ্রয়স্থান অনুসন্ধানে তাহাদিগকে ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিয়াছিল। ১৪০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের মধ্যে, শকগণ বাক্‌ত্রিয়া ও পার্থিয়া আক্রমণ করে। সেই সূত্রে বাক্‌ত্রিয়া ও পার্থিয়া রাজ্য ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়। পার্থিয়ার অধিকারী দুর্দ্ধর্ষ সর্দ্দারগণ তখন আপনাদের আশ্রয়স্থান অন্বেষণে দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইয়াছিল। আর সেই সূত্রে ভারতের সীমান্ত-প্রদেশে তাহারা আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হয়। পার্থিয়ার এই দস্যু-সম্প্রদায়ের প্রথম পরিচালক'র নাম—আর্সাকেস্। আর্সাকেস্ হইতেই পারস্যে 'আর্সাকিডান'-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। প্রায় পাঁচ শতাব্দী কাল (২৪৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) এই বংশের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। পার্থিয়ার যে রাজা প্রথমে ভারতবর্ষে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহার নাম—প্রথম মিথ্‌রাডেটস্। ১৭১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্ব-কাল বলিয়া উক্ত হয়। তিনি সিন্ধু-নদের পূর্ব্ব-তীর পর্য্যন্ত আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তক্ষশিলার এবং মথুরার তৎকালিক অধিপতিগণ যে সাত্রাপ নামে অভিহিত ছিলেন, তাহাতে পার্থিয়ার প্রভাব ছিল বলিয়া, ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করেন। এই হিসাবে পার্থিয়ার রাজকে ভারতের পঞ্চম আক্রমণকারী বলা যাইতে পারে। মিথ্‌রাডেটসের পর পার্থিয়ার দুই জন রাজা (ফ্রেটেস দ্বিতীয় এবং আর্ত্তাবানাস প্রথম) শকদিগের হস্তে নিহত হন। সঙ্গে সঙ্গে পার্থিয়ার রাজন্যবর্গের স্বদেশের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। তখন তাঁহারা 'ভারতের নৃপতি' বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতে প্রয়াসী হন। ইতিহাসে 'ইন্দো-পার্থিয়' রাজবংশের নামকরণ সেই হইতেই সূচিত হয়। মাউয়েস (মাউয়াস) ভারতে 'ইন্দো-পার্থিয়' রাজবংশের আদি-রাজা বলিয়া অভিহিত। ১২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, তিনি পঞ্জাবের পশ্চিমাংশে 'রাজার রাজা' নাম পরিগ্রহ করিয়া, আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। প্রথম মিথ্‌রাডেটস কর্তৃক সীমান্তের যে অংশটুকু ১৩৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে পার্থিয়া-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, সেইটুকু মাউয়েসের অধিকারে আসে। কেহ কেহ বলেন,—মাউয়েস শক জাতীয় ছিলেন; পার্থিয়ার নৃপতিদ্বয়কে হত্যা করিয়া, ভারতবর্ষের অংশটুকু তিনি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া, যে কয়েক জন পার্থীয় নৃপতি খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগ হইতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, ভারতের অংশ-বিশেষে আধিপত্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভনোনেস্, আজেস্ প্রথম, আজিলাইসেস্, আজেস্ দ্বিতীয় এবং গণ্ডোফারেস্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা কোন্ সময় ভারতের কোন্ অংশটুকু

অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, ঐতিহাসিকগণ এখন ইঁহাদের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সকল পার্থীয় নৃপতিগণ যখন ভারতের অংশ-বিশেষ অধিকার করিয়াছিলেন, কথিত হয়, সেই সময়ের মধ্যে পার্থিয়া দুই বার আপনার লুপ্ত-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। টেসিফোন ও দ্বিতীয় মিথ্‌রাডেট্‌স শকদিগের কবল হইতে পার্থিয়ার পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। ভনোনেস্‌, আজেস্‌ প্রভৃতি সে সময়ে তাঁহাদের প্রতিনিধি মধ্যে গণ্য হন। গণ্ডোফারেসের মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় আজেস্‌ ভারত-সীমাস্থিত পার্থিয়া-জ্যের আধিপত্য লাভ করেন। সিন্ধু-দেশ ও আরাকোসিয়া প্রদেশ জয় করিয়া, তিনি আপনার রাজ্য-সীমা অনেকাংশে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তদ্বংশীয়গণের মধ্যে, পার্থীয়গণের অধিকৃত প্রদেশ বিভক্ত হইয়া যায়। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দাগাসেস্‌ পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ প্রাপ্ত হন; আরাকোসিয়া ও সিন্ধু-দেশ আর্থাগ্নেসের অংশে পড়ে। আব্দাগাসেসের উত্তরাধিকারীর কোনও পরিচয় নাই। পাকোরেস উত্তরাধিকার-সূত্রে আর্থাগ্নেসের অংশ লাভ করেন। তাহার পর, পার্থীয়গণের প্রাধান্য একেবারে লোপ পাইয়া যায়; ভারতবর্ষের অধিবাসী মধ্যে পরিগণিত হইয়া তাঁহারা ভারতের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া ফেলেন। পার্থিয়ায় রাজ-বংশ হৃত-সর্ব্বস্ব হওয়ার প্রধান কারণ—য়ুচি, কুষণ বা শক আক্রমণকারিগণের আক্রমণ। ঐ আক্রমণকারিগণের আক্রমণের ঝঞ্ঝাবাতেই, গ্রীক-বাক্ত্রিয় রাজবংশের শেষ-শিখা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। হারমেইওস্‌, গ্রীক-বাক্ত্রিয় রাজবংশের পরিত্যক্ত শেষ সম্পৎটুকু লইয়া, ভারতের এক প্রান্ত-ভাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কাবুলে তাঁহার রাজধানী ছিল। সহসা কুষণ-আক্রমণকারিগণ আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে সেটুকু কাড়িয়া লইলেন। ইন্দো-গ্রীক ও ইন্দো-পার্থিয় অধিকারের লোপ এইরূপে প্রায় সমসময়েই সংঘটিত হইয়াছিল। খৃষ্ট-পর-শতাব্দীতে ভারতের কোনও কোনও অংশে পার্থিয়ার, বাক্ত্রিয়ার, বা গ্রীসের সন্তান-সন্ততিগণকে যদিও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সে আধিপত্য ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নহে। তাঁহারা ভারতের উপর কোনও প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। পরবর্ত্তিকালে তাঁহারা কেহ বা বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণে কেহ বা খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে ভারতের অধিবাসী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের নাম ও উপাধি এতই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছিল যে, তখন আর তাঁহাদিগকে বৈদেশিক বলিয়া বুঝিতে পারাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ে 'সাত্রাপ' উপাধি ক্ষহর্ত্তা, ক্ষত্রপ, মহাক্ষত্রপ প্রভৃতি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল; আর সেই সাত্রাপগণের নাম—রুদ্রদমন, ভুমক, নাহাপান, দক্ষমিত্র প্রভৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। * সাত্রাপ-রূপে পরিচিত হইয়াও তাঁহারা ভারতীয় তাৎকালিক হিন্দু বা বৌদ্ধ নৃপতিগণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং নিজেরাও আচারে-ব্যবহারে ধর্ম্মে কর্ম্মে অনেকটা হিন্দু বা বৌদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

---

* ইঁহাদের মধ্যে কেহ পার্থিয়, কেহ বাক্ত্রিয় এবং কেহ বা সিদীয় (শক) ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

শকগণ ও হূনগণ।

[শকদিগের ভারত আক্রমণ ;—কণিষ্ক ও তাঁহার বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রহণ ,—হূনগণের ভারত আক্রমণ —তোড়মান, মিহিরকুল প্রভৃতির নৃশংস ব্যাপার ,—গ্রীসের, বাকত্রিয়ার, পার্থিয়ার এবং শকগণের ও হূনগণের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সংস্রবের পরিণতি।]

শকগণের ভারত আক্রমণ।

গ্রীক্‌গণের, বাক্‌ত্রিয়-গণের ও পার্থিয়-গণের, আক্রমণের পর ভারতবর্ষ শকগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, শকগণ ভারতবর্ষেরই আদিম অধিবাসী, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার দিনে, যে কয়টি ক্রিয়াভ্রষ্ট আচারভ্রষ্ট জাতি ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, শকগণ তাহাদেরই অন্যতম। পারদ (পারসিক), পহ্লব প্রভৃতি জাতিগণের অনুসরণে শকগণ মধ্য-এসিয়ায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। মধ্য-এসিয়ায় তাহাদিগের এক উপনিবেশ স্থাপিত হয়। শকগণের নামানুসারে তাহা 'শকস্থান' * নামে পরিচিত ছিল। কিছু কাল ঐ উপনিবেশে বসবাসের পর, পারিপার্শ্বিক শক্তি-সমূহের উপদ্রবে বিব্রত হইয়া, শকগণকে আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আদি-উপনিবেশ-স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া, শকগণ জাক্‌জার্ত্তেজ নদীর উত্তর-তীরস্থিত অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ডে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাহারা ঐ নূতন উপনিবেশে বসবাস করিতেছিল। মধ্য-এসিয়ার তাৎকালিক অন্যান্য দুর্দ্ধর্ষ জাতিদিগের ন্যায়, লুণ্ঠন ও দস্যুতা প্রভৃতি দ্বারাই প্রধানতঃ শকগণকে জীবিকার্জ্জন করিতে হইত। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে, ইয়েচি-গণ (যু চিং) † কর্ত্তৃক তাহারা আক্রান্ত হয়। ফলে শকগণকে আপনাদের আবাস-স্থান পরিত্যাগ করিয়া, আবার নূতন

---

† গ্রীকগণ শকস্তেন (Sakastene) নামে সেই দেশের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন 'শকস্থান' এখন সিস্তান নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

* চীন-রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমের অংশে কাঙ-সু প্রদেশে 'ইয়ে-চি' জাতির বসতি ছিল। 'হিউং নু' নামধেয় তুর্কজাতীয় একশ্রেণীর লুণ্ঠনকারী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তাহারা স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হয়। ১৭৪ হইতে ১৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। প্রায় এক লক্ষ ইয়েচি জাতীয় নর-নারী স্বদেশ হইতে এইরূপে বিতাড়িত হইয়া মধ্য-এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। গোবী মরুভূমির উত্তর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে প্রথমে 'উ-সুঙ' জাতির সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। উ-সুঙ-গণ ইলি-নদীর উপত্যকা-প্রদেশে বাস করিত। এই উ-সুঙ গণের পশ্চিমাংশে শকদিগের বসতি ছিল। প্রায় ২০ বৎসর-কাল ইয়েচি গণ উ-সুঙ-দিগের রাজ্যেই বাস করিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে উ-সুঙ সর্দ্দারের এক পুত্র কর্ত্তৃক তাহারা ঐ দেশ হইতে বিতাড়িত হয়। আপনাদের রাজ্য ইয়েচি-গণ অধিকার করিলে, ঐ সর্দ্দার-পুত্র ইয়েচি-গণের পূর্ব্ব-শত্রু হি-উঙ-গণের আশ্রয় পাইয়াছিল। তাঁহাদের সহায়তায় সর্দ্দার পুত্র যখন পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন, ইয়েচি-গণ তখন শকরাজ্য অভিমুখে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল। শাকরা তাঁহাদের আক্রমণে বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া, পার্থিয়া ও বাক্‌ত্রিয়ার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে ধাবমান হয়। শকগণের ভারত আক্রমণের ইহাই সূত্রপাত বলিয়া অনেকে নির্দ্ধারণ করেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও শকগণের ভারত-আক্রমণের পরিচয় পাওয়া যায়। ("পৃথিবীর ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ড 'কাশ্মীর-রাজ্য' দ্রষ্টব্য)।

আশ্রয় অন্বেষণ করিতে হইয়াছিল। তাহাদের সেই আশ্রয়-অনুসন্ধান-চেষ্টার ফল—তাহাদের ভারতে প্রবেশ। শকগণ প্রথমে বাকৃত্রিয়া অধিকার করে। পার্থিয়-গণ ক্রমশঃ তাহাদিগের নিকট পরাজিত হয়। তখন তাহারা নূতন আশায় উন্মত্ত হইয়া, ভারতের প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি সঞ্চালন করে। কোন্ সময় কোন্ পথে কি ভাবে শকগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে নানা মতান্তর আছে। হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, এক সময়ে শকগণ কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করিয়াছিল; এবং মথুরা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি জনপদ শকগণের কবলে নিপতিত হইয়াছিল। খৃষ্ট-জন্মের বার শত বৎসর পূর্ব্বে শকগণের এক বার আক্রমণের বিষয় অবগত হওয়া যায়। আবার খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৭ অব্দে শকগণের ভারত-আক্রমণের বিষয় জানিতে পারি। অধুনা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ শকগণের প্রথম ভারতাগমন খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ঘটনা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। আমরা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন সময়ে শকগণের ভারত-আক্রমণের বিবরণই স্বীকার করি। তাহারা ভারতের প্রাচীন জাতি। পারদ, পহ্লব প্রভৃতির ন্যায় ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া, তাহারা যে পুনঃপুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণের চেষ্টা পাইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছিল; সুতরাং সে সকল আক্রমণ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য হয় নাই। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তাহারা আপনাদের কিছু পরিচয়-চিহ্ন ভারতবর্ষে রাখিতে সমর্থ হয়; তাই, সেই হইতে তাহাদিগকে ভারতের আক্রমণকারী পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়া থাকে। শক-গণের ভারত-আক্রমণের কাল—খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৭ অব্দে বা তাহার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সে আক্রমণ, ভীষণ আক্রমণ হইলেও, তদ্দ্বারা ভারতের সহিত শকগণের কোনও স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। যে সময় শকগণের ঐ আক্রমণ সংঘটিত হইয়াছিল, তখন রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তখন ভারতে আবার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রদীপ্ত প্রভাব। সুতরাং, শকগণ তখন ভারতের অঙ্গে অঙ্গক্ষেপ মাত্র করিয়াই, পলায়নপর হইতে বাধ্য হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য প্রবর্ত্তিত অব্দ ভারতবর্ষ হইতে শকগণের উচ্ছেদ সাধন-বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া আজিও অব্যাহত রহিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যে শক-নৃপতি ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন, তিনি ইউরোপীয়গণের নিকট প্রথম কাড্‌ফাইসেস্ নামে অভিহিত। তিনি আপন রাজ্য-সীমা পারস্য-সীমান্ত হইতে সিন্ধু-নদের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সোগদিয়ানা, বুখারার অন্তর্গত খানাৎ এবং বর্ত্তমান আফ্‌গানিস্থান রাজ্য তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। প্রথম কাড্‌ফাইসেস্ ১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন বলিয়া প্রকাশ আছে। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কাড্‌ফাইসেস্ রাজা হন। তিনি বারাণসী পর্য্যন্ত আপনার আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে। এই দ্বিতীয় কাড্‌ফাইসেসের খোদিত মুদ্রা ভারতের বিভিন্ন স্থানে (কাবুল হইতে গাজিপুর ও বারাণসী পর্য্যন্ত এবং কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ে) পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐ সকল স্থানে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। কাড্‌ফাইসেসের পর কনিষ্ক শক-বংশের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন।

তিনি সম্রাট বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। কণিষ্কের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল-সম্বন্ধে এবং তাঁহার বংশ-পর্য্যায় বিষয়ে সহস্র মতান্তর থাকিলেও, ভারতের ইতিহাসে তিনি একজন প্রখ্যাত-নামা পুরুষ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত আছেন। *

দ্বিতীয় কাড্‌ফাইসেসের পর কণিষ্ক শক-বংশের সিংহাসন লাভ করেন। † তিনি যে একজন অমিত-পরাক্রমশালী বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার রাজ্য-সীমার আলোচনা করিলেই তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র দেশ এবং উজ্জয়িনী প্রদেশ তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল। উত্তরে ভারত-সীমান্তে আফ্‌গানিস্থান তাঁহার রাজ্যের কেন্দ্র মধ্যে পরিগণিত ছিল। পুরুষপুরে (পেশোয়ার প্রদেশে) তিনি রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান্ প্রভৃতি তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তিব্বতের উত্তরস্থিত, চীন-সাম্রাজ্যান্তর্গত তুর্কি-স্থান, তিনি আপন অধিকারে আনিয়াছিলেন। প্রথমে সীমান্ত-রক্ষার জন্য তাঁহাকে চীনের করদ-রাজ মধ্যে পরিগণিত হইতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু পরিশেষে তিনি সে সম্বন্ধ-বন্ধনও ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বীরত্বে এতাদৃশ নিদর্শন-পরম্পরার উপর কণিষ্ক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রহণে ভারতের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দিয়া যে যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। বৈদেশিক আক্রমণকারিগণের মধ্যে ভারতের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়াছিলেন বলিয়া মেনান্দারের নাম যেমন উজ্জ্বল হইয়া আছে, কণিষ্কের স্মৃতি কর্ম্মগুণে তাহারও অধিক সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। যখন দেশ-বিজয়ে নরশোণিত-পাতে পাপের আঁধারে হৃদয় সমাচ্ছন্ন, সহসা বুদ্ধদেবের দিব্য-জ্যোতিঃ কণিষ্কের হৃদয় মধ্যে উদ্ভাসিত হইল! অনুতাপের অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়া গেল। কণিষ্ক পাপিত্রাতা বুদ্ধদেবের চরণে শরণ লইলেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের শেষজীবনে যেমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, কণিষ্কের জীবনেও সেই পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। এখন তিনি দেশলুণ্ঠনকারী শক বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুসরণে দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণগ্রামে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণে পরিবৃত হইয়া, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মহিমা-গান কীর্ত্তনে, শেষ জীবন তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার

কণিষ্ক।

* শক-বংশীয় একাধিক নৃপতির একই নাম দেখিতে পাই। একই কণিষ্ক (কনিষ্ক) নাম বহু সময়ে উল্লেখ আছে। আর সেই জন্য ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপৌর্য্য রক্ষায় বিঘ্ন ঘটে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত শকগণের একটা পৌর্ব্বাপৌর্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

† কণিষ্ক শক-নৃপতি বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু কেহ কেহ বলেন,—কণিষ্ক ইয়েচি-জাতির কুষণ-শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শক, কুষণ, ইয়েচি প্রভৃতির সম্বন্ধ-সংশ্রব এক সময়ে বড়ই জটিল হইয়া পড়িয়াছিল। ইন্দো-সিদীয়গণ (ভারতের অধিবাসী শকগণ)—কুষণ সংজ্ঞা লাভ করেন বলিয়াই প্রসিদ্ধি। ইয়েচি-গণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ-সংশ্রব ঘটিয়াছিল বলিয়াই তাঁহাদিগকে ইয়েচি-জাতির শাখা বলা হয়,—এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রবন্ধে নানা স্থানে মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রায় ৪৫ বৎসর কাল কণিষ্ক রাজত্ব করেন। অধুনা তাঁহার শেষ নিদর্শন নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইতেছে। কণিষ্কের পর বাসিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি রাজত্ব করেন। তাঁহারা কেহই কণিষ্কের ন্যায় প্রতাপশালী ছিলেন না। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে আপনাদের আধিপত্য রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মথুরা, কাশ্মীর ও কাবুল অনেক দিন পর্য্যন্ত এই বংশের অধিকারে ছিল। বাসুদেবই এই বংশের শেষ রাজা। ১৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুতরাং শক-বংশের প্রাধান্যের উহাই শেষ। তাহার পর শক-বংশের যে সকল বংশধর ভারতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা ক্রমে ভারতের অধিবাসীর মধ্যেই গণ্য হইয়া যান। কাবুলে কুষণ বা শক বংশের আধিপত্য খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। শেষে হূণগণের উপদ্রবে সে বংশের বিলোপ-সাধন হয়। তখন ভারতে উপনিবিষ্ট শকগণ বৌদ্ধ মধ্যে পরিগণিত হইয়া, আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আক্রমণকারী বৈদেশিক জাতিগণ কিরূপভাবে ভারতের সঙ্গে মিশিয়া যায়, বাকৃত্রিয়, পার্থিয়, সিদীয় প্রভৃতি জাতির পরিণতির বিষয় অনুধাবন করিলে তাহা বেশ উপলব্ধি হইতে পারে। কণিষ্কের প্রভাব যখন গুজরাট প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হয়, তাঁহার প্রতিনিধি-শাসনকর্তৃগণের উপর যখন গুজরাট রাজ্য শাসনের ভার সমর্পিত হয়, তখন সেই শাসনকর্তৃগণের কি পরিবর্তনই সাধিত হইয়াছিল! 'সাত্রাপ' সংজ্ঞার পরিবর্তে তাঁহারা তখন 'ক্ষহর্ত্তা' সংজ্ঞা লাভ করেন। ভারতের ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম বা অপধর্ম্ম মনে করার বিষয় একেবারে ভুলিয়া যান। নাসিকের গিরি-গুহায় 'ক্ষহর্ত্ত' নাহাপানের যে খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের এই ভাবান্তরের বিষয় স্পষ্ট প্রকাশ আছে। সেই খোদিত লিপিতে প্রকাশ,—নাহাপান ব্রাহ্মণগণকে বিশেষরূপ সমাদর করিতেন, ব্রাহ্মণগণ নাহাপানের নিকট নানা উপঢৌকন প্রাপ্ত হইতেন; নাহাপান ব্রাহ্মণগণকে ও তাহাদের দেবদেবীর উদ্দেশ্যে বহু গ্রাম নগর দান করিয়াছিলেন, নাহাপান প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। ভারতবর্ষের ধর্ম্মমূল উচ্ছেদ-কারী দুর্দ্দমনায় শক-জাতির অধিপতি হইয়াও ব্রাহ্মণগণের প্রতি নাহাপানের এতাদৃশ সদ্ব্যবহার দৃষ্টে—হয় তাঁহাকে কূটরাজনৈতিক বলিয়া মনে করিতে পারি—নয় তিনি যে একেবারে ভারতের সঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাই মনে হইতে পারে। সৌরাষ্ট্র-দেশের শাসনকর্তা রূপে পরিচিত 'সাহ'-রাজগণের প্রবর্ত্তিত বহু প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায়, নাহাপান ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ সৌরাষ্ট্রের 'সাহ'-বংশীয় রাজা * বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই 'সাহ'-রাজবংশে সপ্ত-

---

* এই সাহ'-বংশীয় রাজগণের মধ্যে রুদ্রদমন বিশেষ প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি মহাক্ষত্রপ (প্রধান সাত্রাপ) বলিয়া অভিহিত হন। গির্ণারের নিকট সেতুগাত্রে তাঁহার এক খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সেতু—রুদ্রদমনের সেতু বলিয়া অভিহিত হয়। ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সেতু তিনি নির্ম্মাণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সেতুগাত্রাঙ্কিত লিপিতে প্রকাশ,—ঐ সেতু বহু পূর্ব্বকালের; চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক কর্তৃক উহার সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। তার পর প্রবল বন্যায় সেতু ভাঙ্গিয়া যায়। তখন রুদ্রদমন ঐ সেতু পুনর্নির্ম্মাণ করেন। এই 'সাহ'-বংশীয় রাজগণের সহিত অন্ধ্র-রাজগণের সর্ব্বদাই বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটিত,—সেতুগাত্রাঙ্কিত লিপিতে তাহা প্রকাশ আছে।

বিংশতি জন নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। সাহ বংশীয় সেই সকল নৃপতির নাম, রাজ্য-প্রাপ্তিকাল এবং মুদ্রাদি প্রবর্ত্তনার সময় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ; যথা,—

নাম	মুদ্রার কাল (শকাব্দ)	রাজ্যকাল। (খৃষ্টাব্দ)	নাম	মুদ্রার কাল (শকাব্দ)	রাজ্যকাল। (খৃষ্টাব্দ)
নাহাপান (বংশের প্রতিষ্ঠাতা)	৪১	১১৯	যশোদমন	১৬০	২৩৮
			বিজয়সেন	১৬০	২৩৮
চষ্টন	—	—	ঈশ্বরদত্ত	—	—
জয়দমন	—	—	দমজদশ্রী	১৭৬	২৫৪
রুদ্রদমন	৭২	১৫০	রুদ্রসেন	১৮০	২৫৮
দমজদশ্রী	—	—	বিশ্বসিংহ	১৯৮	২৭৬
জীবদমন	১০১	১৭৮	ভর্ত্তৃদমন	২০০	২৭৮
রুদ্রসিংহ	১০৩	১৮১	সিংহসেন	—	—
রুদ্রসেন	১২৫	২০৩	বিশ্বসেন	২১৬	২৯৪
সঙ্ঘদমন	১৪৪	২২২	রুদ্রসিংহ	২৩১	৩০৯
পৃথ্বীসেন	১৪৪	২২২	যশোদমন	২৪০	৩১৮
দমসেন	১৪৮	২২৬	সিংহসেন	—	—
দমজদশ্রী	১৫৪	২৩২	রুদ্রসেন	২৭০	৩৪৮
বীরদমন	১৫৮	২৩৬	রুদ্রসিংহ	৩১০	৩৮৮

মুদ্রার অঙ্কিত অব্দ-শকাব্দ বলিয়া স্থির করিয়া লইয়া অনুসন্ধিৎসুগণ সৌরাষ্ট্রের সাহ-রাজগণের ঐরূপ কাল-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, উঁহাদের উপাধি ও নাম প্রভৃতি দেখিলে উঁহারা আপনাদের পূর্ব্ব সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া ভারতের সহিত কিরূপভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে। এইরূপভাবে মিলন-মিশ্রণের ফলে উঁহাদের প্রভাব স্থায়ী হইয়াছিল। এই 'সাহ'-রাজবংশ ব্রাহ্মণদিগকে নগর-গ্রাম সম্পত্তি প্রভৃতি দানে, পুষ্করিণী-খননে, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি স্থাপনে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কণিষ্কের পর উঁহারা যে স্বাধীনতা অবলম্বনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সদ্ব্যবহারই তাহার কারণ বলিয়া মনে হয়। কণিষ্কের পরিবর্ত্তনের প্রভাব সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। শেষ জীবনে তিনি যেমন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সেবায় জীবনপাত করিয়াছিলেন, শেষ জীবনে তিনি যেমন জনসাধারণের হিতানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহার সে প্রভাব তাঁহার প্রতিনিধিগণের মধ্যেও অনেক পরিমাণে বিস্তৃত ছিল। -

শকগণের পর যে জাতি ভারত-আক্রমণে বা ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠনে অগ্রসর হয়, তাহা হুন বলিয়া পরিচিত। ক্রিয়াভ্রষ্ট, আচারভ্রষ্ট হওয়ায় যে সকল জাতি ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, হুনগণ তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। হুনগণ মধ্য এসিয়ার বিভিন্ন স্থানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই হুনগণই 'হিউঙ্‌-নু' নামে এক সময়ে পরিচিত হয় এবং শক ও ইয়েচি-গণকে ইহারাই স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করে। যাহা হউক, কিছুকাল পরে, হুনগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, মধ্য-এসিয়ার দুই প্রান্তে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল। দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হেতু একদল 'শেফ্‌থা-

হুনগণের ভারত আক্রমণ।

লাইট বা হোয়াইট্ হূন্' নামে এবং অপর দল 'সার্মাটিয়ান্ বা সিদিয়ান্' হূন্ নামে পাশ্চাত্য-দেশে পরিচিত। প্রথমোক্ত হূন্গণ পারস্যের দক্ষিণাংশে বসতি করিত; আর শেষোক্ত হূন্গণ ইউরোপ ও এসিয়ার মধ্যবর্তী 'সার্মাটিয়া' প্রদেশে বসবাস করিত। এই উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত হূন্দিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত সংগ্রহ হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের কেহ (নেপার) উঁহাদিগকে মঙ্গোলীয়-বংশসম্ভূত বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন; কেহ বা (হাম্বোল্ট) উহাদিগকে 'উগ্রীয়ান' বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন; আবার কেহ কেহ বা (লাথাম্ প্রভৃতি) উঁহাদিগকে তুর্ক-বংশসমুদ্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইতিহাসে হূন্গণের প্রথম প্রসিদ্ধি—চীন-সাম্রাজ্য আক্রমণে। হূন্গণ ২০১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে চীন সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। চীনের সম্রাট সে আক্রমণে বিশেষ অপদস্থ হন। ৯৩ খৃষ্টাব্দে উহারা চীনের সীমানা হইতে বিতাড়িত হয়। তখন উহারা তাতার দেশের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহার পর একদল হূন ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয়, আর এক দল হূন্ ভারতের দিকে লোভ-লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, হূন্গণ ইউরোপকে যেরূপ বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, ইউরোপের ইতিহাস সে সাক্ষ্য বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। ভারতের প্রতি হূন্গণের দৃষ্টি অনেক দিন হইতেই পতিত হইয়াছিল; কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত তাহারা কোনও সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া পায় নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে হূন্গণ ভারত-লুণ্ঠনে অগ্রসর হয়। প্রথমে তাহারা পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিমাংশে গান্ধারে লুণ্ঠনকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে সে লুণ্ঠনের সীমানা বৃদ্ধি পায়। কুষণ-রাজ্য গ্রাস করিয়া, হূন্গণ গান্ধার ও পেশোয়ার বিধ্বস্ত করে। পরিশেষে গাঙ্গ্য-প্রদেশ আক্রমণে অগ্রসর হয়। তোরামান ঐ হূন্গণের পরিচালক ছিলেন। সীমান্তে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, প্রথমে তিনি মধ্য-ভারতের মালবে গিয়া রাজোপাধি গ্রহণ করেন। পার্শ্ব-পার্শ্বিক দুই এক জন নৃপতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতির আতঙ্কে দেশ কাঁপিয়া উঠে। ৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তোরামানের অভ্যুদয়-কাল নির্দ্দিষ্ট হয়। তোরামানের পর তাঁহার পুত্র মিহিরকুল (মিহিরগুল) রাজা হইয়াছিলেন। সাকল (পঞ্জাবের শিয়ালকোট) তাঁহার রাজধানী ছিল। মিহিরকুল ভারতবর্ষকে যেরূপভাবে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার আক্রমণকালে ভারতবর্ষ যেরূপ নরশোণিত-স্রোতে প্লাবিত হইয়াছিল, তাহার তুলনা হয় না। কত গ্রাম-নগর মিহিরকুল কর্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছিল। কত নরনারী দাসদাসীরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। ইউরোপ যেমন হূন্-সর্দ্দার আটিলার নামে কাঁপিয়া উঠিত, মিহিরকুলের নামেও ভারতবর্ষ সেইরূপ কম্পান্বিত হইত। প্রায় ১৮ বৎসর কাল মিহিরকুল পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু পরিশেষে অত্যাচার যখন অসহ্য হইল, ভারতের বিচ্ছিন্ন রাজশক্তি তখন একসূত্রে গ্রথিত না হইয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। মগধরাজ বালাদিত্য, মধ্য-ভারতের অধিপতি যশোধর্ম্মণ প্রভৃতি তখন একসূত্রে গ্রথিত হইলেন। বিষম সমরানল প্রজ্বলিত হইল; আর সে সমরে মিহিরকুল বন্দী হইলেন। বন্দী মিহিরকুলের প্রাণদণ্ড হইত, কিন্তু মগধা-

ধিপতির অনুকম্পায় মিহিরকুল প্রাণভিক্ষা পাইলেন। বন্দী মিহিরকুলকে পরিশেষে ভারত-সীমান্তরে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ভগ্ন-মন ভগ্ন-স্বাস্থ্য হওয়ায় মিহিরকুলকে অধিক দিন বাঁচিতে হয় নাই। সীমান্তে পৌঁছিবার অল্পদিন মধ্যেই কালের কঠোর কশাঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। মিহিরকুলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হূনদিগের পতনের পথ প্রশস্ত হইয়া আসে। মিহিরকুলের ভ্রাতা কাশ্মীর-জয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বহু ধর্ম্ম-মন্দির বিধ্বস্ত করার পর, বহু মর্ম্মান্তিক অত্যাচার সংসাধনের পর, তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। সঙ্গে সঙ্গে হূনদিগের ভারত-অধিকারের কল্পনা একেবারে লোপপ্রাপ্ত হয়। হূনদিগের বংশধরগণ যাহারা এদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, পরিশেষে তাহারা ভারতের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, ভারতের একটী আচার-ভ্রষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

বৈদেশিক সংস্রবের পরিণতি।

ইন্দো-পার্থিয় রাজগণের প্রাধান্য সময়ে, বিশেষতঃ গণ্ডোফারেস্ যখন পার্থীয় অধিকারে একাধিপত্য ক্ষমতা লাভ করেন, সেই সময়ে খৃষ্ট-ধর্ম্মপ্রচারকগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। আর প্রায় সেই সময়েই, দাক্ষিণাত্যের সহিত রোম-সাম্রাজ্যের এক বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। মালবার উপকূলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক সেণ্ট টমাস ঐ উপকূলে আসিয়া খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার আছে। ৫২ খৃষ্টাব্দে সকোত্রা দ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া, তিনি জলপথে পশ্চিম উপকূলে ক্রাঙ্গানোর নামক স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। প্লিনির এবং 'পেরিপ্লাস্' গ্রন্থের লিখিত প্রাচীন মুজিরিস্ বন্দর অধুনা ক্রাঙ্গানোর নামে পরিচিত হয় বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। ঐ বন্দর হইতে মাবার বা করোমণ্ডল উপকূলে তিনি খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজের সন্নিকটে মৈলাপুর—সত্যের জন্য তাঁহার জীবনোৎসর্গের ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিহ্নিত হইয়া থাকে। অধুনা ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের যে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান, পার্থীয়-রাজ গণ্ডোফারেস্ তাহার প্রথম উৎসাহদাতা ছিলেন। যদিও ধর্ম্মবিপ্লবের ঘাতপ্রতিঘাতে, খৃষ্টধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনার সে চিহ্ন ভারতের অঙ্গ হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছিল; কিন্তু প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের গবেষণার ফলে, সে লুপ্ত-স্মৃতির কিছু কিছু পুনরুদ্ধার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সময়ে বাণিজ্য ব্যপদেশে রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের যে সম্বন্ধ-সংস্রব হইয়াছিল, তাহারই ফলে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের ভারতে প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। এই সময় বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য ও ভারতে বিভিন্ন দেশের দূতগণের গতিবিধি ঘটিয়াছিল।* ফলতঃ, শত্রুভাবে না হইলেও, এই সময় হইতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি ভারতে প্রবেশ লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তবে ঐ সকল বৈদেশিক জাতিরা প্রায়ই সীমান্ত-প্রদেশে বা পশ্চিম উপকূলে এবং দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশে মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন। সে হিসাবে, মুসলমানগণের ভারতাগমনের পূর্ব্বে, বঙ্গ,

---

* "ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য" প্রসঙ্গে "পৃথিবীর ইতিহাস" চতুর্থ খণ্ডে এ সকল সম্বন্ধ-বিবরণ বিশেষ ভাবে পরিবর্ণিত হইয়াছে।

বিহার, উড়িষ্যা সম্বলিত বঙ্গ-রাজ্য এবং মধ্যভারত কখনই বহিঃশক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয় নাই। বাঙ্গালী যতই ক্ষীণ ও হীন হউক, বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা ইতিহাস যতই তারস্বরে ঘোষণা করুক, কি ধর্ম্মে কি শৌর্য্যে কি মনুষ্যত্বে প্রাচীন-বঙ্গের গৌরব বিভব কোনক্রমেই উড়াইয়া দিবার নহে।* বৈদেশিক শক্তি-সংঘর্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত নানারূপে উৎখাত ও বিপর্য্যস্ত হইলেও, বঙ্গদেশ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আপনার গৌরব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। ঐ কাল পর্য্যন্ত কোনও বৈদেশিক শক্তি বঙ্গের অঙ্গ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। গ্রীক্, বাক্ত্রিয়, পার্থিয়, শক, হূন্ প্রভৃতির আক্রমণের পর মুসলমানগণের ভারত-আক্রমণই ভারতের ইতিহাসের প্রথম আলোচ্য বিষয়। এক হিসাবে ঐ সকল আক্রমণের পরিণতিই ভারতে মুসলমান-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। তাঁহারা যেন পথ পরিষ্কার করিয়া যান; আর মুসলমানগণ সে পথে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। অন্যান্য বৈদেশিক আক্রমণকারীরা কেহই ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপনে সমর্থ হন নাই; তাঁহাদের ইতিহাস, প্রদেশ-বিশেষের ইতিহাস হইলেও, 'ভারতের ইতিহাস' মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। তাই প্রধানতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস তিন অংশে বিভক্ত হয়। প্রথম অংশ—হিন্দু-রাজত্ব; দ্বিতীয় অংশ—মুসলমান-রাজত্ব; তৃতীয় অংশ—ইংরেজ-রাজত্ব। ভারতের সম্রাট্-পদ দুর্লভ পদ এই তিন জাতিই লাভ করিয়া আসিয়াছেন। বৌদ্ধ-সম্রাটগণ হিন্দু-নৃপতি মধ্যেই গণ্য হন; কারণ, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম—হিন্দু-ধর্ম্মেরই শাখা-বিশেষ। তবেই বুঝা যায়, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাল হিন্দু রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে ভারতের সকল ধর্ম্মমতই ম্লান হইয়া যায়। তখন নিশাশেষে সূর্য্যোদয়ের ন্যায়, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের দীপ্ত-প্রভায় ভারত-ক্ষেত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। পরবর্ত্তিকালে ভারতীয় নৃপতিগণ যদিও সকলে একবাক্যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন না বটে; কিন্তু প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। আর, সে প্রতিষ্ঠা যত দিন ছিল, ততদিন ভারতের গৌরব-গরিমার কোনই হানি হয় নাই। পরিশেষে ভারতবর্ষ যে মুসলমানগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহারও কারণ আর কিছুই নয়; তখন ভারতবর্ষ পুনরায় আচারভ্রষ্ট ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর ঈর্ষা-দ্বেষে জর্জ্জরীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। অন্য দিকে, মুসলমানগণ ইস্লাম ধর্ম্মের নবীন বলে বলীয়ান হইতে পারিয়াছিলেন। তাই বিভিন্ন ধর্ম্মমতের অভ্যুদয়ে উচ্ছৃঙ্খল-উদ্বেগে, ভারতবর্ষ যখন বিব্রত-ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমানগণ সেই সময়েই এই ভারতবর্ষে আগমন করেন,—ভারতবাসীর আত্ম-দ্রোহের উপর ভগবানের কঠোর দণ্ড আসিয়া নিপতিত হয়। সেও এক বৈষম্যে সাম্য-স্থাপন। এই সাম্য-স্থাপনের শেষ নিদর্শন—বৈষম্যে সাম্যস্থাপনে শ্রীভগবানের কি বিচিত্র বিধান—ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য স্থাপন! দেশ কি অরাজকই হইয়া পড়িয়াছিল! শুভক্ষণে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-স্থাপনে সে অরাজকতা দূরীভূত হইয়াছে।

---

* "পৃথিবীর ইতিহাস" চতুর্থ খণ্ডে প্রাচীন-বঙ্গের 'গৌরব-বিভব' প্রসঙ্গে এতদ্বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মুসলমানগণের ভারতাগমন।

[মুসলমানগণের ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা;—খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রাজশক্তির অভ্যুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের রাজনৈতিক অবস্থা;—মুসলমানদের প্রথম ভারত আক্রমণ;—মহম্মদ কাসিমের ভারত অভিযান;—সবক্তেজিন কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণে মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত;—সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের পূর্ববর্ত্তী সময়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।]

পূর্ব্ববর্ত্তী একটী পরিচ্ছেদে (তৃতীয় পরিচ্ছেদে) ভারতবর্ষের ইতিহাসের দুইটী প্রধান স্তরের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করিয়াছি। তাহার এক স্তরে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরবর্ত্তী কাল হইতে আরম্ভ করিয়া, বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বভাগের সংক্ষিপ্ত-সার প্রদত্ত হইয়াছে; অপর স্তরে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব পর্য্যন্ত সময়ের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর, আরও কয়েক শতাব্দী কাটিয়া যায়। তাহার পর ভারতে মুসলমানাধিপত্যের সূত্রপাত ঘটে। সে হিসাবে শঙ্করাচার্য্য হইতে ভারতে মুসলমান আধিপত্যের সূচনা পর্য্যন্ত সময়কে আমরা ভারতের ইতিহাসের একটী স্তর বা স্তরাংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসের সে একটী উপ-স্তর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। তার পর মুসলমানগণের আধিপত্য-লোপের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইংরেজ্-রাজত্বের অভ্যুদয়—আর এক স্তরাংশ। এই পরিচ্ছেদে আমরা সাঙ্ক্ষেপে, ঐ দুই স্তরাংশের প্রথমটীর সূচনা পর্য্যন্ত সময়ের একটু পরিচয় দিবার চেষ্টা পাইতেছি। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে এই স্তরাংশের সূচনা বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সংঘর্ষ—এই স্তরে প্রধান লক্ষ্যীভূত। এই সময়ে যদিও কখনও কখনও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাবের নিকট তাহাকে সর্ব্বদাই অবনত থাকিতে হইয়াছিল। তাই এ স্তরকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের স্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। এখন যদিও রাজ-শক্তি বিচ্ছিন্ন ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাবে তাহা প্রায় সর্ব্বত্রই একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল—এরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। এই ভাব যখন প্রবল ছিল, তখন চেষ্টার পর চেষ্টা করিয়াও প্রদীপ্ত মুসলমান-বীর্য্য ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাহার পর সে ভাব যখন শ্লথ হইয়া আসে, মুসলমানগণ ক্রমশঃ ভারতবর্ষে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, নিম্ন-প্রকটিত বিবরণে তাহা উপলব্ধি হইতে পারিবে; তার পর, কি ভাবে মুসলমানগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তাহাও বুঝা যাইবে।

পূর্ব্বের ইতিহাস।

৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ।—'আন্‌হিল্‌বার'-নগরে চাপোৎকট-বংশের যোগরাজ অধিষ্ঠিত হন। তিনি তাঁহার পিতা বাণ-রাজের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় রাষ্ট্রকূট রাজবংশ একটু প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই বংশের (তৃতীয়) গোবিন্দরাজ, চাপোৎকট রাজগণের নিকট হইতে লাটদেশ (মধ্য ও দক্ষিণ গুজরাট) পুনরুদ্ধার করেন। গোবিন্দরাজের ভ্রাতা ইন্দ্ররাজ তখন ঐ লাটদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

৮১২ খ্রীষ্টাব্দ।—জয়াপীড়ের মৃত্যুর পর (৮০৮ খৃঃ), তাঁহার পুত্র ললিতাপীড় এখন কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। গুজরাটে রাষ্ট্রকূট রাজগণের প্রতিনিধি-রূপে এখন কাকরাজ শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। তিনি ইন্দ্ররাজের পুত্র। তাঁহার এক ভ্রাতা গোবিন্দরাজ তাঁহার সহযোগিরূপে ৮১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ।—প্রতিহার-বংশীয় রাজা নাগভট্ট এখন ভীনমলে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি বৎসরাজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। তিনি কনোজের চক্রায়ুধকে জয় করিয়া, তথায় আপন রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার পুত্র রামভদ্র ও পৌত্র প্রথম ভোজদেব (৪৪৩ খ্রীঃ) তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। এই সময়ে প্রথম গুবাক কর্ত্তৃক রাজপুতানায় শাকম্ভরী (সম্বর) রাজ্যে চাহ্‌মান (চৌহান) বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। গুবাক, প্রতিহার-বংশীয় রাজা নাগভট্টের করদ-রাজ মধ্যে গণ্য ছিলেন। একটী খোদিত লিপিতে গুবাকের পূর্ব্ব-পুরুষগণের এইরূপ নাম পাওয়া যায়,—সামন্ত, জয়রাজ, বিগ্রহ, চন্দ্র, গোপেন্দ্রক, দুর্লভ। গুবাকের উত্তরাধিকারিগণ যথাক্রমে চন্দ্ররাজ, দ্বিতীয় গুবাক, চন্দন, বাকপতিরাজ, বিন্ধ্যরাজ, সিংহ-রাজ, বিগ্রহরাজ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। এই সময় রাষ্ট্রকূট-বংশে তৃতীয় গোবিন্দরাজের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি মান্যক্ষেত (মালখেত) নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ নগর পরবর্ত্তী কালে রাষ্ট্রকূট রাজ-বংশের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট-রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, তাঁহার খুল্লতাত কর্করাজ সে বিদ্রোহ দমন করেন। অমোঘবর্ষের প্রতিষ্ঠার তাহাই মূলীভূত। ইঁহার বীরত্বের বিশেষ খ্যাতি আছে। ভীঙ্গা-বল্লীর যুদ্ধে ইনি প্রাচ্য-চৌলুক্যগণকে পরাজিত করেন। অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মালব, ভেঙ্গী প্রভৃতি রাজ্য ইঁহার প্রাধান্য মান্য করিয়াছিল। ইনি ৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

৮১০ খ্রীষ্টাব্দ।—এ সময় কাশ্মীরে দ্বিতীয় সংগ্রামপীড় (পৃথিব্যাপীড়) অধিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ব্ব কাথিয়াবাড়ে বর্দ্ধমান বা বর্দ্ধন সহরে বিক্রমার্ক রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বিক্রমার্ক হইতে চাপ-বংশীয় নৃপতিগণের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহার পুত্র আদ্দক, পৌত্র পুলকেশী, প্রপৌত্র ধ্রুবভট্ট ও ধরণীবরাহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

(৮১০ খৃষ্টাব্দ) উদয়ন প্রবর্ত্তিত পাণ্ডব-বংশে হর্ষগুপ্তের পুত্র শিবগুপ্ত বালার্জ্জুন এখনও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজপ্রতিনিধি কর্করাজ এখন মধ্যভারত শাসন করিতেছিলেন। তিনি ভীনমলের নাগভট্টকে পরাজয় করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই সময় বঙ্গদেশে পাল-রাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। পাল-বংশের রাজা গোপাল (প্রথম) এই সময় প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। মগধ তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। রাজপুতানার গুর্জ্জর বংশীয় রাজা বৎসরাজ তাঁহার প্রাধান্য নষ্ট করিয়াছিলেন।

৮২৯ খৃষ্টাব্দ।—প্রলম্ভের পুত্র হরজর.এই সময় আসাম-প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার বংশধরগণ বাণমাল, জয়মাল, বীরবাহু ও বলবর্ম্মণ নামে পরিচিত। প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ-বংশের পূর্ব্বে যে বংশ আসামে রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের আদি-পুরুষের নাম—ভগদত্ত। ব্রহ্মপাল, রত্নপাল, ইন্দ্রপাল প্রভৃতি তাঁহার পুত্র-পৌত্র-গণের নাম খোদিত-লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৮৩০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময় জেজাভুক্তি (বুন্দেলখণ্ড) প্রদেশে চান্দেল্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। নান্নুক এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মাহোবার প্রতিহার রাজগণকে বিধ্বস্ত করেন এবং জেজাভুক্তি প্রদেশের দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া বসেন। বাক্‌পতি, জয়শক্তি, বিজয়শক্তি, রাহিল, হর্ষ প্রভৃতি তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি এই বংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজবংশ উত্তরে যমুনা নদীর তীর পর্য্যন্ত রাজ্য-সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। এ সময় গঙ্গাবংশে শ্রীপুরুষের পুত্র দ্বিতীয় শিবমার রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি গঙ্গা-বাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজার নাম—দিণ্ডিক।

৮৩৫ খৃষ্টাব্দ।—রাষ্ট্রকূট রাজবংশের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তৃরূপে এখন ধ্রুবরাজ (প্রথম) গুজরাট প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী—তাঁহার পুত্র অকালবর্ষ শুভতুঙ্গ। কাশ্মীরে এখন গৃহ-বিবাদ। ললিতাপীড়ের পুত্র চিপ্পত জয়াপীড় ৮২৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এখন (৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার মাতুল কর্ত্তৃক নিহত হন। ফলে, বজ্রাদিত্য বাপ্পিয়াকের পৌত্র অজিতাপীড় সিংহাসন লাভ করেন।

৮৪০ খৃষ্টাব্দ।—এ সময়ে বঙ্গদেশ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন। বঙ্গের প্রাধান্য এখন দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত। গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল এখন বঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ়। কনোজাধিপতি ইন্দ্ররাজ এবং উত্তর-পশ্চিমের অন্যান্য বহু নৃপতি তাঁহার নিকট পরাজিত হন। কনোজ অধিকার করিয়া, তিনি চক্রায়ুধকে আপন করদ নৃপরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম্মপাল বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি ও বঙ্গোপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তরে দিল্লী ও জলন্ধর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য-সীমা বিস্তৃত হইয়াছিল।

৮৪১-৪৩ খৃষ্টাব্দ।—আন্‌হিলবারে চাপোৎকট রাজবংশে ক্ষেমরাজ (যোগরাজের পুত্র) প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চোলপুর প্রদেশে চাহ্‌মন-বংশীয় চণ্ড মহাসেন এ সময় (৮৪২ খৃঃ) রাজত্ব করিতেছিলেন। কনোজের প্রতিহার রাজ-বংশে প্রথম ভোজদেব ৮৪৩ খৃঃ হইতে ৮৮১ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি রামভদ্রের পুত্র। আদিবরাহ, মিহির, প্রভাস প্রভৃতি নামেও তিনি পরিচিত। পঞ্জাবে শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব-তীর পর্য্যন্ত এক সময়ে তাঁহার রাজ্য-সীমা বিস্তৃত হয়। যুক্ত-প্রদেশ, রাজপুতানা, গোয়ালিয়র এবং সম্ভবতঃ মালব ও কাথিয়াবাড় তাঁহার রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই ভোজদেবকে কেহ কেহ বাঙ্গালী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বঙ্গ-বিহারে পাল-বংশের রাজ্য পর্য্যন্ত, এক সময় ভোজদেবের প্রাধান্য মান্য করিয়াছিল। এই সময়ে প্রাচ্য-চৌলুক্যবংশে পঞ্চম বিষ্ণুবর্দ্ধন (দ্বিতীয় বিজয়াদিত্যের পুত্র) অধিষ্ঠিত হন। উত্তর কোঙ্কণে শিলহার রাজবংশে পুলশক্তি রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি প্রথম কপর্দ্দিনের পুত্র এবং রাষ্ট্রকূট-রাজ অমোঘবর্ষের করদ-রাজ বলিয়া পরিচিত।

৮৪৪ খৃষ্টাব্দ।—প্রাচ্য চৌলুক্য-বংশে এখন বিষ্ণুবর্দ্ধনের পুত্র তৃতীয় বিজয়াদিত্য অধিষ্ঠিত। তিনি গঙ্গা-বংশীয় রাজগণকে পরাজিত করেন। চক্রকূট ভস্মীভূত হয়। নোলাম্বাবাড়ীর মাঙ্গী তৎকর্ত্তৃক নিহত হন। দাহলের সঙ্কিলা এবং তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণ তাঁহার নিকট পরাজিত হন। তিনি কৃষ্ণপুর নগর ভস্মসাৎ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ নানা উক্তি লিপিবদ্ধ আছে।

৮৫০ খৃষ্টাব্দ।—সংগ্রামপীড়ের পুত্র অনঙ্গপীড় এই সময় কাশ্মীরে অজিতাপীড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। চোল রাজবংশে বিজয়ালয় পরাকেশরীবর্ম্মণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রায় ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র রাজা কেশরীবর্ম্মণ প্রথম আদিত্য ২৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৮৫১ খৃষ্টাব্দ।—উত্তর কোঙ্কণে শিলহার রাজবংশে দ্বিতীয় কপর্দ্দিন রাজা হন। তিনি ৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি পুলশক্তির পুত্র। তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্রপৌত্রাদির নাম,—বাপ্পুবন্ন, ঝঞ্ঝ, গোগ্‌গি, বজ্জদ, অপরাজিতা ইত্যাদি।

৮৫৫ খৃষ্টাব্দ।—এখন সুখবর্ম্মণের পুত্র অবন্তীবর্ম্মণ কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। সুখ-বর্ম্মণ ৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন পাইয়াছিলেন। এ সময় কুমায়ুন প্রদেশে ললিতাসুর রাজশক্তি পরিচালনা করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা ও পিতামহ যথাক্রমে ইষ্টগণ ও নিম্বর নামে পরিচিত।

৮৬০ খৃষ্টাব্দ।—এই সময়ে বঙ্গাধিপতি ধর্ম্মপালের সহিত রাষ্ট্রকূট রাজবংশের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। রাষ্ট্রকূট রাজবংশের রাজা পরবল (কর্করাজের পুত্র) আপন কন্যা রন্নাদেবীকে ধর্ম্মপালের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ

(৮৬০ খৃষ্টাব্দ) করেন। এ সময় গঙ্গা-বাণ রাজবংশে প্রথম মারসিংহ রাজা হন। প্রতিহার রাজবংশে কাক্কুক ঘাটোয়াল প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। দেবগড়ে বিষ্ণুরাম (৮৬২ খৃষ্টাব্দ), পাণ্ড্যরাজ্যে বড়গুণ (৮৬৩ খৃষ্টাব্দ), আনহিলবারে চাপোৎকট রাজবংশে ভূয়াড় (৮৬৬ খৃষ্টাব্দ) অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা ভূয়াড় দ্বারাবতী ও পশ্চিম প্রদেশ অধিকার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রাষ্ট্রকূট রাজপ্রতিনিধি দ্বিতীয় ধ্রুবরাজ (অকালবর্ষের পুত্র) মিহিরকে (৮৬৭ খৃষ্টাব্দ) পরাজিত করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী— তাঁহার ভ্রাতা দান্তিবর্দ্মণ।

৮৭০ খৃষ্টাব্দ।—তালকাড়ে পশ্চিম গঙ্গা রাজবংশে সত্যবাক্য কোঙ্গনিবর্ম্মরাজ এই সময় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। তিনি প্রথম বুতগ নামে প্রসিদ্ধ। ৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যকাল। গোরখপুরের সন্নিকটে বিজয়পুরে, এই সময় দ্বিতীয় জয়াদিত্য রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি মলয়কেতু-বংশোদ্ভব।

৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ।—পাণ্ড্য-রাজ্যের রাজা বড়গুণ, ৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে চোল-রাজ্যের অন্তর্গত ইড়াভাই আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং ভেম্বিল দুর্গ ধ্বংস করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি গঙ্গা-পল্লব-বংশীয় অপরাজিত-বিক্রমবর্ম্মণের রাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হন। তীরু-পিরাম্বিয়াম্ নামক স্থানে ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গঙ্গা-বাণ-বংশীয় দিণ্ডিক, অপরাজিত-বিক্রমবর্ম্মণের সহায় ছিলেন। শেষে চোলরাজ প্রথম আদিত্য কর্ত্তৃক অপরাজিত-বিক্রম নিহত হন এবং তাঁহার রাজ্য চোলরাজ্যান্তর্ভুক্ত হয়।

৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ।—এই সময় ত্রিপুরীর (জব্বলপুরের নিকট চিহ্নিত হয়) কোলচুরি বা হৈহয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম কোক্কল্ল ঐ বংশের আদিভূত। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে মুগ্ধতুঙ্গ, প্রসিদ্ধধবল, বালহর্ষ, যুবরাজ প্রথম, লক্ষ্মণরাজ, শঙ্করগণ, যুবরাজ দ্বিতীয় প্রভৃতি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরিচিত। এই বংশ ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'ত্রিকলিঙ্গেশ্বর' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সেউনদেশে যাদব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বারাবতী হইতে আসিয়া, চন্দ্রাদিত্যপুরে দৃঢ়প্রহর এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশে প্রথম সেউনচন্দ্র, ধাদিয়াপ্প, ভিল্লম প্রথম, শ্রীরাজা, ভদ্দিগ প্রভৃতি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে প্রসিদ্ধ। সেউনচন্দ্র কর্ত্তৃক সেউনপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। ভদ্দিগ, রাষ্ট্রকূট-বংশীয় তৃতীয় কৃষ্ণরাজের করদরাজ মধ্যে গণ্য ছিলেন। এই সময় প্রথম মল্ল কর্ত্তৃক ভেলানাড়ু সহরে তেলেগু রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। মল্লের পুত্র ইরিয়বর্ম্মণ, পৌত্র কুড়িয়বর্ম্মণ, প্রপৌত্র দ্বিতীয় মল্ল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বঙ্গের পাল-রাজবংশে এ সময় দেবপাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ধর্ম্মপালের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্ব-কাল ৩৩ বৎসর। তিনি উড়িষ্যা-দেশ জয় করিয়াছিলেন।

৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।—কাশ্মীরে এখন শঙ্করবর্ম্মণ রাজত্ব করিতেছিলেন। গুজরাটে রাষ্ট্রকূট-রাজপ্রতিনিধি কৃষ্ণরাজ অকালবর্ষ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাচ্য চৌলুক্য-বংশে প্রথম চৌলুক্যভীম, বিজয়াদিত্যের সিংহাসন লাভ করেন। তিনি দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজকে পরাজিত করিয়া, রাষ্ট্রকূটগণের নিকট হইতে ভেঙ্গী পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

৮৯৩ খৃষ্টাব্দ;—কনোজে এখন মহেন্দ্রপাল রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি প্রথম ভোজদেবের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। তিনি ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সম্বন্ধে দ্বিবিধ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একবিধ লিপিতে প্রকাশ,—তাঁহার দুই পুত্র (দ্বিতীয় ভোজদেব এবং বিনায়ক পাল হর্ষ) ৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অন্য লিপিতে প্রকাশ,—তাঁহার উত্তরাধিকারী মহীপাল (৯১৪-১৭ খ্রীষ্টাব্দ), দেবপাল (৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) বিজয়পাল (৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ), রাজ্যপাল (মৃত ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দ), ত্রিলোচনপাল (১০২৭ খ্রীষ্টাব্দ), যশোপাল (১০৩৬ খ্রীষ্টাব্দ)। কনোজের এই রাজন্যবর্গের সহিত বঙ্গের পালবংশীয় নৃপতিগণের সম্বন্ধ-সূত্র লক্ষিত হয়। এই সময়ে কাথিয়াবাড় প্রদেশে লক্ষ্মীসাপুর সহরে চৌলুক্য-বংশীয় মহাসামন্ত বলবর্ম্মণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কনোজাধিপতি মহেন্দ্রপালের করদ নৃপতি মধ্যে পরিগণিত।

৮৯৫ খৃষ্টাব্দ।—চাপোৎকট রাজবংশীয় বীরসিংহ আনহিলবারে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রাজা ভুয়াড়ের উত্তরাধিকারী। এ সময় মহীশূর প্রদেশে পল্লব-বংশীয় রাজা নোলাম্বাধিরাজ প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রাধিরাজ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন।

৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।—রাষ্ট্রকূট-বংশীয় দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ (প্রথম অমোঘবর্ষের পুত্র) ৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি খেতক, কলিঙ্গ ও মগধ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অন্ধ্রগণ ও গঙ্গাবংশীয় রাজগণ, তাঁহার নিকট পরাজিত হন। তিনি গুর্জ্জর, লাট ও গৌড় দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বাণবিক্রমাদিত্য এবং বঙ্কপুরের লোকাদিত্য তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন।

৮৯৯ খৃষ্টাব্দ।—বালবর্ম্মণের পুত্র দ্বিতীয় অবনীবর্ম্মণ চৌলুক্য মহাসামন্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এই সময় লক্ষ্মীসাপুর সহরে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি বঙ্গদেশ এবং ধবণীবরাহ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার আছে।

৯০০ খৃষ্টাব্দ।—রাষ্ট্রকূট রাজবংশে হস্তিকুণ্ডীতে হরিবর্ম্মণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। লাট-প্রদেশের প্রথম চৌলুক্য রাজপ্রতিনিধি নিম্বার্ক এই সময় প্রতিষ্ঠান্বিত হন। তাঁহার পুত্র বারপ্প, পৌত্র গোগ্গি রাজা, প্রপৌত্র কীর্ত্তিরাজা প্রভৃতিতে ১০১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাটিয়াছিল। শৈল-বংশের দ্বিতীয় যশোবর্দ্ধন এই সময়ে মধ্য-ভারতে শ্রীবর্দ্ধনপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন বিভিন্ন রাজ-শক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, দশম শতাব্দীতেও প্রায় সেই ভাব পরিদৃষ্ট হয়। যদিও এই দুই শতাব্দীর মধ্যে কোনও কোনও নৃপতি একছত্র প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রভাব সর্ব্বব্যাপিত্ব বা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ, দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষা-দ্বেষের ভাব বড়ই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল; আর প্রধানতঃ সেই ধর্ম্ম-বিপ্লবের ফলেই রাজশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এ সময়ে বঙ্গদেশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিল বটে; কিন্তু পারিপার্শ্বিক শক্তি-সমূহের ঈর্ষার প্রভাবে বঙ্গের প্রাধান্যও সর্ব্বত্র সকল সময় সমভাবে রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহবিবাদ-সূত্রে এবং পরস্পর হিংসা-দ্বেষ-নিবন্ধন এ সময় কেন্দ্রশক্তি শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। বিশেষতঃ, শতাব্দীর পর শতাব্দী-ব্যাপী লুণ্ঠনকারী সম্প্রদায়ের অস্ত্রাঘাতে রাজশক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এখন কত ধর্ম্মের কত মতের কত ভাবের কত প্রকার জাতি সীমান্ত-প্রদেশ বিভাগ করিয়া লইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এখন বিচ্ছিন্ন-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবার সুযোগ-সুবিধা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। দশম শতাব্দীর সেই বিচ্ছিন্ন রাজশক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে মুসলমানগণের ভারত-আক্রমণের পক্ষে কি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অনেকটা বোধগম্য হইবে।

দশম শতাব্দীতে।

৯০২-৯০৪ খৃষ্টাব্দ।—কাশ্মীরে এ সময় ঘোর অন্তর্বিপ্লব। কাশ্মীর-রাজ শঙ্করবর্ম্মণ যুদ্ধে নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র গোপালবর্ম্মণ সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার মন্ত্রী প্রভাকরদেব কর্তৃক ৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। সে সময় সঙ্কট নামক শঙ্করবর্ম্মণের এক পুত্র সিংহাসন পাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সিংহাসন-প্রাপ্তির দশ দিন মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে শঙ্করবর্ম্মণের বিধবা-পত্নী সুগন্ধা কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন।

৯০৬ খৃষ্টাব্দ।—এ দুই বৎসরের মধ্যেই কাশ্মীরে সুগন্ধার প্রাধান্য লোপ পায়। তখন পার্থ কাশ্মীরের রাজা হন। তিনি নির্জ্জিতবর্ম্মণের পুত্র এবং অবন্তী-বর্ম্মণের বৈমাত্র ভ্রাতা সুরবর্ম্মণের বংশধর।

৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ।—চোল-রাজ্যে প্রথম পরান্তক (প্রথম আদিত্যের পুত্র) রাজা হন। তিনি পাণ্ড্যরাজ রাজসিংহকে এবং দুই জন বাণবংশীয় যুবরাজকে পরাজিত করেন। মাদুরা ও সিংহল দ্বীপ অধিকার করিয়া, তিনি ৪০ বৎসর রাজ-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। গঙ্গা-বাণবংশীয় পৃথ্বীপতি এই প্রথম পরান্তকের অধীনরাজমধ্যে গণ্য হন। তিনি প্রথম মারসিংহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন। এ সময় কনোজে মহেন্দ্রপাল (৮৯৩ খ্রীঃ—৯০৭ খ্রীঃ) অধিষ্ঠিত। তাঁহার করদরাজ মধ্যে শিলোদীর উদ্ভট্ট প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি মদুরেশ্বর নদীর তীরে বাণরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

৯১২ খৃষ্টাব্দ।—এখন দেবপাল কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিরোহির ধুরভট্ট তাঁহার করদরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ।—কনোজে এখন মহীপাল প্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রতীহার-বংশীয় রাজা বলিয়া পরিচিত। ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্ব-কাল। জেজাভুক্তির চান্দেল্য-রাজবংশে এখন হর্ষ রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি রাহিলের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। বিক্রমার্ক প্রবর্ত্তিত চাপ-রাজবংশে এখন ধরণীবরাহ প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি কনোজরাজ মহীপালের করদ নৃপতিরূপে বর্দ্ধমানে (বদ্ধনে) রাজত্ব করিতেছিলেন। রাষ্ট্রকূট রাজবংশে এখন তৃতীয় ইন্দ্ররাজ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ।—হস্তিকুণ্ডী সহরে রাষ্ট্রকূট-বংশের বিদগ্ধ রাজা হন। তিনি হরিবর্ম্মণের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। এই সময় রাষ্ট্রকূট-বংশীয় তৃতীয় ইন্দ্ররাজ কনোজ আক্রমণ করেন। তাহাতে মহীপাল রাজ্যভ্রষ্ট হন এবং তাঁহার পুত্র অমোঘবর্ষ (দ্বিতীয়) সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি এক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলন। তাঁহার পর (৯১৮ খৃষ্টাব্দে) তৃতীয় ইন্দ্ররাজের কনিষ্ঠ পুত্র চতুর্থ গোবিন্দরাজ রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। ৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৯২০ খ্রীষ্টাব্দ।—এ সময় আন্হিল্বারে চাপোৎকটু-বংশে রণাদিত্য প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় কাড়াদে শিলহার-রাজবংশের এক শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম যতীগ ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্র নাম্মীবর্ম্মণ, পৌত্র চন্দ্ররাজ, প্রপৌত্র দ্বিতীয় যতীগ, পরে তৎপুত্র গোণক, গুবাল, কীর্ত্তরাজ, চন্দ্রাদিত্য এবং গোণকের পুত্র মাড়সিংহ (১০৫৮ খৃষ্টাব্দ) প্রভৃতি এই বংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৯২১-২৩ খ্রীষ্টাব্দ।—দুই বৎসরের মধ্যে কাশ্মীরে দুই জন রাজার পরিবর্ত্তন ঘটে। ৯২১ খৃষ্টাব্দে পার্থ সিংহাসনচ্যুত হন। তখন তাঁহার পিতা নির্জ্জিতবর্ম্মণ সিংহাসন লাভ করেন। আবার দুই বৎসর পরেই, নির্জ্জিতবর্ম্মণের স্থলে চক্রবর্ম্মণ (পুত্র) রাজা হন। তিনি ৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ।—প্রাচ্য চৌলুক্য রাজবংশে এ সময় বিষম বিপ্লব উপস্থিত হয়। এক বৎসরের মধ্যে সাত জন রাজার পরিবর্ত্তন ঘটে। পিতা অম্বরাজের সিংহাসন পঞ্চম বিজয়াদিত্য লাভ করেন। এক মাসের মধ্যেই তিনি 'তাহ' (তালপ) কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হন। 'তাহ' আবার এক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (চৌলুক্যভীমের পুত্র) কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। নয় মাস রাজত্বের পর, প্রথম অম্বরাজের পুত্র আবার সে রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন। আট মাস তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তখন আবার দ্বিতীয় যুদ্ধমল (তাহের পুত্র) তাঁহাকে নিহত করিয়া, সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন।

৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ।—বিনায়কপাল হর্ষ এখন কনোজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কাশ্মীর-রাজ্যে এখনও গৃহবিবাদ চলিতেছিল। সেই গৃহবিবাদের ফলে (৯৩১ খৃঃ) প্রথম সুরবর্ম্মণ কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ও চক্রবর্ম্মণ কাশ্মীর-রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন।

৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ।—এ সময় আবার প্রথম সুরবর্ম্মণ কাশ্মীর হইতে বিতাড়িত হন। পার্থ সেই সিংহাসন লাভ করেন। প্রাচ্য-চৌলুক্য রাজবংশেও নানা বিপ্লব চলিতে থাকে। দ্বিতীয় যুদ্ধমল্লকে বিতাড়িত করিয়া, দ্বিতীয় চৌলুক্য-ভীম এখন রাজা হন। কাল্কিক বিজয়াদিত্য (প্রথম অম্বের পুত্র) তৎকর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট বংশীয় চতুর্থ গোবিন্দরাজকেও তিনি বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। তালকাড়ের পশ্চিম গঙ্গা-রাজবংশে এরেয়াপ্প অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আয়াপদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। আয়াপদেব পহ্লব-বংশের রাজা বলিয়া পরিচিত। তিনি নোলাম্বা-শাখার অন্তর্ভুক্ত।

৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ।—এ সময়ে চক্রবর্ম্মণ আবার কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। এক বৎসরের মধ্যেই, শম্ভুবর্দ্ধন আবার তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। পর বৎসর শম্ভুবর্দ্ধন পরাজিত ও নিহত হন, চক্রবর্ম্মণ আবার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু ৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সংহারসাধন করিয়া পার্থের পুত্র উন্মত্তাবন্তী কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে (৯৩৯ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন দ্বিতীয় সুরবর্ম্মণ কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। তিনি কয়েক দিন মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর প্রভাকরদেবের পুত্র যশস্কর কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন।

৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ।—এ সময়ে রাষ্ট্রকূট রাজ-বংশের সম্মট হস্তিকুণ্ডীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি বিদগ্ধের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। এদিকে তৃতীয় অমোঘবর্ষের সিংহাসনে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ রাষ্ট্রকূট-রাজসিংহাসন লাভ করেন। তিনি ৯৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত ২১ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিম-গঙ্গা রাজবংশে দ্বিতীয় বুতগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরেয়াপ্পের পুত্র প্রথম রাসমল্ল তখন সেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পহ্লব-রাজবংশীয় নোলাম্বার অন্নিগকে এবং কোলচুরির চেদী-বংশীয় রাজা সহস্রার্জ্জুনকে পরাজিত করেন। কঞ্জেভরম এবং তাঞ্জোর তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু পরিশেষে রাজাদিত্য চোল কর্ত্তৃক তাক্কোলামে তিনি বিধ্বস্ত হন। কৃষ্ণরাজের ভ্রাতা তৃতীয় জগত্তুঙ্গ রাজকার্য্যে তাঁহার সহায় ছিলেন বলিয়া উক্ত হয়। সেউন-দেশের যাদব-বংশীয় রাজা বদ্দিক ও তাঁহার পুত্র এই কৃষ্ণরাজের করদ নৃপতি মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। রক্ত-

(৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) রাজবংশের পৃথ্বীরাম (মেরদের পুত্র) মান্তক্ষেতের রাষ্ট্রকুট রাজবংশের করদ নৃপতি মধ্যে গণ্য ছিলেন। এই পৃথ্বীরাম কর্ত্তৃক সাউনদাত্তির রত্ত-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ বংশে তাঁহার পুত্র পিত্তুগ এবং পৌত্র শান্তিবর্ম্মণ (৯৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) রাজত্ব করেন।

৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ।—কনোজে এখন দেবপাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার করদরাজরূপে শিরোণীতে নিষ্কলঙ্ক রাজত্ব করিতেছিলেন। জেজাভুক্তির চাণ্ডেল্য রাজবংশে যশোবর্ম্মণ (লক্ষ্যবর্ম্মণ) প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি হর্ষের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। এই যশোবর্ম্মণ গৌড়দেশে, কোশলে, কাশ্মীরে, মিথিলায়, মালবে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। খস্‌গণ, কুরুগণ এবং গুর্জ্জরগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হন। কোল্‌চুরির চেদিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তিনি কালাঞ্জর আক্রমণ করেন।

৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।—কাশ্মীরে এখনও বিপ্লব চলিতেছিল। যশস্করের পুত্র সংগ্রামদেব এখন কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। এক বৎসরের অধিক কাল রাজ্য না করিতেই, তিনি নিহত হন; এবং তাঁহার স্থলে পর্ব্বগুপ্ত রাজা হন। এক বৎসর পরে (৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে) পর্ব্বগুপ্তের সিংহাসন তাঁহার পুত্র ক্ষেমগুপ্ত অধিকার করেন। এই সময় চোল্‌রাজ রাজাদিত্য, রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণরাজের বিরুদ্ধে তাক্কোলাম নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তিনি গজারোহণে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, পশ্চিম গঙ্গাবংশীয় রাজা দ্বিতীয় বুতগের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। এই দ্বিতীয় বুতগ, কৃষ্ণরাজের সম্বন্ধী ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে মহীশূর রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। রাজাদিত্যের মৃত্যুর পর, তাঁহার দুই ভ্রাতা এবং তাঁহাদের পুত্রগণ পর্য্যায়ক্রমে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। রাজাদিত্যের ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম—গান্দারাদিত্য ও অরিঞ্জয়।

৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ।—এই সময়ে আন্‌হিলবারে (আঁনহিল্লপাতক) চৌলুক্যগণের শোলাঙ্কি-শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। ভুবনাদিত্যের পুত্র রাজী ঐ শাখার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্র—প্রথম মূলরাজ নামে প্রসিদ্ধ। গুজরাটের ইতিবৃত্তে প্রকাশ,—কনোজের অন্তর্গত কল্যাণকটক হইতে ভূরাজ আসিয়া সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে গুজরাট জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ যথাক্রমে কর্ণাদিত্য, চন্দ্রাদিত্য, সোমাদিত্য ও ভুবনাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। এই সময় শাকম্ভরীর বাক্‌পতিরাজের পুত্র লক্ষ্মণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তৎকর্ত্তৃক নাদোলে চাহ্‌মান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ইঁহার পুত্র প্রপৌত্র প্রভৃতি সকলেই যশস্বী হইয়াছিলেন। ইঁহার এক পুত্র 'শোভিত' (সোহিয়) অর্ব্বুদ-রাজবংশের যুবরাজকে পরাজিত করেন। তাঁহার পুত্র বালিরাজ কর্ত্তৃক মালবের প্রমার-বংশীয় দ্বিতীয় (মুঞ্জরাজ) বাক্‌পতিরাজ

(৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) পরাভূত হইয়াছিলেন। এই সময় (৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে) কচ্ছপঘাট (কচ্ছপারি) রাজবংশের অন্তর্গত গোয়ালিয়র শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বংশের আদি-নৃপতিও লক্ষ্মণ নামে পরিচিত। সাউনদাত্তি ও বেলগাঁয়ে যে রত্ত-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই বংশের আদিভূত নন্ন এই সময় রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি কল্যাণীর প্রাচ্য-চৌলুক্যরাজগণের করদনৃপতি মধ্যে গণ্য ছিলেন।

৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ।—রাজ্ঞী মহালক্ষ্মীর পুত্র অল্লত এখন মিবারে (মেওয়ারে) গুহিল-রাজবংশে রাজত্ব করিতেছিলেন।

৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ।—দ্বিতীয় বুতগ এখন মহীশূর রাজ্যে পশ্চিম-গঙ্গাবংশীয় যুবরাজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র মুরলদেব ও পৌত্র রচ্ছ যথাক্রমে তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন।

৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ।—জেজাভুক্তির চান্দেল্য-রাজবংশে এখন ধাঙ্গ রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি যশোবর্ম্মণের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। রাজা ধাঙ্গের রাজত্ব-কালে চান্দেল্য রাজ্যের সীমানা একদিকে যমুনা-তীরে চেদী-রাজ্যের সীমানা পর্য্যন্ত এবং অন্যদিকে কালাঞ্জর হইতে গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ধাঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গণ্ড, পৌত্র বিদ্যাধর এবং প্রপৌত্র বিজয়পাল যথাক্রমে রাজত্ব করেন। ১০০২ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হয়।

৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ।—কনোজে এখন বিজয়পাল রাজত্ব করিতেছিলেন। শিরোণীতে এখন নিষ্কলঙ্ক তাঁহার করদ-রাজ মধ্যে পরিগণিত। আলোয়ারে গুর্জ্জর-প্রতিহার-বংশীয় রাজা মথনদেব (সাবতের পুত্র) এ সময় বিজয়পালের করদ-রাজ মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। কাশ্মীরে ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যুর (৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় অভিমন্যু রাজা হন। রাণী দিদ্দা তাঁহার পুত্রের অভিভাবকরূপে রাজকার্য্য পরিদর্শনে ব্রতী হইয়াছিলেন।

৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।—তালকাড়ের পশ্চিম-গঙ্গা রাজবংশে এখন দ্বিতীয় মাড়সিংহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বুতগের পুত্র এবং রচ্ছের উত্তরাধিকারী। মান্যক্ষেতের রাষ্ট্রকূট রাজগণের তিনি করদ মধ্যে গণ্য ছিলেন। তৃতীয় কৃষ্ণরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী অল্লকে পরাজিত করিয়া, তিনি সেই রাজ্য চতুর্থ ইন্দ্ররাজকে প্রদান করেন। তাঁহার আরও নানা বিজয়-বার্ত্তা বিঘোষিত হয়।

৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ।—প্রাচ্যচৌলুক্যবংশে দ্বিতীয় অম্বরাজের ভ্রাতা দানার্ণব এ সময় সিংহাসন লাভ করেন। ইনি তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর ২৭ বৎসর কাল সিংহাসন শূন্য থাকে।

৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ।—মালয়ের প্রমার রাজবংশে দ্বিতীয় সিয়াক (হর্ষ) রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বৈরীসিংহের পুত্র। রাষ্ট্রকূট-বংশীয় খত্তিগ্ তাঁহার নিকট

(৯৭১ খৃষ্টাব্দ) পরাজিত হন। এই খত্তিগ্—তৃতীয় কৃষ্ণরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মিবারে গুহিল-রাজবংশে এখন নরবাহন রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি অল্লতের পুত্র।

৯৭২ খৃষ্টাব্দ।—কাশ্মীরে অভিমন্যুর পুত্র নন্দীগুপ্ত রাজা হন। পিতামহী দিদ্দা কর্ত্তৃক তাঁহার সংহার-সাধন হয়। তদন্তে দিদ্দার আর এক পৌত্র ত্রিভুবনগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। রাষ্ট্রকূট রাজবংশে খত্তিগের সিংহাসনে এখন দ্বিতীয় কক্করাজ (কক্কলদেব) অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তৃতীয় কৃষ্ণরাজের ভ্রাতা নিরুপমের পুত্র। তিনি গুর্জ্জরগণকে, হুন্‌গণকে, চোলগণকে এবং পাণ্ড্যগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পশ্চিম-গঙ্গা রাজবংশের দ্বিতীয় মাড়-সিংহ এবং পাঞ্চালদেব তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করেন। কিন্তু পরিশেষে, তিনি পশ্চিম-চৌলুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈল কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

৯৭৩ খৃষ্টাব্দ।—শাকম্ভরীর চাহ্‌মান-রাজবংশে এখন বিগ্রহরাজ রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি সিংহরাজের পুত্র। দুর্ল্লভ, গুণ্ডু বাক্‌পতি, বীর্য্যরাম, চামুণ্ড, সিংহত, দুষল, বিশল, পৃথ্বীরাজ (প্রথম), জয়দেব, অর্ণরাজ প্রভৃতি ইঁহার উত্তরাধিকারী ছিলেন বলিয়া একটী খোদিত লিপিতে প্রকাশ আছে। এই সময় (৯৭৩ খৃষ্টাব্দে) চতুর্থ বিক্রমাদিত্যের পুত্র দ্বিতীয় তৈল (তৈলপ) কর্ত্তৃক কল্যাণীতে পশ্চিম-চৌলুক্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ইনি রাষ্ট্রকূট-রাজবংশের দ্বিতীয় কক্করাজকে এবং রাণাস্তম্বকে (রাণাকুম্ভ) পরাজিত করেন। প্রমার-রাজ মুঞ্জ (দ্বিতীয় বাক্‌পতিরাজ) ইঁহার হস্তে বন্দী ও নিহত হন। পশ্চিম গঙ্গাবংশের পাঞ্চালদেবকে ইনি নিহত করেন। ইঁহা কর্ত্তৃক কুন্তলদেশ বিধ্বস্ত, চেদীরাজ হতমান এবং চোলরাজ্য আক্রান্ত হন। গুজরাট ভিন্ন সমগ্র রাষ্ট্রকূট রাজ্যে ইনি একাধিপত্য প্রভুত্ব স্থাপন করেন। রত্তগণ, সিন্দগণ, কাদম্বগণ এবং কোঙ্কণের ও নোলাম্বাবাড়ের পাণ্ড্য-গণ ইঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ।—আন্‌হিলবারে চৌলুক্য-বংশীয় রাজা প্রথম মূলরাজ (রাজীর পুত্র) এখন রাজত্ব করিতেছিলেন। ইনি চাপোৎকট-বংশীয় কয়েকজন যুব-রাজকে পরাজিত করেন। কিন্তু চাহ্‌মান-বংশীয় (চৌহান-বংশীয়) বিগ্রহরাজ এবং মধ্য গুজরাটের চৌলুক্য-বংশীয় যুবরাজ বারপ কর্ত্তৃক ইঁহার গতি প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। শেষে বারপ ইঁহার নিকট বিধ্বস্ত হন। ত্রিপুরীর কোল্‌চুরি রাজ-বংশে এখন দ্বিতীয় যুবরাজ রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি শঙ্করগণের ভ্রাতা। ইঁহার পুত্র দ্বিতীয় কোকল্ল, পৌত্র গাঙ্গেয় বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি ইঁহার উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন। মালবের প্রমার-রাজবংশে এখন দ্বিতীয় বাক্‌পতিরাজ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় সিয়াকের পুত্র, এবং অমোঘবর্ষ, মুঞ্জ ও উৎপল প্রভৃতি নামে পরিচিত। ইনি কর্ণাট, লাট, কেরল, চোল প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্তবর্গকে এবং কোল্‌চুরি রাজ দ্বিতীয়

(৯৭৩ খৃষ্টাব্দ) যুবরাজকে পরাজিত করেন। পশ্চিম-চৌলুক্যের অধিপতি দ্বিতীয় তৈল ইঁহার নিকট ছয় বার পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু পরিশেষে ইনি নাদোলের বলিরাজার নিকট এবং দ্বিতীয় তৈলের নিকট পরাজিত হন। পশ্চিম-গঙ্গাবংশীয় যুবরাজ মাড়সিংহের সিংহাসন-ত্যাগ ও মৃত্যুর পর এই সময় পাঞ্চালদেব সিংহাসনারোহণ করেন। কিন্তু পশ্চিম চৌলুক্য-রাজ দ্বিতীয় তৈল কর্তৃক তাঁহার সংহার সাধিত হয়।

৯৭৫ খৃষ্টাব্দ।—দিদ্দা কর্তৃক পৌত্র ত্রিভুবনগুপ্তের সংহারসাধন হয়। তখন কাশ্মীরের সিংহাসনে ভীমগুপ্ত নামে দিদ্দার আর এক পৌত্র অধিষ্ঠিত হন।

দশম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের রাজশক্তি যেরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্যেই তাহার প্রোজ্জ্বল চিত্র প্রত্যক্ষীভূত হইবে। আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় অনুধাবন করিলে, সীমান্ত-প্রদেশের শক্তি-সামর্থ্যের বিষয় স্বতঃই বুঝিতে পারা যাইবে। এই অবস্থাতেই ভারতের প্রতি মুসলমানগণের ধারাবাহিক আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্বে সপ্তম শতাব্দীতে সিন্ধু-প্রদেশ আক্রমণে মধ্যে মধ্যে মুসলমানগণ বিক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। তার পর দশম শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসর হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগ পর্য্যন্ত আক্রমণের উপর আক্রমণের প্রবাহ আসিয়া, ভারতবর্ষকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রথমে যে শক্তি দস্যুতায় কলঙ্কিত হইয়াছিল, পরিশেষে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সেই শক্তি যশোভূষণে মণ্ডিত হইল। ভারতের সহিত মুসলমানগণের প্রথম সম্বন্ধ—৬৬৪ খৃষ্টাব্দে। ওমার তখন 'কালিফ' পদে *

ধারাবাহিক মুসলমান আক্রমণ।

* ইস্‌লাম-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত্ মহম্মদের মৃত্যুর পর, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ 'কালিফ' নামে অভিহিত হন। তাঁহারা মুসলমান-সমাজের ঐহিক ও পারত্রিক উভয় পথের নিয়ন্তা ছিলেন। একদিকে তাঁহারা সম্রাট-পদে অভিষিক্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের সাম্রাজ্য 'কালিফেট্' বলিয়া পরিচিত হইত; অন্যদিকে তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্মে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ধর্ম্মরাজ্যে গুরু এবং রাজকার্য্যে সম্রাট—এই উভয় ক্ষমতা পরিচালন করিতে সমর্থ ছিলেন বলিয়া, কালিফগণের প্রতিষ্ঠার অবধি ছিল না। এই কালিফ-পদে প্রথমে যিনি প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহার নাম আবুবেকর। তিনি হজরত্ মহম্মদের শ্বশুর ছিলেন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি কালিফ্ নামে গণ্য হন। তাঁহার পর (৬৩৪ খৃষ্টাব্দ) যিনি কালিফ পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহার নাম ওমার। তিনিও হজরত্ মহম্মদের অন্যতর শ্বশুর। তাঁহার পর যিনি তৃতীয় কালিফ হন, তিনি ওথ্‌মান নামে প্রসিদ্ধ। তিনি হজরত্ মহম্মদের জামাতা। ৬৪৪ হইতে ৬৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, তাঁহার রাজত্ব কাল। ওথ্‌মানের মৃত্যুর পর, কালিফ পদ লইয়া বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। মদিনার জনসাধারণ আলি-বেন-আবে-তালেবকে কালিফ নির্ব্বাচন করেন। এই আলি—চতুর্থ কালিফ। ইঁহার পর কয় মাস (৬৬১ খৃষ্টাব্দে) হাসান কালিফ পদ লাভ করেন। তৎপরে ওম্মিয়াদ বংশীয়গণ কালিফ হন। ওম্মিয়া হইতে এই বংশের নামকরণ। ডামাস্কাসের শাসনকর্ত্তা মোয়াইজ এই বংশের প্রথম কালিফ। তাঁহার সময় (৬৬১ খৃষ্টাব্দে) ডামাস্কাসে কালিফের রাজধানী স্থাপিত হয় এবং ঐ পদ পুরুষানুক্রমিক হইয়া পড়ে। এই হইতে এই ওম্মিয়াদ কালিফ-বংশে ১৪ জন কালিফ আরবে এবং ২৪ জন স্পেনে (কর্‌ডোভায়) প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই ওম্মিয়াদ-বংশের ষষ্ঠ কালিফের নাম প্রথম ওয়ালিদ। ইঁহার সময়েই কালিফগণের প্রাধান্য-প্রতিপত্তি গৌরবের উচ্চচূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭৪৪ খৃষ্টাব্দে এই বংশের চতুর্দ্দশ কালিফ দ্বিতীয় মারওয়ান হইতে এসিয়া মহাদেশে ওম্মিয়াদ-কালিফ-বংশের উচ্ছেদ হয়। তার পর যে বংশ এসিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সে বংশ আব্বাসাইদ্ কালিফ বংশ নামে পরিচিত।

প্রতিষ্ঠিত। সেই সময় দুর্দ্ধর্ষ আরবগণ জল-পথে দস্যু-বৃত্তি অরম্ভ করিয়াছিল। সময়ে সময়ে তাহারা সমুদ্র-পথে সিন্ধু-দেশে আসিয়া উপনীত হইত, আর ধন-রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। কেবল ধন-রত্ন-লুণ্ঠনেই তাহারা তৃপ্ত ছিল না; সিন্ধু-দেশ হইতে সুন্দরী রমণীগণকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়াই তাহাদের প্রধান ব্যবসায় ছিল। সেই সকল সুন্দরী রমণীগণকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া, তাহারা আরবের অন্তঃপুর সজ্জিত করিত। ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থলপথে মার্ভের মধ্য দিয়া আরবগণ কাবুল আক্রমণ করে। ইহাই ভারত-বিজয়-উদ্দেশ্যে আরবগণের প্রথম যুদ্ধযাত্রা। কাবুল আক্রমণ করিয়া, আরবগণ তত্রত্য দ্বাদশ সহস্র অধিবাসীকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। তাহার পর পঞ্চনদ প্রদেশে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয়। কথিত হয়, মহালীব নামক জনৈক সেনাপতির অধিনায়কত্বে এই সময় এক দল আরব সৈন্য মুলতানে প্রবেশ করিয়াছিল; এবং সেখান হইতে বহু নর-নারীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইহার পর দ্বিতীয় আক্রমণ ৭১০-১১ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ঐ সময় সিন্ধু-দেশের অন্তর্গত দিবাল বন্দরে আরবগণের একখানি অর্ণবপোত আসিয়া উপস্থিত হয়। আরবগণ ইতিপূর্ব্বে ঐ বন্দরে বা উহার পারিপার্শ্বিক স্থানে লুঠ-তরাজ আরম্ভ করিয়াছিল। ঐ অর্ণবপোতের আগমনে অসদুদ্দেশ্যের বিষয় অনুভব করিয়া, সিন্ধুদেশের তাৎকালিক অধিপতি দাহির আরবগণের সেই অর্ণবপোত আক্রমণ করেন। তদনুসারে আরবগণ রাজা দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া বসে। রাজা দাহির ক্ষতিপূরণে অস্বীকার করেন। আরবগণ তখন উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং বলপ্রকাশে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে বদ্ধপরিকর হয়। সেই সূত্রে এক সহস্র পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য রাজা দহিরের রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু ঐ অল্প সৈন্য অনায়াসেই রাজা দাহির বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। কালিফ ওয়ালিদের সময় আরবগণের এই পরাজয় সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। আরবগণের এই পরাজয়-বার্ত্তা শ্রবণে বসোরার শাসনকর্ত্তা হেজ্জাজ বড়ই রোষান্বিত হন। তখন সিরাজ সহরে ছয় সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য সংগৃহীত হয়। কালিফের ভ্রাতুষ্পুত্র বিংশ বর্ষ বয়স্ক যুবক মহম্মদ কাসিম সেই সৈন্য পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হন। ৭১১ খৃষ্টাব্দে তিনি দিবাল রাজ্য আক্রমণ করেন। নগরের পার্শ্বে প্রস্তর-প্রাচীর-বেষ্টিত একটি দেবমন্দির ছিল। সেই মন্দির দুর্গরূপে নগর রক্ষা করিতেছিল। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত সেই দুর্গ-রক্ষা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। কাসিম যখন আগ্নেয়াস্ত্রাদি সাহায্যে মন্দির আক্রমণ করিলেন, নগর রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িল। মন্দির-রক্ষক রাজপুতগণ অনেকেই প্রাণদান করিলেন এবং মন্দিরাভ্যন্তরস্থিত ব্রাহ্মণগণ ও নগরবাসিগণ বন্দী হইলেন। নগর অধিকার করিয়াই মহম্মদ কাসিম অত্যাচারের পরকাষ্ঠা-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই ব্রাহ্মণগণের প্রতি তাঁহার পাশবিক অত্যাচার প্রকাশ পাইল। তিনি বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে মুসলমান-ধর্ম্মগ্রহণ করাইবার আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণগণ কোনক্রমেই কাসিমের আদেশ প্রতিপালনে সম্মত হইলেন না। ফলে, সপ্তদশ বর্ষের অধিক বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রকেই নৃশংসরূপে হত্যা করা হইল। রমণীগণকে ও বালকবালিকাগণকে কাসিম ক্রীতদাস মধ্যে গণ্য করিয়া লইলেন। এই

নগর আক্রমণে যে সকল ধন-রত্ন লুণ্ঠিত হয়, তাহার পঞ্চমাংশ হেজ্জাজের জন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট অংশ সৈন্যগণ পরস্পর ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইল। অন্যান্য নগর লুণ্ঠনেও উহাদের মধ্যে এইরূপ বিভাগ-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, দাহিরের এক পুত্র পলায়ন করিয়া ব্রাহ্মণাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাসিম তাঁহার অনুসরণে অগ্রসর হইয়া, মেরুণ (বর্ত্তমান হায়দ্রাবাদ), সেওয়ান এবং শালিন আক্রমণ করিলেন। রাজা দাহির ভীরু কাপুরুষ ছিলেন না। ভিন্ন ভিন্ন নগর কাসিমের করতলগত হইতেছে দেখিয়া, তিনি প্রাণপণে কাসিমকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য তাঁহার পতাকা-মূলে সজ্জিত হইল। কিছুকাল ঘোর যুদ্ধ চলিল। পরিশেষে সহসা বিপক্ষের একটী গোলা-আসিয়া দাহিরের হস্তীর উপর নিপতিত হইল। হস্তী ভীত চকিত হইয়া, দাহিরকে পৃষ্ঠে লইয়া নিকটবর্ত্তী নদীগর্ভে ঝম্প প্রদান করিল। তখন দাহিরকে সম্মুখে না দেখিয়া তাঁহার সৈন্যদল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। গজ হইতে অবতরণ করিয়া দাহির যখন অশ্বারোহণে পুনরায় সৈন্যদল মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ভাগ্যলক্ষ্মী আর তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। প্রথমে শত্রুপক্ষের এক তীর আসিয়া তাঁহার দেহ বিদ্ধ করিল। কিন্তু তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, দাহির যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিঃসহায় অবস্থায় এই অসমসাহসিকতার যে ফল অবশ্যম্ভাবী, তাহাই সংঘটিত হইল। দাহির সেই রণস্থলেই প্রাণবিসর্জ্জন দিলেন। দাহিরের মৃত্যুর পর, তাঁহার সৈন্যদল ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গে আশ্রয় লইল। দাহিরের বিধবা পত্নী—বীররমণী—সেই সৈন্যদলের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিন ব্রাহ্মণাবাদ আত্মরক্ষা করিল। ক্রমে রসদ ফুরাইয়া আসিল। তখন, আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া পুত্রপরিজন সহ রাজ্ঞী সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। ফুরাইল!—দাহিরের রাজ্য-রক্ষার শেষ দীপশিখাটিও নির্ব্বাপিত হইল। তখন দুর্গ মধ্যে আর আর যাহারা ছিল, কেহ বা আক্রমণকারিগণের শাণিত তরবারি মুখে প্রাণদান করিল, কেহ বা বন্দী হইয়া ক্রীতদাস মধ্যে পরিগণিত রহিল। ইহার পর কাসিম বিনা বাধায় মুলতানে প্রবেশ করিলেন। দাহিরের রাজ্য সর্ব্বতোভাবে কাসিমের কবলগ্রস্ত হইল। দাহিরের রাজ্য অধিকারে কাসিমের অত্যাচার—ইতিহাসের অঙ্ক কি কলঙ্কিত করিয়াই রাখিয়াছে! কাসিম যে নগরী যখন আক্রমণ করিয়াছেন, তখনই সে নগরের দেব-মন্দিরাদি বিধ্বস্ত করিয়াছেন; আর সেই নগরের অধিবাসীদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইয়াছেন। যে জন তাহাতে আপত্তি করিয়াছে, তাহার মস্তকচ্ছেদ হইয়াছে। কাসিমের আক্রমণোপলক্ষে কত নরনারী যে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল, কত নর-নারী যে দাস-দাসী রূপে আরবে ও পারস্যে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এই উপলক্ষে, কথিত আছে, রাজা দাহিরের দুইটি সুন্দরী কন্যা কালিফের দরবারে উপঢৌকনরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই অভিনব উপহারের বিষয় অবগত হইয়া, কালিফ ওয়ালিদ আনন্দভরে রাজার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে নিকটে লইয়া যাইতে আদেশ করেন। দাহির-কন্যা যখন অন্তঃপুরে কালিফের নিকট আনীত হন, তিনি আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি প্রকাশ করেন,—

'কাসিম তাঁহাকে যে অপমান করিয়াছিলেন, সে অপমানের পর কালিফের দৃষ্টি কি প্রকারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে?' দাহির-কন্যার কাতরোক্তিতে কালিফ বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠেন। উত্তেজনা-বশে তাঁহার মনে হয়,—'কি আস্পর্দ্ধা! আমার নিকট যে উপঢৌকন আসিতেছে, আমার ভৃত্য হইয়া কাসিম সে উপঢৌকন অপবিত্র করিল!' এই মনে করিয়া কালিফ রোষভরে কাসিমের দেহটাকে কাঁচা চামড়ার মধ্যে সেলাই করিয়া তাঁহার দরবারে (দামাস্কসে) পাঠাইবার জন্য আদেশ দিলেন। কাসিমের দেহ যখন সেইভাবে কালিফের নিকট আনীত হয়, রাজকন্যা আনন্দ-আবেগে প্রকাশ করেন,—'আমার পিতৃহন্তার এই পরিণাম দেখিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি কতকটা নিবৃত্ত হইল।' ৭১৪ খৃষ্টাব্দে কাসিমের প্রাণদণ্ড হয়। আরবগণের ভারতজয়লিপ্সা সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায়। কাসিমের অধিকৃত প্রদেশ-সমূহের শাসন-ভার, তখন তামিম্ নামক জনৈক সেনানায়কের উপর অর্পিত হইয়াছিল। তামিম্-বংশীয়গণ ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময় ওম্মেয়া কালিফ-বংশের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে মুসলমানাধিকারের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপপ্রাপ্ত হয়। তাহার পর প্রায় পাঁচ শতাধিক বৎসর-কাল মুসলমানগণ আর ভারতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শঙ্করাচার্য্যরূপ দীপ্ত-সূর্য্যের আবির্ভাবে, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রখর প্রভায়, মুসলমান আক্রমণরূপ মেঘ একেবারে অপসৃত হইয়া যায়। কাসিমের অমানুষিক অত্যাচারও উহার এক কারণ বলিয়া মনে হইতে পারে। ইস্‌লাম-ধর্ম্মের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, এই কারণেই মনে হয়, ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে পাঁচ শত বৎসরের পথ পিছাইয়া পড়িয়াছিল।

কাসিমের ভারত আক্রমণের পর, প্রায় তিন শতাব্দীকাল ভারতবর্ষ শান্তি লাভ করিয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে মুসলমানগণ আর ভারতের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিতে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে সবক্তেজিন্ কর্ত্তৃক আবার ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইল। সবক্তেজিনের ভারত আক্রমণ—মুসলমানগণের তৃতীয় আক্রমণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই আক্রমণ হইতেই ধারাবাহিকরূপে ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ চলিতে থাকে; আর এই আক্রমণ হইতেই ভারতে মুসলমান-রাজত্বের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। সবক্তেজিন গজ্‌নীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সামান্য একজন ক্রীতদাস হইতে তিনি ঐ পদে উন্নীত হন। সাবক্তেজিনের এই পদ প্রাপ্তির অল্প দিন পূর্ব্বে গজ্‌নীতে মুসলমানগণের শাসন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আলপ্তেজিন নামক জনৈক তুর্কজাতীয় ক্রীতদাস ঐ শাসন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মূলীভূত। তিনি সামানী-বংশীয় সুল্‌তান আবদুল মালেকের প্রিয়পাত্র ছিলেন। সুল্‌তানের মৃত্যুর পর, তিনি আপনার প্রাধান্য-খ্যাপনে প্রযত্নপর হন। সর্দ্দারগণ কিন্তু তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। ফলে, মন্‌সুর সুল্‌তান পদ লাভ করেন; আলপ্তেজিন রাজধানী হইতে বিতাড়িত হন। রাজসংসারে অবস্থিতি-কালে আলপ্তেজিনের কতকগুলি সহযোগী জুটিয়াছিল; তাহাদের লইয়া একটা দল পাকাইয়া আলপ্তেজিন গজনীতে আসিয়া একটা শাসন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বসেন। আলাপ্তেজিনের দ্বারা বহিঃশত্রুর গতিরোধ

সবক্তেজিনের আক্রমণ।

হইতে পারিবে বিবেচনা করিয়া, সুলতান তাঁহাকে আপনার অধীনে গজনীর শাসনকর্তা বলিয়া মানিয়া লন। গজনভী-বংশের প্রতিষ্ঠার ইহাই সূত্রপাত। সবক্তেজিন, আলপ্তে-জিনের ক্রীতদাস ছিলেন। কথিত হয়, আলপ্তেজিন প্রীতিবশে তাঁহার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই সূত্রে সবক্তেজিনের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া যায়। আলপ্তে-জিনের মৃত্যুর পর, তিনি গজনীর সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসেন। আলপ্তেজিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যে তিনি গজনীর সিংহাসন-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা নহে। প্রথমে ইসাথ. ঐ পদ লাভ করেন। সবক্তেজিন তাঁহার সহকারী থাকেন। পরিশেষে পিরি নামক জনৈক সর্দ্দার ঐ পদে নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু সবক্তেজিন তাঁহার হত্যাকাণ্ড সংসাধনান্তে সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। ক্রীতদাস হইয়াও সবক্তেজিনের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একদিন মৃগয়ায় গিয়া সবক্তেজিন একটি মৃগ-শিশু লাভ করেন। সেই মৃগ-শিশুটিকে সঙ্গে লইয়া তিনি যখন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, সেই সময় তাহার জননী তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল। হরিণী এমনই কাতর-ভাবে সবক্তেজিনের ঘোটকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল যে, তদ্দৃষ্টে সবক্তেজিনের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয়। সবক্তেজিন তখন সেই মৃগ-শিশুকে তাহার জননীর নিকট ছাড়িয়া দেন। শিশুকে পাইয়া হরিণী আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া যায়। সেই রাত্রে সবক্তে-জিনের শয্যার পার্শ্বে যেন মজরত মহম্মদ আসিয়া উপস্থিত হন এবং ঐ করুণার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রদান করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়া যান। সেই ভরসার উপর নির্ভর করিয়াই সবক্তেজিন রাজ্যপ্রতিষ্ঠার অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সবক্তেজিন যখন গজনীতে প্রতিষ্ঠান্বিত হন, তখন কাবুল-প্রদেশ হিন্দুরাজ-গণের শাসনাধীন ছিল। আল-বারুণি লিখিয়া গিয়াছেন,—তখন সমন্দ (সামন্ত) নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ঐ প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। ঐ রাজার সহিত লাহোরের অধিপতি জয়পালের সম্বন্ধ-সংশ্রব ছিল। সবক্তেজিন যখন গজনী অধিকার করিয়া কাবুলের প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করেন, তখন হিন্দুনৃপতিগণের মধ্যে আবার একটা বিভীষিকার উদয় হয়। আপন রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য জয়পাল সসৈন্যে কাবুলের অভি-মুখে অগ্রসর হন। পেশোয়ার হইতে কাবুল যাইবার পথে, লাঘ্মান নামক স্থানে, ভীষণ সমরের আয়োজন হয়। সেই সময় সৈন্যদলের অগ্রসর হওয়ার পথে সহসা বৃষ্টি-বজ্র-ঝঞ্ঝাবাতাদি বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া জয়পালের সৈন্যদলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। বিধাতার প্রতিবন্ধক মনে করিয়া, রাজা জয়পাল যখন হতাশ হইয়া পড়িলেন, সেই সময় সবক্তেজিন তাঁহার সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। জয়পালকে সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হইল। এই যুদ্ধে সবক্তেজিন ৫০টি হস্তী প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন তাঁহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জয়পাল তাঁহাকে কিছু অর্থ-প্রদানেও সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই সেই সন্ধিসর্ত্ত ভাঙ্গিয়া যায়। তখন আবার হিন্দু মুসলমানে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে দিল্লী, আজমীর, কলিঞ্জর, কনোজ প্রভৃতির রাজন্যবর্গ জয়পালের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারা এক লক্ষ অশ্বারোহী ও বহু সংখ্যক পদাতিক

সৈন্যসহ লাঘমান-অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, ঐ যুদ্ধেও হিন্দুগণের পরাজয় ঘটিল। তখন সবক্তেজিন নরশোণিতে দেশ প্লাবিত করিয়া, লুঠতরাজ করিতে করিতে সিন্ধুনদের তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিন্ধুনদের পশ্চিম-তীরবর্ত্তী সমস্ত জনপদ সবক্তেজিনের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইল। পেশোয়ারে তাঁহার একজন প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। লাঘমানের আফগানগণ ও খিলিজি সর্দ্দারগণ সবক্তেজিনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, তাঁহার সৈন্যদলের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে লাগিল।

সবক্তেজিনের পুত্র—সুল্‌তান মামুদ নামে পরিচিত। পিতা সবক্তেজিন ভারতের দিকে অগ্রসর হইবার যে পথ পরিষ্কার করিয়া যান, তিনি সেই পথ প্রশস্ত করিয়া তুলেন।

তাৎকালিক অবস্থা।

সুলতান মামুদের ভারত-আক্রমণ-কাহিনী এখনও অন্তরে অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে। প্রধানতঃ সেই আক্রমণের ফলেই ভারতে মুসলমান-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। সবক্তেজিনের অস্ত্রাঘাত শুকাইতে না শুকাইতে, সুলতান মামুদের ভীষণ তরবারি ভারতের বক্ষে নিপতিত হয়। জ্বালা জুড়াইতে না জুড়াইতেই, নূতন জ্বালা আরম্ভ হয়। যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন, প্রায় প্রতি বৎসরই সবক্তেজিন ভারতের এক এক প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাহার পর কুক্ষণে একাদশ শতাব্দী আসে। শতাব্দীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দিগ্দাহকারী উল্কাপাতের ন্যায় সুল্‌তান মামুদ আসিয়া ভারতের বক্ষের উপর নিপতিত হন। ১০০১ খৃষ্টাব্দে সুল্‌তান-মামুদের প্রথম আক্রমণ। তার পর যে ভাবে যে বিপদ-পরম্পরার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ মুসলমানগণের কবলে পতিত হয়, সে ইতিহাস মুসলমান-রাজত্বের ইতিবৃত্ত-প্রসঙ্গে পরিবর্ণিত হইবে। এতৎপ্রসঙ্গে মাত্র সবক্তেজিনের সহিত প্রথম সংঘর্ষের সময় হইতে সুল্‌তান মামুদের ভারত-আক্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তিকালের সংক্ষিপ্তসার বিবরণ প্রদান করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে।

৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।—জয়পালের বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলের সহিত সবক্তেজিনের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে জয়লাভে সবক্তেজিনের প্রভাব বৃদ্ধি। এ সময় ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা নানারূপে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কচ্ছপঘাট-রাজবংশের বজ্রদমন কনোজ ও গোয়ালিয়র অধিকার করেন। মিবারের গুহিল রাজবংশে নরবাহনের পুত্র শক্তিবাহন রাজা হন। তালকাডের পশ্চিম গঙ্গা-বংশে দ্বিতীয় রাসমল রাজত্ব করিতেছিলেন।

৯৭৯ খৃষ্টাব্দ।—সবক্তেজিন কাবুল উপত্যকায় লাঘমান পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। জয়পাল তাঁহার নিকট পরাজিত হন। তখন উত্তর-সিন্ধু প্রদেশ ভাতিন্দার রাজার অধিকারভুক্ত ছিল। এই সময় সে প্রদেশেও সবক্তেজিনের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ।—কাশ্মীরে এখনও অন্তর্বিপ্লব চলিতেছিল। রাজ্ঞী দিদ্দা কর্ত্তৃক এ সময় ভীমগুপ্ত নিহত হন। মন্ত্রী তুঙ্গ প্রধান সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহারই ক্রীড়া-

(৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ) পুত্তলি-রূপে, রাণী রাজকার্য্য-পরিচালনে প্রবৃত্ত হন। লাত্তালুরের রত্তবংশীয় যুবরাজ কার্ত্তবীর্য্য এখন রাজা হন। কুণ্ডদেশ তাঁহার শাসনাধীনে ছিল। তিনি কল্যাণীর পশ্চিম-চৌলুক্যগণের করদ-নৃপতি মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সাউনদাত্তির রত্তরাজ-বংশে এখন শান্তিবর্ম্মণ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি পশ্চিম চৌলুক্য-রাজ দ্বিতীয় তৈলের করদ মধ্যে পরিগণিত হন। গোয়ানগরে এই সময় কাদম্ব-রাজবংশের এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। গুহিল্য ব্যাঘ্রমারিণ্ ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।—চোল-বংশে এখন প্রথম রাজরাজ প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি *পশ্চিম-চৌলুক্যের সত্যাশ্রয় ইরিবা-বেদাঙ্গকে এবং প্রাচ্য-চৌলুক্য রাজবংশের বিমলাদিত্যকে পরাজিত করেন। গঙ্গাপাড়ি, নুলম্বাপাড়ি, তারিগাইপাড়ি, ভেঙ্গী, কুর্গ, মালবার, কলিঙ্গ, লঙ্কাদ্বীপ এবং পশ্চিম-চৌলুক্য সাম্রাজ্য, তাঁহার পঁচিশ বর্ষ-ব্যাপী রাজ্যকালে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।—এই সময় সবেক্তজিন ক্রমাগত দুই বৎসর কাল, ভারতের পশ্চিম উপকুল-স্থিত বন্দর-সমূহ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।—এই সময় জয়পাল এবং ভাতিন্দার সাহী সবক্তেজিনকে আক্রমণ করেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহাদিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইতে হয়। তাঁহাদের চারিটি দুর্গ এ সময় সবক্তেজিনের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।—পশ্চিম-চৌলুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈল এই সময় মালবের প্রমার-রাজ দ্বিতীয় বাক্‌পতিরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। তখন মালবে সিন্ধুরাজ (বাক্‌পতিরাজের ভ্রাতা) প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি কোশলের হুন-বংশীয় নৃপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।—মুলরাজের পুত্র চামুণ্ডরাজ এখন আন্‌হিলবাড়ে চৌলুক্য-রাজসিংহাসন লাভ করেন। তিনি মালবের সিন্ধুবাজের সহিত এই সময় যুদ্ধে ব্রতী হন।

১০০০ খ্রীষ্টাব্দ।—এ সময় পালবংশীয় রাজা প্রথম বিগ্রহপাল বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র নারায়ণপাল, পৌত্র রাজ্যপাল, প্রপৌত্র দ্বিতীয় গোপাল প্রভৃতি রাজত্ব করেন। এই সময়ে উড়িষ্যায় গুপ্তবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয় হয়। এই বংশ ত্রিকলিঙ্গাধিপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রথম শিবগুপ্ত, তৎপুত্র ভবগুপ্ত প্রভৃতি এই বংশে রাজত্ব করেন। এই সময় বিভিন্ন প্রান্তে আরও বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল।

১০০১ খ্রীষ্টাব্দ।—গজনীর মামুদ এই বৎসর ভারতবর্ষ আক্রমণে অগ্রসর হন। এই বৎসর পেশোয়ারের নিকট যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। এই বৎসরই জলন্ত অনলে প্রবেশ করিয়া জয়পাল ইহজীবন শেষ করেন।

—— * ——

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

——:*:——

প্রাণভূত উপাদান।

[ভারতের ইতিহাসে ধর্ম্মের প্রভাব,—ভারতের ইতিহাসকে ধর্ম্মের ইতিহাস বলি কেন,—সকল দেশে সকল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় ও স্থায়িত্বে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের প্রভাব,—ভারতের ইতিহাসের প্রাণভূত উপাদান।]

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর হইতে মুসলমানগণের ভারতাক্রমণ-কাল পর্য্যন্তের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্তসার বিবরণ প্রদানের চেষ্টা পাইয়াছি।

ইতিহাসে ধর্ম্মের প্রভাব।

মুসলমানগণের ভারত আগমনের পর, কি ভাবে ভারতে তাঁহাদের ও তদন্তে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তদ্বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবে। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কাল-প্রভাবে যতই যাহা পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, ঐ সকল বিষয়ের আলোচনায়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের ইতিহাস প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। এক ভাগ—হিন্দু রাজত্ব, এক ভাগ—মুসলমান-রাজত্ব; এক ভাগ—ইংরেজ-রাজত্ব। কিন্তু, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল সময়ের সকল অবস্থাতেই এক অভিনব শক্তির প্রাধান্য দেখিতে পাই। কি রাজনৈতিক, কি সমাজ-নৈতিক, কি ধর্ম্মনৈতিক, ভারতের ইতিহাসের যে দিকেই যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন সেই একই শক্তির প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। প্রাচীন ভারতের সত্য ত্রেতা-দ্বাপরাদি দূর অতীতের তত্ত্বানুসন্ধানে মস্তিষ্ক আলোড়ন করিবার আবশ্যক নাই, যদি কেহ কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সমসাময়িক অবস্থা হইতে বর্ত্তমান-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার তুলনা করিয়া দেখেন, তাহা হইতেও সকল দিকে সর্ব্বতোভাবে সেই শক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। কি কুরুপাণ্ডবগণের আত্মবিনাশী বিরোধের দিনে, কি বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইলে, কি মুসলমান-শৌর্য্যের প্রদীপ্ত প্রভার মধ্যে, আবার কিবা এই বৃটিশ-সাম্রাজ্যের গৌরবময় মধ্যাহ্নকালে,—সেই একই শক্তির লীলা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষীভূত। ভারতের ইতিহাসের ইহাই বিশেষত্ব। আমরা যে পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিয়াছি, ভারতের ইতিহাস—ধর্ম্মের ইতিহাস—ধর্ম্ম-সংঘর্ষের ইতিহাস,—সকল কালের সকল অবস্থাতেই তাহা সপ্রমাণ হয়।

ভারতের ইতিহাস—ধর্ম্মের ইতিহাস কেন বলিয়াছি, তাহার কারণ অনুসন্ধানে বড় অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইবে না। যাঁহাদের গৌরবে ইতিহাস গৌরবান্বিত, তাঁহাদের অস্তিত্ব-

ধর্ম্মের ইতিহাস কেন?

প্রাধান্য প্রভৃতিই উহা সপ্রমাণ করিতেছে। হিন্দুর অস্তিত্ব-প্রাধান্যই হিন্দু-রাজত্ব, ইস্‌লাম-ধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রাধান্যই মুসলমান-রাজত্ব, আবার খৃষ্টধর্ম্মের অস্তিত্ব-প্রাধান্যই বৃটিশ রাজত্ব। মুসলমান রাজত্বের পরবর্ত্তী এই বৃটিশ-রাজত্বকে, ইতিহাস 'খৃষ্টান-রাজত্ব' বলিয়াই অভিহিত করিতে পারিত, কিন্তু বোধ হয় খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে অতি-প্রতাপশালী একাধিক নৃপতির অস্তিত্ব আছে বলিয়াই ভারতবর্ষ 'খৃষ্টান সাম্রাজ্য' বলিয়া অভিহিত না হইয়া 'বৃটিশ-সাম্রাজ্য' নামে বিশেষিত

হইতেছে। যেদিক দিয়া যেমন ভাবেই দৃষ্টিপাত কর না কেন, সত্য সকল দিকেই পূর্ণ-প্রভাবিত, আর সেই সত্য,—ধর্ম্ম প্রভাবের উপরই ভারতের রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত। কুরুক্ষেত্র-মহাসমরে ভারতের ইতিহাসের যে স্তর সংগঠিত হইয়াছে, সেখানে যে শক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করি, ভারতে বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও সেই শক্তি, আবার মুসলমানের এবং বৃটিশের সাম্রাজ্য সৃষ্টির মধ্যেও সেই শক্তি ক্রীড়া করিতেছে। সেই শক্তি—ঐশী শক্তি—এক এক সময়ে এক এক মহাপুরুষের মধ্য দিয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছে। সেই শক্তি, কখনও শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, কখনও বুদ্ধের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, কখনও বা মহম্মদকে, কখনও বা যীশুখৃষ্টকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৈষম্যে সাম্যরক্ষা—শ্রীভগবানের মহীয়সী মহিমা—ইহসংসারে কত বার কত রূপে প্রকটিত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? বৈষম্যে সাম্যরক্ষার জন্যই তাঁহাকে মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে। তিনি মীন-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামনাদি কত বার কত রূপ ধারণ করিয়া বৈষম্যে সাম্য-স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-রূপে আবির্ভূত হইয়া বৈষম্যে সাম্য স্থাপন জন্য তিনি কত লীলা কত খেলাই দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার, বুদ্ধদেবে, মহম্মদে, ও যীশুখৃষ্টে তাঁহারই মহিমা পরিকীর্ত্তিত, তাঁহারই উদ্দেশ্য সংসাধিত, তাঁহারই অভীষ্ট পরিপূরিত। ইতিহাস কি? ইতিহাসে আর আছে কি? ইতিহাসে তাঁহারই তত্ত্ব পরিব্যক্ত। তিনি যদি এবম্বিধ নব নব ভাবে অভিব্যক্ত না হইতেন, বৈষম্যের বিষম ঝঞ্ঝাবাতে পড়িয়া সংসার তরণী কোন কালে বিপর্য্যস্ত হইত। অন্ধতমসাচ্ছন্ন গগনে ঘন মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুরণের ন্যায় তাঁহার শুভাগমনে আলোক-রশ্মি সঞ্চারে দিগ্‌ভ্রান্ত সংসারকে দিক দেখাইয়া দিয়া গিয়াছে। তাই এখনও সংসার এক এক বার গৌরবে বক্ষ স্ফীত ও মস্তক উন্নত করিতে সমর্থ হইতেছে। আর, তাই মনে হয়, ভারতের ইতিহাসের এই যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর, সকলেরই মূলে—ভগবৎ প্রভাব। আর, তাই মনে হয়, যদি ভারতের ইতিহাস বর্ণন করিতে হয়, তাহা হইলে কোন্ স্তরে কোন্ প্রভাব বিদ্যমান, তাহা দেখাইবারই বিশেষ প্রয়োজন। আর, তাই মনে হয় যদি কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের পরবর্ত্তিকালের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা আবশ্যক বোধ করি, তাহা হইলে সেই সময়ের সেই সমাজের প্রাণভূত মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ সর্ব্বাগ্রে উত্থাপন করিতে হয়। আর, তাই মনে হয়, যদি বৌদ্ধযুগের ইতিবৃত্ত ভারতের ইতিহাসে স্থান লাভ করে, তাহা হইলে সেই ইতিহাসের প্রাণভূত বুদ্ধদেবের বিষয় আলোচনা করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আর, তাই মনে হয়, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তিকালে—সমাজ যখন বিকৃত, ধর্ম্ম যখন কলুষিত, রাজনীতি যখন বিপর্য্যস্ত, তখনকার ইতিহাস যদি বর্ণন করার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সেই সময়ের উপর শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবের বিষয় অনুসন্ধান করার আবশ্যক হয়। আর, তাই মনে হয়, মুসলমান-রাজত্বের ভিত্তি-মূলে মহম্মদের প্রভাব এবং খৃষ্টান-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মূলে যীশুখৃষ্টের মহিমা কীর্ত্তন করা ভারতের ইতিহাসে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ঐ সকল মহাপুরুষগণের মহীয়সী শক্তির উপরই তত্তৎ সাম্রাজ্য-সৌধের ভিত্তি-ভূমি প্রতিষ্ঠিত। সকল দেশের সকল ইতিহাসেই রূপান্তরে বা ভাবান্তরে তাঁহাদের বিষয় প্রকটিত হয় বটে,

কিন্তু বিশেষভাবে কোথাও সে প্রভাবের বিষয় আলোচিত হইতে দেখি না। অথবা ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত ধর্ম্মের প্রভাব এতই ওতঃপ্রোত বিজড়িত যে, ধর্ম্মের ইতিহাস বাদ দিয়া ভারতের ইতিহাস প্রকটন সম্ভবপরই নহে। বরং তদ্রূপ চেষ্টায় ইতিহাস অসম্পূর্ণ ভ্রম-সঙ্কুল বলিয়া মনে হইতে পারে।

ইতিহাসে প্রাণভূত।

মহাভারতের সমসাময়িক চিত্রাঙ্কন ব্যপদেশে অথবা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরবর্ত্তিকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি প্রকাশে যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবের বিষয় কীর্ত্তন না করি, তাহা হইলে ইতিহাসের আদিভূত উপাদানই উপেক্ষিত রহিয়া যায়! এইরূপ, বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতে হইলে, সমাজে ধর্ম্মে আচারে ব্যবহারে বুদ্ধদেবের প্রভাব দেখাইতে না পারিলে, সে ইতিহাসও অঙ্গহীন হইয়া রহে। এইরূপ, মুসলমান-সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত বিবৃত করিতে হইলে, অথবা বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে, ঐ সকল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণের প্রভাবের বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়। কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নহে; পৃথিবীর যে দেশে যখনই যে রাজ্য-সাম্রাজ্যের উদ্ভব হইয়া স্থায়িত্ব-লাভ করিয়াছে, তাহারই মধ্যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের প্রভাব লক্ষ্য করি। কোন্ সমাজে, কিরূপ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে, যীশুখৃষ্ট আবির্ভূত হন, আর কিরূপ যন্ত্রণাময় জীবনে পরের পাপ-ভার-গ্রহণে প্রাণ দান করেন; তদ্বিষয় অনুধাবন করিলেই বিশাল খৃষ্টান-সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমির দৃঢ়তা অনুভূত হইতে পারে। খৃষ্টের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই, ইউরোপে নাস্তিক্য-প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসে, ইউরোপ খৃষ্টের আশ্রয়মূলে একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে, আর, তাহারই ফলে এখন পৃথিবীতে বিশাল খৃষ্টান-রাজ্য সংগঠিত হইয়াছে। খৃষ্টের এই ধর্ম্মপ্রভাব যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন খৃষ্টান-সাম্রাজ্যের বা খৃষ্টান-জাতির লোপ নাই। হজরত মহম্মদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের প্রতিষ্ঠাও ততদিন রহিবে,—যতদিন তাহারা মনে প্রাণে স্বধর্ম্মের অনুসরণে কাতর না হইবে, অথবা তাহাদের ধর্ম্মমত বিকৃত হইয়া না আসিবে। ভারতের সম্বন্ধেও ঐ একই উক্তি প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের সমাজ, ভারতের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির মূলে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের প্রভাব সর্ব্বথা পরিদৃশ্যমান। কুরুক্ষেত্র মহাসমর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে সকল মহাপুরুষ ভারতবর্ষের সমাজ ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সমসাময়িক ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে। আমরা তাই, অন্য প্রসঙ্গের অবতারণার প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিকথা কীর্ত্তন করিতেছি। তার পর, তাঁহার প্রভাব কিরূপভাবে কোথায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা পাইতেছি। অধুনা ভারতের ইতিহাসে বুদ্ধদেবের বিষয় কিছু কিছু আলোচিত হয় বটে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রায়ই কোনও ইতিহাসে স্থান লাভ করে না; অথচ, শ্রীকৃষ্ণ, ভারতের ইতিহাসের প্রাণভূত প্রধান উপাদান।

শ্রীকৃষ্ণ।

[(১) শ্রীকৃষ্ণ—ভারতের ইতিহাসে প্রাণস্থানীয়; কেন-না, বিপ্লবের বিষম আবর্ত্তে পতিত ভারত-তরণীকে তিনিই রক্ষা করিয়াছিলেন। (২) শ্রীকৃষ্ণ সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা; কেন-না, তিনি বিচ্ছিন্ন রাজ-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। (৩) শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান; কেন না, সকল ভগবদ্বিভূতি তাঁহাতে বিদ্যমান দেখি। (৪) শ্রীকৃষ্ণ—পরম দার্শনিক; কেন-না, তিনি সাংখ্য পাতঞ্জলাদি সকল দর্শনের সার-সমন্বয় সাধন করিয়া গিয়াছেন। (৫) শ্রীকৃষ্ণ—পরম জ্ঞানী; কেন না, জ্ঞানের চরম স্ফূর্ত্তি তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। (৬) শ্রীকৃষ্ণ—পরম যোগী; কেন-না, যোগের সকল অঙ্গ সার তত্ত্ব তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। (৭) শ্রীকৃষ্ণ—পরম প্রেমিক, কেন-না, তিনি বিশ্বপ্রেমের মূলাধাররূপে বিদ্যমান আছেন। (৮) শ্রীকৃষ্ণ—পরম নীতিবিৎ; কেন-না, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি—সকল নীতিশিক্ষা-দানেই তাঁহার মহিমা বিকশিত। (৯) শ্রীকৃষ্ণ—সনাতন ধর্ম্মের উদ্ভাবকর্ত্তা; কেন-না, ধর্ম্ম সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আদর্শ তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। (১০) শ্রীকৃষ্ণ—পরম ত্যাগী; কেন-না, তিনি সকল ত্যাগের সারভূত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। (১১) শ্রীকৃষ্ণ—সকল সত্য তত্ত্বের আদর্শ, কেন না, তিনিই সত্য-স্বরূপ।]

* * *

১। শ্রীকৃষ্ণ—ভারতের ইতিহাসে প্রাণস্থানীয়; কেন-না, বিপ্লবের বিষম আবর্ত্তে পতিত ভারত-তরণীকে তিনিই রক্ষা করিয়াছিলেন।

[শ্রীকৃষ্ণ—বিপ্লব হিন্দু-সমাজের রক্ষাকর্ত্তা,—লোপপ্রাপ্ত প্রাচীন জাতিসমূহের সহিত হিন্দু-জাতির তুলনায়;—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কালে ভারতের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক অবস্থার চিত্র,—কংস, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন প্রভৃতির প্রসঙ্গে এবং তাৎকালীন সমাজের ব্যভিচারাদির বিষয় উল্লেখে।]

শ্রীকৃষ্ণ প্রাণস্থানীয়।

পৃথিবীর উপর দিয়া বিবর্ত্তনের কি প্রবল প্রবাহই চলিয়াছে! কতই ভাঙ্গিতেছে—কতই গড়িতেছে! কত জাতির অভ্যুত্থান ও অধঃপতন ঘটিল,—কত নব নব সাম্রাজ্য, কত নব নব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, কত ভাবে কালের ক্রোড়ে ক্রীড়া করিয়া গেল! কিন্তু সেই বিশ্ব-বিপ্লবকারী বিবর্ত্তন-প্রবাহের মধ্যেও ভারতবর্ষ আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। সে দেখিল—তাহার চক্ষের উপর কত জাতি কত ভাবে ভাসিয়া গেল! সে দেখিল—কালের তাণ্ডব লীলা কত সম্প্রদায়কে কেমন ভাবে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লইল! কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, তাহার উপর বিবর্ত্তনের সে প্রভাব কার্য্যকরী হইল না! কি জানি, কোন্ মহীয়সী মহিমা সে বিপ্লবে তাহাকে রক্ষা করিল! জল-বুদ্বুদের ন্যায় কত জাতি উঠিল ও মিশিয়া গেল; কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দু-জাতি অক্ষুণ্ণ রহিল! কত সমাজ কত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কত চাকচিক্যই দেখাইবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু জলদ-কোলে ইন্দ্রধনুর ন্যায় তাহাদের অস্তিত্ব কোথায় লুকাইয়া গেল! অথচ, সূর্য্যসম প্রভাববান্ হইয়া রহিল—ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্ম, আর

সেই সনাতন ধর্ম্মের অনুসারী এই হিন্দু-জাতি। যখন দেখিতে পাই, বিবর্ত্তনই বিশ্বজনীন নিয়ম; তখন সেই নিয়মের ব্যতিক্রমকারী এ অভাবনীয় অচিন্তা-পূর্ব্ব ঘটনার কারণ কি? এক কারণ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শুভক্ষণে ভারতভূমে কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল;—তাই সেই বিবর্ত্তনের বিষম সঙ্কটের দিনেও হিন্দুজাতি রক্ষা পাইয়া গেল! শ্রীকৃষ্ণ যদি ভারতবর্ষে আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, 'ভারতবর্ষ' নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইত; তাহা হইলে বোধ হয়, 'হিন্দুস্থান' সংজ্ঞা ইতিহাসের অঙ্গ হইতে মুছিয়া যাইত; তাহা হইলে বোধ হয়, পৃথিবীর অন্যান্য লোপ-প্রাপ্ত প্রাচীন জাতি-সমূহের নামের সঙ্গে, 'হিন্দুর' নামটি মাত্র কচিৎ গ্রথিত থাকিত! কোথায় সে প্রাচীন মিশর—কাল-প্রভাবে ভাসিতে ভাসিতে গিয়া কাহার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দিল! সে জাতির কীর্ত্তি-স্তম্ভ পিরামিড-স্তূপ!—তুমি কি সাক্ষ্য দিতে পার—তোমার সেই লোকপ্রসিদ্ধ নির্ম্মাতৃগণ এখন কি ভাবে কোথায় অবস্থান করিতেছেন! প্রাচীন রোম!—প্রাচীন গ্রীস!—তোমরা তো জগতের বক্ষে সে দিন মাত্র ক্রীড়াশীল ছিলে!—তোমরাই বা এখন কোথায় কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছ? কাল-প্রবাহে বিচরণশীল আসিরীয়া, বাবিলন, ফিনিসীয়া—বুদ্‌বুদের প্রায় কোথায় মিশিয়া গেলে? প্রাচীন কাহারও কোনও পরিচয়-চিহ্ন—ক্রম-পর্য্যায়—কোথাও অনুসন্ধান করিয়া মিলিবে না। কিন্তু সে পরিচয় অক্ষুণ্ণ আছে—ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ আজিও তারস্বরে ঘোষণা করিতে সমর্থ—তাহার পিতৃ-পরিচয়ের এখনও ক্রমভঙ্গ হয় নাই। সেই হিন্দু, আজিও আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে স্পর্দ্ধা অনুভব করিতে পারেন; সেই ব্রাহ্মণ—আজিও আপনাকে বরেণ্য আসনে অধিষ্ঠিত রাখিতে সমর্থ আছেন। এ ক্রম-পর্য্যায় রক্ষার মূলাধার—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ—ভারতের ইতিহাসে তাই প্রাণস্থানীয়।

কি বিপ্লব-বিপদ হইতেই শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিলেন? রাষ্ট্র-বিপ্লব, ধর্ম্ম-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, নীতি-বিপ্লব—যত প্রকার বিপ্লব সম্ভবপর, ভারতবর্ষে সেই সকল বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তখন রাজন্যবর্গ কি দুর্বৃত্ত-দুশ্চরিত্র হইয়াই উঠিয়াছিলেন! যে জাতির মূল-মন্ত্র—'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ'; সে জাতির অধিপতি হইয়া, রাজচক্রবর্ত্তী কংস আপনার পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! রাজার রাজধর্ম্ম-পালনে ব্যভিচার, ইহার অধিক আর কি হইতে পারে? সৌভ্রাত্র্য যে জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, সে জাতির নৃপতি দুর্য্যোধন বঞ্চনায় ভ্রাতৃগণকে হৃতসর্ব্বস্ব করিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তার পর, কি ভীষণ!—কি লোমহর্ষণ!—জরাসন্ধের অত্যাচার! জরাসন্ধ শঙ্কর-পূজার অছিলায় নরবলি প্রদান করিতেন; আর তাঁহার সেই অত্যাচারে কত গৃহস্থকে প্রাণভয়ে দেশান্তরে পলায়ন করিতে হইয়াছিল! * সমাজের এ অধঃপতনের কি তুলনা আছে? রাজার এবম্বিধ অত্যাচারের কি পার আছে? কেবল কি প্রজার প্রতি এই অত্যাচার? সুসভ্য রাজনীতির নিয়ম অনুসারে অধীন করদ-মিত্র

বিপ্লব-বিভীষিকার চিত্র।

* জরাসন্ধের নরবলির বিষয়—মহাভারত, সভাপর্ব্ব, দ্বাবিংশ অধ্যায় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

রাজন্যবর্গ প্রধান রাজার আশ্রয়-লাভে শান্তিসুখে সুখী থাকেন। কিন্তু জরাসন্ধের আধিপত্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, তাঁহাদের কি দুর্দ্দশাই উপস্থিত হইয়াছিল! তাঁহারা জরাসন্ধের অত্যাচারে দিবারাত্রি পরিত্রাহি ডাক ডাকিতেছিলেন। ইতিহাসে প্রকাশ, পারিপার্শ্বিক এক শত ক্ষুদ্র রাজা, জরাসন্ধের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু জরাসন্ধ সুযোগক্রমে সেই সকল অধীন নৃপতিকে আপন রাজধানীতে আহ্বান করিয়া আনিয়া বন্দী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সেই সকল নৃপতিকে নরবলি প্রদান করিবেন। অপিচ, তখন ভারতে এমন কেহই সামর্থ্যবান ছিলেন না যে, জরাসন্ধের সে অত্যাচারে বাধা দিতে পারেন। রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পাদনে মহামতি যুধিষ্ঠির যখন রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত হইবেন স্থির হয়, তখন সে অত্যাচার-নিবারণে তাঁহারও বিক্রম, বিভীষিকা দেখিয়াছিল। জরাসন্ধের অত্যাচারের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন কহিলেন,—"সেই এক শত অধীন নৃপতির মধ্যে ষড়শীতি ভূপতি জরাসন্ধ কর্ত্তৃক সমানীত হইয়া বলিদানার্থ নিরূপিত রহিয়াছেন। কেবল চতুর্দ্দশ মাত্র অবশিষ্ট আছেন, তাঁহারা হস্তগত হইলে, ঐ ঘোরতর ক্রূর কর্ম্ম অচিরে সম্পাদিত হইবে। অতএব ঐ ব্যাপারে যিনি বিঘ্ন প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই প্রদীপ্ত যশোরাশি লাভ করিতে পারিবেন, এবং যিনি তাঁহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য ভোগ করিবেন।" কিন্তু স্মরণ করিয়া দেখুন, যুধিষ্ঠির তাহাতে কি উত্তর দেন! জরাসন্ধের ন্যায় পরাক্রমশালী নৃপতি বিদ্যমান থাকিতে, তাঁহার রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিয়াই তিনি ব্যক্ত করেন। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন উৎসাহ-সহকারে জরাসন্ধ-বধের প্রস্তাব করেন, যুধিষ্ঠির হতাশ-ভাব-প্রকাশে কহিয়াছিলেন,—"আমি মনে করি, ভীমার্জ্জুন আমার নেত্র-যুগল, আর তুমি আমার মন। অতএব নয়ন-মন বিহীন হইয়া আমি কিরূপে জীবিত থাকিব?" ফলতঃ, অত্যাচারীর অত্যাচার-দমনের সামর্থ্যও তখন লোপ পাইয়াছিল। রাজশক্তি বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, যথেচ্ছাচারিতা যেন রাজ্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। যেমন জরাসন্ধ, তেমনই শিশুপাল। শিশুপাল চেদী-দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি ভগবদ্বিদ্বেষী ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভেদবুদ্ধি শিক্ষা দেওয়াই যেন তাঁহার রীতি-নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভগবদ্ভক্তি, ভগবৎ-প্রীতি মানুষ যাহাতে বিস্মৃত হইয়া যায়, চেদীপতি শিশুপালের কার্য্যে ও বাক্যে সেই শিক্ষাই বিকাশমান। পৌণ্ড্রদেশের অধিপতি বাসুদেব কর্ত্তৃক ভগবানের প্রতি বিদ্রূপ-প্রকাশই বা কি শিক্ষা দিতেছিল? মানুষ ভগবানের প্রতি বিদ্রূপপরায়ণ হউক—এ কি নীচ শিক্ষা! এইরূপ কত দিকে কত ভাবে উচ্ছৃঙ্খল রাজত্ব করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। তখন রাজশক্তি কি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াই পড়িয়াছিল! উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম—ভারতের যে প্রান্তে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই দিকেই দেখিতে পাইবেন, রাজলক্ষ্মী কাঁদিয়া কাঁদিয়া আশ্রয় অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। উত্তরে দেখুন—কত রাজ্য কত জনপদ আপনাপন ক্ষুদ্র-শক্তির গরবে অধীর হইয়া যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছে; আর সেই সুযোগে কত বৈদেশিক আচারভ্রষ্ট জাতি ভারতের

দ্বারে প্রবেশোন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে পশ্চিমে দক্ষিণে— সকল দিকেই সমান বিশৃঙ্খলা—সমান বিভীষিকা! বর্ত্তমান ইতিহাস বলিয়া থাকে,—'আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণই বিধর্ম্মী বৈদেশিক জাতিগণের ভারতের সহিত প্রথম সম্বন্ধ স্থাপন।' * সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস হিসাবে সেই আক্রমণই প্রথম আক্রমণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যে সময়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, তখনও এক এক বার ভারতের সেই অবস্থার উপক্রম হইয়াছিল। ভারত হইতে বিতাড়িত আচারভ্রষ্ট পারদ-পহ্লব-চীন-যবনাদি জাতিগণ তখনও পূর্ব্ব-অপমান পূর্ব্ব-শত্রুতা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। পরন্তু, তখনও তাহারা ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবার জন্য জিহ্বা-লেহন করিতেছিল, আর ধীরে ধীরে আহার্য্যের অন্বেষণে অগ্রসর হইতেছিল। যেমন রাষ্ট্র-বিপ্লব, তেমনই সমাজ-বিপ্লব ও নীতি-বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। যাঁহারা আদর্শ-স্থানীয় হইবেন, তাঁহারাই তখন কি কলুষ-চরিত্রের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যখন দেখিতে পাই,—যুধিষ্ঠিরের ন্যায় আদর্শপুরুষ বিভ্রান্ত দ্যূতক্রীড়াসক্ত, আর তাহাতে রাজ্য-সাম্রাজ্য—এমন কি, সহধর্ম্মিণীকে পর্য্যন্ত পণ করিতে অকুণ্ঠিত-চিত্ত, তখন সমাজ যে কি অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয় না কি? কলির আগমনের সূচনা, তাৎকালিক বহু নর-চরিত্রেই যেন প্রকাশ পাইতেছিল। নীতি কি বিকৃতি-প্রাপ্তই হইয়াছিল! রাজ-দণ্ডধর রাজার সভায় রজঃস্বলা রমণীকে কেশাকর্ষণে লইয়া গিয়া বিবস্ত্র-করণের চেষ্টা!— ইহার অধিক নীতিবিগর্হিত কার্য্য আর কি হইতে পারে? সমাজ-বন্ধন কি শিথিল হইয়াই পড়িয়াছিল! সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি, আর গান্ধর্ব্ব-রাক্ষসাদি বিবাহের প্রবর্ত্তনা—সমাজের অধঃপতনের কি ভীষণ চিত্রপট নয়ন-পথে প্রতিফলিত করে! তখন সচ্চরিত্র সাধু-সজ্জন যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি না, তবে কুচরিত্র কদাচারের প্রশ্রয় যে দিন-দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল, আর প্রসিদ্ধ প্রধান সংসার-বিশেষের মধ্যে যে ব্যভিচার-স্রোত প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। সেই অবস্থাই অধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অবস্থা। গীতায় যে শ্রীভগবান বলিতেছেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

'হে ভারত! যখনই যখনই ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই তখনই আমি নরদেহ ধারণ করিয়া ভূভার-হরণে অবতীর্ণ হই', পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোচনায় সেই সময়ই উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না কি? ফলতঃ, সে বিশৃঙ্খলার ভাব যদি বর্দ্ধমান থাকিত, সে বিলাস-ব্যসনের স্রোতে সমাজ যদি ভাসমান হইত, তাহা হইলে ভারতের হিন্দুজাতির অস্তিত্ব কোন্ দিন কোথায় লুকাইয়া যাইত। পাপের এই প্রবল বন্যার মাঝে, সমাজ-বিপ্লবের এই খর-স্রোত-সম্মুখে, গিরিবরের ন্যায় বিশাল বক্ষ

---

* আধুনিক ইতিহাস হিসাবে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণই প্রথম আক্রমণ বটে, কিন্তু অন্য দেশের অন্য জাতির স্বতন্ত্র ভাবে প্রাদুর্ভাব পূর্ব্বে ভারত হইতে বিতাড়িত জাতিরা যে মধ্যে মধ্যে ভারত আক্রমণের চেষ্টা পাইয়াছিল, মহাভারতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

বিস্তার করিয়া যিনি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, আর যাঁহার প্রভাবে সেই প্রচণ্ডগতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল ; তাঁহার মহিমার কি পরিসীমা আছে? শ্রীকৃষ্ণ—সেই অপরিসীম প্রভাববান ; বিপ্লবের বিষম আবর্ত্তে নিপতিত ভগ্নপ্রায় ভারত-তরণীকে তিনিই তখন রক্ষা করিয়াছিলেন।

২। শ্রীকৃষ্ণ—সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা ; কেন-না, তিনিই বিচ্ছিন্ন রাজ-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করেন।

[ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম চারিদিকের বিচ্ছিন্ন রাজশক্তির পরিচয়, রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতির বিবরণোপলক্ষে তাৎকালিক রাজন্যবর্গের প্রসঙ্গ ;—কোন্ দিকে কোন্ দেশ পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরের প্রভাব বিস্তৃত, তাহার আলোচনা ;—যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-সামর্থ্য ও বুদ্ধিমত্তা ;—জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতির সংহার সাধনে যবনগণের আক্রমণ নিবারণে, জলদস্যুগণের উপদ্রব দমনে তাঁহার কৃতিত্ব-কথা ;—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বেও যে যবনাদি আচারভ্রষ্ট জাতিগণ ভারতের প্রতি লোভলোলুপ ছিল, তাহার নিদর্শন ;—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সকল বিঘ্ন দূরীকরণ ও সাম্রাজ্য-স্থাপন।]

তখন কত নৃপতি কি ভাবে ভারতের কোন্ প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিয়া ছিলেন, রাজসূয়-যজ্ঞে দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তাহা অবগত হওয়া যায়। ভীমার্জ্জুন-নকুল-সহদেব ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় যথাক্রমে পূর্ব্ব উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম দিগ্বিভাগে অভিযান করিয়াছিলেন। কোন্ কোন্ দিকে কোন্ কোন্ রাজ্য জনপদ তাঁহাদের প্রাধান্য অস্বীকারে প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করে, আর কোন্ কোন্ রাজ্য সহজে বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হয়, মহাভারতে তাহার পরিচয় আছে।

ভারতের বিচ্ছিন্ন রাজশক্তি।

উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, মহাবাহু অর্জ্জুন প্রথমে কুলিন্দ দেশের মহীপালগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন, পরে আনর্ত্ত, কালকূট প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া, তিনি মহীপতি সুমণ্ডলকে পরাজিত করেন। তৎপরে শাকল-দ্বীপে তত্রত্য নৃপতিগণের সহিত তাঁহাকে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত, কিরাত, চীন এবং সাগর-তীরস্থ অন্যান্য অনূপদেশবাসী বহুসংখ্যক যোধগণের সহিত মিলিত হইয়া, অর্জ্জুনকে বাধা প্রদান করেন। অষ্টাহ ঘোর যুদ্ধ চলে। পরিশেষে সে যুদ্ধে জয়লাভানন্তর, সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, অর্জ্জুন অন্তর্গিরি উপগিরি বহির্গিরি প্রভৃতি পার্ব্বতীয় রাজ্যসমূহ আপনাদের বশতাপন্ন করেন। তার পর, উলুকবাসী বৃহন্তের রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে, একে একে মোদাপুর, বামদেব, সুদামা, সুকুল ও উত্তর-উলূক দেশ সমুদয় অর্জ্জুনের প্রাধান্য স্বীকার করে। ইহার পর দেবপ্রস্থের সেনাবিন্দু, পুরুবংশীয় বিশ্বগশ্ব, উৎসব-সঙ্কেত নামক সপ্তবিধ ম্লেচ্ছ জাতি, কাশ্মীর দেশীয় ক্ষত্রিয় বীরগণ এবং দশ জন ক্ষুদ্র নৃপতির সহিত রাজা লোহিত পরাজিত হন। ত্রিগর্ত্ত, দারুক, কোকনদ প্রভৃতি বহু দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ এই সময়ে অর্জ্জুনের অনুবর্ত্তন করেন। ইহার পর অভিসারী নগর অধিকৃত হয় এবং উরগবাসী রোচমান পরাজিত হন। সিংহপুর, সুহ্ম ও সুমাল তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করে। বাহ্লীক, দরদ ও কাম্বোজগণ * তাঁহার অধীনতা স্বীকারে বাধ্য

* কাম্বোজগণের বাসস্থান সম্বন্ধেও নানা মত প্রচলিত। গ্রিফিথস্ সাহেবের মতে,—কাম্বোজগণ 'আরোচাসিয়ার' (Arochasia) অধিবাসী ছিল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'ইন্দো-এরিয়ান' (*Indo-Aryan*) গ্রন্থে উহাদিগকে কাবুল-প্রদেশের ও হিন্দুকুশ পর্ব্বতের অধিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

হন। পূর্ব্বোত্তর দেশের দস্যুগণ, লোহ, পশ্চিম কাম্বোজ, উত্তর ঋষিক প্রভৃতি সন্নিকৃষ্ট জাতিগণ অতি-ভয়ঙ্কর সংগ্রামের পর পরাজিত হয়। ঋষিকগণকে পরাজয়ের পর বহু উপঢৌকন লাভ করিয়া নিষ্কুট গিরি ও হিমালয় প্রদেশে ধনঞ্জয় আপন প্রাধান্য খ্যাপন করেন। যথাক্রমে শ্বেত পর্ব্বত, কিন্নরগণ নিষেবিত কিম্পুরুষবর্ষ ও গুহ্যকগণ রক্ষিত-হাটক দেশ অর্জ্জুনের করায়ত্ত হয়। অনন্তর গন্ধর্ব্ব-রক্ষিত গন্ধর্ব্ব নগর অধিকারে অর্জ্জুন উত্তর-হরিবর্ষ * জয়ে অভিলাষী হন। উত্তর-হরিবর্ষ—উত্তর-কুরুদেশের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া কথিত হয়। এই উত্তর হরিবর্ষ হইতে দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ ও দিব্য অজিন কররূপে প্রাপ্ত হন। অর্জ্জুনের উত্তর দিগ্বিজয়ে যে চিত্র প্রত্যক্ষ করি, যে ভাব হৃদয় মধ্যে জাগিয়া উঠে, ভীমসেনের পূর্ব্বদিগ্বিজয়েও তাহাই দেখিতে পাই। ভীমসেন প্রথমে পাঞ্চালদিগের মহানগরে উপনীত হন। পরে যথাক্রমে গণ্ডক, বিদেহ, দশার্ণ, অশ্বমেধ, পুলিন্দ, চেদী প্রভৃতি রাজ্য স্ববশে আনয়ন করেন। † অতঃপর, সুকুমার, কোশল, অযোধ্যা, গোপালকক্ষ, উত্তর কোশল মল্লরাজ্য, জলোদ্ভব দেশ, ভল্লাটদেশ শুক্তিমৎপর্ব্বত, কাশী রাজ্য, সুপার্শ্বদেশ, মৎস্যদেশ মলদদেশ তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করে। তখন বৎসভূমি, ভর্গদেশ, নিষাদদেশ, বিদেহদেশ, সুহ্ম ‡ প্রসুহ্ম ও মগধদেশ তাঁহার বশানুবর্ত্তী হয়। এই সময় শক ও বর্ব্বরগণ ভীমসেনের ছলনায় বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। অতঃপর দণ্ড ও দণ্ডধার প্রভৃতি মহীশ্বরগণকে পরাজিত করিয়া গিরিব্রজ গমন পূর্ব্বক ভীমসেন জরাসন্ধ-নন্দন সহদেবকে বশীভূত করেন। ইহার পর কর্ণ প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া, মোদাগিরিস্থ অতি-বলশালী রাজাকে, পুণ্ড্রাধিপতি মহাবল বাসুদেবকে এবং কৌশিকীকচ্ছ নিবাসী রাজা মহৌজকে তিনি পরাজিত ও বশীভূত করেন। পরিশেষে, বঙ্গরাজ্য-জয়ে তিনি অগ্রসর হন। সেখানে মহীপতি সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বটাধিপতি ও সুহ্মাধিপতির সহিত যুদ্ধ হয়। অতঃপর, সাগরতীরবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া তিনি লৌহিত্য-দেশে উপনীত হন। তথন সাগর-তীরস্থিত জলপ্রধান-দেশবাসী ম্লেচ্ছগণ বহু মণি-মাণিক্য উপঢৌকন প্রদানে তাঁহার সৎকার করেন।

* হরিবর্ষ বলিতে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ... উত্তরবর্ত্তী দেশ—প্রাচীন ইউরোপীয় সার্ম্মাটিয় (Europia Sarmatia)—ভারতবর্ষের ইতিহাস বাদে বুঝিয়া থাকেন। প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† এ সময় দশার্ণ রাজ্যে সুধর্ম্ম, অশ্বমেধ রাজ্যে রোচমান পুলিন্দ নগরে সুকুমার ও সুমিত্র এবং চেদিরাজ্যে শিশুপাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

‡ সুহ্ম নামে উত্তরে ও পূর্ব্বে দুই দিকে দুই রাজ্যের পরিচয় পাই। সুতরাং কোন্ প্রদেশ সুহ্ম বলিয়া তখন পরিচিত ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ (সভাপর্ব্ব ৩০ অ, ১৬শ শ্লোক) অর্থাৎ রাঢ়দেশ সুহ্মদেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন—"Th[illegible] country of the Suhmas would seem to c[illegible]rrespond to the modern Tipera and Arracan" কালিদাসের রঘুবংশে 'তালিবনশ্যাম' উপকণ্ঠং মহোদধেঃ।'"—বাক্যে সুহ্মদেশকে তালিবনশ্যাম সাগরসৈকত পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশ বলিয়া বুঝা যায়। সুহ্মগণ নানা সময়ে নানা দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য নানা স্থানে তাঁহাদের ভগ্নাবশেষ সুহ্ম প্রসুহ্ম প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়াছিল। উত্তরে ও পূর্ব্বে দুই দিকে মহাভারতের সময় তাই দুই সুহ্মদেশ দেখিতে পাই।

এইরূপে পূর্ব্ব দেশ জয় করিয়া মহাবাহু ভীমসেন রাজধানীতে উপনীত হইয়াছিলেন। এইরূপ দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যে সকল রাজা-রাজ্য-জনপদের প্রভাব দৃষ্ট হয়, তাহারও কয়েকটির নাম নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে। সহদেব প্রথমে শূরসেনদিগকে পরাজয় করিয়া মৎস্যরাজকে বশীভূত করেন। পরে অধিরাজপতি দন্তবক্র, নরাধিপ সুকুমার ও সুমিত্র, পশ্চিম মৎস্যরাজ্য, পটচ্চরদেশ, নিষাদভূমি, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গোশৃঙ্গ প্রভৃতি জয় করিয়া সহদেব চর্ম্মণ্বতী নদীতীরে জম্ভক রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধের পর, সহদেব সেক ও অপর সেকগণকে পরাজিত করেন। তৎপরে তিনি নর্ম্মদাসন্নিহিত দেশ সমুদয়ে আধিপত্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হন। অবন্তীদেশে বিন্দ ও অনুবিন্দ বীরদ্বয়কে পরাজিত করিয়া, তিনি ভোজকোটপুরে ভীষ্মক রাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া, কোশলাধিপতিকে, বেণ্বাতটের অধীশ্বরকে, কান্তারবর্গের ও পূর্ব্ব কোশলের নৃপতিগণকে পরাজয় করেন। এই সময় নাটকেয় ও হেড়ম্বদিগকে এবং মারুধকে যুদ্ধে বিমর্দ্দিত করিয়া সহদেব মুঞ্জগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। নাচীন, অর্ব্বুক ও আরণ্যক নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া বাতাধিপকে বশবর্ত্তী করেন। পুলিন্দগণ, কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্যের মৈন্দ ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বানররাজ সপ্তাহ যুদ্ধের পর তাঁহার সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর মাহিষ্মতিপুরে নীলরাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। ত্রৈপুররাজ পৌরবেশ্বর, সুরাষ্ট্রাধিপতি, ভোজকোটস্থ ভীষ্মকরাজ প্রভৃতি এই সময় সহদেবের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হন। অনন্তর শূর্পারক, তালাকট ও দণ্ডকগণ বশীভূত হন। সাগরদ্বীপবাসী ম্লেচ্ছযোনিসম্ভূত নরপতিগণ, নিষাদবর্গ, পুরুষাদক সমুদায়, কর্ণপ্রাবরণ সমস্ত, নররাক্ষসযোনি কালমুখ সকল, সমস্ত কোলগিরি, সুরভিপট্টন, তাম্রদ্বীপ ও তিমিঙ্গল প্রভৃতি দেশ তাঁহার বশায়ত্ত ও করপ্রদ হয়। তিনি পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উড্র, কেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ ও উষ্ট্রকেরলদিগকে বশীভূত করেন। রমণীয়া আটবীপুরী, যবনদিগের নগর ও বিভীষণের রাজধানী দূত-প্রেরণ দ্বারা তাঁহার বশীভূত হয়। এইরূপে দক্ষিণ দেশে আপনাদের প্রাধান্য বিস্তার করিয়া, অশেষ মণি-মাণিক্য রত্ন-সম্ভার সহ সহদেব রাজধানীতে উপনীত হন। কত যুদ্ধে কিরূপ ভাবে এই সকল জনপদ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। ফলতঃ, সহদেবের এই দিগ্বিজয়ে দক্ষিণ-ভারতের রাজশক্তির অবস্থা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মহামতি নকুল পশ্চিম-দেশজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে রোহিতক পর্ব্বতে মত্তময়ূরকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। তৎপরে মরুভূমি অতিক্রম করিয়া শৈরীষক ও মহেত্থদেশ আক্রমণ করেন। অতঃপর রাজর্ষি আক্রোশের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্পট এবং মাধ্যমিক, বাটধান দ্বিজগণ এই সময় তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন। পুষ্করারণ্যবাসী উৎসবসঙ্কেত নামক ম্লেচ্ছগণ, সিন্ধুকূলাশ্রিত মহাবল গ্রামণীয়গণ, সরস্বতী-তীরস্থ শূদ্র ও আভীরগণ, মৎস্যজীবী ও পর্ব্বতবাসী জনগণ, সমস্ত পঞ্চনদ, অমরপর্ব্বত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্যকট ও দ্বারপাল নগর তিনি বলাৎকারে বশীভূত করেন। রামঠ, হারহূন ও পশ্চিম তীরস্থ অন্য সকল নৃপতিবর্গ তাঁহার শাসনমাত্র বশায়ত্ত হয়। যোধপতি ও শাকলপতি আপনাপনি উপঢৌকন প্রদান করেন। অবশেষে সাগরগর্ভস্থ

শরমদারুণ ম্লেচ্ছগণকে এবং পহ্লব বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে তিনি বশায়ত্ত করেন।* এইরূপে পশ্চিম দিক জয় করিয়া বহু ধনরত্ন সহ নকুল রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছিল।

---

* অনেক অনুসন্ধিৎসু লেখক শক, যবনাদির এইরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,—"The Sacas were ancient Sacae. The Pahlavs were Medes speaking Pahlavi or the ancient Persian. The Combojas were the inhabitants of Kamboja or Cambodia. The Yavans, as is well known, were the Greeks. The Dravids may be the Druids of Great Britain. The Kirats were the inhabitants of Baluchistan. Daradas of Dardasthan in the Chinese territory. The Khoses were probably some people of Eastern Europe.—Hindu Superiority.

শাকি ও সিদীয় Sacae, Scythian) এক জাতি বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উহাদের বাসভূমি শাকদ্বীপ নামে অভিহিত হয়। গ্রীস দেশীয় ভৌগোলিকগণ শাকদ্বীপকে প্রধানতঃ শাক্তাই (Saktai) ও সিদীয়া (Scythia) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কাস্পিয়ান সমুদ্রের পূর্ব্বস্থিত প্রদেশকে ষ্ট্রাবো সিদীয়া সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। কিন্তু টলেমির মত অন্যরূপ। তাঁহার 'প্রাচীন ভারত' গ্রন্থে (Ptolemy's *Ancient India*) শকাই ও স্কিদীয়া (Sakai, Skythia) দুইটী ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সে হিসাবে স্কিদীয়া দেশের পূর্ব্বাংশে 'শকাই' দেশ অবস্থিত ছিল। শকাই দেশের পশ্চিম সীমা—সোকডিয়ানৈ (Sogdianoi) স্কিদীয়া দেশের ইয়াকজার্ত্তেজ (Iaxartes) নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার পূর্ব্ব-সীমায় আস্কাটাঙ্কাস (Askatangkas) ও ইমাওস (Imaos) পর্ব্বতদ্বয় এবং দক্ষিণ সীমায় ইমাওস পর্ব্বত। এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী দেশ টলেমির মতে শকাইদিগের দেশ। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের মতে শকগণের আবাস-স্থান যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সিদীয়গণ পুরাণে সিদ্ধগণ নামে উক্ত হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। হেরোডোটাসের মানচিত্রে দেখা যায় কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীরের ভূভাগ, সিদীয়া বা স্কিদীয়া নামে (Scythia) নির্দ্দিষ্ট আছে। ভারত হইতে বিতাড়িত আচারভ্রষ্ট জাতিগণ উপনিবেশ অন্বেষণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল বলিয়া তাহাদের বাসস্থানের স্থিরতা নাই।

শবরগণ—পার্ব্বত্য-দেশবাসী বলিয়া অভিহিত। টলেমির গ্রন্থে উহাদিগকে ভারতবর্ষেরই অনার্য্য জাতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। টলেমি 'সাবারাই' (Sabarai) নামক এক পার্ব্বত্য জাতির উল্লেখ করেন। প্লিনির গ্রন্থে 'শুয়ারী' (Suari) নামক এক জাতির নাম দেখা যায়। কানিংহাম সিদ্ধান্ত করেন,—উহারাই 'শবর'; উহাদের বাসস্থানের স্থির নাই। উহারা বনজঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। গোয়ালিয়রের দক্ষিণ পশ্চিমে শুয়ার (Suar) নামক এক পার্ব্বত্য-জাতির অস্তিত্ব আছে। দক্ষিণ-রাজপুতানায় 'সুরিয়স' (Surrius) নামে এক জাতি দেখা যায়। কেহ কেহ উহাদিগকেই শবর বলিয়া অনুমান করেন। উড়িষ্যার সম্বলপুর অঞ্চলে, গোদাবরী নদীর পার্শ্বস্থ জঙ্গলে, কটক ও খুর্দ্দার মধ্যবর্ত্তী স্থানে, শৌর (Sours, Souras) অভিধেয় পার্ব্বত্য জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কেহ তাহাদিগকে 'শবর' বলিয়া থাকেন।

উইলসন, 'খশ' জাতির বাসস্থান কাশ্মীরের পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (Wilson's *Vishnupurana*)। ভ্যালেন্তের বন্যজাতি বিষয়ক গ্রন্থে (*The Wild Tribes of India*) খশগণকে 'খাশিয়া' (Khasiahs) বলিয়া অভিহিত করা হয়। সে মতে, উহারা ভোটজাতির প্রতিবেশী; খাডোয়াল ও কুমায়ুনের পর্ব্বত-শ্রেণীতে উহাদের বসতি।

বর্ব্বর।—আফ্রিকার অন্তর্গত বর্ব্বরী দেশে উহাদের বাসস্থান ছিল বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

রাজসূয়-যজ্ঞোপলক্ষে দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে এবং যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত নৃপতিগণের পরিচয় প্রসঙ্গে, আমরা ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় বুঝিতে পারি। তার পর, কুরু-পাণ্ডবের মহাসমরের সূচনা সময়ে, উভয় পক্ষের সহায়তাকারী নৃপতিবৃন্দের বিষয় আলোচনা করিয়াও তাৎকালিক বিচ্ছিন্ন রাজ-শক্তির আভাষ পাইতে পারি। * এই দুই সময়ের ইতিবৃত্তে দুইটি বিষয় বিশেষ-ভাবে হৃদ্গম্য হয়। প্রথমতঃ বুঝিতে পারি, তখন ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, আর সেই সকল রাজ্যের রাজন্যবর্গের অনেকেই ধর্ম্মহীন ও যথেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ বুঝিতে পারি,—ভারতবর্ষের প্রাধান্য-প্রভুত্ব তখন কত দূরদূরান্তে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রাগ্-জ্যোতিষপুর বলিতে অধুনা আসাম-প্রদেশ বা তাহার উত্তর-সীমান্ত পরিচিহ্নিত হইয়া থাকে। যদি অধুনা-চিহ্নিত সেই প্রদেশই তাৎকালিক প্রাগ্জ্যোতিষপুর রাজ্য হয়, তাহা হইলে হস্তিনাপুর হইতে যাত্রা করিয়া ভারতের উত্তরাংশস্থিত ও তদন্তর্ভুক্ত জনপদের মধ্যে কতগুলি রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল, বেশ বুঝা গেল না কি? তার পর, বাহ্লিক বলিতে মধ্যকালের বাক্ট্রিয়া-রাজ্য এবং আধুনিক মধ্য-এসিয়ার কিয়দংশ (বাল্খ) পরিচিহ্নিত হইয়া থাকে। সেই বাহ্লিক-রাজ্য অতিক্রমান্তে কতদূরে অগ্রসর হইলে হরিবর্ষে উপনীত হওয়া যায়, চিন্তা করিয়া দেখিলে কি বুঝিতে পারি? সমগ্র ইউরোপ এবং ইউরোপের উত্তর-সীমান্ত পর্য্যন্ত তখন যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল—মনে হয় না কি? যেমন উত্তরাংশে, তেমনই দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিমাংশে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বাভিমুখে সাগরসীমা পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল বলিতে চীন-দেশ ও তদন্তস্থিত দ্বীপ-দেশাদি অধিকারের ভাব মনে আসিতে পারে। † দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগ্বিজয়ের বিষয় আলোচনা করিলে ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অষ্ট্রেলিয়ায় ও আফ্রিকা মহাদেশ ‡ পর্য্যন্ত সীমানা, পাণ্ডবগণের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল—সপ্রমাণ হয়।

রাজনৈতিক অবস্থা।

---

* "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ডে, ৪১৪ পৃষ্ঠায় রাজসূয়-যজ্ঞে সমাগত রাজন্যবর্গের এবং পাণ্ডবপক্ষের সহায়তার জন্য যে সকল নৃপতির নিকট মহারাজ দ্রুপদ কর্ত্তৃক দূত প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহাদের তালিকা পাঠে একত্রবিবরণ অবগত হওয়া যায়।

† লৌহিত্য-দেশ বলিতে বর্ত্তমান ব্রহ্মদেশাদির পূর্ব্ববর্ত্তী চীন জাপান পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূমিখণ্ডকে মনে করা যাইতে পারে। কেহ কেহ ব্রহ্মপুত্রের শাখা-বিশেষকে লোহিত-নদ বুঝিয়া তদন্তঃপাতী দেশকে লৌহিত্য-দেশ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি ও আরাকান প্রভৃতি লৌহিত্যের অন্তর্গত। তাঁহারা বলেন—লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের পরপারে পাণ্ডবগণ যাইতে পারেন নাই। তাই সে সকল দেশ সাধারণতঃ পাণ্ডববর্জ্জিত আখ্যা লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না। কারণ, প্রাগ্জ্যোতিষপুর-জয়ে সে সীমা অতিক্রান্ত হইতে দেখি।

‡ শাকল দ্বীপ বলিতে আফ্রিকা মহাদেশকে বুঝাইয়া থাকে। উহা বহু বিভাগে বিভক্ত ছিল। সুতরাং তত্রত্য বহু নৃপতির সহিত অর্জ্জুন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জনৈক অনুসন্ধিৎসু লিখিয়াছেন,—"শাক-দ্বীপের (আফ্রিকার) রাজা ষষ্ঠ (Tata, the first King of Ethiopia) ইথিওপিয়ার প্রথম রাজা ছিলেন। (সাহিত্যসংবাদ, 'ভুবনমুক্ত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, কাহার প্রভাবে ভারতের এই বিচ্ছিন্ন রাজশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল! শ্রীকৃষ্ণই কি ইহার মূলাধার নহেন? যদি শ্রীকৃষ্ণের

বিচ্ছিন্ন রাজশক্তি একীভূত কে করিল?

আবির্ভাব না হইত, এ বিচ্ছিন্ন রাজশক্তি কখনই একসূত্রে গ্রথিত হইতে পারিত না। প্রশ্ন উঠিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ এমন কি করিয়াছিলেন, যাহাতে সকল গৌরবের মূলাধার বলিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তিত করা যাইতে পারে! দিগ্বিজয়ে দেখিতে পাই, ভীমার্জ্জুন-নকুল সহদেবাদির বাহুবলে পারিপার্শ্বিক রাজ্যসমূহ বশীভূত হইয়াছিল। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃতিত্বের কথা কি আছে? পুরাণেতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তির চিত্তে এবম্বিধ প্রশ্নের স্থান পাইতে পারে না সত্য, কিন্তু আধুনিক ইতিহাসের ধারানুসারী অনভিজ্ঞ জন এইরূপ প্রশ্নই উত্থাপন করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাদের সংশয় নিরসন উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণের কৃতিত্বের কয়েকটি প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমতঃ, যুধিষ্ঠির এই রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানে আপনাকে ক্ষমবান বলিয়া মনে করেন নাই। আত্মীয়-আমাত্যগণের উৎসাহ-বাক্যে সম্পূর্ণরূপ ভরসান্বিত হইতে না পারিয়া, তিনি এতদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ-প্রার্থী হন। প্রকারান্তরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আপনার অক্ষমতার বিষয় জ্ঞাপন করেন। রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটপদ লাভ করিবার পক্ষে যে সকল অন্তরায় আছে, তখন একে একে তৎসমুদায় প্রকাশ পায়। তখন জরাসন্ধের প্রভাব প্রতিপত্তির বিষয় মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে। জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে রাজসূয় মহাযজ্ঞ কোনক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে না। অথচ, জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারে,—এমন ক্ষমতাও তখন কাহারও ছিল না। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে যত সৈন্য-সমাবেশ হইয়াছিল, কথিত হয়, জরাসন্ধের সৈন্যবল তদপেক্ষা অধিক ছিল। জরাসন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্যবর্গকে বন্দী করিয়া আনিয়া মহাদেবের নিকট বলি প্রদান করিবেন, আর তাহাতেই তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ণ হইবে, সম্রাট-পদ লাভ সত্বর হইয়া আসিবে। ফলতঃ, জরাসন্ধের ন্যায় প্রবল বলশালী প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যমানে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। এক হিসাবে জরাসন্ধ দেববলে বলীয়ান হইয়াছিলেন; সুতরাং এক শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা ভিন্ন সে যুদ্ধে জয়লাভের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। জরাসন্ধ বধে শ্রীকৃষ্ণের কৌশল অব্যর্থ হইয়াছিল। আর তাহারই ফলে যুধিষ্ঠির সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন। জরাসন্ধের বল-বিক্রমের বিষয় স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, *—"হে জনার্দ্দন! জরাসন্ধের ভীষণ পরাক্রমশালী দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যগণকে প্রাপ্ত হইয়া যমও পরাস্ত করিতে পারেন না। সুতরাং এ পক্ষে চেষ্টা করিলে মহা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা! অতএব আমার মতে প্রস্তাবিত যজ্ঞারম্ভের

* মহাভারত, সভাপর্ব্ব, চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ অধ্যায় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। যুধিষ্ঠিরের উক্তি; যথা,—

"ন তু শক্যং জরাসন্ধে জীবমানে মহাবলে। রাজসূয়স্ত্বয়াবাপ্তুমেষা রাজন্ মতির্মম॥"

"জরাসন্ধ বলং প্রাপ্য দুষ্পারং ভীমবিক্রমম্। যমোঽপি বিজিতাজৌ তত্র বঃ কিং বিচেষ্টিতম্॥

সন্ন্যাসং রোচয়ে সাধু কার্য্যস্যাস্য জনার্দ্দনঃ। প্রতিহন্তি মনো মেঽদ্য রাজসূয়ো দুরাহরঃ॥"

মানস করা উচিত নয়। এ রাজসূয়-যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই আমি শ্রেয়স্কর বোধ করিতেছি। আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে; আমি নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করা অসাধ্য ব্যাপার।” যুধিষ্ঠির যখন এবম্বিধ ভীতিবিহ্বল, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহার নিকট জরাসন্ধ-বধের উপায়-পরম্পরা বিবৃত করেন। একছত্র সম্রাট-পদ লাভ করিতে হইলে, জরাসন্ধের সংহার-সাধন যে একান্ত আবশ্যক, সে পরামর্শ শ্রীকৃষ্ণের নিকটই যুধিষ্ঠির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার নিধনোপায়ও শ্রীকৃষ্ণই যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞাপন করিলেন। এই ঘটনায় একদিকে অত্যাচারী রাজার সংহার-সাধন হইল, অন্যদিকে ধর্ম্মপুত্রের ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার হইয়া আসিল। জরাসন্ধের সংহার-সাধনে তাঁহার অত্যাচারে প্রপীড়িত নৃপতিবর্গ বন্ধন-মুক্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের পক্ষাবলম্বন করিলেন। যাদুকরের যাদুপ্রভাবে এক খেলায় কত খেলা সাঙ্গ হইয়া গেল। অথচ, যাঁহার মহিমা প্রভাবে এই অভাবনীয় অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইল, তিনি স্বয়ং তাহার কণামাত্র যশের আকাঙ্ক্ষা করিলেন না। জরাসন্ধ-জয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, আত্মপ্রতিষ্ঠা গোপন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ কেমন প্রফুল্ল-চিত্তে কহিলেন,—“হে নৃপসত্তম! ভাগ্যক্রমে ভীমসেন জরাসন্ধকে নিপাতিত করিয়াছেন এবং রাজগণও বন্ধনমুক্ত হইয়াছেন। ভাগ্যক্রমে ভীমার্জ্জুন কুশলযুক্ত হইয়া, অক্ষত শরীরে স্বনগরে পুনরাগমন করিলেন।” * মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠির যেন তাহাই বুঝিলেন। আনন্দ-কল্লোলে রাজধানী পরিপূর্ণ হইল। ফলে, যে সকল নৃপতি জরাসন্ধের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, জরাসন্ধের অসদ্ব্যবহারের কারণ তাঁহারা কেহই জরাসন্ধের পক্ষাবলম্বন করিলেন না। পরন্তু তাঁহারা সকলেই আসিয়া এখন যুধিষ্ঠিরের রাজছত্রতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাজীকরের এও এক বাজী-খেলা! তারপর রাজসূয়-যজ্ঞের সময় চেদীপতি শিশুপাল যখন সে যজ্ঞ পণ্ড করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়াছিলেন, আর যজ্ঞপণ্ড ভয়ে পাণ্ডবগণ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে সঙ্কটেই বা কে সহায় হইয়াছিলেন? সেও সেই ভগবান বাসুদেব। তিনি যদি সে সময় শিশুপালের সংহার-সাধনে সাহসী না হইতেন, কে বলিতে পারে, সে রাজসূয়-যজ্ঞ পণ্ড হইত না! পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাধিপতি বাসুদেব, তাঁহার সখা কাশীরাজ ও তৎপুত্র সুদক্ষিণ, সৌভরাজ শাল্ব এবং মথুরাধিপতি কংস প্রভৃতির সংহার-সাধনেও শ্রীকৃষ্ণ সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার পথের সকল কণ্টক দূরীভূত করিয়াছিলেন। এইরূপ যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, ভারতের রাজশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব দিকে দিকে দেদীপ্যমান। কেবল বিচ্ছিন্ন রাজশক্তিকে একীভূত করার জন্য নহে; তৎকালে বৈদেশিক শক্তির ভারত আক্রমণের পথেও তিনিই বাধা-প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মদ্বেষী দেশদ্রোহী জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার

---

* এ বিষয় মহাভারতে মহর্ষি বেদব্যাসের ভাষায় এইরূপ ভাবে পরিবর্ণিত আছে;—

“ইন্দ্রপ্রস্থমুপাগম্য পাণ্ডবাভ্যাং সহাচ্যুত। সমেত্য ধর্ম্মরাজানং প্রীয়মাণোঽভ্যভাষত॥
দিষ্ট্যা ভীমেন বলবান্ জরাসন্ধো নিপাতিতঃ। রাজানো মোক্ষিতাশ্চৈব বন্ধনান্নৃপসত্তম॥
দিষ্ট্যা কুশলিনৌ চেমৌ ভীমসেন ধনঞ্জয়ৌ। পুনঃ স্বনগরং প্রাপ্তাবক্ষতাবিতি ভারত॥”

মথুরা রাজ্য আক্রমণ করেন। জরাসন্ধ সেই সময়ে পারদ, দরদ, তুখার, তুরুণ, খস, পহ্লব, শক, যবন প্রভৃতি পার্ব্বত্য-প্রদেশবাসী ম্লেচ্ছগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। * জরাসন্ধ সমভিব্যাহারে ঐ সকল বৈদেশিক জাতি যখন বার বার মথুরারাজ্য আক্রমণে সমর্থ হইয়াছিল, তখন দেশের সে কি দুর্দ্দিন আসিয়াছিল, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। দেশের সেই সঙ্কট সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরানগরী রক্ষা করিয়াছিলেন এবং কালযবন নামা ম্লেচ্ছরাজকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমবেত যবন-সৈন্য তখন যদি পরাজিত না হইত, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের মন্ত্রণা হয় তো আকাশ-কুসুমে পরিণত হইত। বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক নগর লুণ্ঠন, জলদস্যুগণ কর্ত্তৃক বালক অপহরণ প্রভৃতি বিভীষিকাই বা কাহার প্রভাবে দমন হইয়াছিল? সেও সেই শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলে। মুরদিগের অধিপতি নরকাসুর এই সময় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অধিকার করিয়াছিল। ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উচ্ছেদ-প্রয়াসী যবনশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এই মুরগণ ভারতের প্রতি

---

* জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণে এবং পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে প্রায় চারিদিকেই ম্লেচ্ছজাতিগণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অনেকে ইহাতে মনে করেন, মুসলমানগণকে লক্ষ্য করিয়া বা মুসলমানগণের ভারত আক্রমণ লক্ষ্য করিয়া এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ভ্রম-বিশ্বাস। কেন-না, ম্লেচ্ছ জাতির উৎপত্তির বিবরণ অনুসন্ধান করিলে মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব্বে যবন ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতির অস্তিত্ব ছিল বুঝা যায়। উহাদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল। ম্লেচ্ছ বলিতে বা যবন বলিতে, এক সময় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু ভিন্ন অপর জাতিমাত্রকেই বুঝাইত। স্মৃতি-মতে,—

"চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থানম্ যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে। ম্লেচ্ছদেশঃ স বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃপরম্॥"

এই ম্লেচ্ছগণের মধ্যে মনুসংহিতায় পৌণ্ড্রক, উড্রক, দ্রবিড়, কম্বোজ জবন (যবন), শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত দরদ খশ প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। (মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায়।) মহাভারতে হুন, পুলিন্দ, কেরল, কিরাত প্রভৃতি আরও কতকগুলি ম্লেচ্ছ-জাতির নাম দেখা যায় (আদি পর্ব্ব ১৭৬ম অধ্যায়)। এই সময়ে ঐ সকল ম্লেচ্ছ জাতি যবন বলিয়াও অভিহিত হইত। পরিশেষে 'যবন' শব্দ বিশেষভাবে গ্রীকদিগকেই বুঝাইয়াছিল। মহাভারতে ম্লেচ্ছ ও যবন দুইটী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বুঝিতে পারি। তদনুসারে তুর্ব্বসুর বংশে যবনগণ এবং অনুর বংশে ম্লেচ্ছ-জাতির উৎপত্তি হয় (আদি-পর্ব্ব, ৮৪ম অধ্যায়)। এই যবনগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে মহাভারতে ও রামায়ণে যোনিদেশাচ্চ যবনান (যবনাঃ)" বাক্য দৃষ্টে উহাদের বাসস্থানের একটা আভাষ মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে। মনে হয় উহারা যে দেশে বাস করিত, সে দেশ যোনি-দেশ (যবন-দেশ) নামে পরিচিত ছিল; তদনুসারে গ্রীকগণের সহিত ঐ যবনগণের সম্বন্ধ-সূত্র বেশ বুঝিতে পারা যায়। অশোকের শিলালিপিতে 'যোন'-রাজ (য়োন-রাজ) বলিয়া গ্রীসের অধিপতিগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে (আন্তিওক-নামা যোন-রাজ)। প্রাচীন গ্রীক-জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী আছে, তদনুসারেও উহারা যবন বলিয়া চিহ্নিত হয়। গ্রীকদিগের পুরাণ-গ্রন্থে লিখিত আছে,—'য়ো' নাম্নী (Io) পুরোহিত-কন্যা গাভী-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, আর তাঁহারই গর্ভে 'য়োন'-গণ উৎপন্ন হয়। রামায়ণে রূপকের সহিত এ অংশের সাদৃশ্য দেখা যায়। শব্দের সাদৃশ্য দেখিলেও যবনের ও গ্রীসের আদিম অধিবাসিগণের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। লাটিন ভাষায় 'জুভেনিস' (Juvenies), জেন্দ-ভাষায় 'জুভন' এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদির "জবন" একই ভাব প্রকাশ করে। হোমারের বর্ণনায় গাভী-রূপিণী "য়োয়" প্রসঙ্গে Iaoves শব্দ আছে। ঐ শব্দ ও হিব্রু-ভাষার Javan শব্দ এক, অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। আরও নানা প্রকারে 'যবন' শব্দের সহিত গ্রীকদিগের অভিন্নতা প্রদর্শিত হয়।

সর্ব্বদাই লোভ-লোলুপ দৃষ্টি সঞ্চালন করিত; আর, একটু সুযোগ পাইলেই তাহারা ভারতের নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, ধন-রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। ভারতীয় রাজন্যবর্গ মুরগণের সে অত্যাচার দমন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশেষতঃ, মুরগণের * সুরক্ষিত রাজপুরী, গিরিদুর্গ অস্ত্র-শস্ত্র দুর্ভেদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই মুর-দস্যুদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য স্বয়ং সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া কি বিক্রমই প্রকাশ করিয়াছিলেন! তাঁহারই অব্যর্থ সন্ধানে মুর-সর্দ্দারের মস্তক ছেদ হয়, আর তাহার সহকারিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। এইরূপে নরকাসুর প্রভৃতির সংহার-সাধনে একদিকে যেমন বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ উপদ্রব নিবারিত হইল, অন্যদিকে তেমনই সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার পথও নিষ্কণ্টক হইয়া আসিয়াছিল। জলদস্যুগণের লুণ্ঠন-অপহরণ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে নিবারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গুরুপুত্রের উদ্ধার-ব্যাপারে তাহা বুঝিতে পারি। অবন্তীপুরে কাশ্যপ-গোত্রজ সান্দীপনী মুনির আশ্রমে কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সমুদ্রে স্নানকালে তাঁহাদের গুরুপুত্রকে জলদস্যুগণ অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। সমুদ্র-গর্ভে দ্বীপে মধ্যে দস্যুদলের আবাসস্থান ছিল। গুরুপুত্র হরণের বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্র শ্রীকৃষ্ণ সেই দ্বীপে উপস্থিত হন এবং দস্যুদলকে বিধ্বস্ত করিয়া গুরুপুত্রকে উদ্ধার করিয়া আনেন। ফলতঃ, দেশে শান্তি-স্থাপন পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যাহা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই; আর তাই বলিতেছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ ভারতে একছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলাধার, শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছিন্ন রাজ-শক্তিকে একীভূতকরণে কেন্দ্রশক্তি, শ্রীকৃষ্ণ শান্তি-স্থাপনে সিদ্ধকাম।

* * *

৩। শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান; কেন-না, সকল ভগবদ্বিভূতি তাঁহাতে বিদ্যমান দেখি।

[শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে চতুর্ব্বিধ মত;—বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ;—মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব-পরিচয়;—পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব;—কৃষ্ণ ও খৃষ্ট,—যীশুখৃষ্টের জীবন-বৃত্তের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তের সাদৃশ্যালোচনা;—কৃষ্ণ-পূজায় খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রভাবের কথা;—শ্রীকৃষ্ণ-চরিতে খৃষ্ট-প্রভাবের অযৌক্তিকতা;—'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'—যেহেতু সকল ভগবদ্বিভূতিই তাঁহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।]

যিনিই যত শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য হউন না কেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব জগতে কখনও সর্ব্ববাদি-সম্মত হয় নাই। সংসারে সকল বিষয়েই মতান্তর ঘটিয়া আসিতেছে। কোনও বিষয়েই মানুষের ঐকমত্য দেখিতে পাই না। যে সত্যের আলোকে জগতের অন্ধকার দূর হয়, সেই সত্য সম্বন্ধে কত বিতণ্ডা চলিয়া থাকে। কেহ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করে; কেহ সত্যকে মিথ্যার আবরণে আবৃত করিয়া রাখে। ক্বচিৎ কোনও জন সত্যের স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয়। বহুরূপী দর্শন করিয়া আসিয়া, একজন বলিয়াছিল—বহুরূপী নীল বর্ণ;

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে চতুর্ব্বিধ মত।

* মুসলমান-ধর্ম্মের অভ্যুদয়-কালে যে মুরগণ প্রবল প্রতাপশালী হইয়া আফ্রিকায় ও ইউরোপে প্রভুত্ব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল, এই মুরগণকে তাহাদেরই আদিভূত বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। মুরজাতি প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অন্য জন বলিয়াছিল—বহুরূপী রক্তবর্ণ;—ভিন্ন ভিন্ন জনের মুখে, বহুরূপীর নীল পীত লোহিত নানা বর্ণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাহাদের কেহই বুঝিতে পারে নাই যে, বহুরূপীর বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল! ভ্রম চিরদিনই আছে। বিতণ্ডা চিরকালই চলিয়াছে। মানুষের ভ্রম-বিতণ্ডার জন্য কোনও মহাপুরুষ জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। এই ভ্রম-প্রমাদের জন্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লইয়া কত মারা-মারি কাটা-কাটি চলিয়াছে! শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও তাই মতান্তরের অবধি নাই। আদিতে মতান্তর, মধ্যকালে মতান্তর, এখনও মতান্তর। সেই মতান্তরাবলম্বিগণকে প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম সম্প্রদায়,—শ্রীকৃষ্ণদ্বেষিগণ; ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক-খ্যাপনেই বদ্ধ-পরিকর। কালযবন-কংস-জরাসন্ধ শিশুপাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজি পর্য্যন্ত কালের কৃষ্ণদ্বেষিগণের অন্ত আছে কি? দ্বিতীয় সম্প্রদায়,—শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-কল্পনায় যীশুখৃষ্টের প্রভাব-খ্যাপনকারিগণ; খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পাদ্রীগণ ও তাঁহাদের আধুনিক অনুসরণকারিগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় সম্প্রদায়,—শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ মনুষ্য রূপে প্রতিষ্ঠাতৃগণ; ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বলবীর্য্য জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতির আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মনুষ্য বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য-বিদ্যাবিশারদ আধুনিক স্বদেশ-ভক্তগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। চতুর্থ সম্প্রদায়,—ভগবদ্ভক্তগণ; ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষ পরাৎপর বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই শ্রেণীর ভগবদ্ভক্তগণের পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র; কত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কত রূপে শ্রীকৃষ্ণকে এই ভাবে পূজা করিয়া আসিতেছেন, তাহার অন্ত হয় না। এবম্বিধ শত্রু-মিত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত জ্যোতিষ্মান্। ভগবদ্ভক্তগণ বলেন,—নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের হিতসাধনে যিনি উৎসৃষ্ট প্রাণ, তাঁহার আবার শত্রু-মিত্র কি? সকল দিক্ দিয়া সকলে তাঁহার দিব্যজ্যোতিঃ দর্শন করিতে সমর্থ হউন,—এই জন্যই শত্রু মিত্ররূপে তাঁহার লীলা-খেলা। এই লীলা-খেলা চিরদিনই চলিয়াছে—চিরদিনই চলিবে। আর, সংশয়-সাগরে নিমজ্জিত জন চিরদিনই সংশয়-দোলায় দোলায়মান থাকিবে। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"—ইহা শাস্ত্র-বাক্য। সুতরাং শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ জনকে বুঝাইতে হয় না যে, শ্রীকৃষ্ণ কত দিন হইতে দেবতারূপে সম্পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাঁহারা ঐতিহাসিক বলিয়া প্রখ্যাত, যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু বলিয়া গৌরবান্বিত, তাঁহারা অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বড়ই ভ্রান্তমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং, তদ্দ্বারা জনসাধারণের মনে প্রথমেই একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া আসে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইলে, সেই ভ্রান্ত-বিশ্বাস দূর করা প্রথম আবশ্যক বলিয়া মনে করি। কারণ, ঐরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকিলে, মানুষ কখনই শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের মর্ম্মানুধাবনে সমর্থ হইবে না। প্রত্নতাত্ত্বিক বলিয়া প্রসিদ্ধ অনেকেই প্রায় আজ কাল বলিয়া থাকেন,—'শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে কখনও দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন না। জন্মকালেও নহে; কুরু-পাণ্ডবের রাজত্ব-কালেও নহে। এই সে দিন মাত্র—মুসলমানগণের ভারতাক্রমণের পর হইতে শ্রীকৃষ্ণ দেবতা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এমন কি, জয়দেবের পূর্ব্বে—খৃষ্টীয় দ্বাদশ

শতাব্দীর পূর্ব্বে, শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব-লাভের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির সময়ে এবং বৌদ্ধ-গ্রন্থাদির প্রবর্ত্তনা কালে শ্রীকৃষ্ণের বিষয় কেহই জানিতেন না।' * অপর এক সম্প্রদায়ের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহারা এমনও পর্য্যন্ত বলিতে সাহসী হইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবই হয় নাই; যীশুখৃষ্টের জীবন-বৃত্ত অবলম্বন করিয়া পুরাণকারগণ কাল্পনিক কৃষ্ণচরিত্রের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এইরূপ বিরুদ্ধ মতের অবধি নাই। তাঁহার সম্বন্ধে কত ভ্রান্ত মত যে কত ভাবে প্রচলিত, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। অথচ, শ্রীকৃষ্ণ কত কাল হইতে দেবতা-রূপে সম্পূজিত হইয়া আসিতেছেন! অনুসন্ধান করিলে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই না কি—বেদ পুরাণ ইতিহাস সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত আছে! দেখিতে পাই না কি—শ্রীকৃষ্ণ চিরকালই ভগবান বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন!

শ্রীকৃষ্ণ কত কাল হইতে সম্পূজিত? সে তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, প্রধানতঃ দুইটী বিষয়ের অনুধাবন করা আবশ্যক। প্রথম,—শ্রীকৃষ্ণের নাম-তত্ত্ব। দ্বিতীয়,—কৃষ্ণ-চরিত্রের উপাদান-সমূহ। কৃষ্ণ-চরিত্র বুঝিতে হইলে কোথায় কি ভাবে কৃষ্ণকথা আলোচিত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক হয়। আর তাঁহার নাম তত্ত্ব অনুধাবন করিতে হইলে—কি কি নামে তিনি পরিচিত ছিলেন, তাঁহার সন্ধান লইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য অগণ্য নামের মধ্যে বিষ্ণু, বাসুদেব, নারায়ণ, বৈকুণ্ঠনাথ প্রভৃতি তাঁহার নাম-সংজ্ঞা কে না অবগত আছেন? পুরাণে সেই পরিচয়ই পাই; অভিধানে সেই পরিচয়ই পাই। কৃষ্ণ-চরিত্র প্রাচীন যে যে গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ—বিষ্ণু-বাসুদেব-নারায়ণ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন। "কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তুতে"—ভগবদ্ভক্তগণের এই নিত্য-উচ্চারিত মন্ত্রে কৃষ্ণ-বিষ্ণু-বাসুদেব যে অভিন্ন, তাহা নিত্য উপলব্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের সার উপাদান যেখানে যেখানে পাইবেন, সর্ব্বত্রই ইহার প্রমাণ আছে। ইহাতে কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও

শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ শাস্ত্র-গ্রন্থে।

* ম্যাক্সমুলার-প্রমুখ বৈদেশিক পণ্ডিতগণ প্রথমে এই মত প্রচার করেন। তার পর, আমাদের দেশের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এই মতের পরিপোষক। রমেশচন্দ্রের 'প্রাচীন ভারতের সভ্যতা' বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থ, সংস্কৃত-সাহিত্যের ভিত্তি অবলম্বনে (based on Sanskrit Literature) লিখিত; অথচ সেই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন,—"Krishna, who is scarcely much known to Kalidas, Bharavi, Banabhatta, Bhavabhuti, and other classic authors, became the popular god of the Hindus at a later date; Magha and Jayadava, celebrated his deeds in the eleventh and twelfth centuries; and all through the Musulman rule, Krishna was no doubt the most favourite diety of the Hindus." *A History of Civilisation in Ancient India* by R. C. Dutt. ভারতীয় উপাসক-সম্প্রদায় গ্রন্থে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও পূর্ব্বোক্ত মতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রেও' এবম্বিধ মতেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাই।

বাসুদেব অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং যেখানে বাসুদেব বলিয়া সম্বোধন করিয়া অর্চ্চনা হইতেছে, সেখানেও তিনি; আবার যেখানে বিষ্ণু নামে সম্বোধন পূর্ব্বক অর্চ্চনা হইতেছে, সেখানেও তিনি। বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও বাসুদেব প্রভৃতি নামের এই অভিন্নত্ব বুঝিতে হইলে, তাঁহাদের হন্যমান অসুরাদির ও পরিধেয় বসনাদির বর্ণনায় স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। 'অভিধান-চিন্তামণি'-নামকোষ কর্ত্তা হেমচন্দ্র বিষ্ণুর বধ্যাদয় ও ভূষণাদি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এক ভিন্ন অন্য বলিয়া মনে হয় না। * শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেও এতদ্বিষয়ক ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এইরূপে, শ্রীকৃষ্ণ-বিষ্ণু বাসুদেব প্রভৃতি অভিন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মিলে, বেদে পুরাণে ইতিহাসে সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর তাহা হইলে বুঝা যাইবে, ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে (৯৯ম ও ১০০ম সূক্তে) বিষ্ণু-দেবতার যে উপাসনা আছে, সে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা; আর বুঝা যাইবে,—শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির আদি-কাল হইতেই ভগবানরূপে সম্পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলে (২২শ সূক্তে) বিষ্ণুর উপাসনা আছে। সেখানে তাঁহাকে সূর্য্যদেব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—এইরূপ কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু সে অর্থ যে ভ্রমসঙ্কুল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। † ফলতঃ, বিষ্ণুপূজা, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা, যখন বেদে আছে; তখন আবহমানকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তবে এ কথায় কেহ কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ ও বিষ্ণু এক নহেন; অভিধানকারগণ বা কৃষ্ণানুসারী সম্প্রদায়গণ পরবর্ত্তিকালে কৃষ্ণের সহিত বিষ্ণুর সম্বন্ধ ঘটাইয়া ঐরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত একান্ত ভিত্তিহীন। কারণ, সকল শাস্ত্রগ্রন্থেই বিষ্ণুর ও কৃষ্ণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়া রহিয়াছে। তার পর, বেদের অন্য কোথাও যে কৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তিত হয় নাই, তাহা নহে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় অন্যূন দশ স্থলে কৃষ্ণ-নাম দেখিতে পাই। ‡ তাহার দুই এক স্থলে কৃষ্ণ শব্দে কোনও ঋষি বিশেষকে বুঝাইলেও অন্যত্র তাঁহার দেবত্ব প্রতিপন্ন হয়। কেবল ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের ভ্রান্তিবশে সেখানে কৃষ্ণের গর্ব্ব খর্ব্ব করা হইয়াছে। ঋগ্বেদ সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ৯৬ম সূক্তে যে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাহাতে তাঁহাকে দেবতা ভিন্ন অন্যরূপ মনে করা যায় না। তিনি 'সূর্য্যের ন্যায়' অবস্থিত এবং 'ইন্দ্র প্রজ্ঞাদ্বারা' তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন—এবম্বিধ ব্যাখ্যাও যাঁহারা

---

* বিষ্ণুর বধ্য ও ভূষণাদির বিবরণ অভিধানকার এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

মধুধেনুকচাণূরপূতনাযমলার্জ্জুনাঃ। কালনেমিহয়গ্রীবশকটারিষ্টকৈটভাঃ॥
কংসঃ কেশিমুরৌ সাল্বমৈন্দদ্বিবিদরাহবঃ। হিরণ্যকশিপুর্ব্বাণঃ কালিয়ো নরকো বলিঃ॥
শিশুপালশ্চ বধ্যা বৈনতেয়স্তু বাহনঃ। শঙ্খোঽস্য পাঞ্চজন্যোঽস্য শ্রীবৎসাঙ্কোঽসিস্তু নন্দকঃ॥
গদা কৌমোদকী চাপং শার্ঙ্গং চক্রং সুদর্শনঃ। মণিঃ স্যমন্তকো হস্তে ভুজমধ্যে তু কৌস্তুভঃ॥

† "পৃথিবীর ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড, ১৪-১৫ পৃষ্ঠা, প্রাচীন আর্য্য-নিবাস প্রসঙ্গে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

‡ ঋগ্বেদ-সংহিতা—প্রথম মণ্ডল, ১০১ম সূক্তের ১ম ঋক; ১১৬শ সূক্তের ২৩ম ঋক; ১১৭শ সূক্তের ৭ম ঋক; দ্বিতীয় মণ্ডলের ১৮৫ম সূক্ত ১৮শ ঋক; ৮ম মণ্ডল, ৯৬ম সূক্তের ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ ঋক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৃষ্ণের মহিমা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। * ফলতঃ, নিগূঢ় সন্ধান করিলে, বেদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ দেবরূপে মান্য হইয়াছেন বুঝিতে পারা যায়। কিবা বিষ্ণু-নামে, কিবা কৃষ্ণ-নামে, তাঁহার মহিমা সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত আছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার পর অথর্ব্ববেদ সংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম দেখিতে পাই। সেখানে তিনি কেশী দৈত্যের সংহারকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত। কেশী দৈত্যের সংহার সাধনের জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেশিনিসূদন নামে অভিহিত হন। হরিবংশে কেশী দৈত্যের বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের বধ-কামনায় কংস কর্ত্তৃক কেশী দৈত্য বৃন্দাবনে প্রেরিত হয়। তাহার অত্যাচারে বৃন্দাবন শ্মশানে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার সংহারসাধন করিয়া, বৃন্দাবন রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং অথর্ব্ব-সংহিতায় যে বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। উপনিষদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব পূর্ণ প্রতিভাত। ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গিরস ঋষির শিষ্য ছিলেন; আর ঋষি শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ঋষি এক দিন শ্রীকৃষ্ণকে বলেন,—'তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণ-সংশিত।' বলা বাহুল্য, তিনটী বিশেষণই ভগবদ্বিভূতিবাচক। † এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে,—দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল; বেদে বা উপনিষদে (দ্বাপরের পূর্ব্বকালের শাস্ত্র-গ্রন্থে) শ্রীকৃষ্ণের নাম থাকিবে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে হইলে, নাম-মাহাত্ম্য বুঝিবার আবশ্যক হয়। বুঝিতে হয়,—কৃষ্ণ নাম নিত্য সনাতন, আর তাই সে নাম বেদ-মধ্যে বিদ্যমান।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব।

যে মহাভারতে কৃষ্ণ-চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি, আর যে মহাভারতের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াই আধুনিক পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, সেই মহাভারতেই বা শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখিতে পাই, অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। মহাভারতে পাণ্ডবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে। কিন্তু সেখানে শ্রীকৃষ্ণ দেবতারূপে সম্পূজিত নহেন। পাণ্ডবগণ তখন জয়যুক্ত; সুতরাং আনন্দে আত্মহারা। তখন তাঁহারা তাঁহাকে চিনিবেন কি প্রকারে? বিপদ-পারাবারে নিমজ্জিত হইয়া তরঙ্গাভিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ না হইলে, মানুষ তাঁহাকে স্মরণ করে না,—মানুষ তাঁহাকে চিনিতে পারে না। সঙ্কটে পড়িলেই করুণানিধানের করুণা প্রার্থনা করে। কাতরে কাঁদিলে করুণাময়ের করুণা-সাগর উথলিয়া উঠে। দয়াল ঠাকুর তখন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। পাণ্ডবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দেবতারূপে মিলন—পাণ্ডবগণের সমক্ষে তাঁহার ভগবদ্বিভূতি প্রকাশ—তাঁহাদের বিপদের অবস্থাতেই দেখিতে পাই। রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন

---

* ঋগ্বেদ-সংহিতা, রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ এবং স্থানান্তরে ইহার বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

† ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—"তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স বভূব সোহন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ॥"

দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত, তাঁহাদের অন্তঃপুরলক্ষ্মী পাঞ্চালী যখন অক্ষপণে বিক্রীতা; সে দিনের ন্যায় দুর্দ্দিন পাণ্ডবগণের জীবনে বুঝি আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় নাই। দুরন্ত দুঃশাসন কেশাকর্ষণে বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে রাজসভা মধ্যে আনিয়াছে। আর রাজার অভিমত অনুসারে পতির সম্মুখে পত্নীকে বিবস্ত্রা করিবার জন্য তাঁহার বস্ত্র উন্মোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এমন সঙ্কটের অপেক্ষা মানুষের আর অধিক সঙ্কট কি হইতে পারে? এই সঙ্কটের দিনে দ্রৌপদী কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়াছিলেন,—"হে গোবিন্দ! হে দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ! হে গোপীজনবল্লভ! কৌরবগণ আমাকে অভিভূত করিতেছে, হে কেশব! আপনি কি তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছেন না? হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশন! আমি কৌরব সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, হে জনার্দ্দন! আমায় উদ্ধার করুন। হা কৃষ্ণ! হা মহাযোগিন্! হা বিশ্বাত্মন্! হা বিশ্বভাবন! আমি কুরুমধ্যে অবসন্ন হইয়াছি; হে গোবিন্দ! এই বিপন্ন জনকে পরিত্রাণ কর।" এইরূপে ভুবনেশ্বর কৃষ্ণের স্মরণ করিয়া, অবগুণ্ঠিতমুখী দ্রৌপদী যখন রোদন করিতে লাগিলেন, কমলাপতির কমলাসন আন্দোলিত হইল। প্রাণপ্রিয়া কমলাকে পরিত্যাগ করিয়া, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণের জন্য বিপদবারণ মধুসূদন দ্রৌপদীর সহায় হইলেন। তখন দুরাত্মা দুঃশাসন বসন যতই আকর্ষণ করিতে লাগিল, ততই নানারাগ-রঞ্জিত শত শত বসন প্রাদুর্ভূত হইল। * আর তদ্দর্শনে সভাস্থলে ঘোরতর আরাব-সম্বলিত হলাহলা উত্থিত হইল।' যাঁহারা বলেন, মহাভারতের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দেবতারূপে সম্পূজিত হন নাই; তাঁহারা বিচার করিয়া দেখুন,—মহাভারতের এই বর্ণনায় কি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে? এরূপ এক স্থলে নহে; মহাভারতের বিভিন্ন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দেবত্বের—অমানুষিক প্রাধান্যের প্রভাব পরিকীর্ত্তিত রহিয়াছে। সভাপর্ব্বে দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ উপলক্ষে শ্রীহরির যে করুণা প্রকাশমান, বনপর্ব্বে অগ্নিকল্প ঋষি দুর্ব্বাসার ক্ষুন্নিবারণ ব্যাপারেও সেই করুণা দেদীপ্যমান। দুর্য্যোধনের কল্যাণ-কামনায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া, উগ্রতপা ঋষি দুর্ব্বাসা দশ সহস্র শিষ্য সহ বনবাসী পাণ্ডবগণের আশ্রমে অতিথি হইলেন। বনবাসী হইয়াও আদিত্য-প্রদত্ত অক্ষয় অন্নস্থালীতে পাণ্ডবগণের সকল অভাব দূরীভূত হইত। সেই অন্নস্থালীর একটু বিশেষত্ব ছিল। দ্রৌপদী যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্নাহার না করিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থালী, যত কেন হউক না,—সকল অতিথিরই অভাব পূরণ করিতে সমর্থ ছিল। কিন্তু দ্রৌপদীর আহারের পর সেই অক্ষয় অন্নস্থালী পিপীলিকারও আহার্য্য সঙ্কুলান করিতে সমর্থ হইত না। পাণ্ডবগণকে বিপন্ন করিবার

* মহর্ষি বেদব্যাসের বর্ণনায় এ দৃশ্য এইরূপভাবে বর্ণিত আছে,—

আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ। গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়। কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব। হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন। কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন। প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্॥ ইত্যনুস্মৃত্য কৃষ্ণং সা হরিং ত্রিভুবনেশ্বরম্। প্রারুদদ্দুঃখিতা রাজন্মুখমাচ্ছাদ্য ভামিনী॥ যাজ্ঞসেন্যা বচঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণো গহ্বরিতোঽভবৎ। ত্যক্ত্বা শয্যাসনং পদ্ভ্যাং কৃপালু কৃপয়াভ্যগাৎ॥ কৃষ্ণঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ হরিং নরঞ্চ ত্রাণায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী। ততস্তু ধর্ম্মোঽন্তরিতো মহাত্মা সমাবৃণোদ্বৈঃ বিবিধৈঃ সুবস্ত্রৈঃ॥

অভিপ্রায়ে দুর্য্যোধন কৌশলে মূর্ত্তিমান ক্রোধস্বরূপ মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে দ্রৌপদীর আহারান্তে সেই বনে গিয়া, তাঁহাদের নিকট অতিথি হইবার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং, যখন সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষি, দ্রৌপদীর আহারের পর পাণ্ডবগণের আশ্রমে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, তখন পাণ্ডবগণ কি দারুণ সঙ্কটেই নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, সশিষ্য মহর্ষি যখন স্নানার্থ গমন করিলেন, দ্রৌপদীর তখন আর চিন্তার অবধি রহিল না। বিস্তর চিন্তা করিয়াও তিনি অন্নসংস্থানের কোনও উপায়ই অনুসন্ধান করিয়া পাইলেন না। তখন নিরুপায়ের উপায় ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে দেবকীনন্দন! হে অব্যয়! হে বাসুদেব! হে জগন্নাথ! হে প্রণতজন-ক্লেশবিনাশন! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বজনক! হে বিশ্বসংহারকারিন্! হে প্রভো! হে অবিনাশিন্! হে প্রপন্নপাল! হে গোপাল! হে প্রজাপাল! হে পরাৎপর! হে আকূতি-চিত্তি চিত্তবৃত্তিদ্বয়ের প্রবর্ত্তক! তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে বরেণ্য! হে বরদ! হে অনন্ত! তুমি গতিবিহীন জনগণের গতিস্বরূপ। হে পুরাণ পুরুষ! হে প্রাণমনবুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির অগোচর! হে সর্ব্বাধ্যক্ষ! হে পরাধ্যক্ষ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে দেব! হে শরণাগতবৎসল! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা কর। হে নীলোৎপলদলশ্যাম! হে পদ্মগর্ভারুণেক্ষণ! তুমি ভূতবর্গের আদি অন্ত এবং পরম গতি। তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর, জ্যোতিঃ ও বিশ্বের আত্মা। তোমার মুখ সর্ব্বদিকে প্রসারিত। তোমাকেই পণ্ডিতেরা পরমবীজস্বরূপ এবং সর্ব্বসম্পত্তির নিধান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। হে দেবেশ। তুমি সহায় থাকিতে সর্ব্বপ্রকার আপদ হইতেও ভয় নাই। পূর্ব্বে সভামধ্যে দুঃশাসনের হস্ত হইতে তুমি আমাকে যেমন মুক্ত করিয়াছিলে, তদ্রূপ এস্থলে এই সঙ্কট হইতে আমাকে উদ্ধার কর।" * ইহার পর, পার্শ্বশায়িনী রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ কিরূপভাবে সেই অরণ্যে আসিয়াছিলেন, আর কেমন করিয়া সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষির ক্ষুৎপিপাসা দূর করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় সর্ব্বজনবিদিত। ফলতঃ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভগবদ্রূপে আরাধিত হইয়াছেন, দ্বৈতবনে দুর্ব্বাসার আক্রমণ-কালে তাঁহাকে তেমনই ভাবে ঈশ্বররূপে আরাধিত হইতে দেখা গেল। দ্রৌপদী তাঁহাকে যে সম্বোধনে সম্বোধন করিলেন, তাহাতে মহাভারতের সময়েই শ্রীকৃষ্ণ যে পরমপুরুষ বলিয়া সম্পূজিত হইতেন, তাহাতে আর কোনই সংশয় নাই। কেবল দ্রৌপদীর নিকট নহে; কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গণে বিশ্বরূপ-প্রদর্শনে তিনি

---

* সশিষ্য দুর্ব্বাসা স্নানার্থ গমন করিলে সেই সময়ের অবস্থার বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—

"মনসা চিন্তয়ামাস কৃষ্ণং কংসনিসূদনম্। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো দেবকীনন্দনাব্যয়॥ বাসুদেব জগন্নাথ প্রণতার্ত্তিবিনাশন। বিশ্বাত্মন্ বিশ্বজনক বিশ্বহর্ত্তঃ প্রভোঽব্যয়॥ প্রপন্নপাল গোপাল প্রজাপাল পরাৎপর। আকূতীনাঞ্চ চিত্তীনাং প্রবর্ত্তক নতাস্মি তে॥ বরেণ্য বরদানন্ত অগতীনাং গতির্ভব। পুরাণপুরুষ প্রাণ-মনোবৃত্ত্যাদ্যগোচর॥ সর্ব্বাধ্যক্ষ পরাধ্যক্ষ ত্বামহং শরণং গতা। পাহি মাং কৃপয়া দেব শরণাগতবৎসল॥ নীলোৎপলদলশ্যাম পদ্মগর্ভারুণেক্ষণ। পীতাম্বরপরীধান লসৎকৌস্তুভভূষণ॥ ত্বমাদিরন্তো ভূতানাং ত্বমেব চ পরায়ণম্। পরাৎপরতরং জ্যোতির্বিশ্বাত্মা সর্ব্বতোমুখঃ॥ ত্বামেবাহুঃ পরং বীজং নিধানং সর্ব্বসম্পদাম্। ত্বয়া নাথেন দেবেশ সর্ব্বাপদ্ভ্যো ভয়ং ন হি॥ দুঃশাসনাদহং পূর্ব্বং সভায়াং মোচিতা যথা। তথৈব সঙ্কটাদস্মান্মামুদ্ধর্ত্তুমিহার্হসি॥"

যখন অর্জ্জুনকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে অর্জ্জুন কি বলিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি? অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন,—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥
রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তিলোকাস্তবাপি বক্ত্রানি সমৃদ্ধবেগাঃ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥"

ইহার পরেই অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষপুরাণ স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥"

এতদ্বিষয়ে মহাভারতের আরও দুই একটি প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রজ্ঞাবৃদ্ধ ভীষ্ম, শ্রীকৃষ্ণকে যে ভূমণ্ডল মধ্যে প্রধান ও অর্চ্চনীয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও যে তাহাই বুঝিয়াছিলেন, মহাভারতের মধ্যে তাহারও নানা প্রমাণ আছে। মহাভারতে অর্ঘ্যাহরণ-প্রকরণে শ্রেষ্ঠজনকে যখন অর্ঘ্য-প্রদানের জন্য যুধিষ্ঠির প্রস্তুত হন এবং বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পিতামহ ভীষ্মকে যখন অর্ঘ্য প্রদান করিতে যান; ভীষ্ম তখন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি? ভীষ্ম বলিয়াছিলেন,—ভূমণ্ডলের মধ্যে কৃষ্ণকে তিনি প্রধান ও অর্চ্চনীয় বলিয়া মনে করেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন,—"যেমন সমুদায় জ্যোতিঃপুঞ্জ মধ্যে ভাস্কর সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বান, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রাজগণের মধ্যে তেজঃ, বল ও পরাক্রম দ্বারা সমধিক উদ্ভাসমান প্রতীয়মান হইতেছেন।" এইরূপ শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মাধ্যায়ে যুধিষ্ঠির যখন পিতামহ ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে পিতামহ! পূর্ব্বকালে মহর্ষি সনৎকুমার বৃত্রাসুরের নিকট যে নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই কৃষ্ণই কি সেই নারায়ণ?" * ভীষ্ম তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—"সেই সর্ব্বাশ্রয় চৈতন্যস্বরূপ পরমব্রহ্ম স্বীয় অসীম তেজঃপ্রভাবে নানা রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা কেশব তাঁহারই অংশসম্ভূত এবং ইঁহারই অংশে এই ত্রিলোক সমুৎপন্ন।" আর অধিক দেখাইবার আবশ্যক নাই। মহাভারতের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এবং ভীষ্মাদির নিকট পুরুষপ্রধান বলিয়া পূজিত হইতেন, যেমন করিয়াই দেখি না কেন,—তাহা সপ্রমাণ হয়। তবে কেহ কেহ যে তাঁহাকে শত্রুভাবে দেখিয়াছিলেন, কেহ কেহ যে তাঁহাকে ক্ষুদ্র মানুষ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, সে তাঁহাদের ভ্রম মাত্র। মানুষকেই যখন মানুষ চিনিতে পারে না;—মানুষের অতীত সামগ্রীকে চিনিবে কি করিয়া? তুমি জ্ঞানী কি না, তুমি পণ্ডিত কি না, তাহা

---

* যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন ও ভীষ্মের উত্তর মহাভারতে (সভাপর্ব্বে) এইরূপ লিখিত আছে.—

"যুধিষ্ঠির উবাচ। কস্মৈ ভবান মন্যতেঽর্ঘ্যমেকস্মৈ কুরুনন্দন। উপনীয়মানং যুক্তঞ্চ তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ বৈশম্পায়ন উবাচ। ততো ভীষ্মঃ শান্তনবো বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য বীর্য্যবান। বার্ষ্ণেয়ং মন্যতে কৃষ্ণমর্হণীয়তমং ভুবি॥ এষ হ্যেষাং সমস্তানাং তেজবলপরাক্রমৈঃ। মধ্যে তপন্নিবাভাতি জ্যোতিষামিব ভাস্করঃ॥ অসূর্য্যমিব সূর্য্যেণ নির্ব্বাতমিব বায়ুনা। ভাসিতং হ্লাদিতঞ্চৈব কৃষ্ণেনেদং সদো হি নঃ॥"

বুঝিতে হইলে, তোমার জ্ঞানের ও তোমার পাণ্ডিত্যের সহিত মিশিয়া তাহার পরিচয় লওয়া আবশ্যক। দূরে থাকিয়া, ভিতরে প্রবেশ না করিয়া, কে বল, জ্ঞান-বারিধির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়? ভগবানের সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। তাঁহার সহিত যিনি যে ভাবে মিশিবেন, তিনি তাঁহাকে সেই ভাবেই বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি, সে যেন বহুরূপীর বর্ণ-বিবর্ত্তন-দর্শন। যে স্বরূপ বুঝিবে, তাহার আর কোনই ভ্রান্তি ঘটিবে না।

যেমন মহাভারতে দেখিতে পাই, তেমনি পুরাণ-পরম্পরার মধ্যেও নানা স্থানে শ্রীকৃষ্ণের ভগবানত্ব প্রতিপাদিত। শ্রীমদ্ভাগবত—বৈষ্ণবগণের হৃদয়ের ধন। শ্রীমদ্ভাগবতে বিভিন্ন-স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। তাঁহার জন্ম-কালেই তাঁহাতে ভগবদ্বিভূতি প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বসুদেব দেখিলেন,—"তাঁহার নয়ন কমলতুল্য প্রশস্ত, তিনি চতুর্ভুজ, তাহাতে শঙ্খ ও গদাদি অস্ত্র সকল উদ্যত; বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে শোভা পাইতেছে; গলদেশে কৌস্তভ মণি; পরিধান পীতবসন; বর্ণ নিবিড় মেঘের ছায় মনোহর। অপরিসীম কেশ-কলাপ,—মহামূল্য বৈদূর্য্য, কিরীট ও কুণ্ডলের প্রভায় দেদীপ্যমান। অত্যুত্তম মেখলা, অঙ্গদ ও কঙ্কণাদি অলঙ্কার দ্বারা শরীরের শোভা সম্পাদিত হইতেছে।" ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহাকে সেইরূপেই দর্শন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা দেখিয়াছিলেন,—'সেই বৃন্দাবন মধ্যে অদ্বয় পর অনন্ত অগাধবোধ এক ব্রহ্ম, গোপবালকের নাট্য অবলম্বন পূর্ব্বক, হস্তে খাদ্যসামগ্রীর গ্রাস লইয়া বৎস এবং সখাগণকে অন্বেষণ করিতেছেন।' তার পর, ব্রহ্মা কি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন, তাহাও দেখুন। শ্রীকৃষ্ণের স্তবে ব্রহ্মা বলিতেছেন,—"হে স্তবনীয়! তোমার নবীন নীরদ-সদৃশ শ্যাম-কলেবরে পীতবসন-বিদ্যুৎ শোভা পাইতেছে। গুঞ্জনির্ম্মিত কর্ণভূষণ এবং ময়ূরপুচ্ছে তোমার কান্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। গলদেশে বনমালা। খাদ্যসামগ্রীর গ্রাস, বেত্র, শৃঙ্গ, বংশী—এই সকল চিহ্ন দ্বারা তোমার অপূর্ব্ব শোভা হইতেছে! ....প্রভো! বিধাতো! ঈশ্বর! তুমি অজ; তথাপি দেবতা, ঋষি, নর, তির্য্যগ্-জাতি এবং জলচর ইহাদিগের মধ্যে যে তোমার জন্ম হয়, সে কেবল অসাধুদিগের দুর্ম্মদ দমন এবং সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত। ......অহো! নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের কি সৌভাগ্য!—পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণ সনাতন ব্রহ্ম তাঁহাদিগের আত্মীয়।" ব্রজের গোপ-গোপীগণ কেহ ভক্তি-ডোরে, কেহ বাৎসল্য-বন্ধনে, কেহ সখ্যসূত্রে, কেহ প্রেম-পাশে শ্রীভগবানকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই ভাব-প্রবাহে যিনি ভাসমান হইতে পারিবেন, তিনিই বুঝিতে সমর্থ হইবেন,—শ্রীকৃষ্ণ কেমন ভাবে কত দিন হইতে, প্রাণে প্রাণে আলোক-রশ্মি বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। হরিবংশে, ব্রহ্মপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, বিষ্ণুপুরাণে, পদ্মপুরাণে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে, গরুড়পুরাণে, স্কন্দপুরাণে, কূর্ম্মপুরাণে, আদিপুরাণে যেখানে যেখানে কৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেখানে সেখানে তাঁহাকে পরমপুরুষ পরাৎপর বলিয়া ব্যাখ্যাত আছে। তথাপি কেন যে সংশয়-প্রশ্ন উঠে—কৃষ্ণ কত কালের দেবতা, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! মহাকবি কালিদাসের

পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

রচনার মধ্যেই কি কৃষ্ণ-কথা নাই? তিনিও কি জানিতেন না,—কৃষ্ণই গোপবেশধারী বিষ্ণু? মেঘদূতে (পূর্ব্বমেঘে) বিরহী যক্ষ জলধরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"রত্নচ্ছায়া-ব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাদ্বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ।"

অর্থাৎ,—'হে পয়োধর। ঐ দেখ পদ্মরাগাদি মণি-প্রভা মিশ্রণের ন্যায় প্রিয়দর্শন ইন্দ্র-ধনু পুরোভাগের বল্মীকাগ্রদেশ হইতে আবির্ভূত হইতেছে। উহা দ্বারা ত্বদীয় শ্যামল দেহ আর পর নাই সমলঙ্কৃত হইবে এবং বোধ হইবে,—যেন তুমি উজ্জ্বল-কান্তি ময়ূর-বর্হ-বিভূষিত গোপবেশধারী বিষ্ণুর দিব্য শোভা অপহরণ করিয়া লইয়াছ।' তবেই বুঝা গেল, মহাকবি কালিদাসের সময়েও শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তবে তাঁহার গ্রন্থে কৃষ্ণ-কথার অধিক উল্লেখ না থাকার একটি কারণ এই বলিয়া মনে হইতে পারে যে, রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য শিবোপাসক ছিলেন; সুতরাং কবির কাব্যে কৃষ্ণ-কথা সাধারণতঃ অনুল্লেখ ছিল। তার পর, যত আধুনিকই হউন, মহাকবি মাঘ-বিরচিত শিশুপালবধ মহাকাব্য নিশ্চয়ই মুসলমানগণের ভারতে আগমনের পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। শিশুপালবধ কাব্যের প্রথম ছত্রেই জগন্নিবাস শ্রীপতি জগৎ শাসন জন্য বসুদেব-গৃহে আবির্ভূত হন, এই কথাই লিখিত আছে,—"শ্রীয়ঃ পতিঃ শ্রীমতি শাসিতুং জগজ্জগন্নিবাসো বসুদেবসদ্মনি।' এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে চতুর্ব্বিধ মতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, সেই মত-সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকপ্রদ মত—শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের কল্পনা মূলে যীশু-খৃষ্টের প্রভাব। এ পর্য্যন্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু পণ্ডিতের মস্তিষ্ক এই গবেষণায় আন্দোলিত হইয়া আসিতেছে। প্রধানতঃ যে সকল কারণে তাঁহারা ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

কৃষ্ণ ও খৃষ্ট।

তাঁহাদের প্রথম যুক্তি,—নাম সাদৃশ্য; অর্থাৎ—খৃষ্ট-নামের কৃষ্ণ-নাম সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয় যুক্তি,—খৃষ্টের ও কৃষ্ণের জীবনের ঘটনা-সাদৃশ্য, (১) যীশু এবং কৃষ্ণ দুই জনই রাজ-বংশোদ্ভব। কংস-ভয়ে বসুদেব কৃষ্ণকে গোকুলে রাখিয়া আসেন, হেরডের ভয়ে জোসেফ ও মেরি যীশুকে লইয়া মিশরে পলায়ন করেন। কৃষ্ণ বাল্যকালে গোপগৃহে প্রতিপালিত হন, যীশু মেষপালকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। মেরি ও এলিজাবেথের ন্যায় যশোদার ও দেবকীর উল্লেখ আছে। কৃষ্ণের প্রাণনাশ করিবার জন্য কংসের আদেশে অনেক শিশু নিধন হইয়াছিল, যীশুর যাহাতে প্রাণ যায়, সেজন্য হেরডের আদেশে এত শিশু-হত্যা হয় যে, সে বিভীষণ হত্যাকাহিনী (Slaughter of the innocents বাক্য) এখনও মানুষ ভুলিতে পারে নাই। (২) পূর্ব্বদেশ হইতে আগত পণ্ডিতগণের নিকট হেরড জানিলেন,—যীশু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভয় হইল, বুঝি বা যীশু সিংহাসন কাড়িয়া লন। দৈব-বাণী কংসকে জানাইল, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও বিনষ্ট করিবার জন্য দেবকীর গর্ভে এক সন্তান জন্মিবে। (৩) যীশু বাল্যকালে শাস্ত্রীয় তর্কে ইহুদী পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করেন; কৃষ্ণ দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় মাতুল কংসের কেশাকর্ষণ করিয়া প্রাণবধ করেন। আবার

ও প্রবীণ ব্যক্তির, শিশুর নিকট তর্কে পরাস্ত হওয়ার রূপক-বর্ণনায়, গুরুজনকে কেশাকর্ষণ করিয়া হত্যা করায় পরিণত হইয়াছে। (৪) যীশুর দ্বাদশ শিষ্য ছিল, কৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ অনুচর। যীশুর প্রিয়শিষ্য জন, সর্ব্বদা নিকটে নিকটে থাকিতেন; অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির এবং সাইমন পিটার দুইজনেই ধার্ম্মিক; কিন্তু দুই জনেই মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। সাইমন পিটার স্বইচ্ছায় মিথ্যা বলিয়াছিলেন; যুধিষ্ঠির কিন্তু কৃষ্ণের চক্রান্তে পড়িয়া মিথ্যা বলেন। তথাপি তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হয়। ঈশ্বর কাহাকেও পাপ কার্য্যে নিয়োজিত করেন না। হিন্দুধর্ম্মে যে এরূপ নিকৃষ্ট বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহার কারণ—মূল ধর্ম্মপুস্তক হইতে রূপান্তরিত করায় এইরূপ বিকৃত হইয়াছে। (৫) গোকুল-যাত্রাকালে ঈশ্বর মহিমায় যমুনার জল এত অল্প হইয়া গেল যে, বসুদেব অনায়াসে হাঁটিয়া পার হইয়া গেলেন। বাইবেলে উল্লেখ আছে, লোহিত সাগর ও জর্ডনের জল ঐরূপ শুকাইয়া যায়। (৬) রোমান-ক্যাথলিকদিগের পূজা-পদ্ধতির সহিত হিন্দুদিগের পূজার অনেক সাদৃশ্য আছে। ধূপ ঘণ্টা প্রভৃতি উভয় সম্প্রদায়েই ব্যবহার করেন। দুই সম্প্রদায়েরই পুরোহিতেরা মস্তকের কিয়দংশ কামান এবং পাড়বিহীন বস্ত্র পরিধান করেন। (৭) জীবনের শেষ দশায় খৃষ্ট অনেক কষ্ট অপমান সহ্য করিয়া ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন। কৃষ্ণও ব্যাধের বাণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজবংশের ধ্বংস দেখিয়া যান। (৮) খৃষ্টানেরা বলেন,—আদম ও ইভ হইতেই মানবজাতির উৎপত্তি। হিন্দু-শাস্ত্রে লেখে,—মহাদেব ও পার্ব্বতী হইতে প্রজার সৃষ্টি। সয়তান সর্পরূপে আদম ও ইভকে প্রতারিত করিয়াছিল। সর্প মহাদেবের ভূষণ। পাপীর হৃদয়ে পাপের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান। আদম এবং ইভ হইতে মানবজাতির পতন বা সর্ব্বনাশ হয়। হিন্দুরা মহাদেবকে সংহারকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। (৯) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—হিন্দুদের এই ত্রিমূর্ত্তি, বাইবেলে ঈশ্বর, যীশু এবং পবিত্র আত্মার (Holy Ghostএর) উল্লেখ আছে। ভাষার পার্থক্যবশতঃ খৃষ্ট শব্দই কৃষ্ণ হইয়াছে।' এইরূপ সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া, একজন গবেষণিক পণ্ডিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—"বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারিত ছিল। পরে যখন ধর্ম্মযাজকদিগের অত্যাচারে প্রকৃত খৃষ্ট-ধর্ম্ম বিকৃত হইল, বাইবেল পাঠ করিবার অধিকার যাজক ভিন্ন অপর কাহারও রহিল না, সে সময়ে ভারতবর্ষেও খৃষ্ট-ধর্ম্মের অবনতি হইল। ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্মের যাজক ছিলেন, সুতরাং বাইবেল তাঁহাদেরই আয়ত্তে ছিল। ধর্ম্মযাজক ভিন্ন তখনকার অন্যান্য লোক লেখা-পড়া জানিত না। এই সুযোগে ব্রাহ্মণেরা পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক-বর্ণিত বিষয়গুলি, নিজ নিজ কল্পনানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন এক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া লন।" যদি কেবল কোনও একদেশদর্শী খৃষ্টান পাদ্‌রী এবম্বিধ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতেন, তাহা হইলে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু অনেক সময় অনেক প্রত্নতাত্ত্বিকের মস্তিষ্কও এই বিষয় লইয়া বিঘূর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এমন কি, বঙ্গের—কেবল বঙ্গেরই বা বলি কেন—ভারতের কৃতী সন্তান বলিয়া যাহারা পরিচিত, তাঁহাদেরও কেহ কেহ যে এবম্বিধ চিন্তা-চাঞ্চল্যে বিচলিত হইয়া

ছেন, তাহাও দেখিতে পাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচরিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে অধুনা এবম্বিধ সংশয়-সন্দেহের নিরসন আবশ্যক বলিয়া মনে করি। প্রথমে কাহার মস্তিষ্ক হইতে এই অদ্ভুত কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সুসাধ্য নহে। তবে অধুনা এতদ্বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে যাঁহারা যশোলিপ্সু হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডক্টর লেক্‌স, ডক্টর লরিস্‌নার, প্রফেসার ভাণ্ডারকার, প্রফেসার ওয়েবার, ডক্টর গ্রিয়ার্সন্‌, মিষ্টার কেনেডি, মিষ্টার হপ্‌কিন্স এবং ডক্টর শীল প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।* উপরে যে কয়টি হেতুবাদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ডক্টর লেক্সের মস্তিষ্ক-প্রসূত। ইহার পর জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লেবার হুপ্‌কিন্স প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, দেখিতে পাই, অনেকেই তাহার অনুসরণকারী। ওয়েবার বলেন,—'এই বাসুদেবের উপাসনা খৃষ্ট-ধর্ম্মানুসারিণী! মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত নারায়ণীয়-পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে,—মহর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে গমন পূর্ব্বক আদিদেবকে দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং সেখান হইতেই ধর্ম্মের সার তত্ত্ব অবগত হইয়া আসিয়াছিলেন। ভাগবতে এবং নারদপঞ্চরাত্রে যে ভক্তিভাবের কথা লিখিত আছে অথবা যে ভগবত্তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, মহর্ষি তাহা শ্বেতদ্বীপ—আদিস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।' ঐ যে আদিস্থান শ্বেতদ্বীপ, ওয়েবার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাহাকে খৃষ্টানের আদিস্থান এসিয়া মাইনর—সিরীয়া বা মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মেরু গিরিশৃঙ্গ হইতে বায়ু-কোণে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষীরোদসাগরের উত্তরভাগে সেই শ্বেতদ্বীপ অবস্থিত। সেই দ্বীপ—সুমেরু শৈলের মূল দেশ হইতে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন উচ্চ। মহাভারতের এই বর্ণনা উপলক্ষ করিয়া তাঁহারা বলেন—সেই শ্বেতদ্বীপে অর্থাৎ (আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতিতে) ভারতীয় বণিকগণ গমনাগমন করিতেন এবং সেখান হইতে বাণিজ্যিগণ এদেশে আসিতেন; আর সেই সূত্রে ঐ দেশ-প্রচলিত খৃষ্ট ধর্ম্ম এদেশে আসিয়া রূপান্তরে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপর খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তারের ইহাই কারণ। বলা বাহুল্য, ডক্টর শীল এই মতের উপরই রং ফলাইয়া আর একটু বেশী দূর গড়াইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ও খৃষ্ট-ধর্ম্মের তুলনায় সমালোচনা ব্যপদেশে তিনি এখন বলিতেছেন,—খৃষ্ট যে নারায়ণের অবতার রূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন, এবং ভারতীয় বৈষ্ণবগণ মিশরের বা এসিয়া-মাইনরের উপকূল হইতে যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ এদেশে আনিয়াছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শ্বেতদ্বীপ, তাঁহার মতে, মিশরের বা এসিয়া মাইনরের উপকূল। কারণ, উহা রম্যক বর্ষের নিকট।' তিনি আরও বলিতেছেন—ভাবপ্রকাশে প্রকাশ, শ্বেতদ্বীপের নিকট গন্ধক উৎপন্ন হয়; সুতরাং গন্ধকের উৎপত্তি-স্থান ঐ প্রদেশ,

---

* এই বিষয়ে ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি (Indian Antiquary) পত্রে কয়েক বৎসর ধরিয়া আলোচনা চলিয়াছিল। প্রফেসর ওয়েবার ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, ডক্টর লরিস্‌নার ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে, ডক্টর গ্রিয়ার্সন ও মিষ্টার কেনেডি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে (Journal of the Royal Asiatic Society, 1907.). রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে (Vaishnavism &c.) এই বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন

উহা শ্বেতদ্বীপ না হইয়া যায় না। ফলতঃ, খৃষ্ট-ধর্ম্মের কেন্দ্র স্থান হইতে বৈষ্ণবগণের দ্বারাই এদেশে যে রূপান্তরে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। পুণ্ডরীকাক্ষ, বিশ্বভাবন, হৃষীকেশ, মহাপুরুষ পূর্ব্বজ প্রভৃতি নারায়ণের যে বিশেষণ, এতদ্দ্বারাও খৃষ্টের ভাবত্রয়ের উপাসনাই বুঝা যায়। * ভাণ্ডারকার বলেন,—'আভীরগণ বিদেশ হইতে অর্থাৎ এসিয়া মাইনর প্রভৃতি খৃষ্টান-ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান-সমূহ হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিল। তাহারা অস্থায়ীভাবে নানাস্থানে গতিবিধি করিত। শেষে তাহারা ভারতেরই এক প্রান্তভাগে উপনিবিষ্ট হয়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে উহারা বড়ই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বালগোপাল উপাসনা অর্থাৎ শিশু-দেবতার পূজা তাহাদের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে গোপকুলে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এই আভীরগণের মধ্য হইতেই তাহা প্রচার হইয়া পড়ে। আবিরায় (Abiria) নামক এক জনপদ 'পেরিপ্লাস ইরিথ্রিয়েরি' গ্রন্থে চিহ্নিত আছে। সেই আভীর স্থান শকদিগের অধিকৃত ছিল। সুতরাং সিরীয় বা শকগণের দ্বারা খৃষ্ট-ধর্ম্ম এদেশে আসিয়াছিল, এবং তদ্দ্বারাই খৃষ্ট, কৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছিলেন।' এইরূপ এক এক কল্পনায় এক এক জন আপনাপন কৃতিত্ব-প্রচারে প্রয়াস পাইয়াছেন।

যাঁহারা মনে করেন—যীশুখৃষ্টের চরিত্রানুসরণে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কল্পিত হইয়াছে, তাঁহারা কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াছেন? তাঁহাদের প্রথম প্রমাণ—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে; দ্বিতীয় প্রমাণ—শ্রীকৃষ্ণের পূজা পদ্ধতি প্রবর্ত্তন-বিষয়ে। তিনি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কতকাল হইতে তাঁহার পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, এ জ্ঞান যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনি কখনই যীশু-খৃষ্টের আদর্শে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র কল্পিত হইয়াছিল বলিতে সাহসী হইবেন না। যীশু-খৃষ্টের জন্মের অন্যূন তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীকৃষ্ণ দেহ-ধারণ করেন। এ বিষয় আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রমাণ

শ্রীকৃষ্ণ চরিত খৃষ্ট চরিতের অনুকরণ নহে।

---

* ডক্টর শীলের লেখায় এসম্বন্ধে কৌতুকাবহ। তাঁহার কথা একটু উদ্ধৃত না করিলে রসাস্বাদন হইবে না। শ্বেতদ্বীপ-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—"Now this নারায়ণীয় record, in my opinion, offers decisive evidence of an actual journey or voyage undertaken by some Indian Vaishnavas to the coast of Egypt or Asia Minor, and makes an attempt in the Indian eclectic fashion to include Christ among the Avatars or incarnations of the supreme spirit Narayana, as Buddha came to be included in later stage......... Christ is Narayana's শ্বেতদ্বীপ in Svetadvipa." পুণ্ডরীকাক্ষ প্রভৃতি বিশেষণ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য,—"Christ is here invoked—(1) as পুণ্ডরীকাক্ষ incarnation of the Logos—God in the flesh; (2) as বিশ্বভাবন—the Logos as Creator; (3) as হৃষীকেশ, মহাপুরুষ, পূর্ব্বজ, —i. e, the Logos the first—begotton or only-begotton Son." 'সুধাপ্রথম' শব্দ দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"The Eucharist is here described. The inhabitants drink up the Logos সুধাপ্রথম বিষ্বক্সেন। All these epithets are applicable to the Logos. especially as concieved by the Syrian Christians and Gnostics."—*Comparative Studies in Vaishnavism and Christianity.*

করিয়াছি। * পুরাণপরম্পরা, যতই আধুনিক বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হউক না কেন, খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যে বিদ্যমান ছিল, তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও এখন স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। † বৈয়াকরণ পাণিনি খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার থাকেন। ‡ বাসুদেব ও পাণ্ডবগণের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে এবং তৎকালে দেব-প্রতিমার পূজা-পদ্ধতি যে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে পাণিনির কয়েকটি সূত্র অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। সেই সূত্র কয়টি এই,—

(১) "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্। ৪৩।৯৮। (২) গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ। ৮।৩।৯৫। (৩) স্ত্রিয়ামবন্তিকুন্তিকুরুভ্যশ্চ। ৪।১।১৭৬। (৪) নভ্রাণ্-নপান্নবেদানাসত্যানমুচিনকুলনখনপুংসকনক্ষত্রনক্রনাকেষু। ৬।৩।৭৫। (৫) দ্রোণপর্ব্বতজীবন্তাদন্যতরস্যাম্। ৪।১।১০৩। (৬) মহান্‌ব্রীহ্যপরাহ্ণগৃষ্টিশ্বাস-জাবালভারভারতহৈলিহিলরৌরবপ্রবৃদ্ধেষু। ৬।২।৩৮। (৭) ইবে প্রতিকৃতৌ। ৫।৩।৯৬। (৮) জীবিকার্থেচাপণ্যে। ৫।৩।৯৯। (৯) ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ। ৪।১।১৪৪।"

উপরি-উদ্ধৃত পাণিনি-সূত্র-সমূহের প্রথমটির ব্যাখ্যায় হইতে বুঝিতে পারা যায়, বাসুদেব ও অর্জ্জুন সে সময়ে দেবতারূপে সম্পূজিত হইতেন। কেন-না ঐ সূত্রে বাসুদেব ও অর্জ্জুন শব্দের উত্তরে, বুন প্রত্যয় হইয়াছে। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের (৪।৩।৯৫) সহিত উহার সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অর্থ করিতে হইলে, ঐ 'বুন্' প্রত্যয়ে ভক্তি প্রকাশ বুঝায়; অর্থাৎ—বাসুদেব শব্দের উত্তর 'বুন্' প্রত্যয়ে যে 'বাসুদেবক' শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহার অর্থ বাসুদেবের সেবক বা ভক্ত; এইরূপ 'অর্জ্জুনক' শব্দে অর্জ্জুনের সেবক বা ভক্ত বুঝায়। সুতরাং ঐ সূত্রেই বুঝা যায়, পাণিনির সময়ে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্র-পঞ্চকে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, কুন্তী, নকুল ও মহাভারতের নাম পাওয়া যাইতেছে। সপ্তম ও অষ্টম সূত্রে তৎকাল-প্রচলিত প্রতিমা-পূজাদির উল্লেখ দেখিতে পাই। নবম সূত্রে বসুদেব, অনিরুদ্ধ, নকুল, সহদেব প্রভৃতির পরিচয় দিতেছে। পাণিনির পূর্ব্বে বৈয়াকরণ শাকটায়ন বিদ্যমান ছিলেন। "লঙঃ শাকটায়নস্য" (৩।৪।১১) ইত্যাদি পাণিনি-সূত্রে তাহা প্রতিপন্ন হয়। পাণিনির পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলি "যুধিগবেষ্ঠিরঃ, বাসুদেবার্জ্জুনাদ্‌বুঞ্, কুন্ত্যবন্তেস্ত্রিয়াম্" ইত্যাদি রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী শাকটায়নের সময়েও যুধিষ্ঠিরাদির বিদ্যমানতা ঐ মতে প্রতিপন্ন হয়। পতঞ্জলি কর্ত্তৃক পাণিনি-সূত্রের মহাভাষ্য বিরচিত হইয়াছিল। সেই মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিকেও আধুনিক পণ্ডিতগণ খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গোল্ডষ্টুকার প্রমাণ করিয়াছেন,—বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ও মহাভাষ্য-প্রণেতা পতঞ্জলি এক সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। ভাণ্ডারকার, মহাভাষ্য-প্রণেতা

* "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, মহাভারত প্রসঙ্গে এবং নির্ঘণ্টানুসরণে অন্যান্য অংশ দ্রষ্টব্য।

† *Vide* Vincent Smith's *Early History of India.* এই খণ্ডের অন্তর্গত 'ভারতের ইতিহাসের উপাদান' শীর্ষক প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

‡ "পৃথিবীর ইতিহাস", চতুর্থ খণ্ডে, ৪০০-০৪ পৃষ্ঠায় এতদ্বিবরণ দ্রষ্টব্য।

পতঞ্জলিকে রাজা পুষ্পমিত্রের সভাসদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, খ্রীষ্ট-জন্মের ১৪২ বৎসর পূর্ব্বে পতঞ্জলির মহাভাষ্য বিরচিত হইয়াছিল। তাহাতেও খৃষ্ট-পূর্ব্ব শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণের পূজাপদ্ধতির বিষয় বোধগম্য হয়। * এক্ষণে মহাভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এবং তাঁহার পূজা প্রভৃতি সম্বন্ধে কি কি উক্তি পাওয়া যায়, দেখা যাউক; যথা,—

(১) "জঘান কংসংকিল বাসুদেবঃ।"—৩।২।১১১। সূত্রের ভাষ্য। (২) "শঙ্কর্ষণ দ্বিতীয়স্য বলং কৃষ্ণস্য বর্দ্ধতাম্।"—২।৩।২৩। সূত্রের ভাষ্য। (৩) "অক্রূরবর্গ্যঃ অক্রূরবর্গিণঃ বাসুদেববর্গ্যঃ বাসুদেববর্গিণঃ।"—৪।৩।৬৪। সূত্রের ভাষ্য। (৪) "মৃদঙ্গ শঙ্খতূণবাঃ পৃথঙ্‌নদন্তি সংসদি প্রাসাদে ধনপতিরামকেশবানামিতি।"—২।২।৩৪ সূত্রের ভাষ্য। ইত্যাদি।

প্রথম ভাষ্যে বসুদেবাত্মজ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংসের সংহার সাধন, দ্বিতীয় ভাষ্যে বলদেবানুজ শ্রীকৃষ্ণের বলবর্দ্ধন আকাঙ্ক্ষা। তৃতীয় ভাষ্যে অক্রূর ও বাসুদেবের উল্লেখ এবং চতুর্থ ভাষ্যে বলরাম-কেশবের মন্দিরে মৃদঙ্গশঙ্খতূণব প্রভৃতি বাদ্যের বিষয় লিখিত রহিয়াছে। সে সময়ে যে ভিক্ষুকগণ জীবিকার্জ্জনের জন্য বাসুদেব শিব স্কন্দ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি সঙ্গে সঙ্গে করিয়া লইয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করিত, "জীবিকার্থেচাপণ্যে' সূত্রের ভাষ্যে তাহা উক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই; যথা,—"জীবিকার্থং যৎ অবিক্রীয়মাণং তস্মিন্নাচো কনোলুপাস্যাৎ। বাসুদেবঃ শিবঃ স্কন্দঃ দেবলকানাং জীবিকার্থায় দেবপ্রতিকৃতিরিত্যিদম॥" বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্রের পিটক-মধ্যে এবং বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যমানতার প্রমাণ আছে। 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থ ৭৬ খ্রীষ্টাব্দে চীন-দেশে অনুবাদিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ গ্রন্থ যে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে বিরচিত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। 'ললিতবিস্তরে' শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দেখা যায়;—"অথ কৃষ্ণমহৎসাহঃ। .... রূপং বৈশ্রবণাতিরেক সদৃশং ব্যক্তং কুবেরোহ্যয়ম্ আহ বজ্রধরস্য বৈস প্রতিমা চন্দ্রোহপ সূর্য্যোহ্যয়ম্ কামোভ্যাধিপতিশ্চ বা প্রতিকৃতী রুদ্রস্য কৃষ্ণস্য বা শ্রীমান্ লক্ষণ বিধিতাঙ্গ অনঘো বুদ্ধোহথম্ স্যাদয়ং॥" † ঐ সময়ের এবং উহার পরবর্ত্তিকালের খোদিত-লিপিতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বিষয়ক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ নানা প্রকারে হিন্দু-দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতি লোপ করাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক ঐ সকল উক্তি দেখিয়া কি মনে করিতে পারি? মনে করিতে পারি না কি—খ্রীষ্ট-জন্মের বহু পূর্ব্ববর্ত্তিকালে শ্রীকৃষ্ণের পূজা এদেশে প্রচলিত ছিল? এ সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ সত্ত্বেও যীশুখ্রীষ্টের চরিত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র কল্পিত হইয়াছে মনে করিয়া, অনুসন্ধিৎসুগণ কেন ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হন, ইহাই আশ্চর্য্য!

---

* *Compare* Goldstucker's *Panini* and Dr. Bhandarker's article in the *Journal of the Royal Asiatic Society.*

† 'ললিতবিস্তর' একাদশ অধ্যায় এবং "জর্ণাল অব দি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী", (Journal of the Royal Asiatic Society, new series, Vol I.) দ্রষ্টব্য।

আমরা অবশ্য এমন কথা কখনও বলি না যে, শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র অবলম্বনে যীশুখ্রীষ্টের চরিত্র লিখিত হইয়াছিল; তবে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের কোনও কোনও অংশে ভারতীয় ধর্ম্মের ছায়াপাত যে ঘটিয়াছিল, ইতিহাস সে কথা কোনক্রমেই উড়াইয়া দিতে পারে না।

সাদৃশ্যে বিভ্রম।

যাঁহারা 'শ্বেতদ্বীপ' অর্থে সিরিয়া বা আলেক্‌জান্দ্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং নারদের ভগবদ্দর্শন উপলক্ষে বণিকগণের বা বৈষ্ণবগণের খৃষ্ট-ধর্ম্ম-যাজকগণের অনুসরণ বলিয়া মনে করেন; তাঁহাদিগকে আধুনিক ইতিহাসের একটা পরিচ্ছেদ উল্টাইয়া দেখিতে অনুরোধ করি। খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আর্ম্মেণীয়া রাজ্যে সেণ্ট গ্রেগরী বিদ্যমান ছিলেন। সে সময়ে ঐ দেশে দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। গ্রেগরী সেই প্রতিমা-পূজার ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। সেজন্য প্রথমে তাঁহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে, তাঁহার এতই দল-বল বৃদ্ধি হয় যে, আর্ম্মেণীয়ার অধিপতি তাঁহাকে আর আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। তখন রাজা পর্য্যন্ত গ্রেগরীর অনুবর্ত্তী হন। দেব-মন্দির-সমূহ বিধ্বস্ত ও দেব-দেবীর মূর্ত্তি বিচূর্ণিত করিবার জন্য গ্রেগরী বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়ান। মহম্মদের আবির্ভাবের পর, তাঁহার অনুচরগণ যেরূপ-ভাবে হিন্দুগণের দেব-মন্দির-সমূহ লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, গ্রেগরীও সেইরূপ ভাবে নৃশংশতার পরিচয় দেন। গ্রেগরীর এই অত্যাচারের বিষয় জেনোরিয়াস্ নামক সিরীয়া দেশের একজন পাদ্রী ঐ দেশের ভাষায় লিখিয়া রাখিয়া যান। কিছুকাল হইল, জেনোরিয়াসের সেই রচনা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে অবগত হওয়া যায়, গ্রেগরীর আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্বে, ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত কতকগুলি হিন্দু সিরিয়া-প্রদেশে গিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে দেব-দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, পূজা-অর্চ্চনা করিতেন। সিরিয়ার যে অংশে হিন্দু-ঔপনিবেশিকগণ বসতি করিতেন, সে অংশ 'পালুনিস' নামে পরিচিত ছিল। গ্রেগরী যখন হিন্দুগণের সে উপনিবেশ বিধ্বস্ত করেন, হিন্দুগণ তখন আপনাদের কতকগুলি দেব-দেবীকে মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়াছিলেন এবং কতকগুলিকে স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গ্রেগরীর এই অত্যাচারে সহস্রাধিক হিন্দু মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পাঁচ-সহস্রাধিক হিন্দু ধর্ম্মান্তরগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল; আর কতকগুলি হিন্দু কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। জেনোরিয়াস স্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।* খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব শতাব্দীতে আসিরীয়া প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষের আধিপত্যের কথা আমরা নানা স্থানে প্রতিপন্ন করিয়াছি। সুতরাং ঐ সকল প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের পূজা-পদ্ধতির বিষয়ও খ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্ব্ববর্ত্তিকালেই প্রচারিত ছিল মানিতে হয়। সে অবস্থায় খ্রীষ্টান পাদ্রীগণের নিকট হইতে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি শিখিয়া আসিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পূজার কল্পনায় তাহা প্রবর্ত্তিত করা কোনক্রমেই সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তার পর, কোনও দেশের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক এ ভাব কখনও ব্যক্ত

---

* এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে (Journal of the Asiatic Society.) প্রাচীন আর্ম্মেনীয়ায় হিন্দু-উপনিবেশ সংক্রান্ত প্রবন্ধে এতদ্বিবরণ বিবৃত আছে।

করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ফরাসী দেশের জনৈক অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত পারিস-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়া, ভারতবর্ষ-পরিভ্রমণে আগমন করেন। নিরপেক্ষ ভাবে ভারতবর্ষের সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা দর্শন করিয়া, তাহা লিপিবদ্ধ করাই পারিস-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত বৃত্তির উদ্দেশ্য ছিল। সেই বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, ফরাসী পণ্ডিত (আল্‌বার্ট মেটিন) খ্রীষ্ট-পূজা হইতে কৃষ্ণ-পূজার বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যান। তাঁহার মন্তব্যের মর্ম্ম এইরূপ,—"অষ্টাদশ শতাব্দীর কতিপয় খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক, যাহাতে উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরা সহজে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারে—এই উদ্দেশে আপনাদিগকে যে সময়ে শ্বেত-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন, বাইবেল গ্রন্থকে পঞ্চম-বেদ বলিয়া প্রতিপাদন করেন, ব্রহ্মা অব্রাহামের অপভ্রংশ, কৃষ্ণ খ্রীষ্টের অপভ্রংশ, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন ইহার প্রতিবাদ ব্রাহ্মণেরা করেন নাই—ইহার প্রতিবাদ খ্রীষ্টানেরাই করিয়াছিল।" * ফলতঃ, ইতিহাসের ধারানুসারে বিতর্ক উপস্থিত করিলে, কোনক্রমেই কৃষ্ণের জীবন-চরিতে যীশুখ্রীষ্টের প্রভাব আসিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের জীবন-চরিত সম্বলিত মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ খ্রীষ্ট জন্মাইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল; আর ম্যাথু, মার্ক, লুক ও জন লিখিত যীশু-খৃষ্টের জীবন-চরিত তাঁহার জন্মের পরবর্ত্তিকালে রচিত হইয়াছিল। বাইবেলের 'নিউ টেষ্টামেণ্টের' অন্তর্গত ঐ সকল গ্রন্থ ৬০ খৃষ্টাব্দের পরে লিখিত হয় বলিয়াই প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই সকল পরবর্ত্তিকালের লিখিত গ্রন্থ হইতে, তাহার বহু-পূর্ব্বকালের প্রচারিত গ্রন্থের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল বলিলে, তাহা নিতান্তই হাস্যজনক হয়। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, কৃষ্ণের ও খ্রীষ্টের জীবনে আশ্চর্য্যরূপ সাদৃশ্য ঘটিল কি প্রকারে? এই প্রশ্নের দ্বিবিধ উত্তর প্রদান করা যাইতে পারে। প্রথম, একই প্রকার ঘটনা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে। একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। "নেপালে সেদিন যে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা এখনও অনেকেরই স্মরণ আছে। বীরসম্সেব ম্যাক্‌বেথের ন্যায় পদ-গৌরবের লোভে হিতৈষী পিতৃব্যের প্রাণ-সংহার করিলেন। ডন্‌ক্যানের ন্যায় নেপালরাজ-মন্ত্রীও নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে ভ্রাতুষ্পুত্রকে মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে উচ্চ-পদ প্রদান করিয়াছিলেন। ডন্‌ক্যানকে বধ করিয়া ম্যাক্‌বেথ প্রচার করেন, ম্যালকলম ও ডোন্যালবেন্ পিতৃ-সিংহাসন-আশায় রাজাকে গুপ্ত হত্যা করে। বীরসম্সেরও প্রচার করেন, রণদীপসিংহ তাঁহার পুত্র ধোজ্‌নরসিংহের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। ডনক্যানের মৃত্যুর পর, ব্যাঙ্কো যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ম্যাক্‌বেথ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। বীরসম্সেরও পিতৃব্যের প্রাণনাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। পিতৃব্য পুত্র জগৎজংকেও পরলোকে পাঠাইলেন। ম্যাক্‌ডফের স্ত্রী ও পুত্র এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ম্যাক্‌বেথের কৃপায় তবযন্ত্রণা

* *L'Inde d'aujourd hui*—Albert Metin. শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পূর্ব্বোক্ত ফরাসী গ্রন্থকারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া, তাহার যে মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল।

হইতে মুক্তি পায়। রাজ্যে পুনরায় যাহাতে কোনরূপ বিপ্লব না ঘটে, সেই জন্য নেপালের আরও অনেক পদস্থ ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছিল। পিতৃ-রাজ্য উদ্ধারার্থে ম্যালকলম এড্‌ওয়ার্ডের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিচার-প্রত্যাশায় স্যার রণদীপসিংহের পুত্র ও স্যার জংবাহাদুরের কন্যা ব্রিটিশ অধিকারে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।" এক ঘটনার সহিত অন্য ঘটনার সাদৃশ্য আছে বলিয়া, যাঁহারা একের স্কন্ধে অন্যকে চাপাইবার চেষ্টা পান, নেপালের পূর্ব্বোক্ত রাষ্ট্র বিপ্লব-কাহিনী শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা কি বলিবেন? তাঁহারা কি বলিবেন,—'নেপালের হত্যাকাণ্ড সমস্তই মিথ্যা। রেসিডেন্ট সাহেবের সেক্সপিয়ার পড়া ছিল, সময় কাটাইবার জন্য তিনি প্রত্যহ নেপালবাসীদিগের নিকট গল্প করিয়া বেড়াইতেন। ইংরাজী নাম মনে রাখিতে না পারিয়া, তাহারা প্রকৃত উপাখ্যানটি এইরূপে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।' * অতএব, ঘটনার সামঞ্জস্য দেখিয়া, একটি অন্যের কল্পনা বলিয়া কোনক্রমেই উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তার পর, পৌর্ব্বাপর্য্য দেখিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের প্রভাব, কোনও কোনও স্থলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব, খৃষ্ট ধর্ম্মে পতিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এ বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে, সুতরাং, এস্থলে আর অধিক আলোচনা আবশ্যক মনে করি না।

একটী কথার আলোচনা এখনও হয় নাই। মহাভারতের যে শ্লোক-চতুষ্টয়ের উপর নির্ভর করিয়া ক্ষীরোদার্ণব-উত্তরস্থিত শ্বেতদ্বীপ শব্দে সিরিয়া বা মিশরকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং যে শ্লোকের অন্তর্গত শব্দ-বিশেষের অর্থ-বিকৃতি ঘটাইয়া 'ইউকেরিষ্ট' মতাবলম্বী 'নষ্টিকগণের' কথা টানিয়া আনা হইয়াছে, সেই শ্লোক কয়েকটির একটু তাৎপর্য্য অনুধাবন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। মহাভারতের শ্লোকে যে শ্বেতদ্বীপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত, সে শ্বেতদ্বীপের স্বরূপ-তত্ত্ব কেহ উপলব্ধি করিয়াছেন কি? সেখানে এ স্থূল-শরীরের কথা হইতেছে না, সেখানে এ পার্থিব রাজ্যের এই জন্মজরামরণশীল নরলোকের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। মূল দেখুন, টীকা দেখুন, অনুবাদ দেখুন, তবেই বুঝিতে পারিবেন,—কি মহান্ জ্ঞান-রাজ্যের বিষয় সেখানে বলা হইতেছে। সেখানকার অধিবাসীরা কেমন? "অনিন্দ্রিয়াশ্চানশনাশ্চ তত্র নিষ্পন্দহীনাঃ সুসুগন্ধিনস্তে।" নীলকণ্ঠ কৃত টীকা, যথা,—"অনিন্দ্রিয়াঃ স্থূলদেহসঙ্গহীনাঃ, অতএবানশনাঃ শব্দাদিবিষয়ভোগশূন্যাঃ নিষ্পন্দহীনা নিশ্চেষ্টাশ্চ সুগন্ধিঃ পরমাত্মা 'সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনমিতি' মন্ত্রলিঙ্গাৎ; শোভনঃ সুগন্ধিঃ সোঽহস্ত্যেষাং ধ্যানগোচর ইতি সুসুগন্ধিনঃ॥" অর্থাৎ,—'তথায় স্থূলশরীরসঙ্গবিহীন শব্দাদিবিষয়যোগশূন্য নিশ্চেষ্ট পরমাত্ম-ধ্যান-পরায়ণ শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান পুরুষগণ অবস্থিতি করিতেছেন।' অনিন্দ্রিয়া, নিরাহারা, অনিষ্পন্দা, সুসুগন্ধি ইত্যাদি বিশেষণ কি নরদেহধারী মানুষের পক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে? এ কি দিব্যলোকের চিদবস্থার কথা নহে? "শ্বেতাঃ পুমাংসো গতসর্ব্বপাপাশ্চক্ষুর্ম্মুষঃ পাপকৃতাং নরাণাম্,"—

চিদবস্থার কথায়।

---

* ডক্টর সেকাসের মন্তব্য এবং তাহার উত্তর অনুসন্ধান পত্রে (১৩০০ সালে) প্রকাশিত হয়। পরম স্নেহ-ভাজন (এক্ষণে স্বর্গগত) শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র লাহিড়ী বি-এল্ সেই সুন্দর প্রবন্ধ দুইটি লিখিয়াছিলেন। তাহারই মর্ম্মাংশ উপরে প্রদত্ত হইল।

এতদ্বিশেষণেরই বা অর্থ কি? 'শ্বেতাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানাঃ, চক্ষুর্দুর্ষস্তেজস্বিত্বাৎ'; অর্থাৎ—শ্বেত বলিতে শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট মনুষ্যকে বুঝায় নাই, শ্বেত বলিতে ঐ স্থলে 'শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান' অর্থ সূচিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষগণ পরলোকে কি অবস্থায় অবস্থিত থাকেন, তাহারই আভাষ ঐ স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। মহর্ষি নারদ পরমজ্ঞানী পরমযোগী ছিলেন। তিনি যোগ-বলে জ্ঞান-প্রভাবে ভগবৎ-সন্নিকর্ষ-লাভে সমর্থ হইতেন, পারলৌকিক অবস্থা অভিজ্ঞাত ছিলেন। 'নারায়ণীয়ে' অধ্যায় সমূহে সেই অর্থই প্রকাশমান। 'মহাপুরুষ-স্তবে' সে তত্ত্ব আরও বিশদীকৃত। সেই স্তবে তাঁহাকে অন্তর্যামী, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, লোকসাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞ, সনাতন, পুরুষোত্তম, অনন্ত ইত্যাদি যে সকল বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, তাহাতেই বা কি ভাব মনে আসে? তার পর, প্রধানতঃ যে শ্লোকে সিরীয়া-দেশের 'নষ্টিকগণের' প্রসঙ্গ উঠে, তাহারই বা মর্ম্মার্থ কি? "ছত্রাকৃতিশীর্ষা মেঘৌঘনিনাদাঃ সমমুষ্কচতুষ্কা রাজীবচ্ছদপাদাঃ। ষষ্ট্যা দন্তৈর্যুক্তাঃ শুক্লৈরষ্টাভিদ্দংষ্ট্রাভির্যে জিহ্বাভির্যে বিশ্ববক্ত্রং লেলিহ্যন্তে সূর্য্যপ্রখ্যম্॥" শ্লোকের অন্তর্গত 'সূর্য্য-প্রখ্যং বিশ্ববক্ত্রং দেবং' শব্দের অর্থ সিরীয় খ্রীষ্টানদিগের পদ্ধতির সহিত কখনই সাদৃশ্য-সম্পন্ন নহে। নীলকণ্ঠ ঐ ব্যাসকূটের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ অর্থ। "সূর্য্যেণ প্রখ্যায়তে স্ফুটীক্রিয়তে দিনমাসর্ত্তুসংবৎসরাত্মা মহাকালস্তং বিশ্ববক্ত্রং বিশ্বং বক্ত্রে যস্য তাদৃশং জিহ্বাভিরিব স্বাঙ্গভূতাভী রসনাশক্তিভি লেলিহ্যন্তে পায়সমিব লিহন্তি।" অর্থাৎ,—মহাকালময় বিশ্ববক্ত্রের বিষয়ই এখানে বলা হইয়াছে, বুঝিতে হয়। কালগ্রাসে সংসার অহর্নিশ গ্রস্ত হইতেছে—এই বর্ণনায় এস্থলে সম্প্রদায়-বিশেষের পদ্ধতি-বিশেষকে যে লক্ষ্য করা হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। পূর্ব্বাপর সঙ্গতি-রক্ষায়, শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত 'নারায়ণীয়ে' অধ্যায়কয়টি পাঠ করিলে দিব্য-লোকের দিব্য-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। যাহা হউক, যে দিক দিয়াই আলোচনা করা যাউক না কেন, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রভাব যে কৃষ্ণের পূজা-পদ্ধতিতে কোনও আকারে পতিত হয় নাই, তাহা স্পর্দ্ধা করিয়া বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ ভ্রম-ধারণা-নিবন্ধনই এই সকল ঘটনা সংঘটিত হয়।

মানুষের বিভ্রম।

মানুষের ভ্রম, প্রমা, বিপ্রলম্ভ চিরদিনই আছে, চিরদিনই থাকিবে। তাই সত্য-মিথ্যা লইয়াও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। তাই মানুষ সকল সময় সত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। তাই মানুষ অনেক সময় মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়। তাই দেখিতে পাই, জগতে যখনই যে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, অথবা যখনই যে সত্য বিঘোষিত হইয়াছে; তখনই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে। আলোকের পশ্চাতে আঁধারের বিকট বদন চিরদিনই ব্যাদান করিয়া ছুটিয়াছে। দেবতার মধ্যেও নহেন, মানুষের মধ্যেও নহেন,—সত্য-প্রচার করিতে গিয়া কেহ কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন নাই। কোন্ দেশের কোন্ মহাপুরুষের কাহিনী কীর্ত্তন করিব? যে পাশ্চাত্যের ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যে অধুনা সমগ্র পৃথিবী পরিকম্পিত, সেই পাশ্চাত্যের ইষ্টগুরু যীশুখৃষ্ট কি অবস্থায় কি ভাবে নির্য্যাতনগ্রস্ত হইয়া জীবনদান করিয়াছিলেন, ইতিহাসে যে স্মৃতি অশ্রুজলে প্রবহমান হইয়া আছে। যাঁহার সেবকানুসেবক একজন 'দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা' বিশেষণে

স্পর্দ্ধান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিজের জীবনে কি নির্য্যাতন-পরম্পরাই সহিতে হইয়াছিল মুসলমান-গৌরবের প্রাণভূত হজরত মহম্মদকে কখনও মক্কায় কখনও মদিনায় কি ভাবে কি সঙ্কটে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল, স্মরণ করিয়া দেখুন! যাঁহার দর্শন-গবেষণার ফলে ইউরোপ আজি গৌরবান্বিত, সেই পাশ্চাত্য দার্শনিকপ্রবর সক্রেটিস্ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। জগতের ইতিহাসে এইরূপ যে দিকে দেখিবে, সর্ব্বত্রই প্রবল শক্রতার মধ্য হইতে সত্যকে জয়লাভ করিতে হইয়াছে। ভারতের সকল মহাপুরুষই—সকল অবতারগণই এই দ্বন্দ্বের মধ্য হইতে আপন বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এ দ্বন্দ্বের প্রভাব আরও বিশেষভাবে পরিদৃশ্যমান। আবির্ভাবে তাঁহার শক্র ছিল, জীবনকালে তাঁহার শক্র ছিল, আবার তিরোভাবেও তাঁহার শক্রর অন্ত নাই। জরাসন্ধ, শিশুপাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বিষ্ণুদ্বেষী সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মহান্ চরিত্রে কলঙ্ক-খ্যাপন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অথচ, ভারতের অন্ধতমসাচ্ছন্ন আকাশে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদয়ে কি আলোকই বিচ্ছুরিত হইয়াছিল, আর সে আলোক-রশ্মি এখনও কেমন শক্তিরূপে ক্রীড়া করিতেছে! 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—এ শাস্ত্রোক্তি কখনও মিথ্যা নয়, ভ্রান্ত-বুদ্ধিবশেই মানুষ শাস্ত্রোক্তিতে ভ্রম দেখিতে পায়।

শ্রীকৃষ্ণ—ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ—নররূপে নারায়ণ। যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারা আপনাপনিই জানিতে পারেন; যাঁহারা বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন, তাঁহাদের বিবেকই তাঁহাদিগকে সে তত্ত্ব জানাইয়া দেয়; আর যাঁহাদের জানিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁহারাও শনৈঃশনৈঃ তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হন। কিন্তু যাঁহাদের জানিবার স্পৃহা নাই, অনুসন্ধান নাই, তাঁহারা কিরূপে জানিবেন? যে জন কখনও সাগর-সান্নিধ্যে উপস্থিত হয় নাই, মহাসাগরের বিশালতা ও গভীরতা কি প্রকারে সে অনুভব করিবে? মানুষের কূটবুদ্ধি অনেক সময় তাই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাদির সহিত তাঁহার কার্য্য-পরম্পরার পরিচয় প্রদান করিয়া মূঢ় মানবকে সে তত্ত্ব বুঝাইবার আবশ্যক হয়। ভগবান কাহাকে বলে? ভগবৎ শব্দে শাস্ত্র কি অর্থ নির্দ্দেশ করেন? এ তত্ত্ব বুঝিতে হইলে জ্ঞানতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিবার আবশ্যক হয়। শাস্ত্র (বিষ্ণুপুরাণ, ষষ্ঠাংশ, পঞ্চম অধ্যায়) বলিতেছেন,—

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

"আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধাজ্ঞানং তথোচ্যতে। শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্মবিবেকজম্॥
অন্ধন্তম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবম্। যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্বিপ্রর্ষে বিবেকজম্॥
মনুরপ্যাহ বেদার্থং স্মৃত্বা যৎ মুনিসত্তম। তদেতৎ শ্রূয়তামত্র সম্বন্ধে গদতো মম॥
দ্বে ব্রহ্মণী বেদীতব্যো শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ। শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥
দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে বৈ ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ। পরয়া হ্যক্ষরপ্রাপ্তির্ঋগ্বেদাদিময়াপরা॥
যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্। অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্॥
বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্। ব্যাপ্যব্যাপ্যং যতঃ সর্ব্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥
তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তৎ ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণা। শ্রুতিবাক্যোদিতংসূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
তদেব ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ। বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষয়াত্মনঃ॥

এবং নিগদিতার্থস্য সতত্ত্বং তস্য তত্ত্বতঃ। জ্ঞায়তে যেন তজ্জ্ঞানং পরমং যত্ত্রয়ীময়ম্॥
অশব্দগোচরস্যাপি তস্য বৈ ব্রহ্মণো দ্বিজ। পূজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে হ্যৌপচারিকঃ॥
শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরব্রহ্মণি বর্ত্ততে। মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে॥
সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোহর্থদ্বয়ান্বিতঃ। নেতা গমযিতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি। সর্ব্বভূতেষশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ॥
এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম। পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যতঃ॥
তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি পরিভাষাসমন্বিতঃ। শব্দোঽয়ং নোপচারেণ অন্যত্র হ্যুপচারতঃ॥
উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দ বাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥
সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি। ভূতেষু চ স সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ॥”

অর্থাৎ,—‘জ্ঞান দুই প্রকার, এক আগম হইতে ও দ্বিতীয় বিবেক হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আগম দ্বারা শব্দব্রহ্ম এবং বিবেক দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানা যায়। প্রদীপ যেমন অন্ধকারকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ আগম দ্বারা শব্দময় ব্রহ্মকে জানিলে, অজ্ঞান কতক পরিমাণে ধ্বংস হয়, কিন্তু বিবেক দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সমস্ত অজ্ঞান মিটিয়া যায়; যেমন সূর্য্য প্রকাশিত হইলে সমস্ত অন্ধকার ধ্বংস হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে মনু, বেদের তাৎপর্য্য স্মরণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাও তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্ম দুই প্রকার জানিবে, প্রথম শব্দময় ও দ্বিতীয় পরম। প্রথম শব্দব্রহ্মকে জানিলে তবে পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারে। বিদ্যাও দুই প্রকার, কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ, ইহাই আথর্ব্বণী-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। পরাবিদ্যার দ্বারা অক্ষরব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে ও ঋগ্বেদাদিময়ী বিদ্যাই পরা, অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, নিত্য, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ, হস্তপদাদিবিবর্জ্জিত, বিভু, সর্ব্বগত, ভূতসমূহের উৎপত্তিবীজ অথচ অকারণ, ব্যাপ্য ও ব্যাপক প্রভৃতি সর্ব্বরূপেই মুনিগণ যাঁহাকে জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই পরমব্রহ্ম। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ তাঁহারেই ধ্যান করিয়া থাকেন, তিনিই বেদে অতি সূক্ষ্ম ও বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পরমাত্মার সেই মূর্ত্তিই ভগবৎ শব্দের বাচ্য এবং ভগবৎ শব্দই সেই আদি ও অক্ষর পরমাত্মার বাচক। এইরূপ যথার্থ স্বরূপে সমধিগততত্ত্ব মুনিগণের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই পরম এবং তাহা বেদময়। হে দ্বিজ! সেই পরমব্রহ্ম শব্দের অগোচর হইলে, তাঁহার পূজার জন্য তাঁহাকে ভগবৎ শব্দ দ্বারা কীর্ত্তন করা যায়। হে মৈত্রেয়! বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বকারণের কারণ মহাবিভূতিশালী সেই পরমব্রহ্মেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভগবৎ শব্দে ভকারের দুইটি অর্থ; প্রথম তিনিই সকলের ভরণকর্ত্তা ও সমস্তের আধার এবং গকারের অর্থ গময়িতা (অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলের প্রাপক) ও স্রষ্টা এই দুই প্রকার। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য—এই ছয়টির নাম ভগ। অখিলের আত্মভূত সেই পরমাত্মায় ভূতগণ অবস্থান করিতেছেন, বকার দ্বারা এই অর্থই লাভ হইয়া থাকে। হে সাধু-

শ্রেষ্ঠ!—এবম্বিধ অর্থসম্পন্ন ভগবৎ এই মহান্ শব্দ পরমব্রহ্ম স্বরূপ সেই বাসুদেব ব্যতিরিক্ত অন্য কুত্রাপি প্রযুক্ত হয় না। সেই পরমব্রহ্মেই এই ভগবৎ শব্দ সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে; অন্যত্র ইহা প্রযুক্ত হইলে নিরর্থক হয়। ভূতসমূহের উৎপত্তি, প্রলয়, অগতি, গতি এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাকে তিনি জানেন. এই জন্যই তাঁহাকে ভগবান বলা যায়। জ্ঞান শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ প্রভৃতি সদ্‌গুণ-সমূহই ভগবৎ শব্দের বাচ্য। সমস্ত ভূতগণ সেই পরমাত্মাতেই বাস করিতেছে এবং সকলের আত্মস্বরূপ সেই বাসুদেব সমস্ত ভূতেই বাস করিতেছেন।" শাস্ত্র ভগবানের লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া, বাসুদেবকেই (শ্রীকৃষ্ণকে) ভগবান বলিয়া অভিহিত করিলেন। এই শাস্ত্রোক্তির উপর অধিক বক্তব্যের আবশ্যক ছিল না; তথাপি ভারতের ইতিহাসের সহিত যে সূত্রে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছি, তাহা বিশদ করিবার জন্য কিছু আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। শাস্ত্র বলিলেন,—"জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ প্রভৃতি সদ্‌গুণ-সমূহই ভগবৎ-শব্দের বাচ্য।' তবেই বুঝা যায়, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, যিনি শক্তিস্বরূপ, যিনি বলৈশ্বর্য্য-তেজঃস্বরূপ, তিনিই ভগবৎ-শব্দবাচ্য। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়া সম্পূজিত; কেন-না, তিনি জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-তেজঃস্বরূপ। আরও, শাস্ত্রমতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিদ্যা-অবিদ্যা সকলই তাঁহার অধিগত। তাঁহার জীবনে তাঁহার কার্য্যপরম্পরায় ভগবৎ শব্দবাচক এবম্বিধ বিভূতি প্রকটিত নহে কি? তাঁহার জ্ঞান-বারিধির গভীরতা কে নির্ণয় করিতে পারে? প্রতি বাক্যে প্রতি কার্য্যে যিনি জ্ঞানের অনন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যদি জ্ঞানাধার না হইবেন, তবে আর জ্ঞান-নির্ঝর কোথায় অন্বেষণ করিবে? তাঁহার সেই দিব্যজ্ঞানের অমৃত-ধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়াছিল বলিয়াই তো মৃতকল্প দেহ আজিও সংজ্ঞাশূন্য হয় নাই! সংসার যখন অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, জ্ঞানের দিব্যালোক বিকীরণ করিয়া তিনিই সেই আঁধার দূর করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দার্শনিক গবেষণা, তাঁহার নীতি-তত্ত্ব-আলোচনা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আজিও জগৎ কি শিক্ষা লাভ করে? হিন্দুজাতি যে আজিও জীবিত আছে, আজিও তাহার পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠার পরিচয় দিতে সমর্থ হইতেছে, তাহার কারণ—কৃষ্ণচন্দ্রের করুণা-কণা। তিনি যদি তারস্বরে ঘোষণা করিয়া না যাইতেন, তিনি যদি প্রাণে প্রাণে বিদ্ধ করিয়া না দিতেন,—'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ'; এ জাতি এ ধর্ম্ম রক্ষা পাইত কি? ঝঞ্ঝার পর ঝঞ্ঝাবাত আসিয়াছে; উর্ম্মির পর মহোর্ম্মি চলিয়া গিয়াছে; তথাপি যে এ জাতির সর্ব্বনাশ সাধিত হয় নাই, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ আর অন্য কি হইতে পারে? তিনিই যে সেই মেঘমন্দ্রে কর্ণে কর্ণে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ!" তাঁহার আবির্ভাবের পর এই যে পাঁচ সহস্রাধিক বর্ষকাল হিন্দুজাতি আপনাদের ক্রমপর্য্যায় অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার কারণ অন্য আর কি হইতে পারে? যাহার কর্ণ এখনও বধির হয় নাই, সেই অমোঘ-বাণীর চিরপ্রতিধ্বনি এখনও তাহার কর্ণপটহে ধ্বনিত হইতেছে। শিক্ষার প্রথম স্তর—স্বধর্ম্ম-পালন। এই স্তরে

প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য পুনঃপুনঃ উপদেশ প্রদানের পর, স্তরে স্তরে তিনি জ্ঞানের উচ্চ-সোপানে সংসারকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সেই আকর্ষণের চেষ্টাই শ্রীকৃষ্ণের দার্শনিক গবেষণা। সাঙ্খ্য-পাতঞ্জল-ন্যায়-মীমাংসা-বৈশেষিক-বেদান্ত দর্শন-সমুদ্র মন্থন করিয়া, তিনি যে সার রত্ন সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন, কোথাও তাহার তুলনা নাই। তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ, তদ্দ্বারাই তাঁহার প্রমাণ হইতেছে।

* . *

৪। শ্রীকৃষ্ণ—পরম দার্শনিক; কেন-না, তিনি সাঙ্খ্য-পাতঞ্জলাদি সকল দর্শনের সার-সমন্বয় সাধন করিয়া গিয়াছেন।

[বিভিন্ন দার্শনিক মতের সমন্বয় সাধনে ;—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সাঙ্খ্য-মত,—প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব,—সাঙ্খ্যের ও গীতার সাদৃশ্য ;—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যোগ দর্শন,—সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জলে সাদৃশ্য,—যোগাঙ্গ সমাধি সাধনা প্রভৃতি,—যোগের আদি স্তর অভ্যাস ;—মীমাংসা-দর্শনের সার কথা,—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যজ্ঞবিধির উপযোগিতা-প্রসঙ্গ,—যজ্ঞকার্য্যে ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্যতা ;—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বৈশেষিক দর্শনের ও ন্যায়দর্শনের সার সিদ্ধান্ত ;—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বেদান্ত-দর্শন,—গীতোক্ত 'অহং' 'আমি' তত্ত্ব,— শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যায় সেই মত পরিস্ফুট ;—গীতার সার সিদ্ধান্ত,—সকলের অধিগম্য সুখ-তত্ত্ব,—গীতার দার্শনিক মত সম্বন্ধে বিবিধ বক্তব্য।]

শ্রীকৃষ্ণ—পরম দার্শনিক। দুর্ব্বোধ্য দুরধিগম্য জটিল দর্শন-তত্ত্ব তিনি যেমন সুন্দর সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, বিভিন্ন দার্শনিক মতের বিতণ্ডা মধ্যে তিনি যেমন সরল সুন্দর সমন্বয় সাধন করিয়া গিয়াছেন, তেমন আর দ্বিতীয় দেখিতে পাই না। সাঙ্খ্যগণ জ্ঞানমার্গের অনুসরণে ধাবমান হইয়াছেন; কিন্তু সামঞ্জস্য সাধন করেন নাই। পাতঞ্জল সম্প্রদায়গণ যোগ-সাধনকেই জীবনের সারভূত বলিয়া একবাক্যে নির্দ্দেশ করিলেন; কিন্তু সামঞ্জস্য বিধান করিলেন না। এইরূপ, নৈয়ায়িকগণ, মীমাংসকগণ, বৈদান্তিকগণ, আপন-আপন পথেই অগ্রসর হইয়াছেন; কিন্তু কেহই দর্শন-সমুদ্র-মন্থনে সারতত্ত্ব নিষ্কাষণে চেষ্টা পান নাই। দার্শনিকগণ প্রায়ই, কেহ কর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়াছেন, কেহ ভক্তিকে উড়াইয়া দিয়াছেন, কেহ বা জ্ঞানকে উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রের যে মুখ্য উদ্দেশ্য—দুঃখ-নিবৃত্তি ও পরমসুখ-লাভ—তৎপথে যে এ জন্মজরামরণশীল মানুষের পক্ষে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম তিনেরই প্রয়োজন, বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণই জগৎকে তাহা প্রথম বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যখন কর্ম্ম-কাণ্ড দোষ-দুষ্ট হইল, যখন ভক্তিমার্গে কণ্টক আসিয়া পড়িল, যখন জ্ঞান-পথ অজ্ঞান আঁধারে ঘেরিয়া ফেলিল, শ্রীকৃষ্ণ সেই অবস্থায় পথ প্রদর্শন করিলেন। পাপতাপা-ক্রান্ত দুঃখ-দাবদগ্ধ সকল সন্তপ্ত জনকে তিনি অভয় দিয়া কহিলেন,—'ভয় নাই! যে যেমন অবস্থাতেই আছ, বিচলিত হইও না, উদ্ধার পাইবে।' গৃহী হও, সন্ন্যাসী হও, কর্ম্মী হও, ভক্ত হও, জ্ঞানী হও—যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থাতেই যে মুক্তিলাভের পথ আছে,—তিনি তাহা গভীর কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন! "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ"—এই অমৃত-

দার্শনিক মতের সমন্বয়।

বাণী কি শুভক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করিয়াছিলেন! সে দুর্দ্দিনে এ বাণী বিঘোষিত না হইলে, একাকারের প্রবল বন্যায় সমাজ ভাসিয়া যাইত, ধর্ম্ম প্লবমান হইত, জাতীয় অস্তিত্ব চিরতরে লোপ পাইত। দার্শনিক সম্প্রদায়ের দারুণ উচ্ছৃঙ্খলার মধ্যে সত্যের মহিমা-বিস্তারে কি কৌশলেই শ্রীকৃষ্ণ হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করিয়াছেন!

সমস্যা-সমাধানে।

মীমাংসাই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের প্রাণভূত। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবারও বলিতেছি, সঙ্কট-সমস্যার সমাধানই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের প্রধান শিক্ষা। * জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম—তিনের প্রাধান্য-অপ্রাধান্য লইয়া দ্বন্দ্ব কত কাল চলিয়া আসিতেছে এবং আরও কত কাল চলিবে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এ দ্বন্দ্বের কেমন সুন্দর মীমাংসাই করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান-বাদিগণ বলেন,—'কর্ম্মে মোক্ষ নাই; যেহেতু, কর্ম্মের ফলে জন্মাদি সুখ-দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য হয়। এমতে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম মোক্ষ-হেতু নহে, কারণ, তদ্দ্বারা স্বর্গাদি লাভ ঘটিলেও তাহা চিরসুখপ্রদ হয় না; জ্ঞানই একমাত্র মুক্তির উপায়।' কিন্তু কর্ম্মবাদিগণ তাহার প্রতিবাদে বলেন,—'কর্ম্মই মূলাধার। জন্মিয়াই কয় জন জ্ঞানালোক-লাভে সমর্থ হন? শুকদেব বা শঙ্করাচার্য্য হইয়া কয় জন জন্মগ্রহণ করেন?' শ্রীকৃষ্ণ সেই দ্বন্দ্বের সমাধান করিয়া দিলেন। তিনি বুঝাইলেন,—মোক্ষ-মার্গে কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি তিনেরই প্রয়োজন। তিনি বুঝাইলেন,—'সকল মানুষের শিক্ষা, ধর্ম্ম ও অবস্থা একরূপ হইতে পারে না; বিভিন্ন অবস্থায় মনুষ্যগণকে মোক্ষ-পথে পৌঁছাইয়া দিবার পথ তাই বিভিন্ন প্রকার।' এই উপলক্ষে তিনি আরও বুঝাইলেন,—'কেহ স্বধর্ম্ম-ত্যাগী হইও না; সকলেই আপন আপন ধর্ম্মের মধ্য দিয়া কর্ম্মের সাহায্যে মোক্ষ-লাভে সমর্থ হইবে।' কি ভাবে শ্রীকৃষ্ণ এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে, প্রথমে দর্শনকারগণের অভিমত বুঝিবার প্রয়োজন হয়। তাহা হইলে, সাঙ্খ্যের নিঃশ্রেয়স্ বা পতঞ্জলির কৈবল্য বলিতে কোন্ অবস্থা বুঝাইয়া থাকে এবং সে অবস্থা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, স্থূলভাবে তাহার একটু আলোচনা করার আবশ্যক হয়। সাঙ্খ্য-মতে—'জ্ঞানই মুক্তি; প্রকৃতির ও পুরুষের ভেদ-জ্ঞানই সেই মুক্তির মূল। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই নিত্য অব্যয় ও অনাদি। তবে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ হইলে, প্রকৃতির যে বিকৃতি ঘটে, তাহাই সংসার—তাহাই সকল দুঃখের নিদান। পুরুষপ্রকৃতির প্রকৃত জ্ঞানলাভই—তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ, তাহাই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি।' পুরুষ ও প্রকৃতির সেই জ্ঞানলাভের জন্য সাঙ্খ্য পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানলাভ আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। † পতঞ্জলিরও প্রায় এই মত। তবে তিনি বলেন,—'পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতীত এক পুরুষ বা ঈশ্বর আছেন; তাঁহাতেই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা; যোগবলে সেই জ্ঞান লাভ হয় এবং সেই জ্ঞানই কৈবল্য।' ফলতঃ, কি সাঙ্খ্যে,

* "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, মহাভারত-প্রসঙ্গে এতদ্বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

† অষ্ট প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার এবং পুরুষ—ইহাই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বা পঞ্চবিংশ পদার্থ। তাহাদেরই জ্ঞান—তত্ত্ব-জ্ঞান। "পৃথিবীর ইতিহাস প্রথম খণ্ডে সাঙ্খ্য-দর্শন প্রকরণে এই তত্ত্বজ্ঞান-লাভের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

কি পাতঞ্জলে উভয়ত্র জ্ঞান-লাভকেই মোক্ষ বা কৈবল্য * বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে ; বেদান্তও সেই জ্ঞান-তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ন্যায়-দর্শনেরও প্রতিপাদ্য—তত্ত্বজ্ঞান-লাভই মুক্তি। মীমাংসকগণ যজ্ঞাদি কর্ম্মকে মোক্ষপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সকলেই চান—মোক্ষ বা মুক্তি; সুতরাং প্রতিপাদ্য প্রায় সকলেরই অভিন্ন; কেবল পরিগৃহীত পন্থা স্বতন্ত্র। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহারও সমাধান করিয়া গিয়াছেন। তিনি সকল পথের সকল কর্ম্মের সকল জ্ঞানের গভীরতা নির্ণয়ে সর্ব্ব সামঞ্জস্য সাধন করিয়া দিয়াছেন।

সকল দেশের সকল দর্শন-শাস্ত্রেরই মুখ্য লক্ষ্য এক। এই দুঃখতাপময় সংসারে, দুঃখনিবৃত্তি করিয়া, চিরশান্তি-লাভ আশায় সকলেই উৎকণ্ঠিত-চিত্ত। আপন আপন বুদ্ধি যুক্তি ও অভিজ্ঞতা অনুসারে এক এক জন এক এক পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দুঃখ-নিবৃত্তির—শান্তি-লাভের জন্য নির্দ্দিষ্ট পথ তাই অসংখ্য। সে পথ সম্বন্ধে, প্রাচ্যের নির্দ্দেশ এক রূপ, পাশ্চাত্যের নির্দ্দেশ আর এক রূপ, ভক্তের নির্দ্দেশ এক রূপ, অভক্তের নির্দ্দেশ আর এক রূপ, সাকারবাদীর নির্দ্দেশ এক রূপ, নিরাকারবাদীর নির্দ্দেশ আর এক রূপ। আমাদের দেশে এই পথ প্রদর্শন সম্বন্ধে ছয়টী প্রধান দার্শনিক মত প্রচলিত; তাহার শাখা উপশাখা যে কত্তই আছে, তাহার অন্ত নাই। সেই ষড়বিধ দার্শনিক মতের মধ্যে, সাংখ্য-মত প্রথম আলোচিত হইয়া থাকে। এই মতের মূল-তথ্য—প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব নিরূপণে। প্রকৃতি-পুরুষের মিলন-জনিত বিকৃতিই এই সংসার। সংসারেরই নামান্তর অবিদ্যা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইতেছেন,—অবিদ্যাই বা কি, আর প্রকৃতি-পুরুষই বা কি এবং তাহাদের মিলনজনিত বিকৃতিই বা কি! 'অবিদ্যা' বলিতে তিনি বুঝাইলেন,—আত্মীয়-স্বজন-পরিবৃত এই সংসার। † পুরুষ প্রকৃতি ও তাহাদের সংযোগ-ফল বুঝাইবার জন্য তিনি (গীতা, ২য় অধ্যায়, ১৩শ—২২শ শ্লোক) বলিলেন,—

গীতায় সাংখ্য-মত।

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্। বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ। অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

---

* এই কৈবল্য-প্রাপ্তির বিষয় "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম খণ্ডে পাতঞ্জল-দর্শন-প্রকরণে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে।

† শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় ২৮শ শ্লোক হইতে দ্বিতীয় অধ্যায় দশম শ্লোক পর্য্যন্ত অবিদ্যা যে কি বস্তু, তাহার পরিচয় আছে।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্। কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত॥"

অর্থাৎ,—"মনুষ্যগণের দেহে যেমন বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা ঘটিয়া থাকে, জন্মজনিত দেহ-লাভ ও মৃত্যুজনিত দেহান্তর-প্রাপ্তি তদ্রূপ জানিয়া সুধীর মানবগণ তজ্জন্য একটুও শোকাভিভূত হন না। হে ভরতবংশাবতংস কুন্তীনন্দন! ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত বাহ্য-বিষয়ের যে সম্বন্ধ, তাহাই শীতোষ্ণাদি বিবিধ বোধের প্রবর্ত্তক এবং হর্ষবিষাদাদির জনক। তৎসমস্ত উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট সুতরাং অনিত্য। অতএব তাদৃশ বাহ্যকারণজনিত হর্ষ-বিষাদে অভিভূত না হইয়া ধীরভাবে তৎসমস্ত সহ্য করিতে ও অকিঞ্চিৎকরবোধে উপেক্ষা করিতে অভ্যাস কর। হে মানবকুলোত্তম অর্জ্জুন! শীতোষ্ণাদি বাহ্যবিষয়-সমূহ যে নিত্যানিত্য-বোধ-সম্পন্ন মানবকে বিচলিত ও অভিভূত করিতে পারে না, সেই সাধু পুরুষই অমৃত-স্বরূপ মোক্ষলাভের অধিকারী। শীতোষ্ণাদি অনিত্য বস্তুর আত্মাতে বিদ্যমানতা নাই; সৎস্বরূপ আত্মার নাশ নাই। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ শীতোষ্ণাদি অসৎ বস্তু এবং আত্মস্বরূপ সৎবস্তু এতদুভয়ের চরম অবধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ,—আত্মা অবিনাশী এবং সুখ দুঃখাদি অচিরস্থায়ী, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে অবধারণ করিয়াছেন। যে পরমাত্মা আগমাপায়ধর্ম্মাত্মক দেহাদি সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই আত্মস্বরূপের কখনই বিনাশ নাই। কেহই সেই সমভাবাপন্ন আত্মস্বরূপের বিনাশ-সাধন করিতে পারে না। তত্ত্বদর্শী বিবেকিগণ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সর্ব্বদা সমভাবাপন্ন, বিনাশবিহীন, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণাতীত আত্মার স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-স্বরূপ সুখ দুঃখাদি ধর্ম্মাত্মক এই দেহ-সকল নশ্বর; অতএব সমর-বিরতিরূপ স্বধর্ম্মত্যাগ না করিয়া, যুদ্ধে বিনিযুক্ত হও। যে অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি আত্মাকে বধকর্ত্তা বলিয়া মনে করে বা দেহ-নাশে আত্মনাশ হইবে বলিয়া বোধ করে, তাহারা উভয়েই প্রকৃত তত্ত্ববিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। কারণ, আত্মা কখনও কাহাকে বধ করেন না এবং কাহারও কর্ত্তৃক হতও হন না। আত্মা জন্মমরণ-রহিত। দেহের ন্যায় আত্মা উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট এবং বিনষ্ট হইয়া পুনরুৎপন্ন হয় না। আত্মার জন্ম নাই বলিয়া অজ, সর্ব্বদা একরূপ বলিয়া নিত্য, ক্ষয় নাই বলিয়া শাশ্বত, রূপান্তর নাই বলিয়া পুরাণ। দেহ বিনষ্ট হইলেও সেই দেহাতীত আত্মার বিনাশ হয় না। হে পার্থ! যে ব্যক্তি আত্মাকে নিত্য, অজ, অব্যয় এবং অবিনাশী বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন, তিনি উত্তেজনা বাক্যে অপরের দ্বারা কাহারও বধ করাইতে পারেন না, স্বয়ংও কাহাকেও বধ করিতে পারেন না। মানবগণ যেমন ছিন্ন, গলিত ও অব্যবহার্য্য বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র ধারণ করে, তদ্রূপ আত্মাও বয়ঃক্লিষ্ট কাতর ও অকর্ম্মণ্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য অভিনব শরীর পরিগ্রহ করেন। এই অবিক্রিয় আত্মাকে খণ্ডিত করিতে কোনও অস্ত্রেরই শক্তি নাই, ইঁহাকে দহন করিতে অগ্নির সামর্থ্য নাই, বারিরাশিরও ইঁহাকে বিগলিত করিবার যোগ্যতা নাই, এবং বায়ু-প্রবাহেরও ইঁহাকে বিশুষ্ক করিবার ক্ষমতা নাই।

আত্মায় ও দেহে ভেদ-জ্ঞান যাঁহার হৃদয়ে সম্যক উদিত হইয়াছে, তিনিই তো প্রকৃত-তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন। তাঁহার অবিদ্যা তিরোহিত হইয়াছে। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ-জ্ঞান তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। কর্ম্মজনিত সংসার-বন্ধন তাঁহাকে আর কখনও আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। গীতা-মাহাত্ম্যে যে লিখিত আছে,—"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"—এই উক্তির সার্থকতা পূর্ব্বোদ্ধৃত কয়েক পংক্তির মধ্যেই যেন জীবন্ত পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে! গীতা যে সর্ব্বোপনিষৎ-সার, উদ্ধৃত প্রত্যেক বাক্যেই তাহা উপলব্ধি হয়। উপনিষদের সার সিদ্ধান্ত,—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ (কঠোপনিষৎ, ১।২।১৮)। স বা এষ মহানজ আত্মাহজরোহমরোহমৃতোহভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ॥" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪অ।৪।২৫) ইত্যাদি। গীতার ভগবদ্বাক্যে কি ঐ বাণীই বিঘোষিত নহে? গীতার মধ্যে শ্লোক-দশক সূত্রে (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৩শ—২২শ শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণ যে সাঙ্খ্য-মতের সারোদ্ধার করিয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে তাহা বেশ বিশদীকৃত দেখিতে পাই। যথা, সপ্তম অধ্যায়ে প্রকৃতি-বিভাগ-ব্যপদেশে, কৃষ্ণোক্তি (৪র্থ ও ৫ম শ্লোক),—

প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব।

'ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

অর্থাৎ,—'প্রকৃতি—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আট ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বে যে প্রকৃতির বিবরণ নির্দ্দেশ করিলাম, তাহা নিকৃষ্ট। তদতিরিক্ত জীবস্বরূপা আমার অন্যরূপ শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি আছে। হে অর্জ্জুন! সেই প্রকৃতিই এই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।' অন্যত্র, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১ম ও ২য় এবং ১৯শ—২৩শ শ্লোক),—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥
কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে॥"

অর্থাৎ,—'শ্রীভগবান বলিলেন, হে কৌন্তেয়! এই ভোগায়তন দেহ ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং যিনি এতন্মধ্যে ইহাকে আমার আমি ইত্যাদিরূপে অনুভব করেন, তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন। হে ভারত! যাবতীয় ক্ষেত্রে আমাকেই তদধিষ্ঠিত ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে।...এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান,—ইহাই আমার অভিমত। প্রকৃতি এবং পুরুষ এতদুভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে; এবং বিকারী ইন্দ্রিয়াদি ও সত্ত্বাদি গুণ-সমূহকে প্রকৃতি-সম্ভূত বলিয়া জানিবে। প্রকৃতি

কার্য্য-কারণ-রূপ শরীরেন্দ্রিয়ের উৎপাদনের হেতু বলিয়া কথিত হয়, এবং জীব সুখদুঃখ-ভোগের কারণ রূপে উক্ত হয়। অপিচ, জীব প্রকৃতিগত হইয়াই প্রকৃতিসম্ভূত সুখ-দুঃখাদি গুণসমূহকে উপভোগ করে। এই জীব যে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে, তদ্বিষয়ে বিষয়াসক্তিই কারণ। এই দেহে অবস্থিত হইয়াও পুরুষ ইহা হইতে ভিন্ন, ইহার সাক্ষী অনুমোদক, ভর্ত্তা ভোক্তা এবং সর্ব্বস্বামী পরমাত্মা প্রভৃতি রূপে কথিত হন। যিনি এইরূপে পুরুষকে এবং স্বীয় বিকারযুক্ত প্রকৃতিকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি যে কোনও ভাবে অবস্থিত হইলেও পুনর্ব্বার জন্ম-পরিগ্রহ করেন না।' ভগবদ্বাক্যে বেশ বুঝা যায়, প্রকৃতি কি, পুরুষ কি, আর উভয়ের সংযোগে কি বিকৃতি ঘটে! ভগবদ্বাক্যে আরও বুঝা যায়, যিনি প্রকৃতি-পুরুষের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন। সাঙ্খ্য-মতে দেখিতে পাই,—অষ্ট প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার। সে-মতে সেই অষ্ট প্রকৃতি—(১) অব্যক্ত মূলা প্রকৃতি অর্থাৎ অন্তঃকরণ বা মহত্তত্ত্ব, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার, (৪-৮) পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ। গীতার শ্লোকেও ('ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃখং' ইত্যাদিতে) প্রকৃতিকে আট ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে;—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। সাঙ্খ্যের সহিত এখানে কোনই বিভিন্ন ভাব দৃষ্ট হইল না। সাঙ্খ্য-মতে, পঞ্চসূক্ষ্মভূত বা পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়। যে মহাভূত যে তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন, সেই তন্মাত্র সেই মহাভূতের গুণ বলিয়া অভিহিত। শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশ-মহাভূত সমুৎপন্ন; আকাশের গুণ শব্দ। তদ্ভিন্ন, আর আর মহাভূত-সমূহ যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাভূতের গুণও প্রাপ্ত হয়; যেমন স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে বায়ু মহাভূত উৎপন্ন হয়; কিন্তু বায়ুর গুণ—শব্দ ও স্পর্শ। রূপ-তন্মাত্র হইতে তেজ মহাভূত সমুৎপন্ন; কিন্তু তেজের গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। রসতন্মাত্র হইতে জল মহাভূত সমুৎপন্ন; কিন্তু জলের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। গন্ধ-তন্মাত্র হইতে পৃথিবী মহাভূত সমুৎপন্ন; কিন্তু পৃথিবী মহাভূতের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এইরূপ তন্মাত্র-সম্মিলনে যে পঞ্চ-মহাভূত, এই চরাচর বিশ্ব, তাহারই সংযোগ-বিয়োগে সমুৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং 'ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ' এই পঞ্চ মহাভূতের উল্লেখে প্রকারান্তরে পঞ্চতন্মাত্রেরই উল্লেখ হইয়াছে, বুঝা যাইতেছে। অতএব, ঐ কয়েকটি শ্লোকে শ্রীভগবান যে সাঙ্খ্য-দর্শনের সার-তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞ' অভিধায়ে শ্রীভগবান পুরুষ ও প্রকৃতির যে পরিচয় দিলেন, তাহাও সাঙ্খ্য-মত হইতে অভিন্ন এবং শ্রুত্যনুসারী। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।" অর্থাৎ,—'জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, নামরূপে পরিব্যক্ত হইব।' সেই যে ক্ষেত্রজ্ঞ পরম পুরুষ, তিনিই প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, বিকৃতি-প্রাপ্তিতে নামরূপ ধারণ করেন। 'অপরেয়মিতিস্তন্যাং' ইত্যাদি বাক্যে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। সাঙ্খ্য-মতে 'ব্যক্ত', 'অব্যক্ত' ও 'জ্ঞ' শব্দত্রয়ে যথাক্রমে দৃশ্যমান জড়জগৎকে, জগতের নিদানভূত মূলা প্রকৃতিকে এবং চৈতন্য-স্বরূপ (জড়াতীত)

সাঙ্খ্যের ও গীতার সাদৃশ্য।

পুরুষকে বা আত্মাকে বুঝাইয়া থাকে। পুরুষ—অনাদি, অনন্ত, চেতন ও নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতি—জড়ধর্ম্মাক্রান্তা, গুণময়ী, অবিবেকী। পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃতি যে কার্য্য করে, সাঙ্খ্যগণ সেই মিলন-কার্য্যকে 'সংঘাত' বলেন। চৈতন্যের সহিত মিলন-জনিত কার্য্যই সংঘাত। সংসারে যে কোনও বস্তু আছে, ঐ সংঘাত-জনিতই তৎসমুদায় সমুৎপন্ন। সংঘাতোৎপন্ন সমুদায় পদার্থ একের প্রয়োজন-সাধক হয়। স্থূল-দৃষ্টান্তের অবতারণায় বুঝিতে পারি, এই ঘর বাড়ী- খাট-বিছানা পোষাক-পরিচ্ছদ—এমন কি এই দেহটি পর্য্যন্ত, সকলই সংঘাতোৎপন্ন, সকলই একের প্রয়োজন-সাধন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। এ হিসাবে, পুরুষ ভোক্তা, সংঘাত উৎপন্ন বস্তু-মাত্রই ভোগ্য, আর পুরুষের সংযোগেই প্রকৃতি ক্রিয়মাণা। এই বিষয় বুঝাইবার জন্য, সাঙ্খ্যকারগণ দুইটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করেন। প্রথম, মনে করুন—একটি পুষ্প। পুষ্পের উৎপত্তি-মূলেও পুরুষ, পুষ্পের সৌন্দর্য্য-সৌগন্ধ অনুভবেও পুরুষ। পুষ্প কখনও নিজে আপনার সৌন্দর্য্য বা সৌগন্ধ উপভোগ করে না। সুতরাং তাহার শোভা-সৌন্দর্য্য-সৌরভের ভোক্তা অন্য এক জন আছেন। তিনিই পুরুষ বা আত্মা। একের সহিত অন্যের—পুরুষের সহিত প্রকৃতির—সংযোগ না হইলে প্রকৃতির ক্রিয়মাণত্ব যে প্রকাশ পায় না, তাহার দৃষ্টান্তস্থলে সাঙ্খ্যগণ পঙ্গু ও অন্ধের উদাহরণ উপস্থিত করেন। পঙ্গু ও অন্ধ উভয়ে স্থানান্তর গমনে ইচ্ছুক, কিন্তু অঙ্গ-বৈকল্য-হেতু উভয়েই তৎকার্য্য সাধনে অসমর্থ। এই-রূপ ক্ষেত্রে পঙ্গু ব্যক্তি যদি অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করে, তাহা হইলে উভয়েরই গন্তব্য-স্থানে পৌছান সম্ভবপর হয়। প্রকৃতি জড় হইলেও, চেতন পুরুষের সাহায্যে কার্য্যকরী ক্ষমতা লাভ করে। ফলতঃ, সৃষ্টি-ব্যাপারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পুরুষ কার্য্য করেন না বটে, কিন্তু পরোক্ষভাবে তিনিই সৃষ্টির কারণ-স্বরূপ কথিত হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রকৃতির "পরা' ও 'অপরা' দুই অবস্থা কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে প্রকৃতি পুরুষের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত অর্থাৎ চৈতন্য-সান্নিধ্য-প্রাপ্ত, তাহাই পরা বা শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি, আর যাহা চৈতন্য-সান্নিধ্য যুক্ত নহে, তাহা অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ শেষ বুঝাইয়াছেন, সকলের মূল—আমি। "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥" অর্থাৎ,—'এ জগতে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। সূত্রে যেমন মণি-মুক্তা গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।' এই যে আমি, কাহারও ভাষায় ইহা পুরুষ বা আত্মা, কাহারও ভাষায় পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর শ্রীভগবান, আবার কাহারও ভাষায় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীভগবান যেমন সাঙ্খ্য-মত বিবৃত করিয়া মানুষকে নিঃশ্রেয়স-পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনই আবার তিনি যোগ-তত্ত্ব বিশদীকৃত করিয়া মানুষের কৈবল্য-প্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। সাঙ্খ্য-মতের সঙ্গে সঙ্গে পাতঞ্জল-মতের আলোচনায়, মূলে ঐ দুই মতের মধ্যে কি ঐক্য রহিয়াছে,—গীতায় তাহা বড় সুন্দর-রূপেই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মূলে যে দুই মতই এক, বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে আর কেহ এমনভাবে বুঝাইতে সমর্থ হন নাই। সাঙ্খ্য-গণ যে তত্ত্ব

সাঙ্খ্য ও যোগ।

অনুসন্ধানে নিয়োজিত, যোগমার্গাবলম্বিগণও সেই তত্ত্বই অনুসন্ধানে নিরত রহিয়াছেন; অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়, উঁহাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব অবধি নাই! মূল অনুসন্ধেয় উভয়েরই অভিন্ন; কেবল অনুসন্ধানের প্রকৃতি-পদ্ধতি বিভিন্ন। এক পক্ষ জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের অনুসন্ধান করিতে চান, অপর পক্ষ জ্ঞানের সঙ্গমে জ্ঞানস্বরূপে লীন হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই বুঝাইতেছেন, অজ্ঞেরাই পার্থক্য অনুধাবন করেন; নচেৎ, কিবা সাংখ্য, কিবা যোগ, উভয়ের একের অনুষ্ঠানেই মানুষ মোক্ষ-লাভে সমর্থ হয়। মূলতঃ উভয়েই এক; যিনি সাংখ্যকে ও যোগকে এক দেখেন, তিনি সম্যক দর্শন-শক্তি লাভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তারস্বরে এই কথা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"

সাংখ্যের ও যোগের অভিন্নত্ব কীর্ত্তন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ একে একে যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ, যোগের অঙ্গ, যোগের আসন, যোগের ফল প্রভৃতি বিষয় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ",—পাতঞ্জল-সূত্রে যোগের এই প্রধান লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাই আরও একটু বিশদ ভাবে বুঝাইয়া বলিতেছেন,—

"যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে। সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ। অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু। সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥"

অর্থাৎ,—"যখন শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ে এবং তজ্জন্য কোনপ্রকার শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়ায় আসক্তি না থাকে, তখন সেই সর্ব্বসঙ্কল্প-ত্যাগী ব্যক্তি যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হন। যোগারূঢ় ব্যক্তি, বিবেক শক্তি-সম্পন্ন হইয়া, আপনিই আপনার উদ্ধার-সাধনে যত্নবান হইবে; অবিবেকী হইয়া, কখনও আত্মাকে অধঃপাতিত করিবে না; অর্থাৎ, বিষয়ানুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, আপনার দ্বারাই আপনাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে, দুঃখময় সংসার-সমুদ্রে কখনও আপনাকে ডুবাইবে না। আত্মাই আত্মার শত্রু; আত্মাই আত্মার মিত্র। আত্মার দ্বারাই আত্মার উদ্ধার-সাধন হয়। যিনি আপনার দ্বারা আপনাকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনিই নিজের বন্ধু; আর যিনি আত্মার দ্বারা আত্ম-জয় করিতে অসমর্থ, তাঁহার আত্মাই তাঁহার শত্রু-স্বরূপ। যিনি আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, যাঁহার রাগ-দ্বেষাদি দূরীভূত হইয়াছে, তিনিই শীতোষ্ণসুখদুঃখ মানাপমান ইত্যাদির দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া, অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করিতে পারেন। শাস্ত্রোপদেশ-জনিত জ্ঞান, আর সেই জ্ঞান-সাহায্যে যাথার্থ্য-অনুভবরূপ বিজ্ঞান যাঁহার হৃদয়কে আকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য করিয়াছে, আর যিনি সর্ব্বতোভাবে ছিন্নসংশয় হইয়া জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিয়াছেন, আর লোষ্ট্র-কাঞ্চনে যাঁহার সমদৃষ্টি জন্মিয়াছে, তিনিই প্রকৃত যোগী বা যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হন। প্রত্যুপকার-প্রত্যাশা-বিরহিত উপকারী—সুহৃৎ, স্নেহবশে উপকারক—মিত্র, বিনাশোদ্যত—শত্রু, বিবাদমান

পক্ষদ্বয়ের কোনও পক্ষেই অনাশ্রয়ী—উদাসীন, বিবাদভঞ্জনকারী—মধ্যস্থ, অমুপকারী জনের হিতৈষী—দ্বেষ্য, সম্বন্ধ হেতু উপকারক—বন্ধু, শাস্ত্র-বিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠাতা—সাধু, শাস্ত্রবিগর্হিত আচার-পরতন্ত্র—পাপাত্মা, ইত্যাদি সকলের প্রতিই যাঁহার সমান দৃষ্টি, তিনিই শ্রেষ্ঠ।' যোগ-সূত্রে যোগের যে অবস্থা বর্ণিত আছে, এখানেও সেই অবস্থাই বিবৃত হইয়াছে। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ—ইহার অপেক্ষা কি হইতে পারে! তার পর—যোগের অঙ্গ। পতঞ্জলি যোগ-সূত্রে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি—এই অষ্টবিধ যোগাঙ্গের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতায়ও দেখুন,—সেই অঙ্গাদির বিষয় কি ভাবে বিবৃত হইয়াছে!

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ। উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ। সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ। মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ। শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ। ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে। নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা। যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্। বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্। স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা।
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ। মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্। উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ। সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"

অর্থাৎ,—'যিনি যোগে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি অবিরত জনশূন্য স্থানে একাকী অন্তঃকরণ ও দেহের সংযম করিয়া আকাঙ্ক্ষা-বিহীন এবং পরিগ্রহ-পরিশূন্য হইয়া মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন। পরিশুদ্ধ-প্রদেশে প্রথমে কুশ, তদুপরি ব্যাঘ্রাদি চর্ম্ম এবং তদুপরি মৃদুবস্ত্র পাতিত করিয়া অনতি-উচ্চ ও অনতি-নীচ নিশ্চল আসন স্থাপিত করিবেন। তদনন্তর চিত্ত-

ইন্দ্রিয় ও তাহার কার্য্য সংযমকারী সাধক সেই আসনে সমুপবিষ্ট হইয়া এবং মনকে বিক্ষেপশূন্য করিয়া, অন্তঃকরণ শুদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন। দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সরল ও নিষ্পন্দরূপে স্থির রাখিয়া এবং অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল স্বকীয় নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি সংযত করিবেন। এইরূপে স্থিরচিত্ত সর্ব্বশঙ্কাশূন্য ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ এবং মদ্গতচিত্ত হইয়া ও আমাকেই সর্ব্বপুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া সমাধিযুক্তভাবে উপবেশন করিবেন। পূর্ব্ব-কথিত প্রণালীতে মনের সংযম করিতে করিতে ক্রমশঃ যোগী পুরুষ সংযতচিত্ত হন এবং পরিণামে মোক্ষপ্রদ আমার সারূপ্যরূপা মুক্তি লাভ করেন। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি অতিরিক্ত আহার করে, অথবা যে ব্যক্তি নিতান্ত আহার-বিমুখ, তাহাদের যোগ হয় না; যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিদ্রাশীল, অথবা যে ব্যক্তি জাগরণশীল, তাহারাও যোগের অধিকারী নহে। যিনি নিয়মিতরূপ আহার বিহার করেন, কর্ম্মসম্বন্ধে সমুচিত চেষ্টা করেন, এবং পরিমিতরূপ নিদ্রা ও জাগরণ করেন, তাঁহার যোগ সর্ব্ব-সংসার ক্লেশ নিবারণের হেতুস্বরূপ। যখন চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া স্বকীয় আত্মাতেই নিশ্চলভাবে অবস্থিত হয়, তখন যোগী সংসারের সকল কামনায় বিগততৃষ্ণ হইয়া সমাহিত নাম প্রাপ্ত হন। বায়ুহীন-প্রদেশস্থ দীপকলিকা ক্ষণমাত্রও আন্দোলিত হয় না, যোগজ্ঞেরা যোগ-পরায়ণ সংযতমনা যোগীদিগের আত্মার অবস্থাও তদ্রূপ বলিয়া বিবেচনা করেন। যে অবস্থায় যোগাভ্যাস-প্রভাবে চিত্ত সংযত হইয়া বিষয়ান্তরবিমুখ হয়; যে অবস্থায় পরমানন্দস্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হেতু, যোগী ব্যক্তি স্বকীয় আত্মা সম্বন্ধেই পরিতুষ্ট থাকেন; যে অবস্থায় যোগী পুরুষ কেবল বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণীয়, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ পরিশূন্য, অবক্তব্য অনন্ত সুখসম্ভোগ করেন; যে অবস্থায় সমবস্থিত হইয়া সেই জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ কখনই তাহা হইতে বিচলিত হন না; যে সুখময়ী অবস্থা লাভ করিয়া তদিতর কোনও লাভকেই তদপেক্ষা অধিক বলিয়া তাঁহার মনে হয় না; এবং যে অবস্থায় অবস্থিত যোগী অস্ত্রাঘাত ও শীতবাতাদিজনিত অতীব ক্লেশ সম্পাতেও অভিভূত হন না; সেই অবস্থাই দুঃখসংস্পর্শপরিহীন যোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সংকল্প-সমুদ্ভূত সুতরাং যোগ-প্রতিকূল যাবতীয় বিষয়-ভোগ-কামনা নিঃশেষরূপে পরিবর্জ্জন করিয়া এবং স্বকীয় মানসিক শক্তিপ্রভাবে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহৃত ও নিরুদ্ধ করিয়া শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-জনিত দৃঢবিশ্বাস সহকারে নির্ব্বেদ-রহিত হৃদয়ে সেই যোগ অভ্যাস করা বিধেয়। ধৈর্য্য-বশীভূত বুদ্ধির দ্বারা স্বকীয় মনকে আত্মাতেই সম্যক্-রূপে নিশ্চলভাবে স্থাপন করিবে এবং ক্রমশঃ অভ্যাস সহকারে বিষয় ব্যাপার হইতে উপরত হইয়া যাবতীয় চিন্তা পরিত্যাগ করিবে। স্বভাবতঃ বিষয়-বিক্ষিপ্ত অস্থির চিত্ত যে যে বিষয়াভিমুখে প্রধাবিত হয়, তৎসমস্ত হইতে তাহাকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাধীনতায় স্থাপন কর। যাঁহার হৃদয় হইতে রজোগুণ বিদূরিত হওয়ায় চিত্ত প্রশান্ত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিরহিত হইয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়াছে, সমাধি রূপ পরম সুখ তাঁহাকে নিশ্চয় আশ্রয় করে॥ উল্লিখিত প্রকারে মনকে সতত যোগনিষ্ঠ করিলে যোগী পুরুষ ক্রমশঃ বিনা-ক্লেশে ব্রহ্মসম্মিলনরূপ পরম সুখ উপভোগ করিতে থাকেন। যোগপ্রভাবে যাঁহার অন্তঃকরণ

সমাহিত হইয়াছে, সকল ভূতপদার্থে সমজ্ঞানসম্পন্ন সেই যোগী আত্মাকে সকল ভূতে সমবস্থিত এবং আত্মাতে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল ভূতই সন্দর্শন করেন। যে যোগী সর্ব্বভূতে বাসুদেবরূপ আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রপঞ্চজাত দর্শন করেন, সেই বিবেক-দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের নিকট আমি কখনই অদৃশ্য হই না, এবং তিনিও আমার নিকট অদৃশ্য হন না। যে যোগী সকল ভূতে আমি অধিষ্ঠিত আছি জানিয়া সর্ব্বভূতে অভেদভাবে আমার ভজনা করেন, বিবিধ বৈষয়িক ব্যাপারে বিনিযুক্ত থাকিলেও, তিনি প্রতিনিয়ত আমাতেই অবস্থিত থাকেন।” ইহার পর, মন যে দুর্নিবার ও অস্থির,—তাহার আলোচনায়, কিরূপে মনঃস্থৈর্য্য সাধিত হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। কি কারণে যোগী যোগ-ভ্রষ্ট হয়, শিথিলপ্রযত্ন যোগীও কেমনভাবে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়, এতৎপ্রসঙ্গে তাহারও আলোচনা আছে। এই সকল বিষয় কহিয়া উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥” অর্থাৎ,—‘যে ব্যক্তি সম্যক্‌ভাবে আমাতেই অন্তঃকরণ সমাহিত করিয়া, শ্রদ্ধাসহকারে আমার ভজনা করেন, যাবতীয় যোগিগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত জানিবে।’ সকল মতের আলোচনায়, উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি দেখিতে পাই, যোগ তত্ত্বের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেও সেই কথারই প্রতিধ্বনি শুনি। সকল বাণীর সার বাণী—এক মনে এক প্রাণে তাঁহার—শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হও। এখানেও সেই-‘আমি’। যিনি এই অগৎ স্বজন, সেই আত্মা, সেই পরম পুরুষ, সেই ‘আমি’। সাংখ্য-পাতঞ্জলের সামঞ্জস্য-সমুদ্ধারে শ্রীকৃষ্ণ সকলই দেখাইলেন—সেই আমি।

অভ্যাসই সকল যোগের মূল। চিত্ত বায়ুগতি বিচঞ্চল, অথচ, চিত্তকে স্থির করিতে না পারিলে, কৈবল্য তো দূরের কথা, কোনও উদ্দেশ্যই সুসিদ্ধ হয় না। কি সাংখ্যের জ্ঞান, কি পাতঞ্জলের যোগ,—চিত্ত স্থৈর্য্যের উপর সকলই নির্ভর করে।

অভ্যাস—যোগের প্রথম স্তর।

অভ্যাস—সেই চিত্ত-স্থৈর্য্যের প্রথম সোপান। এই বিষয় বিশেষরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীভগবান উপদেশ দিয়াছেন,—“যদি তুমি মন স্থির করিতে পার, একমাত্র আমাতেই তোমার চিত্ত বিনিবিষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাতেই অবস্থান করিবে অর্থাৎ কৈবল্য-লাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু যদি তাহাতে অসমর্থ হও, যদি তোমার চিত্তস্থৈর্য্য না আসে, তুমি মদ্গতচিত্ত হইতে অভ্যাস কর, অর্থাৎ,—চিত্তকে পুনঃপুনঃ আমার প্রতি স্থির করিবার জন্য অভ্যস্ত হও। যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে ফিরাইয়া আনিয়া আমার প্রতি স্থির করিতে অপারক হইয়া পড়, তবে আমার প্রীতি-সাধনের উপযোগী কর্ম্ম-সকল অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হও। আমার প্রীতি-সাধনের উপযোগী কর্ম্মসমূহের দ্বারাও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যদি সে কর্ম্মেও তোমার সামর্থ্য না থাকে, একান্তপ্রাণে আমার শরণাপন্ন হও, আর সংযতচিত্ত হইয়া কর্ম্মফলসমূহ পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ,—যে কার্য্যই যখন কর না কেন, তাঁহার কার্য্য তিনি করাইতেছেন,—এই মনে করিয়া ফলের আশা পরিত্যাগ কর, তাহা হইলেও তোমার

উপায় হইবে। অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, আবার ধ্যান হইতে কর্ম্ম-ফল-ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মফলত্যাগ অর্থাৎ আসক্তি-নিবৃত্তি হইতেই শান্তি অধিগত হয়।" এইরূপ উপদেশ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রকারান্তরে বুঝাইলেন যে, মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত; সুতরাং বিভিন্ন জনের বিভিন্ন প্রকার পথ নির্দ্দিষ্ট। ব্যাধি যেমন বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত; ভেষজেরও সেইরূপ অন্ত নাই। অভ্যাস—যোগাঙ্গের প্রথম স্তর। এই স্তরে ধীরে ধীরে চিত্তকে বিষয়-নিবহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হয়; একবার অসমর্থ হইলে দ্বিতীয় বারে, দ্বিতীয় বার অসমর্থ হইলে তৃতীয় বারে, এইরূপ পুনঃপুনঃ চেষ্টার ফলে মানুষ চিত্তবৃত্তি-নিরোধে সমর্থ হয়। অভ্যাস—সেই চেষ্টা-বিশেষ। অভ্যাস করিতে করিতে যদি অকৃতকার্য্যও হওয়া যায়, চেষ্টার পর চেষ্টায়ও যদি সফল-কাম হইতে না পারি, তাহাতেও নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই। সে সম্বন্ধেও শ্রীভগবান অভয় দিয়া বলিয়াছেন,—'সৎকর্ম্মকারী ইহজীবনে সিদ্ধি-লাভ না করিলেও, পরজীবনে তাহার দুর্গতি হয় না। এ জীবনে যাঁহারা যোগ-ভ্রষ্ট হন, পরজীবনে তাঁহাদের উচ্চগতি-প্রাপ্তি ঘটে। তদ্দ্বারা উৎকর্ষের পর উৎকর্ষ-লাভে তাঁহারা পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' ফলতঃ, সৎকর্ম্ম সাধনে চিত্ত নিবিষ্ট করার পক্ষে চেষ্টার ত্রুটি না হয়,—ইহাই ভগবানের উপদেশ। তদ্দ্বারা যোগ-মার্গে উপস্থিত হওয়া যায়। যিনিই যোগী, তিনিই জ্ঞানী, আবার যিনিই জ্ঞানী, তিনিই জ্ঞানস্বরূপে আত্মলীন। জল-প্রবাহ যেমন মহাসাগরে মিশিয়া যায়, প্রশ্বাস-বায়ু যেমন আকাশে অনন্ত বায়ু-তরঙ্গে বিলীন হয়, যোগ-যুক্ত জীবন-জল-বুদ্বুদ্ সেইরূপ জ্ঞান-সমুদ্রে ব্রহ্ম-তরঙ্গে বিলীন হইয়া যায়।

জ্ঞান-সমুদ্রই বা কি? আর তাহাতে বিলীন হওয়াই বা কি? রূপকের আবরণ উন্মোচন করিয়া, সরল-সুন্দর সুবোধ্য ভাষায় শ্রীভগবান গীতায় তাহা বুঝাইয়া গিয়াছেন। সাঙ্খ্যগণও চান—জ্ঞান; যোগমার্গাবলম্বিগণও অনুসন্ধান করেন—জ্ঞান। তাই ভগবান বুঝাইয়া দিতেছেন—জ্ঞান কি; আর সে জ্ঞান মানুষের অধিগত হওয়াই বা কি প্রকার! আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিয়াছি,—সদ্‌গুণ-সমষ্টিই জ্ঞান। যিনি সদ্‌গুণাধার, তিনিই জ্ঞানী। জ্ঞানের স্বরূপ-তত্ত্ব আলোচনায় তাহাই উপলব্ধি হয়। জ্ঞানতত্ত্ব-বর্ণন-ব্যপদেশে শ্রীভগবান গীতায় (১৩শ অধ্যায়ে) বলিতেছেন,—

জ্ঞান-সমুদ্র।

"অমানিত্বমদাম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্। আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারাগৃহাদিষু। নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্। এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥"

অর্থাৎ—'শ্লাঘাশূন্যতা, দম্ভপরিহার, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, সদ্‌গুরুসেবা, বাহ্য এবং অভ্যন্তরের শৌচ, স্থিরচিত্ততা, দেহ এবং ইন্দ্রিয় সমূহের সংযম, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ভোগে বিরক্তি, অহঙ্কার ত্যাগ, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখের দোষদর্শন, পুত্রকলত্র-সুহৃদাদির মায়া-পরিবর্জ্জন এবং তাহাতে অহংজ্ঞানের পরিত্যাগ, শুভাশুভ উভয়েই সমবুদ্ধি

সমবুদ্ধি, অনন্যা নিষ্ঠাদ্বারা আমাতে ঐকান্তিকী ভক্তি, নির্জ্জনস্থানে বাস, সাধারণ জনসমাজে যাতায়াত না করা, পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানে একনিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ অর্থাৎ মুক্তির আলোচনা এই সকল জ্ঞানের লক্ষণ, এবং ইহার বিপরীত লক্ষণই অজ্ঞান।' যে জ্ঞান-লাভের জন্য মানুষ সারাজীবন ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছে, অথচ যে জ্ঞানের স্বরূপ-তত্ত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, কয়টি সরল কথায় কেমন সুন্দর ভাবে তাহা বোধগম্য করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। অজ্ঞানের ও জ্ঞানের পার্থক্য কি, ঐ কয়েক পংক্তির মধ্যে তাহা বিশদীকৃত। কোনও একটি বস্তুকে বুঝিতে হইলে, দ্বিবিধ লক্ষণের দ্বারা তাহা বুঝিবার আবশ্যক হয়। সেই দুই লক্ষণের নাম—(১) স্বরূপ-লক্ষণ, (২) তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা বিশেষ কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বুঝায় না, জিনিষটি যাহা, তদ্দ্বারা তাহাই শব্দান্তরে বুঝাইবার চেষ্টা হয়, যেমন কলস ও কুম্ভ, শূন্য ও ফাঁক; এখানে কলস বলিলেও যাহা বুঝাইল, কুম্ভ বলিলে তাহার অধিক কিছু বুঝা গেল না; শূন্য শব্দের প্রতিবাক্যে ফাঁক বলিলেও ঐ একই ভাব মনে আসে। ইহাই হইল—স্বরূপ লক্ষণ। তটস্থ-লক্ষণ বলিতে অন্য বস্তুর সাহায্যে এক বস্তু বুঝাইবার চেষ্টা, যেমন, শূন্য বলিতে যদি বলি—এই প্রাচীরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানই শূন্য,—ইহাই হইল তটস্থ লক্ষণ। ঈশ্বর সম্বন্ধেও দার্শনিকগণ দ্বিবিধ লক্ষণের অবতারণা করেন। তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ-বর্ণন ব্যপদেশে তাঁহারা বলিয়া থাকেন—তিনি সৎ, তিনি চিৎ, তিনি আনন্দ ইত্যাদি। আর তাঁহার তটস্থ লক্ষণ বিষয়ে তাঁহারা বলেন—তিনি স্রষ্টা, তিনি কর্ত্তা, তিনি সংহর্ত্তা। এইরূপ স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণের সমবায়ে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর 'নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরাকার' এবং 'কর্ত্তা ভর্ত্তা বিধাতা' প্রভৃতি বিপরীত বিশেষণে বিশেষিত হইয়া থাকেন। গীতোক্ত জ্ঞানের বিশেষণে বুঝা উচিত, একবিধ বিশেষণে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আর অন্যবিধ বিশেষণে তাঁহার তটস্থ লক্ষণ বিবৃত আছে। বস্তুপক্ষে কোনও ভেদ নাই; বুঝাইবার সুবিধার জন্যই ভেদভাবের অবতারণা করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কেহ কেহ কহেন,—স্রষ্টৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব, পালয়িতৃত্ব প্রভৃতি শক্তিগুলি ব্রহ্মের প্রকৃত গুণ বা লক্ষণ নয়, প্রকৃতির সহিত পুরুষের মিলন-জনিত বিকৃতির ফল মাত্র। সুতরাং ঐ সকল গুণের সহিত ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অন্যপক্ষের মত এই যে,—'কি গুণ, কি ক্রিয়া, কি সাকার, কি নিরাকার, সকলই তিনি—সর্ব্বরূপে তিনিই বিদ্যমান।' এ বিতর্কের মীমাংসা গীতাতেই আছে—সে কেবল অধিকারি-ভেদ। যাহার যেমন বুদ্ধি, যেমন জ্ঞান, তাহার পক্ষে ব্রহ্ম তেমনই ভাবে বিকাশমান। তিনি গুণস্বরূপ, তিনি গুণাতীত, তিনি সকলই; সুতরাং সকল দিক দিয়াই তাঁহাকে অনুসন্ধান করা যায়। পরমব্রহ্মকে যখন জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর জ্ঞানের যখন লক্ষণ-সমূহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবন্মুখে কীর্ত্তিত দেখিলাম, তখন তাহাই অনুধাবন করিবার পক্ষে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। শ্রীভগবানের মতে জ্ঞানের একটি অঙ্গ বা লক্ষণ—অমানিত্ব। মানীর ভাব মানিত্ব, তদ্ভাবের অভাবই অমানিত্ব। সে হিসাবে, অমানিত্ব শব্দের সাধারণ অর্থ—আত্মশ্লাঘারাহিত্য। মানুষ কতদূর জ্ঞানসম্পন্ন ও উন্নত অবস্থায় উপনীত হইলে, তাঁহার

অমানিত্ব-ভাব উপস্থিত হয়, বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি! মান-অপমান, জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্ব লইয়াই সংসার অহর্নিশ কম্পমান। এ সংসারে কয় জন অমানিত্বের অধিকারী? এইরূপ গীতোক্ত এই এক একটি বিশেষণের বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া দেখুন, কোনটিই অল্প আয়াস-সাধ্য নহে। অদাম্ভিত্ব শব্দেই বা কি বুঝায়? কর্ম্ম করিয়া মানুষ আত্ম-যশের কামনা করে; সেই আত্ম-যশের ঘোষণাই দাম্ভিত্ব। পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতিতেও এই দাম্ভিত্ব দেখিতে পাই। সুতরাং জ্ঞান-স্বরূপ যে অদাম্ভিত্ব, তাহা কত উচ্চ স্তরের সম্পৎ,—বুঝা যায় না কি? এইরূপ অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব প্রভৃতি বিংশতাধিক স্বতন্ত্র যে গুণধর্ম্ম বা লক্ষণ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তাহা সাঙ্খ্যের সার—যোগেরও সার। 'জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম'—এই একটি চরণের মধ্যে কত গভীর ভাবের অভিব্যক্তি আছে! যেন জন্ম না হয়, মৃত্যু না হয়, জরা-ব্যাধির অধীন হইতে না হয়; আর যেন, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিবিধ দুঃখের কবল হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিতে পারা যায়,—এই চিন্তা, এই অনুধ্যান, যাঁহার জন্মিয়াছে, তিনি জ্ঞানী নন তো জ্ঞানী আর কে? সাঙ্খ্যের যে আত্ম-জ্ঞান, সে কি এই অবস্থা নহে? যোগের যে সমাধি, সেই বা ইহার অতীত কোন্ অবস্থা? যোগযুক্ত ব্যক্তি যে অবস্থায় যে বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়া আশ্রয়-গ্রহণ করিবেন, তাহার বিষয় ঐ বিংশতি লক্ষণান্তর্গত 'বিবিক্তদেশসেবিত্বং' বাক্যে স্পষ্টীকৃত রহিয়াছে। ফলতঃ, মানুষ ঐ সকল গুণসম্পন্ন হইতে পারিলেই, মোক্ষ-লাভে সমর্থ হইবে। গীতার ইহাই স্থূল উপদেশ; ইহাই সাঙ্খ্যের জ্ঞান—যোগীর যোগসাধন। যোগের আদি-স্তর যে অভ্যাস বলিয়া আমরা কীর্ত্তন করিয়াছি, এই জ্ঞান-গুণ-সম্পন্ন হইতে হইলে, সেই অভ্যাসই যে প্রথম ও প্রধান অবলম্বন হওয়া আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

এক্ষণে মীমাংসা-দর্শনের সহিত গীতার কি সামঞ্জস্য আছে, আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মীমাংসা দর্শন বলিতে প্রধানতঃ পূর্ব্ব-মীমাংসাকেই বুঝাইয়া থাকে। কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড—বেদের দুই বিভাগ। সেই দুই বিভাগের অনুবর্ত্তী দুই দার্শনিক মত প্রচলিত;—(১) পূর্ব্ব-মীমাংসা, (২) উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত। উত্তর মীমাংসা—বেদান্ত বলিয়া সাধারণতঃ পরিচিত। যাঁহারা কর্ম্মবাদী, তাঁহারা প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহারাই মীমাংসক-সম্প্রদায় নামে পরিচিত। আর যাঁহারা জ্ঞান-বাদী, তাঁহারা বৈদান্তিক নামে অভিহিত। মীমাংসকগণ কর্ম্মকাণ্ডকেই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে—যজ্ঞাদিই শ্রেয়ঃসাধক। মীমাংসকগণের উপদেশ—'যজ্ঞানুষ্ঠান কর; স্বর্গলাভ হইবে।' তাঁহাদের মতে, স্বর্গলাভই পরম সুখ। সেখানে অমৃত-পানে চিরসুখী হওয়া যায়। * মীমাংসকগণ যে যজ্ঞের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, গীতাও সেই উপদেশ দিতেছেন। সাঙ্খ্যেরা কর্ম্ম-পরিত্যাগ করিতে বলেন, যেহেতু কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন আসে। কিন্তু, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সে বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

গীতার মীমাংসাদর্শন।

* মীমাংসা-দর্শনের মূল প্রাচীনত্ব বিষয় "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম খণ্ডে 'মীমাংসাদর্শন' প্রসঙ্গে আলোচিত আছে।

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ। অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥"

অর্থাৎ—'যজ্ঞার্থ কর্ম্ম কর, যজ্ঞ বা পরমেশ্বরের আরাধনা ব্যতীত অন্য যে কোনও উদ্দেশ্যেই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা মনুষ্যের সংসার-বন্ধনের হেতুভূত হয়। অতএব হে পার্থ! তুমি কামনা-বিহীন হইয়া, কেবল ঈশ্বর আরাধনার নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাক। পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞ সহকৃত ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণাত্মক প্রজা উৎপাদন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞের অনুসরণক্রমে তোমরা উত্তরোত্তর অতি-বৃদ্ধি লাভ কর; কেন-না, এই যজ্ঞক্রিয়া তোমাদিগের পক্ষে কামধেনুর ন্যায় অভিলষিত ভোগপ্রদ। বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমরা দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট ও সম্মানিত করিলে, তাঁহারাও তোমাদিগের হিতসাধন করিয়া পরিতৃপ্ত করিবেন। এইরূপে পরস্পর সংবর্দ্ধিত করিতে থাকিলে, পরিণামে তোমরা মোক্ষরূপ পরমমঙ্গলের অধিকারী হইবে। যজ্ঞদ্বারা সেবিত ও পরিপুষ্ট দেবগণ, তোমাদিগের বিবিধ বাসনারূপ ভোগ্য পদার্থ প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি সেই দেবদত্ত ভোগ্যবস্তুসমূহ যজ্ঞাদি দ্বারা দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত না করিয়া স্বয়ং উপভোগ করে, সে তস্করতুল্য। যে সাধু পুরুষেরা দেবযজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যে দুর্ব্বৃত্তেরা কেবল আত্মোদর পূরণার্থ ভোজ্য প্রস্তুত করে, তাহারা পাপই ভোজন করে। অন্ন রূপান্তরিত হইয়া প্রাণিসমূহের উদ্ভব করে। সেই অন্ন বৃষ্টি হইতে সমুদ্ভূত, সেই বৃষ্টি যজ্ঞক্রিয়ার পরিণাম-স্বরূপ এবং সেই যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন। ঋত্বিক ও যজমান সাধ্য কর্ম্ম বেদ হইতে সমুৎপন্ন, সেই বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত। সুতরাং সর্ব্বপ্রকাশক অবিনাশী বেদরূপ ব্রহ্ম যজ্ঞ-কর্ম্মে সতত বিরাজমান আছেন। যে ব্যক্তি ইহসংসারে ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত-রূপ জগচ্চক্রের অনুগামী না হয়, হে পার্থ! সে পাপজীবন ভোগাসক্ত বৃথা জীবন-ধারণ করে।" ভগবদুক্তিতে এখানে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যজ্ঞই মোক্ষ-লাভের প্রকৃষ্ট প্রধান পথ।

কিন্তু যজ্ঞ কি? যজ্ঞ কত প্রকার? শ্রীকৃষ্ণ তদ্বিষয় যখন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃত করিতেছেন, তখন সকল দিকের সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। তখন বুঝিতে পারি, কিবা জ্ঞান-কাণ্ডে, কিবা কর্ম্ম-কাণ্ডে, কোথায়ও কোনও পার্থক্য নাই। সাংখ্যের নিঃশ্রেয়স্ বা পতঞ্জলির কৈবল্য বলিতেও যাহা বুঝিয়াছিলাম, যজ্ঞ বলিতেও মূল-পক্ষে তাহাই বুঝিতে পারি। সেই অহঙ্কার-বল-দর্প-কাম-ক্রোধ প্রভৃতিকে বশীভূত করণ, সেই সর্ব্বভূতে চিৎ-স্বরূপের বিকাশ দর্শন, সেই

যজ্ঞের স্বরূপ-তত্ত্ব।

ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্যতা,—মূলে সব একই গিয়া দাঁড়াইতেছে। কেমন ভাবে কি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে (৪র্থ অধ্যায়ে) তাহার পরিচয় দেখুন ;—

'গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে। ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি। শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে। আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে। স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে। প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্। নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ। যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ। মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে। যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ। ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসং ॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণং। শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ। যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং।
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ! নিশ্চিতং মতমুত্তমং॥"

অর্থাৎ—'যে কামনা-বর্জ্জিত, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-বন্ধন-বিনির্ম্মুক্ত, আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ যজ্ঞসংরক্ষণোদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহার তত্ত্ববিৎকর্ম্ম, ফলের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়। স্রুব জুহ্বাদি যজ্ঞীয় পাত্রসমূহে যাঁহার ব্রহ্ম-জ্ঞান, আহুতি প্রদানার্থ ঘৃতাদিতেও যাঁহার ব্রহ্মবোধ, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ যজমান হোমানুষ্ঠান করেন ইহাই যাহার ধারণা, তাদৃশ ব্রহ্মৈকচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মই পাইয়া থাকেন। কোনও কোনও কর্ম্মযোগী উল্লিখিত প্রণালীতে ইন্দ্রাদি দেবোদ্দেশে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া থাকেন, আর কোনও কোনও জ্ঞানযোগী ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, আত্ম-যজ্ঞ সম্পাদন করেন। নিষ্ঠাচারসম্পন্ন যোগিগণ ইন্দ্রিয়সংযমস্বরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়গণকে হবিরূপে প্রক্ষেপ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হন, আর অন্যেরা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-সমূহ প্রক্ষেপ করেন, অর্থাৎ—স্পৃহাহীনতা হেতু বিষয় গ্রহণে বিরত হন। অন্য এক প্রকার যোগিপুরুষেরা ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ উপলব্ধিরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সমুজ্জ্বলিত আত্ম-সংযমরূপ যোগানলে ইন্দ্রিয় ও প্রাণের কর্ম্মসমূহ আহুতি প্রদান করেন। অনেকে দ্রব্যদানাদিরূপ দ্রব্য-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অনেকে যজ্ঞ-জ্ঞানে চান্দ্রায়ণাদি তপের দ্বারা তপোযজ্ঞ সাধন করেন, অনেক যত্নশীল দৃঢ়-ব্রত ব্যক্তি ঋগাদি বেদালোচনাকেই যজ্ঞ-বোধে তদ্দ্বারা স্বাধ্যায়-যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং শাস্ত্রার্থ অবধারণরূপ জ্ঞানকেই যজ্ঞ মনে করিয়া জ্ঞান-যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। কোনও কোনও ব্যক্তি পূরক দ্বারা অপানে প্রাণকে, কেহ কেহ বা রেচক দ্বারা প্রাণে

অপানকে আহুতি দিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা প্রাণ ও অপানের গতি নিরোধ করিয়া প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অপরে মিতাচারী হইয়া প্রাণাদি পঞ্চ-বায়ুতে ইন্দ্রিয় সকল সমর্পণ করেন। যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান তৎপর, যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত ক্ষয়িত-পাপ এবং অমৃতস্বরূপ যজ্ঞাবশেষ ভোজনরত তাঁহারা নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই লাভ করেন। আর যাঁহারা কোনও যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারা যৎসামান্য সুখবিধায়ক এই মনুষ্যলোক হইতে পরিভ্রষ্ট, সুতরাং তাঁহাদের বহুসুখদায়ক পরলোক লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। সেই সকল আসুর ব্যক্তি আপনা-আপনি অহঙ্কৃত অনম্র এবং ধন মান ও মদ সমন্বিত হইয়া কেবল নামমাত্র প্রসিদ্ধির নিমিত্ত দম্ভ-সহকারে বিধিবিবর্জ্জিতভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। এই সকল ব্যক্তি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্বদেহে এবং পরদেহে চিদংশরূপে স্থিত আমাকে দ্বেষ করে, সাধুগণের গুণাবলীতে বিবিধ প্রতারণাদি দোষের উদ্ঘাটন করিয়া থাকে। ফলকামনা বিরহিত পুরুষ নিষ্কাম যজ্ঞই অবশ্যানুষ্ঠেয় এইরূপ স্থির করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ নামে অভিহিত হয়। স্বর্গাদি ফলকামনা সহকারে অথবা কেবল নিজ মহত্ত্বাদি খ্যাপনের নিমিত্ত যে যজ্ঞ সম্পাদন করা হয়, হে ভরতকুলপ্রদীপ! তাহাকেই রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে। শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য, অন্নদান বর্জ্জিত, মন্ত্রবর্জ্জিত দক্ষিণাহীন এবং শ্রদ্ধা-বিরহিত যজ্ঞ, পণ্ডিতগণ তাহাকেই তামস যজ্ঞ বলিয়া থাকেন। যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম-সমূহ কখনই পরিত্যাগ করা উচিত নহে, বরং তাহাদের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মনিচয় ফলকামনা-শূন্য বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব ইহার অনুষ্ঠান অতীব বিধেয়। হে পার্থ! বন্ধনের হেতুভূত হইলেও আসক্তি এবং ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞ-দানাদি কর্ম্মসমূহকে অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই আমার স্থির এবং উৎকৃষ্ট অভিমত জানিবে।' এইরূপে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়া শ্রীভগবান উপসংহারে কহিতেছেন,—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥
যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা। তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোপি মাম্।"

অর্থাৎ—'বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মনিষ্ঠগণ, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমার পূজা করিয়া এবং যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস-পান-জনিত পাপ পরিশূন্য হইয়া, স্বর্গগমন প্রার্থনা করেন; তাঁহারা পুণ্য-ফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গপুরে দিব্য দেবভোগ-সকল উপভোগ করেন। তাঁহারা পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য-ফলে সুবিস্তীর্ণ স্বর্গরাজ্যের সুখ-সমূহ উপভোগ করিয়া, পুণ্যের ক্ষয় হইলে পুনরায় বসুন্ধরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রণালীক্রমে আবার কামনা-পরতন্ত্র হইয়া বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মমার্গের অনুসরণ-ক্রমে বার বার যাতায়াত করিতে

থাকেন। হে অর্জ্জুন! শ্রদ্ধা-সহকারে ও ভক্তিভাবে যাঁহারা অন্য দেবতার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে পূজা আমারই পূজা বটে, কিন্তু তাহা বিধিবিগর্হিত। যাঁহারা দেবোপাসনা-পরায়ণ, তাঁহারা দেবলোক প্রাপ্ত হন; যাঁহারা শ্রদ্ধাদি-সহকারে পিতৃপূজা-পরায়ণ, তাঁহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন; যাঁহারা ভূতাদির পূজাপরায়ণ, তাঁহারা ভূতলোক প্রাপ্ত হন, এবং যাঁহারা আমার পূজা-পরায়ণ, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' এখানে দুইটী বিষয় বিবেচনা করিবার আছে। এক হিসাবে এটী সাঙ্খ্য-মত; অন্য হিসাবে এটী যজ্ঞানুষ্ঠানের চরম ও পরম উপদেশ। যজ্ঞ দ্বারা কর্ম্মফলে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে গতাগতির প্রসঙ্গ-হেতু ইহা সাঙ্খ্য, আবার কি ভাবে কেমন যজ্ঞ দ্বারা কি ফল লাভ হইবে, তাহা বিশদীকৃত হওয়ায় যজ্ঞানুষ্ঠানের স্তর-পর্য্যায় ইহাতে প্রত্যক্ষীভূত। অথচ, সেই—একই কথা। "যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্"—আমার ভজনাকারী যাঁহারা, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। সেই 'আমি'—সেই 'অহং'—সেই ব্রহ্ম! সকলেরই শেষ সেই—আমি!

বৈশেষিক দর্শন ও ন্যায় দর্শন উভয়ই তত্ত্বজ্ঞান লাভকে নিঃশ্রেয়স্ বা অপবর্গ লাভের উপায় বলিয়া গণ্য করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু দুই সম্প্রদায় দুই দিক দিয়া সে পথ নির্দ্ধারণের প্রয়াস পাইয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের মতে, সাতটি পদার্থের (দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব) সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের তত্ত্বজ্ঞানই নিঃশ্রেয়স। ন্যায় দর্শন মতে, ষোড়শ পদার্থের (প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ-স্থান) তত্ত্বজ্ঞানই অপবর্গলাভের কারণ। * বৈশেষিকের সপ্ত পদার্থ এবং নৈয়ায়িকের ষোড়শ পদার্থ আবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত আছে। সেই সকল বিভাগ-বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলে, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে মোক্ষলাভ ঘটে। অনেকে বলেন,—বৈশেষিক-দর্শনের ও ন্যায়-দর্শনের পরিকল্পিত পন্থার সহিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রদর্শিত পন্থার কোনরূপ ঐক্য নাই। সাধারণতঃ তাহাই মনে হয় বটে; কিন্তু একটু বিশেষভাবে দেখিলে গীতার মধ্যেও ঐ দুই দর্শনের সার তথ্য সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশেষিক-দর্শনের কথা—পরমাণু—অণু, পরমাণু-সৎ, নিত্য, কারণাতীত, পরমাণুর সংহিত হইয়া সৃষ্টি।' গীতার কি এ কথা—এ ভাব নাই? পরমাণু শব্দটী না থাকিতে পারে; কিন্তু পরমাণু বলিতে যাহা উপলব্ধি হয়, তাহা নিশ্চয়ই আছে। যেমন, পরমসুখলাভ বুঝাইবার জন্য সেই অবস্থাকে কেহ মোক্ষ, কেহ নিঃশ্রেয়স্, কেহ অপবর্গ, কেহ মুক্তি, কেহ কৈবল্য সংজ্ঞা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ সংজ্ঞান্তর মাত্র দেখিতে পাই। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।' অর্থাৎ,—অনিত্য বস্তুর বিদ্যমানতা নাই, নিত্য বস্তুর নাশ নাই। বৈশেষিক দর্শনে কণাদেরও এই উক্তি,—'এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তম্' এবং

গীতায় বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনের সার।

* এই সাত পদার্থের বিভাগ ও তাহার সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের পরিচয় এবং ন্যায় দর্শনের ষোড়শ পদার্থের আলোচনা "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম খণ্ডে বৈশেষিকদর্শন ও ন্যায়দর্শন প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

'অনিত্যেঽনিত্যং দ্রব্যানিত্যত্বাৎ।' অর্থাৎ,—নিত্য দ্রব্যের আশ্রয়ে নিত্যত্ব এবং অনিত্যের আশ্রয়ে অনিত্যত্ব। অন্যত্র,—'অনিত্যমনিত্যম্', 'নিত্যং নিত্যম্'। যে দ্রব্যের উৎপত্তি-বিনাশ নাই, সে দ্রব্য কি, আর যে দ্রব্য উৎপত্তি-বিনাশশীল, তাহাই বা কি;—এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে। এ হিসাবে, বৈশেষিকের যে পরমাণু, তাহাকেই পূর্ব্বোক্ত বিশেষণভুক্ত আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আর একটি সূত্র,—"আত্মকর্ম্মসু মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ।' এই বৈশেষিক-সূত্রে গীতোক্ত সকল সিদ্ধান্তেরই সার্থকতা দেখিতে পাই। ঐ সূত্রের অর্থ—আত্মকর্ম্ম হইতে মোক্ষ হয়। কিন্তু আত্মকর্ম্ম কি, আর কিরূপেই বা সেই আত্ম কর্ম্ম সাধিত হয়? সূত্রের ব্যাখ্যায় তাহা বিশদীকৃত দেখুন। আত্মকর্ম্ম অর্থে—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি। 'শাস্ত্রোক্ত আত্মা কি, তাহা শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়ার নাম—শ্রবণ। বিচার দ্বারা শ্রুত বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে হয়; এই বিচারই অনুমানের উদ্ভাবক, এই অনুমান হইতে অনুমিতি হয়, সেই প্রমাণ জন্য অনুমিতি শ্রুতবিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনে সক্ষম, এই দৃঢ়তা সম্পাদন হেতু অনুমিতিই মনন। তৎপরে নিদিধ্যাসন অর্থাৎ সমাধি। এই সমাধি অভ্যস্ত হইলে, আত্মসাক্ষাৎকার হয়; তখন, দেহাদির প্রতি অহং-জ্ঞান থাকে না। তখন দেহে অহংজ্ঞানমূলক যে সুখাদির প্রতি ইচ্ছা ও দুঃখাদির প্রতি বিদ্বেষ, তাহা আর হয় না। সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম আর উৎপন্ন হয় না, পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মও দেহের অহংজ্ঞানের অভাবের সঙ্গে ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় বিফল হইয়া পড়ে। সুতরাং নূতন ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুৎপত্তি এবং পুরাতন ধর্ম্মাধর্ম্মের অকর্ম্মণ্যতা হেতু জন্ম হয় না, জন্ম না হওয়ায় মন ও শরীর সম্বন্ধের অভাব, দুঃখও হয় না। এই চরম দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি বা মোক্ষ। মোক্ষের উপযোগী বলিয়া দ্রব্যাদি-পদার্থ-জ্ঞান প্রথম প্রয়োজনীয়!" * শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এ ভাব কোথায় নাই? মোক্ষ-লাভের জন্য যে যে বিধি গীতায় বিহিত দেখিতে পাই, এতন্মধ্যে তাহার সকল বিধিই বিদ্যমান। বৈশেষিক দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে † সুতরাং বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়েরই সার্থকতা পরিদৃশ্যমান। বৈশেষিক-দর্শনে অণু-পরমাণু প্রভৃতি পদার্থ-তত্ত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া অনেকে উহার মধ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া পান নাই। কিন্তু বাস্তবপক্ষে বৈশেষিক-দর্শনে যখন অদৃষ্ট-তত্ত্ব ও কর্ম্ম-তত্ত্ব, যাগ-যজ্ঞ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় আলোচিত আছে; তখন উহাকে কোনও ক্রমেই নিরীশ্বর-দর্শন বলা যাইতে পারে না। আরও, গীতায় যাহা আছে, তাহার সার কথা—"দৃষ্টানাং দৃষ্টপ্রয়োজনানাং দৃষ্টাভাবে প্রয়োগোঽভ্যুদয়ায়" এই বৈশেষিক সূত্রটির মধ্যেই গ্রথিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। 'যে সকল কর্ম্ম শাস্ত্র-দৃষ্ট এবং যাহাদের প্রয়োজন শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে,—তাহার দৃষ্টফল না থাকিলে অভ্যুদয়ের জন্য অনুষ্ঠান হয়'—এতদর্থেই বা কি বুঝিতে পারি? 'বেদ—প্রমাণ, বেদোক্ত কর্ম্ম—কর্ত্তব্য; সেই কর্ম্মজনিত ধর্ম্ম-প্রভাবে স্বর্গ হয়, বিশেষ ধর্ম্মপ্রভাবে দ্রব্যগুণাদি পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান হয়, তৎফলে মিথ্যা-জ্ঞান নিবৃত্তি হইলে মুক্তিলাভ হয়।' বৈশেষিক-দর্শনের আলোচনায়

* বঙ্গবাসী সংস্করণ 'বৈশেষিক-দর্শন', তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ব্যাখ্যা।

† 'তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যমিতি', 'বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্বেদে' ইত্যাদি।

পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বৈশেষিক দর্শনের সহিত গীতার যে সম্বন্ধ সম্যক পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। বৈশেষিক-দর্শনের অঙ্গীভূত পরমাণু বাদ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়োক্ত আত্মার বিশেষণেই বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হয়। এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বৈশেষিক-দর্শনে পরমাণুর যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত আত্মার বিশেষণও সেখানে সেইরূপ প্রযুক্ত দেখিতে পাই। পরমাণু যেমন অবিভাজ্য নিত্য সনাতন, এখানে আত্মাও তাহাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যথা,—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ। অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥"

এই অংশে যে পরমাণু-বাদের প্রসঙ্গ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির ভাষ্যে তাহা অনুভূত হয়। যাহা সৎ, যাহা অপরিবর্ত্তনীয়, যাহা অবিভাজ্য, আর যাহার সংযোগ-সম্ভূত বা বিকারে এই পরিদৃশ্যমান অনিত্য সংসার, সেই সদ্বস্তু ও তাহার বিকারের বিষয় বোধগম্য করাইবার জন্য ঘট পট অট্টালিকা ও তাহাদের উপাদানাদির দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হয়। যে সামগ্রীর অস্থিরভাব বটে, তাহাই অসৎ, আর যাহা নিত্য-বিদ্যমান তাহাই সৎ। ঘট—অসৎ পদার্থ, যেহেতু, মৃত্তিকার সমাবেশে উহা সমুৎপন্ন, উহার পরিণতিও মৃত্তিকা। এইরূপে স্থূল দৃষ্টিতে মৃত্তিকা সৎ ও ঘট অসৎ প্রতিপন্ন হয়। আর একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে, মৃত্তিকাও অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, সে হিসাবে মৃত্তিকার উপাদানভূত পরমাণুই সৎ। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরমাণুর যে পরমাণু—যাহা অবিভাজ্য অচ্ছেদ্য, তাহাই শেষ গিয়া দাঁড়ায়। এইখানে একটা বিতণ্ডার কথা উঠিয়া থাকে। পরমাণুর যে সংযোগবশতঃ এই পরিদৃশ্যমান জগদবয়বভূত দ্রব্যাদি দৃষ্টিগোচর হয়, সে সংযোগ কি প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে? নাস্তিকামতাবলম্বিগণ বলেন,—'সংযোগ-বিয়োগ আপনা-আপনিই সাধিত হইয়া থাকে।' আস্তিক্যগণের মত এই যে—'তাহাদের সংযোগ-কর্ত্তা এক জন আছেন, তিনিই ঈশ্বর বা পরমেশ্বর।' বৈশেষিকদর্শনকে যাঁহারা নাস্তিক্য-দর্শন বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা পরমাণু সংযোগ বিষয়ে প্রথমোক্ত মতেরই অনুসরণকারী। কিন্তু বলা বাহুল্য, সে মত বেদমার্গানুসারী বৈশেষিক-দর্শনের মত নহে, সে মত ডেমক্রেটাস্, এপিকিউরাস্, ডাল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পরমাণু-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমব্রহ্মকে মূলাধাররূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্যই দর্শন-সমুদ্র মন্থন করা হইয়াছে, আর তাই কেহ কেহ উহাতে বৈশেষিক-দর্শনের তত্ত্ব-কথার আভাষ প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু গীতায় পরমব্রহ্মের যে নামরূপ ও বিশেষণাদির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্বিষয় অনুধাবন করিলে—পরমাণুতত্ত্বের প্রসঙ্গও যে তন্মধ্যে নিহিত আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।†

---

* ডেমক্রেটাস, এপিকিউরাস, ডাল্টন প্রভৃতির মতের আলোচনা 'পৃথিবীর ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

† গীতোক্ত পরমব্রহ্মের নামরূপের ও বিশেষণাদির পরিচয় গীতায় ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্রান্ত পরবর্ত্তী আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ন্যায়দর্শনের আলোচনা কি ভাবে আছে, দেখা যাউক। ন্যায়-দর্শনেরও প্রতিপাদ্য—তত্ত্ব-জ্ঞান। কি প্রকারে সে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইতে পারে? প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের জ্ঞানেই সেই তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ—ন্যায়-মতে প্রমাণ এই চতুর্ব্বিধ। প্রমাণের যাহা বিষয়, তাহাই প্রমেয়। আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ—এই দ্বাদশটি প্রমাণের বিষয়। ন্যায়-দর্শন প্রমাণাদির দ্বারা বুঝাইতেছেন—সেই দ্বাদশ প্রমেয়ের স্বরূপ-তত্ত্ব কি? এজন্য, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান প্রভৃতি কত জ্ঞানেরই আবশ্যক হয়। ন্যায়-দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য—'আত্মা দেহাতিরিক্ত এবং দেহ হইতে স্বতন্ত্র।' এই তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের হেতুভূত। সমাধি-বিশেষের অভ্যাসে তত্ত্বজ্ঞান এবং যম-নিয়মাদির দ্বারা সেই তত্ত্ব-জ্ঞানই লাভ হয়।[২] নৈয়ায়িকগণ অদৃষ্ট বা পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্ম স্বীকার করেন। পুরুষের কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট যে ঈশ্বরাধীন, "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ",—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। অতএব, গীতায় যে ন্যায়-দর্শনের তত্ত্ব নিহিত নাই, তাহাই বা কি প্রকারে বলিতে পারি? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ঈশ্বর তত্ত্ব আলোচনা করিলে, নৈয়ায়িকগণের ঈশ্বর এবং আত্মা প্রভৃতির সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাইতে পারে। এখানে একটি প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। সাংখ্য-মত, পাতঞ্জল-মত, মীমাংসা-মত এবং বেদান্ত-মত গীতায় যেরূপ বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে, ন্যায়মত ও বৈশেষিক-মত সে ভাবে আলোচিত হয় নাই; এমন কি, প্রথমোক্ত মতচতুষ্টয়ের তুলনায় শেষোক্ত মতদ্বয়ের অস্তিত্বই গীতায় অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, প্রথমোক্ত মত-চতুষ্টয়ের সঙ্গে, শেষোক্ত মতদ্বয়ের পার্থক্য অতি সামান্য। এক হিসাবে এই দুই দর্শনই সাংখ্য-দর্শনের অনুসারী। সাংখ্য প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানে নিঃশ্রেয়স্ আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ন্যায়দর্শন ষোড়শ পদার্থের জ্ঞানে এবং বৈশেষিক-দর্শন সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য জনিত জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞানলাভের পথ বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তিন মতের মধ্যেই প্রকারান্তরে সেই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, জল, বায়ু, আকাশ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির আলোচনা আছে। সেই আত্মার, পরমাণুর, মনের বা বিশেষ পদার্থের অনুসরণে ত্রিবিধ দর্শনই প্রকারান্তরে বিনিযুক্ত রহিয়াছে। অনুসন্ধেয় সামগ্রী প্রায় সর্ব্বত্রই অভিন্ন, কচিৎ কোথাও কিছু কমী-বেশী আছে। বৈশেষিকগণ একটি বিশেষ পদার্থের অনুসন্ধান করেন, নৈয়ায়িকগণ সে ক্ষেত্রে দেহাতিরিক্ত আত্মার অন্বেষণে ধাবমান আছেন। সাংখ্য সন্ধান করিয়া থাকেন,—পুরুষ ও প্রকৃতি। বিতণ্ডা—সংজ্ঞা বা নাম লইয়া; বস্তুপক্ষে পার্থক্য অতি সামান্যই পরিদৃষ্ট হয়। নির্ঝরিণী বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গিরি-কন্দরে উৎপন্ন হয়; বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জনপদ অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন মুখে ধাবমান হয়, কিন্তু সকলের সম্মিলন-স্থান—সেই মহাসাগর। দার্শনিকগণও যিনিই যে পথে অগ্রসর হউন; শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন—সকলেরই মিলন-স্থান—সেই পরাৎপর পরমব্রহ্ম।

গীতায় ন্যায় দর্শন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বেদান্ত দর্শন দর্শন করিলে—গীতোক্ত 'অহং' 'আমি' তত্ত্ব অধিগত হইলে—শ্রীকৃষ্ণ কেমনভাবে সর্ব্ব দর্শনের সামঞ্জস্য-সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্যক্‌রূপে বোধগম্য হইতে পারে। বেদান্ত দর্শন জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার। যিনি যে দিক দিয়াই অগ্রসর হইবেন, বেদান্ত দর্শনের জ্ঞানালোকে সকল দিকের সকল পথই উদ্ভাসিত দেখিতে পাইবেন। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ—পরস্পর বিরুদ্ধ দুই বাদের এবং তাহাদের শাখা-উপশাখা প্রভৃতির উৎপত্তি-মূলে ও ঐক্য-স্থাপনে বেদান্ত দর্শনের প্রভাব অসাধারণ। বেদান্তের অনুসন্ধান—ব্রহ্ম। তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ে সেই ব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রহ্মের সন্ধান পাইলেই, সংসার-পারাবার হইতে উদ্ধার-লাভ হইতে পারে। বেদান্ত বলে সেই যে ব্রহ্ম, কিরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ে অধিগত হইতে পারে, বেদান্ত সূত্রে তাহারই বিচার হইয়াছে। সেই বিচারের যে মতান্তর, তাহাই অদ্বৈত বাদ এবং দ্বৈতবাদান্তর্গত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধ দ্বৈত-বাদ প্রভৃতি। একই সূত্রের দ্বিবিধ অর্থের অবতারণায় অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতদ্বয় প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের মত এই যে,—"সকলই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুরই সত্তা নাই। জীবই ব্রহ্ম; ব্রহ্মাস্মি।" এ মতে, ব্রহ্ম ভিন্ন যে অন্য কিছু দেখ, সে মায়া, সে অবিদ্যা—সে তোমার ভ্রান্তি! এ মতে, ব্রহ্মে ও জীবে মধ্যে উপাস্য উপাসকের কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু দ্বৈতবাদিগণের মত সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ, তাঁহারা প্রমাণ করেন, 'জীব ও ব্রহ্ম বিভিন্ন, ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক।' * শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ ভাষ্যকারগণ অদ্বৈত মতের এবং রামানুজাচার্য্য প্রমুখ ভাষ্যকারগণ বিশিষ্টাদ্বৈতমতের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কোনও দিকের কোনও যুক্তিই উপেক্ষণীয় নহে। অনন্ত মহা-সমুদ্রে অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে বিভ্রান্ত তরণীকে দুই দিকের দুই আলোক-বর্ত্তিকা পথ দেখাইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন্ পথে অগ্রসর হইলে, কত দূরে আশ্রয়-স্থান মিলিবে, সে আশ্রয়-স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইবার পক্ষে কতটুকু শক্তি-সামর্থ্য আছে, তাহা বুঝিয়া সেই বিভিন্নমুখী আলোক-বর্ত্তিকার একটীর অনুসরণ কর, বেদান্ত-সূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় তাহাই যেন উপদেশ দিতেছে। এ ভিন্ন, এমন জটিল সে বেদান্ত-তত্ত্ব যে, উহার একবিধ ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করিয়া অন্যবিধ ব্যাখ্যার পশ্চাতে অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করিলে বিভ্রমগ্রস্ত সুতরাং বিপন্ন হইতে হয়। তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হইলেই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য পথ পরিদৃষ্ট হয়। পথ কতদূর জটিল, কতদূর বিপরীত-গতিবিশিষ্ট, অদ্বৈতবাদি-গণের ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের বিচার-বিতর্ক অনুধাবন করিলে, তাহা কতকটা উপলব্ধি হইতে পারে। দুই বিপরীত দিকে যে দুই আলোক-বর্ত্তিকার বিষয় উল্লেখ করিলাম, আর সেই দুই ভাব হইতেই যে দুই বিভিন্ন মতের প্রবর্ত্তনার বিষয় বুঝিতে পারি, সে দুই দিকের দ্বিবিধ আলোকের বা দ্বিবিধ ভাবের প্রেরণা কোথা হইতে আসিল, একটু অনুসন্ধান করিলেই সকল সংশয় দূরীভূত হয়। শ্রুতিতে ব্রহ্মের বা আত্মার দুইরূপ লক্ষণ—দুইরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ—প্রণিধান করাইবার

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বেদান্ত-দর্শন।

---

* "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ডে বেদান্ত-দর্শন প্রসঙ্গে এতদ্বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

উদ্দেশ্যে লক্ষণ দুইটির পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি; সে লক্ষণ দ্বারা কেহ তাঁহাকে সৎ চিৎ আনন্দ প্রভৃতি সংজ্ঞায় এবং কেহ তাঁহাকে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ইত্যভিধায়ে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। সেখানে যেমন তিনি দুই বিপরীত বিশেষণে বিশেষিত ব্রহ্মের ভাব সম্বন্ধেও তদ্রূপ দ্বিবিধ শ্রুতি দৃষ্ট হয়। একবিধ শ্রুতি—'নির্ব্বিশেষ নির্গুণ' এবং অন্যবিধ শ্রুতি—'সবিশেষ সগুণ'। তাঁহার বিশেষণে যেখানে বলা হইয়াছে—তিনি অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অরস অক্ষয়; যেখানে বলা হইয়াছে—তিনি অদৃশ্য অগ্রাহ্য অগোত্র অবর্ণ; যেখানে বলা হইয়াছে—তাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই; সেই সেই স্থলে তাঁহার নির্ব্বিশেষ নির্গুণ লক্ষণ মাত্র বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু আবার যেস্থলে তাঁহাকে অণু হইতে অণু, মহৎ হইতে মহৎ, চেতনের চেতন, প্রভুর প্রভু, ঈশ্বরের ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, সেখানে তাঁহার 'সবিশেষ সগুণ ভাব' বিবৃত রহিয়াছে। শ্রুতির একই উক্তির মধ্যে নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ভাবের ও সবিশেষ সগুণ ভাবের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই। দুই-একটি দৃষ্টান্ত; যথা,—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ *
অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ *
যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যম্।
বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥
যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ †
নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্
অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং।
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ॥
সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ।
পাদা অকার উকারো মকার ইতি॥ ‡
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥" **

উপনিষদের প্রায় সর্ব্বত্রই এই প্রকার সবিশেষ সগুণ ও নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ভাব ওতঃপ্রোত বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাই। উপরি-উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি,—'তিনি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বিহীন, অনিত্য অথচ অব্যয়; অপিচ, অনাদি অনন্ত অহত অর্থাৎ নিত্য সত্য পর। আর যিনি তাঁহাকে জানিতে পারেন, তিনিই মুক্তি-লাভে সমর্থ হন।' আবার, 'তিনি অশরীর, অথচ সর্ব্বব্যাপক। তিনি

* কঠোপনিষৎ, ৩।১৫; ঐ ২।২২; † মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।৬-৭; ‡ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, ৭-৮; ** শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।১৬-১৯;

মহৎ, বিভু এবং তাঁহাকে মনন করিলে, মানুষ মোক্ষ লাভ করে।' আরও, 'তিনি অদৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন, তাঁহার গোত্র-সম্বন্ধ নাই। তিনি স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিরহিত, তিনি চক্ষুকর্ণহস্তপদরহিত; অথচ, তিনি নিত্য, ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত প্রাণিসমূহের অধিষ্ঠাতা, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, অতি সূক্ষ্ম, পরিমাণ বিহীন, সর্ব্বভূতের উৎপত্তিস্থান, এবং যিনি তাঁহাকে জানিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। উর্ণনাভ যেমন আপনার শরীর হইতেই তন্তু-সমূহ বাহির করিয়া বহির্দ্দেশে বিস্তৃত করে এবং পুনঃরায় তৎসমুদায়কে স্বশরীরে সংহৃত করে; পৃথিবী যেমন ওষধি প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া তৎসমুদায় পুনরায় রূপান্তরে আত্মসাৎ করে; পুরুষ হইতে যেমন কেশলোমাদি-সমূহ সম্ভূত হয়, সেই প্রকার অক্ষর পরমব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে।' এইরূপ তাঁহার বিশেষণে আরও বলা হয়—'তাঁহার প্রজ্ঞা বহির্ম্মুখ অন্তর্ম্মুখ বা উভয়মুখ নহে, তিনি প্রজ্ঞানঘন প্রজ্ঞ বা অপ্রজ্ঞ নহেন; তিনি দর্শনের ব্যবহারের গ্রহণের লক্ষণের চিন্তার নির্দ্দেশের সকলেরই অতীত; অথচ আত্মপ্রত্যাশার প্রপঞ্চাতীত শান্ত শিব অদ্বৈত; এবং যে তাঁহাকে মনন করে, সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। সেই আত্মা অকার উকার মকার ইতি সংযোগান্ত ওঙ্কারস্বরূপ।' অধিক বিবৃতির আবশ্যক নাই। ফলতঃ, ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ও সবিশেষ সগুণ ভাবদ্বয় হইতেই, যথাক্রমে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতদ্বয়ের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে বলিতে হয়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রথমোক্ত মতের পরিপোষক, আর শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য শেষোক্ত মতের পুষ্টিসাধক। ইঁহাদের দুই মতে দুই দিক দিয়া বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা চলিয়াছে। অদ্বৈতবাদীর মতে—মুক্ত হন তিনি, যিনি ব্রহ্মকে জানেন—যিনি ব্রহ্মের সহিত সাম্যলাভে সমর্থ হইয়াছেন। সোঽহং ব্রহ্মাস্মি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞানই, অদ্বৈত মতে তত্ত্বজ্ঞান; তাহাই মুক্তি। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদিগণের মুক্তি অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন,—"ব্রহ্ম ও জীব স্বতন্ত্র; জীব উপাসনা-প্রভাবে ব্রহ্মের সমান গুণ প্রাপ্ত হন বটে; কিন্তু ব্রহ্মত্ব লাভ করেন না। জীব মুক্ত হইলে, সর্ব্ববিষয় দর্শনের এবং সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন বটে; কিন্তু জগৎ ব্যাপারে তাঁহার কোনই অধিকার থাকে না। বেদান্ত-সূত্রে আছে,—জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বং।' এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ ঘোষণা করেন,—'শ্রুতি-সকলের প্রকরণ ও অর্থের বিচার করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, নিখিল-চিদচিৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার কেবল ব্রহ্মেরই কার্য্য; ঐ কার্য্য ব্যতীত অন্যান্য সকল কার্য্যেই মুক্ত-জীবের সামর্থ্য আছে। যতো বা ইমানি ভূতানি,'—এই বাক্যের প্রকরণ দৃষ্টি করিলে, উহা ব্রহ্ম পক্ষেই বুঝা যাইবে। অনেক যত্ন করিলেও ঐ সকল শ্রুতিকে কোনক্রমেই জীবপক্ষে সঙ্গত করা যায় না। কারণ, জীবসম্বন্ধীয় কোনও কথাই উহার সন্নিধানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অন্যথা—'জন্মাদস্যযতঃ' ইত্যাদি ব্রহ্ম-লক্ষণ-বাক্য কথিত হইত না। জীবের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইলে অনেকেশ্বরতারূপ অনিষ্টপাত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অতএব মুক্তজীবে জগদ্ব্যাপারিত্ব অস্বীকার্য্য।' মুক্তপুরুষগণ সর্ব্ব-বিধ বিকারের অতীত হন বটে; কিন্তু ব্রহ্ম হইতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বেদান্ত-মত সর্ব্বতোভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। উপসংহারে তিনি আপন সার-সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। গীতায় কি ভাবে বেদান্ত-দর্শনের আলোচনা হইয়াছে, আর শ্রীকৃষ্ণ কিরূপভাবে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে গীতোক্ত ব্রহ্ম-তত্ত্ব বুঝিবার প্রয়োজন হয়। তার পর, জীব তত্ত্ব, অবিদ্যা, অসৎ বা মায়ার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার আবশ্যক হয়। সুতরাং গীতায় বেদান্ত দর্শন বুঝিবার পূর্ব্বে আমরা প্রথমে ঐ সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথম—ব্রহ্ম। সাধারণ দৃষ্টিতে গীতায় ব্রহ্মবাচক দশাধিক সংজ্ঞার প্রাপ্তি লক্ষ্য পড়ে,—(১) ব্রহ্ম, (২) পুরুষ, (৩) ক্ষেত্রজ্ঞ, বা ক্ষেত্রী, (৪) আত্মা, (৫) ওঁ, (৬) তৎ, (৭) সৎ, (৮) ঈশ্বর বা পরমেশ্বর (৯) কর্ত্তা, (১০) অহং। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, ঐ সংজ্ঞা-দশকের মধ্যেও নানা বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানিগণ সে বিরোধ মীমাংসা করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শনে সমর্থ। কিরূপ বিরোধ, আর কিরূপভাবে তাহার মীমাংসা হয়, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মবাচক কি কি শব্দ কি কি অর্থে কিরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা যাউক। প্রথম—'ব্রহ্ম' শব্দ। গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে সাতটী অধ্যায়ে একবিংশত্যধিক শ্লোকে 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাতে ব্রহ্মের যে স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্দ্বারা মনে কতই বিভিন্ন বিপরীত ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ব্রহ্ম কিংস্বরূপ? গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন,—

গীতায় ব্রহ্ম-তত্ত্ব।

(১) জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে। অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্। অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৩।১২—১৭।

অন্যত্র,—(২) ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ। প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে। কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ১৭।২৩—২৭।

অপরঞ্চ—(৩) মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ। তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ১৪।৩—৪।
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ১৪।২৬—২৭।

অন্যত্র—(৪) ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে। ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ৪।২৪—২৫॥

অপিচ,—সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৫।৬।
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ৫।১০।
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্। স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥

বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্। স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ৫। ১৯—২১।
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি।
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ। ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্। অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্। ৫।২৪—২৬।

অপিচ—(৬) সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে। সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠাজ্ঞানস্য যা পরা॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ। ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্। ১৮।৫০—৫৪।

অন্যত্র—(৭) পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১১।১৫॥ ইত্যাদি।

গীতার যে সাতটি অধ্যায়ে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ দেখিলাম, সাধারণ দৃষ্টিতে উহা বিপরীত ভাবদ্যোতক বলিয়া মনে হয়। প্রথম বলা হইয়াছে, 'সেই পরমব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন, অথচ, সেই পরমব্রহ্মের হস্তপদ সর্ব্বত্র প্রসারিত, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক বিদ্যমান; তাঁহার শ্রবণ সকল স্থানে শ্রুতি-শক্তি-সম্পন্ন এবং তিনি বিশ্বের সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন।' ঐ সূত্রে আরও বলা হইয়াছে—'সেই পরমাত্মা ইন্দ্রিয়সমূহের গুণের অবভাসক অথচ তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিহীন; তিনি নির্লিপ্ত অথচ সকলের আধার-স্বরূপ; তিনি নির্গুণ, অথচ গুণসমূহের ভোক্তা।' আরও বলা হইয়াছে—'তিনি ভূতগণের বাহিরে এবং অন্তরে অবস্থিত, আবার তিনি স্থাবর জঙ্গম-রূপ ভূতপুঞ্জ; তিনি অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ রূপাদি-বিহীন-হেতু জ্ঞানের অগোচর; অপিচ তিনি দূরবর্ত্তী অথচ নিকটে অবস্থিত।' আরও,—'তিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতপুঞ্জে অবিভক্ত হইয়াও ভিন্নরূপে প্রতীয়মান; তিনি স্থিতিকালে ভূতবর্গের পালক, প্রলয় কালে সংহারক, এবং সৃষ্টি-কালে উৎপাদক বলিয়া জানিবে। সেই ব্রহ্ম সূর্য্যাদিরও প্রকাশক এবং অজ্ঞান দ্বারা অসংস্পৃষ্ট; তিনি জ্ঞানরূপী, জ্ঞেয় বস্তু, জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্য এবং সকলের হৃদয়ে নিয়ন্তারূপে অবস্থিত।' একই অধ্যায়ে একই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান ব্রহ্মের কি স্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেন, বুঝিয়া দেখুন! সেই যে বলিয়াছি,—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ—ব্রহ্মের দুই লক্ষণ; সেই যে বুঝিয়াছি,—নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ও সবিশেষ সগুণ—ব্রহ্মের দুই ভাব; গীতায় ভগবদুক্তিতেও সেই নির্দ্দেশ। অদ্বৈতবাদী যে চক্ষে ব্রহ্মকে দেখিতে চাহেন, তিনি সেই চক্ষেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন; আবার দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ব্রহ্মের যে স্বরূপ নির্ণয় করেন, তাহাও এখানে পরিস্ফুটীকৃত। ব্রহ্মের পর্য্যায়—ওঁ তৎ সৎ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'ব্রহ্মের ঐ ত্রিবিধ নাম (ওঁ তৎ সৎ) শিষ্টগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। এই নামত্রয় দ্বারাই ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞসমূহ পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল। এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান তপস্যা প্রভৃতি বৈদিক কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ 'তৎ' এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক ফলকামনা পরিহার করিয়া, বিবিধ যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে পার্থ! সৎ শব্দ সদ্ভাবে অর্থাৎ অস্তিত্ব বিষয়ে এবং সাধু

ভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মাঙ্গলিক-কার্য্যে 'সৎ' শব্দ উচ্চারিত হয়। যজ্ঞে তপস্যায় এবং দান কার্য্যে যে একান্ত নিষ্ঠা, তাহা সৎরূপে নির্দ্দিষ্ট এবং ব্রহ্মজ্ঞানানুকূল যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও সৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।' আরও বলা হইতেছে যে, 'ব্রহ্ম আমার যোনি বা গর্ভাধান-স্থান, উহাতে আমি গর্ভ অর্থাৎ জগৎ বিস্তারের কারণ-স্বরূপ চিদাভাস নিক্ষেপ করি, আর তাহা হইতেই নিখিল ভূতগণ উৎপত্তি হয়। যোনিসকলে যে মূর্ত্তি (অর্থাৎ মনুষ্যাদি জগদ্ব্যাপার) উদ্ভূত হয়, মহৎ ব্রহ্ম তাহার মাতৃস্থানীয়া এবং আমি তাহার গর্ভাধানকারী পিতা।' এখানে মহৎব্রহ্ম বা ব্রহ্ম প্রকৃতি-স্থানীয়া এবং আমি—পুরুষ বা কর্ত্তা-স্থানীয়, এইরূপ বুঝা যায়। ইহার পর আবার বলা হইয়াছে,—'যে জন আমার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিমান ও সেবাপরায়ণ, সে ব্যক্তি সকল গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম ভাব অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হন। অপিচ আমি ব্রহ্মের প্রতিমা, অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্ম, আমি নিত্য অমৃতের, সনাতন ধর্ম্মের এবং পরম সুখের প্রতিমা অর্থাৎ আশ্রয়-স্থান।' তবেই বুঝুন,—কি ব্রহ্ম, কি ভাবে উপনীত। এই ব্রহ্মের আর এক পরিচয়—'অর্পণ ব্রহ্ম, হবি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোম ব্রহ্ম। ঈদৃশ কর্ম্মাত্মক ব্রহ্মে ন্যস্তচিত্ত জনও ব্রহ্ম।' এখানে একেবারে 'সোঽহম্' ভাব। ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত যজ্ঞকারীর এই অবস্থা। ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন—আর কোন্ জন? যে জন কর্ম্মযোগযুক্ত, তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যাঁহারা কর্ম্মযোগী, কর্ম্মফলে আসক্তি-ত্যাগ-হেতু, তাঁহাদের কর্ম্মবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াই আছে; যেমন, জলমধ্যে থাকিয়াও পদ্মপত্র জল দ্বারা লিপ্ত হয় না, কর্ম্মযোগিগণ কর্ম্মফল ব্রহ্মে অর্পণ হেতু তদ্রূপ নির্লিপ্ত ভাবাপন্ন। আর, 'যাঁহাদের চিত্ত সাম্যে স্থিত, তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়াও স্বর্গজয়ী, ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন, সুতরাং যাঁহারা নির্দ্দোষ সাম্যভাবাপন্ন, তাঁহারাও ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্ত।' ব্রহ্মভাবাপন্ন বা ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত জন কেমন?—না, তাঁহারা স্থিরবুদ্ধি মোহ-হীন, প্রিয় বা অপ্রিয় কোনও অবস্থায় হৃষ্ট বা বিষণ্ণ নন, বাহ্যেন্দ্রিয়ের আকর্ষণীয় বিষয়সমূহে তাঁহারা অনাসক্তচিত্ত, তাঁহাদের অন্তঃকরণ পরম শান্তিপূর্ণ, সমাধি দ্বারা পরমাত্মার সহিত মিলন জনিত তাঁহারা অক্ষয় সুখপ্রাপ্ত। তাঁহারাই যোগী, তাঁহারাই ব্রহ্ম, তাঁহারাই আত্ম-সম্পন্ন, তাঁহারাই ব্রহ্ম প্রাপ্ত।' উপসংহারে (অষ্টাদশ অধ্যায়ে) ব্রহ্মপ্রাপ্তির পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ব্রহ্মের স্বভাব এবং তদ্ভাব-প্রাপ্তির ব্রহ্মত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সে পথ—সে স্বভাবপ্রাপ্তি কি? সাত্ত্বিকী বুদ্ধি, সাত্ত্বিকী ধৃতি, তদ্দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন, রাগদ্বেষ পরিহার, পবিত্র স্থানে বাস ও পরিমিত আহার, দেহ-মন সংযম-সাধন, অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধ পরিগ্রহ পরিহার, ব্রহ্ম-ধ্যানপরায়ণ, সর্ব্ব বিষয়ে সমত্ব-জ্ঞান, আর 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয়,—ইহাই হইল ব্রহ্মত্ব লাভের লক্ষণ। যাঁহার শোক নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, নিরানন্দ নাই; সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা আছে, আর আমাতে অচঞ্চলা ভক্তি আছে। যাঁহার এই ভাব হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনিই দেখিতেছেন—'সেই ব্রহ্মেই এই বিশ্ব ওতঃপ্রোত বিদ্যমান রহিয়াছে; দেবগণ, প্রাণিগণ, দিব্য ঋষিগণ, বিশ্ব-সংসার সকলই তাঁহাতে অবস্থিত আছে।' ব্রহ্মের ও ব্রহ্মবিদের ইহাই চরম ও পরম অবস্থা।

'ব্রহ্ম' শব্দ গীতায় যে যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; পুরুষ, ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি শব্দ প্রায় সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। গীতার যে কয়েক স্থানে পুরুষ শব্দ ব্রহ্ম-ভাবদ্যোতক, তাহার মধ্যে অষ্টম অধ্যায়ে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, ষোড়শ অধ্যায়ে যে পুরুষ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় বলিয়া মনে করি। অষ্টম অধ্যায়ে 'পুরুষশ্চাধিদৈবতং'—পুরুষকে 'অধিদৈবত' বলা হইয়াছে। অধিদৈবত শব্দের অর্থ—সূর্য্য-অগ্নি-জল-বায়ু-আকাশাদির আশ্রয়-স্বরূপ অধিষ্ঠানভূত চৈতন্যাংশ, ইন্দ্রাদি দেবগণের অধিপতি। শঙ্করাচার্য্য এই 'অধিদৈবত' পুরুষকে, 'আদিত্যান্তর্গত হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বপ্রাণিকরণানামনুগ্রাহক' বলিয়া বিশেষিত করিয়া গিয়াছেন। এই অধ্যায়ে এই পুরুষের আর পরিচয় আছে,—'অভ্যাস যোগদ্বারা একাগ্রচিত্তে সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষকে চিন্তা করিলে, তাঁহাকেই লাভ করা যায়। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম, ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা, মলিন মনোবুদ্ধির অগোচর, প্রকৃতির পর বর্ত্তমান সূর্য্যের ন্যায় স্বপর প্রকাশক।' * আরও, 'সেই পুরুষে ভূতগণ অবস্থিত আছে; তিনি এই সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া আছেন; তিনি কারণ-স্বরূপ ও শ্রেষ্ঠ, মাত্র অনন্যা-ভক্তি দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।' † পুরুষকে প্রায় সকল স্থলেই 'অহং' বা 'আমি' হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে দেখিতে পাই। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরুষ অনাদি ("প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি"), পুরুষ সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব-হেতু ("পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে") অর্থাৎ,—'সুখদুঃখভোগের কারণরূপে উক্ত। সেখানে পুরুষ প্রকৃতিগত হইয়া, প্রকৃতিসম্ভূত সুখদুঃখাদি গুণ-সমূহকে উপভোগ করেন; সেখানে পুরুষ এই দেহে অবস্থিত হইয়াও দেহ হইতে ভিন্ন এবং ইহার সাক্ষী, অনুমোদক, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও সর্ব্বস্বামী পরমাত্মা প্রভৃতি রূপে পরিচিত।' অপিচ, যিনি এই পুরুষকে আর বিকারযুক্ত প্রকৃতিকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই মুক্তি লাভ করেন। ‡ পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষের ত্রিবিধ মূর্ত্তি দেখিতে পাই। এক প্রকার পুরুষ 'ক্ষর', এক প্রকার 'অক্ষর' এবং তৃতীয় প্রকার পুরুষ 'উত্তম'। সেই উত্তম পুরুষকে সেখানে পরমাত্মা ঈশ্বর নির্ব্বিকার ও লোকরক্ষক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সেই পুরুষ বা পুরুষোত্তম যে অহং, তাহাই উক্ত আছে। ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর কর্ত্তা প্রভৃতি শব্দেরও প্রায় ঐ একই রূপ সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকে পূর্ব্বে যাহাকে প্রকৃতি ও পুরুষ বলা হইয়াছে, তাহাকেই আবার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইতেছে; যথা,—"যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভঃ॥" পরে আবার ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্রী নামে অভিহিত দেখি। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান-লাভে যে পরমপদপ্রাপ্তি হয়, তাহাই সিদ্ধান্ত। ঈশ্বর শব্দ যেখানে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেখানে

পুরুষ, ক্ষেত্রজ্ঞ, ঈশ্বর, আত্মা।

* গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ৮-১০ এবং ২১ ২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৯শ—২৪শ শ্লোক ও তাহার অর্থ অনুধাবন করুন।

‡ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে এবং ৩৩শ-৩৪শ শ্লোকে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রী প্রভৃতির পরিচয় দ্রষ্টব্য।

প্রায় সর্ব্বত্রই 'অহং'-ভাবদ্যোতক (ঈশ্বরোঽহমহং ইত্যাদি)। একস্থলে ঈশ্বরের একটু পরিচয় আছে; যথা,—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" অর্থাৎ,—অন্তর্য্যামী ঈশ্বর স্বকীয় মায়া-প্রভাবে যন্ত্রারূঢ় ভূতগণকে পরিভ্রমণ করাইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বতোভাবে এই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে, মুক্তি অধিগত হয়। 'ওঁ তৎ সৎ' শব্দত্রয় যে ব্রহ্মবাচক, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অতঃপর,—কর্ত্তা। গীতায় কর্ত্তার ত্রিবিধ প্রকার-ভেদ কথিত আছে। কর্ত্তা—সাত্ত্বিক, কর্ত্তা—রাজস, কর্ত্তা—তামস। 'মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ। হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ। বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥' এই ত্রিবিধ কর্ত্তার মধ্যে সাত্ত্বিক কর্ত্তাই শ্রেষ্ঠ। তিনি মুক্তসঙ্গ, অর্থাৎ ফলকামনা পরিবর্জ্জিত। তিনি নিরহঙ্কার, তিনি ধৈর্য্য ও উৎসাহশীল, অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞান-সম্পন্ন। কার্য্যের সিদ্ধিতে বা অসিদ্ধিতে তাঁহার হর্ষ-বিষাদ নাই। যিনি রাজস কর্ত্তা—তিনি কামাদি রাগযুক্ত, কর্ম্ম-প্রার্থী, হিংসাপরায়ণ, অশুচি, লাভালাভে হর্ষ-শোকযুক্ত। আর যিনি তামস কর্ত্তা—তিনি অসংযত অবিবেকী অনম্র প্রবঞ্চক অলস শোকস্বভাব ইত্যাদি। মানুষ যেমন সত্ত্বাদি ত্রিবিধ গুণান্বিত, তাহার কর্ত্তাও তদনুরূপ। যে কর্ত্তা সাত্ত্বিক, সেই কর্ত্তাই বিমুক্ত। গীতায় যে বিভিন্ন দার্শনিক মতের সামঞ্জস্য-সাধন হইয়াছে, তাহার মূল তথ্য প্রকৃতি-পুরুষ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব ব্রহ্ম, কর্ত্তা করণ, ওঁতৎসৎ, অহং প্রভৃতি নাম-সংজ্ঞার মধ্যেই যেন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই নাম সংজ্ঞার পরিণতিই অহং, গীতোক্ত 'অহং'-তত্ত্বের আলোচনায় তাহাই উপলব্ধি হয়।

গীতার সার—অহং' 'আমি' তত্ত্ব। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, পুরুষ, কর্ত্তা, আত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ, ওঁতৎসৎ আদি যে কিছু তত্ত্ব গীতায় আলোচিত হইয়াছে, তাহার সকলের সারভূত—অহং বা আমি। গীতার সেই 'অহং আমি' উপলব্ধি করিতে পারিলেই গীতাপাঠ সার্থক হয়,—শ্রীকৃষ্ণের দার্শনিক গবেষণার সামঞ্জস্য-সমাধানও সম্যক অধিগত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ যখনই যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই উপদেশেরই শেষ মীমাংসায় অহং-তত্ত্ব দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি প্রথমেও বলিয়াছেন—'ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া মৎপরায়ণ হও (তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীতমৎপরঃ)'; মধ্যেও বলিয়াছেন,—'সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে অর্পণ কর'; শেষেও বলিয়াছেন—

গীতার সার 'অহং'—'আমি'।

'মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥' অর্থাৎ,—'আমার প্রতি চিত্ত ন্যস্ত কর, আমার ভক্ত ও আমার উপাসক হও, একমাত্র আমাকেই নমস্কার কর, তাহা হইলেই আমাকে পাইবে; হে প্রিয়, এ কথা সত্য—ধ্রুব সত্য। সর্ব্ব ধর্ম্ম (সর্ব্ব কার্য্য) পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমার শরণ লও; আমিই তোমায় সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিব; অনুশোচনার কোনও প্রয়োজন নাই।' এক্ষ

স্থানে নয়; দ্বিতীয় অধ্যায়ে—যেখানে তাঁহার উপদেশ আরম্ভ হইয়াছে, সেখানেও ঐ কথা; আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে—যেখানে উপদেশ শেষ হইয়াছে, সেখানেও ঐ কথা। তৃতীয় অধ্যায়েও সেই; চতুর্থ অধ্যায়েও সেই; পর পর সকল অধ্যায়েই সেই কথা। তৃতীয় অধ্যায়ে, যথা,—'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্ম চেতসা।' চতুর্থ অধ্যায়ে,—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' পঞ্চম অধ্যায়ে, যথা—'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক-মহেশ্বরম্। সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥' ষষ্ঠ অধ্যায়ে,—'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥' সপ্তম অধ্যায়ে,—'ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ। অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু। সাধি ভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ। প্রযাণকালেঽপিচ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥' অষ্টম অধ্যায়ে,—'অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্। যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥' নবম অধ্যায়ে,—'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥' দশম অধ্যায়ে,—'মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥' একাদশ অধ্যায়ে,—'মৎকর্ম্মকৃন্মৎ পরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥' দ্বাদশ অধ্যায়ে,—'ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্ত উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যা-বেশিতচেতসাম্॥ ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥' ত্রয়োদশ অধ্যায়ে,—'মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।' চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে,—'মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান সমতীত্যৈতান ব্রহ্ম-ভূয়ায় কল্পতে॥' পঞ্চদশ অধ্যায়ে, 'যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্। স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥' ষোড়শ অধ্যায়ে,—'তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥' সপ্তদশ অধ্যায়ে,—'কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ। মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চযান্॥' এইরূপে দেখা যায়, গীতার সর্ব্বত্রই তিনি বলিয়াছেন,—'সমুদায় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ কর; যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি; যে জন আমাকে সকল যজ্ঞের, সকল তপস্যার নিলয়-স্থান, সর্ব্বলোকমহেশ্বর ও সর্ব্বভূতের সুহৃৎ বলিয়া জানিতে পারে, সেই মোক্ষ-লাভের অধিকারী হয়; যিনি আমাকে সর্ব্বভূতে দেখিতে পান এবং আমাতে সর্ব্বভূতের আশ্রয় বলিয়া জানেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য নহি, তিনিও আমার দৃষ্টি-বহির্ভূত নহেন; যিনি সর্ব্বভূতে আমাকে অভিন্ন-ভাবে অবস্থিত দেখিয়া আমার ভজনা করেন,

তিনি যে ভাবেই অবস্থিত হউন না কেন, তিনি আমাতেই অবস্থিত হন, হে পার্থ। তুমি একমাত্র আমাতে নিবিষ্ট-চিত্ত ও একমাত্র আমার শরণাপন্ন হইয়া যোগরত হও; তাহা হইলে তুমি সর্বরূপে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, যাঁহারা আমাকে অধিভূত অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত জানেন, আমাতে আসক্তচিত্ত হন, অন্তকালে তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিয়া, যে জন কলেবর পরিত্যাগ করে, সে জন আমারই ভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই, তাদৃশ মদ্ভক্তগণ দুঃখের আলয়স্বরূপ অনিত্য জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং পরমাসিদ্ধি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মলোক হইতেও জীবগণ পুনরায় ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু যে জন আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না, হে কৌন্তেয়। তুমি যে কার্য্যই কর, আহারই কর, হোমই কর, দানই কর, আর তপস্যাই কর, তৎসমস্ত যেন আমাতে সমর্পিত হয়—এমনই ভাবে করিবে, মচ্চিত্ত, মৎসেবক ও মদুপাসক হইয়া আমাকেই নমস্কার কর, মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে একাগ্রচিত্ত হইতে পারিলে, আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, আমার প্রতি যাহাদের চিত্ত ন্যস্ত, যাহারা মদ্গতপ্রাণ, তাহারা আমার কথা কহিয়া— আমার মাহাত্ম্য জনসমাজকে বুঝাইয়া দিয়া, পরমানন্দ পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়, হে পাণ্ডব। আমার প্রীতির জন্য যিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন আমি যাঁহার পরম পুরুষার্থ, যিনি আমার পরম ভক্ত, যিনি পুত্র কলত্রাদিতে আসক্তিশূন্য অথচ সর্ব্বজনে নির্ব্বৈর ভাব, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন, আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, পরম শ্রদ্ধা সহকারে, যাহারা আমার উপাসনা করে, তাহারাই আমার প্রকৃষ্ট উপাসক, যাহারা সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, অনন্যভক্তিসহকারে ধ্যাননিরত যোগযুক্ত হইয়া, আমার উপাসনা করে, হে পার্থ। মদ্গতচিত্ত সেই সকল মহাত্মাদিগকে আমি মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি, অতএব আমাতেই মন অর্পণ কর, আমাতেই বুদ্ধি স্থির রাখ, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই, যে জন আমার ভক্ত, সে জন সকল জ্ঞান লাভ করিয়া, আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, আমাকে যে জন অবিচলিতা ভক্তি দ্বারা উপাসনা করে, সে গুণাতীত হইয়া ব্রহ্ম ভাব (মুক্তি) প্রাপ্ত হয়; অবিচলিত চিত্তে যে জন আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিতে পারে এবং সেইরূপ জানিয়া আমার ভজনায় সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হয়, সে জন সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করে; আর যে ক্রুর-কর্ম্মা নরাধম পাপিষ্ঠ আমার বিদ্বেষী হয়, তাহাকে আমি নিরন্তর আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি, যে অবিবেকী (জন অশাস্ত্রীয় যজ্ঞ তপাদির দ্বারা) অন্তরস্থিত আমাকে এবং বহিঃস্থিত ভূতবর্গকে কষ্ট প্রদান করে, তাহারা আসুর-স্বভাব অর্থাৎ তাহারা চিরকষ্টভাগী হয়।' অহং, আমি বা আমার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গীতায় এমনই পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে ঐ 'অহং' আমি বা আমার স্বরূপ কিছুই ব্যক্ত করা হয় নাই, কিন্তু ঐ 'অহং' আমি বা আমার মধ্যে কর্ম্মকাণ্ড আছে, জ্ঞান কাণ্ড আছে, সুতরাং বেদের সার, উপনিষদের সার, দর্শনের সার—সর্ব্বসারভূত মোক্ষ-তত্ত্ব সর্ব্বতোভাবেই বিবৃত রহিয়াছে।

সে 'আমি'—কোন্ আমি? তিনি যেখানে বলিলেন—'তানি সর্ব্বাণি সংযম্য আসীত মৎপরঃ'; সেখানে 'মৎপরঃ' বলিতে কাহার অনুসরণ বুঝাইতেছে? ইহার পূর্ব্বে গীতায় আর কোথাও 'অহং'-জ্ঞাপক-শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। অপিচ, এখানেও এই 'মৎ' শব্দের কোনও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। সুতরাং সহজ-দৃষ্টিতে এখানে কৃষ্ণগতচিত্ত হইবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু অধিকারী অনধিকারীর আবশ্যক অনুসারে টীকাকার ও ভাষ্যকারগণ এখানে এই 'মৎ' শব্দের নানা অর্থ নিষ্কাষণ করিতে পারেন। পূর্ব্বে জীব বা আত্মার বিষয় উক্ত হইয়াছে। যদিও সেখানে জীব বা 'আত্মা' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু যে বিশেষণে যাঁহাকে বুঝান হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে জীব বা আত্মা বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হয়। আত্মাই বল, আর অন্য যে সংজ্ঞাই প্রদান কর, সেখানে তিনি—অবিনাশী, নিত্য, সৎ, অব্যয়, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত আছেন।* সাঙ্খ্যগণ বলেন, ঐ 'মৎ' শব্দে সেই 'আত্মাকে' বা পুরুষকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে 'মৎপর' শব্দে 'আত্মপর' বা আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন অর্থ সূচিত হইতেছে। বৈদান্তিকগণের ব্যাখ্যা অনুরূপ। যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহাদের ব্যাখ্যায় ঐ বিশেষণগুলি জীব সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। জীবের 'সোঽহং' (আমিই ব্রহ্ম) এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিত ভাব 'মৎপরঃ' শব্দে বুঝাইয়া থাকে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদিগের ব্যাখ্যায় সর্ব্বাত্মা বাসুদেবের প্রতি একাগ্রচিত্ততা প্রতিপন্ন হয়।† দ্বৈতবাদিগণ অধিকতর পরিষ্কার ভাবে বলিয়া থাকেন যে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই সকলের আত্মারূপে অবস্থিত; তৎপ্রতি একান্ত ভক্তি-পরায়ণ হইলে সংসারের সকল বিপদ বিদূরিত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহারা বলেন, শাস্ত্রে আছে—'যাঁহারা বাসুদেবের ভক্ত, তাঁহাদের কখনও অমঙ্গল হয় না। প্রবল বলশালী নৃপতির আশ্রয়-গ্রহণে লোক যেমন দস্যুগণকে দমন করিতে সমর্থ হয়, আর রাজাশ্রিত জন জানিয়া দস্যুগণ যেমন ভয়ে বশীভূত থাকে, সেইরূপ ভগবদাশ্রয় লাভ করিতে পারিলে দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রিয়গণ নিগৃহীত ও বশতাপন্ন হয়। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা উপাসনা দ্বারাই যে ইন্দ্রিয়গণকে দমিত ও বশীভূত করা যায়, এ পক্ষ তাহাই সিদ্ধান্ত করেন। ফলতঃ এক সম্প্রদায় 'মৎপরঃ' শব্দে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, এক সম্প্রদায় 'অহং'ভাবাপন্ন, অন্য সম্প্রদায় আত্ম-সমাধিযুক্ত এবং অন্যান্য সম্প্রদায় কৃষ্ণভক্ত অর্থ নিষ্পন্ন করেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যখন বক্তা, তখন শেষোক্ত অর্থই যে অধিকাংশের অনুমোদিত, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, অন্যান্য অধ্যায়ে তিনি সেই 'আমার' কি পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহার সহিত এই মৎপরতার কি সম্বন্ধ আছে, দেখা যাউক। তৃতীয় অধ্যায়ে, (২২শ—২৪শ শ্লোক) যথা,—

সেই 'অহং'—'আমি' তত্ত্ব।

---

* এই আত্মার বা জীবের পরিচয় গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭শ-২৪শ শ্লোকে পাওয়া যায়।

† শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য—'মৎপরোঽহং বাসুদেবঃ সর্ব্বপ্রত্যগাত্মা পরো যস্য স মৎপরঃ নান্যোঽহং তস্মাদিত্যাসীতেত্যর্থঃ।' নীলকণ্ঠ,—'মৎপরঃ অহমেব সর্ব্বেষাং প্রত্যগাত্মা পরঃ যস্য স মৎপরঃ।' মধুসূদন,—'অহং সর্ব্বাত্মা বাসুদেব এব পর উৎকৃষ্ট উপাদেয়ো যস্য স মৎপরঃ একান্ত ভক্ত ইত্যর্থঃ। তথাচোক্তং, 'ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ' ইতি।'

'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্। সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥'

অর্থাৎ,—'হে পার্থ! এই ত্রিলোকের মধ্যে আমার কিছুই কর্ত্তব্যও নাই; প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্যও নাই; তথাপি আমি কর্ম্মে প্রযুক্ত আছি। হে পার্থ! আমি যদি অনলস হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তবে মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমারই অনুসরণ করিবে। আমি কর্ম্ম না করিলে, আমার অনুসরণে কর্ম্ম না করিয়া, ধর্ম্মলোপবশতঃ তাহারা বিনষ্ট হইবে। আর তাহা হইলে, আমিই বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব এবং আমা হইতেই লোকসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।' এখানে 'আমার' একটু পরিচয় পাওয়া গেল। সে 'আমি' কেমন?—না, নিয়ত কর্ম্মানুরত। কর্ত্তব্য বলিয়া নহে; প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য বলিয়াও নহে; তথাপি কর্ম্ম আমায় করিতেই হইবে। এ প্রসঙ্গে একটি নিগূঢ় উপদেশ পাওয়া যায়। সে উপদেশ,—আমি যেমন কর্ম্ম করি, আমার জন্য নহে,—জীবের জন্য; জীব সেইরূপ নিজের জন্য কর্ম্ম না করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করুক ('ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা')। তাহাতেই তাহার মোক্ষ। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে এই 'আমির' যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এই,—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"

এখানে বলা হইল,—'অর্জ্জুনের অনেক জন্ম; কিন্তু অর্জ্জুন তাহা জানেন না (কারণ অবিদ্যার দ্বারা তিনি আচ্ছন্ন আছেন)। আমারও অনেক জন্ম, অথচ আমি তাহা অবগত আছি (কারণ আমি অবিদ্যাচ্ছন্ন নই)। আমি অজ অর্থাৎ আমার জন্ম নাই; আমি অব্যয় অর্থাৎ আমার বিনাশ নাই; আমি ভূতগণের ঈশ্বর অর্থাৎ আমার কর্ম্ম নাই; কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্ব প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, আমি আবার মায়াবশতঃ জন্মগ্রহণ করি।' ইহার পরেই আবার বলা হইয়াছে, যে জন আসক্তি ভয় ও ক্রোধ শূন্য হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে আশ্রয় করে, সে জন আত্মজ্ঞান-লাভে স্বধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া মৎসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ইহার পর পঞ্চম অধ্যায়ে যজ্ঞ ও তপস্যার কথায় 'আমাকে' যজ্ঞভোক্তা সর্ব্বলোক-মহেশ্বর ও সর্ব্বজীবের উপকারক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে, সর্ব্বভূতে আমার অবস্থান এবং যে আমাকে সর্ব্বভূতে দেখিতে পায়, সেই মুক্তি-লাভ করে,—এইরূপ 'আমার' পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে, 'আমার' যে পরিচয় আছে তাহাতে বলা হইয়াছে,—'ক্ষিত্যপতেজঃমরুৎব্যোম মনোবুদ্ধি অহঙ্কার আমার এই অষ্টবিধা প্রকৃতি; ঐ প্রকৃতি অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্টা, উহা ব্যতীত আমার এক শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি আছে, তাহা জীবভূতা অর্থাৎ চৈতন্যময়ী। সেই চৈতন্যময়ী প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। ঐ দুই প্রকৃতি হইতে ভূতগণ উৎপন্ন; ঐ প্রকৃতির সহিত আমি জগতের উৎপত্তির এবং লয়ের নিদান।' এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আর এক গূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতি সংযুক্ত সুতরাং বিকৃতি-মধ্যস্থিত এই 'আমির' উপরেও যে

আর এক 'আমি আছে, যেন তাহাই তাঁহার লক্ষ্য। এই উপলক্ষেই তিনি বলিতেছেন,—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ। প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥
পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ। জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্। বুদ্ধি বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগাববর্জ্জিতম্। ধর্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥"

অর্থাৎ,—'আমি ভিন্ন সৃষ্টি-সংহারের আর কোনও কারণ নাই; সূত্রে মণিগণের ন্যায় জগৎ আমাতে গ্রথিত রহিয়াছে। আমি জলে রস, চন্দ্র-সূর্য্যে প্রভা, সর্ব্ববেদে প্রণব, আকাশে শব্দ, নরগণের মধ্যে পৌরুষ, পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্ব্বভূতে জীবন এবং তপস্বিগণের তপ; আমাকে সনাতন ও সর্ব্বভূতের বীজ বলিয়া জানিবে; আমি বুদ্ধিমানদিগেব বুদ্ধি ও তেজস্বীদিগের তেজ। আমি বলবানদিগের কাম-রাগ-বিবর্জ্জিত বল এবং ভূতগণের মধ্যে ধর্ম্মের অবিরোধী যে কামনা আছে, তাহাও আমি।' আরও, 'যে কোনও প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আছে, তৎসমস্তই আমা হইতে বিকশিত; অথচ, আমি তাহাদের অধীন নই, কিন্তু তৎসমুদায়ই আমার অধীন। সমগ্র জগৎ ত্রিবিধ গুণময় ভাবে মোহিত থাকায়, মূলতত্ত্ব বুঝিতে পারে না, এবং আমি যে সমস্ত পদার্থের অতীত, উৎপত্তি-বিনাশাদি-রহিত, তাহাও জানিতে পারে না। আমার সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া অতিশয় দুস্তরা। যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয় বা ভজনা করে, তাহারাই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে।' এই বলিয়া 'আমার' পরিচয় দিয়া, কোন্ প্রকার লোক কি ভাবে মায়া-পারাবার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া 'আমাকে' লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহার বিবরণ বিবৃত আছে। পরিশেষে উপসংহারে বলা হইয়াছে,—'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥' অর্থাৎ,—'(কর্ম্মের পর কর্ম্মের দ্বারা) অনেক জন্মের শেষে, জ্ঞানবান হইয়া, এই ব্রহ্মাণ্ডই বাসুদেব এই প্রকার সর্ব্বত্র আত্ম-দৃষ্টিতে আমাকে প্রাপ্ত হয়।' সপ্তম অধ্যায়ে এই যে 'আমার' বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, এখানে ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি-উপলক্ষে নানা বিতর্ক-বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। এখানে সাঙ্খ্য মত, কি মীমাংসকগণের মত, কি বেদান্ত-মত আলোচিত হইয়াছে,—বিতর্ক সেই বিষয়েই উঠিয়া থাকে। ভাষ্যকারগণের মধ্যে যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত, তিনি সেই সম্প্রদায়ের উপযোগী ব্যাখ্যাই করিয়া গিয়াছেন। এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান যখন আপনার অষ্ট-প্রকৃতির পরিচয় দিলেন, তখন সাঙ্খ্য-মত ব্যক্ত হইল বলিয়া বুঝা গেল। এক প্রকৃতি অপরা অর্থাৎ জড়, এবং অন্য প্রকৃতি পরা অর্থাৎ চৈতন্যময়ী; আর তাহাদের মধ্যে 'অহং' বা 'পুরুষ'—উৎপত্তি-সংহার-কর্ত্তা। * আমি ভিন্ন সৃষ্টি-সংহারের কারণান্তর নাই; সূত্রে মণিগণের ন্যায় জগৎ-সংসার আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে। ইহা সাঙ্খ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ ভাবদ্যোতক বটে; তবে এখানে একটা বড় সূক্ষ্ম ভাব মনে

---

* গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, শ্লোকত্রয় অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া দেখুন। যথা,—'ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।' ইত্যাদি।

আসে। প্রকৃতি পুরুষের উপর মিলনকর্ত্তা যে আর একজন আছেন, এই উপমায় আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই নিষ্ক্রিয়; কিন্তু উভয়ের মিলনজনিত সৃষ্টি বা সংসার। অনুধাবন করিয়া দেখুন দেখি, মিলন হয় কি প্রকারে? যাহারা নিষ্ক্রিয় সুতরাং নিশ্চল, একজন তাহাদের মিলন-কর্ত্তা না থাকিলে, তাহাদের মিলন হয় কি প্রকারে? সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, পুরুষের উপর পুরুষোত্তম আর একজন আছেন। এই 'সূত্রেমণিগণাইব' উপমায় তাহার ইঙ্গিত পাই। গীতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাহার চরম স্ফূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। গীতার ভিন্ন ভিন্ন স্থলে এই 'আমার' একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নবম অধ্যায়ে (৪র্থ—৫ম শ্লোকে), যথা,—

(১) "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥"

(২) দশম অধ্যায়ে (২০শ—৪২শ শ্লোক), যথা,—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ। ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্। বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্। সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ। গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনি॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্। ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্। প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্। পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্। মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্। ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন। অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ। অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্। কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমাঃ॥
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্। মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্। জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ। মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্। মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন। ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ। এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥
যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংঽশসম্ভবম্॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।"

রূপকের আবরণে আবৃত থাকায়, পূর্ব্বোক্ত শ্লোক-সমূহের সেই অহং-তত্ত্ব সম্যক হৃদ্‌গম্য না হইলেও, মানুষ এই 'অহং' অর্থের অনুশীলনে বড় একটা উচ্চ শিক্ষা পাইতে পারে, বড় একটা উচ্চ আদর্শ দেখিতে পায়। সকলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে হইবে, আর সেই শ্রেষ্ঠ স্থানই আমি। এখানে সেই পরিচয়ই শ্রীহরি প্রদান করিয়াছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে এ ভাব বিশদীকৃত দেখিতে পাই। সেখানে 'আমার' পরিচয় এইরূপ,—

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্ত পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্ত-কৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল, প্রকৃতি দ্বিবিধা—পরা ও অপরা। এখানে বলা হইল—পুরুষও দ্বিবিধ ;—ক্ষর ও অক্ষর। অধিকন্তু বলা হইল, সকলের উপর আর এক পুরুষ আছেন, তিনি 'উত্তম পুরুষ'। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তিনি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব পরমাত্মা নামে অভিহিত। সুতরাং বুঝিয়া দেখুন, সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় এই জগৎ যে অবস্থিত, তাহার লক্ষ্য কোথায়—কত দূরে—কোন্ 'আমার' প্রতি? 'সূত্রে মণিগণাইব' উপমায় পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ সাঙ্খ্যমতের অনুসরণে পুরুষ-সংযোগে প্রকৃতির বিকৃতি এবং অদ্বৈতবাদিগণ মায়োপহিত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করিলে এখানে মিলনের উপর মিলন-কর্ত্তার ভাবই মনে আসে। এ উদাহরণ—বিকৃতির উদাহরণ নহে। যদি উপমায় বলিতেন—বৃক্ষে যেমন পত্র-পুষ্প-ফল, তাহা হইলে প্রোক্ত অর্থ সূচিত হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু সূত্র ও মণির মিলনকর্ত্তা অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষের কথাই বলা হইয়াছে বুঝিতে হয়। সূত্র স্বতন্ত্র, মণি স্বতন্ত্র, উভয়ই নিষ্ক্রিয়। আমি যদি তাহাদের মিলন করিয়া না দেই, মিলন হইবে কি প্রকারে? সুতরাং ঐ উপমার প্রভাবে সূক্ষ্মদর্শীর লক্ষ্য—সকলের অতীত বিশেষণ-বিরহিত সেই 'আমার' প্রতি আকর্ষণ করিয়াছে। গীতার মূলে সেই 'আমিই' পরিদৃশ্যমান। যখন জ্ঞানীর মধ্যে কোন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, তাহার মীমাংসার আবশ্যক হইল, যখন ভক্তের মধ্যে কোন্ ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাহা নির্দ্দেশ করার প্রয়োজন আসিল, তখন শ্রীভগবান কি কহিলেন? তিনি কহিলেন,—'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥' বলিয়াছি তো, এই শ্লোকের অর্থ লইয়া কতই বিতণ্ডা চলিয়াছে! বৈষ্ণব বলিতেছেন—সেই নন্দনন্দন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গই এখানে উত্থাপিত, সেই যে পীতধড়া মোহনচূড়া বনমালী বংশীধারী, পটে হউক প্রতিমায় হউক, তাঁহারই উপাসনার বিষয় এখানে উপদিষ্ট। দ্বৈতবাদিগণ (বিশিষ্টদ্বৈতবাদিগণ) সেই ব্যাখ্যারই অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির ধ্যান-ধারণায় নিবিষ্ট চিত্ত। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ বাসুদেব শব্দ

সত্ত্বেও অন্যরূপ ব্যাখ্যায় অন্যরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষের প্রমাণ—'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥' অর্থাৎ,—কিরূপ ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হয়,—এই উপদেশ প্রদান কালে শ্রীভগবান যখন বলিলেন,—'অল্পবুদ্ধি লোকেরা আমার অব্যয়, সর্ব্বোত্তম স্বরূপতত্ত্ব জানিতে না পারিয়া মায়াতীত আমাকে ব্যক্তিভাবে (মনুষ্যাদিরূপে) ভজনা করিয়া থাকে', তখন অদ্বৈতবাদিগণ, বিগ্রহ-মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া, প্রতীকোপাসনার বিষয় বিস্মৃত হইয়া, জ্ঞান-স্বরূপ অহং-এর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ, বেদান্তের সর্ব্ববিধ ব্যাখ্যাই যে গীতায় ভগবদ্বাক্যের অন্তর্ভূত হইয়া আছে, ঐ একটী শ্লোকের ব্যাখ্যায়ই তাহা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং গীতার ভগবদুক্তি-সমূহ যিনি যে চক্ষে দেখিবেন, তন্মধ্যে তিনি সেই ভাবই প্রাপ্ত হইবেন। তাই শঙ্করাচার্য্যাদির ভাষ্যে একরূপ অর্থ নির্ণয় করিতেছে; রামানুজাচার্য্যাদির ভাষ্যে অন্যরূপ অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

ব্রহ্মের নাম বিশেষণের সম্বন্ধ সংশ্রবে বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের সহিত গীতার সম্বন্ধ-সংশ্রব সূচিত হয়। 'ব্রহ্ম'বাচক শব্দ-সমূহের গীতায় যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনুসন্ধিৎসুগণ তাহাতেই সকল দর্শনের সার-সম্পৎ দেখিতে পান।

অহ—কর্ত্তা। ব্রহ্ম, পুরুষ, ক্ষেত্রজ্ঞ, অহং প্রভৃতির প্রসঙ্গে সে পরিচয় আমরা সঙ্ক্ষেপে সামান্যমাত্র প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আর একটি নাম-বিশেষণের আলোচনায় ঐ প্রসঙ্গের উপসংহারের চেষ্টা পাইতেছি। সে নাম—কর্ত্তা। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে যে কর্ত্তা যে কেমন কর্ত্তা, তাহা আংশিক বুঝিতে পারিয়াছি। * এক্ষণে সেই কর্ত্তাকে একটু বিশেষরূপে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। বেদান্ত-মতে পাঁচটি কারণ দ্বারা কর্ম্ম-ফল নিষ্পন্ন হয়। সেই পাঁচটি কারণ—(১) অধিষ্ঠান অর্থাৎ শরীর, (২) কর্ত্তা অর্থাৎ উপাধি-লক্ষণ-ভোক্তা—দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদির সহিত অভিন্ন-ভাবাপন্ন আত্মা, (৩) করণ অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ ও মনোবুদ্ধি প্রভৃতি, (৪) বিভিন্নরূপ চেষ্টা, (৫) দৈব অর্থাৎ পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম—অদৃষ্ট—অনুগ্রাহক দেবতাজাত। শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা মানুষ যে কোনও ধর্ম্ম্য বা অধর্ম্ম্য কর্ম্ম করে, সে সকল কর্ম্মেরই এই পাঁচটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন,—'এই কারণপঞ্চক দ্বারা নিষ্পাদ্যমান কার্য্যে যে ব্যক্তি অবিবেকবশতঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ক্রিয়া-গুণবিরহিত চিৎ-স্বরূপ আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, সে দুর্ম্মতি সম্যক দর্শনের অক্ষমতাহেতু কর্ম্ম-ফল-ভোগে বাধ্য হয়। কিন্তু 'আমি এই কর্ম্ম করিলাম'—এ ভাব যাহার নাই, যাহার বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত নহে, সে ব্যক্তি কখনই কর্ম্ম-ফলজনিত বন্ধনে (হনন করিয়াও প্রত্যবায়ভাগী) বদ্ধ হন নাই।' গীতার এই ব্যাখ্যায় 'কর্ত্তার' উপরে এক অচিন্ত্য অব্যক্ত চিৎস্বরূপকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছি, পুরুষ—পর, অপর, উত্তম, পূর্ব্বে যেমন মনে জাগিয়াছে, সূত্রে 'মণি-গণাইব' দৃষ্টান্ত, পুরুষ প্রকৃতি ও তাঁহাদের মিলন কর্ত্তার অব্যক্ত স্মৃতি; এখানেও সেই ভাব—সেই দ্যোতনা। অদ্বৈতবাদী এখানে জীব ও ব্রহ্মে একত্ব দেখিতে পান;

* এই পরিচ্ছেদে ১৮৯ পৃষ্ঠায় কর্ত্তার ত্রিবিধ মূর্ত্তির পরিচয় দেখুন।

দ্বৈতবাদী এখানে সেই একত্বের মধ্যে একটু বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করেন। অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম-সাগরে কর্ত্তা কর্ম্ম করণ অধিষ্ঠান দৈব সব এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে,—তাঁহাদের সকলই ব্রহ্মাস্মি; কিন্তু দ্বৈতবাদিগণ দেখিতেছেন—সেই মহামিলনের মহোদধি-ক্রোড়ে ওঁকার-রূপী নারায়ণ অনন্ত-শয্যায় শায়িত রহিয়াছেন; তাঁহাদের কর্ত্তা ব্রহ্মাংশ বটেন; কিন্তু ব্রহ্ম নহেন। বেদান্ত-বেদ্য ব্রহ্মের বিভূতি যে ঐ 'কর্ত্তার' অঙ্গে দ্যুতিমান, গীতা-পাঠক বা গীতার ব্যাখ্যাকারী সাধারণ্যের দৃষ্টি তৎপ্রতি কচিৎ নিপতিত হইয়াছে, দেখিতে পাই। প্রধানতঃ অনেকেই ঐ কর্ত্তার সহিত যে সেই বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্বরের সম্বন্ধ সূচিত হইতে পারে, তাহা মনেই স্থান দেন না। তাঁহাদের মতে উহা সাধারণ ভাবে মনুষ্যের কর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি,—জ্ঞান জ্ঞেয় পরিজ্ঞাতাও যাহা, করণ কর্ম্ম কর্ত্তাও তাহাই;—'জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা। করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥' এই শ্লোকের অন্তর্গত 'কর্ম্মচোদনা' ও 'কর্ম্মসংগ্রহ' শব্দদ্বয়ের অর্থ লইয়া বিতণ্ডা চলিয়াছে, আর তজ্জন্যই অর্থোৎপত্তি-পক্ষে মতান্তর ঘটিয়া আসিতেছে। কিন্তু মূলতঃ ঐ দুই শব্দের অর্থ অভিন্ন; 'চোদনাসংগ্রহ শব্দয়োরৈক্যার্থঃ।' তাহাতে বুঝিতে পারি,—যাহা করণ, তাহাই জ্ঞান; যাহা কর্ম্ম, তাহাই জ্ঞেয়, যিনি কর্ত্তা, তিনিই জ্ঞাতা। করণ—সাধনভূত দ্রব্যাদি, কর্ম্ম—যাগাদি, কর্ত্তা—অনুষ্ঠাতা; 'করণং সাধনভূতং দ্রব্যাদিকং কর্ম্মযাগাদি কর্ত্তানুষ্ঠাতেতি।' এখানে মীমাংসকগণের যজ্ঞানুষ্ঠান ও তজ্জনিত অপবর্গ-প্রাপ্তির ভাব মনে আসিতে পারে। তার পর, এই কর্ত্তার সহিত বেদান্ত-বেদ্য জীব বা ব্রহ্মের কেমন সম্বন্ধ কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। কর্ত্তা শব্দ অহঙ্কারভাব-জ্ঞাপক; শুদ্ধসত্ত্বচিৎস্বরূপ ব্রহ্মে কর্ত্তৃত্ব বা অহঙ্কার থাকিতে পারে না। এই হেতু-বাদে, এই কর্ত্তার সহিত বেদান্ত-বেদ্য ব্রহ্মের যে কোনও সম্বন্ধ নাই, ইহাই সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু কর্ত্তাও যাহা, জীবও তাহাই নহে কি? পরমপুরুষের পরিচয়ে শ্রুতি (প্রশ্নোপনিষৎ, ৪র্থ। ৯) বলিয়াছেন,—'এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥' পরমব্রহ্ম যে কর্ত্তা দ্রষ্টা বোদ্ধা শ্রোতা স্প্রষ্টা, তাহা বেশ উপলব্ধি হইল। সেই যে বলিয়াছি,—ব্রহ্মের দুই ভাব; এ ভাব তাহারই অন্তর্গত সবিশেষ বা সগুণ ভাব। অতএব বুঝা গেল, কর্ত্তাই জীব, জীবই ব্রহ্ম, এখানে এ ভাব আসিতে পারে। 'জ্ঞোঽত এব' বেদান্ত-সূত্রেও, জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জীব যে জ্ঞাতৃস্বরূপ হন, ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, 'জ্ঞ এবাত্মা জ্ঞানস্বরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃ-স্বরূপ এব।' বাদরায়ণ সূত্রান্তরে জীবও কর্ত্তার অভিন্নত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; যথা,—'কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ।' অর্থাৎ,—'শাস্ত্রার্থবত্ত্ব-প্রযুক্ত জীবকে কর্ত্তা বলাই যুক্ত হইয়াছে।' জীবের কর্ত্তৃত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ বহুল প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইস্থলে বেদান্ত একটি বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। সে বিতর্ক—"জীবের ঐ কর্ত্তৃত্ব স্বায়ত্ত

বেদান্ত-দর্শন দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদে ৩১শ—৩৪শ সূত্রে জীবের কর্ত্তৃত্ব-বিষয় আলোচিত আছে। পরিশেষে, ঐ কর্ত্তৃত্ব যে 'পরায়ত্ত' তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে (৩৯শ—৪২শ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

কি পরায়ত্ত? এইরূপ সংশয়ে—'স্বর্গকামনায় যজ্ঞ করিবে', 'ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না', ইত্যাদি বিধি-নিষেধ শাস্ত্র হইতে তাঁহার কর্তৃত্ব স্বায়ত্ত বলিয়াই বোধ হয়। যিনি নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত ও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, তাঁহাকেই কর্ম্মে নিয়োগ করিতে দেখা যায়। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ স্থির হয়। তদুত্তরে বেদান্ত বলিতেছেন,—'পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ,' অর্থাৎ,—'শ্রুতি-প্রমাণ-সদ্ভাব হেতু জীবের কর্তৃত্ব পরায়ত্তই জানিতে হইবে।' তু শব্দ শঙ্কাচ্ছেদের নিমিত্ত। জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বরায়ত্ত। কারণ, পরমেশ্বরই জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন;—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য-সকল ঐরূপই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিতেছেন যে, জীবের কর্তৃত্ব যদি পরমেশ্বরের আয়ত্তাধীন হয়, তাহা হইলে বিধি নিষেধ শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কারণ, নিজ ইচ্ছানুসারে প্রবৃত্তিনিবৃত্তিসমর্থ ব্যক্তির পক্ষেই শাস্ত্রের শাসন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থে বলিতেছেন,—'কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধা-বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ।' অর্থাৎ,—বিধি ও নিষেধের অবৈয়র্থ্যাদি হইতে কৃত-প্রযত্নাপেক্ষ পরমেশ্বরের অধীনেই জীবের কর্তৃত্ব-স্বীকার করিতে হয়।' তু শব্দ শঙ্কার নিরাসার্থ। জীব কৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম-লক্ষণ-প্রযত্ন অপেক্ষা করিয়াই পরমেশ্বর তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন। অতএব উক্ত দোষের অবতার হইতেছে না। পরমেশ্বর মেঘের ন্যায় নিমিত্ত মাত্র হইয়া, জীবগণকে ধর্ম্মাধর্ম্ম-সমুখ বৈষম্যবশতঃ বিষম ফল প্রদান করেন। মেঘ যেরূপ অসাধারণ স্বীয় বীজ হইতে উৎপন্ন তরুলতাদির কারণ হয়, মেঘ না থাকিলে উহাদের রস পুষ্পাদির বৈষম্য সম্ভব হয় না এবং বীজ না থাকিলেও উহারা উৎপন্ন হইতে পারে না—তদ্রূপ পরমেশ্বরও জীব কৃত কর্ম্মানুসারেই নিমিত্ত-স্বরূপে তাহাদিগকে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। জীবরূপ কর্ত্তাও পরমেশ্বর-প্রেরিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন বলিয়া, তাঁহার কর্তৃত্ব নিবারিত হইল না। এরূপ ঘটনা কেন হয়?—বিধিনিষেধের অবৈয়র্থ্যাদি বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। ইহাতে বিধি-শাস্ত্র বা নিষেধ-শাস্ত্র ব্যর্থ হইতেছে না। পরমেশ্বর যদি বিধিতে বা নিষেধে কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির ন্যায় জীবকে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে ঐ সকল শাস্ত্রের প্রামাণ্যের হানি হয়; নিয়োজ্য কর্ত্তারও কৃতিত্ব থাকা চাই। উন্নতির জন্য সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তনের নাম অনুগ্রহ এবং অবনতির নিমিত্ত অসৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তনের নামই নিগ্রহ। পরমেশ্বরের নিমিত্ত-কর্তৃত্বে উহা সম্ভব হয়; অন্যথা উহা সম্ভব হয় না এবং বৈষম্যাদি দোষেরও পরিহার হয় না। অতএব জীব প্রযোজ্য-কর্ত্তা এবং পরমেশ্বর হেতু-কর্ত্তা ও প্রযোজক-কর্ত্তা। পরমেশ্বরের অনুমোদন ব্যতিরেকে জীবের কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না।" এবম্বিধ বিচারের উপসংহারে প্রতিপন্ন হয়, 'অংশুমানের অংশুর ন্যায় জীব পরমেশ্বরেরও অংশ। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও তৎসম্বন্ধাপেক্ষী।' এই ব্রহ্মের স্বরূপ তত্ত্ব উপনিষৎ যেরূপে কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহার দৃষ্টান্ত; (শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ১ম।১৫) যথা,—

'তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি॥'

পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় গীতারও মূল বাণী এই দেখিতে পাই। পুরুষ আছেন, ক্ষেত্রজ্ঞ

আছেন, ব্রহ্ম আছেন, কর্ত্তা আছেন,—সকলের উপর আছেন—'অহং'। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে গীতায় যে ত্রিবিধ কর্ত্তার বিষয় উত্থাপিত, সে কর্তৃ-ত্রয়ের সাত্ত্বিক কর্ত্তাই 'পর' পুরুষ বা পরা প্রকৃতি; এবং উহার অপর দুই কর্ত্তা অপরা বা বিকৃতি। গীতায় ত্রিবিধ কর্ত্তার উল্লেখে 'সাত্ত্বিক', রাজস, 'তামস'—তিন স্তর বা অবস্থা প্রতীত হয়। সাত্ত্বিক অবস্থার স্তরে যিনি উপনীত, তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সম্পন্ন অথবা ব্রহ্মভূত। তিনিই বুঝিয়াছেন,—গীতায় কিন্তু সকল জ্ঞানের—সকল শিক্ষার সারভূত শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' কর্ত্তা কর্তৃত্ব সকলই এখানে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

সর্ব্ববিধ দার্শনিক মতের আলোচনায়, গীতায় শ্রীভগবান সকলের অধিগম্য সুখতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। তাহাই গীতার সার-সিদ্ধান্ত, তাহাই গীতার অস্থি-মজ্জা-মেরুদণ্ড, তাহাই গীতার প্রাণভূত। জীব মাত্রই দুঃখপঙ্কনিমগ্ন; গীতার লক্ষ্য—তাহাদের সকলকেই উদ্ধার করিতে হইবে। যিনি অজ্ঞানের অগাধ গহ্বরে নিমজ্জিত আছেন, তাঁহাকেও উদ্ধার করিতে হইবে; যিনি জ্ঞান-অজ্ঞানের মধ্য-সীমায় সমতল ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহাকেও পথ দেখাইতে হইবে; যিনি জ্ঞান-গিরিবরের উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাকেও উচ্চতম সোপানে আরূঢ় করাইতে হইবে। অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়গণ বিশেষ বিশেষ অবস্থার জনগণকে পথ দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু গীতা জ্ঞানী অজ্ঞানী উচ্চ নীচ সকলেরই মুক্তির পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। গীতার সেইটুকুই বিশেষত্ব। শ্রীভগবান যে সর্ব্ব-জীবে সমান দয়াবান, গীতায় তাহাই উপলব্ধি হয়। তিনি জীবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

গীতায় সুখতত্ত্ব উপলক্ষে।

'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥"

অর্থাৎ,—'স্বধর্ম্মানুসরণই শ্রেয়ঃ, সে স্বধর্ম্ম বিগুণ হইলেও তাহার সার্থকতা আছে। কিন্তু উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও পর-ধর্ম্ম কখনই গ্রহণীয় নহে। সহজ অর্থাৎ প্রকৃতিগত কর্ম্ম করিয়া মানুষ কখনই পাপ-ভাগী হয় না।' এ স্থলে সাংখ্যমতাবলম্বিগণ আপত্তি তুলিতে পারেন যে, কর্ম্মমাত্রই মোক্ষের অন্তরায়—জন্মবন্ধনের হেতুভূত; সুতরাং যাহার যে ধর্ম্ম যে কর্ম্ম স্বভাবতঃ নির্দ্দিষ্ট আছে, সে ধর্ম্মে সে কর্ম্মে তাহার জন্ম-বন্ধন দৃঢ় হইয়া আসে। কিন্তু তাহারও উত্তর শ্রীভগবান প্রদান করিয়া বুঝাইলেন,—সে হিসাবে পরকীয় অস্বভাবজ ধর্ম্ম-কর্ম্মেও দোষ আছে; যেমন অগ্নিতেও ধূম থাকে। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ধূম-দোষ পরিহার করিয়া মানুষ যেমন অগ্নির ব্যবহার করে, সেইরূপ কর্ম্মের দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া গুণাংশ গ্রহণ করুক, তাহাতে তাহার স্বধর্ম্মই শ্রেয়ঃ-সাধক হইবে। ফল কথা, যে জন যে ধর্ম্মে যে অবস্থায় আছে, সেই ধর্ম্মে সে অবস্থায় থাকিয়াই আত্মোৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টা করুক,—ইহাই শ্রীভগবানের প্রধান উপদেশ। পরমসুখস্বরূপ মোক্ষলাভের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া একেবারে সীমালঙ্ঘনের চেষ্টা কখনই শ্রেয়ঃসাধক নহে; তোমার গণ্ডীর মধ্যেই তোমার মুক্তি আছে,—ইহাই

গীতার এক প্রধান উপদেশ। অবস্থা অনেকের অনেক রূপ থাকিতে পারে; সুতরাং বিভিন্ন অবস্থায় সুখের বিভিন্ন স্তরেও, মানুষের উপনীত হওয়া অসম্ভব নহে। গীতার লক্ষ্য,—সকল স্তরের সকল জীবকে মোক্ষ-ক্ষেত্রে পৌছাইয়া দেওয়া।

সকলের আয়ত্তাধীন মোক্ষ-পথ প্রসঙ্গে।

কিন্তু সকলের আয়ত্তাধীন সে মোক্ষ-পথ কি প্রকার? গীতার ব্যাখ্যা-বিবৃতি উপলক্ষে বিভিন্ন জন বিভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানবাদিগণ, জ্ঞান ভিন্ন মোক্ষলাভ হইবে না বলিয়া, অন্যের উদ্ধারের পক্ষে হতাশ্বাস হইয়াছেন। ভক্তি-বাদিগণ গীতার মধ্যে ভক্তিই সার সম্পৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মবাদিগণ মুক্তির পথে কর্ম্মেরই প্রাধান্য দেখিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে, গীতাশাস্ত্রের প্রধান প্রয়োজন, সহেতুক (অর্থাৎ কারণের সহিত বিদ্যমান) সংসার হইতে উপরম-লক্ষণ (অর্থাৎ বৈরাগ্য-লক্ষণ) বা মুক্তি। * শঙ্কর-ভাষ্যের সূচনায় প্রকাশ,—'প্রবৃত্তি-লক্ষণ ও নিবৃত্তি-লক্ষণ ভেদে বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বিবিধ। প্রবৃত্তিলক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম-বিষয়—ভোগাভিলাষপ্রবর্ত্তক যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম্ম, তদ্দ্বারা সৃষ্টি-রক্ষা ও প্রাণিগণের মঙ্গল সাধন হয়। নিবৃত্তি-লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম—বিষয় ভোগাভিলাষ-নিবর্ত্তক—জ্ঞানমূলক। যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ভোগাভিলাষ-বৃদ্ধিতে জ্ঞান লোপপ্রাপ্ত হইয়া আসিলে, শ্রীভগবান জ্ঞানতত্ত্ব-প্রচারে মোক্ষ-পথ সুগম করিয়া দেন। গীতা সেই জ্ঞান-তত্ত্ব প্রচারের হেতুভূত।' শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর টীকা-তাৎপর্য্যালোচনায় এই ভাব আরও একটু বিশদীকৃত। কর্ম্ম-কাণ্ড, উপাসনা-কাণ্ড, জ্ঞান-কাণ্ড—বেদ যে ত্রিবিধ কাণ্ডে বিভক্ত, গীতার ষটক-ত্রিতয়ে তাহারই অবভাস। ঐ ষটক-ত্রিতয়ে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য প্রতিফলিত। প্রথম ষটকে—কর্ম্ম-ত্যাগ-প্রসঙ্গে জীবাত্মা ('ত্বং') নিরূপিত। দ্বিতীয় ষটকে—ভক্তি-প্রসঙ্গে পরমাত্মা ('তৎ') নির্দ্ধারিত। তৃতীয় ষটকে—জ্ঞান-প্রসঙ্গে 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে 'অসি' (হও—মিলন হয়) বাক্য প্রযুক্ত। † ফলতঃ, এ হিসাবে জীবের ও ব্রহ্মের একত্ব-জ্ঞানই গীতার লক্ষ্য। রামানুজাচার্য্য এবং বিশ্বনাথ প্রমুখ ভাষ্য-টীকাকারগণ ভক্তিকেই গীতার সার সম্পৎ বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ভক্তি ভিন্ন কর্ম্ম-জ্ঞান সমস্তই মিথ্যা; ভক্তিই কর্ম্ম-জ্ঞানের মূলীভূত; আর সেই জন্যই ভক্তি যোগ-প্রকরণ গীতার মধ্যস্থলে সন্নিবিষ্ট আছে। বিশ্বনাথ প্রভৃতির টীকা-তাৎপর্য্যে এবম্বিধ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ‡ এই মতে কেবলীভূতা ও প্রধানীভূতা-ভেদে ভক্তি দ্বিবিধা। কেবলীভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না; উহা স্বতঃ-বিকশিত ও বিশুদ্ধ। উহার নামান্তর—অনন্যা বা অকিঞ্চনা ভক্তি। কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভাবে যে ভক্তি

---

* 'গীতা-শাস্ত্রস্য সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং পরং নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্য সংসারস্যাত্যন্তোপরমলক্ষণং।'

† 'তত্র তু প্রথমে কাণ্ডে কর্ম্ম তত্ত্যাগবর্ত্মনা। ত্বম্পদার্থো বিশুদ্ধাত্মা সোপপত্তির্নিরূপ্যতে॥ দ্বিতীয়ে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠাবর্ণনবর্ত্মনা। ভগবান্ পরমানন্দস্তৎপদার্থোঽবধার্য্যতে॥ তৃতীয়ে তু তয়োরৈক্যং বাক্যার্থো বর্ণ্যতে স্ফুটম্। এবমত্রাপি কাণ্ডানাং সম্বন্ধোঽস্তি পরস্পরম্॥'

‡ তত্রাধ্যায়ানাং প্রথমেন ষটকেন নিষ্কামকর্ম্মযোগঃ দ্বিতীয়েন ভক্তিযোগঃ তৃতীয়েন জ্ঞানযোগো দর্শিতঃ। তত্রাপি ভক্তিযোগস্যাতিরহস্যত্বাদুভয়সঞ্জীবকত্বেনাভ্যর্হিতত্বাৎ সর্ব্ব দুর্লভত্বাচ্চ মধ্যবর্ত্তীকৃতঃ।'

উৎপন্ন হয়, তাহা কর্ম্মপ্রধানা বা জ্ঞানপ্রধানা ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাব ভাষ্য ও টীকাকারগণ যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কর্ম্মের প্রাধান্য বিষয়ে তাঁহারা যে তদ্রূপ কোনও গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা মনে হয় না। এক পক্ষ বলেন—ভক্তি চাই, অন্য পক্ষ বলেন—জ্ঞান চাই, তবেই মুক্তি পাইবে। কর্ম্মকে প্রায়ই কেহ মুখ্যভাবে মোক্ষের পথ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন নাই। জ্ঞান ও ভক্তির মুক্তি-সামর্থ্য-বিষয়ক বিতণ্ডাই প্রধান বিতণ্ডা। কর্ম্ম পক্ষে প্রায় সকলেরই মত এই যে,—গীতার উপদেশ নিষ্কাম কর্ম্মই শ্রেয়ঃসাধক; সেই কর্ম্মই জ্ঞান, সেই কর্ম্মই ভক্তি। এই সকল মতের সার নিষ্কাষণে উপলব্ধি হয়,—কর্ম্ম না থাকিলেও চলে; জ্ঞান আর ভক্তি প্রভাবেই মুক্তি অধিগত হইয়া আসে।

বড়ই সমস্যার কথা—কর্ম্ম কি জ্ঞান কি ভক্তি—মুক্তি কোন্ পথে কিরূপে অধিগত হয়! কর্ম্মই জন্ম, কর্ম্মই সংসার, কর্ম্মই সর্ব্বথা পরিদৃশ্যমান। জীব-মাত্রই কর্ম্মের অধীন। জ্ঞানীর বা ভক্তের কর্ম্ম শেষ হইতে পারে; কিন্তু অবশিষ্ট সকলেই তো কর্ম্মের অধীন! সংখ্যার অনুপাত করিবার প্রয়াস পাইলেই বা কি বুঝিতে পারি? তার পর, পূর্ব্বেই বলিয়াছি তো, জন্মিয়াই কয় জন জ্ঞানী বা ভক্ত হইতে পারেন! শুকদেব শঙ্করাচার্য্য—সংসারে বিরল নহে কি? সুতরাং বুঝিতে পারি, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অণুপরমাণুর-স্বরূপ প্রাণি-জগতের দৃষ্টির অগোচর ক্ষুদ্র অংশ মাত্র জ্ঞানী বা ভক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিলেও, বিশাল বিরাট অংশ কর্ম্ম-ডোরে বাঁধা পড়িয়া থাকে। করুণানিদান শ্রীভগবান সেই অসংখ্য অগণ্য কর্ম্মানুবন্ধ জীবের মুক্তি-বিধান করিতেছেন। গীতার তাহাই দার্শনিক তত্ত্ব। অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় যে অভিনব পন্থানুসারী, এই তত্ত্ব আলোচনায়ই তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। নিখিল দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই বোধ হয় প্রথম ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—কর্ম্ম ভিন্ন জীবের মোক্ষলাভের উপায়ান্তর নাই।

গীতার দার্শনিক মত।

'ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥'

অর্থাৎ,—'কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্য (তত্ত্বজ্ঞানী) হইতে পারে না। কর্ম্ম ভিন্ন কেবলমাত্র সন্ন্যাসেও সিদ্ধি-লাভ হয় না।' শ্লোক-পংক্তিদ্বয়ের ব্যাখ্যায় নানা জনে নানা গবেষণা প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু যতই যাহা নূতন কথা যিনি বলুন, কর্ম্মই যে জ্ঞানের মূল, এই শ্লোকে সেই কথাই বলা হইয়াছে; তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি স্বরূপ শ্রীভগবান পুনরায় বলিয়াছেন (৩য় অধ্যায়, ৮ম শ্লোক),—

'নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ। শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥'

অর্থাৎ,—'কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেয়স্কর; তুমি নিয়ত কর্ম্মপর হও। সর্ব্ব-কর্ম্ম-পরিশূন্য হইলে তোমার দেহযাত্রাই নির্ব্বাহ হইবে না।' কর্ম্ম ভিন্ন মানুষের অস্তিত্বই যে অসম্ভব, এখানে তাহাই বলা হইল। অতএব ভগবদ্বাক্যে বেশ প্রতীত হইতেছে,—কর্ম্মই মানুষের প্রথম প্রয়োজন। কর্ম্মপর মানুষ কর্ম্মানুরত না হইলে, জ্ঞান তো দূরের কথা, তাহার অস্তিত্বাভাবই ঘটিবে; অর্থাৎ,—জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে। বুঝা

গেল—সকলকে কর্ম্ম করিতেই হইবে; বুঝা গেল—কর্ম্মের উপরেই অস্তিত্ব। এইবার বুঝা আবশ্যক—কর্ম্ম কি? তোমায় করিতে হইবে—কোন্ কর্ম্ম! সৎ ও অসৎ ভেদে প্রধানতঃ কর্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। দৈব ও আসুর ভেদেও কর্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু এ বিভাগ মানুষ সহজে বুঝিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিয়াছেন, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম—কর্ম্মের এই যে দুই বিভাগ, বিবেকিগণও তাহা বুঝিতে পারেন না; 'কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।' ফলতঃ, কর্ম্মই বা কি, আর অকর্ম্মই বা কি, তাহা অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন। তার পর, আরও বুঝা প্রয়োজন—বিকর্ম্ম। শ্রীভগবান বলিতেছেন (গীতা, ৪র্থ অ, ১৭শ শ্লোক),—

'কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ। অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥'

কর্ম্মের গতি বড় দুর্জ্ঞেয়; সুতরাং কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম তিনই বুঝা আবশ্যক। এ বোধ বড়ই কঠিন। সে কাঠিন্য—সে দুর্জ্ঞেয়ত্ব—শ্রীকৃষ্ণের একটী উক্তিতেই প্রতিপন্ন হয়; যথা,—

'কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥'

পূর্ব্বে কর্ম্মের ত্রিবিধ বিভাগ (কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম) নির্দ্দিষ্ট হইল। তার পরই শ্রীভগবান বলিলেন,—'যিনি কর্ম্মকে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (সর্ব্ব কর্ম্মানুষ্ঠাতা) ও যুক্ত (নির্লিপ্ত যোগী পুরুষ)। এ বড় বিষম প্রহেলিকার কথা। কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম—কর্ম্মের যখন তিনটী ভাগ করিলেন, তখন কর্ম্ম বলিতে শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম্ম, বিকর্ম্ম বলিতে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম বলিতে কর্ম্ম-সন্ন্যাসই (নৈষ্কর্ম্ম্য) অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ ভাষ্য-টীকাকারগণ ঐরূপ অর্থই নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে এখন কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম কিরূপে দেখিতে পারা সম্ভবপর হয়? কর্ম্ম ও অকর্ম্মের স্থূল অর্থে বুঝিতে পারি,—যাহা কর্ম্ম, তাহা ফলপ্রসূ; যাহা অকর্ম্ম, তাহা নিষ্ফল। সুতরাং একে অন্যের আরোপ হয় কি প্রকারে? কর্ম্মণি ও অকর্ম্মণি—সপ্তম্যন্ত পদ। বিষয়ে বা অধিকরণে দুই কারণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। কিন্তু কর্ম্মে অকর্ম্ম, অকর্ম্মে কর্ম্ম,—এরূপ বাক্যে ঐ দুই কারণের কোনও কারণই সঙ্গত হয় না। সমান বিষয়ে সমান জ্ঞানই, বিষয়ে সপ্তমীর লক্ষণ, অর্থাৎ—ঘটে ঘট জ্ঞান, পটে পট-জ্ঞান ইত্যাদি। বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ ঘট ও পট রূপ দুই ভিন্ন পদার্থের একত্ব-জ্ঞান কদাচ সিদ্ধ হয় না। এইরূপ, অধিকরণে সপ্তমী সিদ্ধান্ত করিতে গেলে, তাহাতেও বিঘ্ন ঘটে। আধার ও আধেয় কখনও বিপরীত-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া তিষ্ঠিতে পারে না। পাত্রে জল থাকিতে পারে; কিন্তু জলে অনল, আধার আধেয় ভাবে কখনও থাকিতে পারে কি? কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম এবম্বিধ বাক্যে সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ অসম্ভবতার প্রশ্নই মনে জাগিয়া থাকে। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করা উচিত নহে কি যে, শ্রীভগবানের মুখকমল হইতে অসম্ভব আযৌক্তিক উপদেশ কখনই নির্গত হইতে পারে না? তবে বস্তুপক্ষে কথাটা কি? ভগবানের বাক্য কখনও মিথ্যা বা প্রমাদপূর্ণ নহে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, ঐ বাক্যের মধ্যে নিশ্চয়ই সত্য নিহিত আছে। অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধান করিয়া, ভাষ্যকারগণ নির্ঘণ্ট করিলেন,—কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন—

এ দৃষ্টান্তের তো অপ্রাচুর্য্য নাই! রেলে, ষ্টীমারে বা নৌকায় গতাগতি কালে, মানুষ সচরাচর দেখিতে পায়—পারিপার্শ্বিক বৃক্ষ লতা-গুল্ম-সমূহ, এমন কি পর্ব্বত-মৃত্তিকাস্তূপ ভূমিখণ্ড পর্য্যন্ত, বিপরীত দিকে চলিয়াছে! তাহারা গতি-ক্রিয়াহীন; অথচ সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয়, তাহারা প্রাতিলোম্য গতিবিশিষ্ট। অচলে চলচ্ছক্তি দর্শন—অকর্ম্মে কর্ম্ম-দর্শন নহে কি? এবম্বিধ দৃষ্টান্ত আরও বহুল পরিদৃশ্যমান! মনে করুন, কোনও যোগী প্রকৃত যোগ-যুক্ত না হইয়া দেহান্দ্রিয়াদি ব্যাপার প্রতিরোধ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সেই প্রতিরোধ ক্রিয়া—তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বন, দৃশ্যতঃ অকর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও উহা যে কর্ম্ম-সাপেক্ষ, তাহা উপলব্ধি হয়। অকর্ম্মে কর্ম্মের দৃষ্টান্ত এইরূপ আরও আছে। মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম (যাহা ফলপ্রদ নহে), সে কর্ম্মের অকরণজনিত প্রত্যবায় ঘটে। সুতরাং সে অকরণ বা অকর্ম্ম—কর্ম্মবাচ্য। অতএব বুঝা গেল, অকর্ম্মে কর্ম্ম অসিদ্ধ নহে। এই-রূপ, কর্ম্মেও অকর্ম্মের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কোনও মনুষ্য বা যানাদি অতি দূরে গতিবিশিষ্ট; দূরত্ব নিবন্ধন তাহাদের গতি-ক্রিয়া অনুভূত না হওয়ায় তাহাদিগকে নিশ্চল বলিয়া মনে হইতেছে। সে যেমন ভ্রম, সৌরজগতে গ্রহাদির গতিবিধি সংক্রান্ত সেইরূপ ভ্রম কত জনের মনে বদ্ধমূল আছে; অজ্ঞজন গতিবিশিষ্ট গ্রহাদিকে স্বতঃই নিশ্চল বলিয়া মনে করে। সুতরাং বিবিধ দৃষ্টান্তে কর্ম্মে অকর্ম্ম উপলব্ধি হয়। তাহার পর নিত্যকর্ম্মের বিষয়। এক হিসাবে নিত্যকর্ম্ম (সন্ধ্যাদি) কর্ম্ম নয়; কারণ, উহার অকরণে দোষ আছে, কিন্তু করণে কোনও ফল নাই। সুতরাং বিবিধ দৃষ্টান্তে বেশ উপলব্ধি হয় যে, কর্ম্মে অকর্ম্ম বা অকর্ম্মে কর্ম্ম বাক্য শ্রীহরির মুখ হইতে অনর্থক নির্গত হয় নাই। তাহা যদি না হইয়া থাকে, তবে এইবার "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদ কর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ" বাক্যের প্রকৃত অর্থ নিষ্কাষণ কিরূপে হইতে পারে, দেখা যাউক। পূর্ব্বে ভগবান বলিয়াছেন, কর্ম্ম কি আর অকর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে পণ্ডিতগণও মুহ্যমান হন। কিন্তু এখন বলিলেন—যাঁহারা কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান যোগী ও কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। এই দুই উক্তির সামঞ্জস্য-রক্ষায় বুঝিতে পারা যায়, শেষোক্ত স্থলে যাঁহারা কর্ম্মাকর্ম্মের ভেদ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের প্রসঙ্গই এখানে উত্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারাই তো কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখিতে সমর্থ হন! যাহারা অজ্ঞানী, তাহাদের নিকট সে ভ্রম তো রহিয়াই গিয়াছে! সুতরাং এস্থলে কর্ম্মাকর্ম্ম-জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রসঙ্গই উত্থাপিত বলিয়া স্বীকৃত হয়। এ অর্থ সমীচীন বটে; কিন্তু ইহারও উপরে আরও যে এক নিগূঢ় ভাব আছে, তাহাই শ্রীভগবানের লক্ষ্যীভূত বলিয়া বিশ্বাস করি। সে ভাব—কোন্ ভাব? তুমি যে কর্ম্ম করিবে, সে কর্ম্ম যেন তোমার অকর্ম্ম (নৈষ্কর্ম্ম্য) মধ্যে গণ্য হয়; আর সেই অকর্ম্মেই (নৈষ্কর্ম্ম্যেই) যেন তুমি কর্ম্ম দেখ। অর্থাৎ,—কর্ম্ম করিতেই হইবে; কিন্তু সে কর্ম্ম এমন হওয়া চাই, যদ্দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য বা মোক্ষ অধিগত হইতে পারে। কর্ম্ম-প্রসঙ্গে যখন উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তখন কেমন কর্ম্ম করিতে হইবে—সেই উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে, বুঝা আবশ্যক। যিনি এই বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে পারিবেন, তিনিই বুদ্ধিমান যোগী ও কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। ফলতঃ, কর্ম্ম

চাই, কর্ম্ম করিতেই হইবে। গীতার ইহাই প্রধান উপদেশ। গীতা যেমন বলিয়াছেন—'কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ'; সেইরূপ গীতায় (৫অ। ৫) আরও বলা হইয়াছে,—'যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥' অর্থাৎ,—'জ্ঞানিগণ যে স্থান বা মোক্ষ লাভ করেন, কর্ম্মযোগিগণও সেই স্থানই প্রাপ্ত হন। সাঙ্খ্যকে ও যোগকে যিনি অভিন্ন-ভাবে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই সম্যক্ দর্শন-শক্তি লাভ করিয়াছেন।'

বুঝা গেল, কর্ম্মই আবশ্যক। বুঝা গেল, কর্ম্মের মধ্যে আবার সেই কর্ম্ম আবশ্যক—যে কর্ম্মে বন্ধন নাই, যে কর্ম্ম কর্ম্ম হইয়াও নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ মুক্তিফলপ্রদ। কিন্তু সে কর্ম্ম—কোন্ কর্ম্ম? গীতায়ই তাহার উপদেশ আছে। এক স্থানে নয়। এক কথায় নয়; বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন যুক্তি সাহায্যে গীতায় শ্রীভগবান সেই কথাই বুঝাইয়া গিয়াছেন। স্থির ধীর চিত্তে সেই সকল উপদেশ পড়িয়া দেখুন; পড়িয়া সার-সিদ্ধান্ত অনুধাবন করুন। গীতায়, যথা,—

কর্ম্মেই নৈষ্কর্ম্ম্য।

(১) যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

(২) কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ। যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥
আবৃতং জ্ঞা৹ মে৹তন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥
তস্মাত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ। পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥

(৩) যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ। শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ। সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥

(৪) শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে। ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে। শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

(৫) কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ। যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম। ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ। যজ্ঞদানতপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥"

অর্থাৎ,—(১) 'যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধনের কারণ। সুতরাং যজ্ঞার্থ (ভগবানের প্রীতি-সাধনের জন্য) নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিবে; অর্থাৎ—সে কর্ম্মে বন্ধন নাই।' (২) 'কাম রজঃগুণজাত অতৃপ্ত অত্যুগ্র; ক্রোধ কামেরই পরিণাম। সুতরাং কামকে মোক্ষ-পথের বৈরী বলিয়া জানিবে। ধূম যেমন বহ্নিকে আবৃত করিয়া রাখে, মলিনতা যেমন দর্পণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, জরায়ু যেমন গর্ভকে আবৃত করিয়া রাখে, কাম তেমনই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। জ্ঞানের চিরশত্রু কামরূপ দুষ্পূরণীয় অনল দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি কামে অধিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত হয়; যেহেতু, ইন্দ্রিয়াদি দ্বারাই জ্ঞানকে আবৃত করিয়া, কাম দেহীকে মুগ্ধ করে। অতএব ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশন কামকে বিনাশ কর। দেহাদি হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। ইহা বুঝিয়া আত্মার দ্বারা আত্মাকে স্থির করিয়া কামরূপ দুর্নিবার শত্রুকে জয় করিবে।' (৩) 'যাঁহার সকল কর্ম্ম কাম-সঙ্কল্প-বর্জ্জিত, তিনিই পণ্ডিত; তাঁহারই জ্ঞানরূপ অগ্নিতে কর্ম্মসকল দগ্ধপ্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম-ফলে আসক্তি-ত্যাগী ব্যক্তি নিত্যতৃপ্ত নিরবলম্ব; কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও নিরাকাঙ্ক্ষ-নিবন্ধন তাঁহার কর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম্য মধ্যে গণ্য হয়। নিষ্কাম সংযত-চিত্ত-দেহ সর্ব্ববিষয়-সঙ্গ-পরিত্যাগকারী ব্যক্তি দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য যে কর্ম্ম করেন, সে কর্ম্ম কখনই বন্ধনের হেতু হয় না। যদৃচ্ছা-লাভে সন্তুষ্ট, ক্ষুধাতৃষ্ণাশীতোষ্ণাদি-সহনশীল নির্ব্বৈর, সিদ্ধিতে বা অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান ব্যক্তিরও কর্ম্ম বন্ধন-হেতু নহে। যাঁহারা নিষ্কাম, রাগাদি বিরহিত, জ্ঞানাবস্থিত-চিত্ত এবং ভগবদুদ্দেশে যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের কর্ম্ম আপনিই লয় প্রাপ্ত হয়।' (৪) 'অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্ম-ফল-ত্যাগ শ্রেষ্ঠ; তাহাতেই শান্তিলাভ হয়। যে জন সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মৈত্র ও কারুণ্য-সম্পন্ন, অথচ মমতাহীন, অহঙ্কার-শূন্য, শোক-দুঃখে সমদর্শী, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্টচিত্ত, যোগী, সংযতচিত্ত, অধ্যবসায়-সম্পন্ন ও ভগবানে মনোবুদ্ধিসমর্পণকারী হন, তিনিই ভগবানের প্রিয়; অর্থাৎ মোক্ষাধিকারী। যিনি লোক সকলের উদ্বেগের কারণ নহেন, লোকসমূহ হইতেও যিনি উদ্বেগ-প্রাপ্ত হন না, হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগমুক্ত সেই ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয়। স্বয়মাগত অর্থেও যিনি স্পৃহাশূন্য, শৌচ-সম্পন্ন, অনলস, অপক্ষপাত, চিত্ত-ক্লেশ-শূন্য ও সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা-পরিত্যাগী, তিনিই ভগবানের প্রিয়। আনন্দ (প্রিয়বস্তুলাভে) নাই, বিদ্বেষ (অপ্রিয় বস্তুতে) নাই, দুঃখিত (ইষ্ট-নাশে) নহেন, আকাঙ্ক্ষা (পদগৌরব, অর্থের) করেন না, শুভাশুভ-পরিত্যাগকারী ভগবানে ভক্তিমান্ যে ব্যক্তি, সেই তাঁহার প্রিয় হয়। শত্রু-মিত্রে ও মানাপমানে সমদর্শী, শীতোষ্ণসুখদুঃখে সমজ্ঞান, আসক্তিশূন্য, নিন্দা-

প্রশংসায় অবিচলিত-চিত্ত, সংযতবাক্, সদাসন্তুষ্ট, আশ্রয়রহিত অথচ স্থিরচিত্ত, এরূপ ভক্তিমান্ যে জন, তিনিই ভগবানের প্রিয়পাত্র।' (৫) 'পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম্মের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন; কিন্তু বিচক্ষণ জন সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মনীষিগণ (সাঙ্খ্যগণ) কর্ম্ম মাত্রকেই দোষ-হেতু বলিয়া ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। অন্য পণ্ডিতগণ (মীমাংসকগণ) যজ্ঞ-দান-তপঃকর্ম্মকে অত্যাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমার (ভগবানের) মত এই যে, ত্যাগ ত্রিবিধ। যজ্ঞ দান-তপঃ-কর্ম্ম কখনও ত্যাজ্য নহে; পরন্তু তাহা কর্ত্তব্য কার্য্য। যেহেতু, যজ্ঞ দান-তপস্যা দ্বারাই মনীষিগণের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়। অতএব আসক্তি ও ফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া, ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা একান্ত আবশ্যক। ইহাই আমার নিশ্চিত উত্তম মত জানিবে।' অধিক বলিবার বা বুঝাইবার আবশ্যক নাই। যে কর্ম্ম যে ভাবে অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, ভগবান পুনঃপুনঃ সেই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যখন বলিয়াছেন,—'আমাকে ভজনা কর', তখনও যে ভাবে ভজনা করিতে বলিয়াছেন; যখন বলিতেছেন—'কর্ম্ম কর', তখনও সেই ভাবেই কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। ভজনায়ও যাহা—কর্ম্মেও তাহাই। কর্ম্ম করিতে হইবে; কিন্তু ফলকামনা ত্যাগ করিয়া। আমাকে ভজনা করিতে হইবে, কিন্তু সর্ব্বভূতে সমদর্শন করিয়া। কর্ম্ম করিতে হইবে; কিন্তু অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধ-পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া; ব্রহ্মত্ব পাইতে পারিবে, যদি বুঝিয়া থাক—সর্ব্বভূতে সর্ব্বজীবে ব্রহ্ম বিরাজমান্। সে বোধ, সে জ্ঞান, সকলই কর্ম্মের অধীন। সে কর্ম্ম অকর্ম্মরূপ কর্ম্ম; সে কর্ম্ম কর্ম্মফলত্যাগরূপ কর্ম্ম; সে কর্ম্ম—সর্ব্বত্রে ব্রহ্মাধিষ্ঠানদর্শন এবং সর্ব্বজীবে সমদর্শনরূপ কর্ম্ম। রাগ দ্বেষ অহঙ্কার প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া, অমানিত্ব-অদাম্ভিত্ব প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হইতে হইতে নির্গুণত্ব-লাভ হয়। কর্ম্মেই অকর্ম্ম, গুণেই নির্গুণত্ব, অগ্নিতেই নির্ব্বাণত্ব। কর্ম্ম হইয়াও, নৈষ্কর্ম্ম্যের (মোক্ষের) হেতুভূত, দেখুন সে কি কর্ম্ম;—

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ। দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্। দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমাধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা। ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥"

অর্থাৎ,—'নির্ভীকতা, চিত্তের প্রসন্নতা, জ্ঞান-যোগ-নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়-সংযম, যজ্ঞ, বেদাদি-পাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, সন্ন্যাস, চিত্তের উপরতি, পরনিন্দাত্যাগ, জীবে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তরশৌচ, জিঘাংসারাহিত্য ও অভিমান-শূন্যতা,—এই ষড়বিংশতি প্রকার বৃত্তি শুদ্ধ-সাত্ত্বিকী সম্পদকে লক্ষ্য করিয়া জাত ব্যক্তিরই জন্মিয়া থাকে।' এই ষোড়শ দৈবী সম্পদের বিষয় বলিয়া শ্রীভগবান ঘোষণা করিলেন,—"দৈবীসম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।" অর্থাৎ,—দৈবী সম্পদে মোক্ষ; আর দম্ভদর্পাভিমানাদি আসুরী সম্পৎ বন্ধনের হেতুভূত। যথা,—

"দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ। অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থসম্পদমাসুরীম্॥
দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধয়াসুরী মতা। মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমাভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥"

দৈবী-সম্পদের অধিকারী হইলে তাহার আর মোক্ষের ভাবনা নাই। এমন করিয়া 'চোখে

আঙুল' দিয়া, যিনি এমন সরল-সুগম মোক্ষের পথ দেখাইয়া দিলেন, তিনি কি পরম দার্শনিক নহেন? তাই বলিতেছিলাম,—শ্রীকৃষ্ণ পরম দার্শনিক, কেন-না, তিনি সকল দর্শনের সার-সমন্বয় সাধন করিয়া এক সরল সুগম সুখের পন্থা জনসমাজকে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীভগবান গীতাশাস্ত্রের যেখানেই যখন মোক্ষের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেখানেই তখন কর্ম্মের উপর মোক্ষের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইয়াছি। ক্বচিৎ কোথাও অর্থ নিষ্পত্তি পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হইলেও, পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষায় অর্থোৎপত্তির প্রয়াস পাইলে, সর্ব্বথা সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। কর্ম্মই মূল, কর্ম্ম ভিন্ন গত্যন্তর নাই, ইহাই গীতার মুখ্য উপদেশ। তবে কর্ম্মের প্রকারভেদ আছে, আর সে প্রভেদ উপলব্ধি করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হও, ইহাই শ্রীভগবানের প্রদত্ত সুশিক্ষা। গীতায় দেখান হইয়াছে,—মোক্ষের অধিকারী কোন্ জন? প্রাক্তন বা কর্ম্ম অনুসারে মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত। গীতায় সেই বিভিন্ন অবস্থার মানুষেরই মুক্তির পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। তুমি জ্ঞানী জ্ঞানমার্গানুসারী, শুনিবে—তোমার মুক্তি হইবে কি প্রকারে? মুক্তি—জ্ঞানের দ্বারাই হইবে বটে; সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের নিবৃত্তিতেই তুমি কৃতকৃতার্থ হইবে সত্য; কিন্তু তুমি যখন দেহী, তখন দেহের দ্বারাই—কর্ম্মের দ্বারাই—আচারের দ্বারাই—তোমার সেই সত্ত্বাদি গুণের নিবৃত্তি আবশ্যক। তোমায় সুখ-দুঃখে অবিচলিতচিত্ত হইতে হইবে, লোষ্ট্র-প্রস্তর-স্বর্ণে তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে, প্রিয়-অপ্রিয় বিষয়ে সমভাবাপন্ন এবং নিন্দা-প্রশংসায় অনুদ্বিগ্ন থাকিতে হইবে। মান-অপমানে সমভাব, শত্রু-মিত্রে সমদর্শী, দৃষ্টাদৃষ্ট লাভালাভ বিষয়ে নিরপেক্ষচিত্ত—এমনটি হইতে পারিলে তবে তো তুমি গুণাতীত সুতরাং মুক্ত হইতে পারিবে! * তবেই বুঝুন, জীবে কর্ম্ম প্রয়োজন কি না! যে দিক দিয়া যে ভাবেই দৃষ্টিপাত করুন, সৎকর্ম্ম সদনুষ্ঠান ভিন্ন মানুষের গত্যন্তর নাই। অসৎকর্ম্ম অসৎ-পথ পরিত্যাগ এবং সৎকর্ম্ম সৎচিন্তায় মনোভিনিবেশ,—ইহাই হইল মোক্ষের প্রথম স্তর। এই স্তরে উপনীত হইলেই গীতার প্রধান লক্ষীভূত কর্ম্মফল ত্যাগ আপনা-আপনি অধিগত হয়। গীতার কোথায় না এ আভাষ—এ উপদেশ দেখিতে পাই? দৃষ্টান্ত কত উল্লেখ করিব? দেখুন—মুক্তির অধিকারী—স্থিতপ্রজ্ঞ। দেখুন—মুক্ত জীবের—ব্রহ্মনির্ব্বাণ। দেখুন—মানুষের পরম সুখময় পরা গতি। সর্ব্বত্রই এক ভাব—এক চিন্তা—এক শিক্ষা। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ; যথা,—

মোক্ষের অধিকারী।

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্। নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

* গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এতৎপ্রসঙ্গের আলোচনা দ্রষ্টব্য। ঐ অধ্যায়ে ২৪শ—২৫শ শ্লোকে গুণাতীত অবস্থার পরিচয় আছে।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীৎ মৎপরঃ। বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সংযায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্। আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা। ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুত সুখম্॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতং যন্মনোঽনুবীয়তে। তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥
তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ। ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"

অর্থাৎ—"হে পার্থ! যোগী ব্যক্তি, অন্তঃকরণের মধ্যে যত প্রকার আশা তৃষ্ণা বা অভিলাষ আছে, তৎসমস্তই যখন এককালে পরিত্যাগ করেন, কোনও বিষয়েই কোনও প্রকার তৃষ্ণা বা কামনা অল্পমাত্রও থাকে না, কেবলমাত্র পরমার্থ-তত্ত্ব-স্বরূপ আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, সেই অবস্থায় তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলে। যখন দুঃখেতে কোন-প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয়, সুখেতেও কোনপ্রকার স্পৃহা থাকে না, আর যিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তিকে সমূলে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্থিতধী বা ব্রহ্মজ্ঞানী মুনি বলা যায়। যিনি ধন, ঐশ্বর্য্য ও পুত্র-কলত্র-দেহাদিতে এককালে নিঃস্নেহ, যিনি শুভ বা অশুভ ঘটনা হইলে কোনপ্রকার আনন্দ বা বিদ্বেষ অনুভব না করেন, তাঁহারই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে বলা যায়। কূর্ম্ম যেমন হস্তপদাদি অঙ্গগুলিকে বাহির হইতে গুটাইয়া লইয়া দেহের মধ্যে সন্নিবেশিত করে, সেই প্রকার আপন ইন্দ্রিয়গণকে রূপ-রসাদি বিষয়-সমূহ হইতে প্রত্যাকর্ষণ পূর্ব্বক যিনি আত্মাতে বিলীন করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি পীড়াদি নিবন্ধন অথবা আহার্য্য-দ্রব্যের অভাবে নিরাহার হয়, তাহারও সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল হইয়া বিলীনপ্রায় হয় বটে; কিন্তু তাহাতে বিষয়ানুরাগের কিছুমাত্র ক্ষয় হইতে পারে না। আর যাঁহারা আত্মাকে দেখিতে পান, তাঁহাদের অনুরাগের সহিতই ইন্দ্রিয়াদির প্রতিসংহার হইয়া যায় অর্থাৎ অনুরাগও বিনষ্ট হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়গণও প্রতিসংহৃত হয়। অতএব পীড়াদিজনিত ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য কোনই কার্য্যের নহে; অনুরাগ সহিত যে ইন্দ্রিয়ের লয় হয়, তাহাই উন্নতির চিহ্ন। কিন্তু হে কৌন্তেয়! পূর্ব্বোক্ত প্রজ্ঞাস্থৈর্য্য লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা আবশ্যক; কারণ, ইন্দ্রিয়গণ যাঁহাদের বশীভূত হয় নাই, সেই বিদ্বান্ পুরুষগণ প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যের নিমিত্ত অতিশয় প্রযত্ন করিলেও প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ, বলাৎকার পূর্ব্বক তাঁহাদের মনকে বিষয়াভিমুখে লইয়া যায়। অতএব, প্রথম সেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া সমাধির অনুষ্ঠান করতঃ 'সোঽহং' (আমিই ব্রহ্ম) এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিতি করিবে; কারণ, ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত, তাঁহারই

প্রজ্ঞা স্থিরতা লাভ করিতে পারে। ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে হইলে, প্রথমতঃ বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক; কারণ, বিষয়ের চিন্তা হইতেই ক্রমে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, সর্ব্বদা নানা প্রকার ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইলেই তাহা প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত অভিলাষ হয় এবং তখন যদি সেই তীব্র অভিলাষ কোনপ্রকারে ব্যাঘাত পায় (পাইয়াই থাকে), তাহা হইলেই ক্রোধ আসিয়া পড়ে; ক্রোধ হইলেই লোকের হিতাহিত বিষয়ে মোহ হইয়া থাকে। তখন সদুপদেশ সকল বিস্মৃত হইয়া যায়, সুতরাং তখন বুদ্ধির বিবেকশক্তি বিনষ্ট হয়; কার্য্যাকার্য্যের বিবেকশক্তি বিনষ্ট হইলেই পুরুষ এককালে অধঃপতিত হইল। আর যাঁহারা অনুরাগের এবং বিদ্বেষের সহিত অসংশ্লিষ্ট হইয়া নিজ বশীকৃত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয় রাজ্যে বিচরণ করেন, সেই বিজিতমনাঃ মহাত্মাই প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। প্রসন্নতা শক্তির বিকাশ হইলে, তাঁহার সমস্ত দুঃখের অভাব হইয়া যায়। প্রসন্নমনা ব্যক্তিরই অবিলম্বে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত বা ব্রহ্ম-সংস্থিতি হইয়া থাকে। চিত্ত-প্রসাদ না থাকিলে আত্মা বা ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান হইতে পারে না; এবং প্রসাদশূন্য ব্যক্তির আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশও হইতে পারে না। অভিনিবেশ না হইলে শান্তি আসিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের ও অন্তঃকরণের শান্তি বা বিরাম না হইলে আর সুখ হইবে কেন? অর্থাৎ,—বিষয়-তৃষ্ণাদি-স্বরূপ দুঃখই থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-বিচরণকালে যদি মনও তাহার অনুকূলেই চলে, তাহা হইলে, বায়ু যেমন নৌকাকে জলমধ্যে নিমগ্ন করে, মনও সেইরূপ সংযমীর বিবেক বুদ্ধিকে হরণ করিয়া ফেলে। অতএব হে মহা-বাহো! যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই ব্রহ্ম-সংস্থিতি হইতে পারে। হে ধনঞ্জয়! অবিবেকী মনুষ্যাদি প্রাণিগণের যাহা রাত্রি অর্থাৎ অন্ধকারময়, সেইখানে সংযমী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা জাগ্রত থাকেন, আর অবিবেকি-গণ যেখানে জাগ্রত থাকেন, সেখানে আত্মদর্শী মহাত্মার নিশা। অতএব সংসার-রাজ্যে আসক্তি থাকিলে আত্ম-সংস্থিতি হওয়া অসম্ভব। আবার আত্ম-সংস্থিতি হইয়া গেলেও কর্ম্মানুষ্ঠান করা নিতান্ত আবশ্যক। পর্ব্বতাদি হইতে নানারূপে নিঃস্যন্দিত নদনদী-সমূহ যেমন অচলভাবে অবস্থিত জলরাশি-পরিপূরিত সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত সমস্ত কামনা বা বাসনা যাহার সেই সমুদ্রস্থানীয় অনন্ত আত্মাতে প্রত্যাহারের দ্বারা বিলীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষ পাইতে পারেন; যিনি বিষয়-বাসনা-পরবশ, তিনি কখনই মুক্তি পাইতে পারেন না। অধিক বলিব কি, যিনি সমস্ত প্রকার বাসনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশেষে জীবনের উপরেও নিস্পৃহ হইয়া অহংমদীয়ত্বভাব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিচরণ করেন, তিনিই নির্ব্বাণ নামক মুক্তি পাইতে পারেন।" যেমন স্থিতপ্রজ্ঞ দেখিলেন, তেমনই ব্রহ্মনির্ব্বাণ-প্রাপ্তির লক্ষণাদি এবং পরাগতি-প্রাপ্তির লক্ষণাদি অনুধাবন করিয়া দেখুন! * সর্ব্বভূতে সমদর্শন—সর্ব্বভূতে

* গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের ২৫শ-২৬শ শ্লোক, নবম অধ্যায়ের ৩২শ শ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৪শ প্রভৃতি শ্লোক আলোচনায় এই সকল তত্ত্ব বিশদীকৃত হয়।

জগদীশ্বরের অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষীকরণ—কত সদ্‌গুণের সমবায়ে সঞ্জাত হয়, যাঁহার সামান্য বিবেচনা-শক্তি আছে, তিনিই তাহা বুঝিতে পারেন। গীতার প্রথম লক্ষ্য—কর্ম্ম—সৎকর্ম্ম; চরম লক্ষ্য—সর্ব্বভূতে সমদর্শন—ব্রহ্মদর্শন। সৎকর্ম্মের ফল—কর্ম্মফলত্যাগ; সেই কর্ম্ম-ফল-ত্যাগেই সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন; তাহাই মোক্ষ। ফলতঃ, সর্ব্বজীবে সমদর্শী হও, সকলকে আত্ম-রূপে আপনার বলিয়া জ্ঞান কর;—শান্তি অধিগত হইবে, মোক্ষ লাভ করিবে।

শান্তি-লাভে রাজভক্তি।

শ্রীকৃষ্ণের দার্শনিক মত পর্য্যালোচনা করিলে, এইরূপে বেশ উপলব্ধি হয় যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের সকলের সুখ-শান্তি-বিধানের জন্যই চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। শান্তি-রাজ্য—ধর্ম্ম রাজ্য—সংস্থাপন করাই তাঁহার কার্য্যে ও উপদেশে সর্ব্বত্র অভিব্যক্ত। আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সমাজ-বিপ্লব, নীতি-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল; সেই বিপ্লবে শান্তি-স্থাপন জন্য শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। সেই শান্তি-স্থাপন-পক্ষে কার্য্যতঃ তিনি যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, সে আভাষ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। গীতায় দার্শনিক-তত্ত্ব-প্রচারেও তাঁহার তদ্বিধ চেষ্টারই পরিচয় পাওয়া যায়। গীতার এক গূঢ় লক্ষ্য—শান্তি-স্থাপন;—সমাজে শান্তি-স্থাপন, রাজ্যে প্রজাগণের মধ্যে শান্তি-স্থাপন, বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব-কোলাহলে শান্তি-স্থাপন। শ্রীকৃষ্ণের দার্শনিক গবেষণার বিষয় আলোচনা করিলে তিনি ধর্ম্মে ও সমাজে কি ভাবে শান্তি-স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছেন, উপলব্ধি হইতে পারে। রাষ্ট্র-বিপ্লবই প্রধানতঃ সমাজ-বিপ্লবের ও নীতি-বিপ্লবের মূল। সুতরাং রাষ্ট্র-বিপ্লবে শান্তি-স্থাপন-পক্ষে গীতোক্ত বাক্যে কি উপদেশ পাইতে পারি, প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। গীতার কুব্যাখ্যার ফলে ভারতবর্ষে রাষ্ট্র-বিপ্লবকারী দলের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কিছুকাল হইতে গীতার প্রতি তাই এক শ্রেণীর রাজ-পুরুষের খরদৃষ্টি নিপতিত আছে। কদর্থকারিগণ গীতার যেরূপ কদর্থেরই সূচনা করুন, গীতার মধ্যে রাষ্ট্র-বিপ্লবের ভাবোদ্রেক-মূলক প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপিত নাই; পরন্তু, রাষ্ট্র-বিপ্লব-নিবারক শান্তি-প্রতিষ্ঠাপক সন্দর্ভই গীতার অস্থি-মজ্জা-মেরুদণ্ডে অন্তর্ব্বাহী শোণিত-তরঙ্গে সঞ্চালিত রহিয়াছে। গীতার শ্লোকে আছে—'আত্মার বা জীবের বিনাশ নাই; যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম; অতএব তুমি সুখ-দুঃখ লাভালাভ ও জয়পরাজয়কে সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহাতে তোমার পাপ হইবে না।' * সাধারণ দৃষ্টিতে যে অর্থ প্রতিপন্ন হয়, সেই অর্থই মানিয়া লইলাম। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহ-দানের অভ্যন্তরে যে এক নিগূঢ় শিক্ষা আছে, তাহা বুঝাইবার আবশ্যক এ প্রসঙ্গে দেখি না। তবে গীতার যে অর্থ ধরিয়া উচ্ছৃঙ্খলার বা রাষ্ট্রবিপ্লব-উত্তেজনার আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হয়, সেই অর্থের অনুসরণেই আমরা বুঝিতে পারি, এ অংশে রাষ্ট্র-বিপ্লব-উত্তেজনার প্রসঙ্গ কিছুই নাই; বরং রাষ্ট্র-বিপ্লবে শান্তি-স্থাপনের প্রসঙ্গই পরিস্ফুট। এইখানে অশান্তির ও শান্তির কারণ কি, বুঝিবার প্রয়োজন। রাজা যুধিষ্ঠির; রাজ্যে তাঁহার ন্যায্য অধিকার; দুর্য্যোধন অধর্ম্মাচরণে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে চান; যুদ্ধ সেই

* "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥" ইত্যাদি।

উপলক্ষে—অশান্তি সেই কারণে। সে অশান্তি দূর হইতে পারে কি প্রকারে? যিনি রাজা, যাঁহার ন্যায়-সঙ্গত অধিকার, তিনি যদি আপন রাজ্য—আপন অধিকার প্রাপ্ত হন; তাহা হইলেই অশান্তি দূর হয়। এক দিকে ন্যায্য অধিকার-দান—সচ্চরিত্র সাধু নৃপতির সুপ্রতিষ্ঠা-সাধন; অন্য দিকে কুচরিত্র কদাচারীর অন্যায় কার্য্যে সহায়তা (অর্জ্জুন যদি যুদ্ধ না করিয়া তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বনে অবস্থিত থাকেন, তাহাতেও পরোক্ষভাবে অন্যায় কার্য্যে সহায়তা করা হয়)। বিবেচনা করিয়া দেখুন, অর্জ্জুনের পক্ষে কোন্ পথ অবলম্বনীয়? যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য; আর সে কর্ত্তব্যপালনে শান্তিই সূচিত হয়। এইবার বুঝা প্রয়োজন, অর্জ্জুন কোন্ পক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন! তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন—রাজার পক্ষে; যাঁহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার—সেই রাজার পক্ষে। তিনি বিপ্লবকারীর দলে মিশিয়া রাষ্ট্র-বিপ্লবে যোগ দিতে প্রবৃত্ত নহেন; তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনে রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রশ্রয় দিতেও প্রস্তুত নহেন। তিনি দেশপতি রাজার পক্ষাবলম্বনে দেশে শান্তি-স্থাপনে বদ্ধপরিকর। রাজার হিতসাধন-পক্ষে চেষ্টা—রাষ্ট্র-বিপ্লব-দমনে প্রয়াস—মোক্ষাভিলাষী ধার্ম্মিকেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কেন-না, "নরাণাঞ্চ নরাধিপম্" অর্থাৎ শ্রীভগবান নরগণের মধ্যে নৃপতিরূপেই অবস্থিত আছেন। * যিনি বলিয়াছেন,—'নরগণের মধ্যে নৃপতি-রূপে আমি (ভগবান) অবস্থিত আছি'; আরও যিনি উপদেশ দিয়াছেন,—'যদি মোক্ষ চাও, আমার (ভগবানের) ভক্ত হও'; তাঁহার উক্তির অর্থ কখনও রাজদ্রোহিতাসূচক বা উচ্ছৃঙ্খলামূলক হইতে পারে কি? পরন্তু, 'নরমধ্যে আমি নৃপতিরূপে আছি, আর তুমি আমার ভক্ত হও'—এতাদৃশ উক্তিতে রাজদ্রোহিতার ভাব পরিহারপূর্ব্বক মানুষ রাজভক্তিপরায়ণ হউক, এই শিক্ষাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথচ, কি পরিতাপের বিষয়, এবম্বিধ রাজভক্তিমূলক গীতাশাস্ত্রকে লোকে বিদ্রোহিতাচরণমূলক বলিয়া মনে করিতেছে! কি ভ্রান্তি! ফলতঃ সকল দিকে সকল প্রকার শান্তিস্থাপনেই শ্রীকৃষ্ণ প্রযত্নপর। বহিরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গের শান্তি-স্থাপনেই তাঁহার দার্শনিক গবেষণা। জ্ঞানমার্গানুসারী বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতের সহিত তাঁহার গবেষণার সামঞ্জস্য-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাই আমরা সংক্ষেপে সমাজের বহিরঙ্গে তাঁহার শান্তি-স্থাপনের প্রয়াসের বিষয় উল্লেখ করিলাম। যে

* গীতার দশম অধ্যায়ে ২৭শ শ্লোকে "নরাণাঞ্চ নরাধিপম্" এই যে উক্তি দেখিতে পাই (দশম অধ্যায়ের ঐ শ্লোক এবং শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে আত্ম-পরিচয় দিতেছেন, সেই সকল শ্লোক, এই খণ্ডের ১১৫ম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে), শ্রীমদ্ভাগবতেও এই উক্তির প্রতিধ্বনি আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ১৭শ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন,—"তপতাং দ্যুমতাং সূর্য্যং মনুষ্যানাঞ্চ ভূপতিং"। অর্থাৎ,—প্রতাপশালী ও দীপ্তিশালীদিগের মধ্যে আমি সূর্য্য এবং মনুষ্যগণের মধ্যে আমি নৃপতি। কেবল শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে নহে; হিন্দুর শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই রাজার মাহাত্ম্য এইরূপ পরিকীর্ত্তিত আছে। (পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ২৯শ পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য)। যে রাজা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ বিভূতি মধ্যে পরিগণিত, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ—পাপ ও অধর্ম্ম তো বটেই; অধিকন্তু তাঁহার সহায়তার পক্ষে সচেষ্ট না হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনও পাপমূলক। গীতার দশম অধ্যায়ের ২০শ হইতে ৪২শ শ্লোকে শ্রীভগবান আপনার বিভূতির যে পরিচয় দিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে ৯ম হইতে ৪১শ শ্লোকে সেই পরিচয়ই দেদীপ্যমান। দুই গ্রন্থ মিলাইয়া পাঠ করিলে অনুপম সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে।

দিক দিয়াই দেখা যাউক, শ্রীকৃষ্ণ শান্তি স্থাপনেই—ঐহিক শান্তি হইতে পারলৌকিক পরম শান্তি প্রতিষ্ঠা কল্পেই—প্রযত্নপর ছিলেন। সর্ব্ব বিষয়ে শান্তি-স্থাপনের প্রয়াস ভিন্ন উচ্ছৃঙ্খলার উত্তেজনায় তিনি কখনও সহায়তা করেন নাই।

* * *

৫। শ্রীকৃষ্ণ—পরম জ্ঞানী ; কেন-না, জ্ঞানের চরম স্ফূর্ত্তি তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছে।

[জ্ঞানের স্বরূপ কি,—অভিধানাদির মতে ;—বদ্ধমুক্তের লক্ষণ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা,—শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তাঁহার জ্ঞান মহিমা পরিস্ফুট ,—শ্রীকৃষ্ণ সকল জ্ঞানে জ্ঞানবান,—সংসারের সকল তত্ত্বই তাঁহার অধিগত।]

জ্ঞানীকে বুঝিতে হইলে, জ্ঞান কি—বুঝিবার প্রয়োজন হয়। আবার জ্ঞানের স্বরূপ-তত্ত্ব যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাকেই জ্ঞানী বলিয়া বুঝিতে পারি। জ্ঞানীর জ্ঞানের নিদর্শন তাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে বিকাশমান। শ্রীকৃষ্ণ যে পরম জ্ঞানী, গীতার দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় তাহা বিশেষভাবেই হৃদ্‌গম্য হয়। শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান বারিধির গভীরতা যে অতলস্পর্শী, এক গীতায় নহে, যেখানেই তিনি প্রকাশমান, সেখানেই তাহা প্রত্যক্ষীভূত। মহাভারতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাঁহার জ্ঞানপ্রভা মানুষের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিবার জন্য যেমন আলোক সঞ্চার করিয়া আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে, ব্রহ্মপুরাণে, গরুড়পুরাণে, অগ্নিপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে এবং অন্য যে কোনও স্থানে তাঁহার আবির্ভাব দেখি, সেইখানেই তাঁহার জ্ঞানরশ্মি সমভাবে বিচ্ছুরিত রহিয়াছে। গীতায় অর্জ্জুনের মোহনাশ প্রসঙ্গে যেরূপ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধব-সম্মিলনে তাঁহার উক্তিতে সেইরূপই জ্ঞানের প্রস্রবণ উন্মুক্ত দেখি। গরুড়পুরাণে পূর্ব্ব-খণ্ডে গীতাসার বর্ণন-প্রসঙ্গে, তাঁহার জ্ঞানের সেই পরিচয়ই দেদীপ্যমান। ব্রহ্মপুরাণে তাহার জীবন কাহিনীতে সেই জ্ঞানই উদ্ভাসিত। আর আর যেখানে যেখানে তিনি, সেই সেই স্থানেই, বলিয়াছি তো, তাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে জ্ঞানীর জ্ঞান বিকাশমান। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে ও কার্য্যে, তিনি যে জ্ঞানাধার, সর্ব্বথা তাহা পরিব্যক্ত রহিয়াছে।

বাক্যে ও কার্য্যে জ্ঞানের পরিচয়।

বিষয়-বিশেষকে বুঝাইতে হইলে, কতকগুলি লক্ষণ নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়। যে বিষয়টি যে লক্ষণাক্রান্ত, লক্ষণ জানিয়া, তদনুসারে তাহাকে চিহ্নিত করা হইয়া থাকে। জ্ঞান ও জ্ঞানী—উভয়েরই পরিচায়ক লক্ষণাদি আছে। সেই দেখিয়া, জ্ঞান কি ও জ্ঞানী কে, নির্ণয় করা হয়। পরীক্ষার সেই কষ্টিপাথরে কষিয়া যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান-গবেষণার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন, শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হইবে। সুতরাং প্রথমে দেখা যাউক—জ্ঞান কি। অভিধান মতে—'জ্ঞানম্ বিশেষেণ,

জ্ঞানের স্বরূপ কি।

সামান্যেন চাববোধঃ।' অমরকোষ অনুসারে,—'মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।' অমরকোষের টীকাকার এই সূত্রের অর্থ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন; যথা,—

'মোক্ষে শিল্পে শাস্ত্রে চ যা ধীঃ সা জ্ঞানং বিজ্ঞানঞ্চোচ্যতে এষা বিশেষপ্রবৃত্তিঃ। অন্যত্র ঘটপটাদৌ যা ধীঃ সাপি জ্ঞানং বিজ্ঞানঞ্চোচ্যতে এষা সামান্যপ্রবৃত্তিঃ। মোক্ষে ধীর্জ্ঞানং বিজ্ঞানঞ্চ যথাজ্ঞানান্মুক্তিরিতি সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ইতি। অন্যত্র তথা জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে ইতি ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞানমিতি যে কেচিৎ প্রাণিনো লোকে সর্ব্বেবিজ্ঞানিনো মতাঃ ইতি। ব্রহ্মণো নিত্যবিজ্ঞানানন্দরূপত্বাদিতি এবং চিত্রজ্ঞানং ব্যাকরণজ্ঞানং ঘটপটবিজ্ঞানমিত্যাদিকং প্রযুজ্যত এব। মোক্ষনিমিত্তং শিল্পশাস্ত্রয়োর্ধীর্জ্ঞানমুচ্যতে তন্নিমিত্ততোঽন্যনিমিত্তঃ যা তয়োর্ধীঃ সা বিজ্ঞানমিতি কেচিৎ। মোক্ষবিষয়া মোক্ষফলা ধীর্জ্ঞানং অন্যধীর্বিজ্ঞানং কান্যত্র ইত্যাহ শিল্পশাস্ত্রয়োরিতি কেচিৎ। অববোধ ইত্যধ্যাহৃত্য মোক্ষবিষয়ে অববোধো ধীঃ অন্যত্র ঘটপটাদি বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রবিষয়ে বিজ্ঞানমিতি কেচিৎ। ইতি ভরতঃ।'

এ হিসাবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য লাভই, জ্ঞানের অন্তর্ভূত। মোক্ষানুসারিণী বুদ্ধি চাই, আবার শিল্প-বিজ্ঞানাদিতে অভিজ্ঞ হওয়া চাই। কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীর আদর্শ হইতে হইবে, আবার জ্ঞানক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে। জ্ঞান—তাহারই নাম। জ্ঞানীর অবস্থা সর্ব্বদিকে সকল ভাবের চরম স্ফূর্ত্তির অবস্থা। দর্শনকারগণ জ্ঞানের কত প্রকার বিবৃতি-ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে সকল দিকে সকল ভাবের চরম স্ফূর্ত্তির অবস্থাই জ্ঞান। ন্যায়মতে জ্ঞানের পরিচয়; —যথাভাষা-পরিচ্ছেদে,—

'অপ্রমা চ প্রমা চৈব জ্ঞানং দ্বিবিধমুচ্যতে। তৎশূন্যে তন্মতির্যা স্যাদপ্রমা সা নিরূপিতা॥ তৎপ্রপঞ্চো বিপর্য্যাসঃ সংশয়োঽপি প্রকীর্ত্তিতঃ। আদ্যো দেহ আত্মবুদ্ধিঃ শঙ্খাদৌ পীতিমা মতিঃ॥ ভবেন্নিশ্চয়রূপা সা সংশয়োঽথ প্রদর্শ্যতে। কিং স্বিন্নরো স্থাণুর্ব্বেত্যাদি বুদ্ধিস্তু সংশয়ঃ। তদ্ভাবাপ্রকারা ধীস্তৎপ্রকারা তু নির্ণয়ঃ॥ স সংশয়ো ভবেদ্‌যা ধীরেকত্রাভাবভাবয়োঃ। সাধারণাদিধর্ম্মস্য জ্ঞানং সংশয়কারণম্॥ দোষোঽপ্রমায়া জনকঃ প্রমায়াস্তু গুণো ভবেৎ। পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধো মতঃ॥ গুণঃ স্যাদ্‌ভ্রমভিন্নস্তু জ্ঞানমত্রোচ্যতে প্রমা। অথবা তৎপ্রকারং যজ্‌জ্ঞানং তদ্বৎ বিশেষ্যকম্॥ জ্ঞানং যন্নির্ব্বিকল্পাখ্যং তদতীন্দ্রিয়মিষ্যতে। তৎ প্রমাণাপ্রমাণাপি জ্ঞানং যন্নির্ব্বিকল্পকম্॥ প্রকারত্বাদিশূন্যং হি সম্বন্ধানবগাহনাৎ।''

প্রমা ও অপ্রমা ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। যাহা সত্য, সেই জ্ঞান প্রমা জ্ঞান; যাহা মিথ্যা বা ভ্রান্তি, তাহা অপ্রমা জ্ঞান। অপ্রমা জ্ঞানে পণ্ডিতকে মূর্খ দেখে, রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে করে। পিত্তরোগীর চক্ষে শ্বেত শঙ্খও পীতবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। অপ্রমা জ্ঞানে সেইরূপ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মনে করে। যে জ্ঞান সত্যস্বরূপ, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। সেই জ্ঞানে যিনি জ্ঞানবান, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। ন্যায়দর্শন সেই জ্ঞানেরই অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছেন। কেবল ন্যায়দর্শন বলিয়া নহে, সকল দর্শনই তত্ত্বজ্ঞানের সত্যজ্ঞানের অন্বেষণে প্রযত্নপর। শ্রীকৃষ্ণ সে সকল জ্ঞানেরই গূঢ়তত্ত্ব অবগত ছিলেন। জ্ঞান কাহাকে বলে, জ্ঞানের স্বরূপ লক্ষণ কি, গীতায় তিনি যে ভাবে তাহা ব্যক্ত

করিয়া গিয়াছেন; অমানিত্ব অদাম্ভিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানের তিনি যে লক্ষণসমূহ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি যে সর্ব্বজ্ঞানাধার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি যে জ্ঞান-সমুদ্র সেই প্রসঙ্গেই আমরা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি। * তার পর জ্ঞানের বিভাগ-ব্যপদেশেও— সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিনি যে জ্ঞানের বিভাগ বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহার দ্বারাও—তাঁহার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥
পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান। বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধিরাজসম্ ॥
যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্। অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥"

অর্থাৎ,—'যে জ্ঞানের দ্বারা এই বিভিন্ন আকারে প্রতীয়মান নিখিল জগতের সর্ব্বত্র, সেই একমাত্র অবিভক্ত অবিকার আত্মার ভাব পরিদৃষ্ট হয়, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান। আর যে জ্ঞানে প্রতি দেহে বিভিন্নগুণধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মার পৃথক পৃথক অস্তিত্ব অনুভূত হয়, তাহাই রাজসিক জ্ঞান। আর যে জ্ঞান কেবলমাত্র বহুল দেহকেই লক্ষ্য করে; আত্মা ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি যাহা কিছু অদৃশ্য পদার্থ আছে, তৎসমস্তকেই দেহ বা দেহীর বস্তু বলিয়া দেখে; যে জ্ঞানের কোনও প্রকার যুক্তি বা হেতু নাই, যাহা তত্ত্বার্থ প্রকাশক নহে, যাহা অতীব ক্ষুদ্র অর্থাৎ কোনও বিষয়ের অভ্যন্তর প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু কেবল বাহিরের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে তামস জ্ঞান বলিয়া থাকে।' জ্ঞানের এইরূপ ত্রিবিধ প্রকার-ভেদ বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যথন কর্ম্মাদির প্রকার-ভেদ করিয়াছেন, তথনই বুঝিতে পারা যায়,—শ্রীকৃষ্ণ কেমন জ্ঞানী ও কেমন কর্ম্মী! গীতার সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ-বর্ণন-প্রসঙ্গেও তিনি জ্ঞানের তত্ত্ব নিরূপিত করিয়া গিয়াছেন। পরম জ্ঞানী ভিন্ন এমন করিয়া জ্ঞান-তত্ত্ব প্রচারে কে সমর্থ হইতে পারে?

বদ্ধমুক্তের লক্ষণে। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা।

মনীষিগণ জ্ঞানের যে পরিভাষা নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে আমরা বুঝিতে পারি, সদসৎ সকল পদার্থের স্বরূপ-তত্ত্ব বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা, তাহাই জ্ঞান; অপিচ সকল কার্য্যে পারদর্শিতাও জ্ঞান। যিনি জ্ঞানী, তিনি সকল তত্ত্ব অবগত আছেন এবং সকল কর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। বেদ-বেদাঙ্গাদি নিখিল শাস্ত্র গ্রন্থ-সমূহ জ্ঞানীর অধিকৃত; অধিকন্তু জ্ঞানী যিনি, তিনি শিল্প-বিজ্ঞানেও প্রতিষ্ঠাপন্ন। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে জ্ঞানের এই সকল অঙ্গই পরিপুষ্ট দেখি। বেদ-বেদাঙ্গাদি নিখিল শাস্ত্র-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যে অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁহার প্রতি উক্তিতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। গীতার দার্শনিক গবেষণায় তিনি দর্শন-সমুদ্র মন্থন করিয়া, উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত যে সাররত্ন-সমূহ সমুদ্ধার করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতেও তাঁহার উক্তি মধ্যে সেইরূপ সম্পৎ দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে সপ্তম হইতে অষ্টাবিংশ পর্য্যন্ত অধ্যায়-দ্বাবিংশকে উদ্ধবকে তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন,

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৭ম—১১শ শ্লোকে তিনি জ্ঞানের যে লক্ষণাদি নির্ণয় করিয়াছেন, এই খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসে" ১৭২ম পৃষ্ঠায় জ্ঞান-সমুদ্র-প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তাহা গীতারই ন্যায় জ্ঞানের ভাণ্ডার। ঐ সকল অধ্যায়ে, অষ্টগুরুর প্রসঙ্গে, বদ্ধমুক্তাদির লক্ষণে, সাধুসঙ্গ-মহিমা কীর্ত্তনে, কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ-বিধি বর্ণনে, সাধন সহ ধ্যান-যোগ ব্যাখ্যানে, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিকথনে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম এবং ভক্তিযোগ, জ্ঞান-যোগ ও ক্রিয়াযোগ নিরূপণে, দ্রব্যাদির দোষগুণ ব্যাখ্যায় ও তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা মতের বিরোধ-ভঞ্জনে, সাঙ্খ্য-যোগ কথনে ও সত্ত্বাদি গুণের বৃত্তি প্রভৃতি নিরূপণে, ক্রিয়াযোগ ও পরমার্থ নির্ণয়ে, শ্রীকৃষ্ণ আপন জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভগবান বদ্ধমুক্তাদির লক্ষণ বিষয়ে, উদ্ধবকে যে উপদেশ দেন, তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ। গুণস্য মায়ামূলত্বাৎ ন মে মোক্ষ ন বন্ধনম্॥
শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া। স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্নতু বাস্তবী॥
বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে। বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥
অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে। বিরুদ্ধধর্ম্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেকধর্ম্মিণি॥
সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান॥
আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বানপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ॥
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্‌যথোত্থিতঃ। অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্‌যথা॥
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ। গৃহ্যমাণেষ্বহংকুর্য্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়॥
দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্ম্মণা। বর্ত্তমানোঽবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে॥
এবং বিরক্তঃ শয়ন আসনাটনমজ্জনে। দর্শনস্পর্শনঘ্রাণ-ভোজনশ্রবণাদিষু॥
ন তথা বধ্যতে বিদ্বান্ তত্র তত্রাদয়ন্ গুণাৎ। প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ॥
বৈশারদ্যেক্ষয়াসঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ। প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নান্নানাত্বাদ্‌বিনিবর্ত্ততে॥
যস্য স্যুর্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্। বৃত্তয়ঃ স বিনির্ম্মুক্তো দেহস্থোঽপি হি তদ্‌গুণৈঃ॥"

অর্থাৎ,—'সত্ত্বাদি গুণের আরোপে আত্মার বদ্ধ বা মুক্ত আখ্যা প্রদান করা হয়। কিন্তু বস্তুপক্ষে আত্মা বদ্ধ বা মুক্ত নহেন। গুণ মায়ামূলক; সুতরাং আত্মার বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই; মায়া দ্বারাই শোক মোহ সুখ দুঃখ ও দেহোৎপত্তি ঘটে। স্বপনে যেমন মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, সৃষ্টিও তাই; উহা অবাস্তব। শরীরি-গণের মোক্ষবন্ধকারী যে বিদ্যা ও অবিদ্যা, তাহারা আমারই দুই আদ্যাশক্তি এবং আমার মায়ার দ্বারা বিনির্ম্মিত। আমার অংশ-স্বরূপ এই অদ্বিতীয় অনাদি জীব অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধ হয় এবং বিদ্যা দ্বারা মুক্তি লাভ করে। এক অবস্থায় অবস্থিত বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত বদ্ধ ও মুক্ত জীবের বৈলক্ষণ্য সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পরস্পর সমান সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ দুইটী পক্ষী যদৃচ্ছা-ক্রমে বৃক্ষশাখে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিত আছে। ইহাদের এক জন পিপ্পলান্ন ভক্ষণ করে, অন্য জন নিরাহার হইলেও বলবান আছে। যে পিপ্পলান্ন আহার করে

না, সেই বিদ্বান্ আত্মাকে ও আত্মাতীত বস্তু-সমূহকে অবগত আছে। যে পিপ্পল ভক্ষণ করে, সে সেরূপ নহে। যে অবিদ্যার সহিত যুক্ত, সে নিত্যবদ্ধ, যে বিদ্যা-ময়, সে নিত্যমুক্ত। বিদ্বান জন, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায়, দেহস্থ হইয়াও দেহস্থ নহেন; কুমতি মূঢ় জন, স্বপ্নাবস্থের ন্যায়, অদেহস্থ হইয়াও দেহস্থ। ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় এবং গুণ দ্বারা গুণগণ গ্রহণ করিয়াও নির্বিকার বিদ্বান ব্যক্তি 'আমি গ্রহণ করিতেছি' এরূপ মনে করেন না। কিন্তু অজ্ঞিত অজ্ঞজন দৈবাধীন শরীর পরিগত করিয়া, গুণজনিত কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, 'আমি কর্ত্তা' ভাবিয়া, কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। বিদ্বানগণ, শয়ন উপবেশন পর্য্যটন মজ্জন দর্শন স্পর্শন ঘ্রাণ ভোজন শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়-সকলে বিরক্তভাবে ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ করাইলেও, তদ্দ্বারা বদ্ধ হন না। প্রকৃতিতে অবস্থিত হইলেও আকাশ সূর্য্য অনিল যেমন অসংসক্ত, বিদ্বানজন সেইরূপ বৈরাগ্য যোগ দ্বারা সংশয় ছিন্ন করেন এবং স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় দেহাদি প্রপঞ্চ হইতে নিবৃত্ত থাকেন। যাঁহার মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রাণ আচরণ সকল সঙ্কল্পশূন্য, তিনি দেহস্থ হইয়াও গুণগণ হইতে মুক্ত।' শ্রীভগবান বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের এই যে পরিচয় দিলেন, এই অল্পকয়েকটি কথার মধ্যে সকল জ্ঞানের সমাবেশ আছে। এখানেও সেই উপনিষদের আভাস, এখানেও সেই বেদান্তের কথা। 'সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ' ইত্যাদি শ্লোকে তিনি যে উপমার অবতারণা করিয়াছেন ঐ উপমা উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। যথা, মুণ্ডকোপনিষদে,—

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥'

অর্থাৎ,—'পরস্পর সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ দুইটী সুন্দর পাখী একই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত। তাহাদের একজন সুস্বাদু পিপ্পল-ফল ভক্ষণ করে, অপর জন ভক্ষণ করে না, কেবল দেখে। একই বৃক্ষে অবস্থিত এক জন অর্থাৎ জীব ঈশ্বরকে না দেখিয়া মুহ্যমান হইয়া শোক প্রকাশ করে, কিন্তু আবার ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলে, তাঁহার মহিমা অনুভব করিয়া বীতশোক অর্থাৎ শোকের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।' উপনিষদের এই বাণীই ভাগবতে কৃষ্ণোক্তিতে ধ্বনিত নহে কি? যতক্ষণ আত্মজ্ঞান না হয়, মানুষ ততক্ষণ উদ্ভ্রান্ত হইয়া ফিরে; কিন্তু যেই আত্মদর্শন হয়, অমনই সকল বিক্ষোভ বিদূরিত হয়। বেদান্তেও এই ভাব পরিস্ফুট দেখি। অদ্বৈত মতে এই জীবই ব্রহ্মত্ব লাভ করে—যখন তাহার ভেদজ্ঞান দূর হয়। দ্বৈতমতে পরমেশ্বরই সে ভেদ জ্ঞান দূর করিয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈতাদ্বৈতের সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। নানা মতের বিরোধ ভঞ্জনে তিনি বলিয়াছেন,—

"প্রকৃতেরেবমাত্মানমবিবিচ্যাবুধঃ পুমান্। তত্ত্বেন স্পর্শসংমূঢ়ঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে॥
সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন দেবান্ রজসাসুরমানুষান্। তমসা ভূততির্য্যক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্ম্মভিঃ॥
নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্। এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্নণীহোঽপ্যনুকার্য্যতে॥

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব। চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রমতীব ভূঃ॥
যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা। স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ॥
অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে। ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥
তস্মাদুদ্ধব মা ভুঙ্ক্ষ বিষয়ানসদিন্দ্রিয়ৈঃ। আত্মাগ্রহণনির্ভাতং পশ্য বৈকল্পিকং ভ্রমম্॥
ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলব্ধোঽসূয়িতোঽথবা। তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ॥
নিষ্ঠ্যূতো মূত্রিতো বাঽজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ। শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগত আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ॥"

অর্থাৎ,—'অবিবেকী পুরুষ প্রকৃতি হইতে আত্মাকে তত্বতঃ পৃথক বিচার না করিয়া, দেহাভিমান দ্বারা বিমূঢ় হইয়া সংসার প্রাপ্ত হয়। সত্ব সংসর্গ হেতু ঋষি ও দেব, রজঃ সঙ্গে অসুর ও নর এবং তমঃ সঙ্গে ভূত ও পশু পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে সে কর্ম্ম দ্বারা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। যেমন মনুষ্য নর্ত্তক ও গায়কদিগকে দেখিয়া তাহাদের অনুকরণ করে; সেইরূপ অনীহ জীব, বুদ্ধির গুণ সকল দর্শন করিয়া অনুকরণ করিতে বাধ্য হন। যেমন জল কম্পিত হইলে তীরস্থিত বৃক্ষ সকল যেন কম্পিত বলিয়া বোধ হয়; যেমন নয়ন ঘূর্ণমান হইলে, যেন পৃথিবীকে ভ্রমিত দেখায়; হে দাশার্হ! যেমন কামনাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তির বিষয়ানুভব এবং স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় অলীক; সেইরূপ আত্মার জন্ম মৃত্যু। এই পুরুষ বিষয়-নিকর চিন্তা করিতেছে, এ জন্য বিষয়-সকল বর্ত্তমান না থাকিলেও, স্বপ্নে অর্থপ্রাপ্তির ন্যায়, ইহার পক্ষে সংসার বিরাম হয় না। অতএব উদ্ধব! প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়-নিকর দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিও না; দেখ, বিকল্পসম্বন্ধীয় ভ্রম, আত্ম-অজ্ঞান বশতঃই অবভাসিত হইতেছে। অসাধু জনগণের তিরস্কৃত, অবমানিত, অসূয়িত, তাড়িত, বন্ধন করিয়া রক্ষিত, ভৃতি সকল হইত ধ্বংসিত, কিম্বা অজ্ঞজন কর্ত্তৃক নিষ্ঠীবন দ্বারা ব্যাপ্তীকৃত, অথবা মূত্র দ্বারা আর্দ্রীকৃত,—এইরূপ নানাবিধ কষ্টে পতিত হইয়াও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি পরমেশ্বরে নিষ্ঠা-সম্পন্ন হইয়া, আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবেন।' ইহার অধিক আর জ্ঞানের পরিচয় হইতে পারে না। 'আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ'; আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে; আপনার দ্বারা আপনার উপায় বিধান করিতে হইবে;—এ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, এ জ্ঞান অনুসারে যিনি কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার আর ভাবনা কি? জ্ঞানের ইহাই পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ যে পরম জ্ঞানী, 'আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ' এই একমাত্র বাক্যে তাহা প্রতীত হয়।

কোষ-গ্রন্থাদির অনুসরণে জ্ঞানের যে পরিভাষা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি,—তত্বজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বিজ্ঞানাদি বিষয়েও অভিজ্ঞতা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণে যে জ্ঞানের

শ্রীকৃষ্ণ সকল জ্ঞানে জ্ঞানবান।

সকল অঙ্গই পরিপুষ্টি-লাভ করিয়াছিল, তাঁহার জীবন-বৃত্ত আলোচনায় তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর কেমনভাবে সে শিক্ষা তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল, তাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে যেমন পরিচয় পাই, তাঁহার বাল্যজীবনের ইতিহাসেও সে পরিচয় তেমনই প্রাপ্ত হইতে পারি। তিনি যেখানে যে ভাবে যে যে বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে,—শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০ম স্কন্ধ, ৪৫শ অধ্যায়) যথা,—

"অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ। কাশ্যং সান্দীপনিং নাম হ্যবন্তিপুরবাসিনম্॥
যথোপসাদ্য তৌ দান্তৌ গুরৌ বৃত্তিমনিন্দিতাম্। গ্রাহয়ন্তাবুপেতৌ স্ম ভক্ত্যা দেবমিবাদৃতৌ॥
তয়োর্দ্বিজবরস্তুষ্টঃ শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ। প্রোবাচ বেদানখিলান্ সাঙ্গোপনিষদো গুরুঃ॥
সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং ধর্ম্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা। তথাচান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ ষড়্বিধাম্॥
সর্ব্বং নরবরশ্রেষ্ঠৌ সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তকৌ। স কৃৎনিগদমাত্রেণ তৌ সঞ্জগৃহতুর্নৃপ॥
অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃ কলাঃ। গুরুদক্ষিণয়াচার্য্যং ছন্দয়ামাসতুর্নৃপ॥"

উপনয়ন-সংস্কারের পর দ্বিজত্ব-লাভে রামকৃষ্ণ ভ্রাতৃদ্বয় ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করেন। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের পর তাঁহারা সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হন। সেখানে রামকৃষ্ণ কি কি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, উপরের শ্লোক-কয়েকটিতে তাহারই পরিচয় আছে। গুরুগৃহে অবস্থিতিকালে অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত তাঁহারা নিখিল বেদ শিক্ষা করেন। বেদের অঙ্গ বলিতে—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। বিভিন্ন বেদের বিভিন্ন উপনিষদের সংখ্যা-নির্ণয়-কল্পে দুই শতাধিক উপনিষদের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং অঙ্গ ও উপনিষৎ সহিত অখিল বেদ অধ্যয়নে কীদৃশ জ্ঞান-গবেষণার প্রয়োজন, সহজেই উপলব্ধি হয়। অঙ্গ ও উপনিষৎ সহ শ্রীকৃষ্ণ যে বেদ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার উক্তিতে মহাভারতে ভাগবতে সর্ব্বত্র প্রতিফলিত রহিয়াছে। তার পর, মন্ত্র ও দেবতা জ্ঞানের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন! সকল মন্ত্রের সকল দেবতার জ্ঞান—মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। রামকৃষ্ণ মনুষ্যের অতীত পরম পুরুষ ছিলেন; তাই তাঁহারা সকল দেবতা সকল মন্ত্র অধিগত করিতে সমর্থ হন। ধনুর্ব্বেদ—যুদ্ধশাস্ত্র। এই ধনুর্ব্বেদের মধ্যে যুদ্ধের উপযোগী সকল অস্ত্রেরই প্রসঙ্গ আসিতে পারে। বন্দুক, কামান প্রভৃতিও ধনুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত। এই ধনুর্বিদ্যায় বা এই যুদ্ধবিদ্যায় শ্রীকৃষ্ণ যে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে নিদর্শন বিদ্যমান। বিবিধ ধর্ম্ম, নীতিমার্গ, অন্বীক্ষকী বিদ্যা এবং ষড়্বিধ রাজনীতি শিক্ষা প্রসঙ্গেও তাঁহার জ্ঞান-গরিমার কি না নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়! আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিতে—আগম শাস্ত্র প্রতিপাদিত বস্তু-তত্ত্ব জ্ঞানের পর যে তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হয়, অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রজ্ঞান বলিয়া বুঝিতে পারি। গৌতমের ন্যায়-দর্শনকে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গীতায় বিশেষভাবে সাঙ্খ্য-দর্শনের মীমাংসা-দর্শনের ও বেদান্ত-দর্শনের বিষয় উল্লেখ হইয়াছে দেখিয়া যাঁহারা ন্যায়দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন, এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রসঙ্গে তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হইতে পারে। রাজনীতি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের অভিজ্ঞতা যে কত দূর ছিল, বিচ্ছিন্ন রাজশক্তির একীকরণে—সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। এই সকল বিদ্যা একবার শুনিবা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার জ্ঞান কতদূর পরিস্ফুট ছিল, স্বতঃই অনুভূত হইতে পারে। তিনি চতুঃষষ্টি অহোরাত্রে চতুঃষষ্টি কলা-বিদ্যা শিখিয়া লইয়াছিলেন। চতুঃষষ্টি কলা-বিদ্যা যে কি, সে বিবরণ আমরা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। গীত, বাদ্য, নৃত্য, নাট্য, আলেখ্য প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া, আকরজ্ঞান,

সঙ্গীতজ্ঞান, বাস্তু নির্ম্মাণ জ্ঞান প্রভৃতি মানুষের যাহা কিছু জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, সকলই এই চতুঃষষ্টি কলার অন্তর্ভুক্ত। * যিনি চতুঃষষ্টি কলায় নৈপুণ্য লাভ করিতে পারেন, তিনিই সঙ্গীতজ্ঞ, তিনিই বাদ্য-বিশারদ, তিনিই নৃত্য-পরায়ণ, তিনিই চারু-চিত্রকর, তিনিই ঐন্দ্রজাল, তিনিই দেশভাষাভিজ্ঞ—তাঁহার মানুষিক গুণের অবধি নাই। তিনি সকল গুণে গুণী, তিনি সকল জ্ঞানে জ্ঞানী। শ্রীকৃষ্ণ যে কলাবিদ্যা-বিশারদ ছিলেন, তাঁহার প্রাণোন্মাদিনী বেণুধ্বনিতে কর্ণে কর্ণে তাহার প্রতিধ্বনি জাগাইয়া রাখিয়াছে। তিনি যে নটন নিপুণ ছিলেন, তাঁহার সেই বাম হেলা ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম মূর্ত্তিতে তাহা প্রকাশমান রহিয়াছে। কলাবিদ্যার লক্ষণান্তর যে দশনবসনাঙ্গরাগ, তাঁহার তিলক-ভূষা পীতধড়া মোহন চূড়া প্রভৃতির মধ্যেই তাহা সমুজ্জল দেখিতে পাই। স্থাপত্যে, শিল্প কলায়—কোথায় শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান পরিস্ফুট নহে? তিনি যে বিজ্ঞান-শাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন, বিনা অগ্নিতে রথ-দাহ-ব্যাপারে তাহা প্রতিপন্ন হয়। † সভাগৃহ নির্ম্মাণে, দ্বারকায় নগরী-প্রতিষ্ঠায়, ‡ শ্রীকৃষ্ণের কৃতিত্ব আজিও জগৎ ঘোষণা করিতেছে। ফলতঃ, জ্ঞানের এমন কোনও অঙ্গই নাই, শ্রীকৃষ্ণ যে অঙ্গে অনভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সকল জ্ঞানের জ্ঞানী, তাই বলি—শ্রীকৃষ্ণ পরম জ্ঞানী।

* * *

৬। শ্রীকৃষ্ণ—পরম যোগী; কেন-না, যোগের সকল অঙ্গ সার-তত্ত্ব তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

[যোগ ও যোগী,—যোগ কি ও যোগী কাহাকে বলে,—শ্রীকৃষ্ণে যোগাঙ্গের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি,—যোগ বিষয়ে তাঁহার উপদেশে তাঁহাকে যোগশাস্ত্রবিশারদ বলিয়া বুঝা যায়,—শ্রীকৃষ্ণে যোগ-সাধনার ফল,—শ্রীকৃষ্ণ যে যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যাবলিতে তাহা প্রত্যক্ষীভূত।]

যোগ প্রভাবে মানুষ সর্ব্ববিধ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়, যোগ-প্রভাবে মানুষ কৈবল্য বা মুক্তি লাভ করে। যোগ কি, আর কিরূপ যোগে কীদৃশ সিদ্ধি অধিগত হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহা সকলই অবগত ছিলেন। গুরু-গৃহে যোগ সম্বন্ধে তিনি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, জীবনে কার্য্য-পরম্পরায় তাহার প্রভাব প্রত্যক্ষ করাইয়া গিয়াছেন। যোগ কি আর যোগীই বা কেমন, প্রথমে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া যাউক। তার পর শ্রীকৃষ্ণ কেমন যোগী কেমন যোগ-তত্ত্বজ্ঞ

যোগ ও যোগী।

---

* পৃথিবীর ইতিহাস চতুর্থ খণ্ডে 'কলাবিদ্যা' প্রসঙ্গে একাদশ পরিচ্ছেদে এতদ্বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† মহাভারত, শল্যপর্ব্বে, একষষ্টিতম অধ্যায়ে এতদ্বিবরণ দ্রষ্টব্য।

‡ দ্বারকায় নগর-নির্ম্মাণে শ্রীকৃষ্ণ যে স্থপতি-বিদ্যার বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে (দশম স্কন্ধে ৫০ অধ্যায়ে ৪৮-৫১ শ্লোকে) তাহার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যবন রাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে হঠাৎ যদি জরাসন্ধ আসিয়া মথুরা আক্রমণ করেন, তাহা হইলে আত্মীয়স্বজনের প্রাণরক্ষা কঠিন হইবে। এই মনে করিয়া সমুদ্রের মধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত এক দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে তিনি এক অপূর্ব্ব নগর নির্ম্মাণ করেন। ঐ নগরে বিশ্বকর্ম্মার বিজ্ঞান ও শিল্প-নৈপুণ্য দৃষ্ট হইয়াছিল। ভাগবতে তাহার বর্ণনা,—

"ইতি সম্মন্ত্র্য ভগবান্ দুর্গং দ্বাদশযোজনম্। অন্তঃসমুদ্রে নগরং কৃৎস্নাদ্ভুতমচীকরৎ॥
দৃশ্যতে যত্র হি ত্বাষ্ট্রং বিজ্ঞানং শিল্পনৈপুণম্। রথ্যাচত্বরবীথীভির্যথাবাস্তু বিনির্ম্মিতম্॥

ছিলেন, তাহা বুঝা যাইবে। শাস্ত্র (বিষ্ণুপুরাণ, ষষ্ঠ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ) বলিয়াছেন,—

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বন্ধস্য বিষয়াসঙ্গি মুক্তের্নির্বিষয়ং তথা॥
বিষয়েভ্যঃ সমাহৃত্য বিজ্ঞানাত্মা মনো মুনিঃ। চিন্তয়েন্মুক্তয়ে তেন ব্রহ্মভূতং পরেশ্বরম্॥
আত্মভাবং নয়ত্যেবং তদ্‌ব্রহ্মধ্যায়িনং মুনে। বিকার্য্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা॥
আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ। তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে॥
এবমত্যন্তবৈশিষ্ট্য যুক্তকর্ম্মোপলক্ষণঃ। যস্য যোগঃ স বৈ যোগী মুমুক্ষুরভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ,—মনই মনুষ্যের বন্ধ ও মুক্তির কারণ; মন যখন বিষয়ে আসক্ত হয়, তখন বন্ধের এবং যখন বিষয় পরিত্যাগ করে, তখন মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। জ্ঞানী মুনিজন বিষয় হইতে মনকে সমাহৃত করিয়া মুক্তির জন্য ব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বরের চিন্তা করিবেন। হে মুনে! যেমন চুম্বক প্রস্তর দ্বারা লৌহ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মও এইভাবে চিন্তিত হইলে, স্বভাবতঃই যোগীকে আত্মভাবে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। মনের এই প্রকার গতি আপনারই যত্নসাপেক্ষ; ব্রহ্মে সেই মনোগতির সংযোগের নামই যোগ। যাহার যোগ এতাদৃশ ধর্ম্ম দ্বারা আক্রান্ত, সেই ব্যক্তিকে যোগী ও মুমুক্ষু বলা যায়।' এই যোগের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ গীতা শাস্ত্রে তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে, যোগকে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া, তিনি যোগের গুহ্য ও চরম তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। যোগ-প্রভাবে মানুষ কত অবস্থা লাভ করিতে পারে, কত অলৌকিক আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় এবং শেষে কেমন ভাবে আত্ম-স্বরূপে বিলীন হইয়া যায়, তাঁহার উক্তিতে নানা স্থানে সে তত্ত্ব বিশদীকৃত। গীতায় তিনি যোগ সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ভাগবতে সে উপদেশ যেন আরও একটু প্রশস্তভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধির বিষয় গীতায় বিশেষভাবে উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু ভাগবতে সেই অষ্টাদশ সিদ্ধির বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগবতে উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বুঝাইয়াছেন যে, যোগ-শাস্ত্র মতে সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার। তদন্তর্গত আটটী সিদ্ধি শ্রীভগবানের আশ্রয়ভূত; অবশিষ্ট দশটী সত্ত্বাদি গুণোৎ-কর্ষ-হেতু লব্ধ। প্রথমোক্ত আটটী সিদ্ধি; যথা,—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য,

---

সুরদ্রুমলতোদ্যানবিচিত্রোপবনান্বিতম্। হেমশৃঙ্গৈর্দিবিস্পৃগ্‌ভিঃ স্ফাটিকাট্টালগোপুরৈঃ॥
রাজতারকুটৈঃ কোষ্ঠৈর্হেমকুম্ভৈরলঙ্কৃতৈঃ। রত্নকূটৈর্গৃহৈর্হৈমৈর্মহামারকতস্থলৈঃ॥
বাস্তোষ্পতীনাঞ্চ গৃহৈর্বল্লভীভিশ্চ নির্ম্মিতম্। চাতুর্ব্বর্ণ্যজনাকীর্ণং যদুদেবগৃহোল্লসৎ॥"

চতুঃষষ্টি কলার প্রধান কলা যে বাস্তু-নির্ম্মাণ, এই বর্ণনায় তাহার চরম চিত্র প্রকটিত দেখি। সমুদ্র মধ্যে নগর; বিস্তৃত উদ্যান-উপবনাদি সমন্বিত রাজমার্গাদি পরিশোভিত সেই নগর অমরপুরীকেও যেন সৌন্দর্য্যে পরাভূত করিয়াছিল। স্বর্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট অনন্তস্পর্শী স্ফটিক-নির্ম্মিত অট্টালিকা ও গোপুর প্রভৃতির বর্ণনায় কাদৃশ কৃতিত্বের বিষয় অবগত হওয়া যায়? চাতুর্ব্বর্ণের বাসোপযোগী করিয়া বাস্তু-দেবতা প্রভৃতির মন্দিরাদিতে বিভূষিত করিয়া কত অল্প সময়ের মধ্যে সমুদ্র-গর্ভে সে নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বাস্তু-নির্ম্মাণ বিদ্যায় শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ অভিজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ বৃন্দাবন নগরী নির্ম্মাণেও শ্রীকৃষ্ণের কৃতিত্ব-কথা কীর্ত্তিত আছে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড, ১৭শ অধ্যায়।)

ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা। * এ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের উক্তি (১১শ স্কঃ ১৫শ অঃ); যথা,—

"সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণাযোগপারগৈঃ। তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ॥
অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ। প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা॥
গুণেষসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি। এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ॥"

এই অষ্টবিধ সিদ্ধির মধ্যে অণিমা, মহিমা ও লঘিমা তিন প্রকার সিদ্ধি দেহের সিদ্ধি মধ্যে গণ্য। প্রাপ্তি-নাম্নী সিদ্ধি সর্ব্বপ্রাণীর ইন্দ্রিয়গণ সহ তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবগণের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত। পারলৌকিক ও দর্শনযোগ্য সমুদায় বিষয়ে যে ভোগদর্শন সামর্থ্য, তাহা প্রাকাম্য সিদ্ধি। মায়ার দ্বারা শক্তি-সকলের যে প্রেরণ-ক্ষমতা, তাহাই ঈশিতা সিদ্ধি। বিষয়-ভোগে সঙ্গহীনতা, তাহাই বশিতা সিদ্ধি। যাহা কামনার অন্তর্ভুক্ত, তাহাই করতলগত,—এবম্ভূত যে সিদ্ধি, তাহাই কামাবসায়িতা সিদ্ধি। ইহার পর, গুণ জন্য সিদ্ধি; যথা,—

"অনূর্ম্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্। মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্॥
স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহ ক্রীড়ানুদর্শনম্। যথা সঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতা গতি॥"

অর্থাৎ,—'গুণ-হেতু সিদ্ধি ফলে ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকিবে না, অতি দূরের সামগ্রী দেখিতে পাইবেন, অতি দূরের শব্দ শ্রুতিগোচর হইবে, মনের গতি অনুসারে দেহের গতি-সামর্থ্য জন্মিবে, যাহা ইচ্ছা তাহাই লাভ করা যাইবে, পরের শরীরে প্রবেশ-ক্ষমতা জন্মিবে, মৃত্যু স্বেচ্ছাধীন থাকিবে, দেবতারূপ ধারণ করিয়া অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়া করিতে সামর্থ্য জন্মিবে, সঙ্কল্পানুরূপ প্রাপ্তি ঘটিবে, আজ্ঞা অপ্রতিহতা থাকিবে।' এই দশবিধ সিদ্ধি গুণজনিত সিদ্ধি নামে অভিহিত হয়। এ ভিন্ন যোগ-ধারণার প্রভাবে আরও কয়েক

---

* মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই অষ্ট-সিদ্ধি একটু বিশেষভাবে আলোচিত আছে; যথা,—

"অণিমা লঘিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ। প্রাকাম্যঞ্চ তথেশিত্বং বশিত্বঞ্চ তথা পরম্॥
যত্র কামাবসায়িত্বং গুণানেতাংস্তথৈশ্বরান্। প্রাপ্নোত্যষ্টৌ নরব্যাঘ্র পরং নির্ব্বাণসূচকান্॥
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমোঽণীয়ান্ শীঘ্রত্বং লঘিমা গুণ। মহিমাশেষ পূজ্যত্বাৎ প্রাপ্তির্নাপ্রাপ্যমস্য যৎ॥
প্রাকাম্যমস্য ব্যাপিত্বাদীশিত্বঞ্চেশ্বরো যতঃ। বশিত্বাদ্বশিমা নাম যোগিনঃ সপ্তমো গুণঃ॥
যত্রেচ্ছা স্থানমপ্যুক্তং যত্র কামাবসায়িতা। ঐশ্বর্য্যকারণৈরেভির্যোগিনঃ প্রোক্তমষ্টধা॥
মুক্তিসংসূচকং ভূপ পরং নির্ব্বাণমাত্মনঃ। ততো ন জায়তে নৈব বর্দ্ধতে ন বিনশ্যতি॥"

অর্থাৎ,—'নির্লিপ্ত যোগী পুরুষ অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব, এই অষ্টবিধ নির্ব্বাণপ্রদ ঐশ্বরিক গুণের অধিকারী হইয়া থাকেন। যাহার দ্বারা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম হওয়া যায়, তাহার নাম অণিমা; যাহার দ্বারা ক্ষিপ্রকারিত্ব জন্মে, তাহাকে লঘিমা কহে; যাহার দ্বারা সকলের পূজনীয় হওয়া যায়, তাহার নাম মহিমা; যাহার দ্বারা অভিলষিত সকলই লাভ হয়, তাহাকে প্রাপ্তি কহে; যদ্দ্বারা ব্যাপিত্ব-শক্তি জন্মে, তাহার নাম প্রাকাম্য; যাহার প্রভাবে সকলের ঈশ্বর হওয়া যায়, তাহাকে ঈশিত্ব কহে; এবং যাহার প্রভাবে সকলেই বশীভূত হয়, তাহার নাম বশিত্ব। এই বশিত্বই যোগিপুরুষের সপ্তম গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আর যাহা দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে যথাতথা গমন ও ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্যই সাধন করা যাইতে পারে, তাহারই নাম কামাবসায়িতা। বস্তুতঃ, যোগিব্যক্তি এই অষ্ট প্রকার গুণের প্রভাবে ঈশ্বরের ন্যায় সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই সকল গুণই মুক্তির সংসূচনা করিয়া দেয়, অর্থাৎ এই সকল গুণ প্রকাশিত হইলে জানিবে যে, যোগী অচিরে মুক্তি লাভ করিবে। ইহার পর তাঁহার জন্ম-বৃদ্ধি-নাশ নাই।'"

প্রকার সিদ্ধি আপনি অধিগত হইয়া থাকে। যথা (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, ১৫শ অধ্যায়),—

"ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা। অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ॥
এতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণসিদ্ধয়ঃ। যয়া ধারণয়া যা স্যাদ্‌যথা বা স্যান্নিবোধ মে॥"

অর্থাৎ,—'যোগধারণায় আরও যে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা এই; যথা,—ত্রিকালজ্ঞতা, শীতোষ্ণাদির দ্বারা অভিভূত না হওয়া, অগ্নি সূর্য্য জল প্রভৃতির স্তম্ভন-সামর্থ্য এবং তাহাদিগের দ্বারা কোনরূপে অভিভূত না হওয়া, ইত্যাদি।' এবম্বিধ অলৌকিক ক্রিয়া-প্রদর্শন, বলা বাহুল্য, চরম সিদ্ধি নহে; চরম সিদ্ধির অবস্থায় যোগী উপনীত হন তখন—যখন তাঁহার আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়। তাই এই সকল সিদ্ধির বিষয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরিশেষে সারভূত সিদ্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। অণিমা, লঘিমা, মহিমা প্রভৃতি সিদ্ধির সার্থকতা কোথায়, উপসংহারে তাহাই প্রদর্শন করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণোক্তি, যথা,—

"ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ময়ি তন্মাত্রং ধারয়েন্মনঃ। অণিমানমবাপ্নোতি তন্মাত্রোপাসকো মম॥
মহত্তত্ত্বাত্মনি ময়ি যথাসংস্থং মনো দধৎ। মহিমানমবাপ্নোতি ভূতানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
পরমাণুময়ে চিত্তং ভূতানাং ময়ি রঞ্জয়ন্। কালসূক্ষ্মাত্মতাং যোগী লঘিমানমবাপ্নুয়াৎ॥
ধারয়ন্ ময্যহংতত্ত্বে মনো বৈকারিকেঽখিলম্। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি মন্মনাঃ॥
মহত্যাত্মনি যঃ সূত্রে ধারয়েন্ময়ি মানসম্। প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠ্যং মে বিন্দতেঽব্যক্তজন্মনঃ॥
বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে। স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্রচোদনাম্॥
নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে। মনো ময্যাদধদ্‌যোগী মদ্ধর্ম্মা বশিতামিয়াৎ॥
নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ। পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোঽবসীয়তে॥"

অর্থাৎ—"যিনি সূক্ষ্মভূতাত্মক আমাতে সূক্ষ্মভূতাকার চিত্ত ধারণা করেন, সেই সূক্ষ্ম ভূতের উপাসক আমার অণিমা সিদ্ধি লাভ করেন। মহত্তত্ত্বাত্মক আমাতে মহত্তত্ত্বাত্মক মন ধারণ করিয়া মহিমা লাভ করেন এবং আকাশাদি আমাতে মন ধারণা করিয়া সেই সেই ভূতগণের মহিমা প্রাপ্ত হন। ভূত-সকলের পরমাণুস্বরূপ আমাতে চিত্ত ধারণা করিয়া যোগী কাল-সূক্ষ্মাত্মক লঘিমা লাভ করেন। বৈকারিক অহংতত্ত্বাত্মক আমাতে একাগ্রচিত্ত নিবেশ করিয়া আমাতে নিহিতচিত্ত ব্যক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে সকল ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধরূপ প্রাপ্তি-সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। সূত্রভূত মহান্ আত্মস্বরূপ আমাতে যিনি মন ধারণা করেন, তিনি অব্যক্তজন্মা আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাকাম্য সিদ্ধি লাভ করেন। ত্রিগুণা মায়ার অধীশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণুস্বরূপ আমাতে মন ধারণা করিলে জীবও তদীয় উপাদেয় সকলের প্রেরণারূপা ঈশিতা-সিদ্ধি লাভ করিবেন। ভগবান শব্দে শব্দিত তুরীয় নারায়ণ স্বরূপ আমাতে মন ধারণ করিয়া মদ্ধর্ম্মসম্পন্ন যোগী বশিতা সিদ্ধি লাভ করিবেন। নির্গুণ ব্রহ্ম আমাতে বিশদ মন ধারণ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন; তাহাতে সমুদায় অভিলাষ সমাপ্ত হইয়া থাকে।" এখানে চিদবস্থার প্রসঙ্গ উত্থাপিত। লোকালোকের অতীত চিন্ময়ের সহিত চিত্তের সংযোগ যে অবস্থায় হয়, তাহারই বিষয় এস্থলে বলা হইয়াছে। এ হিসাবে, সকল সিদ্ধির সার সিদ্ধি—কামাবসায়িতা। এই সিদ্ধিতেই সকল সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা; এই সিদ্ধির প্রথম স্তর—কর্ম্মফলত্যাগ—কামনা-বিসর্জ্জন।

যে বিষয়ে যাঁহার অভিজ্ঞতা যত অধিক, সেই বিষয় তিনি তত সুন্দরভাবে, বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হন। সংসারের শিক্ষা-ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, যে অধ্যাপক যে বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ, অধ্যাপনা-কালে সেই বিষয়ে তাঁহার অধিক পারদর্শিতা প্রকাশ পায়। গীতায়, ভাগবতে এবং অন্যান্য স্থানে যোগ-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যোগ-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্ববিধ অভিজ্ঞতার নিদর্শন দেখিতে পাই। তিনি যেমনভাবে যোগ-ক্রিয়ার বিভাগ বিধান করিয়া গিয়াছেন, তিনি যেমনভাবে আপামর সাধারণ সকলকে যোগ-মার্গে অগ্রসর করিবার জন্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যোগের গুহ্যাদপিগুহ্য তত্ত্ব যে তাঁহার অধিগত ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যম নিয়ম প্রভৃতি যোগের অঙ্গগুলিকে অতি অল্প কথায় তিনি যেমন বোধগম্য করাইয়াছেন; তার পর যোগের সার-সমুদ্ধারে—ভক্তি-যোগ জ্ঞান-যোগ ও ক্রিয়াযোগ বিষয়ে—তিনি যেমন সরল ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন; তেমন আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। যোগাঙ্গের এক একটী বিষয় জানিবার জন্য উদ্ধব তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। যম নিয়ম কি, শম দম তিতিক্ষাই বা কি, দান তপ শৌর্য্য সত্য প্রভৃতিই বা কি,—এবম্বিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ কত সরল ভাবে, কিরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, অনুধাবন করুন (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, ১৯শ অঃ);—

শ্রীকৃষ্ণে যোগাঙ্গের পূর্ণস্ফূর্ত্তি।

"অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়। আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমা ভয়ম্॥
শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনম্। তীর্থাটনং পরার্থেহাতুষ্টিরাচার্য্যসেবনম্॥
এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতাঃ। পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকামং দুহন্তি হি॥
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ। তিতিক্ষা দুঃখসম্মর্ষো জিহ্বোপস্থঃ জয়ো ধৃতিঃ॥
দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামত্যাগস্তপঃ স্মৃতঃ। স্বভাববিজয়ঃ শৌর্য্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনম্॥
অন্যচ্চ সুনৃতাবাণী কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা। কর্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগ সন্ন্যাস উচ্যতে॥
ধর্ম্ম ইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ। দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলম্॥
ভগো মে ঐশ্বরো ভাবো লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ। বিদ্যাত্মনি-ভিদাবাধো জুগুপ্সা হ্রীবকর্ম্মসু॥
শ্রীর্গুণা নৈরপেক্ষ্যাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ। দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ॥
মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ। উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ॥
নরকস্তমউন্নাহো বন্ধুর্গুরুরহং সখে। গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্য উচ্যতে॥
দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ। গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসঙ্গোবিপর্য্যয়ঃ॥"

যম ও নিয়মের সাধন দ্বারা মানুষ মোক্ষ আহরণ করিতে সমর্থ হয়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গাবলম্বিগণের দ্বাদশটি করিয়া যম ও নিয়ম বিহিত আছে; যথা,—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অর্থাৎ মনে বা কারণে পরস্বাপহরণে বিরতি), অসঙ্গ, লজ্জা, অসঞ্চয়, আস্তিক্য (অর্থাৎ স্বধর্ম্মে বিশ্বাস), ব্রহ্মচর্য্য, শৌচ (বাহ্যাভ্যন্তর ধৌত), মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, ভয়, জপ, তপ, হোম, ধর্ম্মে আদর, আতিথ্য, ভগবদর্চ্চন, তীর্থভ্রমণ, পরকার্য্যে সন্তোষ ও আচার্য্য-সেবা। এই সকল যম নিয়ম দ্বারা মানুষ কামনানুসারে মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। ইহার পর একে একে শম-দমাদির অর্থ বুঝাইয়া শ্রীভগবান বলিতেছেন,—"শম অর্থে—শান্তি মাত্র

শম—মন্নিষ্ঠতা অর্থাৎ ভগবচ্চিত্ততা, দম অর্থে—চৌরাদি দমন নয়—ইন্দ্রিয় সংযম, তিতিক্ষা—দুঃখসহন, (ভারবহনে নহে), ধৃতি—জিহ্বা উপস্থ জয়—বেগধারণ (অনুদ্বেগ নয়), দান—দণ্ড পরিত্যাগ (ধনার্পণ নয়), তপঃ—কাম্য-ত্যাগ (ভোগ জন্য কৃচ্ছ্রাদি নহে), শৌর্য্য—স্বভাব-বাসনা বিজয় (বল প্রকাশ নয়), সত্য—সমদর্শন (কেবল যথার্থভাষণ নহে) এবং সত্য ও প্রিয় বাক্ অর্থাৎ বিবেকসম্পন্ন, শৌচ—কর্ম্মে অনাসক্তি (কেবল মলত্যাগরূপ শৌচ নহে), সন্ন্যাস—কর্ম্মত্যাগ, ধর্ম্ম—মনুষ্য-মাত্রের ইষ্টসাধন (পশু মাত্রের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম নহে) যজ্ঞ—ভগবদ্বুদ্ধি (আমাকে ভগবান জানিয়া অর্চ্চনা), দক্ষিণা—যজ্ঞার্থ দান জ্ঞানোপদেশ (হিরণ্যাদি দান নহে), প্রাণায়াম—মনোদমন-জনিত উৎকৃষ্ট বল, ভাগ্য—আমার ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণ, উত্তম লাভ—আমার প্রতি ভক্তি (পুত্রাদি লাভ, লাভ নহে), বিদ্যা—আত্মাতে অভেদ জ্ঞান (কেবল লেখা-পড়া শিক্ষা নহে), লজ্জা—অকর্ম্মে হেয়ত্ব দর্শন, শ্রী—নিরপেক্ষতার গুণ (কিরীটাদি ভূষণে নহে), সুখ—সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থা (ঐহিক সুখজনিত নহে), দুঃখ—বিষয়ভোগাপেক্ষা (অগ্নিদাহাদি জনিত নহে), পণ্ডিত—বন্ধমোক্ষবিৎ (কেবল বিদ্বজ্জন নহে), মূর্খ—দেহ গেহাদিতে অভিমানী, পন্থা—নিবৃত্তি মার্গ (কণ্টকাদি শূন্য যে পথ, সে পথ নহে) অর্থাৎ যে পথে ভগবানকে পাওয়া যায়, উৎপথ—চিত্ত-বিক্ষেপ প্রবৃত্তি-মার্গ, স্বর্গ—সত্ত্বগুণের উদয় (ইন্দ্রাদি লোক নহে), নরক—তমোগুণের উদ্রেক (তামিস্রাদি নহে), বন্ধু—গুরুই বন্ধু (ভ্রাতাদি নহে) অর্থাৎ জগদ্গুরু ভগবান, গৃহ—ভোগায়তন শরীর (হর্ম্ম্যাদি নহে), আঢ্য—গুণসম্পন্ন ব্যক্তি (ধনী নহে), দরিদ্র—অসন্তুষ্ট ব্যক্তি (নিঃস্ব নহে), কৃপণ—অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি (দীন নহে), ঈশ্বর—বিষয়ে অনাসক্ত বুদ্ধি (রাজাদি নহে), অনীশ্বর—গুণগণে যাহার আসক্তি।” এইরূপে শমদমাদির অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—

“কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ। গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ॥”

অর্থাৎ,—গুণ ও দোষের লক্ষণ অধিক বর্ণনা করা বাহুল্য। এক কথায় এই বলিলেই বলা যায়,—দোষ-গুণ-দর্শনই দোষ, আর দোষ গুণ বিবর্জ্জিত হওয়াই গুণ। সেই দোষগুণ-বিবর্জ্জিত অবস্থাই বা কেমন, আর কি প্রকারেই বা সেই দোষ গুণের অতীত অবস্থায় উপস্থিত হওয়া যায়, ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ ও ক্রিয়াযোগ নিরূপণ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তাহা বিবৃত করিতেছেন,—

“যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।”

‘মনুষ্যগণ যাহাতে মোক্ষলাভে সমর্থ হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমি জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ও ভক্তিযোগ—ত্রিবিধ যোগের বিষয় বিবৃত করিয়াছি। তদ্ভিন্ন মানুষের মুক্তির আর অন্য উপায় নাই। কর্ম্মমাত্রকে দুঃখমূলক মনে করিয়া, কর্ম্মফলে বিরক্তি-বশে যাঁহারা কর্ম্ম-ত্যাগে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই জ্ঞানযোগী অর্থাৎ জ্ঞান-প্রভাবে তাঁহারা মোক্ষাধিকারী। কর্ম্মসকলে দুঃখবুদ্ধি শূন্য হইয়া ফলকামনা বর্জ্জন পূর্ব্বক যাঁহারা কর্ম্ম করিতে পারেন, তাঁহারা কর্ম্মযোগী অর্থাৎ তাঁহাদের কর্ম্মই সিদ্ধিপ্রদ। আর যাঁহারা ভাগ্যফলে ভগবৎপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং কর্ম্মফলে অবিরক্ত ও অনাসক্ত, তাঁহারাই

ভক্তিযোগী, অর্থাৎ তাঁহাদেরই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ।' কঠোর যোগতত্ত্বকে শ্রীকৃষ্ণ কত ভাবে কত রূপে সাধারণের বোধগম্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সর্ব্ব অবস্থায় সকল মানুষ যোগ-পথে অগ্রসর হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে যোগের প্রতি স্তর প্রতি সোপান, তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অভ্যাসই যে যোগের আদি স্তর, অভ্যাসে অভ্যস্ত হইতে হইতে মানুষ যে যোগ-শিক্ষায় সমর্থ হইবে, এ উপদেশ তিনি পুনঃপুনঃ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে যোগের প্রথম স্তর তিনি কিরূপ বিশদভাবে বুঝাইতেছেন, দেখুন (শ্রীমদ্ভাগবত, একাদশ স্কন্ধ, চতুর্দ্দশ অধ্যায়),—

"সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম। হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ॥
প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ। বিপর্য্যয়েণাপি শনৈরভ্যসেন্নির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
হৃদ্যবিচ্ছিন্নমোঙ্কারং ঘণ্টানাদং বিসোর্ণবৎ। প্রাণেনোদীর্য্য তত্রাথ পুনঃ সংবেশয়েৎ স্বরম্॥
এবং প্রণবসংযুক্তং প্রাণমেব সমভ্যসেৎ। দশকৃত্বস্ত্রিষবণং মাসাদর্ব্বাগ্ জিতানিলঃ॥
হৃৎপুণ্ডরীকমন্তঃস্থমূর্দ্ধনালমধোমুখম্। ধ্যাত্বোর্দ্ধমুখমুন্নিদ্রমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্।
কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ সূর্য্যসোমাগ্নীনুত্তরোত্তরম॥ বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্রূপং মমৈতদ্ধ্যানমঙ্গলম্।
সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজম্॥ সুচারু সুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্।
সমানকর্ণবিন্যস্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥ হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বনমালাবিভূষিতম॥ নূপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্।
দ্যুমৎ কিরীটকটক-কটিসূত্রাঙ্গদাযুতম্॥ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম্।
সুকুমারমভিধ্যায়েৎ সর্ব্বাঙ্গেষু মনো দধৎ॥ ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য তন্মনঃ।
বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্ব্বতঃ॥ তৎ সর্ব্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্রধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্॥ তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি।
বিচষ্টে ময়ি সর্ব্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষিসংযুতম্॥ ধ্যানেনেত্থং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ।
সংযাস্যত্যাশু নির্ব্বাণং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ॥" (৩২শ—৪৬শ শ্লোক)

কেমনভাবে যোগাসনে উপবেশন করিতে হইবে, কেমনভাবে পূরক কুম্ভক রেচক দ্বারা প্রাণপথ শোধন করিতে হইবে, কেমনভাবে প্রাণায়াম প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে হইবে, কেমনভাবে অষ্টাঙ্গ-যোগ সাধন করিতে হইবে, আর পরিশেষে কেমনভাবে যোগী নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিবেন, উপরিউদ্ধৃত শ্লোক কয়েক পংক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ তাহারই আভাষ দিয়াছেন। যোগমার্গাবলম্বিগণ তাঁহার ঐ উপদেশ অনুসরণে উপযুক্ত গুরুর সাহায্যে যোগ-মার্গে অগ্রসর হইতে পারেন। ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া মনকে সর্ব্বতোভাবে ভগবানে ন্যস্ত রাখিতে হইবে। অগ্নির মধ্যে তাঁহার সেই অনুপম রূপ ধ্যান করিতে করিতে তন্ময়ত্ব আসিবে। চরণ-পঙ্কজ হইতে ক্রমে ক্রমে মুখকমলে দৃষ্টি ন্যস্ত হইবে, শেষে আত্মাতে আত্মার দর্শন লাভ ঘটিবে। ফলতঃ, যোগের স্তর-পর্য্যায় প্রদর্শন করিয়া নিগূঢ় যোগ-তত্ত্ব প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ যে আপনার যোগাভিজ্ঞতার বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কোনই সংশয় নাই।

যোগ-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শ্রীকৃষ্ণকে যেমন যোগজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার অমানুষিক কর্ম্ম-পরম্পরা দৃষ্টে তাঁহাকে সেইরূপ যোগিশ্রেষ্ঠ পরমযোগী বলিয়া বুঝিতে পারি। যোগী যোগ-প্রভাবে অতি দূরের শব্দ শুনিতে পান; আবার যোগী যোগ-প্রভাবে মনোগতির ন্যায় দ্রুতগতি লাভ করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এই দুই দৃশ্যই দৃশ্যমান। কোথায় হস্তিনা, আর কোথায় দ্বারকা! দ্রৌপদী কাতর-কণ্ঠে ডাকিলেন,—"হে গোবিন্দ! হে দ্বারকা-বাসিন্! আমার লজ্জা নিবারণ করুন।" শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে সেই ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন; সঙ্কট-মোচন, দ্রৌপদীর সে সঙ্কট মোচন করিলেন। একবার নয়, একটী দৃষ্টান্তে নয়; মূর্ত্তিমান ক্রোধ-স্বরূপ দুর্ব্বাসা যখন পাণ্ডবগণের আশ্রমে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, দ্রৌপদী কি সঙ্কটে পড়িয়া কি ডাক ডাকিয়াছিলেন, স্মরণ করিয়া দেখুন। কত দূরের ক্রন্দন-ধ্বনি কেমন ভাবে তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, আর কিরূপে আসিয়া সেই বনে কিরূপ ভাবে তিনি দ্রৌপদীর মুখ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করিয়া দেখুন। সে কি যোগীর যোগ-প্রভাব নহে? সে কি 'দূরশ্রবণদর্শনম' দূরে শ্রবণ-দর্শনে সিদ্ধিলাভ নহে? আর, সে কি 'মনোজবঃ' অর্থাৎ মনোবেগে দেহের গতি নহে? অভিলষিত রূপ লাভ, পরের শরীরে প্রবেশ, ত্রিকালজ্ঞতা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণে অপ্রচুর নহে। শরশয্যার পর ভীষ্মের দেহে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে ত্রিকাল-দর্শন জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, মহাভারত-পাঠকের এ বিষয় অবিদিত নাই। সঙ্কল্পিত বিষয় প্রাপ্তি, অপ্রতিহত আজ্ঞা,—কোন্ পক্ষে তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যের পরিচয় না পাই? যোগ-সাধনার চরম স্ফূর্ত্তি—তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু। কৃষ্ণদ্বেষী নাস্তিকগণের বিশ্বাস এই যে, ব্যাধের বাণে তাঁহার অপমৃত্যু ঘটে। যাঁহারা ইতিহাস অবগত নহেন, যাঁহারা শাস্ত্র-গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহারাই এই রটনার মূলীভূত। নহিলে, শ্রীকৃষ্ণ যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন এবং মরণের অস্ত্রটী পর্য্যন্ত তিনি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, শাস্ত্র সে নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। ব্রহ্ম-শাপে যদুবংশের ধ্বংস অনিবার্য্য হইল;—সেও শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা-মাহাত্ম্য। যদুবংশ-ধ্বংসের প্রবর্ত্তনায় তিনি দেখাইলেন,—তাঁহার আত্মীয়ও কেহ নয়, স্বজনও কেহ নয়; অথচ, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেই সংসার পরিবৃত। তিনি বুঝাইলেন,—পুত্র-পরিজন কেহ আত্মীয় নয়; আত্মীয়—ধর্ম্মপরায়ণ নিষ্পাপ জন। তাই তিনি পাপকর্ম্মানুরত বংশের ধ্বংস সাধনে পরাঙ্মুখ হইলেন না; আবার অন্যদিকে তিনি সাধু-সজ্জনের মুক্তির বা অমরত্বের পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন—ধরার ভার লাঘব হইল; আরও যখন দেখিলেন—তাঁহার অগ্রজ বলরাম যোগা-বলম্বনে মানুষ-লোক পরিত্যাগ করিলেন; তখন তাঁহার মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন কেমনভাবে তুষ্ণীম্ভাবাবলম্বনে তনুত্যাগে প্রযত্নপর হইলেন, তখন কেমনভাবে কি অবস্থায় তিনি আত্মাতে আত্ম-যোজনা করিয়া কমল-নয়ন মুদ্রিত করিলেন, আর তখন কেমনভাবে আগ্নেয়ী যোগ-প্রভাবে নিজ দেহ দগ্ধ করিয়া নিজধামে উপনীত

শ্রীকৃষ্ণে যোগ-সাধনার ফল।

হইলেন, শিবভাগবতে তাহার তত্ত্ব-কথা অবগত হউন (ভাগবত, ১১শ স্কন্দ ৩০শ অঃ),—

"রামনির্যাণমালোক্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ। নিষসাদ ধরোপস্থে তুষ্ণীমাসাদ্য পিপ্পলম্॥
বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া। দিশো বিতিমিরাঃ কুর্ব্বন্ বিধূম ইব পাবকঃ॥
শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং তপ্তহাটকবর্চ্চসম্। কৌশেয়াম্বরযুগ্মেন পরিবীতং সুমঙ্গলম্॥
সুন্দরস্মিতবক্ত্রাব্জং নীলকুন্তলমণ্ডিতম। পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥
কটিসূত্রব্রহ্মসূত্র কিরীটকটকাঙ্গদৈঃ। হারনূপুরমুদ্রাভিঃ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্॥
বনমালাপরীতাঙ্গং মূর্ত্তিমদ্ভির্নিজায়ুধৈঃ। কৃত্বোরৌ দক্ষিণে পাদমাসীনং পঙ্কজারুণম্॥"

এ কি স্বেচ্ছামৃত্যু নহে? * বলরামের নির্ব্বাণ দর্শন করিয়া তুষ্ণীম্ভাবাবলম্বনে শ্রীভগবান্ অশ্বত্থ তরুতলে উপবেশন করিলেন। ধূমহীন অগ্নির ন্যায় তাঁহার জ্যোতিঃ চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইল। তিনি চতুর্ভুজ ধারণ করিলেন। কি অপরূপ রূপই তখন প্রকাশ পাইল। শ্রীবৎসচিহ্নিত, ঘনশ্যাম বর্ণ, তপ্তকাঞ্চনপ্রভ, কৌশেয়বস্ত্রাম্বরযুগল-পরিবৃত, সুমঙ্গল, সুন্দর, সহাস্য নয়নকমল, সুনীল কুন্তলমণ্ডিত, পুণ্ডরিকপ্রভাবিশিষ্ট নয়নকমল, মকরকুণ্ডলশোভিত, কটিসূত্র ব্রহ্মসূত্র, কিরীট কটক অঙ্গদ হার নূপুর মুদ্রা ও কৌস্তুভ দ্বারা ভূষিত, অঙ্গে বনমালা দোদুল্যমান, সর্ব্বায়ুধধৃত,—এই অবস্থায় উরুদেশে পঙ্কজারুণ দক্ষিণ পদ রক্ষা করিয়া শ্রীহরি দেহ-ত্যাগের জন্য উপবেশন করিলেন। তার পর গরুড়বাহিত রথ আসিয়া তাঁহাকে আপন স্থানে লইয়া যায়। সে যে কেমনভাবে তিনি দিব্যধামে প্রয়াণ করেন, শুকদেবের বর্ণনায় তাহা পাঠ করিয়া দেখুন, যথা,—

"লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্। যোগধারণয়াগ্নেয়্যাদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্।"

স্বশরীরে স্বধামে গমন, আত্মায় আত্মসংযোজন করিয়া দিব্যধামে প্রয়াণ,—এ কি মৃত্যু?

---

* শ্রীকৃষ্ণের ইহলোক পরিত্যাগ সম্বন্ধে জরা-ব্যাধ কর্ত্তৃক তাঁহার সংহার-সাধনের এক রূপক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। জরা নামক ব্যাধ মৃগ-ভ্রমে বাণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল, আর তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। যে বাণে তাঁহার দেহান্তর ঘটে, সে বাণ যদুকুলনাশন মুষলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ডে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ আছে। এ ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও তাহাতেও কৃষ্ণের যোগ তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়। তিনি যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গে তাহা অস্বীকৃত নহে। পরন্তু জরা ব্যাধের সহিত তাঁহার কথোপকথনে এবং লোকান্তরের পূর্ব্বে সারথির প্রতি দ্বারকার পরিণাম বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ দানে তাঁহার ভবিষ্যদ্দর্শিত্বতারই পরিচয় পাওয়া যায়। তার পর জরা ব্যাধ শব্দ যদি রূপক অর্থে জরাকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহাও তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু বলিতে হয়। কেন-না, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া অশ্বত্থ বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া তিনিই তো জরাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। ফলতঃ যে দিক দিয়াই দেখি, শ্রীকৃষ্ণ যে আপন ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আপন ইচ্ছায়ই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনই মতান্তর থাকিতে পারে না। ব্যাধের বাণে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু-প্রসঙ্গে আর একটা বড় উচ্চ ভাব মনে আসিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যে তাঁহার হত্যাকারী, তাহাকে ক্ষমা করিয়া তাহার সদ্গতি বিধান, ভগবানেই শোভা পায়। মহাত্মা যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধেও এইরূপ একটী কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। যাহারা তাঁহাকে ক্রুশে হত্যা করিয়াছিল, যীশুখৃষ্ট তাহাদের সম্বন্ধে ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন,—"Father, forgive them; for they know not what they do." *S. Luke*, XIII, 34. ; Mathew, V. 44. 87.

এমন মৃত্যুর অধিকারী কয় জন হইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমনে স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইল; আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইল; ব্রহ্মাদি দেবগণ বিস্মিত হইলেন; এ কি মৃত্যু? অথবা, এ কি যোগসাধনার চরম স্ফূর্ত্তি নহে? যিনি যোগ-প্রভাবে এবম্বিধ অলৌকিক অমানুষিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করাইয়া গিয়াছেন, তিনি পরম যোগী নহেন তো পরম যোগী কে? তাই বলি,—শ্রীকৃষ্ণ পরম যোগী।

* * *

৭। শ্রীকৃষ্ণ—পরম প্রেমিক; কেন-না, তিনি বিশ্বপ্রেমের মূলাধার রূপে বিদ্যমান আছেন।

[প্রেম-স্বরূপ,—প্রেম আত্মনিবেদন;—প্রেমিকের লক্ষণ,—প্রেমিকের সমদর্শন; কৃষ্ণ-প্রেমে পরম প্রেমিক,—শ্রীরাধার ও ব্রজগোপীর প্রেম-প্রসঙ্গ;—বৈষ্ণবের প্রেম-তত্ত্ব,—ব্রজগোপীর ও শ্রীরাধার প্রেমের নিগূঢ় রহস্য।]

প্রেম-স্বরূপ।

ভক্তের যে সিদ্ধি-লাভ, তাহাই প্রেম। প্রেম—ভক্তি-তরুর অমৃত-ফল। স্নেহ, মমতা, করুণা প্রভৃতি মুকুল-মুঞ্জর-পুষ্প যখন প্রেম-ফলে পরিণত হয়, তখনই ভক্তি-তরু ফলপ্রসূ বলিয়া বুঝিতে পারি। সেই প্রেম-ফল পরিপক্ব হয়, তাহার অম্লত্ব-কষায়ত্ব দূরীভূত হইয়া যায়,—প্রেম যখন পূর্ণরূপে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হয়। বৈষ্ণব-শাস্ত্র বড় যথার্থ কথাই বলিয়াছেন,—প্রেমই ভক্তের পরম মাহাত্ম্য, ভক্তের যে সিদ্ধিলাভ, নিশ্চয়ই তাহা প্রেমফল। "প্রেমভক্তেশ্চ মাহাত্ম্যং ভক্তের্মাহাত্ম্যতঃ পরম্। সিদ্ধমেব যতো ভক্তেঃ ফলং প্রেমৈব নিশ্চিতম্॥" ভক্তির যে নয় লক্ষণ (শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্॥), শ্রবণ মনন কীর্ত্তনাদি ভেদে নববিধা যে ভক্তির প্রাধান্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, আত্মনিবেদন তাহারই পরিণতি। আত্মনিবেদনই প্রেম। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য—সকলের পরিণতি আত্মনিবেদনে বা প্রেমে। পরম-প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ স্তরে স্তরে ভক্তির লক্ষণ-সমূহ প্রদর্শন করিয়া, সকলের পরিণতি দেখাইয়াছেন—আত্মনিবেদনে বা প্রেমে। শ্রীকৃষ্ণের নিজ জীবনে এই নববিধা ভক্তির লক্ষণ পূর্ণ প্রস্ফুটিত দেখিতে পাই। কেমন স্তরে স্তরে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া স্নেহ-মমতা-সখ্যতা প্রভৃতি প্রেমে পরিণত হয়, তাঁহার জীবনে কত ঘটনায় কত রূপে তাহা প্রকাশিত। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন প্রভৃতির ফলে দাস্য-সখ্য ভাব সঞ্জাত হয়। সেই দাস্য-সখ্য ভাবের স্ফূর্ত্তি—আত্মনিবেদনে বা প্রেমে। তিনি আপনি দাস্যভাব দেখাইয়াছেন,—নন্দাদিকে পিতৃ-সম্বোধনে; তাঁহার প্রতি দাস্যভাব দেখাইয়াছেন—ব্রহ্মাদি দেবগণ। শ্রীকৃষ্ণের নন্দালয়ে অবস্থিতি-কালে নন্দের বাধা-বহন, আর বিপদে ব্রহ্মাদি দেবগণের শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন,—উভয়ত্রই দাস্য-ভাবের দৃষ্টান্ত। স্নেহ-বাৎসল্যের উদাহরণে নন্দ-যশোদার বিষয় স্বতঃই মনে উদয় হয়। ব্রজবালকগণের সখ্যতা,—সখ্যভাবের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

এই দাস্য, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি স্তর অতিক্রমের পর আত্মনিবেদন বা প্রেম ভাব। অমর বিদ্যাপতি এই আত্মনিবেদনের অবস্থাদির বিষয় এইরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন,—

ধানশী।

তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম
সুত মিত রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়,
অতএ তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম নিদে গোঙায়নু
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গ মাতনু
তোহে ভজব কোন্ বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগরী লহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন ভয়ে
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি,
অব তারণ ভার তোহারা॥

ব্রজগোপীগণে এই আত্মনিবেদনের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। তাঁহারাই আদর্শ প্রেমিকা। আত্মনিবেদনে একাগ্রতার ফলে, তাঁহারা যখন দেখিলেন,—জলে কৃষ্ণ স্থলে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভিন্ন আর অন্য কিছুই নাই, তখনই তাঁহাদের আত্মনিবেদন সার্থক হইল,—তখনই তাঁহাদের প্রেমের পূর্ণ পরিণতি সাধিত হইল। সেই প্রেমই তো প্রেম।—যে প্রেমে সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন হয়। কে বলে—ব্রজাঙ্গনার প্রেম কামরাগকলুষিত? কে বলে—ব্রজগোপীগণের প্রেমে আসক্তির আবিল্য ছিল? রাসমণ্ডলে অসংখ্য গোপী-পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু গোপীগণের সকলেই মনে করিতেছে—"শ্রীকৃষ্ণ আমারই নিকটে রহিয়াছেন।" * কৃষ্ণের কথা স্মরণ করিতে করিতে, কৃষ্ণের ভাব অনুধ্যান করিতে করিতে, কৃষ্ণ-প্রেম-বিধুরা ব্রজাঙ্গনাগণ "আমিই কৃষ্ণ" এই ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে,—

"গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহস্মিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমা॥"

সে সে কি অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার, যাঁহারা জ্ঞান-রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা অনুধাবন করিতেই পারিবেন না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে এই রাসলীলার যে বর্ণনা আছে, তাহা স্মরণ করিলে স্তম্ভিত ও বিস্মিত-বিমুগ্ধ হইতে হয়। সে বর্ণনায় দেখিতে পাই, রাসমণ্ডলে নয় লক্ষ গোপীর সমাগম হইয়াছিল; আর শ্রীহরি নয় লক্ষ গোপরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। তবেই বুঝিয়া দেখুন—রাসলীলা কি, আর ব্রজগোপীগণ কেমন ভাবে কিরূপ প্রেমে আত্মনিবেদনে সমর্থ হইয়াছিল। সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন—সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন—এ প্রেমের কি অন্ত আছে? শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে ও কার্য্যে সেই পরম প্রেমেরই শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন। ব্রজগোপীগণের বস্ত্রহরণ—সেও এই প্রেম-শিক্ষারই নিদর্শন। যখন

* শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ৩০শ অধ্যায়, ৩য় শ্লোকে এই বর্ণনা দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম খণ্ড, ২৮শ অধ্যায়েও এ বিষয় লক্ষ্য করুন।

উাবদ্ভক্তি পূর্ণতা লাভ করিবে, তখন সকল ভেদ-ভাব দূরীভূত হইবে। যাহার ভেদ-ভাব দূরীভূত হইয়াছে, যে জলে স্থলে সর্ব্বত্র ভগবানকে দেখিতে পাইতেছে, তাহার আবার লজ্জা কি? কতটা আত্মজ্ঞান জন্মিলে কতদূর ত্যাগ স্বীকার শিক্ষা করিলে মানুষ মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতে পারে, বস্ত্রহরণ-ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই শিক্ষা দিলেন। তিনি শিক্ষা দিলেন,—যদি ভক্ত হইতে চাও, ভক্তির মাহাত্ম্য বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে তাহার চরম পন্থা "আত্মনিবেদন" অবলম্বন কর। উহাই ভক্তির পরিণতি। সে অবস্থায় অদেয় আর কিছুই নাই, আপনার বলিতে আর কিছুই নাই, রমণীর যে শ্রেষ্ঠ সম্পৎ লজ্জা, সেখানে সে লজ্জার মূলে পর্য্যন্ত কুঠারাঘাত করিতে হইবে। এই হইল—চরম শিক্ষা। যাহার এই ভাব—এই ত্যাগের ভাব আসিয়াছে, প্রেম যে কি পরম বস্তু, সেই তাহা জানিয়াছে;—সেই বিশ্ব-প্রেমে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া প্রেমিক হইতে পারিয়াছে।

এই প্রেমের মাহাত্ম্য শ্রীকৃষ্ণ যেমন বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইয়া গিয়াছিলেন, তেমন আর দ্বিতীয় দেখি না। ত্যাগী না হইলে প্রেমিক হইতে পারে না, জীবনের প্রতি কার্য্যে, কর্ত্তব্য-সাধনের প্রতি উপদেশে, সেই ত্যাগ-তত্ত্বই তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যেমন ব্রজগোপীগণকে দেখাইয়াছেন,—কত ত্যাগের ফলে প্রেমিক হওয়া যায়; তেমনই ত্যাগের আদর্শরূপে আপনাকে প্রতিফলিত করিয়া বিশ্ববাসীকে বিশ্ব-প্রেমের মুখ্য-মন্ত্র শিখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে ত্যাগের দৃষ্টান্তের অবধি নাই। কত বার কত অবসর আসিয়াছিল, তিনি কত বিশাল রাজ্য-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারিতেন; কিন্তু ত্যাগী পুরুষ, ত্যাগ-শিক্ষাদান রূপ মহামন্ত্রের উপদেষ্টা মহাপুরুষ, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। ত্যাগের আদর্শ অনুসরণ করিয়া কেমনভাবে সংসার বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা হইতে পারিবে, ইহাই তাঁহার ধ্রুব লক্ষ্য ছিল। প্রকৃত প্রেমিক কোন্ জন? বিশ্বপ্রেমে যাঁহার প্রাণ মাতোয়ারা হইয়াছে, তিনি ভিন্ন প্রেমিক আর কোন্ জন? সর্ব্বজীবে সমদর্শন কর; সর্ব্বত্র ভগবদধিষ্ঠান দেখ; ইহাই হইল—প্রেমিকের লক্ষণ; ইহাই হইল—আত্ম-সমর্পণ; ইহাই হইল—মোক্ষ-মুক্তি-নির্ব্বাণ-কৈবল্য পন্থানুসরণ। শ্রীকৃষ্ণ তাই পুনঃপুনঃই বলিয়াছেন,—সেই পরাগতিপ্রাপ্ত হয়, যে জন সর্ব্বভূতে পরমেশ্বরের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যথা,—

প্রেমই সমদর্শন।

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্। ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।"

সর্ব্বজীবে সমদর্শন, সর্ব্বত্র ঈশ্বর অনুভূতি,—ইহাই প্রকৃত প্রেম, ইহাই পরম প্রেমিকের লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ পুনঃপুনঃই এই উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন বলিয়াছেন,—'আমি অনলে আছি, অনিলে আছি, সলিলে আছি', তখন তাঁহার সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয়। তার পর তিনি আরও যখন বলিয়াছেন,—'অগ্নিতে, গুরুতে, আত্মাতে, সকল প্রাণীতে আমার উপাসনা করিবে', তখনই মনে হয় না কি—তিনি কি বিশ্বপ্রেমের কি মহান্ শিক্ষাই প্রদান করিতেছেন! সর্ব্বভূতে সমদর্শন—বিশ্বপ্রেমে প্রাণ-সমর্পণ—ইহার অপেক্ষা প্রেমিকের আদর্শ আর কি হইতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণের প্রেম তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, শ্রীরাধাকে বুঝিবার আবশ্যক হয়; নহিলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ভক্তির যে চরম পরিণতি প্রেম, ব্রজাঙ্গনায় আর শ্রীমতী শ্রীরাধিকায় তাহা পরিস্ফুট দেখি। প্রেমে ভেদাভেদ ভাব দূর হয়; প্রেমে আত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া যায়। সাধনা কত দূর উচ্চতা প্রাপ্ত হইলে সে ভেদভাব দূর হয়, ভক্ত ও ভগবান এক হইয়া যান, বুদ্বুদ প্রশান্তভাবে বারিধি অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দেয়, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে সেই তত্ত্বই-বিশদীকৃত। -কল্পনাকুশল কবিগণের কলুষ-তুলিকায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম এক বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু যাঁহারা সে প্রেম-তত্ত্ব অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন—সে প্রেম কি অনুপম অপার্থিব সামগ্রী! যেখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেম পরিবর্ণিত আছে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণই বা কে—আর শ্রীরাধাই বা কে? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"আমি সেই আমি—যে আমি সকলের অন্তরাত্মা সর্ব্বকর্ম্মে নির্লিপ্ত সর্ব্বজীবে অবস্থিত হইয়াও সর্ব্বত্র অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিতেছি। বায়ু-দেব যে প্রকার সর্ব্বত্র সর্ব্ব জন্তুতে বিচরণ করিয়াও লিপ্ত নহেন, সেইরূপ আমি নির্লিপ্ত অথচ সর্ব্ব-কর্ম্মের সাক্ষী। সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে বিদ্যমান জীবাত্মা আমার প্রতিবিম্ব মাত্র। সেই জীবাত্মাই নিরন্তর কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। যে প্রকার জলপূর্ণ ঘটে চন্দ্র-সূর্য্যমণ্ডল প্রতিবিম্ব রূপে বিরাজ করে, আবার সেই ঘট ভগ্ন হইলে সেই প্রতিবিম্ব চন্দ্র-সূর্য্যে সংশ্লিষ্ট হয়, সেইরূপ দেহীর বিনিষ্ট হইলে আমার প্রতিবিম্ব জীবও আমাতে বিলীন হইয়া থাকে। আমি সমুদায় প্রাণিগণের জীবরূপে দৃষ্ট ও আত্মরূপে অদৃষ্ট হইয়া আছি। আমি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্ব দ্রব্যে অধিষ্ঠিত আছি; আমি শরীর ধারণ করিলে সগুণ হই, নতুবা নিরাকার নির্গুণ।" বুঝিয়া দেখুন,—স্বরূপ তত্ত্ব! আরও বুঝিয়া দেখুন,—শ্রীমতী কার প্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জিতা! সাংখ্যে যে পুরুষ, উপমার অলঙ্কারে রূপকের অভ্যন্তরে; এখানে তিনিই প্রকাশমান নহেন কি? তাহার পর তাঁহাদের সে মিলনই বা কেমন? শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন,—"তুমি আমি একই পদার্থ! যেমন দুগ্ধ ও দুগ্ধধাবল্যের কখনই পার্থক্য হয় না, সেইরূপ আমাদেরও নিশ্চয়ই ভেদ নাই। বিশ্বের সমুদায় যোষিদ্গণই তোমার কলাংশের অংশ-কলায় সমুৎপন্ন; সুতরাং যে রমণী, সেই তুমি; যে পুরুষ, আর সেই আমি; আমি অংশ-বিশেষে বহ্নিরূপী হইলে তুমিও স্বীয় অংশে স্বাহা নামে দাহিকাশক্তি-রূপিণী আমার প্রিয়া হইয়াছ। আমি তোমার সহিত একত্রিত থাকিলে সমুদায় বস্তু দগ্ধ করিতে সমর্থ। আর তোমার বিচ্ছেদে তাহাতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমি কলা দ্বারা দীপ্তিমান্ দিনের মধ্যে সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইলে তুমিও প্রভারূপে আমার সহিত মিলিতা হইয়াছ। তোমার মিলন ব্যতীত আমি দীপ্তিমান্ হইতে পারি না।" নির্ব্বাণে মোক্ষে যে মিলন, এ মিলন—সেই মিলন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এবং হরিবংশে শ্রীরাধার যে পরিচয় পাই, তাহার সারতত্ত্ব নিষ্কাষণ করিলে তিনিই সাক্ষাৎ প্রকৃতিরূপিণী বলিয়া বুঝিতে পারি। যিনি রাধা, তিনি সাযুজ্যপ্রাপ্তা। যিনি রাধা, তাঁহার প্রেম পূর্ণতা-প্রাপ্ত; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে শ্রীরাধা, আর শ্রীরাধার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ,—ভক্তে ও ভগবানে

কৃষ্ণপ্রেমে পরম প্রেমিক।

অভিন্ন ভাব। শ্রীমদ্ভাগবতে (৯ম স্কঃ ৪র্থ অঃ ৬৩শ ও ৬৮শ শ্লোঃ) ভগবান তাই বলিয়াছেন,—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

অর্থাৎ,—'ভক্তের সহিত আমার স্বাতন্ত্র্য নাই, আমি ভক্তের অধীন, সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়া আছেন। সাধু ভক্তগণই আমার হৃদয়, আমিই ভক্তগণের হৃদয়। তাহারাও যেমন আমা ভিন্ন অন্য জানে না, আমিও তেমনই তাহাদের ভিন্ন অন্য জানি না।' ভক্ত ও ভগবান যেখানে এমনই এক—এমনই অভিন্ন, সেখানেই তো প্রেমের ও প্রেমিকের সার্থকতা। কৃষ্ণপ্রেমে রাধা-প্রেমে—পরম প্রেমের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি—আরাধ্য ও আরাধ্যে, ভক্তে ও ভগবানে অপূর্ব্ব মিলন। এই প্রেমের পরম গুরু—শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণ—পরম প্রেমিক।

পরম ভাগবত বৈষ্ণবগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেম কিরূপ ভাবে উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটু পরিচয় এস্থলে প্রদান করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি। প্রেমের স্বরূপ তত্ত্ব তাঁহারা কিরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণের প্রেম যে কি উচ্চ স্তরের সামগ্রী, তাঁহারা কেমন বুঝাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পদাবলী হইতে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করুন। প্রেম কি, কিরূপে তাহা উৎপন্ন হয়, শ্রীচৈতন্যদেব ভক্ত শ্রীরূপকে তাহা বুঝাইতেছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যথা,—

পরম বৈষ্ণবের প্রেমতত্ত্ব।

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—
সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

তথা হি ভাগবতে—
মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ॥
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—
ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয়॥

প্রেম কি পরম পদার্থ, উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনায় তাহা কতকটা অনুভব করা যায়। প্রেমিক যিনি, তাঁহার প্রার্থনা কিছুই নাই। সাগরে যেমন গঙ্গার সলিল গিয়া মিশিয়া যায়, সে যেমন আপনার কোনও আকাঙ্ক্ষা কোনও কামনাই রাখে না, প্রেমিকের সেই লক্ষণ। প্রেমিকের নিষ্কাম সাত্ত্বিক ভক্তি, সালোক্য (সমান লোকে বাস) চাহে না, সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য) চাহে না, সামীপ্য (নিকটবর্ত্তিত্ব) চাহে না, সারূপ্য (সমান রূপতা) চাহে না, সাযুজ্য বা একত্ব—তাহাও চাহে না, এমন কি, প্রেমিক ভক্তকে ভগবান যদি সালোক্যাদি

মুক্তি প্রদান করিতে চাহেন, তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। কত স্তরে সেই প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয়, শ্রীচৈতন্যদেব দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা শ্রীরূপকে এইরূপে বুঝাইয়া বলিতেছেন, যথা—

প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, সার।
শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তমমিশ্রি আর॥
এই সব কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়িভাব।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥
সাত্ত্বিক-ব্যভিচারি-ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত-আস্বাদনে॥
যৈছে যদি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর।
মিলনে 'রসালা' হয় অমৃত মধুর॥
ভক্তভেদে রতিভেদ—পঞ্চ প্রকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর।
বাৎসল্যরতি, মধুররতি—এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পঞ্চভেদ॥
শান্ত-দাস্য সখ্য-বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ-ভক্তে গৌণ সপ্ত রস হয়॥
পঞ্চ রস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্তমনে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥
শান্তভক্ত—নব যোগেন্দ্র, সনকাদি আর।
দাস্যভাবভক্ত—সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্যভক্ত—শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্যভক্ত—মাতা, পিতা, যত গুরুজন॥
মধুররসভক্ত মুখ্য—ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ,—অসঙ্খ্য গণন॥
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রা, কেবলা ভেদ আর॥
গোকুলে কেবলা-রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি॥
শান্তদাস্যরসে ঐশ্বর্য্য কাঁহা উদ্দীপন।
বাৎসল্য-সখ্য-মধুরে ত করে সঙ্কোচন॥
বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হৈল॥

তথাহি ভাগবতে,—

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হইল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয়॥
কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীকে কৈল পরিহাস।
'কৃষ্ণ ছাড়িবেন' জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥
কেবলার শুদ্ধ প্রেম—ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥

শ্রীচৈতন্যদেবের এই সকল উক্তি প্রাণে প্রাণে যিনি অনুভব করিতে পারেন, তিনিই বুঝিতে সমর্থ হন,—ব্রজগোপীগণের প্রেম শ্রীরাধার প্রেম কি অপার্থিব স্বর্গীয় সামগ্রী! মধুররসে যে সকল রসের সার সম্মিলন, শান্তদাস্যাদি রস পর পর পুষ্ট হইয়া যে পরমরস মাধুর্য্যে পরিণত হয়, এ উপমার মধ্যে এক নিগূঢ় সত্যের আভাষ দেখিতে পাই। সেই নিত্য-পদার্থ তন্মাত্র-সংযোগে যে বিশ্বসৃষ্টির বিষয় অবগত হই, এখানেও তাহারই অধ্যাস নহে কি? সাঙ্খ্যের যে পুরুষ—নির্গুণ নির্লিপ্ত নিরুপাধিক; সাঙ্খ্যের যে প্রকৃতি—নির্গুণা নির্লিপ্তা নিরুপাধিকা; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা—সেই পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে পরিকীর্ত্তিত। সেখানে সাঙ্খ্যমতে পঞ্চতন্মাত্রক যে সৃষ্টি-ক্রিয়া, সেখানে আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি-মূলে যে পঞ্চতন্মাত্রের স্ফূর্ত্তি-লীলা; এখানেও শান্তদাস্যাদির পরিস্ফুরণে কেমন ভাবে মাধুর্য্য-রসের (প্রেমের) উৎপত্তি হয়, তাহাই বুঝান হইয়াছে। সাঙ্খ্যের পঞ্চতন্মাত্রের সহিত

আকাশাদি ভূতগণের সম্বন্ধ এবং ভগবানে একনিষ্ঠা (স্বরূপজ্ঞানাদি) মূল-তত্ত্বের সহিত শান্ত দাস্যাদি রস পঞ্চকের সম্বন্ধ—উপমা-বিশ্লেষণে এইরূপ উপলব্ধি হইতে পারে। যথা,—

পঞ্চভূত	উৎপত্তিমূল।	রসপঞ্চক	উৎপত্তিমূল।
আকাশ	... ... শব্দতন্মাত্র।	শান্ত	... একনিষ্ঠা (তৃষ্ণাত্যাগ)।
বায়ু	... শব্দ ও স্পর্শ তন্মাত্র।	দাস্য	... ... নিষ্ঠা ও সেবা।
তেজ	... শব্দ, স্পর্শ, রূপ তন্মাত্র।	সখ্য	... নিষ্ঠা, সেবা ও বিশ্বাস।
জল	... শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস তন্মাত্র।	বাৎসল্য	... নিষ্ঠা, সেবা, বিশ্বাস, পালন।
ক্ষিতি	... শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ তন্মাত্র।	মধুর	... নিষ্ঠা, সেবা, বিশ্বাস, পালন, আত্মসমর্পণ।

যেমন আকাশাদি পঞ্চভূতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব তন্মাত্রেরও যোগ আছে, অধিকন্তু নূতন তন্মাত্রের আধিক্য ঘটিয়াছে, এখানেও সেইরূপ মধুর রসে অপর রস-চতুষ্টয়ের সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন তত্ত্বের আধিক্য ঘটিয়াছে। ক্রমান্বয়ে এই গুণ-সমৃদ্ধির পরিচয় শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তিতেই পাওয়া যাইতেছে। স্বরূপ-সম্বোধনে (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে) শ্রীচৈতন্যের উক্তি, যথা,—

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা ত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত কৃষ্ণ ভক্ত এক জানি॥
স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণা ত্যাগে শান্তের দুই গুণে॥
এই দুই গুণে ব্যাপে সব ভক্তগণে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক সেবন।
অতএব দাস্য রসের হয় দুই গুণ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়,
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া-রণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে—আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান্॥
বাৎসল্যে—শান্তের গুণ দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ—অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতা-আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন-ব্যবহার॥
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
সে অমৃতানন্দে ভক্তসহ ডুবেন আপনে।
ঐ ভক্তবশ গুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে।

তথাহি পদ্মপুরাণে—
ইত্থং স্ববলীলাভিরানন্দকুণ্ডে,
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বম্,
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে॥

মধুর রসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এইমত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্য করে চমৎকার॥
এই ভক্তি রসের কৈল দিগ দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু পারে॥

যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহারা কৃষ্ণ প্রেমের মাহাত্ম্য যথার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন; আর যাহারা কলুষচিত্ত, তাহারাই সেই নির্ম্মল অনাবিল প্রেমে কামগন্ধ দেখিতে পায়। নহিলে,—

"গোপীগণের প্রেমে রূঢ় ভাব নাম।
শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী প্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপীকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী॥
গোপীকা জানেন কৃষ্ণ মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটি ইষ্টসমীহিত॥
সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥"

তার পর, কামে ও প্রেমে কি পার্থক্য, তাহাও বুঝিয়া দেখুন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শাস্ত্র-লক্ষণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী কামের ও প্রেমের পার্থক্য বিচার করিয়া বলিতেছেন,—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম জৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখতাৎপর্য্য—হয় প্রেম ত কেবল॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম-প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥"

আর অধিক আলোচনার আবশ্যক দেখি না। যে প্রেমে আত্মায় আত্ম-সম্মিলন, রাধাকৃষ্ণের প্রেম—সেই প্রেম। সে মিলন সে প্রেম মহাযোগীর যোগসাধন। সে প্রেমে আরাধ্য-আরাধিকা এক হইয়া গিয়াছে। নদীর জলে আর সাগরের জলে এক হইয়া আছে।

* * *

৮। শ্রীকৃষ্ণ—পরম নীতিবিৎ; কেন-না, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি—সকল নীতি-শিক্ষা-দানেই তাঁহার মহিমা বিকশিত।

[নীতির মূল তত্ত্ব,—সর্ব্বনীতিজ্ঞতার লক্ষণ;—শ্রীকৃষ্ণ সমাজনীতিজ্ঞ,—তাঁহার জীবনে সমাজনীতিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত;—শ্রীকৃষ্ণের নীতি সচ্চরিত্রতা-বিধায়ক;—রাজনীতি-ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ,—শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির গূঢ় লক্ষণ,—সত্য-মিথ্যার প্রসঙ্গ;—ধর্ম্মনীতিক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ,—কৃষ্ণের ধর্ম্মনীতির মূল লক্ষ্য।]

নীতির কথা।

যাহা হইতে কিছু (উপদেশ) পাওয়া যায়, তাহাই নীতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মানুষের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন প্রয়োজন সাধন জন্য নীতি তাই বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি প্রকার-ভেদ দেখিতে পাই। সর্ব্ববিধ নীতির সমষ্টি শিষ্টনীতি বা কেবলমাত্র নীতি নামে অভিহিত হইতে পারে। যিনি এতদ্বিধ নীতি আয়ত্ত করিতে পারেন, সংসারে তাঁহার যশের অবধি থাকে না।

যিনি রাজনীতিজ্ঞ অথবা যিনি অর্থনীতিজ্ঞ, যিনি সমাজনীতিজ্ঞ অথবা যিনি ধর্ম্মনীতিজ্ঞ, তাঁহাদের কেহই অল্প সম্মানার্হ নহেন। প্রাচ্যের ও প্রাশ্চাত্যের পুরাবৃত্তে এক এক বিভাগে এক এক জন নীতিজ্ঞের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। ইউরোপের আধুনিক ইতিহাসে বিসমার্ক ও গ্লাড্‌ষ্টোন প্রমুখ রাজনীতিজ্ঞগণের প্রতিষ্ঠার বিষয় কে না অবগত আছেন? আবার অন্য দিকে, অর্থনীতি-ক্ষেত্রে, আডাম স্মিথ, রিকার্ডো, ম্যালথাস, আলেকজাণ্ডার বেন্‌, জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতির নাম সর্ব্বজনবিদিত। ধর্ম্মনীতিক সমাজ-নীতিকগণের মধ্যে ইউরোপে খৃষ্টসম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। কিন্তু যে দেশের যে সময়ের ইতিবৃত্তই আলোচনা করি না কেন, একাধারে কোথাও সর্ব্বনীতিজ্ঞতার সমাবেশ দেখি না। ভারতের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণে সেই প্রভাব দেখিতে পাই। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দিনে মহামতি চাণক্য অশেষ নীতি-শাস্ত্র-বেত্তা বলিয়া প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজনীতি বা তদঙ্গীভূত অর্থনীতি সম্বন্ধেই অধিক মস্তিষ্ক চালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; নীতি-শাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগে তিনি তাদৃশ যশঃসম্পন্ন হইতে পারেন নাই। ঐকান্তিক রাজনীতিক (অর্থনীতিক) ছিলেন বলিয়াই, তাঁহার সহিত ইউরোপের কূটনীতিক ম্যাকিয়াভেলীর তুলনা দেখিতে পাই। তাহার পর চাণক্য তাঁহার অর্থশাস্ত্র প্রণয়নে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। শুক্রাচার্য্য, বৃহস্পতি, চার্ব্বাক প্রভৃতির অনু-সরণকারী বলিয়া তাঁহাকে বুঝিতে পারি। তাঁহার পূর্ব্বে সংহিতাকারগণ নীতি-শাস্ত্রের সারসমুদ্র মন্থন করিয়া যান, পুরাণকারগণ সর্ব্বনীতি-তত্ত্বের অনন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখেন। সুতরাং প্রকৃত নীতি-শাস্ত্রবিৎ বলিতে, সর্ব্বনীতি-তত্ত্বজ্ঞ বলিতে, শ্রীকৃষ্ণকে যেমন নির্দ্দেশ করিতে পারি, অধুনা তেমন আর অন্য কাহারও প্রতি লক্ষ্য পড়ে না। শ্রীকৃষ্ণের নীতি—সর্ব্বতোমুখী। যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রে, তেমনই অর্থনীতি ক্ষেত্রে, তেমনই সমাজনীতি ক্ষেত্র, আবার তেমনই ধর্ম্মনীতি ক্ষেত্রে,—তাঁহার নৈতিক অভিজ্ঞতার অন্ত নাই। কেবল বাক্যে নহে; বাক্যে ও কার্য্যে উভয়ত্র তিনি আপনাকে সর্ব্বনীতিতত্ত্বজ্ঞ-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের সমাজনীতি। (বিশ্ব-প্রেমাঙ্কুর।)

সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল উক্তি দেখিতে পাই, তৎসমুদায় বিশেষভাবে লোকশিক্ষাপ্রদ ও জনহিতসাধক। সংসারে সুশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, সংসারকে শান্তিময় করিবার জন্য, তিনি যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, মানুষের মনে যদি তাহা জাগরূক থাকে, মানুষ যদি সে সকল উপদেশ কখনও বিস্মৃত না হয়, তাহা হইলে এই অধিব্যাধি-শোক-তাপ পূর্ণ সংসারেই স্বর্গের সুখ—স্বর্গের শান্তি—প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে। সংসারে অশান্তির এক প্রধান কারণ,—বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্টি সুতরাং সে অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়াস। এই অসন্তুষ্টি অবস্থার পরিবর্ত্তন চেষ্টাই সকল অনর্থের মূল। সমাজবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব,—সংসারে যে কোনও বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে, সকলই আত্ম-অবস্থায় অসন্তুষ্টিজনিত। উৎক্ষেপ বা উচ্ছৃঙ্খলা তাহার প্রধান কারণ বলিয়া বুঝিতে পারি।

মানুষ যখন আপন সমাজ-বন্ধনে সন্তুষ্ট নয়, মানুষ যখন আপনার আচার-ধর্ম্ম-নিষ্ঠায় উদ্বেগসম্পন্ন হইয়া উঠে; তখনই তাহার শান্তি দূরে যায়, উদ্বেগ-উচ্ছৃঙ্খলার আবর্ত্তে পড়িয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত হইতে হয়। বিপ্লবের ও অশান্তির এ মূল তত্ত্ব কি, তাহা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তারস্বরে ঘোষণা করিয়া বলিলেন,—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥"

সমাজের শান্তি-রক্ষার পক্ষে এ উপদেশ অমূল্য। আপন ধর্ম্ম, আপন সমাজ, আপন পিতৃপিতামহানুষ্ঠিত কর্ম্ম যদি দোষ-দুষ্টও হয়, তাহারই অনুসরণ করিবে; কদাচ অন্যের সমাজ, অন্যের ধর্ম্ম বা অন্যের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের জন্য লালায়িত হইবে না। শান্তিলাভ পক্ষে এ উপদেশের কি আর তুলনা আছে? এ উপদেশ—জ্ঞানের সার, নীতির সার। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ" ইহার অপেক্ষা নীতি-শিক্ষা আর কি হইতে পারে? সমাজে শৃঙ্খলা-রক্ষা,—সংসারে শান্তি-রক্ষা যে নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই নীতিই প্রকৃষ্ট নীতি। এবং নীতি-শিক্ষারই এক অঙ্গ,—পিতৃ মাতৃ-গুরুজনে ভক্তি শিক্ষা। দেখুন,—সে বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের কি উপদেশ বা উক্তি (শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৪৫শ অধ্যায়),—

"সর্ব্বার্থ-সম্ভবো দেহো জনিতঃ পোষিতো যতঃ। ন তয়োর্যাতি নির্ব্বেশং পিত্রোর্মর্ত্ত্যঃ শতায়ুষা॥ যস্তয়োরাত্মজঃ কল্য আত্মনা চ ধনেন চ। বৃত্তিং ন দদ্যাৎ তং প্রেত্য স্বমাংসং খাদয়ন্তি হি॥"

অর্থাৎ,—'ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ সর্ব্বার্থসম্ভব এই দেহ, যাঁহাদের দ্বারা উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হইয়াছে, শত বৎসর জীবিত থাকিয়াও মানুষ সেই পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না। যে পুত্র আপনার দেহ দ্বারা এবং ধনসম্পত্তির দ্বারা পিতামাতার তুষ্টি সাধনে সমর্থ না হয়, লোকান্তরে যমদূত তাহাদের মাংস ছিন্ন করিয়া আহার করে।' তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।" কেবল পিতামাতা বলিয়া নহেন; যাঁহারা অসহায় অবস্থায় প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও পিতৃমাতৃতুল্য চিরসেব্য। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

"স পিতা সা চ জননী যৌ পুষ্ণীতাং স্বপুত্রবৎ। শিশূন বন্ধুভিরুৎসৃষ্টান্ কল্যৈঃ পোষরক্ষণে॥"

অর্থাৎ,—'আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত আত্ম-রক্ষণে অসমর্থ শিশুকে যাঁহারা পুত্রবৎ লালন-পালন করেন, তাঁহারাও পিতামাতার তুল্য ভক্তিভাজন অর্থাৎ তাঁহাদের প্রতিও পিতামাতার ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।' তার পর মানুষের আরও কর্ত্তব্য আরও প্রতিপাল্য কার্য্য কি আছে দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৪৫শ অধ্যায়) কহিতেছেন,—

"মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাং সাধ্বীং সুতং শিশুম্।
গুরুং বিপ্রং প্রপন্নঞ্চ কল্যোঽবিভ্রচ্ছ্বসন্ মৃতঃ॥"

অর্থাৎ,—'মানুষের কর্ত্তব্য এই যে, পিতা মাতা সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশুসন্তানগণকে প্রতিপালন করিবে; ব্রাহ্মণগণ এবং প্রপন্ন ব্যক্তিগণও তাঁহাদের প্রতিপাল্য। সামর্থ্য সত্ত্বে যাহারা আত্মীয়-স্বজনের ও আশ্রিত জনের ভরণপোষণ সঙ্কুলান না করে, তাহারা জীবন্মৃত অর্থাৎ জীবিত থাকিয়াও মৃতের মধ্যে পরিগণিত।' বিভিন্ন সংসারের সমষ্টিই সমাজ। সুতরাং ব্যষ্টি-ভাবে এক একটি সংসার যদি সুগঠিত হয়, তাহা হইলে সমাজ আপনই সুগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ

হইয়া আসে। জীব-জন্মের সার্থকতা—শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা—জীবে দয়া। সে দয়া কেমন দয়া,—প্রখর রৌদ্রে পাদপকুলকে ছায়াদান করিতে দেখিয়া, তাহাদের উপমায় ব্রজবাসিগণকে শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, ৩২—৩৫ শ্লোঃ) বুঝাইতেছেন ; যথা,—

"পশ্যতৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্। বাতবর্ষাতপহিমান সহন্তো বারয়ন্তি নঃ॥
অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্। সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥
পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ। গন্ধনির্য্যাস ভস্মাস্থিনতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে॥
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু। প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা॥"

অর্থাৎ—"এই মহাভাগ বৃক্ষকে দর্শন কর ; ইহারা পরের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত নির্জ্জনে জীবিত রহিয়াছে। দেখ,—স্বয়ং বাত বর্ষা রৌদ্র হিম সহ্য করিয়া আমাদিগকে ঐ সকল হইতে রক্ষা করিতেছে। অহো! ইহাদিগের জন্ম অতি উৎকৃষ্ট। ইহারা সকল প্রাণীর উপজীব্য। দয়ালু ব্যক্তির নিকট হইতে যাচকের ন্যায় ইহাদিগের নিকট হইতে কখনই বিমুখ হয় না। ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, গন্ধ, নির্য্যাস, ভস্ম, অস্থি ও পল্লবাদির অঙ্কুর দ্বারা নিরন্তর বাসনা পূরণ করে। প্রাণীদিগের মধ্যে প্রাণ, সম্পত্তি ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা মঙ্গল আচরণ করাই জীবগণের জন্মের ফল।" এ উপদেশের তুলনা নাই। দেহ, প্রাণ, বাক্য, মন, সম্পত্তি প্রভৃতির দ্বারা সর্ব্বদা জীবের মঙ্গল আচবণ কবিবে ; তবেই জীবন সফল—জন্ম সফল। আদর্শ অমূল্য সমাজ-নীতি!—'প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়াঃ বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা।' বিশ্বপ্রেম-বিধায়ক এমন নীতি আর কোথায় আছে?

শ্রীকৃষ্ণের নীতি সচ্চরিত্রতা-বিধায়ক।

শ্রীকৃষ্ণের নীতির মধ্যে যেমন সর্ব্বত্র করুণা প্রকাশের উপদেশ প্রাপ্ত হই, তেমনই সচ্চরিত্রতার ও লোকানুবর্ত্তিতার প্রভাব দেখিতে পাই। দ্যূতক্রীড়া সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি অনুধাবন করিলে তাঁহার নীতি কত দূর উন্নত ছিল, বুঝিতে পারা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—অক্ষক্রীড়ায় সাধু মানবগণের মতিভ্রংশ হয় এবং অসৎ লোকদিগের সুহৃদ্ভেদ ও নানা প্রকার বিপদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা, মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বে দুর্য্যোধনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

"অক্ষদ্যূতং মহাপ্রাজ্ঞ সতাং মতিবিনাশনম্। অসতাং তত্র জায়ন্তে ভেদাশ্চ ব্যসনানি চ॥"

কৃষ্ণদ্বেষিগণের রটনা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ লাম্পট্য দোষ দুষ্ট ছিলেন, পরবর্ত্তী কালে কোনও কোনও বৈষ্ণব কবি কতকটা সেইরূপ চিত্রে শ্রীকৃষ্ণকে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ কোন্ প্রেমের প্রেমিক ছিলেন, আর কেমন প্রেমের শিক্ষা জগৎকে তিনি শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই, তাহা ধারণা করিতে না পারিয়াই, অজ্ঞজন ভ্রমে পতিত হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণের নীতি, শ্রীকৃষ্ণের উক্তি লক্ষ্য করিলে সে ভ্রম একেবারে দূর হইতে পারে। কৃষ্ণগতপ্রাণা রমণীগণকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কি উপদেশ দিতেছেন, দেখুন ;—

"পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ। লোকশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে॥
ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ। তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ॥"

অর্থাৎ,—'অঙ্গে অঙ্গে মিলন মিলন নয় ; চিত্ত-সমর্পণই প্রকৃত মিলন।' পতি, পিতা, ভ্রাতা ও

পুত্রাদি তাহাতে দোষ দিতে পারে না, অথচ, সেই মিলনই প্রকৃষ্ট মিলন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, মনন প্রভৃতির দ্বারাই যে শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর সে সঙ্গলাভে যে সকল বন্ধনের অবসান হইয়া যায়, এখানে ভগবদুক্তিতে সেই ভাবই পরিব্যক্ত,—শ্রীকৃষ্ণের ইহাই সার উপদেশ। শ্রীকৃষ্ণ সমাজের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবার জন্য আদৌ চেষ্টা করেন নাই; পরন্তু যাহাতে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা হয়, তৎপ্রতি তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। পতি, পিতা, পুত্র প্রভৃতি দোষ দেখিতে না পান—এতদুক্তিতে তাঁহার লোকানুবর্ত্তিভাবই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই না কি? কামজয়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রধান শিক্ষা তিনি তাই পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন,—যাহারা অজিতেন্দ্রিয়, তাহারা মা[illegible] দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়া, অগ্নিতে প্রলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায়, অন্ধ নরকে নিপতিত হয়। [illegible] রমণীগণ ও স্বর্ণভরণ ও বস্ত্রাদিতে প্রলুব্ধ হইয়া উপভোগ বুদ্ধিতে জ্ঞানহারা [illegible] বিনষ্ট হয়। যথা,—

"দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্র[illegible] তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥

যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদিদ্রব্যেষু মা[illegible]।

প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগবুদ্ধ্যা পতঙ্গ[illegible]ষ্টঃ॥"

এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনার আবশ্যক অনুভব ক[illegible]তঃ শ্রীকৃষ্ণ যে ব্যাভিচারস্রোত প্রবাহিত করেন নাই, পরন্তু সে স্রোত রুদ্ধ করিবার পক্ষেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীকৃষ্ণ যে একজন পরম রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে [illegible] জরাসন্ধ, কালযবন, শিশুপাল প্রভৃতির সংহার সাধনে তাহা বেশ প্রতিপন্ন হয়। জরাসন্ধ [illegible]ক বন্দী রাজগণের উদ্ধার-সাধন এবং যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য-স্থাপনে একে একে পথের কণ্টক দূরীকরণ,—তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। তাঁহার উক্তির মধ্যে এই রাজনীতিজ্ঞতার নিদর্শন নানা স্থানে দেখিতে পাই।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ।

সৌভাগ্যমদের উন্মত্ততাই যে পতনের লক্ষণ, বন্ধনোন্মুক্ত রাজগণকে শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্দ, ত্রিসপ্ততিতমাধ্যায়, ১৯শ—২০শ শ্লোঃ) তাহা বুঝাইয়া বলিতেছেন,—

"দিষ্ট্যা ব্যবসিতং ভূপা ভবন্ত ঋতভাষিণঃ। শ্রিয়ৈশ্বর্য্যমদোন্নাহং পশ্য উন্মাদকং নৃণাম্॥

হৈহয়ো নহুষো বেণো রাবণো নরকোঽপরে। শ্রীমদাদ্ভ্রংশিতাঃ স্থানাদ্দেবদৈত্যনরেশ্বরাঃ॥"

অর্থাৎ,—'আমি দেখিতেছি, সৌভাগ্য-মদের উন্নতিই মানবের উন্মত্ততার কারণ। কার্ত্তবীর্য্য, নহুষ, বেণ, রাবণ, নরক এবং অন্যান্য দেব দৈত্য রাজগণ ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে অন্ধ হইয়া স্ব স্ব স্থান হইতে পতিত হইয়াছেন।' ইহার পর, সেই বন্ধনোন্মুক্ত রাজগণ স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কি ভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন, শ্রীকৃষ্ণ তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। সে উপদেশে বলেন যে, ভগবানে চিত্ত স্থির রাখিয়া সাবধানে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে হইবে, সন্তান-সন্ততি সুখ-দুঃখ অথবা মঙ্গলামঙ্গল যেমন ঘটিবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে এবং ভগবানে চিত্ত স্থির রাখিয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইবে। এইরূপ উপদেশ দিয়া বন্ধনমুক্ত রাজগণের প্রতি যথোপযুক্ত সদয় ব্যবহার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে

ও কার্য্যে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার বিশিষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। অযথারূপে অত্যাচারগ্রস্ত রাজগণকে মুক্তিদানে তিনি তাঁহাদের হৃদয় যেরূপ ভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহাদিগের দ্বারা বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল। শরণাগত রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে সহায়তা-লাভ,—এই ব্যাপারে দুই কার্য্য সংসাধিত হয়। এ কথা, এ ভাব তাঁহার বাক্যেই প্রকাশ,—"কার্য্যং হৈতদ্ভবদ্ভিস্তু রক্ষা চ শরণৈষিণাম্।" শরণাগত রক্ষা যে শ্রীকৃষ্ণের নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই উক্তির অভ্যন্তরে তাহা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবগণের পক্ষাবলম্বনে যুগপৎ ন্যায়ের মর্য্যাদা ও শরণাগত-রক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। অথচ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে আত্মীয়-সুহৃদের যাহা কর্ত্তব্য, সে কর্ত্তব্য-পালনে শ্রীকৃষ্ণের একটুও ত্রুটি দেখা যায় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে সন্ধি-স্থাপনের জন্য তিনি যে যথোচিত চেষ্টা করিয়ছিলেন, তাহার প্রমাণ পদে পদে প্রত্যক্ষ হয়। মহামতি বিদুর যখন দুর্য্যোধনের অন্যায় আচরণের বিষয় বিবৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—"বলগর্ব্বিত বিমূঢ় দুর্য্যোধন কখনই আপনার বাক্য রক্ষা করিবে না"; মনে করিয়া দেখুন দেখি, তখন শ্রীকৃষ্ণ কি উত্তর দিয়াছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—"আমি দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য এবং ক্ষত্রিয়গণের শত্রুভাব সকলই অবগত আছি, এবং অবগত থাকিয়াও অদ্য কুরুমণ্ডল মধ্যে সমাগত হইয়াছি। যে যে ব্যক্তি এই অশ্ব-রথ-মাতঙ্গ সমাকীর্ণ বিপর্য্যস্ত মেদিনী-মণ্ডলকে মৃত্যু-পাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হয়, সে অবশ্যই অত্যুত্তম ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে। আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, মনুষ্য স্বীয় শক্তি অনুসারে কোনও ধর্ম্ম-কার্য্য নিষ্পাদনে যত্ন করিয়া যদিও কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তথাপি তাহার পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়; আবার মনে মনে কোনও পাপ কর্ম্মের চিন্তা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান না করিলেও তজ্জন্য ফলভোগের অধিকারী হয় না। ....সংগ্রামে আশু-বিনাশোন্মুখ কুরু ও সৃঞ্জয়গণ মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে আমি অকপটে যত্ন করিব। ....আপদগ্রস্ত কৃষ্যমান মিত্রকে যে ব্যক্তি যথাশক্তি অনুনয়ের দ্বারা তাহা হইতে বিমুক্ত করিবার চেষ্টা না করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে নৃশংস বলিয়া উক্ত করেন। মিত্র ক্ষমতানুসারে যত্ন করিয়া যে কোনও উপায় দ্বারা, এমন কি কেশগ্রহ পর্য্যন্ত করিয়াও, মিত্রকে অকার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করতঃ কাহারও নিন্দনীয় হন না। ....আমি হিতানুষ্ঠানে যত্নপরায়ণ হইলেও যদি দুর্য্যোধন আমার প্রতি কোনও শঙ্কা করে, তথাপি মিত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিলাম বলিয়া আমার হৃদয়ের প্রীতি হইবে। জ্ঞাতিগণ মধ্যে পরস্পর ভেদ হইবার সূত্র হইলে যে মিত্র সর্ব্ব-প্রযত্নে মধ্যস্থাবলম্বন না করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে মিত্র বলিয়া গণনা করেন না। সন্ধি বিষয়ে আমার যত্ন করিবার হেতু এই যে, অধর্ম্মনিষ্ঠ সৌহৃদ্য-শূন্য মূঢ় লোকেরা যেন বলিতে না পারে, কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও কোপযুক্ত কুরু-পাণ্ডবগণকে যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিল না। .... অবোধ দুর্য্যোধন যদি আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত মঙ্গলময় বাক্য শ্রবণ করিয়াও অগ্রাহ্য করে, তবে নিতান্তই কালের বশবর্ত্তী হইবে। অথবা যদি পাণ্ডবদিগের অর্থহানি না করাইয়া আমি কুরুগণ মধ্যে শান্তি-সংস্থাপন করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমারও মহাফলোপধায়ক

পুণ্য কর্ম্ম করা হয় এবং কৌরবেরাও মৃত্যুপাশ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে।" শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির মধ্যে সর্ব্ববিধ শিক্ষাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সকল নীতিরই সমাবেশ আছে। কি নিগূঢ় শিক্ষাপ্রদ ধর্ম্মনীতি—যখন তিনি বলিলেন,—

"ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যা নো চেৎপ্রাপ্নোতি মানবঃ। প্রাপ্তো ভবতি তৎপুণ্যমত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ॥
মনসা চিন্তয়ন্ পাপং কর্ম্মনা নাভিরোচয়ন্। ন প্রাপ্নোতি ফলং তস্যেত্যেবং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥"

তার পর, শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মধ্যে আরও দেখুন, রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে কেমন সমাজ-নীতি ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত রহিয়াছে। মিত্রের ও জ্ঞাতির কর্ত্তব্য কি? সে উপদেশ,—

"ব্যসনে ক্লিশ্যমানং হি যো মিত্রং নাভিপদ্যতে। অনর্থায় যথাশক্তি তম্নৃশংসং বিদুর্ব্বুধাঃ॥
আকেশগ্রহণান্মিত্রমকার্য্যাৎ সন্নিবর্ত্তয়ন্। অবাচ্যঃ কস্যচিদ্ভবতি কৃতযত্নো যথাবলম্॥
জ্ঞাতীনাং হি মিথো ভেদে যন্মিত্রং নাভিপদ্যতে। সর্ব্বযত্নেন মধ্যস্থং ন তন্মিত্রং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

এই সকল উক্তির মধ্যে প্রকৃষ্ট রাজনীতির লক্ষণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে অধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধনে সঙ্কল্পবদ্ধ আছেন; অথচ, সন্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। মিত্র হিসাবে, আত্মীয় হিসাবে, যে চেষ্টা করা আবশ্যক, তাহাতে ত্রুটি হইতেছে না; অথচ, দুষ্টের দমন-রূপ কর্ত্তব্যপালন-স্পৃহাও জাগরূক রহিয়াছে। মিত্রতাও দেখান হইতেছে, আবার ভয়-প্রদর্শনেরও ত্রুটি হইতেছে না। রাজনীতিজ্ঞের যে লক্ষণ, এই এক সন্ধি-প্রস্তাবেই তাহা বিশিষ্ট ভাবে দেখিতে পাই। সন্ধি-সংস্থাপনের জন্য কুরু-সভায় গমন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের ত্রুটির কোনও কথাই ব্যক্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন না; অধিকন্তু জানাইলেন, সুহৃদগণের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলে তুমি কোনও কালে কল্যাণ-লাভে সমর্থ হইবে না;—'ন শর্ম্ম প্রাপ্স্যসে রাজন্নুৎক্রম্য সুহৃদান্ বচঃ।' পিতা মাতা গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া যে জন কোনও কার্য্য করে, তাহার শ্রেয়ঃ নাই,—শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে এই সকল কথা প্রকাশ পায়। সুতরাং তিনি এক হিসাবে দুর্য্যোধনের শ্রেয়ঃ-সাধন পক্ষে আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলেন বুঝা যায়; আবার অন্য হিসাবে তাঁহার শ্লেষ-বাক্য দুর্য্যোধনকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিয়াছিল বলিয়াই বুঝিতে পারি। কথিত হয়, দ্বিভাবার্থজ্ঞাপক বাক্য প্রয়োগই বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞের লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে কেহ কেহ তাই তাঁহার ঐরূপ দ্ব্যর্থ-ভাবাত্মক বাক্যের সমালোচনায় তাঁহাকে পরম কূটরাজনীতিজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ রটনায়, সত্যাসত্যের অনুবর্ত্তিতা প্রসঙ্গে, কেহ তাঁহাকে প্রকৃষ্ট রাজনীতিক বলিয়া ঘোষণা করেন, কেহ বা তাঁহাকে অসত্যের—পাপের প্রশ্রয়দাতা বলিয়া অনুযোগ করিয়া থাকেন। এখানে আমরা কিন্তু তাঁহার দিব্য-সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাই। রাজনীতিকের দৃষ্টিতে, বিপক্ষ পক্ষের সংহার-সাধনের জন্য তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই শ্লাঘনীয়। কেন-না, বিজয়-লক্ষ্মী সেই পথেই তাঁহাকে জয়মাল্য প্রদান করিয়াছিলেন। সাম-দান-ভেদ প্রভৃতি রাজনীতির অঙ্গ। রাজনীতি-ক্ষেত্রে জয়ী হইতে হইলে সে সকল কূট-নীতির সাহায্য অপরিহার্য্য। কিন্তু সমালোচকের তীব্র-দৃষ্টিতে ঐ সকল কার্য্যে তিনি ভয়ানক অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন; কেন-না,—তিনি 'সত্যাই ধর্ম্ম' 'অহিংসাই ধর্ম্ম' প্রভৃতি রূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া

আপন কার্য্যে অসত্যের হিংসার প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন। এ সকল বিষয় বুঝিতে হইলে ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিবার প্রয়োজন হয়। * কেন-না, রাজধর্ম্ম একরূপ, গার্হস্থ্যধর্ম্ম একরূপ, আর মোক্ষধর্ম্ম একরূপ; সুতরাং সর্ব্বত্র একবিধ নীতি কখনও প্রয়োজন-সাধক হয় না। কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা যাহা বুঝিয়াছি, † তদনুসারে বিচার করিতে গেলে সত্যে অসত্য, অসত্যে সত্য প্রতিপাদিত হইতে পারে। আমরা যাহাকে সত্য বলিয়া মনে করি, অনেক সময় তাহা ভ্রান্তিমূলক প্রতিপন্ন হয়। আবার আমরা যাহাকে মিথ্যা বলিয়া মনে করি, অনেক সময় তাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। যদি বুঝা যায়, দুর্য্যোধনের পক্ষ অধর্ম্মের—অসত্যের পরিপোষক, আর তাহাদের ধ্বংস-সাধনে ধর্ম্মের—সত্যের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে বুঝিতে হয়, যুধিষ্ঠিরের সেই উক্তি অসত্য হইয়াও সত্য-ফল-প্রসূ। কিন্তু সে বিতর্কে—সে দার্শনিক গবেষণায় প্রবৃত্ত না হইয়া যদি মানুষিক সহজ দৃষ্টিতে সন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলেই বা কি তথ্য অবগত হই? অবগত হই না কি, শ্রীকৃষ্ণ কি লৌকিক ভাবে কি অলৌকিক ভাবে অসত্যের প্রশ্রয় কখনও দেন নাই! যুধিষ্ঠির সত্যবাদী; তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই; জ্ঞানে হউক আর অজ্ঞানে হউক, অশ্বত্থামার সংহার-সাধনে তাঁহাকে মিথ্যার প্রশ্রয় দিতে হইল। জীবনে একবার একটী মাত্র ঘটনায় যুধিষ্ঠির মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু তাহার ফল হইল কি? ফল হইল—তাঁহার নরক-দর্শন। শ্রীকৃষ্ণ দেখাইলেন,—মিথ্যা কখনই শ্রেয়ঃ-সাধক নহে; সত্যের জন্য—ধর্ম্মরাজ্য সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে মিথ্যা, সে মিথ্যাও দোষাবহ। শাস্ত্রে আছে বটে, প্রাণ-রক্ষা-কল্পে ও বিবাহ প্রভৃতি বিষয়-বিশেষে মিথ্যাও পাতক শূন্য হইয়া থাকে; ‡ কিন্তু সত্য-মিথ্যার সে মীমাংসায় উপনীত হওয়া সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। যেখানে উপদেশ আছে—প্রাণীর প্রাণ রক্ষার জন্য মিথ্যা দোষাবহ নহে, সেখানে বিচার করা প্রয়োজন—কোন্ অবস্থায় দোষাবহ নহে! শ্রীকৃষ্ণ পরম জ্ঞানী—পরম নীতি-তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং তিনি দোষাদোষ বিচার করিয়াই সত্য-মিথ্যার উপযোগিতা নির্দ্ধারণ করিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও কর্ম্মফল অনিবার্য্য। মিথ্যা হিংসা যখন কর্ম্মরূপে পরিণত হইবে; তাহার ফলোৎপত্তি কেহই রোধ করিতে পারিবে না। যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা-বাক্য এক দিকে সত্যের প্রতিষ্ঠায়—ধর্ম্ম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় সহায় হইল বটে; কিন্তু অন্য দিকে এক জন ধার্ম্মিকের সংহার-সাধন করিল। সুতরাং ঐ এক মিথ্যায় দুই ফল অনিবার্য্য হইল। যে শুভ-সঙ্কল্প-সাধনের দূর লক্ষ্য রাখিয়া সেই মিথ্যা-বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছিল, সে শুভ-সঙ্কল্প সাধিত হইয়া আসিল; অপিচ, সে যে মিথ্যা—আশীবিষ, তাহার ক্রিয়াও করিয়া গেল,—সেই মিথ্যার জন্য যুধিষ্ঠিরকে নরক-দর্শন করিতে হইল। এইখানে একটী প্রশ্ন

* প্রথম খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে মহাভারত পরিচ্ছেদে 'মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র' প্রসঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্মের এই তত্ত্ব-কথা কতকাংশে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের দার্শনিক মত প্রসঙ্গেও এতদ্বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

† এই খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসের ২০৩-৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ মিথ্যা কোন্ কোন্ অবস্থায় পাতকশূন্য, পৃথিবীর ইতিহাস প্রথম খণ্ডে ২৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় তাহার আলোচনা আছে।

উঠিতে পারে। সে মিথ্যার পাপ কৃষ্ণে না বর্ত্তিয়া যুধিষ্ঠিরে বর্ত্তিল কেন? তাহারও কারণ আছে। শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম, যুধিষ্ঠির সকাম। যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভেচ্ছু, সুতরাং সকাম ছিলেন। সেই জন্য নিষ্কামকর্ম্মী শ্রীকৃষ্ণে পাপফল স্পর্শ করিল না; সকামকর্ম্মী যুধিষ্ঠির পাপ-ফলভাগী হইলেন। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ এখানে দেখাইলেন, অজ্ঞাতসারে মিথ্যা কহিলেও পাপভাগী হইতে হইবে। ফলতঃ, সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, শ্রীকৃষ্ণ যে মিথ্যার প্রশ্রয়দাতা ছিলেন, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। তিনি একজন প্রকৃষ্ট রাজনীতিক ছিলেন, এ সকল আলোচনায় তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীকৃষ্ণের সকল নীতির শ্রেষ্ঠনীতি—ধর্ম্মনীতি। সমাজনীতি রাজনীতি প্রভৃতি এক হিসাবে তাঁহার ধর্ম্মনীতিরই অন্তর্ভুক্ত। যাহা কিছু তিনি উপদেশ দিয়াছেন বা যে কিছু কার্য্যের তিনি অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, সকলেরই মূল লক্ষ্য এক—ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা। সুতরাং তাঁহার নীতিমাত্রেরই মূল-ভিত্তি—ধর্ম্মের উপর। অর্থাৎ,—তাঁহার প্রবর্ত্তিত কি সমাজনীতি কি রাজনীতি সকলই ধর্ম্মশিক্ষামূলক। তথাপি আমরা তাঁহার নৈতিক মত-সমূহকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিলাম; তাহার কারণ এই যে, কার্য্যক্ষেত্রে সংসারীর পক্ষে বিভিন্ন অবস্থাতে তাঁহার মত বিভিন্ন প্রকারে কার্য্যকরী হইতে পারে। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মনীতি-প্রসঙ্গে মানুষের উচ্চ-পরিণতির বিষয়ই বিবৃত করা হইতেছে। যে অবস্থা সকল অবস্থার সার অবস্থা, সে অবস্থার লক্ষণ কি—আর কেমন করিয়াই বা সে অবস্থায় উপস্থিত হওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মনীতির আলোচনায় কেবল তাহারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব মাত্র। প্রথম, মানুষের কিরূপ পরার্থপর নিঃসঙ্গ ও নির্লিপ্ত হওয়া প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—

শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মনীতি।

"শশ্বৎপরার্থসর্ব্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ। সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্॥
প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ। জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ॥
বিষয়েষ্বাবিশন্ যোগী নানাধর্ম্মেষু সর্ব্বতঃ। গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিষজ্জেত বায়ুবৎ॥
পার্থিবেম্বিহ দেহেষু প্রবিষ্টস্তদ্গুণাশ্রয়ঃ। গুণৈর্ন যুজ্যতে যোগী গন্ধৈর্বায়ুরিবাত্মদৃক্॥
অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেষু ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন।
ব্যাপ্ত্যাব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো মুনির্নভস্ত্বং বিততস্য ভাবয়েৎ॥
তেজোঽবন্নময়ৈর্ভাবৈর্মেঘাদ্যৈর্বায়ুনেরিতৈঃ। ন স্পৃশ্যতে নভস্তদ্বৎ কালসৃষ্টৈর্গুণৈঃ পুমান্॥
স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্য্যস্তীর্থভূর্নৃণাম্। মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপস্পর্শকীর্ত্তনৈঃ॥"

অর্থাৎ—'পর্ব্বত যেমন পরার্থ-ব্রতধারী, তদ্গাত্রোৎপন্ন বৃক্ষতৃণ-নির্ঝর যেমন পরের প্রয়োজন-সাধক হয়; সাধুগণের কার্য্যও সেইরূপ হওয়া কর্ত্তব্য; তাঁহারা পর্ব্বতগাত্রোৎপন্ন বৃক্ষাদির নিকট হইতে পরার্থতা (পরের জন্যই তাঁহাদের কার্য্য) শিক্ষা করিবেন। সাধুজন প্রাণধারণ করিবেন—কেবল জ্ঞানান্বেষণের জন্য; রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় উপভোগের জন্য সাধুগণ কখনই জীবনধারণ করেন না। গুণলিপ্সা বাক্মনের বিক্ষেপ জ্ঞান-নাশক। শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি নানাধর্ম্মশীল থাকিয়াও সাধুপুরুষ গুণদোষে অনাসক্ত থাকিবেন; বায়ু যেমন সর্ব্বত্র সঞ্চালিত থাকিয়াও নির্লিপ্ত আছেন; যোগী পুরুষের সেইরূপ নির্লিপ্ততা

প্রয়োজন। আত্মদর্শী যোগী বাল্যযৌবনাদি দেহধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াও এবং সেই সেই অবস্থার গুণাশ্রয়ী হইয়াও, অসংশ্লিষ্ট থাকেন; বায়ু যেমন গন্ধাদি ধর্ম্ম-যোগে গন্ধবহ বলিয়া অভিহিত হইলেও গন্ধাদির সহিত অসংস্পৃষ্ট, যোগিপুরুষও সেইরূপ নির্লিপ্ত-ভাবাপন্ন। আকাশ যেমন সর্ব্বগত, ঘটাদির সহিতও তাহার যেমন অসঙ্গ নাই, অথচ আকাশ যেমন নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত; আত্মা সেইরূপ সর্ব্বভূতে বিরাজমান আছেন; যোগী পুরুষ দেহাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত আত্মার স্থাবর-জঙ্গমাদি সর্ব্বত্র নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিতির বিষয় অনুভব করিবেন। তেজ, জল, অন্ন, পৃথিবী, প্রভৃতি কালসৃষ্টগুণে পুরুষ আবদ্ধ নহেন; বায়ু-চালিত মেঘাদির সহিত আকাশের যেমন সংশ্রব অভাব, যোগী পুরুষেরও সেইরূপ নির্লিপ্ত ভাব। স্বভাবজ নির্ম্মল স্নিগ্ধ মধুর জল যেমন জীবের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে, নির্ম্মল স্নিগ্ধ মধুর স্বভাব সাধুপুরুষও সেইরূপ দর্শন স্পর্শন কীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারা দ্রষ্টা-মাত্রকে পরিতৃপ্ত করেন।' অন্য আর এক স্থলে ভগবান সাধুজনের উপমায় কহিতেছেন,—"সিন্ধু যেমন বর্ষাকালীন নদী-সকলের জল প্রাপ্ত হইয়াও বেলা অতিক্রম করেন না এবং গ্রীষ্মকালে নদীসকল শুষ্ক হইলেও বিশুষ্ক হন না; তদ্রূপ নারায়ণ-পরায়ণ যোগী কামসকল যথেষ্টরূপে লাভ করিয়া বা ঐ সকল বর্জ্জিত হইয়া, আনন্দে মত্ত ও দুঃখে ম্লান হইবেন না।" শ্রীমদ্ভাগবতে (একাদশ স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায়, ৬ষ্ঠ শ্লোক) যথা,—

"সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপরো মুনিঃ। নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ॥"

সাধুর স্বরূপ ও সাধুসঙ্গের ফল শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান এইরূপ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন,—

"সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ। নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥
যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্। শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়নম্। সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্। ধর্ম্মোবিত্তং নৃণাং প্রেত্যসন্তোঽর্ব্বাগ্‌বিভ্যতোঽরণম্॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ। দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্তঃ আত্মাহমেব চ॥"

অর্থাৎ,—"যাঁহারা নিরপেক্ষ, মচ্চিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতাশূন্য, অহঙ্কারবর্জ্জিত, দ্বন্দ্বরহিত এবং পরিগ্রহশূন্য, তাঁহারাই সাধু।...যেমন ভগবান অগ্নিকে আশ্রয় করিলে লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না; তেমনি সাধুগণের সেবা করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যেমন, যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন; তাঁহাদিগের নৌকা পরম আশ্রয়; সেইরূপ ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জন ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধু-সকল পরম অবলম্বন। যেমন অন্ন প্রাণিগণের প্রাণ; যেমন আমি কাতর জনগণের শরণ; যেমন ধর্ম্ম পরকালে মানবগণের ধন; সেইরূপ সাধুগণ সংসারপতনভীত পুরুষের পরিত্রাতা। সাধুসকল অশেষ চক্ষু প্রদান করেন; সূর্য্য উদিত হইয়া বাহ্য-চক্ষু প্রদান করেন; সাধুগণ অন্তশ্চক্ষু, বহিশ্চক্ষু উভয়বিধ দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। সাধুগণই দেবতা ও বান্ধব; সাধুগণই আমি আত্মারূপে অবস্থিত।" সাধুমহিমা সাধুসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মানুষকে সাধুসঙ্গে সচ্চিন্তায় সদ্ভাবনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে সচ্চিন্তায় যে সৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়; আর অসচ্চিন্তায় অসৎসঙ্গে অসৎভাবে যে বিপরীত অবস্থা প্রাপ্তি

ঘটে; একটী দৃষ্টান্তে তাহা বিশদীকৃত দেখি। শ্রীমদ্ভাগবতে (একাদশ স্কন্ধ, নবম অধ্যায়) যথা,—

"যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎসরূপতাম্॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ। যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসন্ত্যজন্॥"

অর্থাৎ—"মনের সহিতই মুক্তির বা দেহীর অবস্থান্তর প্রাপ্তির সম্বন্ধ। স্নেহ, দ্বেষ, ভয় প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে তাহার অনুধ্যান থাকে, দেহান্তেও সে তত্তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। কীট যেমন পেশস্কারকে (ভ্রমর-বিশেষকে) ধ্যান করিতে করিতে তৎকর্তৃক কুড্যার (ভিত্তির) মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিরুদ্ধ অবস্থায় তাহার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়; মানুষেরও সেই দশা হয়।' * সকল উপদেশের সার উপদেশ এই উপমায় নিবদ্ধ দেখি। মনই সকল অবস্থার বিধায়ক; সুতরাং চিত্তকে স্থির করিয়া যিনি আত্মার প্রতি ন্যস্ত করিতে পারেন, অর্থাৎ মন যাঁহার ভগবন্ন্যস্ত হইতে পারিয়াছে, তাঁহারই জন্ম সার্থক, জীবন সার্থক, শিক্ষা সার্থক।

ভক্তমুখে ধর্ম্মনীতি-প্রচার।

বলিয়াছি তো, শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মনীতি তাঁহার শিক্ষার প্রাণভূত। সুতরাং যেখানে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, যেখানে তাঁহার অমৃতবাণী বিঘোষিত হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার ধর্ম্মনীতির আলোক-রশ্মি হৃদয়ে হৃদয়ে বিচ্ছুরিত দেখি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সকল অংশই ধর্ম্মনীতি-মূলক। শ্রীকৃষ্ণের দার্শনিক মত-পরম্পরা আলোচনা-উপলক্ষে যে সকল অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতেই এ বিষয় বিশদরূপে অবগত হওয়া যাইবে। ভাগবত, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং হরিবংশ প্রভৃতিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে সকল উক্তি দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যেও ধর্ম্মনীতি ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাভারতের অনুগীতা—তদুক্ত ধর্ম্মোপদেশ-মূলক। শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম-বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ প্রদান করেন, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দর্শন করিলে, সেও শ্রীকৃষ্ণ-কথিত ধর্ম্ম-তত্ত্ব বলিয়া মনে করিতে পারি। কেন-না, মহাভারতে লিখিত আছে,—শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের শরীরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে ভক্তি ও ত্রিকাল-দর্শন-জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশচ্ছলে সকল শাস্ত্রের সার তথ্য অবগত করান। এমন কোনও উপদেশ বা এমন কোনও শিক্ষা বোধ হয় নাই,—শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের উক্তিতে যাহা ব্যক্ত হয় নাই। ভীষ্ম যে পরম জ্ঞানী পরম পণ্ডিত ছিলেন, তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই। তথাপি মুমূর্ষু ভীষ্ম কোন্ শক্তি প্রভাবে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাদৃশ তত্ত্ব-কথা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও বিবেচনার বিষয়। সে শক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ভিন্ন কি বলিব? যোগ-প্রভাবে পরদেহে প্রবেশের সামর্থ্য জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ যোগপ্রভাবে ভীষ্মের দেহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মুখে ধর্ম্ম-তত্ত্ব ব্যক্ত করেন। ইহা অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নহে! আজকাল যোগাঙ্গের অংশ মাত্র অবলম্বন করিয়াই কত অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে। মেস্‌মেরিজ্‌ম্,

* প্রবাদ আছে, কাঁচপোকা (কুমীরে পোকা) আরশুলা ধরিয়া আপনার বাসার মধ্যে লইয়া যায়। সেখানে গিয়া কাঁচপোকার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আরশুলা ক্রমশঃ কাঁচপোকায় পরিণত হয়। মানুষেরও সেই অবস্থা। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

হিপ্‌নটিজম্, স্পিরিচুয়ালিজম্ প্রভৃতি তত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিষয়ই এখানে উল্লেখ করিতেছি। মেসমেরিজম্ (Mesmerism) শক্তি প্রভাবে মানুষ দেহ বিশেষে শক্তি-বিশেষের সঞ্চালন করিতে সমর্থ হয়। * মেস্মর-তত্ত্ব-বিশারদগণ (Mesmeriser) অধিবিষ্টের (Mediumএর) সাহায্যে অলৌকিক অমানুষিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইউরোপে, আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা হওয়ায়, অধিবিষ্ট (মিডিয়াম্) সাহায্যে পরলোকগত আত্মার আবির্ভাব অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; অপিচ, সেই অধিবিষ্ট (মিডিয়াম্) অশিক্ষিত অজ্ঞজন হইলেও গভীর জ্ঞান-গবেষণার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। তত্ত্বাধিবেশনে (Seance) অধিবিষ্টের (মিডিয়ামের) সাহায্যে পরলোকগত ব্যক্তির ছায়ামূর্ত্তি দর্শন এবং ক্রিয়া-কলাপ দর্শন অধুনা একরূপ অবিসম্বাদিত। একটী প্রামাণিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। † এণ্ড্রু গ্লেণ্ডিনিং বিষয়-বাণিজ্য উপলক্ষে লণ্ডনের উত্তর পশ্চিম ভাগে ডালষ্টন নামক উপকণ্ঠে বাস করিতেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী "তাঁহার শান্তিনিকেতন রূপ সুরম্য নিবাসে একটি তত্ত্বাধিবেশন (Seance) হইয়াছিল। অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা সকলেই দেখিলেন,—গ্লেণ্ডিনিঙের স্বর্গগত সহধর্ম্মিণী, সেখানে জড় পরমাণুতে আবৃত স্পর্শযোগ্য প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া একটা পার্শ্বস্থ টেবিলের পুষ্পাধান হইতে কয়েকটী পুষ্প হস্ত প্রসারণ করিয়া তুলিয়া লইলেন, এবং তাহা হইতে পাঁচটী পুষ্প দ্বারা গ্লেণ্ডিনিঙ্কে অলঙ্কৃত করিয়া, অন্যান্য ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদিগকে একটী কিংবা দুইটী করিয়া পুষ্প উপহার দিলেন।...(গ্লেণ্ডিনিং) প্রতি মাসে দুই তিন দিন, মিডিয়ামের সাহায্যে—প্রখর আলোকে—সিয়ান্স (Seance) অর্থাৎ তত্ত্বাধিবেশন করিয়া, তাঁহার

---

* মেস্‌মেরিজম্ (Mesmerism), স্পিরিচুয়ালিজম্ (Spiritualism), হিপ্‌নটিজম্ (Hypnotism), প্রায় একই প্রকারের ক্রিয়া-বিশেষ। ফ্রাঞ্জ মেস্‌মার (Franz Mesmer) নামক অষ্ট্রিয়ার জনৈক বৈজ্ঞানিক ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মেস্মরতত্ত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি প্রথমে চুম্বক ও লৌহ সমন্বিত যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ব্যাধি-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার এই পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। পরিশেষে মেস্মর-তত্ত্ববিদ্গণ তাঁহাদের দৃষ্টির প্রতি একদৃষ্টে লক্ষ্য করিবার প্রথা আবিষ্কার করিয়া অধিবিষ্টকে অভিভূত করেন এবং তাহার দ্বারা ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাইয়া লন। প্রথমে ব্যাধির চিকিৎসার উদ্দেশ্যেই এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মানচেষ্টার সহরের প্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক ব্রেড কর্ত্তৃক হিপ্‌নটিজম্ (Hypnotism) প্রথা আবিষ্কৃত হয়। উহারই পরিণতি—তত্ত্ববিদ্যা বা স্পিরিচুয়ালিজম্ (Spiritualism)। এতদ্দ্বারা মৃত ব্যক্তিকেও সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে বলিয়া প্রচার।

† বাঙ্গালা ভাষায় এ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট পুস্তক—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত (এক্ষণে লোকান্তরগত) কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি-আই-ই মহাশয়ের "ছায়াদর্শন"। ইংরাজী ভাষায় এ সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য;—(1) Life Beyond the Veil by Andrew Glendinning (2) Modern Spiritualism: its Facts and Fanaticisms by E. W. Carpon. (3) Froot-falls on the Boundary of Another World by Robert Del Owen. (4) Modern American Spiritualism—a Twenty Years' Record of the Communion between Earth and World of Spirits by Emma Hardinge.

স্বর্গগত পত্নী ও পুত্রকন্যার ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদিগের হস্তস্পর্শ ও ললাট-চুম্বন-লাভে, এবং তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথনে অন্তরে অমৃতশীতল সুখশান্তি প্রাপ্ত হন।" তত্ত্ববিদ্যা-সংক্রান্ত গ্রন্থে এ সকল বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষে এই তত্ত্ব-বিদ্যা যে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। যে সময়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তখন তত্ত্ববিদ্যার উৎকর্ষেরই দিন। যোগ—তত্ত্ববিদ্যার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি। যোগ-প্রভাবে সকলই সম্ভব ছিল। শ্রীকৃষ্ণ পরম যোগী ছিলেন। মুমূর্ষু ভীষ্ম যে একাধারে সকল তত্ত্ব-কথার উপদেশ প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার একমাত্র কারণ,—শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব। ভীষ্ম মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ অর্চ্চন বন্দন দ্বারা তদ্গতচিত্ত হইয়াছিলেন। তখন, যোগপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ত্রিকাল-দর্শনের দিব্য-জ্ঞান প্রদান করেন। মহাভারতে (শান্তি-পর্ব্ব) যথা,—

"অভিগম্য তু যোগেন ভক্তিং ভীষ্মস্য মাধবঃ। ত্রৈলোক্যদর্শনং জ্ঞানং দিব্যং দত্ত্বা যযৌহরিঃ ॥"

যোগপ্রভাবে ভক্তের শরীরে প্রবেশ করিয়া ভক্তবৎসল ভগবান যে আপন বিভূতি প্রকাশ করেন, ইতিহাসে এ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। সেদিনও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্ত রায় রামানন্দের দেহে আবির্ভূত হইয়া প্রশ্নোত্তরচ্ছলে রামানন্দের মুখে পরম তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নিজের মুখে এবং অন্তরঙ্গগণের মুখে সকল নীতির সার নীতি-সমূহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে পরম নীতিবিৎ ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনই মতান্তর নাই।

সকল প্রকার নীতির, উপদেশের বা শিক্ষার একটা লক্ষ্য আছে। সে লক্ষ্য—সংসারের বা জগতের হিতসাধন। সুতরাং যে নীতির, উপদেশের বা শিক্ষার দ্বারা জগতের হিতসাধন হয়, তাহাই প্রকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের নীতির এই প্রকৃষ্টতা সর্ব্বতোভাবে পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার নিজের জীবনেই তিনি আপন কার্য্য দ্বারা আপনার প্রচারিত নীতির সার্থকতা দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের নীতি জনহিতসাধক।

শ্রীকৃষ্ণের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি, জনহিতসাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠারও মূল লক্ষ্য—দুষ্কৃতের বিনাশে সজ্জনের রক্ষায় সেই জনহিতসাধন-ব্রত পালন। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, জনহিতসাধনই যদি তাঁহার লক্ষ্য ছিল, তাহা হইলে লোকক্ষয়কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া অন্য প্রকারে তিনি শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা পাইলেন না কেন? জনহিতসাধন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত জন, লোকহনন করিবেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, জনহিতসাধন উদ্দেশ্যেই লোকহনন আবশ্যক হইয়াছিল; নহিলে, অকারণ তিনি লোকক্ষয় করিবার চেষ্টা কখনও পান নাই। জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি বধের দৃষ্টান্তে এ প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে। জরাসন্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জয়লাভ করা তৎকালে পাণ্ডবগণের পক্ষে অসাধ্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরন্তু সে পথে অগ্রসর হইতে হইলে, বহু লোকক্ষয় সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সেখানে এক কৌশল অবলম্বন করিলেন; তাঁহার একটী উক্তিতে বা নীতিবাক্যে, তাঁহার সে কৌশলের আভাষ পাওয়া যায়। সে উক্তিটী এই,—"অদ্বারেণ রিপোর্গেহং

দ্বারেণ সুহৃদো গৃহান। প্রবিশন্তি নরাধীরা দ্বারাণ্যেতানি ধর্ম্মতঃ॥" অর্থাৎ,—'বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা শত্রুর গৃহে অদ্বার দিয়া এবং বন্ধুর গৃহে দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হন।' এই উক্তির নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, শত্রুকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার সুবিধা না দিয়া, সহসা আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করাই বিধেয়। জরাসন্ধ বধ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ এই নীতিরই অনুসরণ করেন। তাঁহার কৌশলক্রমেই ভীমের সহিত জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ভীম ও জরাসন্ধ তুল্য বীর ছিলেন। তাঁহাদের মল্লযুদ্ধ কার্ত্তিক মাসের প্রথম তিথিতে আরম্ভ হয়। ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত উভয়ে দিবারাত্রি অনাহারে অবিশ্রান্ত যুদ্ধে ব্রতী ছিলেন। চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে জরাসন্ধ ক্লান্ত হইয়া সংগ্রামে নিরস্ত হন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীমসেন জরাসন্ধের সংহারসাধন করেন। শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে লোকক্ষয় নিবারিত হয়; অথচ জরাসন্ধও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। শত্রুনাশের সঙ্গে সঙ্গে নিরীহ সৈনিকগণ বা জনসাধারণ নিহত না হন,—এই উদ্দেশ্যে জরাসন্ধের বধে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলাবলম্বন বলিয়া মনে করিতে পারি। শিশুপাল-বধেও শ্রীকৃষ্ণ লোকক্ষয় বিষয়ে সাবধান ছিলেন। কালযবনের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতেও তাঁহার অপূর্ব্ব কৌশল দেখিতে পাই। জরাসন্ধের সহিত কালযবন পুনঃপুনঃ মথুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। কালযবনের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে মথুরাবাসিগণ অসমর্থ হইয়াছিলেন। কালযবনের ভয়ে শেষে শ্রীকৃষ্ণকে আত্মীয়-স্বজন সহ দ্বারকায় আশ্রয় লইতে হয়। অথচ, বিনা লোকক্ষয়ে কেমন কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ সেই কালযবনকে বধ করিয়াছিলেন! কৌশলের চরম চিত্র সেখানে প্রতিফলিত; আবার রাজনীতিজ্ঞতারও প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সেই ঘটনায় প্রত্যক্ষীভূত। বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণের সংহার-সাধন জন্য কাল-যবনের বিশেষ চেষ্টা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহা বেশ জানিতেন। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ একদিন কালযবনের সম্মুখ দিয়া একটা পর্ব্বত-গুহার দিকে একাকী পলায়ন করিলেন। একা শ্রীকৃষ্ণকে পর্ব্বত-গুহার দিকে পলাইতে দেখিয়া, কালযবন শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ একাকী পলায়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার অনুসরণে কালযবনের মনে কোনই দ্বিধা উপস্থিত হইল না। কালযবন একাই শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণে গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই গুহায় সূর্য্যবংশীয় রাজা মুচুকুন্দ যোগস্থ ছিলেন। গুহায় প্রবেশ করিয়াই কালযবন শ্রীকৃষ্ণ-ভ্রমে রাজা মুচুকুন্দকে পদাঘাত করেন। ফলে, মুচুকুন্দের কোপানলে কাল-যবনকে ভস্মীভূত হইতে হয়। হরিবংশে এই ঘটনা বিশেষভাবে বিবৃত আছে। কাল-যবন যাঁহারই হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হউন;—শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার সংহার সাধন করুন, অথবা মুচুকুন্দই তাঁহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলুন;—কালযবন-বধে লোকক্ষয় নিবারণে, প্রকারান্তরে লোকরক্ষা কল্পে, শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা দেখা যায়। কুরুপাণ্ডবের মধ্যে সন্ধিস্থাপন-চেষ্টায় লোকক্ষয় নিবারণ পক্ষে তাঁহার যে একান্ত যত্ন ছিল, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সুতরাং তাঁহার মূল লক্ষ্য যে লোকরক্ষা, সমাজরক্ষা, জনহিতসাধন, তদ্বিষয়ে কোনই মতান্তর থাকিতে পারে না। তবে এ কথাও এখানে বিচার্য্য যে, পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে যেমন তাঁহার লোকরক্ষাকর নীতির প্রাধান্য দেখিতে পাই, অন্যত্র আবার তাহার বিপরীত দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে লোকক্ষয় এবং যদুবংশের ধ্বংস-সাধন তিনি নিবারণ পক্ষে চেষ্টা করিলেন

না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সজ্জনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে দুর্জ্জনের উচ্ছেদ-সাধন অবশ্যম্ভাবী। ক্ষেত্রজাত ধান্যাদি শস্য রক্ষা করিতে হইলে, তদন্তরাঃভূত তৃণ-গুল্মাদি উৎপাটন একান্ত আবশ্যক। অল্পের অনিষ্টে যদি অধিকের ইষ্ট সাধিত হয়, নীতিবিদ্‌গণ তাহাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন। এইরূপে বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ পরম নীতিবিৎ ছিলেন; আর জনহিতসাধন উদ্দেশ্যেই তাঁহার নীতি বিহিত হইয়াছিল।

* * *

৯। শ্রীকৃষ্ণ—সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধারকর্ত্তা; কেন-না, ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আদর্শ তিনিই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

[ধর্ম্ম ও সনাতন ধর্ম্ম;—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কারণে ধর্ম্ম ও সনাতন ধর্ম্মের পরিচয়-লাভ;—কোন্ ধর্ম্মের গ্লানি দূরীকরণে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন,—সে ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম;—অধর্ম্ম-বারণ ও ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা,—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কিরূপে তাহা সংসাধিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন।]

ধর্ম্ম শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, যদ্দারা লোক-রক্ষা, সংসার-রক্ষা, সৃষ্টি-রক্ষা, আত্ম-রক্ষা হয়,—তাহাই ধর্ম্ম। * সনাতন শব্দের অর্থ নিত্য। সুতরাং "সনাতন ধর্ম্ম" শব্দে যে ধর্ম্ম দ্বারা নিত্যকাল লোক, সৃষ্টি ও আত্ম-রক্ষা হইয়া আসিতেছে, তাহাই বুঝা যায়। এই অর্থের অনুসরণে, কেহ বা সদ্‌গুণ-সমূহকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; কেহ বা, যে কর্ম্ম সৎফলপ্রসূ, তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। প্রথমোক্ত মতে,—অদ্রোহ, অস্তেয়, দম, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা প্রভৃতি ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু শেষোক্ত মতে, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, হিংসা ও অহিংসা, উভয়ই ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ আপন উপদেশে ও কার্য্যে ঐ দুই মতের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন,—সনাতন-ধর্ম্মে সকলেরই স্থান আছে, অতিঘৃণ্য নরকের কীট হইতে পরম পুরুষ পরাৎপর পর্য্যন্ত সকলেই সনাতন ধর্ম্মের প্রভাবান্তর্ভুক্ত। ফলতঃ, যে কিছুর সাহায্যে লোক-রক্ষা সৃষ্টি-রক্ষা হইতে আত্মরক্ষা অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষ বা আত্মায় আত্মসম্মিলনের পথ প্রশস্ত হয়, তাহাই সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্গত। তাই সনাতন ধর্ম্ম রূপ কল্পপাদপে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকল ফলই স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে।

ধর্ম্ম ও সনাতন-ধর্ম্ম।

পৃথিবীতে নানা ধর্ম্মমত ও নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কোন্ ধর্ম্মমতের অনুসরণ করিয়াছিলেন ও কোন্ ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন, আর কেনই বা সে ধর্ম্মমতকে সনাতন ধর্ম্ম বলি;—তাহার কয়েকটি তথ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা পাইতেছি। তদ্দারা বুঝা যাইবে, ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ-প্রদর্শনেই শ্রীকৃষ্ণ সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধার-কর্ত্তা বলিয়া প্রখ্যাত আছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কারণে।

* পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে, "ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়" প্রসঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

যুগে।" যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটে, সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃত জনের দমনের জন্য তাঁহার (ভগবানের) আবির্ভাব হয়। এই কারণেই অর্থাৎ সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত জনের দমনের জন্যই ভগবানের মর্ত্ত্যে অবতরণ; আর তাহাতেই অধর্ম্মের অভ্যুত্থান রোধ এবং ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। অতএব, ভগবদুক্তিতে তাঁহার দেহ-ধারণের চারিটী কারণ দেখিতে পাই,—(১) ধর্ম্মের গ্লানি, (২) অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, (৩) সাধুদিগের পরিত্রাণ, এবং (৪) দুষ্কৃত জনের দমন। এই কারণ-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটীর সহিত প্রত্যেকটী সম্বন্ধযুক্ত। অধর্ম্মের অভ্যুদয় নিবারণ হইলেই ধর্ম্মের গ্লানি দূর হইতে পারে, আবার তাহাতেই দুষ্কৃতের বিনাশ এবং সাধু-দিগের পরিত্রাণ আপনা-আপনিই সূচিত হইয়া থাকে। অধর্ম্মের অভ্যুত্থান-নিবারণেই দুষ্কৃতের দমন, আর ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণে অর্থাৎ ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠায় সাধুগণের পরিত্রাণ। এখন দেখা যাউক, গ্লানি হইতেছিল—সে কোন্ ধর্ম্মের? যাহার অভ্যুত্থান হইতেছিল—তাহাই বা কোন্ অধর্ম্ম? আরও দেখা যাউক, যে দুষ্কৃতের তিনি দমন করিয়া গিয়াছেন—সেই বা কিরূপ দুষ্কৃত? আরও, যে সাধুগণের তিনি পরিত্রাণ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারাই বা কি প্রকার সাধু ছিলেন? এই সকল তথ্য নিষ্কাষণ করিতে পারিলে, সনাতন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সম্যক্রূপে উপলব্ধি হইবে। আমরা এক্ষণে একে একে ঐ চারিটি বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি। তাহাতে বক্তব্য বিষয় বেশ বোধ-গম্য হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রথম দেখা যাউক,—শ্রীকৃষ্ণ কোন্ ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য, কোন্ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠারক্ষা-কল্পে, অবতীর্ণ হন? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অস্থি-মজ্জায় দেখিতে পাই, সে

কোন্ ধর্ম্মের গ্লানি দূর জন্য আবির্ভূত হন?

ধর্ম্ম—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। তিনি বলিয়াছেন,—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্মবিভাগশঃ।" চতুর্ব্বর্ণ তাঁহারই সৃষ্টি, অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের তিনিই প্রবর্ত্তক। শারীরিক তপস্যার সংজ্ঞায়ও তিনি বলিয়াছেন,—'দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা, প্রভৃতি শারীরিক তপস্যা বলিয়া উক্ত হয়।' (দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্। ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥)। এখানেও বুঝা গেল, ব্রাহ্মণাদির পূজায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরই প্রাধান্য কীর্ত্তন করিলেন। তার পর ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কর্ম্ম-বিভাগে এবং সে কর্ম্মানুসারেই তাঁহারা যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাহা বলিয়াও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরই মাহাত্ম্য দেখাইলেন। যথা,—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ। কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম॥
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্। দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্মস্বভাবজম॥
কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্। পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥"
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"

পূর্ব্বে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন,—তিনি গুণকর্ম্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন

আবার তিনি সেই চতুর্ব্বর্ণের গুণকর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতেছেন, এই গুণকর্ম্ম তাঁহাদের স্বভাবজঃ অর্থাৎ জন্মানুসারেই এই গুণকর্ম্ম তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। চতুর্ব্বর্ণের সেই গুণকর্ম্ম কি, শ্লোক-কয়েকটীতে তাহারই পরিচয় আছে। যথা,—ব্রাহ্মণের স্বভাববিহিত কর্ম্ম—শম অর্থাৎ মনঃসংযম, দম অর্থাৎ বাহেন্দ্রিয় সংযম, তপস্যা, * শৌচ অর্থাৎ বহির্বস্তুর শুদ্ধি, ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা, আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা, জ্ঞান অর্থাৎ বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রার্থবোধ, বিজ্ঞান অর্থাৎ মানসিক প্রত্যক্ষ, আস্তিক্য অর্থাৎ ভগবদ্বিশ্বাস। এই সকল হইল—ব্রাহ্মণের স্বভাবজঃ গুণ বা কর্ম্ম বা পরিচয়-চিহ্ন। তার পর ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম; যথা—শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না করা, ঔদার্য্য, শাসন-ক্ষমতা প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম। বৈশ্যের কর্ম্ম; যথা—কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য প্রভৃতি বৈশ্যদিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম। আর শূদ্রদিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম;—পরিচর্য্যাত্মক। 'স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠার দ্বারাই মানুষ সিদ্ধি লাভ করে। অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তির মূল এবং সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন; সুতরাং স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারাই মানবগণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।' এইখানে নানা আপত্তির কথা উঠিয়া থাকে। যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিরোধী, তাঁহারা বলেন,—'ঐ সকল গুণকর্ম্মের বিচার করিয়া দেখিলে ব্রাহ্মণাদি কোনও বর্ণেরই অস্তিত্ব থাকে না; কারণ, ঐ সকল গুণ এখন কোনও বর্ণেই নাই।' এই সন্দেহ নিরসনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়া গিয়াছেন, স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি! তিনি বলিয়াছেন,—'যাঁহার যাহা ধর্ম্ম, তাহা যদি তিনি সম্যক্‌রূপে পালন করিতে না পারেন, তাহাতেও দোষ নাই; বিকৃত অবস্থায় প্রাপ্ত অর্থাৎ বিকৃতভাবে অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত থাকিয়া মরণ শ্রেয়ঃ; তথাপি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে নাই। স্বভাববশে অর্থাৎ জন্মানুসারে মানুষ যে ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, তাহা দোষযুক্ত হইলেও তাহা কখনই পরিত্যাজ্য নহে। কর্ম্মমাত্রই দোষযুক্ত; অগ্নিমাত্রেই ধূম আছে;—এই মনে করিয়া, দোষভাগ পরিত্যাগে সার-ভাগ-গ্রহণে (ধূমত্যাগে অগ্নি-গ্রহণের ন্যায়) মানুষ স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ থাকিয়া সিদ্ধির পথে অগ্রসর হউক।' । এই সকল বিবেচনা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার পক্ষে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হয়। তার পর, তিনি যখন অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ উৎসাহিত করিয়া বলিতেছেন,—"তুমি ক্ষত্রিয়; তোমার অন্য ধর্ম্ম নাই, যুদ্ধই তোমার শ্রেয়ঃ ধর্ম্ম"; তখন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার ও তাহার উপযোগিতার বিষয়ই দৃঢ়তার সহিত উপদেশ দেওয়া হইতেছে—বুঝা যায় না কি? এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি সর্ব্বথা স্মরণীয়।

* তপস্যা—কায়িক বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ; সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদেও ত্রিবিধ। শারীরিক তপস্যার পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে; ঐ শারীরিক তপস্যা ও অন্যান্য তপস্যার বিষয় গীতার ১৭শ অধ্যায়ে ১৩শ হইতে ১৯শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

† এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি;—"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম॥ সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥" এই সকল উক্তি পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত হইলেও পুনরুক্তি দোষ ঘটে না। কেন-না, এ সকল উক্তি সৎসংশ্রবযুক্ত।

"স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি। ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্। সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥
অথচেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি। ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়ম্। সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে॥
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ। যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ। নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥
হতোবা প্রপ্স্যাসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥"

ক্ষত্রিয়ের এই যে ধর্ম্ম—যুদ্ধ, লাভালাভ জয়-পরাজয় জ্ঞান না করিয়া ক্ষত্রিয় এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক; তাহাতে মরণ হইলেও তাহার মোক্ষ আছে। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাহাই বুঝাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থ উৎসাহ দিলেন। তবে এইখানে একটী কথা বুঝিবার আবশ্যক আছে যে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যে যুদ্ধ, সে যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ; সে যুদ্ধ—রাজদ্রোহ বা উচ্ছৃঙ্খলা নহে।* ফলতঃ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে কি, সে ধর্ম্ম কার্য্যতঃ কেমন করিয়া পালন করিতে হয়,—শ্রীকৃষ্ণ তাহা তন্ন তন্ন করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার বিষয়ে তাঁহার উপদেশ-পরম্পরা যাঁহার বোধগম্য হইবে, তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন,—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার উদ্দেশেই যেন তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা হইলেই সৃষ্টি-রক্ষা সমাজ-রক্ষা আত্ম-রক্ষা সব দিক রক্ষা হইবে,—এই উপদেশই যেন তাঁহার বাক্যের ও কার্য্যের মধ্যে জীবন্ত পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার ধর্ম্ম-সংস্থাপন উদ্দেশ্যে যে আবির্ভাব, তাহা সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সংস্থাপন বলিয়াই প্রধানতঃ মনে হয়। শান্তি সংস্থাপিত হইলে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষা পাইলে, আত্মরক্ষা বা আত্মোৎকর্ষের পথ আপনিই সুগম হইয়া আসে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম। বেশ বুঝা যায়, সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিতেই তিনি আবির্ভূত হন।

এইবার দেখা প্রয়োজন, শ্রীকৃষ্ণ কোন্ অধর্ম্মের অভ্যুত্থান নিবারণ করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? সেই সঙ্গে বুঝা যাইবে, দুষ্কৃত জনই বা কেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, আর কিরূপেই বা তাহারা বিধ্বস্ত হইয়া আসিল? সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনিই পরিস্ফুট হইয়া আসিবে,—সাধুগণই বা পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন কি প্রকারে? শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে পূর্ব্বে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, প্রকারান্তরে তাহারই মধ্যে এ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। কংস, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন, কালযবন, শিশুপাল প্রভৃতি অত্যাচারী নৃপতিবর্গের ক্রিয়াকলাপেই অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখিতে পাই। তাঁহারা এবং তাঁহাদের পার্শ্বচরগণ দুষ্কৃতজন ভিন্ন আর কোন্ সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে পারেন? সেই দুষ্কৃতজনের দমনে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান নিবারিত হইয়াছিল; আর যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধর্ম্মপর নৃপতির প্রতিষ্ঠায় সাধু সজ্জন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কারণ-

অধর্ম্ম বারণ ও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা।

* অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সে যুদ্ধ—ধর্ম্মযুদ্ধ। এই খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে ২১১শ-২১২শ পৃষ্ঠায় "শান্তি-লাভে রাজভক্তি" প্রসঙ্গে তদ্বিবরণ অনুধাবন করিয়া দেখুন।

পরম্পরা স্মরণ করিলে, আর কি কারণে কুরুপক্ষে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল, তাহা অনুধাবন করিলে, সকল কথারই সদুত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধিক উদাহরণের আবশ্যক নাই। যে কারণে দূরদর্শী ধৃতরাষ্ট্র কুরুপক্ষের পরাজয় প্রজ্ঞাচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই কারণগুলির বিষয় চিন্তা করিলেই মূলতত্ত্ব বোধগম্য হইতে পারে। * যদি সেই দুষ্কৃত জন তখন ধরণীর অঙ্ক হইতে অপসৃত না হইত, তাহা হইলে ধর্ম্ম লোপ পাইত; আর যদি যুধিষ্ঠিরাদি সাধুসজ্জন সুপ্রতিষ্ঠিত না হইতেন, তাহা হইলেও সর্ব্বনাশ ঘটিত। পরীক্ষিতের কলি-নিগ্রহ ব্যপদেশে এই বিষয়টী বেশ বুঝিতে পারা যায়। কলির আগমনের পূর্ব্বে বৃষরূপী ধর্ম্মের সহিত গাভীরূপধারিণী ধরিত্রীর যে কথোপকথন হয়, তাহাতেই ঐ তত্ত্ব বিশদীকৃত। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে যখন কলির কুটিল-দৃষ্টি সংসারের প্রতি নিপতিত হইয়াছিল, সেই সময় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পৃথিবী কয়েকটী বিষয় ধর্ম্মকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে সমাজের কি শৃঙ্খলা সাধিত হইয়াছিল, ধর্ম্মের অঙ্গ সকল কিরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছিল, গাভীরূপিণী পৃথিবীর সেই উক্তিতে তাহা জানিতে পারি। পৃথিবী বলিয়াছিলেন,—"সে সময়ে (শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হওয়ায়) ধর্ম্ম চারিপদ হইয়া লোকের সুখ-ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। সত্য, শৌচ, দয়া দান, ক্ষমা, সন্তোষ, সরলতা, শম, ইন্দ্রিয়-দমন, স্বধর্ম্ম-প্রতিপালন, তপস্যা, সমদৃষ্টিতা, তিতিক্ষা, লাভে উপেক্ষা, শাস্ত্রচর্চ্চা, আত্মজ্ঞান বৈরাগ্য, আত্মদমন, ধীরতা, ইন্দ্রিয়-বল, বল, কর্ত্তব্যবিবেচনা, স্বাধীনতা, কার্য্যনৈপুণ্য, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, মৃদুচিত্ততা, বুদ্ধি, প্রতিভা, বিনয়, সংস্বভাব, মনের পটুতা, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্ষিপ্রকারিতা, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, পূজ্যতা, নিরহঙ্কারতা, ব্রাহ্মণদিগের হিতৈষিতা, শরণত্ব প্রভৃতি মহত্ত্বাভিলাষী সাধুদিগের বাঞ্ছিত গুণসমূহ জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল গুণে গুণবান ছিলেন; সুতরাং সংসারেও ঐ সকল গুণ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।" তার পর প্রকাশ,—পাপভারে যখন ধরণী ভারাক্রান্ত হন, শ্রীকৃষ্ণ সে ভার লাঘব করিয়াছিলেন। † শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রভাবের ফলেই পরীক্ষিৎ যে কলি নিগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। কলি আশ্রয়প্রার্থী হইলে, পরীক্ষিৎ কলির জন্য কয়েকটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তিনি কলিকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—"যেখানে দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, স্ত্রী ও প্রাণী হত্যা হয়, সেই স্থান তোমার বসতিযোগ্য নির্দ্দিষ্ট রহিল।" কলি তখন আরও কয়েকটী স্থান প্রার্থনা করেন। তাহাতে রাজা পরীক্ষিৎ কলির বাসের জন্য আরও পঞ্চস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সে পঞ্চস্থান—মিথ্যা, গর্ব্ব, কাম, হিংসা ও বৈর। শ্রীকৃষ্ণের ইহলোক পরিত্যাগের পরও পাপের পথ রুদ্ধ রাখিবার জন্য এবং সনাতন ধর্ম্মের সাধন-পথ সুগম করিবার পক্ষে কঠোর-কঠিন বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল;—এই সকল উক্তিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। মনে হয়, সেই অনুশাসনেরই ফলে আজিও হিন্দুজাতি জীবিত রহিয়াছে, আজিও তাহার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম একেবারে লোপ পায় নাই। উপদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আপন কার্য্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-রক্ষার চেষ্টা পাইয়াছিলেন,

* ধৃতরাষ্ট্রের নৈরাশ্যব্যঞ্জক উক্তি "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম খণ্ডে মহাভারত প্রসঙ্গে ২৪৮ম—২৫৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† শ্রীমদ্ভাগবত, প্রথম স্কন্দ, ১৭শ অধ্যায়; পরীক্ষিৎ ও ধর্ম্মের কথোপকথন দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান আছে। গোপগণের মধ্যে যখন ইন্দ্র-পূজার প্রবর্ত্তনা পক্ষে চেষ্টা হইয়াছিল, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে তাঁহাদের স্বাভাবিক অর্থাৎ পিতৃপিতামহ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—'স্বভাবস্থ স্বকর্ম্মকারী জীব কর্ম্মেরই পূজা করিবে। যথার্থ যাহার দ্বারা জীবিত থাকা যায়, সেই ইহার দেবতা। ব্রাহ্মণ—বেদাধ্যাপন, ক্ষত্রিয়—পৃথিবী শাসন, বৈশ্য—বার্ত্তা এবং শূদ্র—ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। বার্ত্তা চারি প্রকার,—কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন ও কুসীদ। তন্মধ্যে আমরা গোপালন করিয়া থাকি; আমরা বনবাসী, অতএব গোগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং পর্ব্বত এই সকলের উদ্দেশেই আমাদের যজ্ঞ করা উচিত।" এইরূপে যে প্রকার যজ্ঞ ক্রিয়া গোপজাতির অবলম্বনীয়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে তাহারই অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন। অন্যদিকে আবার শ্রীকৃষ্ণের নিজের এবং যুধিষ্ঠিরাদির যজ্ঞ কর্ম্ম কি ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাও স্মরণ করিয়া দেখুন। তদ্দ্বারা, বিভিন্ন স্তরের জন্য কি কর্ম্ম বিহিত ছিল, তাহা বুঝা যাইতে পারে। তাঁহার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার এক প্রধান নিদর্শন—তাঁহার ব্রাহ্মণ ভক্তি। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—"এই ভূমণ্ডল মধ্যে ব্রাহ্মণগণই আমার সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চনীয়, ব্রাহ্মণদিগের নিকট সর্ব্বদা প্রণতভাবে থাকিলে, তাঁহারা অনায়াসে প্রসন্ন হইয়া সেই প্রণত ভক্তদিগের মঙ্গল সাধন করিবেন।" * কেবল মুখের উপদেশে নয়, শ্রীকৃষ্ণ কার্য্যেও ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। রাজসূয় প্রকরণে তিনি কোন্ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন! মহাভারতে চির-বিঘোষিত রহিয়াছে,—"চরণক্ষালনে কৃষ্ণো ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং হ্যভূৎ। সর্ব্বলোক সমাবৃত্তঃ পিপ্রীষুঃ ফলমুত্তমম্॥" অর্থাৎ—কৃষ্ণ সর্ব্বলোকে বর্ত্তনাধার হইয়াও উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি বাসনায় ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালনে স্বয়ং নিযুক্ত রহিলেন। ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া বিষ্ণু যে ভাবে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের জীবনে ও কার্য্যে তাহারই প্রতিচিত্র দেখিতে পাই। † তিনি ব্রাহ্মণগণকে ভূদেব (ভূমিচরা দেবাঃ) বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তখনও ভূদেবোচিত গুণসম্পন্ন। সুতরাং সকলেরই পূজার্হ ছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

---

* মহাভারত, শান্তি পর্ব্বে, ৩৯শ অধ্যায়ে; যথা,—"বাসুদেব উবাচ। ব্রাহ্মণাস্তাত লোকেঽস্মিন্নর্চনীয়াঃ সদা মম। এতে ভূমিচরা দেবা বাগ্বিষাঃ সুপ্রসাদকাঃ॥"

† ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর—তিনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ঋষিগণের প্রশ্ন-মীমাংসার জন্য মহর্ষি ভৃগু ঐ তিন দেবতার নিকট গমন করেন। কিন্তু তিনি অভিবাদন না করায় ব্রহ্মা ও মহেশ্বর কুপিত হন। ক্ষমা-প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিয়া, তিনি বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। বিষ্ণু তখন নিদ্রিত ছিলেন। ঋষি তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া, তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিলেন। পদাঘাতে জাগরিত হইয়া, রোষ প্রকাশ দূরে থাকুক, বিষ্ণু ঋষির নিকট কতই অপরাধী হইয়াছেন, এই ভাব প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে পদাঘাত করায় ঋষির চরণে আঘাত লাগিয়াছে মনে তিনি করিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। মহেশ্বর ও ব্রহ্মাকে অভিবাদন না করায় তাঁহারা রুষ্ট হইয়াছিলেন; আর বক্ষে পদাঘাত সত্ত্বেও ঋষির নিকট বিষ্ণু অবনত হইলেন। ইহাতে ঋষি বিষ্ণুকেই প্রধান বলিয়া স্থির করিলেন। বিষ্ণুও গৌরবজনক চিহ্ন মনে করিয়া ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিলেন।

ব্রাহ্মণগণই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ভিত্তি-ভূমি। ভিত্তি-ভূমি দৃঢ় থাকিলে সৌধ অচঞ্চল থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীকৃষ্ণ তাই সকল কাজেই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সৌধের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া গিয়াছিলেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার দ্বারাই তাঁহার ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়াছিল।

* * *

১০। শ্রীকৃষ্ণ—পরম ত্যাগী; কেন-না, তিনি সকল ত্যাগের সারভূত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

[ত্যাগ ও তাহার স্বরূপ,—কর্ম্মফলত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ;—ত্যাগ কামনা-জয়,—কামনাজয়ী ব্যক্তিই যোগী বা মুক্ত পুরুষ;—শ্রীকৃষ্ণে ত্যাগের আদর্শ,—তাঁহার ত্যাগ-শিক্ষার ফলে ব্রজবাসিগণের প্রাণে প্রেমের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি।]

ত্যাগ শব্দের অর্থ—দান, বর্জ্জন। সে দান সে বর্জ্জন—কি প্রকার? শ্রীকৃষ্ণ সেইটুকুই বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন; আর সেইটুকুই বিশেষ ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। ত্যাগের স্বরূপ নির্দ্দেশে তিনি বলিয়াছেন,—'সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণা।' অর্থাৎ, যে কোনও কর্ম্ম করিবে, তাহার ফলকামনা ত্যাগ করিবে, ইহাই হইল প্রকৃত ত্যাগ। স্থতরাং ত্যাগী সেই জন—যে জন সর্ব্বকর্ম্ম ফল ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন;—'যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।' মানুষ সংসারে যে কোনও কর্ম্ম করে, তাহার সকল কাজেই একটা-না-একটা ফলকামনা থাকে। ইহাই স্বভাবিক। কিন্তু যে মানুষ ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিতে পারে, তাহারই কর্ম্ম সার্থক—জীবন সার্থক। শ্রীকৃষ্ণ নিজের জীবনে যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলই কর্ম্মফলত্যাগ-শিক্ষা-মূলক। মানুষ যজ্ঞাদি দৈবকার্য্য সাধন করে; মনে কামনা থাকে—স্বর্গলাভ সুখলাভ। শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা দিলেন,—'যজ্ঞ কর, তপস্যা কর, দৈবকর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না; কিন্তু পরিত্যাগ কর—ফলের আকাঙ্ক্ষা।' তার পর তিনি স্থির করিয়া দিলেন—'কোন্ কর্ম্ম করণীয় এবং কোন্ কর্ম্ম ত্যাজ্য।' বুঝাইলেন,—'যে কর্ম্ম পরিত্যাজ্য, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে; যে স্মক করণীয়, তাহা করিতে হইবে।' অর্থাৎ,—কতকগুলি কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল; অথচ, তাহার ফলের আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জনীয় রহিল। আর কতকগুলি কর্ম্ম একেবারেই পরিবর্জ্জনীয় বলিয়া স্থির হইল। ফলে সকল শিক্ষার সার শিক্ষা হইল—কর্ম্মফলত্যাগ শিক্ষা। কেন-না, এই শিক্ষার উপরই নিষ্কাম ভাবে জগতের হিতসাধন নির্ভর করিতেছে; এই শিক্ষার উপরই সমদর্শন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যে সমদর্শন বা আত্মজ্ঞান মোক্ষেরই নামান্তর, কর্ম্মের দ্বারাই তাহা লাভ হয়; শ্রীকৃষ্ণ সেই শিক্ষাই যেন দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া গেলেন। মোক্ষের পথ বড় দুর্গম ছিল না কি—যখন শাস্ত্রবাক্যে বিঘোষিত হইত—'জ্ঞানান্মুক্তি!' জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, তদ্দ্বারা জ্ঞানী হইতে হইবে, তার পর মুক্তি পাইবে! পথ কত

ত্যাগ ও তাহার স্বরূপ।

দুর্গম, সামান্য চিন্তা করিলেই অনুভূত হইতে পারে। পথ আরও দুর্গম!—শাস্ত্র যখন বলিলেন,—'যোগ অভ্যাস কর, যোগী হও; তবে কৈবল্য লাভ করিবে!' কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দেখাইলেন,—পথ কত সরল, কত সুগম! তিনি বলিলেন,—'সত্য, সরলতা, অহিংসা প্রভৃতি মানুষের গুটিকতক কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই কর্ম্ম-কয়েকটী সম্পন্ন করিলেই মোক্ষ তোমার অধিগত হইবে।' কর্ম্মময় জীবন, কর্ম্ম ত্যাগ অসম্ভব। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিলেন না। যাহা অসম্ভব—দেহধারী জীবের পক্ষে যাহা অসম্ভব, তাহা তিনি করিতে বলিবেন কেন? সুতরাং তিনি কর্ম্মই করিতে বলিলেন, আর সেই কর্ম্মগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পথ কতই সুগম হইয়া আসিল! শেষে বুঝাইলেন—ঐ কর্ম্মের উপর একটু ত্যাগ প্রয়োজন, অর্থাৎ ঐ কর্ম্মের ফলে যেন আকাঙ্ক্ষা না থাকে। কেন-না, কর্ম্ম মাত্রেরই ফল আছে, ভোগ আছে। পাছে ফলের দরুণ—ভোগের কারণ—জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন হইতে হয়, তাই উপদেশ দিলেন—"কর্ম্মফল ত্যাগ কর।" এই ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। এই ত্যাগের ন্যায় মোক্ষলাভের পক্ষে সরল পথ আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই আবির্ভূত হইয়াছেন, সেখানেই ত্যাগের মাহাত্ম্য-তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। গীতায়, ভাগবতে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে—সর্ব্বত্রই এই ত্যাগ তত্ত্ব বিবৃত দেখি

ত্যাগ
কামনা জয়।

কামনাই ত্যাগের প্রধান প্রতিবন্ধক। সুতরাং কেমন করিয়া এই কামনার কবল হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ত্যাগ শিক্ষার পক্ষে সেই শিক্ষাই প্রধান আবশ্যক। যুধিষ্ঠিরের সকল শিক্ষা শেষ হইলে, যুদ্ধ-জয় ও রাজ্য-লাভের পর ভীষ্মদেবের নিকট যুধিষ্ঠির মহান্ উপদেশ প্রাপ্ত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ কামনা ত্যাগ বিষয়ে তাঁহাকে শেষ উপদেশ প্রদান করেন। ভীষ্ম প্রভৃতি আত্মীয়-অন্তরঙ্গ জনের শোকে অধীর হইয়া যুধিষ্ঠির রাজ্য-ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে উপদেশ প্রদান করেন, সেই উপদেশ—সকল উপদেশের সার উপদেশ। যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ-ছলে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—"হে ভারত! বাহ্য দ্রব্য রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিলে, সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ হয় না, শারীর-দ্রব্য কামাদি ত্যাগ করিলেই মোক্ষ হইয়া থাকে; পরন্তু শুষ্ক বৈরাগ্যযুক্ত বিবেকবিহীন মানবের মোক্ষ বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই। বাহ্য দ্রব্য রাজ্যাদি বিযুক্ত এবং শারীর দ্রব্য কামাদিতে সংযুক্ত পুরুষের যে সুখ, শত্রুদিগের তাহাই হউক। সংসার বিষয়ে 'মম'তারূপ দ্ব্যক্ষর মৃত্যু বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সংসার বিষয়ে 'নির্ম্মম'তারূপ ত্র্যক্ষর শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। রাজন্! সেই ব্রহ্ম এবং মৃত্যু উভয়েই অদৃশ্যরূপে মনুষ্যচিত্ত মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া প্রাণিগণকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। হে ভারত! যদি এই জগতের অবিনাশ নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে কেহ কোনও প্রাণীর শরীর ভেদ করিলে তাহাকে হিংসাজন্য পাপ ভোগ করিতে হয় না। হে পৃথাতনয়! যদি কেহ স্থাবর ও জঙ্গম সহ সমুদায় পৃথিবী লাভ করিয়া তাহাতে মমতা না করেন, তাহা হইলে সেই পৃথিবী তাঁহার পক্ষে ফলদায়িনী হয় না। আর যিনি বনবাসী হইয়া বন্য ফলমূল দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ

করতঃ বাহ্যবস্তু রাজ্যাদিতে মমতা করেন, তিনি মৃত্যুমুখ মধ্যে বাস করিয়া থাকেন। হে ভারত! আপনি ধ্যানযোগে বাহ্য এবং অন্তর শক্রুরাজ্য ও কামাদির মায়াময়ত্বরূপ স্বভাব অবলোকন করুন; যিনি সেই অনাদি মায়াময় স্বভাবকে বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন, তিনিই মহাভয়ঙ্কর সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। লোকে কামনাবান্ ব্যক্তিকে প্রশংসা করে না এবং ইহলোকে কামনা সকল মনের অঙ্গভূত বলিয়া কামনা ব্যতিরেকে কোনও বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব যোগবিৎ পণ্ডিতেরা পুনঃপুনঃ জন্মের অভ্যাসযোগ বশতঃ শুদ্ধচিত্ত হইয়া সতত উৎকৃষ্ট মোক্ষমার্গ ধ্যান করতঃ কামনা সকলকে সংহার করিয়া থাকেন। যে মানব 'ইনি যাহা যাহা কামনা করেন, তাহা ধর্ম্ম নহে' ইহা বিশেষরূপে বিদিত হইয়া কামনা পূর্ব্বক ব্রত, যজ্ঞ, নিয়ম এবং ধ্যানযোগ সকলের অনুষ্ঠান না করেন, তিনি কামনা-নিগ্রহকেই ধর্ম্ম এবং মোক্ষমূল বলিয়া বোধ করেন। পরন্তু যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে কামের তুরুচ্ছেদ্যত্ববাদী পুরাবিৎ পণ্ডিত-গণ কামগীতবহুল গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি আপনার নিকট সেই গাথা-সকল সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। কাম কহেন,—নির্ম্মমত্ব ও যোগাভ্যাস রূপ উপায় ব্যতিরেকে কোনও প্রাণীই আমাকে জয় করিতে সমর্থ হয় না; যে কামনাবান্ মানব মনোমধ্যে আমার বল বিদিত হইয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়-সাধ্য জপাদিরূপ শস্ত্র দ্বারা আমাকে নিহত করিতে প্রযত্নবান্ হয়, আমি তাহার চিত্ত-মধ্যে 'আমিই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট ও জপকর্ত্তা' এতাদৃশ অভিমানরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার জপাদি সকল বিফল করিয়া থাকি। পুরুষ বিবিধ-দক্ষিণাসমন্বিত যজ্ঞ দ্বারা আমাকে নিগ্রহ করিতে প্রযত্নবান্ হয়, উত্তম যোনিসম্ভূত ধর্ম্মাত্মা মানবের ন্যায় আমি তাহার চিত্ত-মধ্যে দম্ভাদিরূপে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি বেদ ও বেদাঙ্গ সাধন-দ্বারা আমাকে বিনষ্ট করিতে প্রযত্নবান্ হয়, স্থাবরযোনিতে অনভিব্যক্তরূপে আবির্ভূত জীবের ন্যায় আমি তাহার চিত্ত-মধ্যে আবির্ভূত হইয়া থাকি। যে সত্যপরাক্রম মানব ধৈর্য্য দ্বারা আমাকে জয় করিতে প্রযত্নবান্ হয়, আমি তাহার চিত্তরূপে আবির্ভূত হই, সে আমাকে জানিতে পারে না। যে সংশ্রিতব্রত মানব তপস্যা দ্বারা আমাকে জয় করিতে প্রযত্নবান্ হয়, আমি তাহার চিত্তমধ্যে তপোরূপে আবির্ভূত হই; সুতরাং সে আমাকে বোধ করিতে পারে না। যে পণ্ডিতপুরুষ নিত্যমুক্ত আত্মাকে না জানিয়া মোক্ষার্থ মোক্ষমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক আমাকে নিষ্কৃত করিতে প্রযত্নবান্ হয়, সর্ব্বভূতের অবধ্য সনাতন অদ্বিতীয় আমি সেই মোক্ষ-রতিস্থ অজ্ঞ-পুরুষকে উপহাস করতঃ তাহার নিকট নৃত্য করিয়া থাকি।" কামনা বলিয়াছে,—কামনা অবধ্য ও সনাতন। অথচ, সে তাহার নাশের উপায়ও বলিয়া দিয়াছে। সে বলিয়াছে,—'আমি অবধ্য ও সনাতন সত্য। কিন্তু নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাস দ্বারা আমার পরাজয় ও মৃত্যু ঘটিতে পারে।' কামনার মৃত্যুবাণ তাহার মুখে যে ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারি, সে বাণ—ত্যাগ। কামনার প্রতি মমতাশূন্য হইতে পারিলে, অর্থাৎ তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিলে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। কর্ম্মফল-ত্যাগই—কামনার প্রতি মমতাশূন্যত্ব। কর্ম্মফল-ত্যাগই—কামনাকে ত্যাগ। কিন্তু সেই

কর্ম্মফলত্যাগ—বড় সুসাধ্য নহে, তাই তাহা যোগাভ্যাস যোগ-সাধনা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সে কি তাঁহার কম যোগ-সাধনা—যিনি কর্ম্ম করিয়া ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন! অতএব যিনি ত্যাগী, তিনিই যোগী, তিনিই মুক্ত পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণে এই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। ত্যাগ কি, তিনি যেমন তাহার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন; তেমন আর কোথাও দেখি না। শ্রীকৃষ্ণের জীবন বৃত্ত—

শ্রীকৃষ্ণে ত্যাগের আদর্শ।

ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ পর্য্যন্ত আমরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে এই ত্যাগ তত্ত্বই পূর্ণ প্রকটিত দেখি। পুনঃপুনঃ এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে। উপসংহারে আরও দুই একটী দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেছি। শৈশবে পিতৃমাতৃ ত্যাগ, কৈশোরে সখা-সখীগণকে পরিত্যাগ, যৌবনে রাজৈশ্বর্য্যে স্পৃহা-ত্যাগ, প্রৌঢ়ে পুত্র-পৌত্রগণের মমতা-ত্যাগ, বার্দ্ধক্যে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ। কোথাও কামনা নাই; ব্রত—শুধুই জগতের হিতসাধন। কেহ হয় তো বলিতে পারেন,—'যিনি ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার লৌকিক ত্যাগের প্রয়োজন কি ছিল? জন্মের পরেই অথবা জন্মের পূর্ব্বেই তিনি ইচ্ছামাত্র কংসকে ধ্বংস করিতে পারিতেন। সুতরাং পিতা মাতা পরিত্যাগ করিয়া নন্দালয়ে গমনের কোনই কারণ ছিল না। এ ত্যাগ না দেখাইলেও চলিত। ব্রজবাসিগণকে পরিত্যাগে তাহাদের প্রাণে ব্যথা দেওয়াও ত্যাগের আদর্শ নহে।' এইরূপ তাঁহার জীবনের সকল ত্যাগ সম্বন্ধেই বিতর্ক উঠিতে পারে ও উঠিয়া থাকে। কিন্তু কেন এ সকল দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। যদি ভগবান-রূপে অনৈসর্গিক কার্য্যে কংসাদি বধ ব্যাপার সম্পাদন করিতেন, তাহা হইলে মানুষের শিক্ষার বিষয় কিছুই থাকিত না। কিন্তু তাঁহার অবতার-গ্রহণের উদ্দেশ্য—মানুষকে পরিত্রাণ করা। মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া, মানুষের ন্যায় সীমাবদ্ধ শক্তি-সামর্থ্য লইয়া, মানুষ কিরূপে অমানুষিক শক্তি প্রদর্শন করিতে পারে, তাহা শিক্ষা দেওয়াই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি মানুষভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষিক শক্তির দ্বারা অমানুষিক কার্য্য দেখাইবার পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কেবল অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া মানুষ হতাশের তপ্তশ্বাসে বক্ষঃস্থল বিদগ্ধ না করে; আপনার কর্ম্মের দ্বারা, আপনার চেষ্টার দ্বারা, আপনার উদ্যম অধ্যবসায় দ্বারা, পরাগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়,—এই উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা দানের জন্য, শ্রীকৃষ্ণ মানুষী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মানুষী ভাবে মানুষী পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন! তাঁহার ত্যাগকার্য্য সংসারকে উৎকৃষ্ট শিক্ষাই প্রদান করিয়া গিয়াছে। বোধ হয় একটী দৃষ্টান্তে এই বিষয়টী বোধগম্য হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে ব্রজবাসিগণের প্রাণে দাস্য-সখ্য-প্রেম প্রভৃতির পীযূষ-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে যখন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তাঁহাদের প্রাণ তখন কৃষ্ণ-প্রেমে পরিমগ্ন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন; কিন্তু ব্রজবাসিগণ তখনও দেখিতেছেন—ব্রজধাম কৃষ্ণময়। একটী কবির গানে এই ভাবটী কেমন সুন্দর পরিস্ফুট দেখি। শ্রীকৃষ্ণ নাই;

কিন্তু শ্রীরাধা দেখিতেছেন—ব্রজধাম কৃষ্ণময়। অনিলে, অনলে, সলিলে—সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান। যমুনার স্বচ্ছ নীল জলের প্রতি চাহিয়া শ্রীমতী শ্রীরাধিকা কহিতেছেন,—

"কাল জলে কি গো সখি।
অপরূপ রূপ দেখি দেখ সই নিরখি।
বঁধুর অবয়ব সব ভাব ভঙ্গ প্রায়
মায়া কোরে ছায়ারূপে সে কালা এসেছে কি॥
আচম্বিতে আলো কেন যমুনারি জল,
মনে সাধ, ভুলে থাকি, কে করে কি ছল।
তবে কি ছায়া নাগর লেগে হোলো বা এমন,
স্থিতে দেখিতে আমার, জুড়ালো দুটি আঁখি॥
নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে।
ওগো ললিতে।
না দেখি এমন রূপ বারি মাঝেতে॥
আজু সখি একি রূপ নিরখিলাম হায়।
নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়।
ঢেউ দিও না কেউ এ জলে—বলে কিশোরী,
দরশনে বাধা দিলে হইবে সই পাতকী॥
বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই তো নই,
ওগো প্রাণ সই।
নিরখি নির্ম্মল জলে, অনিমিষে রই॥
কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে।
শশী কি ডুবিল জলে রাহুর ভয়ে
আবার ভাবি সে যে শশী কুমুদবান্ধব,
হৃদয়কমল কেন, তা দেখে হবে সুখী॥"

প্রেমের প্রগাঢ়তা জন্মিলে এমনই ভাবে প্রেমাস্পদকে সর্ব্বত্র দর্শন ঘটে। প্রেম প্রগাঢ় হইলে, ত্যাগের পর বিচ্ছেদে, সে প্রেম বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়। ব্রজবাসিগণের প্রাণে অধিকতর প্রগাঢ় ভাবে ভগবদ্ভক্তি বদ্ধমূল করিবার উদ্দেশ্যে—তাঁহাদিগকে বিশ্বপ্রেমে প্রেমময় করিবার মহতী কল্পনায়—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন বলিতে পারি। তাঁহার ত্যাগের মাহাত্ম্য—সেইখানেই। তিনি আপন সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির কামনায় ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া আসেন নাই। তাঁহার সে ত্যাগের উদ্দেশ্য ছিল—স্বতন্ত্র, লক্ষ্য ছিল—ব্রজবাসিগণের প্রাণের উৎকর্ষ-সাধন। ব্যষ্টিভাবে তাঁহার প্রতি তাহাদের যে প্রেম, সমষ্টিভাবে সর্ব্বভূতে সে প্রেম বিস্তৃত হইয়া পড়ুক;—তাঁহার ত্যাগের তাহাই উদ্দেশ্য। সেই ত্যাগই তো ত্যাগ!—যে ত্যাগে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি নাই; অথচ, যে ত্যাগের লক্ষ্য—জনহিত-সাধন। শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতেও এই ভাব প্রকাশ দেখি। সখীগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন,—"হে সখীগণ! যাঁহারা স্বার্থ-সাধন করিতে সচেষ্ট, তাঁহারাই পরস্পর ভজনা করিয়া থাকেন। তাহাতে ধর্ম্ম বা সৌহার্দ্দ নাই; স্বার্থ তাহার উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু যাঁহারা ভজনা করেন না, যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ভজনা করেন, পিতামাতার ন্যায় তাঁহারা দুই প্রকার,—এক দয়ালু, দ্বিতীয় স্নেহময়। উক্ত ভজনার দ্বারা দয়ালু ব্যক্তিরা নিষ্কৃতি ধর্ম্ম এবং স্নেহময় ব্যক্তিরা সৌহৃদ্য লাভ করিয়া থাকে। এখানে অনিন্দিত-ধর্ম্ম সৌহার্দ্দ দুই আছে। যাঁহারা আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ বা গুরুদ্রোহী, তাঁহারা—যাঁহারা ভজনা না করে, তাহাদের দূরে থাকুক, যাঁহারা ভজনা করেন, তাঁহাদিগকেও ভজনা করেন না। হে সখীগণ! আমি কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভজনা করেন, তাঁহাদিগকেও ভজনা করি না। কেন-না, তাহা হইলে তাঁহারা নিরন্তর আমাকে চিন্তা করিয়া থাকিবেন। যেমন নির্দ্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করিয়া, যদি সেই ধন হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই ধনেরই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অন্য চিন্তা ভুলিয়া যায়; হে অবলা-সকল! এইরূপ তোমরাও আমার নিমিত্ত ধর্ম্মা-

ধর্ম্ম না ভাবিয়া লোক ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়াছ, তোমরা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিবে, এই জন্য আমি অন্তর্হিত হইয়াছিলাম; অথচ, তোমরা না দেখিতে পাও, এইরূপে তোমাদিগকে ভজনা করিয়াছিলাম।" * কামগীতার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যে কথা কহিয়াছিলেন, এখানে তাহারই প্রতিধ্বনি। কর্ম্ম-কোলাহল-মগ্ন সংসারে কর্ম্মের মধ্যে পড়িয়া কাল কাটাইতে হইবে; অথচ, তাহারই মধ্যে দেখাইতে হইবে—ত্যাগের আদর্শ। শ্রীভগবান যে সংসারের মধ্যেই বিজড়িত রহিয়াছেন, সংসারের মধ্যেই যে তাঁহাকে দেখিতে হইবে,—ইহাই সার শিক্ষা। ত্যাগ—সেই শিক্ষারই প্রাণভূত।

* * *

১১। শ্রীকৃষ্ণ—সকল সত্য-তত্ত্বের আদর্শ; কেন-না, তিনিই সত্য-স্বরূপ।

[সত্য ও সত্য-স্বরূপ,—সত্যের লক্ষণ ও আকার প্রভৃতি,—তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব;—চতুর্ব্বিধ তত্ত্বের আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব মানুষের সহজজ্ঞানের আয়ত্তাধীন হয়;—সে চতুর্ব্বিধ তত্ত্ব—(১) সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তা, (২) মনুষ্য ও মনুষ্যত্ব, (৩) মনুষ্যের মঙ্গলসাধনে জগদীশ্বরের প্রযত্ন, (৪) ঈশ্বরের দেহধারণ।]

সত্য কি? সত্য শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই,—সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপস্যা, সত্যই যজ্ঞ, সত্যই শ্রুতি, সত্যই পরম পুরুষ। সত্যের অধিক আর ধর্ম্ম নাই; সত্যের অধিক পুণ্য নাই; সত্যেই সিদ্ধি। সত্যের এক প্রধান লক্ষণ—সত্য চিরবিদ্যমান; সত্য—নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়। যাহা সত্য,—তাহা চিরদিনই সত্য; অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান—সত্য চিরকালই সত্য। যাহা আজ সত্য, কাল তাহা মিথ্যা হইতে পারে না; কাল যাহা সত্য ছিল, তাহা কখনই মিথ্যা হইবে না— চিরদিনই সত্য থাকিবে। এইটীই সত্যের বিশেষ লক্ষণ। এ লক্ষণের ব্যতিক্রম দেখিলে বুঝিবে,—সে তোমার ভ্রান্তি। সংসারের সকল পদার্থই পরিবর্ত্তনশীল; একমাত্র সত্যই অপরিবর্ত্তিত। এই হইল—সত্যের মুখ্য লক্ষণ। সত্যের গৌণ লক্ষণ, যথা,—

সত্য ও সত্যস্বরূপ।

"যথার্থকথনং যচ্চ সর্ব্বলোকসুখপ্রদম্। তৎ সত্যমিতিবিজ্ঞেয়মসত্যম্ তদ্বিপর্য্যয়ম্॥"

লক্ষণ-নির্দ্দেশের পর সত্যের আকার নির্দ্দিষ্ট হয়। শাস্ত্রমতে সত্যের আকার; যথা,—

"সত্যঞ্চ সমতা চৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ। অমাৎসর্য্যং ক্ষমা চৈব হ্রীস্তিতিক্ষা নসূয়তা॥
ত্যাগো ধ্যানমথার্য্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং দয়া। অহিংসা চৈব রাজেন্দ্র সত্যাকারা স্ত্রয়োদশঃ॥"

এই সকল লক্ষণে যিনি লক্ষণান্বিত, এই সকল আকারে যিনি আকরিত, তিনিই সত্য-স্বরূপ। তাই ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান এই বিশেষণে বিশেষিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মই সৎ;—ব্রহ্মই সত্য। শ্রীকৃষ্ণের সেই ব্রহ্মত্ব ও ভগবানত্ব সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই কহিয়া আসিয়াছি। † জ্ঞান-শক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজ প্রভৃতি ভগবানের যে বিভূতির বিষয় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তৎসমুদায়ও এই সত্যেরই লক্ষণান্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণে তাহার কোনটীরই অভাব নাই। দেখাইয়াছি—তিনি

* শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্দ, ৩২শ অধ্যায়ে ১৭শ—২১শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† এই খণ্ডের ১৩৮ম হইতে ১৬১ম পৃষ্ঠায়, বিশেষতঃ ১৫৮ম পৃষ্ঠায়, এ বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অশেষ জ্ঞানী; দেখাইয়াছি—তিনি অশেষ কর্ম্মী; দেখাইয়াছি—তিনি অশেস ঐশ্বর্য্যশালী। এখানে সত্যের যে লক্ষণ—সত্যের যে আকার—সত্যের যে নিদর্শন পাই, তাহারও সকলই শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান নহে কি? সত্যের কোন্ লক্ষণ—কোন্ আকার শ্রীকৃষ্ণে দৃশ্যমান না দেখি! এক একটী করিয়া মিলাইয়া দেখিলে, সত্যের সকল লক্ষণ, সকল আকার আদর্শরূপে শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান দেখিতে পাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই সুখ-শান্তি-বিধায়ক ছিলেন; শম, দম, সত্য, অহিংসা, অমাৎসর্য্য প্রভৃতি সকল গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন; ত্যাগ, ধ্যান, দয়া, আর্য্যত্ব প্রভৃতি সকল ভূষণেই তিনি ভূষিত ছিলেন। সুতরাং সত্যের লক্ষণ অনুসারে তিনি সকল সত্যের আধারভূত। অতএব, তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি ব্রহ্ম, তিনি ঈশ্বর।

বিতর্কে বক্তব্য বিষয়।

এইখানেই বিষম বিতর্ক উঠিয়া থাকে। বিতর্ক উঠে,—তিনি কেমন করিয়া ঈশ্বর সংজ্ঞা লাভ করিতে পারেন—যিনি জন্ম-জরা-মরণশীল নরদেহ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন? যিনি সত্যস্বরূপ সনাতন, তাঁহার মনুষ্য-দেহ ধারণ যুক্তি-যুক্ত হয় কি প্রকারে? যিনি নিরাকার নির্ব্বিকার আত্ম-স্বরূপ, তাঁহাতে কর্ম্মের আরোপ করি কি করিয়া? এইরূপ অশেষ প্রশ্ন উঠিয়া থাকে ও উঠিতে পারে। উঠিবার কথাও বটে। যিনি বিশেষণ-বিরহিত, অথবা যাঁহার বিশেষণের অন্ত নাই, তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, প্রশ্ন-বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী। অপিচ, সে সকল প্রশ্ন এতই জটিল—এতই কুটিল যে, তৎসমুদায়ের মীমাংসা হওয়া বড়ই কঠিন। যদিও মীমাংসা হয়, সে মীমাংসা—বিতর্কে নয়—প্রাণে। সে সকল প্রশ্নের সমাধান—বিক্ষোভে উদ্বেগে হয় না; যদি হয়, সে কেবল প্রশান্ত জ্ঞানে। তথাপি সে সকল বিষয় আলোচনার আবশ্যক আছে। সে আলোচনায় মানুষিক জ্ঞানে তাঁহাকে যতটুকু আয়ত্ত করিতে পারা যায়, সে প্রয়াস কখনই নিষ্ফল বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমরা তাই সংক্ষেপে এ প্রসঙ্গে তৎসম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের উত্থাপন করিতেছি। বোধ হয়, তদ্দ্বারা অনেক প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবে। আমাদের বক্তব্য বিষয় প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি; প্রথম,—সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তা; দ্বিতীয়,—মনুষ্য ও মনুষ্যত্ব; তৃতীয়,—মনুষ্যের মঙ্গলসাধনে জগদীশ্বরের প্রযত্ন; চতুর্থ—ঈশ্বরের দেহধারণ। এই চতুর্ব্বিধ বিভাগের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে, মনের অনেক সংশয় দূরীভূত হইতে পারে; এবং তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ও অবতারাদির আবির্ভাব বিষয়ে বহু বিতর্কের অবসান হইয়া আসে। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা সাধারণ-ভাবে ঐ কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। তাহাতে দেখাইবার চেষ্টা করিব,—সৃষ্টিমূলে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রভাব অনন্ত কাল বিদ্যমান আছে, মনুষ্যকে ঈশ্বর সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য মনুষ্যে তাঁহার বিভূতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ঐ প্রসঙ্গে আমরা আরও বুঝিতে পারিব,—মনুষ্যের মঙ্গলসাধনে জগদীশ্বরের বিশেষ প্রযত্ন আছে, এবং ঈশ্বরের দেহধারণ কখনই অসম্ভব নয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শ্রীভগবানের মর্ত্ত্যে অবতরণ।

(১) সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তা।

[বিশ্বমূলে এক অভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা,—সৃষ্টি দেখিয়া এক অভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তার বিষয় সপ্রমাণ হয় ;—সৃষ্টিকার্য্যে স্রষ্টার কল্পনা কৌশল,—স্রষ্টা যে একটা কল্পনা করিয়া—ভবিষ্য ফল অবগত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন-পরম্পরা ;—অভিব্যক্তি-বাদের আপত্তি খণ্ডন,—তদনুসারেও স্রষ্টার সর্ব্বশক্তিমানত্ব সপ্রমাণ হয় ;—ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য বিরুদ্ধ যুক্তির খণ্ডন,—তদ্দ্বারা তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ও ভবিষ্য অভিজ্ঞতার পরিচয় ;—মানুষের জ্ঞানে ঈশ্বরের আভাষ,—তদ্দ্বারা তাঁহার সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব, কল্পনাকুশলত্ব প্রভৃতি প্রতিপন্ন ;—তাঁহার বিশেষণ বিষয়ে বিরুদ্ধ বিতর্কের মীমাংসা,—তাঁহার সম্বন্ধে যতটুকু আমাদের জানা আবশ্যক, তাহা আমরা জানিতে সমর্থ ;—তাহাতে জানি—তিনি স্রষ্টা, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সর্ব্বশক্তিমান ইত্যাদি।]

সৃষ্টি সম্বন্ধে যত মত পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, তাহার সকল মতের সার-সমন্বয়ে আমরা দেখাইয়াছি যে, সকল মতই তিনটী মতের অন্তর্ভুক্ত,—(১) সৃষ্টিরূপে সৃষ্টি-কর্ত্তা বিদ্যমান, (২) সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছাক্রমে সংসারের সৃষ্টি, (৩) সৃষ্টির মূল—ক্রমবিকাশ। তবে আস্তিক্য নাস্তিক্য যত মতই যে ভাবে আলোচনা করা যাউক, স্রষ্টার সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের বিষয় মানুষ ভুলিয়াও ভুলিতে পারে না। প্রকৃতি পুরুষের মিলনে প্রকৃতির বিকৃতি-জনিতই সৃষ্টি হউক, অথবা স্রষ্টার ইচ্ছাক্রমেই সৃষ্টি হউক, অধিকাংশের মতেই সৃষ্টি-কার্য্যের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে। এই হিসাবে সৃষ্টির একটা আদি স্বীকার করিতে হয়। যাঁহারা এই মতের পোষক, তাঁহারা বলেন,—'এই যে বিশ্ব, চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি সমন্বিত এই যে জগৎ, ইহার আদিতে এক অব্যক্ত স্বাধীন শক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদি ইহা সেরূপ কোনও শক্তির কার্য্য না হইত, যদি ইহার মধ্যে কোনও অব্যক্ত স্বাধীন শক্তির লীলা না থাকিত,—তাহা হইলে একই ঘটনা একই অবস্থা পুনঃপুনঃ উপস্থিত হইতে দেখিতাম ; তাহা হইলে, নূতন কিছুই বা উৎকর্ষ কিছুই লক্ষিত হইত না। কিন্তু ইতিহাস সে সাক্ষ্য প্রদান করে না। ভূস্তরাদির তত্ত্বানুসন্ধানে প্রতিপন্ন হয়, পূর্ব্বের অনেক জীবজন্তু লোপ পাইয়াছে, এবং সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ—সে তুলনায় সেদিন মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে।' পাশ্চাত্যের মধ্যে যাঁহারা আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারাই প্রধানতঃ এই মত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন,—'সংসার এই যে উন্নতির পথে ধাবমান হইয়াছে, এ উন্নতির অবস্থাও অনন্তকালস্থায়ী নহে। ইহার যেমন আরম্ভ হইয়াছে, তেমনই ইহার ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী। ক্রম-বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশের রীতি অনুধাবন করিলেও প্রতীত হয়, সীমাবদ্ধ অতীতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতের কোনও এক সীমাবদ্ধ দিনে কার্য্যের শেষ হইয়া যাইবে। যাহার গতি আছে ও বিরাম আছে,—যাহার আরম্ভ আছে ও শেষ আছে, তাহার মূলে একজন কর্ত্তার প্রভাব থাকিবেই থাকিবে।' এ পক্ষের আর এক যুক্তি এই যে, শক্তির বিস্তৃতি

বিশ্ব মূলে এক অভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা।

বা বিচ্ছিন্নতার দিকেই সৃষ্টির গতি চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন,—'এই গতির পরিণতি—উত্তাপে বা তেজে। এখন সৌরমণ্ডলে যে তেজ কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে, সেই তেজ ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিবে এবং পরিশেষে বিশ্ব সেই তেজে বিলীন হইয়া যাইবে। হয় তো, সেই অবস্থায় উপনীত হইতে—বর্ত্তমান শক্তির অপচয় হইতে—লক্ষ লক্ষ বৎসর কাটিয়া যাইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান ক্রমবিকাশের অবস্থা কখনই অনন্তকাল স্থায়ী নহে।' এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইলে, সৃষ্টির যে আদি আছে—তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, এক অভিন্ন আদি ও স্বাধীন শক্তির দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। একই কারণ—একই আদিশক্তি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টির সর্ব্বত্র একটা সাম্য বা একত্ব ভাব বর্ত্তমান আছে। বৈজ্ঞানিকগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—'এক অভিন্ন উপাদানে এই বিশ্ব বিগঠিত।' আমরা বুঝিতে পারি, সেই উপাদান, কিবা সৌরমণ্ডলে কিবা পৃথ্বীতলে, সর্ব্বত্র অভিন্নভাবাপন্ন; সেখানেও যে ভূতে যে ক্রিয়া, এখানেও সেই ভূতে সেই ক্রিয়া। মাধ্যাকর্ষণ সর্ব্বত্রই আছে। কি দূরস্থিত নক্ষত্রে, কি পার্থিব অতি ক্ষুদ্র বালুকণায়, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব সকল স্থলেই সমভাবাপন্ন। এই যে জ্যোতিষ্মান্ ব্যোম—বিশ্বের সর্ব্বত্র সমভাবে বিস্তৃত; এই যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী—সমসূত্রে পরস্পর আবদ্ধ রহিয়াছে; একত্বের এবম্বিধ দৃষ্টান্তে, এক অভিন্ন শক্তি যে উহার মধ্যে কার্য্যকরী, তাহা মনে হয় না কি? স্থাপত্যের সাদৃশ্য দেখিয়া, অধুনা বিশেষ বিশেষ স্থাপত্যকে গ্রীসদেশীয় এবং বিশেষ বিশেষ স্থাপত্যকে ইরাণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কোথায় কোন্ সুদূর যব-দ্বীপে, বুরোবোদার মন্দিরে, হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে দেখিয়া, সে মন্দিরকে আমরা হিন্দু-কীর্ত্তির নিদর্শন বলিয়া মনে করি। সমত্বের বা একত্বের নিদর্শনে শিল্পীর সন্ধান যখন সর্ব্বত্রই এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়; তখন, বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টি-নৈপুণ্যের একত্ব দেখিয়া, সৃষ্টি-শক্তিকে অভিন্ন বলিয়া মনে না করিব কেন? অতএব, বিশ্বের বিভিন্ন অংশের উপাদানের ও কার্য্যকারণের অভিন্নত্ব দেখিয়া, উহাদের প্রযোক্তাকে বা আদি-শক্তিকে অভিন্ন বা অদ্বিতীয় বলিয়া ধারণা করিতে পারি। তার পর, সেই যে প্রযোক্তা বা সেই যে আদি-শক্তি, তাহাকে অনৈসর্গিক বা অলৌকিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কেন-না, সে শক্তি কোনও নিয়মের অধীন নহে। সে শক্তি মাধ্যাকর্ষণের বশীভূত নয়, সে শক্তিতে পারমাণবিক আকর্ষণ কার্য্যকরী নহে, অথচ সে শক্তি কোনও রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগ-ক্রিয়ার অধীনতাও স্বীকার করে না। ঐ সকল আকর্ষণ-বিকর্ষণ-সম্মিলন প্রভৃতি—নিয়মানুবর্ত্তিতার অধীন; কিন্তু সে শক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেই স্বাধীন অলৌকিক শক্তি, আপন ইচ্ছানুসারে কতকগুলি নৈসর্গিক নিয়মের অধীন করিয়া এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে যদি কেহ এমনও সিদ্ধান্ত করেন, এ বিশ্বের আদি নাই—অন্ত নাই, তাহা হইলেও সেই অলৌকিক অনৈসর্গিক শক্তির ক্রিয়া যে ইহার মধ্যে রহিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; তাহা হইলেও সেই শক্তিকেই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে। কেন-না, পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন-রূপ সৃষ্টির মূলেও তো সে শক্তিরূপী তিনি!

সৃষ্টিমূলে সৃষ্টি-কর্ত্তার প্রাধান্য মান্য করিলে, তাঁহার এক অভিনব কল্পনা-কুশলতার বিষয় মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে। মনে হয়,—তিনি যেন একটা কল্পনা করিয়া—একটা লক্ষ্য রাখিয়া, এই সংসারকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কি কার্য্যে কি ফল হইবে, যেন তিনি তাহা জানিতেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে যেন ভূত-ভবিষ্যৎ সকল বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। সৃষ্ট-পদার্থের—বিশেষতঃ প্রাণেন্দ্রিয়-সম্বলিত পদার্থের—ভবিষ্য-বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার অশেষ উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। সে সকল দৃষ্টান্তে তাঁহার কল্পনাকে একজন ঘটিকা-যন্ত্র নির্ম্মাতার কল্পনা-কৌশলের সহিত তুলনা করিতে পারি। ঘটিকা-যন্ত্র-নির্ম্মাতার যেমন অভিজ্ঞতা আছে—কোন্ কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে কীদৃশ উপাদানে কিরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিলে ঘটিকা-যন্ত্র কার্য্যকরী হইবে, এবং কিরূপ উপাদানে প্রস্তুত হইলে সে কত দিন স্থায়ী হইবে, সৃষ্টিকর্ত্তারও সৃষ্টিকার্য্য বিষয়ে তদ্রূপ অভিজ্ঞতার বিষয় মনে করা যাইতে পারে। গোষ্পদের সহিত মহাসাগরের তুলনা—বিসদৃশ হইলেও, একের দ্বারা অন্যের স্বরূপ কতকটা উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর; তাই এ উপমা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঘটিকা-যন্ত্র দেখিয়া, তাহার যে একজন নির্ম্মাতা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আমরা হয় তো সে নির্ম্মাতাকে দেখি নাই, কোন্ সময় কখন কি ভাবে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাও হয় তো জানি না; অথচ, ঘটিকা-যন্ত্র দেখিয়াই উহার একজন কল্পনা-কুশল নির্ম্মাতার বিষয় ধারণা করিয়া লই। সেইরূপ এই বিশ্বের প্রতি বস্তুটী—বিশেষতঃ প্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট প্রত্যেক পদার্থটী তাহাদিগের একজন কল্পনা-কুশল নির্ম্মাতার পরিচয় আমাদিগকে প্রদান করে। যে কোনও প্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট পদার্থের প্রসঙ্গ দৃষ্টান্ত-ক্ষেত্রে উপস্থিত করা যাইতে পারে। এমন কি, প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষয় বিবেচনা করিলেও, তাহাদের একজন নির্ম্মাতার—তৎসমুদায়ের ভবিষ্য কার্য্যকারিতার বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন সুতরাং কল্পনাকুশল নির্ম্মাতার—অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। মনে করুন—মানুষের দর্শনেন্দ্রিয়—চক্ষু। কারিকরের কি কল্পনা-কৌশলে দর্শনেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। যে সকল ত্বক শিরা মণ্ডল প্রভৃতি উপাদানে নেত্রমণ্ডল বিগঠিত, আধুনিক শারীর-তত্ত্ববিদ্গণ সেই উপাদান-সমূহকে প্রধানতঃ এগারটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দর্শন-বিষয়ে রেটিনা (Retina) বা অক্ষিপট এবং অপটিক্ নার্ভ (Optic nerve) বা দর্শন-স্নায়ু প্রধান কার্য্যকরী। দৃশ্যবস্তুর প্রতিকৃতি অক্ষিপটে প্রতিভাত হইলে, দর্শন-স্নায়ু সাহায্যে মস্তিকে তাহার জ্ঞান সঞ্চালিত হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্র মানুষের যে কৃতিত্ব-কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে, অক্ষিগোলকে সেই কৌশলের পূর্ণতা প্রতিপন্ন হয়। আলোক-গ্রহণ, আকুঞ্চন, সম্প্রসারণ, বর্ণবিভাগ প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে দূরবীক্ষণে যেমন সুকৌশলে কাচাদি সন্নিবিষ্ট হয়; অক্ষিগোলকের বিভিন্ন উপাদান সেইরূপ বিভিন্ন কার্য্য সাধনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত আছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বের দ্রব্যাদি দর্শন করিতে হইলে, তদন্তর্গত যন্ত্রাদির সম্প্রসারণ সঙ্কোচন প্রভৃতির দ্বারা কেন্দ্র স্থির

সৃষ্টিকার্য্যে স্রষ্টার কল্পনা-কৌশল।

করিয়া লওয়া আবশ্যক হয়। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় কি কৌশলে কি যন্ত্রের সাহায্যে কিরূপ ভাবে কেন্দ্র স্থির করে, তাহা গভীর গবেষণার বিষয়। কিন্তু তাহার অতিক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সে কেমন অতি-দূরের ও অতি-নিকটের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্ব্ববিধ সামগ্রীকে যথাযোগ্য আকার ও বর্ণ সহ প্রতিভাত করিয়া রাখে! এ সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, যিনি আমাদের চক্ষু-যন্ত্রের নির্ম্মাতা, তিনি কীদৃশ কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য—কেমন একটা ভবিষ্য উদ্দেশ্য রাখিয়া—অক্ষিগোলকের সৃষ্টি করিয়াছেন, মনে হয় না কি? ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্র গ্রহণ কালে আলোক-রশ্মির ন্যূনাধিক্য বিষয়ে যন্ত্র-পরিচালনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক হয়। কিন্তু অক্ষিগোলকের অন্তর্গত আইরিস্ (Iris) বা তারকামণ্ডল এমনই আকুঞ্চন-সম্প্রসারণশীল যে, আবশ্যকানুরূপ আলোক-গ্রহণে আপনি সমর্থ; তাহার আবশ্যক অনুসারে কনীনিকা বা মধ্যতারা ক্ষুদ্র হইয়া আসে। যিনি আলোকচিত্রণ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তিনি যদি তারকামণ্ডলের ন্যায় আলোকগ্রহণ পক্ষে স্বতঃসঙ্কোচক স্বতঃসম্প্রসারক যন্ত্রের আবিষ্কার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহার যশ আরও কত গুণ বৃদ্ধি পাইত! আমাদের চক্ষুর সাহায্যে চারিদিকের বস্তু পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তজ্জন্য তাহার গতি-পরিবর্ত্তনে বিশেষ কোনও আয়াস পাইতে হয় না। কত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই—যখন দৃষ্টিশক্তির কোনই আবশ্যক ছিল না অর্থাৎ মাতৃগর্ভেই—আমাদের চক্ষু গঠিত হইয়া ছিল। কোন্ ভবিষ্যতে দৃষ্টি-শক্তির আবশ্যক হইবে—তাহা অনুধাবন করিয়া, যিনি পূর্ব্ব হইতে আমাদের নেত্র-যুগল যথাবিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাঁহাকে একজন কল্পনা-কুশল ভবিষ্যাভিজ্ঞ অদ্বিতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাঁহার কল্পনার এমনই অলৌকিক কৌশল যে, তিনি যে শারীর-যন্ত্র যে ভাবে নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, পুরুষানুক্রমে দেহের পর দেহান্তরেও তাহার ক্রিয়া সেইভাবেই চলিয়াছে। যদিও কি কৌশলে এই ক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা দুর্নিরীক্ষ; কিন্তু এক জনের নিগূঢ় কল্পনা-কৌশলের ও ক্রিয়ার ফলে যে এই সকল কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। তার পর, এক জনের জন্য নয়; লক্ষ লক্ষ প্রাণীর জন্য লক্ষ লক্ষ চক্ষুর এবং ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি-পরিপুষ্টির বিষয় ভাবিতে গেলে, বিস্ময়ের অবধি থাকে না। শরীরেন্দ্রিয়ের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যদি মানস ইন্দ্রিয়ের বিষয় অনুসন্ধান করি, তাহাতেই বা কি দেখিতে পাই? সকলই তাঁহার এক অলৌকিক কল্পনা-কুশলতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পৎ মনুষ্যের মধ্যে তাঁহার কল্পনা-লীলা যেমন পরিদৃশ্যমান, তেমনই অন্যান্য প্রাণীতে এবং বৃক্ষলতাদিতে পর্য্যন্ত তাঁহার কল্পনা-কৌশল প্রত্যক্ষীভূত। পরমাণুতুল্য ক্ষুদ্র বীজ;—সেই ক্ষুদ্র বীজটীর মধ্যে কি কৌশলে তিনি বিশাল বটবৃক্ষের উপাদান-সমূহ রক্ষা করিয়াছেন, মরলোকের ধ্যান-ধারণায় তাহা আয়ত্ত হয় না। পশু-পক্ষী এবং বৃক্ষাদির সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক জ্ঞান সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও বিচিত্র। মনুষ্যেতর প্রাণিগণ, প্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীবজন্তু বা বৃক্ষলতাদির দ্বারা প্রাণ পোষণ করে। তাহারা আপনাদের আহার্য্য-সামগ্রী আপনারা উৎপন্ন করিতে জানে না বা প্রস্তুত করিতে শিখে নাই। অথচ, খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে

তাহাদের জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপ, উদ্ভিদাদির সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, তাহারাও স্রষ্টার প্রদত্ত জ্ঞানের বশে বায়ু জল প্রভৃতি আকর্ষণ করিয়া কেমন আপনাদের প্রাণ-শক্তি পোষণ করিয়া আসিতেছে! তার পর, এই যে সৌরজগৎ ও পৃথিবী—ইহাদের মধ্যে যে একটা সাম্যভাব রহিয়াছে, তাহাও সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা-কৌশলের পরিচায়ক। তিনি এমনই একটা কৌশলে এ সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, কোনটী কক্ষভ্রষ্ট হইয়া বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারিতেছে না। কত জ্ঞান, কত শক্তি, কত কল্পনা-কৌশল আয়ত্তাধীন থাকিলে, এবম্বিধ সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে, মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে তাহা ধারণা করা সম্ভবপর নহে। ফলতঃ, যে দিক দিয়া যেমন ভাবেই দেখি না কেন, এই সংসারের যিনি স্রষ্টা, সৃষ্টি-কার্য্যে তাঁহার অসীম কল্পনা-কৌশলের পরিচয় পদে পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যাঁহারা অভিব্যক্তিবাদী অর্থাৎ যাঁহারা বলেন—ক্রম-বিকাশের প্রভাবে সৃষ্টি বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সৃষ্টি-বিষয়ে তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তার প্রাধান্য স্বীকার করেন না।

অভিব্যক্তিবাদে আপত্তির খণ্ডন।

তাঁহারা বলেন,—প্রকৃতির নিয়মে সকলেই পূর্ণতার প্রতি প্রধাবমান। তাঁহাদের মত এই যে, সৃষ্টির প্রথমে সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত সৃষ্ট পদার্থের সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু তার পর প্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট সৃষ্ট পদার্থসমূহ স্বভাববশে (Law of Nature) ক্রমবিকাশের পথে প্রধাবমান। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে ক্রম-বিকাশবাদীদের ঐ উক্তির মধ্যেও সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি-কৌশলের পরিচয় পাইতে পারি। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টী বোধগম্য হইতে পারে। ক্রমবিকাশবাদিগণ যাহাকে স্বাভাবিক নিয়ম বা স্বভাববশে পরিণতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাতে কার্য্যমাত্রের পরিচয় থাকে, কারণের কোনও নিদর্শন দেখা যায় না। মনে করুন, আমি বলিলাম—তাপের ধর্ম্ম বিস্তৃতি; ইহাতে 'তাপে বিস্তৃত হয়'—ইহাই মাত্র বলা হইল। কিন্তু কি কারণে যে তাপে বিস্তৃতি ঘটে, ঐ কথায় তাহার কিছুই বলা হইল না। 'স্বাভাবিক নিয়ম' বাক্য দ্বারা সেইরূপ কার্য্য মাত্র নির্দ্দেশ হয়; কারণের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। অথচ, বুঝিতে পারা যায়, তাপে বিস্তৃতি বা শৈত্যে সঙ্কোচন উভয় অবস্থারই কারণ-পরম্পরা বিদ্যমান। মাধ্যাকর্ষণের দৃষ্টান্তে বিষয়টী আরও বিশদীকৃত হইতে পারে। স্বাভাবিক নিয়ম কি, সে আলোচনায় তাহাও বোধগম্য হয়। গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে আপন আপন কক্ষ মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহারা এমনই নিয়মে আবদ্ধ আছে যে, কেহই কোনও দিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতে পারিতেছে না। নদী-গর্ভে ভাসমান নৌকার গতি-ক্রিয়া যেমন কর্ণধারের আয়ত্তাধীন, গ্রহ-উপগ্রহাদির গতি-পথে তেমনই নিয়ম-রূপ কর্ণধার অবস্থিত। সেই নিয়মকে 'স্বাভাবিক-নিয়ম' বলা যাইতে পারে। কেন-না, সে গতি নির্দ্দিষ্ট বৃত্ত অতিক্রম করিতে অসমর্থ। ক্রমবিকাশবাদিগণ তাহাকেই কি স্বাভাবিক নিয়ম বলেন না? কিন্তু, তাহা হইলে, ক্রমবিকাশের পথে একটা বিষম বন্ধন আছে বলিয়া বুঝা যায় না কি? তাহা হইলে, পরিণতির সীমা পূর্ব্ব হইতেই ধার্য্য হইয়া আছে, বলিতে পারি না কি? এ বিষয়টী আরও একটু বিশদভাবে বোধগম্য করিতে হইলে, ক্রম-

বিকাশবাদের মূলতত্ত্ব অনুধাবন করা আবশ্যক। অস্মদ্দেশে ক্রমবিকাশবাদ এক ভাবে এবং পাশ্চাত্যদেশে আর এক ভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়া প্রায়ই কোনও তত্ত্বকথা প্রতিষ্ঠিত নহে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে অনেকটা বিভিন্ন ভাব। সুতরাং তদ্দেশ-প্রবর্ত্তিত ক্রমবিকাশবাদের তত্ত্ব-কথাই এতৎপ্রসঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যক। ক্রমবিকাশবাদের পাশ্চাত্য প্রতিবাক্য—ইভলিউসন্ (Evolution)। এই ইভলিউসন মতে—প্রকৃতির প্রক্রিয়া ত্রিবিধ ;—(১) প্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট পদার্থের ক্রমবিকাশ (Organic Evolution), (২) প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural Selection), (৩) যোগ্যতমের জীবন-সংরক্ষণ (Survival of the Fittest)। প্রথম প্রক্রিয়া অনুসারে বুঝা যায়, প্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট যে কোনও পদার্থ অধুনা পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় বা পূর্ব্বে দৃষ্ট হইত, তৎসমস্তই আদিভূত এক অপুষ্ট অবস্থার বিকাশ মাত্র ; উন্নতির পর উন্নতির বা বিকাশের পর বিকাশের স্ফূর্ত্তিতে ক্ষুদ্র পিণ্ড হইতে প্রাণিজগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই হিসাবে প্রথমে একটা আটার মত প্রাণপদার্থ (Animated Jelly) বা একটা ক্ষুদ্র পিণ্ডগত প্রাণপদার্থ (Nodules) ছিল। তাঁহাদিগকেই প্রাণিজগতের প্রথম পিতৃমাতৃস্থানীয় বলা যাইতে পারে। কেননা, তাহাদের ক্রমপরিণতির ফলেই মনুষ্যাদি প্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অন্য দুই প্রক্রিয়ার বিষয় অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারি যে, সে আদি অবস্থা হইতে ক্রমবিকাশের ফলে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ক্রমে, সেই আদি অবস্থা বিভিন্ন বংশে বা পর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তদ্দ্বারা এক এক বংশ—মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদি—ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে বিষম শক্তি-সংঘর্ষ চলিতেছে। সেই শক্তি-সংঘর্ষে দুর্ব্বল বিধ্বস্ত বিনষ্ট হইতেছে, সবল শক্তিশালী যোগ্যতম স্থান অধিকার করিতেছে। এই ক্রম-বিকাশের ফলে এক দিকে বনের বানর মানুষ 'বনিয়া' যাইতেছে, অন্যদিকে পৃথিবীর অঙ্ক হইতে অসংখ্য অগণ্য অনাবশ্যক জীব লোপ পাইতেছে। এ হিসাবে, ক্রমবিকাশ বলিতে দৈহিক বলের বিকাশ নহে ; সর্ব্ব বিষয়ের স্ফূর্ত্তিতে আদর্শ সৃষ্টিই উহার মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু সে স্ফূর্ত্তির সীমা যে কোথায়, সে বিকাশের গতি কোন্ অনন্ত পথে প্রধাবিত, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। এই হিসাবে আস্তিকগণের সহিত মতানৈক্য নাই বলিলেও বলা যায়। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে অবশ্যই বোধগম্য হইবে, ক্রমবিকাশ একটা প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি মাত্র, উহাকে কোনমতেই সৃষ্টির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। অথচ, কারণ ভিন্ন কোনও কার্য্য হইতে পারে না, ইহা অবিসম্বাদিত। পরিবর্ত্তনের সে কারণ অস্বীকার করা যায় না। অপিচ, পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্ধারিত না হইলে 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' প্রমাণ করিতে পারে না যে, কি প্রকারে আবশ্যক বা যোগ্যতম বাঁচিতে পারে। কারণ না থাকিলে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনও অসম্ভব। সুতরাং, উহার মধ্যেও এমন একটা কৌশলের ক্রিয়া আছে স্বীকার করিতে হয়—যে কৌশলের ফলে ভাল-মন্দের উত্থান-পতন ঘটে, অনাবশ্যক পদার্থ লোপ পায়, আবশ্যক পদার্থ স্থায়ী হইয়া যায়। ক্রমবিকাশবাদের রীতি-

পদ্ধতির আলোচনায়ও একটা শক্তির ক্রিয়া-কৌশল প্রতিপন্ন হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কল্পনা-কৌশল না থাকিলে, যে ভাবে সৃষ্টি-ক্রিয়া চলিয়াছে, তাহাতে ক্রমবিকাশের যুক্তি আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না। যে দর্শনেন্দ্রিয়ের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে অবতারণা করিয়াছি, সেই দৃষ্টান্তেই বুঝা যায়, কোথাও ক্রমবিকাশের স্বাধীন গতি দৃষ্ট হয় না। কেন-না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বংশের চক্ষু বা দৃষ্টি-শক্তি যেরূপ ছিল, আধুনিক বংশের চক্ষু বা দৃষ্টি-শক্তি তদপেক্ষা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে বা স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধিকন্তু দেখিতে পাই,—অপরিস্ফুট ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট কতকগুলি আদি-জীবের চক্ষুর আকৃতি মাত্র আছে, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি-শক্তি নাই। পূর্ব্বেও তাহাদের যে অবস্থা ছিল, এখনও সেই অবস্থা। যদি ক্রমবিকাশের নিয়ম সর্ব্বত্র অবাধ কার্য্যকরী হইত, তাহা হইলে বংশ-বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল জীবের ইন্দ্রিয়াদিও বিকাশপ্রাপ্ত হইত। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে—একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে, ঘড়ির কাঁটার ঘণ্টা পরিবর্ত্তনের ন্যায়, জীবের দেহে ক্রম-বিকাশের একটা ধারা চলিয়াছে মাত্র। নচেৎ, সীমা উল্লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। নারিকেল বৃক্ষে নারিকেল উৎপন্ন হয়; অন্য ফল উৎপন্নের আশা করা যায় না। আবার যতই উৎকর্ষ সাধিত হউক, কোনও নারিকেলই বৃহৎ জালার আকার প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। আর এই জন্যই বোধ হয়, ক্রমবিকাশবাদিগণ মনুষ্যের ও বানরের একই বংশ স্থির করিতে গিয়া মধ্যের সম্বন্ধ-সূত্র (Missing links) খুঁজিয়া পাইতেছেন না! ফলতঃ ক্রমবিকাশ যে স্বতঃসৃষ্ট, তাহা নহে; এবং উহা যে অনন্ত অসীম গতিসম্পন্ন, তাহাও নহে। সুতরাং, হয়—স্বাধীন শক্তির ক্রিয়া মানিতে হইবে, নয়—কল্পনা-কুশলতার লীলা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যখন স্বাধীন-শক্তির ক্রিয়া সপ্রমাণ হয় না, তখন একটা নির্দ্দিষ্ট বন্ধনীর মধ্যে, একটা পূর্ব্ব-কল্পিত ধারার ভিতরে, উহার যে কার্য্য চলিয়াছে, তাহা বলিতেই হইবে। ফলতঃ, ক্রমবিকাশের মধ্যেও সুকৌশলী সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা-লীলা পরিদৃশ্যমান্।

অন্যান্য বিরুদ্ধ যুক্তির খণ্ডন।

সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা-কুশলতার বিরুদ্ধে আর এক প্রকার বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে। সে বিতর্ক—স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি-সংক্রান্ত। এ পক্ষের যুক্তি এই যে,—'প্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট পদার্থের অভ্যন্তরে এক প্রকার স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তির বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। সেই ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে তাহারা আপনা-আপনি আপনাদের উপযুক্ত অত্যুৎকৃষ্ট গতি বা আকৃতি নির্দ্ধারিত করিয়া লয়। ঘটিকা-যন্ত্রের সময়-নিরূপণ ক্রিয়া যদি তাহার স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তির অধীন হয়, আর ঘটিকা-যন্ত্রের স্প্রিং চাকা প্রভৃতি যদি স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা আপনা আপনিই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-ফলে ঘটিকাযন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঘটিকা-যন্ত্র প্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট নহে। সুতরাং উহার সে কার্য্যকারিতা—সে স্বাধীন শক্তি নাই। প্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট পদার্থে সে স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি দৃষ্ট হয়। কেন-না, তাহারা আপনা আপনি মিলিত হয় ও পরিবর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ঘটিকা-যন্ত্র সম্বন্ধে তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বরং প্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট পদার্থ

মাত্রের যে স্বাধীন ইচ্ছা আছে, ঘটিকা-যন্ত্রের মধ্যে সে শক্তির বিদ্যমানতা অসম্ভব বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।' স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, মনুষ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে বিদ্যমান আছে স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রাণিপর্য্যায়ের নিম্ন স্তরে, বিশেষতঃ উদ্ভিদাদিতে, সে পরিচয় কিছু পাওয়া যায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উচ্চ স্তরের প্রাণীর মধ্যে স্বাধীন-শক্তির যে একটু বিকাশ দেখা যায়, তাহাও সীমাবদ্ধ। সৃষ্টির যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী মনুষ্য, তাহারও মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি এতদূর সীমাবদ্ধ যে, আপনার নিতান্ত আবশ্যক কর্ম্ম ভিন্ন সে অন্য কিছুই সম্পন্ন করিতে পারে না। মানুষের দুইটী চক্ষু আছে; তিনটি চক্ষু পাইবার ইচ্ছা করিলে, তাহার ইচ্ছাশক্তি কখনই তাহাকে সহায়তা করিতে পারিবে না। এইরূপে বেশ বুঝা যায়, যত কিছু স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির লীলা-খেলা বা ক্রমবিকাশ, সকলই একটা নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে কার্য্য করিতেছে; আর সেই সীমানা পূর্ব্ব হইতে একজন নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তবে এখানেও একটী বিতর্ক উঠিতে পারে যে, মানুষ আপন স্বাধীন চিন্তা শক্তির প্রভাবে আপন অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়, সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তার ভবিষ্য-দর্শন বিষয়ে সংশয় আসিতে পারে। তিনি যদি গণ্ডী নির্দ্দিষ্ট করিয়া সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, তাহা হইলে আপন ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে মানুষ আপন অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিবে কি প্রকারে? মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি এবং মানুষের ভবিষ্য পরিণতি বিষয়ে ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা কি প্রকারে সমাধান হইতে পারে? তাহারও যৌক্তিকতা আছে। মনে করুন, আমার নিত্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে—কাল প্রাতে আমি আপিসে যাইব। আমার বন্ধু-বান্ধবকেও আমি হয় তো সে কথা কহিলাম। কিন্তু আপিসে যাইবার সময় আমার স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি, আমার গতি প্রতি-রোধ করিল। আমি ইচ্ছা করিয়া আপিস কামাই করিলাম। এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী অভিজ্ঞতা এবং ইচ্ছা-শক্তি উভয়েরই ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইল। সুতরাং ঐ দুই অবস্থাকে কখনই পরস্পর বিরোধী অবস্থা বলা যাইতে পারে না। এক হিসাবে সীমানার মধ্যে থাকিয়াই ঐরূপ স্বাধীন শক্তির ক্রিয়া হইয়াছে বলিতে পারা যায়। সীমা-উল্লঙ্ঘনের কোনই লক্ষণ ইহাতে নাই। বিশেষতঃ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কার্য্যে তোমার স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি, তাঁহার ভবিষ্য অভিজ্ঞতার অন্তর্ভূত বলিলেও বলা যাইতে পারে।

ঈশ্বর, জগদীশ্বর, ব্রহ্ম বা সৃষ্টিকর্ত্তার সংজ্ঞা সম্বন্ধে এতই বিতর্ক বিতণ্ডা চলিয়া থাকে যে, কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করা বা তাঁহার পরিচয়ের কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট সূত্র নির্দ্দেশ করা একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তথাপি মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-ধারণা অনুসারে তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞায় ও সূত্রে তাঁহার পরিচয় খ্যাপন করার চেষ্টা হইয়া থাকে। মানুষের ক্ষুদ্র ধারণা; তাই ক্ষুদ্র বস্তুর উপমায় অনন্তকে বুঝাইবার প্রয়াস হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, এ বিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, আর সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ, তিনি স্রষ্টা—কল্পনা-কৌশল-সম্পন্ন। স্রষ্টা বলিতে গেলেই কর্তৃত্ব সুতরাং একটু ব্যক্তিত্ব আসিয়া পড়ে।

মানুষের জ্ঞানে ঈশ্বরের আভাষ।

মানুষের দৃষ্টান্তেই বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারি, মানুষের তিনটী বিশেষ গুণ বা ধর্ম্ম আছে। সেই তিন গুণ-ধর্ম্মের উপর তাহার কার্য্য নির্ভর করে। সেই তিনটী গুণ ধর্ম্ম,—(১) ভাবনা, (২) বাসনা, (৩) কার্য্য। কোনও একটী কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে, প্রথমে মনে একটা ভাবনার উদয় হয়। সেই ভাবনা ক্রমে বাসনায় বা কামনায় পরিণত হইলে তাহা সম্পাদনে আমরা যত্নবান্ হই। কার্য্য সম্পাদনের এই তিন অবস্থা স্রষ্টায় আরোপ করা যাইতে পারে। অধিকন্তু কার্য্যের গুরুত্ব দেখিয়া কল্পনা-শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। যিনি প্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট পদার্থ-সমূহকে এবং তাহাদের শীর্ষস্থানীয় মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার শক্তির কি ইয়ত্তা করা যায়? তিনি মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর নহেন বলিয়া তাঁহার অদ্বিতীয় শক্তির বিষয় কোনক্রমেই অননুভবনীয় নহে। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হইলেই অস্তিত্ব অপ্রামাণ্য হয় না। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে প্রামাণ্যবাদ প্রসঙ্গে তাই চাক্ষুষ প্রমাণ ভিন্ন বিভিন্ন প্রমাণের বিষয় উত্থাপিত আছে। মানুষের মন এবং মানুষের আত্মা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া উহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের চিত্তের (মনের) এবং আত্মার যেমন অস্তিত্ব আছে, অথচ আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না; ঈশ্বরের অস্তিত্ব সেইরূপ আমাদের অ-দৃষ্ট হইলেও প্রামাণ্য। অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে আমরা আমাদের চিত্তকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও সেইরূপ সর্ব্বাধার শ্রীভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অণুবীক্ষণের গোচরীভূত না হইলেও মনের বা চিত্তের অস্তিত্ব যেমন অবিসম্বাদিত; দূরবীক্ষণ সাহায্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না হইলেও তাঁহার বিদ্যমানতা সেইরূপ দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দূর হইতে অট্টালিকা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে গৃহস্বামী দৃষ্টির অগোচরে আছেন। সৃষ্টির ও স্রষ্টার সম্বন্ধে স্থূলভাবে এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মানুষের সহিত ঈশ্বরের সাদৃশ্য তুলনায় আর একটা আপত্তির কথা উঠিয়া থাকে। মানুষ বা কোনও একটী প্রাণী অন্য প্রাণী হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রাণী মাত্রের উৎপত্তি-কারণের কারণ আছে। কিন্তু যিনি স্রষ্টা, তিনিই আদি কারণ; কেন-না, তাঁহার আর উৎপত্তি-কর্ত্তা নাই। সুতরাং মানুষের সহিত তাঁহার তুলনা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? এ আপত্তি যুক্তিযুক্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, আমাদের অজ্ঞতা-নিবন্ধনই ঐরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের পক্ষে তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার আবশ্যক হয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব বুঝিতে হইলে, তাহা সীমাবিশিষ্ট বলিয়া বুঝা প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহাকে বুঝিতে গেলে, তিনি যে অসীম—তাহা ধারণা করা আবশ্যক। মানুষের দৃষ্টি-শক্তি বলিতে, সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তি বুঝা যায়; ঈশ্বরের দৃষ্টিশক্তি বলিতে অসীম অনন্ত দৃষ্টিশক্তি বুঝাইয়া থাকে। ফলতঃ মানুষের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার সময় তাঁহাতে অনন্তত্ব এবং মানুষে সসীমত্ব স্থির করিয়া লইতে হয়। মনুষ্য কোনও একটী সামগ্রী সৃষ্টি করিলে মনুষ্যকে যে হিসাবে সেই বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিব; বিশ্বের আদি সৃষ্টিকর্ত্তাকে সেই হিসাবে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে না। উভয়েই সৃষ্টিকর্ত্তা বটে, তবে উভয়ের সেই সৃষ্টি-কার্য্যে প্রভেদ—

আকাশ পাতাল। মানুষেরও চেতনা আছে, উদ্ভিদেরও চেতনা আছে, কিন্তু উভয়ের চেতনায় পার্থক্যের অবধি নাই। এই বিষয়টী যেমন আমরা সহজে বুঝিতে পারি, স্রষ্টার সহিত সৃষ্ট বস্তুর গুণাদির তুলনায় মানুষের সৃষ্টির সহিত ঈশ্বরের সৃষ্টির সেইরূপ পার্থক্য অনুভব করা আবশ্যক। সৃষ্টি-কার্য্যেই স্রষ্টার জ্ঞান ও শক্তি প্রকাশমান। ভবিষ্যতের পরিণাম মনে রাখিয়া মানুষ যে কার্য্য সম্পন্ন করে, তদ্দ্বারা তাহার জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও একটী বিষয় সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থাৎ ভবিষ্য ফলোৎপত্তি বিষয়ে কল্পনা-কুশলতার পরিচয় দিতে গেলে, জ্ঞান ও কার্য্য—উভয় শক্তিই আবশ্যক হয়। এই বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ে—অসংখ্য প্রাণেন্দ্রিয়-সমন্বিত এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-মূলে—যে জ্ঞান-শক্তি দেখি, তাহা অনন্ত অপরিমেয়। সেই জন্যই ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। সর্ব্বজ্ঞ বলা হয় এই জন্য—তিনি সৃষ্টির উৎপত্তি স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। সর্ব্বশক্তিমান বলা হয় এই জন্য—তিনি সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে শক্তিমান। সম্ভব অসম্ভব সকল কার্য্যই তাঁহার আয়ত্তাধীন বটে; তথাপি সম্ভবপর যে কোনও কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে স্বীকার করিলেও, তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি অপরিসীম বলিয়া মানিতে হয়। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ভিন্ন সর্ব্বব্যাপিত্বরূপ তাঁহার আর এক বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সে বিশেষণেরও সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখিতে পাই। তদনুসারে তিনি সংসারের রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা রূপে প্রতিভাত হন। সৃষ্টির পর সৃষ্ট পদার্থে যে ক্রিয়া চলে, তাহা তাঁহারই প্রদত্ত। সে ক্রিয়ার মধ্যেও তিনিই কার্য্য করিতেছেন। যদিও মানুষের কার্য্য-বিশেষে তাহার স্বাধীন শক্তির ক্রিয়া প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু তাহা যে কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া বা ফল, তাহাই বুঝা যায়। এই সকল আলোচনায় বেশ প্রতিপন্ন হয়,—(১) এই বিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, (২) সেই সৃষ্টিকর্ত্তা কল্পনাকুশল অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যের ভবিষ্যফলবেত্তা, (৩) তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বজনপ্রতিপালক।

পূর্ব্বোক্ত যে যে বিশেষণে ঈশ্বরকে নির্দ্দেশ করা হইল, তাহার বিরুদ্ধে কতকগুলি বিতর্ক উঠে। তন্মধ্যে একটা প্রধান বিতর্ক এই যে, তিনি যখন আদি-কারণ, তখন তাঁহাকে জানিবার আমাদের কোনই উপায় নাই; সুতরাং তিনি অজ্ঞেয়। অতএব, তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত বিশেষণে কেমন করিয়া বিশেষিত করিতে পারি? এক হিসাবে এ বিতর্কের মূল্য আছে। তাঁহার গুণ-ধর্ম্ম এতই অধিক যে, মানুষের মন তাহা সম্যক ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু ব্যক্ত করি, তৎসমস্তই আংশিক মাত্র। তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব যে অজ্ঞেয়, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহার মধ্য হইতেই একটা সত্য নিষ্কাষণ করিতে পারি। আমাদের অজ্ঞতা—সকল পদার্থ সম্বন্ধেই প্রতিপন্ন হয়। আমরা মানুষ; কিন্তু মানুষের সকল তত্ত্বই কি আমরা অবগত আছি? মনটী কেমন বা প্রাণটী কেমন,—আমরা কিছুই বলিতে পারি কি? ফলতঃ, মানুষ হইয়াও আমরা মানুষের কতক অংশ মাত্র জানিতে পারি। কেবল মানুষের বিষয়ই না বলিবেন, প্রাকৃতিক

বিরুদ্ধ বিতর্কের মীমাংসা।

পার্থিব অধিকাংশ পদার্থ বিষয়েই আমাদের আংশিক অভিজ্ঞতা মাত্র আছে। পার্থিব পদার্থ যখন অণু পরমাণুতে পরিণত হয়, তখন তাহার অবস্থা আমাদের নিকট গূঢ় রহস্যময়; অথচ, পদার্থ-সম্বন্ধে আমাদের কতকটা অভিজ্ঞতা যে আছে, তাহাও অবিসম্বাদিত। ফলতঃ, জ্ঞান অসম্পূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু একেবারে অপ্রকৃত বা মিথ্যা না হওয়াই সম্ভব। এই দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারি, ঈশ্বর সমষ্টি-রূপে আমাদের অজ্ঞেয় হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহার অংশ-বিশেষ ধ্যান-ধারণার অতীত নহে। সর্ব্বাংশে আমরা ঈশ্বরকে না জানিতে পারি, কিন্তু তাঁহার কিয়দংশ নিশ্চয়ই আমাদের পরিজ্ঞাত। প্রাকৃতিক কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পদার্থ ভূপতিত হয়; তদ্দৃষ্টে আমরা একটী শক্তির—মাধ্যাকর্ষণ শক্তির—প্রমাণ পাই। কিন্তু কোথা হইতে সে শক্তি আসিল? অনুসন্ধান করিয়া পাই না! এ যেমন আংশিক জ্ঞান, সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধেও আমাদের সেইরূপ আংশিক জ্ঞান। দেখিতে পাই—সৃষ্টি পদার্থ; বুঝিতে পারি—সৃষ্টির মধ্যে এক কল্পনা-কৌশল আছে; আর, দেখিয়া ও বুঝিয়া স্থির করি—সৃষ্ট পদার্থের একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, নিশ্চয়ই একটা ধারণা হইতে পারে যে, কোনও বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানিতে না পারিলেও, তৎসম্বন্ধে যেটুকু জানা আবশ্যক, তাহা আমরা জানিতে পারি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যাহাই হউক, আমাদের পক্ষে উহার কার্য্যকারিতা যে কি, তাহা আমরা অবশ্যই জানিতেছি। পর্ব্বতের উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিলে কি ফল ফলে, কাহারও জানিতে বাকি আছে কি? ঈশ্বর সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। তিনি যাহাই হউন, আমাদের পক্ষে তিনি যে কি, সেটুকু আমরা নিশ্চয় জানিতে পারি। আমরা জানি,—তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং আমাদের বুঝা উচিত—তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের কি দায়িত্ব আছে! ইহাই হইল—কার্য্যকরী জ্ঞান; আর এই জ্ঞানই আমরা লাভ করিতে পারি। এ সকল বিষয়ের সিদ্ধান্তে আমাদের যুক্তি অনেক সময়ে পর্য্যুদস্ত হয়। অথচ, এই সকল জ্ঞান মানুষের বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার অস্তিত্ব যদি মান্য করিয়া কার্য্য করি, তাহা হইলে কার্য্যক্ষেত্রে যে সুফল লাভের আশা থাকে, অন্য ভাবে সে আশা একেবারে লোপ পায়। একখানি অর্ণবযান অকূল সমুদ্র মধ্যে নিমজ্জমানপ্রায়; তাহার সেই বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া, একখানি বাষ্পীয় পোত তাহার আরোহিগণের উদ্ধার-সাধন জন্য অগ্রসর হইল; কিন্তু সে অবস্থায়, সেই বাষ্পীয় পোতও নিরাপদ নহে জানিয়া, যদি কোনও আরোহী তাহাতে গমন না করেন, তাঁহার পরিণাম কি ঘটিবে—সহজেই অনুমেয়। বাষ্পীয় পোতে গমন করিলে হয় তো তাঁহার রক্ষার উপায় হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু নিশ্চেষ্ট নিরবলম্ব হওয়ায়, তাঁহার জলমগ্ন হওয়া অনিবার্য্য হইল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে, যতই প্রতিকূল যুক্তি অন্তরায় হউক, তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ জনের আশা-রজ্জু একেবারে কখনই অবলম্বনহীন হয় না। ফলতঃ, যখন কার্য্য আছে, তখন তাহার কারণ আছেই; আবার সেই কার্য্যের মধ্যে যখন সর্ব্বত্র একটা একত্বের বিকাশ দেখি, তখন সেই কার্য্যকর্ত্তাকে অভিন্ন অদ্বিতীয় বলিয়াই বুঝিতে পারি। তার পর, প্রতি কার্য্যেই যখন

কতক পরিমাণে ভবিষ্যাভিজ্ঞতার ও কল্পনা-কুশলতার নিদর্শন পাই, তখন সৃষ্টি-কার্য্য যে সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা-কৌশলের ফল, তাহাও উপলব্ধি হয়। এইরূপে সৃষ্টি-তত্ত্বের অনুসন্ধানে স্রষ্টার অনুসন্ধান যতটুকু আমাদের অবগত হওয়া আবশ্যক, অবশ্যই আমরা তাহা অবগত হইতে পারি। ফলতঃ, সৃষ্টিমূলে স্রষ্টার বিদ্যমানতা সর্ব্বপ্রকারেই সপ্রমাণ হয়; ক্রমবিকাশবাদের যুক্তিতেও তাহাতে বাধা পড়ে না;—ক্রমবিকাশ সৃষ্টিকর্ত্তার নির্দ্ধারিত একটী নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে মাত্র।

* * *

(২) মনুষ্য ও মনুষ্যত্ব।

[মনুষ্যের দেহ ও মন,—দেহ ও মনের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে বিচার-বিতর্ক;—মানুষের নৈতিক গুণ-ধর্ম্ম,—সপ্তবিধ কারণে ন্যায়ান্যায় বিষয়ে মানুষের সদসৎ নৈতিক জ্ঞান প্রতিপন্ন;—মানুষের দায়িত্ব ও বিবেকের কর্ত্তৃত্ব,—মানুষ যে স্বাধীন চিন্তাশক্তিসম্পন্ন দায়িত্বপূর্ণ জীব, তাহা প্রতিপন্ন হয়;—মনুষ্যেতর প্রাণীর সহিত মনুষ্যের পার্থক্য,—সর্ব্ববিধ তুলনায় ঈশ্বরের সহিত মানুষের সাদৃশ্যালোচনা।]

মনুষ্যে দেহ ও মন।

'মনুষ্য' শব্দে একটী স্বাধীন ও দায়িত্বপূর্ণ জীব নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। অর্থাৎ,—প্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে যাহা স্বাধীন এবং যাহার দায়িত্ব আছে, তাহাই 'মনুষ্য' শব্দবাচ্য। মনুষ্যের মানসিক এবং নৈতিক গুণ-ধর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় অনুধাবন করিলে, এ অর্থের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। মানুষের মানসিক গুণ-ধর্ম্ম কি? এ বিষয় বুঝিতে হইলে, 'মন' কি এবং 'শরীর' কি, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়। মন এবং দেহ যে স্বতন্ত্র, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। শরীর বা দেহ জড় পদার্থে অর্থাৎ ভূত-সমূহে বিগঠিত। যাহার আকৃতি, পরিমাণ, বর্ণ, গঠন ও কাঠিন্য বা ঘনত্ব আছে, তাহাই জড় পদার্থের মধ্যে গণ্য। মন—এ সকলের অতীত। মনের যে গুণ-ধর্ম্ম—চিন্তা ও অনুভব, তাহার সহিত আকৃতি পরিমাণ প্রভৃতি জড় পদার্থের গুণ-ধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই। অথচ, এই দুই পরস্পর-বিরোধী পদার্থ মানুষে বিদ্যমান্। যখন আমরা কোনও বিষয় চিন্তা করি, তখন আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারি, উহা মনের কার্য্য; আবার যখন আমাদের কোনরূপ গতি-শক্তি হয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি, উহা আমাদের শরীরের বা শারীর উপাদানভূত জড় পদার্থের ক্রিয়া। মানুষের আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস বা জ্ঞান মানুষকে এই শিক্ষাই শিখাইয়া আসিতেছে। মন এবং শরীর পরস্পর বিভিন্ন; শরীর বা দেহ—জড় পদার্থোৎপন্ন, মন—জড়পদার্থাতীত। কাজেই কোনও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বা রাসায়নিক গবেষণায় মনকে কেহ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। অন্য প্রমাণ অপেক্ষা আমাদের স্বভাবজাত বিশ্বাস আমাদিগকে মনস্তত্ত্ব বিষয়ে অধিক শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। স্বভাবজাত বিশ্বাসই সংসারের বহু কার্য্যে আমাদের অবলম্বন। 'অংশ হইতে পূর্ণ বৃহত্তর'—জ্যামিতির এই যে স্বতঃসিদ্ধ, উহার জ্ঞান আমরা কিরূপে প্রাপ্ত হই? আমাদের স্বভাবজাত বিশ্বাস হইতেই পাই না কি? কিন্তু তথাপি বড় জটিল সমস্যা—মানুষ যে দুইটী উপাদানে গঠিত হইল, তাহার সেই দুইটী প্রধান উপাদান—মন ও দেহ—

কেমন করিয়া দুই সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু হওয়া সম্ভবপর? এই বিতর্ক লইয়া সংসারে দ্বন্দ্বের অবধি নাই। এই বিতর্ক-বিতণ্ডা উপলক্ষেই পাশ্চাত্যে আইডিয়ালিজম্ (Idealism) অর্থাৎ মায়াবাদ এবং মেটিরিয়ালিজম্ (Matérealism) অর্থাৎ জড়বাদ রূপ দুই বিষম বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। মায়াবাদেরই নামান্তর—অহংবাদ বলিতে পারি। এই বাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মন বা অহং সারভূত; তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু আছে, সকলই মায়া বা মিথ্যা; দেহ মিথ্যা, ইন্দ্রিয়াদি মিথ্যা, জন্ম-জরা-মৃত্যু সব মিথ্যা—মায়া বা স্বপ্ন। কিন্তু জড়বাদ সম্পূর্ণ বিপরীত। জড়বাদিগণ বলেন—মন বলিয়া কোনও পদার্থ নাই; যাহাকে আমরা মন বলিয়া অভিহিত করি, তাহা মস্তিষ্কের কতকগুলি অণুর বিমিশ্র গতি মাত্র। কিন্তু এ বিষয়েও নানা বাদ-প্রতিবাদ চলে। মনের সহিত মস্তিষ্কের নিকট সম্বন্ধ আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া উহারা যে অভিন্ন, তাহা প্রতিপন্ন হয় না। মস্তিষ্ককে মনের ক্রিয়া-পরিচালক যন্ত্রবিশেষ বলিয়া বরং নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তবে এ পর্য্যন্ত মানুষ যতদূর জানিতে পারিয়াছে, তাহাতে জানিয়াছে যে, মন যদিও মস্তিষ্ক হইতে ভিন্ন; তথাপি মস্তিষ্ক না থাকিলে, মন কখনই ক্রিয়াশীল হইতে পারিত না। সুতরাং মস্তিষ্কের ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে যতই বিপরীত ভাব মনে আসুক, উহাদের পারস্পারিক সম্বন্ধ-সংশ্রব কোনক্রমেই উপেক্ষিত হইবার নহে। জড়বাদের মতে দুই প্রকারে মনের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে; (১) মনের উপাদানের মধ্যে কোনও একটা বিশেষ গুণ বা বস্তু আছে—যাহা মস্তিষ্কের ন্যায় উন্নত অবস্থাপন্ন পদার্থে থাকা সম্ভব; অথবা, (২) যাহা পদার্থ-মাত্রেরই একটা বিশেষ গুণ বা ধর্ম্ম এবং মস্তিষ্কে তাহার স্ফূর্ত্তি। এ মতে, পদার্থের প্রকৃষ্ট পরিণতির বা স্ফূর্ত্তির অবস্থায়ই মানসিক উপাদান সমূহ সঞ্জাত হইয়া থাকে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। যাহার সাহায্যে কোনও কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহার মন বা অনুভব-শক্তি সর্ব্বথা কল্পনায় আসে না। তাহা যদি হইত, জল জমিয়া যে বরফ হয়, তাহাতে জলের অনুভব শক্তি স্বীকার করিতে হইত; উদজান বাষ্প যে দাহিকা-শক্তিসম্পন্ন, তাহা হইলে, তদ্বিষয়ে তাহার জ্ঞান আছে বুঝিতে হয়; যবক্ষারজান বাষ্প অন্যের সহিত মিলিত হইয়া যে ভূত-বিশেষের উৎপত্তি-কার্য্যের সহায় হয়, তাহা হইলে, সেও তাহার মনের কার্য্য—চিন্তার কার্য্য, মানিতে হয়। কিন্তু তাহাই কি সত্য? কখনই নয়! তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে কয়েকটী পদার্থের সম্মিলনে বা স্ফূর্ত্তিতে, মনের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। পদার্থের সমবায়ে যে মনের উৎপত্তি হইতে পারে, এ বিষয়ে অধুনা নানা গবেষণা চলিয়াছে। আধুনিক জড়বাদ বলে,—'প্রতি পদার্থের মধ্যেই সূক্ষ্ম-ভাবে মনের উপাদান-সমূহ বিদ্যমান আছে। অঙ্গার উদ্‌জান প্রভৃতি ভূতসমূহ, সপ্রমাণ হয়, কতক পরিমাণে চিন্তা-শক্তি অনুভব-শক্তি সম্পন্ন। এ মতে, তোমার লিখিবার টেবিলটীর, কলমটীর, কালী-টুকুরও চিন্তাশক্তি আছে। ভূতসমূহ যখন মস্তিষ্করূপ মিশ্র আকারে পরিণত হয়, তখনই মানসিক উপাদানের সৃষ্টি হইয়া থাকে। চিন্তায় এবং অনুভবে তাহারই বিকাশ দেখি।' অধুনা অনেকে এই মতের পরিপোষক। কিন্তু এ পক্ষে প্রমাণ কিছুই আবিষ্কার হয়

নাই। সুতরাং বিশ্বাস-মূলে এ যুক্তির আশ্রয় নাই। মন আর দেহ যে স্বতন্ত্র—এ বিশ্বাস কখনই দূর হইবার নহে। জড়বাদিগণের আর একটী উক্তিতে তাঁহাদের যুক্তির ভিত্তিহীনতা সপ্রমাণ হয়। জড়বাদের স্থূল মর্ম্ম এই যে, জড়বাদিগণ মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং মন যে ভূতসমষ্টির অতীত বস্তু, তাহাও স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, মন ভূতসম্ভব গতিবিশেষ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু আমাদের স্মৃতি-শক্তির বিদ্যমানতা নিবন্ধন জড়বাদের এ সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। আমাদের স্মৃতি আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারে, আমি সেই আমি—দশ বৎসর পূর্ব্বে যে আমার বিদ্যমানতা ছিল। কিন্তু অন্য পক্ষে দেহের প্রতি অংশ এমন কি মস্তিষ্কের প্রতি সূক্ষ্ম উপাদান প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল। পদার্থ-মাত্রই পরিবর্ত্তনের অধীন। যাহা পদার্থের অতীত, তাহাই সৎ, তাহাই অপরিবর্ত্তনীয়। এখানে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের মনের কার্য্য—অনুভূতি—অপরিবর্ত্তনীয়। যখন বুঝিতে পারি, দশ বৎসর পূর্ব্বের 'সেই আমি' আজ 'এই আমিতে' পরিণত, তখন আমার অনুভূতি যে অপরিবর্ত্তিত, তাহা নিশ্চয় সপ্রমাণ হয়। অথচ পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে, মস্তিষ্ক নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের সহিত অপরিবর্ত্তিত নিত্য পদার্থের সম্বন্ধ কদাচ বিহিত হইতে পারে না। একটা বৃক্ষের দৃষ্টান্তে এই ভাবটী হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। দশ বৎসর পূর্ব্বে বৃক্ষটীর যে অবস্থা ছিল, এখন তাহার সে অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। কিন্তু বৃক্ষের এমন কোনই পরিচয় চিহ্ন নাই, যদ্দ্বারা সে বুঝাইতে পারে—'আমি দশ বৎসর পূর্ব্বের সেই বৃক্ষ এই অবস্থায় পরিণত হইয়াছি।' কিন্তু মানুষ তাহা পারে; কেন-না, মানুষের মন আছে, মানুষের স্মৃতি আছে, মানুষের চিন্তাশক্তি আছে, মানুষের অনুভূতি আছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমরা তাহার সাক্ষ্য দিতে পারি। কিন্তু আমাদের দেহে যে অণু-পরমাণু দ্বারা দশ বৎসর পূর্ব্বে সেই কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তাহাদের কেহই এখন সে অবস্থায় বিদ্যমান নাই, পরিবর্ত্তনের প্রবাহে পড়িয়া সকলেই বিক্ষিপ্ত বিচালিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মন এখনও সেইরূপই আছে। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে, মন ও শরীর দুই-ই বিভিন্ন সামগ্রী; মন—ভূতসঙ্ঘের অতীত, দেহ—ভূতসঙ্ঘে বিগঠিত। সংসারের অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থ হইতে মানুষের পার্থক্য এই যে, মানুষের যে মন আছে, অন্যে তাহার অভাব।

মানুষের নৈতিক গুণ-ধর্ম্মের বিষয় বুঝিতে হইলে, তাহার উপাদানভূত কয়েকটী বিষয় বিশেষরূপে বুঝিবার প্রয়োজন হয়। সে বিষয়-কয়টী প্রধানতঃ এই—(১) মানুষের ইচ্ছা-শক্তি আছে; (২) মানুষের কার্য্য-পরম্পরা আংশিক ভাবে তাহার সেই ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, (৩) মানুষের সেই ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন ভাবাপন্ন, (৪) ইচ্ছাশক্তির সে স্বাধীন ভাব মানুষের অপরিজ্ঞাত নহে; (৫) মনুষ্যের কৃতকার্য্য বিষয়ে তাহার দায়িত্ব আছে, (৬) ন্যায়ান্যায় বিষয়ে মানুষের নৈতিক জ্ঞান স্বীকার্য্য, (৭) মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত। প্রধানতঃ এই কয়টী বিষয় বুঝিলে মানুষের নৈতিক গুণধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়। প্রথম,—মানুষের ইচ্ছাশক্তি; মানুষ যে

মানুষের নৈতিক গুণধর্ম্ম।

ইচ্ছা-শক্তি-সম্পন্ন, তাহার চৈতন্য অনুভূতি বা আত্মজ্ঞান দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যায়। মানুষ বেশ অনুভব করিতে পারে যে, তাহার ইচ্ছাশক্তি আছে। সে আরও অনুভব করিতে পারে, যদিও তাহার সে শক্তি তাহার দেহের ও মনের সহিত বিশিষ্টরূপ সম্বন্ধযুক্ত বটে; কিন্তু তাহার দেহ ও মন হইতে স্বতন্ত্র এবং দেহ ও মনের উপর তাহার কার্য্যকারিতা আছে। আমরা আমাদের হস্ত উত্তোলন করিবার বিষয় প্রথমে মনস্থ করি, তাহার পর তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। জ্যামিতির একটী প্রতিজ্ঞা সমাধানে প্রথমে আমাদের ইচ্ছাশক্তি সঙ্কল্পবদ্ধ হয়; তাহার পর তাহা আমরা সমাধান করি। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়,—কি মানসিক কি দৈহিক যে কোনও কার্য্যই সম্পন্ন করি না কেন, সকলেরই মূলে ইচ্ছা-শক্তির প্রভাব আছে। অন্য প্রমাণের অসদ্ভাব বটে; কিন্তু মানুষের চৈতন্য বা আত্মজ্ঞান দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, মানুষের ইচ্ছাশক্তি আছেই আছে। দ্বিতীয়;—মানুষের কার্য্য (এমন কি চিন্তা পর্য্যন্ত) ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। কেন-না, সেই শক্তির দ্বারা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ক্রিয়া হইতে পারে; মনে করিলেই মানুষ আপনার হস্ত উত্তোলনে সমর্থ হয়। ইহার দ্বারাই বুঝা যায়, আপনার কার্য্য নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা মানুষের আছে। সেই ক্ষমতারই নামান্তর—ইচ্ছাশক্তি। এতদ্দ্বারা আমরা অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে, মনুষ্যের ইচ্ছাশক্তি স্বয়ং অঙ্গসঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে কার্য্য করে—শরীরের পেশী-সমূহ; পেশী-সমূহ আবার স্নায়ু দ্বারা পরিচালিত হয়; স্নায়ু সকল আবার মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ গতির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া থাকে। ইচ্ছাশক্তি সেই গতি-ক্রিয়ার পরিচালক বা উপদেষ্টা-স্থানীয়। অর্থাৎ,—ইচ্ছাশক্তি যে উপদেশ দেয়, তদনুসারে বিভিন্ন শক্তির সমবায়ে অভীপ্সিত ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে যে বিতর্ক উপস্থিত না হয়, তাহা নহে। মনে করুন, কেহ আপনার গৃহের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে পাদচারণা করিতেছেন। সেখানে তাঁহার ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অনুভব করিবার কোনও হেতুবাদ নাই। আরও, জড়পদার্থের উপর জড়াতীত পদার্থের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নানা সন্দেহের কথা উঠিয়া থাকে। এ সকল বিষয়ে সহজবোধ্য উত্তর পাওয়া বড়ই কঠিন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনে মানুষের ইচ্ছা, আর তদনুরূপ কার্য্য—এতই সত্বর সংঘটিত হইতে পারে যে, কোন্‌টী পূর্ব্বের ও কোন্‌টী পরের কার্য্য, তাহা নির্দ্ধারণ করাই অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। তাই অনেক সময় সংশয় হয়, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দেহস্থ জড় পদার্থের পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া (হস্ত উত্তোলন প্রভৃতি) সম্পন্ন হইল, অথবা হস্তোত্তোলনাদি-জনিত কার্য্যে মস্তিষ্কাভ্যন্তরে তদুপাদানভূত জড়পদার্থের সঞ্চালন-বশতঃ ইচ্ছাশক্তি সঞ্জাত হইল! এই বিষয়ে দ্বিবিধ প্রশ্নই মনোমধ্যে জাগিতে পারে। হয়—ইচ্ছাশক্তি জড় উপাদানের পরিবর্ত্তনের কারণ, নয়—জড়-উপাদানের পরিবর্ত্তনই সেই শক্তির উৎপত্তির হেতুভূত। এই উভয় যুক্তিই সমান জটিলতাপূর্ণ। জড়াতীত ইচ্ছাশক্তি কেমন করিয়া জড় পরমাণুপুঞ্জের গতি বিধান করিতে পারে এবং সে গতিকে আয়ত্তাধীন রাখিতে সমর্থ হয়, আমরা তাহা কল্পনায় আনিতে পারি না; অপিচ, জড় পরমাণুপুঞ্জের গতি-ক্রিয়া নিবন্ধন কি প্রকারে জড়াতীত ইচ্ছাশক্তির উৎপত্তি হয়, তাহাও কল্পনাতীত। বিষয়টী দুর্ব্বোধ্য হইলেও, ত্রিবিধ কারণে

চিন্তাশক্তিই যে কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা সপ্রমাণ হয়। আমি আমার হস্তোত্তোলন পক্ষে আগে চিন্তা করি, তার পর আমার হস্ত উত্তোলিত হয়। প্রথমে হস্তোত্তোলন, পরে চিন্তা কথনই যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইচ্ছার পর মস্তিষ্কে পরমাণু সঞ্চালন, তার পর স্নায়ু ও পেশীর সাহায্যে ক্রিয়া। সুতরাং চিন্তাশক্তি যে ক্রিয়ার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী, এতদ্দ্বারা তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ক্রমবিকাশবাদের রীতি পদ্ধতির অনুসরণেও ইচ্ছাশক্তির আদিমত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে। ঐ শক্তি যদি জড় পদার্থের ক্রিয়ার ফল হয় এবং তাহার ক্রিয়ার কারণ না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়,—জড় পদার্থের কার্য্য সকল ইচ্ছাশক্তির সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। যদি তাহাই হয়, তাহাতে ইচ্ছাশক্তির বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয় না। কেন-না, ঐ শক্তি কথনও বিকাশ-প্রাপ্ত হয় নাই; এবং যথন উহা জড় পদার্থের উপর কোনরূপ ক্রিয়া-সঞ্চালনে অসমর্থ, তথন উহার অপ্রয়োজনীয়তা অবিসম্বাদিত। যাহা অপ্রয়োজন, তাহার উন্নতি-সাধন ও রক্ষা-বিধান ক্রমবিকাশবাদের রীতিবিগর্হিত। সুতরাং জড় পদার্থ হইতে যে ইচ্ছাশক্তির উৎপত্তি, এ মতে তাহা অপ্রমাণ হয়। শক্তি-সংরক্ষণের (Conservation of Energy) যুক্তি অনুসারেও জড় পদার্থ হইতে ইচ্ছাশক্তির উৎপত্তি পক্ষে বাধা পড়ে। দৈহিক শক্তি সঞ্চালনের প্রক্রিয়া মস্তিষ্কে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত। দৈহিক শক্তি তাহা হইতে সমুৎপন্ন। অর্থাৎ,—জড় পদার্থের ক্রিয়া হইতেই জড় পদার্থের ক্রিয়ার পরিচয় পাই; কিন্তু জড়পদার্থ জড়াতীত ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হইতে পারে না। এবম্বিধ নানা যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারি,—ইচ্ছাশক্তি আদিভূত, ক্রিয়া তাহার অনুসারী। তৃতীয়,—মানুষের ইচ্ছাশক্তি যে স্বাধীন-ভাবাপন্ন, সে বিষয়ে কি যুক্তি আছে, এইবার তাহা আলোচনা করিবার চেষ্টা পাইতেছি। এই বিষয় বুঝিতে গেলে, মনে দুইটী ভাবের উদয় হয়; মানুষের চিন্তাশক্তির স্বাধীনতা মানুষের নিজের আয়ত্তাধীন, অথবা মনুষ্য সে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে বাধ্য? শেষোক্ত প্রশ্নের বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয়, আবশ্যকতা বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দ্বারা মানুষের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হয়; সুতরাং ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে। স্বাধীনতা এবং আবশ্যকতা এই দুই বিষয় যুগপৎ চিন্তা করিলে বেশ প্রতীত হয়, মানুষের ইচ্ছাশক্তি কোনরূপ উদ্দেশ্য বা যুক্তির দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। এথন, যে উদ্দেশ্য বা যুক্তির বিষয় বলিলাম, তাহার উৎপত্তির মূল কি? উহা বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ? অর্থাৎ,—যে উদ্দেশ্য বা যুক্তি ইচ্ছাশক্তির উপর ক্রিয়া করে, তাহা জড়াতীত ইচ্ছাশক্তির বিকাশ, অথবা শারীরউপাদানভূত জড় পদার্থ হইতে উৎপন্ন? আরও, শারীর শক্তি যেরূপ আবশ্যক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমবায়ে কার্য্য সম্পাদন করে, উদ্দেশ্য বা যুক্তিও কি সেইরূপ সমভাবাপন্ন ও শক্তিশালী? অথবা, ইচ্ছাশক্তির সহিত তাহাদের মত-পার্থক্য ঘটিলে ইচ্ছাশক্তিই প্রবল হইয়া উঠে? কাহারও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যথন কোনও পাশবিক বৃত্তির চরিতার্থতার দিকে অগ্রসর হয়, তথন জনহিতসাধন জন্য যে আত্মত্যাগ,—তাহাতে ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য দৃষ্ট হয় না কি? ফলতঃ, একদিকে আবশ্যকতা বা কামনা, অন্যদিকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি—ঘটনা-বিশেষে দুইয়েরই প্রাধান্য বুঝিতে পারা যায়। যদিও ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা স্বতঃপরিদৃষ্ট, তথাপি তদ্বিষয়ে অবিসম্বাদী প্রমাণ পাওয়া

যায় না; পরন্তু বিপরীত যুক্তিবাদেরও প্রাধান্য আছে। তবে সম্ভাব্য দ্বিবিধ যুক্তি দ্বারা ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা সপ্রমাণ হইতে পারে। প্রথম—মানুষের বিবেক—বিশ্বাস। বিবেক মানুষকে বলিতেছে,—মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা আছে। কেন-না, মানুষ ইচ্ছা করিলেই স্বাধীনভাবে আপন হস্ত উত্তোলন করিতে পারে। যে বিশ্বাস মানুষের অস্থিমজ্জায় সহিত গ্রথিত, যে বিশ্বাসের সার্থকতা মানুষের দৈনন্দিন কার্য্যে প্রত্যক্ষীভূত, সে বিশ্বাস অসম্ভব বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা সম্বন্ধে মানুষের যে বিশ্বাস, তাহারও কারণ এবং উদ্দেশ্য লক্ষিত হয়। ক্রমবিকাশবাদের অনুমান সিদ্ধান্ত এই যে, যাহা অসত্য—তাহা বিকাশ-প্রাপ্ত হয় না। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি যদি অসত্য হইত, তাহা হইলে উহা কখনই মনোমধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হইত না। মানুষ যদি শুধুই স্বতঃক্রিয়াশীল যন্ত্রের মত (ঘটিকা যন্ত্রাদির ন্যায়) হইত, তাহা হইলে সে যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন—সে বিশ্বাসে তাহার অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিত না। তাহা হইলে, সে বিশ্বাস সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বিধায় কখনই বিকাশপ্রাপ্ত হইত না। কিন্তু সে বিশ্বাস এখন এতই পূর্ণাবয়বসম্পন্ন যে, উহা মানুষের স্বভাবের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। জগদীশ্বর কেনই বা মানুষকে একটা মিথ্যা বিশ্বাসের বশবর্ত্তী করিয়া রাখিবেন? অতএব, একমাত্র বিবেকের সাহায্যেই প্রতিপন্ন হয়,—মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন। মানুষের বহুদর্শিতা দ্বারাও সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে। মানুষের চরিত্র যে পরিবর্ত্তনশীল, বহুদর্শিতা তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়। পার্থিব অন্যান্য পদার্থের প্রকৃতির সহিত এ বিষয়ে মানুষের স্বাতন্ত্র্য প্রত্যক্ষীভূত। রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যার অনুশীলনে জানিতে পারি,—কোনও পদার্থেরই স্বাধীন শক্তি নাই, প্রত্যেক পদার্থই একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকিয়া একটী কার্য্য করিতেছে। মানুষের চরিত্রের সহিত মনুষ্যেতর প্রাণীর চরিত্রের তুলনা করিলে, মানুষের পরিবর্ত্তনশীল চরিত্রের বিষয় লক্ষ্য করিলে, মানুষে যে স্বাধীন শক্তি আছে, বেশ বুঝিতে পারা যায়। কেহ হয় তো বলিতে পারেন, সমষ্টিভাবে বিচার করিতে গেলে, মনুষ্যের চরিত্র অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে; কেন-না, অনেক মানুষ প্রায়ই এক পথে প্রধাবিত। কিন্তু এ পক্ষে ঐ আপত্তি কার্য্যকরী নহে। মনুষ্যগণ যদিও জন্মজরাবার্দ্ধক্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই পথে প্রধাবিত, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহারা যে প্রাণেন্দ্রিয়বিহীন পদার্থের সহিত সমভাবাপন্ন, তাহা কখনই বুঝা যায় না; ভূতসঙ্ঘের পরমাণু-সমূহ সর্ব্বথা একই ভাবে কার্য্য করে; কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তিতে সে একত্ব দৃষ্ট হয় না। মানুষের বিবেক যাহা জ্ঞাপন করে, মানুষের বহুদর্শিতা তাহারই সমর্থন করিতেছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিতর্কেও মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা উপেক্ষিত হইবার নহে। তবে আর এক পক্ষ আছেন; তাঁহারা বলিতে পারেন,—সৃষ্টির সর্ব্বত্র কার্য্য-কারণে একটা সাম্যভাব আছে; প্রকৃতি-রাজ্যে কোথাও কেহ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না; অতএব, মানুষ যদি স্বাধীনশক্তি-সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে মানুষ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকে না; সুতরাং অলৌকিক সৃষ্টি মধ্যে গণ্য হয়। এক হিসাবে মানুষ অসাধারণ জীবই তো বটে! সৃষ্টিকর্ত্তা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। তিনি যে মানুষকে একটু

অলৌকিক শক্তি না দিতে পারিবেন, তাহাই বা কি করিয়া বলি? যাঁহারা কেবল মাত্র পদার্থবিজ্ঞানালোচনায় জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহারা হয় তো মানুষের মধ্যে স্বাধীন শক্তির বিদ্যমানতা অসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা মানুষের দৈন দিন কার্য্যের বিষয় অনুধাবন করিতেছেন, (অর্থাৎ বিচারক ব্যবহারাজীব রাজনীতিবিৎ প্রভৃতি), তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন—মানুষ কখনই কলের পুতুল নয়, মানুষের মধ্যে স্বাধীন শক্তি নিশ্চয়ই ক্রিয়া করিতেছে। যাঁহারা সে শক্তির বিষয় অনুধাবন করিতে পারেন না, তাঁহাদের সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতে পারি। মনে করুন, একজন রসায়নবিৎ; তৃণ-গুল্ম-উদ্ভিদাদি পরিশূন্য নির্জ্জন দ্বীপে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাণেন্দ্রিয়হীন পদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিষয় অনুশীলন করিতেছিলেন; সহসা তাঁহার নিকট একটী বৃক্ষ উপস্থিত করা হইল। তখন সেই বৃক্ষের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে স্বতঃই বিশৃঙ্খলার ভাব উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু বৃক্ষের রাসায়নিক তত্ত্ব তিনি বুঝিতে না পারিলেও বৃক্ষের অস্তিত্ব অবিসম্বাদিত। এই কারণেই অধুনা রসায়ন-বিদ্যা দুই বিভাগে বিভক্ত,—এক বিভাগে প্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট (Organic) পদার্থের এবং অন্য বিভাগে প্রাণেন্দ্রিয়পরিশূন্য (Inorganic) পদার্থের বিষয়ে গবেষণা চলিয়াছে। দুই গবেষণা-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্নপথানুসারী। বস্তু-তত্ত্ব বিষয়ে যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বিবিধ পন্থার অনুসরণ করে, তখন মানুষের সহিত অন্য পদার্থের প্রকৃতি-প্রক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য না থাকিতে পারিবে কেন? অতএব সিদ্ধান্ত হয়,—এই বিশ্বে যে শক্তির ক্রিয়া চলিয়াছে, সে শক্তি দুই ভাবে ক্রিয়াশীল; এক ভাব মনুষ্যের উপর ক্রিয়া করিতেছে, অন্য ভাব মনুষ্য ভিন্ন অন্যত্র ক্রিয়াশীল। এতদুক্তিতে সৃষ্টিকার্য্যে বিশৃঙ্খলার বিষয় মনে আসিতে পারে; কিন্তু এ পক্ষে প্রমাণের অবধি নাই। স্রষ্টায় সকলই সম্ভব। তিনি মানুষের জন্য এক বিধি এবং অন্যান্যের জন্য অন্য বিধি বিহিত করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অধিকন্তু, তাঁহার সৃষ্টি-কার্য্যে এ বিশৃঙ্খলার ভাবও মন হইতে দূরীভূত হইতে পারে,—যখন বুঝিতে পারি, মানুষের যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, তাহা কখনই খনিজ পদার্থ বা উদ্ভিদ দাবী করিতে পারে না। এ পৃথিবীতে মনুষ্যই তুলনায় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সামগ্রী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং মনুষ্যে যে কিছু অসাধারণ উপাদানের সমাবেশ করিয়াই ঈশ্বর তাহাকে সৃষ্ট করিয়াছেন—তাহা মনে করা যাইতে পারে। আরও এক কথা, প্রাকৃতিক শক্তিকে আমরা যে অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, সে আমাদের বুদ্ধির বা বিচার-শক্তির অনুমান মাত্র। যে অনুমানে আমরা আমাদের স্বাধীনতার বিষয় অনুধাবন করি, সেই অনুমানের বলেই আমরা বিশ্বের সর্ব্বত্র একটা সাম্য-ভাবের লীলা দেখিতে পাই। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান প্রত্যক্ষ ভাবে সূচিত হয়; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান আমরা পরোক্ষভাবে অনুভাবনায় দ্বারা লাভ করি। সকল শক্তিরই আদি—সৃষ্টিকর্ত্তার স্বাধীন ইচ্ছা; সুতরাং যেখানে যে শক্তির ক্রিয়া দেখি না কেন, মূলে সঙ্কল্প বা ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশীল আছেই আছে। শক্তি-সংরক্ষণ রীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, কেহ হয় তো সে স্বাধীন শক্তির বিরুদ্ধে যুক্তির অবতারণা করিতে পারেন; যেহেতু, স্বাধীন ক্রিয়াশক্তির ফলে,

নূতন শক্তির সৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু তাহা শক্তিসংরক্ষণবাদের বিরুদ্ধ। এক পক্ষে এ বিতর্ক অসঙ্গত নহে; কিন্তু আমরা যে অর্থে ইচ্ছাশক্তি শব্দ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছি, তাহার লক্ষ্য—অন্যরূপ; নূতন শক্তি উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও শক্তিকে আয়ত্তাধীন রাখা বা সম্ভবমত ইচ্ছানুরূপ পরিচালন করা,—এবম্বিধ কার্য্যেও ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতার বিষয় অনুভূত হয়। সময় এবং স্থান পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী হৃদগম্য হইতে পারে। মনে করুন, আমি আমার হস্ত উত্তোলন করিব, তাহা এখনও পারি, পরেও পারি। এ বিষয়ে আমার ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার পর, আমি বাম হস্ত উত্তোলন করিতে পারি, আবার ইচ্ছা করিলে দক্ষিণ হস্তও উত্তোলন করিতে পারি। এই হিসাবে, মনুষ্যের অভ্যন্তরে শক্তির একটী গুপ্ত ভাণ্ডার সঞ্চিত আছে মনে করা যাইতে পারে। মানুষের ইচ্ছাশক্তি সেই ভাণ্ডার হইতে কতকটা গ্রহণ করিয়া আবশ্যক কার্য্যে প্রযুক্ত করিতে সমর্থ। এইরূপে বুঝা যায়, মানুষ শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে না বটে, সে বিষয়ে তাহার স্বাধীন-শক্তি নাই সত্য; কিন্তু শক্তির কার্য্য বিষয়ে অর্থাৎ শক্তি-পরিচালনায় তাহার যে সামর্থ্য আছে, তদ্বিষয়ে কোনই দ্বিধা থাকিতে পারে না। অতএব, পূর্ব্বাপর যুক্তি-সমূহ বিচার করিয়া বুঝা গেল,—মানুষের শক্তির স্বাধীনতা আছে, মনুষ্যের বিবেক এবং মনুষ্য-চরিত্রের পরিবর্ত্তনশীলতা এ সিদ্ধান্তের প্রতিপোষক। আরও, মনুষ্যের এই স্বতন্ত্রতা সম্পূর্ণরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ নহে; শক্তি-সংরক্ষণ-বাদের সহিতও ইহাতে কোনও বাধা ঘটে নাই। * মনুষ্যের যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে, প্রতিপন্ন হয়, সে বিষয় মনুষ্য অপরিজ্ঞাত নহে। মানুষ যে জানে—তাহার ইচ্ছা-শক্তি স্বাধীন, ইহাই এ পক্ষের প্রধান প্রমাণ। কোনও একটা কার্য্য মনস্থ করিয়া সম্পন্ন করা অর্থাৎ কার্য্য বিষয়ে কল্পনাকুশলতার পরিচয় দেওয়া প্রভৃতি মনুষ্যের অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। মনুষ্য যে পূর্ব্বে কল্পনা করিয়া পরে সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। মানুষের ভাষায় তাহার স্বাধীনতা-ব্যঞ্জক যে সকল শব্দ দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারাও তাহার স্বাধীনতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। 'আমি ইচ্ছা করি', 'আমি পছন্দ করি', 'আমি আহার করি',—, ইত্যাদি বাক্যে আমার স্বাধীনতার পরিচয়ই প্রাপ্ত হই। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, মানুষ জানে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে।

মনুষ্যের দায়িত্ব ও বিবেকের কর্ত্তৃত্ব।

পঞ্চম,—এইবার মানুষের দায়িত্বের বিষয় মনে আসে। মানুষ যে জানে—মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি সম্পন্ন, তাহাতেই তাহার দায়িত্ব সপ্রমাণ হয়। মানুষের বিবেক এ বিষয়ে প্রধান সাক্ষ্য। এই দায়িত্বজ্ঞান মনুষ্য-জাতির স্বভাবগত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কচিৎ কোনও মনুষ্যে এ জ্ঞানের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে; কিন্তু সমষ্টিভাবে মানবজাতির মধ্যে এ দায়িত্ব-জ্ঞান আছেই আছে। ঈশ্বরের প্রতি কিম্বা কোনও অলৌকিক শক্তির প্রতি মানুষ তাহার প্রথম দায়িত্ব অনুভব করে। সমাজের প্রতি, বিশেষতঃ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাহার দায়িত্বের

* শক্তিসংরক্ষণ বাদ (Conservation of Energy) অনুসারে সিদ্ধান্ত হইয়াছে,—সংসারে নূতন শক্তির সৃষ্টি হয় না। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসারে প্রতিপন্ন হইয়াছে, শক্তি সমভাবেই আছে; বিদ্যুৎ বা

বিষয়ও অনুভূত হয়। প্রথমে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি, পরে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দায়িত্ব-জ্ঞান স্বাভাবিক। বালক যেমন প্রথমে পিতামাতার প্রতি এবং পরিশেষে ভাই-ভগ্নীর প্রতি দায়িত্ব অনুভব করে; তেমনই মানুষের মনে করা উচিত যে, তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের প্রতি তাহার প্রথম দায়িত্ব আছে। তার পর, মানুষ যে সমাজের মধ্যে আছে, সেই সমাজের প্রতি তাহার দায়িত্বের বিষয় স্মরণ করা কর্ত্তব্য। এই জন্যই, ঈশ্বরে পিতৃত্ব বোধ হইলে মনুষ্য-সমাজের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ভাব সঞ্জাত হইয়া থাকে। ষষ্ঠ,—মনুষ্যে সদসৎ নৈতিক-জ্ঞান আছে। উপরোক্ত কারণে তাহা বোধগম্য হইতে পারে। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন বলিয়াই বুঝিতে পারে,—কোন্ কার্য্য সৎ ও কোন্ কার্য্য অসৎ। সদসৎ পাপ-পুণ্য বুঝিতে পারে বলিয়াও মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা সপ্রমাণ হয়। তাহা না হইলে, মানুষের সকল অপকর্ম্মই ঈশ্বরের কৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইত। মানুষ স্বাধীনতা-সম্পন্ন না হইলে, তাহার কার্য্যে বাস্তবপক্ষে পাপের প্রসঙ্গ উঠিতে পারিত না। স্বাধীন-ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে, মানুষকে একটী কলের পুতুল মাত্র মনে করিতে পারিতাম। আর, তাহা হইলে, কি মানুষে কি ঈশ্বরে কাহারও প্রতি পাপের আরোপ সম্ভব হইত না। কারণ, ঘটিকা-যন্ত্র, তাহার নির্ম্মাতায় বর্ত্তিতে পারে—এতাদৃশ পাপ করিতে কখনই সমর্থ নহে। কৃত কার্য্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে যে প্রাণী পার্থক্য বুঝিতে পারে, তাহাকে নীতিবান্ জীব বলিতে পারি। মানুষ যখন সদসৎ ভালমন্দ পার্থক্য বিচার করিতে সমর্থ, তখন মানুষকেই নীতিবান জীব বলা যায়। মানুষের যে নীতিজ্ঞান আছে, মানুষ সদসৎ ভালমন্দ বিচার করিতে পারে বলিয়াই তাহা প্রতিপন্ন হয়। সদসৎ পাপপুণ্য বিষয়ে মানুষ কিরূপ জ্ঞানসম্পন্ন, একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝান যাইতে পারে। আমরা আমাদের দৃষ্টিশক্তির দ্বারা কোন্ বর্ণ পীত, কোন্ বর্ণ লোহিত, কোন্ বর্ণ হরিৎ, তাহা নির্দ্ধারণ করি। যাহারা দৃষ্টিশক্তিহীন নহে, অথবা যাহারা বর্ণ-বিভ্রম-গ্রস্ত নহে, তাহারা সকলেই পূর্ব্বোক্ত বর্ণ-সমূহকে পূর্ব্বোক্ত রূপেই বুঝিতে পারিবে; অর্থাৎ,—লোহিত বর্ণ দেখিয়া কেহ কখনও পীত বর্ণ বলিবে না। যে মানুষে নৈতিক জ্ঞান আছে, তিনিও সেইরূপ অসৎকে সৎ এবং সৎকে অসৎ বলিবেন না। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, মানুষের নৈতিক জ্ঞান আছে। সুতরাং মানুষ সদসৎ পাপপুণ্য অনুধাবন করিতে সর্ব্বথা সমর্থ হয়। অনেক বিষয় মানুষ পরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারে। সুখ-দুঃখ উপকার-অপকার

কেন্দ্রীভূত হওয়ায় তাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই। উত্তাপ—শক্তির প্রকার-বিশেষ। উত্তাপের পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে,—শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি নাই। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চেষ্টার সহরে ডক্টর জুল (Dr. Joule) এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তাঁহার পূর্ব্বেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে, এ বিষয়ে নানারূপ গবেষণা চলিয়াছিল। সেই গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে,—"That the sum of a potential and actual energies of any set of moving bodies cannot be altered by their mutual action." উত্তাপের এবং শক্তির সম্বন্ধ বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ নির্ণয় করেন,—"Heat is one of the forms in which energy becomes known to us....The capacity that a body or system of bodies has for doing work is called energy....There is neither gain nor loss of energy."

প্রভৃতি অনেক সময় তাহার কার্য্যাকার্য্যে নির্ভর করে। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িতে পারে। একবার আগুনে হাত দিয়া কষ্ট পাইয়া তাহা বুঝিয়াছি; তাই দ্বিতীয় বার হাত দিতে পিছাইয়া পড়ি। কিন্তু সদসৎ পাপ-পুণ্য বিষয়ে সেরূপ পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। উহা আমরা আপনিই বুঝিতে পারি। হয় তো কোনও কার্য্যে আমাদের ক্ষতি না হইতে পারে, হয় তো কোনও কার্য্যে আমাদের উপকার না হইতে পারে; কিন্তু সে কার্য্য ন্যায় বা সৎ হওয়া অসম্ভব নয়। শত পরীক্ষায় কোনও ফল নাই; কিন্তু একমাত্র বিশ্বাস আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারে—কোন্‌টী সৎ, কোন্‌টী অসৎ। এই-রূপে উপলব্ধি হয়, মানুষের নৈতিক জ্ঞান আছে। যে বুদ্ধি বা বিচার দ্বারা মানুষের নৈতিক-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অমান্য করিলে সকল বিজ্ঞানের শেষ হইয়া আসে। সপ্তম,—এইবার মানুষের বিবেক বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। কেহ কেহ নৈতিক জ্ঞানের সহিত বিবেকের অভিন্নত্ব অনুভব করিতে গিয়া, বিভ্রান্ত হন। কিন্তু বিবেক ও নৈতিক জ্ঞান দুই-ই বিভিন্ন বস্তু। মানুষের হয় তো নৈতিক-জ্ঞান থাকিতে পারে; মানুষ হয় তো ভাল-মন্দ ন্যায়ান্যায় বিভাগ করিতে পারে; কিন্তু সে যে কোন্ বিভাগের কার্য্য করিতেছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতা অসম্ভব নহে। জটিল সমস্যায় যুক্তির এক দিক অনুসরণ করিয়া আমরা চলিয়া থাকি। তাহাতে সুফল ফলিলেও ফলিতে পারে, কুফল ফলিলেও ফলিতে পারে। কিন্তু সকলের উপরে এক অপার্থিব সামগ্রী আছে,—যাহা সকল অবস্থায় আমাদিগকে ভাল-মন্দ উভয় পথেরই পার্থক্য বুঝাইয়া দিতে পারে। তাহার নিকট বিচার নাই, যুক্তি নাই; সে ভালমন্দের স্বরূপ-তত্ত্ব মাত্র প্রকাশ করে। সে বস্তু—বিবেক। বিবেক যেন নৈতিক-জ্ঞানে যন্ত্র-স্থানীয়। দৃষ্টির যন্ত্র যেমন আমাদের নয়ন-যুগল, ইহাও সেইরূপ। চক্ষু যেমন বুঝিতে পারে—কোন্ বর্ণ লোহিত বা কোন্ বর্ণ হরিৎ; সেইরূপ আমাদের বিবেক বুঝিতে পারে—কোন্‌টী ভাল কাজ, কোন্‌টী মন্দ কাজ। সদসৎ কার্য্য-বিষয়ে বিবেকের অনুভূতি নিমেষ মধ্যে সম্পন্ন হয়; অপিচ, তাহার সে সিদ্ধান্তে সে যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। আমাদের নেত্রদ্বয় যেমন শ্বেত-পীত প্রভৃতি বর্ণ অনুধাবন করে, অথচ বর্ণ প্রস্তুত বিষয়ে চক্ষুর যেমন কোনই কার্য্যকারিতা নাই; সদসৎ ন্যায়ান্যায় কার্য্যের সহিত বিবেকেরও সেইরূপ সম্বন্ধ; বিবেক কেবল বলিয়া দেয়—কোন্‌টী সৎ, কোন্‌টী অসৎ;—সদসৎ কার্য্যকারিতার সহিত বিবেকের কোনই সম্বন্ধ নাই। সকল কালে, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে এবং ধনী দরিদ্র যুবক বৃদ্ধ শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মধ্যেই বিবেক ক্রিয়া করিতেছে। বিবেক আমাদের ইচ্ছাশক্তির অধীন নহে এবং আমাদের পরিচালনাধীনও নহে। আমরা তাহাকে সংশোধন করি না, কিন্তু সে আমাদিগকে সংশোধন করে। আবার, ন্যায়ান্যায় সদসৎ কার্য্য বিভাগ করিয়া দিয়াই সে নিশ্চিন্ত নহে। পরন্তু সৎকার্য্যের পোষকতা ও অসৎ কার্য্যের অননুমোদন জন্য তাহার সুপ্রতিষ্ঠা। অন্যায় কার্য্যের পর মানুষের মনে যে অনুশোচনার উদয় হয়, তাহা বিবেকেরই কার্য্যের ফল। এ অনুশোচনা—এ অনুভূতি মনুষ্য-মাত্রেরই প্রাণে পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে বুঝিতে পারি, মানুষ স্বাধীন ও দায়িত্বপূর্ণ জীব।

প্রাণিবিশেষের সহিত মানুষের সাদৃশ্য তত্ত্ব অনুধাবন করিয়া, কেহ কেহ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বিষয়ে সন্দিহান হন। ক্রমবিকাশবাদিগণ যে মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে তাহার আদি-অবস্থার বিকাশপ্রাপ্তির মত পরিপোষণ করেন, এ বিতর্কের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই বলিলেও চলিতে পারে। বিশেষতঃ, বানরের সহিত মানুষের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সম্বন্ধ-সূত্রের নিদর্শন যখন অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন নাই, তখন উভয় শ্রেণীর পারস্পারিক সম্বন্ধ সপ্রমাণ হয় নাই বলিয়াই বিশ্বাস করি। প্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণি-পর্য্যায়ের বীজ যে স্বতন্ত্র, সকলেরই ক্রমবিকাশের ধারা যে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে, সেই বিষয়েই প্রবল যুক্তি অনুভূত হয়। হইতে পারে, উচ্চ শ্রেণীর প্রাণিপর্য্যায়ে জ্ঞানের প্রাথমিক স্তর সঞ্চিত আছে; কিন্তু তাহা হইলেও মানুষের জ্ঞানের সহিত তুলনায় সে জ্ঞানের পার্থক্য আকাশ পাতাল। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে যে নৈতিক চরিত্রের অভাব পাওয়া যায়, তাহা মনে হয় না। অবশ্য এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বড় সীমাবদ্ধ। যখন আমরা জীবজন্তুর ভাষা অবগত নহি, তখন তাহাদের জ্ঞান মনুষ্যের জ্ঞানের সহিত কতদূর সাদৃশ্যসম্পন্ন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তথাপি কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করিতেছি, তদ্দ্বারা মনুষ্যের সহিত মনুষ্যেতর প্রাণীর পার্থক্য অনুভূত হইবে। প্রাণি-পর্য্যায়ের উচ্চ স্তরে—বানর, ঘোটক, কুকুর প্রভৃতির মধ্যে—স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া কতক পরিমাণে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। স্বতঃক্রিয়াশীল যন্ত্রাদির ন্যায় (ঘটিকা যন্ত্রাদির ন্যায়) ঐ সকল জীব সর্ব্বথা একই নিয়মে কার্য্য করে বটে; কিন্তু তাহাদের কোনও কোনও কার্য্যে সামান্য কল্পনা-কুশলতার সুতরাং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির নিদর্শন দেখিতে পাই। কেবল প্রাণী মাত্রে নহে; উদ্ভিদাদির মধ্যেও কতকটা স্বাধীন ভাব লক্ষ্য হয়। পরিবর্ত্তন-প্রক্রিয়া অল্পাধিক সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান। পরিবর্ত্তন যেন সার্ব্বভৌম রীতি। অরণ্যের বৃক্ষ দুইটী সর্ব্বথা অভিন্ন নয়; একই বৃক্ষের দুইটী পত্র সর্ব্বতোভাবে সাদৃশ্যসম্পন্ন দেখিতে পাই না। এই পরিবর্ত্তনের উপরই ক্রমবিকাশবাদের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত। এবম্বিধ পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া প্রাণেন্দ্রিয়পরিশূন্য পদার্থে পরিদৃষ্ট হয় না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural Selection) বাক্য সেই জন্য প্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট পদার্থ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কেন-না, প্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট পদার্থ-মাত্রেরই নির্ব্বাচন-শক্তি অর্থাৎ স্বাধীন মনোনয়ন ক্ষমতা আছে। অতএব বেশ বুঝিতে পারা যায়, সকলের মধ্যে এক অজ্ঞেয় শক্তির ক্রিয়া আছে,—যে ক্রিয়ার ফলে আমরা মৃতের ও জীবিতের—জড়ের ও চৈতন্যের—পার্থক্য অনুভব করিতে পারি। সেই অজ্ঞেয় শক্তি—স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। ফলতঃ, অল্পাধিক পরিমাণে প্রাণিপর্য্যায়ের উচ্চ স্তরে যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির লীলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বলাই বাহুল্য। কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হইলেও, মনুষ্যেতর প্রাণিগণের যে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, তাহা সপ্রমাণ হইতে পারে। উপমার ছলে, মানুষের ভাষায়, মনুষ্যেতর প্রাণীর জ্ঞান আছে বলিয়া থাকি বটে; কিন্তু সে জ্ঞান অন্য প্রকার। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বিষয়ে মানুষ যে অভিজ্ঞ, কেবলমাত্র তাহার চৈতন্যের বা জ্ঞানের

প্রাণিপর্য্যায়ের তুলনায় মনুষ্য।

দ্বারা সে সত্য প্রতিষ্ঠিত নহে; পরন্তু তাহার কার্য্যের দ্বারাও সে সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। মানুষে যে কল্পনা-কুশলতা আছে, মানুষ যে ভবিষ্যতের ফলাফল বুঝিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ; অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে এ সাদৃশ্য দেখিতে পাই না। যদিও উচ্চ স্তরের কোনও কোনও প্রাণী বিষয়-বিশেষে অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়, সে অভিজ্ঞতা বা কল্পনা-কুশলতা তাহাদের নিজস্ব নয়। তাহাদের সেই যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা সংস্কার, তাহার মধ্যে এক অজ্ঞাত শক্তির কল্পনা-লীলা অনুভূত হয়। ফলতঃ, ভবিষ্য ফলাফল বিষয়ে অভিজ্ঞতামূলক কার্য্য মনুষ্যেতর প্রাণীর দ্বারা সুসাধ্য নহে। কয়েকটী দৃষ্টান্তের আলোচনায় বিষয়টী বোধগম্য হইতে পারে। উচ্চ স্তরের প্রাণীর মধ্যে, যে জ্ঞান বা বুদ্ধি দেখিতে পাই, নিম্ন স্তরের প্রাণিপর্য্যায়ের মধ্যে সে জ্ঞান বা বুদ্ধি ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ভবিষ্য কার্য্যফল সম্বন্ধে প্রাণিপর্য্যায়ে যদি কিছু অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই, স্তরক্রমে সে অভিজ্ঞতারও হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। মানুষের অভিজ্ঞতার সহিত তুলনায় অন্য শ্রেষ্ঠ প্রাণীর অভিজ্ঞতায় অশেষ পার্থক্য। কার্য্যবিশেষে মনুষ্যেতর প্রাণীর যে কল্পনা-কুশলতা দৃষ্ট হয়, তাহা একান্তই সীমাবদ্ধ। কোনও কোনও পক্ষী কুলায়-নির্ম্মাণে অত্যাশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারে; কিন্তু অপর কোনও কারুকার্য্যে তাহার প্রতিভা পরিদৃষ্ট হয় না। মধুমক্ষিকা মধুচক্র-রচনায় ক্ষেত্র-বিজ্ঞানের একাংশের পূর্ণ-জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারে; গণিত-বিজ্ঞানের যে নিয়মানুসারে অত্যল্প উপাদানে অত্যধিক স্থান বেষ্টন করা সম্ভবপর, মধুমক্ষিকার মধুচক্র-রচনার প্রক্রিয়া-পদ্ধতি দেখিলে, তাহারা যেন সেই গণিত-জ্ঞানে জ্ঞানী ছিল—এমনই মনে হয়। কিন্তু সে—সেই একই কার্য্যে! ক্ষেত্রতত্ত্ব বিষয়ক তাহাদের সে জ্ঞান—মধুচক্র রচনা ভিন্ন অন্য কার্য্যে প্রত্যক্ষীভূত নহে। উর্ণনাভ লূতাতন্তুজালে অলৌকিক সূক্ষ্ম শিল্পের পরিচয় দেয়; কিন্তু লূতাতন্তু ভিন্ন অন্যত্র তাহার সে শিল্প-কৌশল দৃষ্ট হয় না। বিশেষ বিশেষ প্রাণী, বিশেষ বিশেষ কার্য্যে কৃতিত্ব-কৌশল প্রদর্শন করে বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না। যে জ্ঞানবশে প্রাণিগণ বিশেষ বিশেষ কার্য্যে কল্পনা-কৌশল প্রদর্শন করে, সে তাহাদের 'স্বাভাবিক' জ্ঞান; সে জ্ঞান—তাহারা কোনও কল্পনা কুশল অজ্ঞাত শক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি। কোনও কোনও প্রাণীর বিশেষ বিশেষ কার্য্য দেখিয়া তাহাদিগকে সুচতুর সুবুদ্ধিমান বলিয়া মনে হয়; কিন্তু আবার তাহাদিগের কার্য্য-বিশেষ দেখিয়া তাহাদের সে বুদ্ধির নিষ্ফলতা বুঝিতে পারি। যে মধুমক্ষিকা এমন গণিত-জ্ঞানের পরিচয় দিয়া মধুচক্র রচনা করে, সে মধুমক্ষিকা আপনার চক্র অন্বেষণে অনেক সময় উদ্ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেকে হয় তো প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, যে বাতায়ন-পথে মক্ষিকা বহির্গমন করিয়াছিল, সে বাতায়ন অনবরুদ্ধ সত্ত্বেও অবরুদ্ধ অন্য বাতায়ন-পথে প্রবেশ-পক্ষে সে শুধুই প্রয়াস পাইতেছে। তার পর জন্মজন্মান্তরেও তাহাদের জ্ঞান যে কোনরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। মধুমক্ষিকা আদিকালে যে মধুচক্র রচনা করিয়াছিল, অধুনা মধুচক্র নির্ম্মাণে তাহার অধিক কোনই কৌশল দেখাইতে পারিতেছে না। সহস্র বৎসর পূর্ব্বের মধুচক্রে এবং এখনকার মধুচক্রে

কোনই পার্থক্য প্রতিপন্ন হয় না। ফলতঃ, বহুদর্শিতাজনিত কোনরূপ অভিজ্ঞতার পরিচয় মধুমক্ষিকার কার্য্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মধুচক্র-নির্ম্মাণে উন্নতির পরিচায়ক বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন-সাধনে আজিও সে সমর্থ নহে। মধুমক্ষিকার প্রসঙ্গ মাত্র উত্থাপন করিলাম। মনুষ্যেতর যে কোনও প্রাণীর সম্পর্কেই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। কিন্তু সে তুলনায় মনুষ্য এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন-ভাবাপন্ন। আপনার পূর্ব্বকৃত কার্য্যের উন্নতি-সাধনে মনুষ্যের সাফল্য পদে পদে পরিদৃষ্ট হয়। এই হিসাবে মনুষ্যেতর প্রাণিগণকে উৎপাদনকারী মাত্র এবং মনুষ্যকে ভবিষ্য-ফলাভিজ্ঞ কল্পনা-কুশল কর্ম্মকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। অন্যান্য প্রাণিগণ জন্মকালীন প্রাপ্ত জ্ঞান লইয়া কার্য্য করে, তাহাদের সে জ্ঞানের নূতন স্ফূর্ত্তি নাই; কিন্তু মানুষ সে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি-সাধনে সমর্থ। সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার যে ভবিষ্য অভিজ্ঞতার নিদর্শন রাখিয়াছেন, বিশেষ বিশেষ প্রাণীর বিশেষ বিশেষ জ্ঞানে তাঁহার সেই কারু-কৌশলের পরিচয়ই প্রাপ্ত হই। বানর কুকুর ঘোটক প্রভৃতি উচ্চ স্তরের জীবজন্তুগণ অনেক সময় অনেক বুদ্ধির ও কৌশলের পরিচয় দেয়। রঙ্গালয়ে (সার্কাসে) উহাদের যে ক্রীড়া-কৌশল পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে উহাদিগকে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালী এবং ভবিষ্য-ফলাভিজ্ঞ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা উহাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হয় না; কেন না, ক্রীড়াকর যেরূপ ভাবে উহাদিগকে শিক্ষাদান করে, উহারা সেই রূপ ভাবেই কার্য্য করিয়া থাকে মাত্র। কর্ম্মফলের অভিজ্ঞতা বা অভিনব উদ্ভাবনা-শক্তির বিকাশ মনুষ্যেতর প্রাণিপর্য্যায়ের মধ্যে কোথাও দৃষ্ট হয় না। অতএব প্রাণিগণের মধ্যে কথঞ্চিৎ ইচ্ছাশক্তির বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হইলেও তাহা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নয়, এবং সে ইচ্ছাশক্তিকে তাহারা স্বাধীন শক্তি বলিয়া জানে না। যাহারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিতে পারে না, তাহাদের দায়িত্বজ্ঞান নাই; সদসৎ ভাল মন্দ কার্য্য বিষয়েও তাহারা দায়ী নহে। মানুষের কতকটা স্বাধীনতা জ্ঞান আছে; সে তাহার আপন দায়িত্ব অনুভব করিতে পারে। পশ্বাদির দায়িত্ব-অনুভব শক্তি নাই; তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিরও অভাব। কেহ হয় তো এ স্থলে বলিতে পারেন, কুকুর বা বানর প্রভৃতিকে তাহাদের কোনও দুষ্কর্ম্মের জন্য প্রহার করিলে, অনেক সময়ে তাহাদের তাহা স্মরণ থাকে, ইহাতে তাহাদের দায়িত্ব-জ্ঞান সপ্রমাণ হয়। কিন্তু এ যুক্তি অন্যবিধ; প্রহারের দরুণ, বেদনা নিবারণ উদ্দেশ্যে, তাহারা যে কার্য্য করে বা যে কার্য্য সম্পাদনে বিরত হয়, তাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক দায়িত্বজ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরাও তাই, পশ্বাদির কার্য্যে তাহারা যে পাপভাগী হয়, তাহা বিশ্বাস করি না। ফলতঃ, মনুষ্যের নৈতিক-জ্ঞান হেতু পশ্বাদি হইতে মনুষ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিপন্ন হয়। আরও, আমরা যদিও বলি, কুকুর বা বানর জাতীয় জীব কতক অংশে ভবিষ্য ফল বিষয়ে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বা কল্পনা-কুশল; কিন্তু তদ্দ্বারা সমস্যা নিরসন হয় না। কেন-না, মৎস্যাদি নিম্নতর ও নিম্নতম শ্রেণীর জীবে সে চিহ্ন আদৌ লক্ষিত হয় না। উদ্ভিদ-পর্য্যায়ে সে শক্তির একান্ত অভাব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং কর্ম্মফলে ভবিষ্য অভিজ্ঞতা মনুষ্যে যাহা কিছু দেখিতে পাই, অন্যত্র তাহা বিরল।

মনুষ্যেতর জীব-জন্তুর স্বাধীন জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা ঘটিলেও, মনুষ্যের সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অস্বীকার করা অযৌক্তিক। পশ্বাদির জীবনে কোন অবস্থায় কি ভাবে দর্শন শ্রবণ ও স্মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া আবদ্ধ হইয়াছে, তাহা জানিতে পারি না বলিয়া, আমাদের শ্রবণ দর্শন স্মরণাদির ক্রিয়াব বিষয় উড়াইয়া দেওয়া যায় কি? তাহাদের ঐ সকল ক্রিয়া অদৃশ্য অপ্রামাণ্য, আর আমাদের উহা পরিদৃষ্ট প্রমাণিত। সুতরাং মানুষের স্বাধীন জ্ঞান স্বাধীন চিন্তার বিষয়ই স্বীকার করিতে হয়। মনুষ্যেতর প্রাণীর সে জ্ঞান সে চিন্তা স্বীকার করিতে পারা যায় না।

এবম্বিধ আলোচনায় আমরা মনুষ্য সম্বন্ধে কয়েকটি নিগূঢ় তত্ত্বকথা অবগত হই। শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক প্রকৃতিতে মনুষ্য অন্য সকল প্রাণী হইতে স্বতন্ত্র। তাহার সে স্বাতন্ত্র্যের বহু কারণ পরিদৃশ্যমান্। অন্য প্রাণীর সহিত তুলনায় মানুষের দেহ বলিষ্ঠ না হইতে পারে; কিন্তু বুদ্ধিশক্তি ক্ষীণ হওয়া সম্ভবপর নহে। আবার মানুষ হয় তো বহু-পরিমাণে বুদ্ধিজীবী হইতে পারে; কিন্তু তাহার নৈতিক-চরিত্র হীন হওয়া অসম্ভব নহে। এই সকল কারণে মনে হয়, মানুষের প্রকৃতি ত্রিধা বিভক্ত; আর তাহার সেই ত্রিবিধা প্রকৃতির উপাদান—তাহার শরীর, মন ও আত্মা। মনকে মানসিক জ্ঞানের বা যুক্তির অংশ, এবং আত্মাকে স্বাধীন নীতিপরায়ণতার অংশ বলা যাইতে পারে। মনুষ্যের দেহ এবং মন অনেকাংশে তাহার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বা আত্মার অধীন। সেই জন্য শেষোক্ত অংশকে বিশুদ্ধ আত্মা বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রকৃত পক্ষে আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদির অন্তর্ভুক্ত নহে। উহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-সম্পন্ন; মনের এবং শরীরের যন্ত্রাদির দ্বারা উহার অভিপ্রেত কার্য্য সাধিত হয়। শরীর এবং মন উভয়েই—আত্মার; কিন্তু উভয়ের কাহারও দ্বারা আত্মা ব্যবস্থাপিত নহে। আত্মাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব; স্বাধীন আত্মাই আপন স্বাধীন-শক্তির বিষয় অবগত। সেই আত্মাই সকলের পরিচালক।

মনুষ্যই সৃষ্টির চরম বিকাশ।

এইবার দেখা যাউক, মনুষ্য ও মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আমরা যাহা কিছু বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে কি বুঝিতে পারিলাম? বুঝিলাম—মনুষ্য একটী স্বাধীন প্রাণী; বুঝিলাম—প্রাকৃতিক শক্তি-লীলা হইতে মনুষ্যের স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্য আছে; বুঝিলাম—মনুষ্য অসাধারণ অলৌকিক জীব; বুঝিলাম—মনুষ্য দায়িত্বপূর্ণ প্রাণী, আর তাহার স্বাধীনতা বিষয়ে তাহার জ্ঞান আছে বলিয়াই তাহার সে দায়িত্ব। সেইজন্য অন্যান্য জন্তু হইতে মনুষ্যের পার্থক্য। সংক্ষেপে বলিতে হইলে এ বিষয়ে এই বলিতে পারা যায় যে, স্বাধীনতা আছে বলিয়াই চেতনাশূন্য পদার্থ হইতে এবং দায়িত্ব আছে বলিয়াই অন্যান্য প্রাণী হইতে মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য সপ্রমাণ হয়। মনুষ্য তাই প্রাণিপর্য্যায়ে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। পৃথিবীর মধ্যে তাহার সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন দ্বিতীয় জীব আর বিদ্যমান নাই। স্বাধীনতা বিষয়ে তাহার যে জ্ঞান, তাহাই উপাদানভূত হইয়া, তাহাকে তাহার কৃত কার্য্যে তাহার কল্পনা-কুশলতা প্রমাণ করিতেছে। এই সকল কারণে,* একমাত্র মানুষের সহিতই ঈশ্বরের সাদৃশ্য সূচিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের অত্যাশ্চর্য্য গুণ-ধর্ম্মের বিষয় অনুধাবন করিলে বেশ প্রতীত হয়, মানুষই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পৎ। ক্রমবিকাশের ধারা অনুসারে যদি প্রাণেন্দ্রিয়-

বিশিষ্ট পদার্থের পরিণতির ফলে মানুষের উদ্ভব হওয়াই সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে, কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তেমন পার্থক্য-বিশিষ্ট পর্য্যায় হইতে এমন জ্ঞান-সম্পন্ন মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে! আর, তাহা হইলে আরও বলিতে হয়, প্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট পদার্থের ক্রমবিকাশের সীমা মনুষ্যে আসিয়া কেমন পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে! কেবল যে প্রাণি-পর্য্যায়েরই পূর্ণ বিকাশ এই মানুষে, তাহা নহে; সকল পর্য্যায়েরই পরিসমাপ্তি মনুষ্যে ঘটিয়াছে। কেন-না, মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী এই পৃথিবীতে কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই, ভবিষ্যতেও জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। অপিচ, যে কারণে মনুষ্যে সৃষ্টির বিকাশ ঘটিয়াছে, সে কারণের অবসান দেখিতে পাই; যেহেতু, মনুষ্যকে প্রাণিপর্য্যায়ের আর কোনও উচ্চ স্তরে লইয়া যাইবার প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের গবেষণাই অধুনা এই সিদ্ধান্তে উপনীত। তাঁহারা বলেন,—মানুষ যখন অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করিল, তখনই তাহার হস্তের ক্রমবিকাশ-গতি রুদ্ধ হইয়া আসিল; তাহার পর যখন তাহারা বস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা করিল, জল-বায়ুর প্রকোপ সহ্য করিবার জন্য দেহের যে দৃঢ়তার ও শক্তিমত্তার আবশ্যক ছিল, সে আবশ্যকতারও অন্তর্দ্ধান ঘটিল; পরিশেষে মানুষ যখন অস্ত্র-ব্যবহারে ও যন্ত্রাদি আবিষ্কারে সমর্থ হইল, তাহার শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যের আর আবশ্যকতাই রহিল না,—দৈহিক বলবৃদ্ধিতে তাহার আর কি ফললাভ সম্ভবপর! ক্রমবিকাশের ক্রিয়া যখন চিত্তের প্রতি ন্যস্ত হয়, তখন দৈহিক পুষ্টিসাধন ক্রিয়া শেষ হইয়া আসে। সুতরাং বুঝা যায়, আর অন্য প্রাণিপর্য্যায়ে মানুষকে বিকাশ পাইতে হইবে না; মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি সাধনের দ্বারা এই মানুষেই বিকাশের পূর্ণতা সাধিত হইবে। আর দৈহিক উন্নতির আবশ্যক নাই; মানসিক উন্নতিই মানুষকে পূর্ণতার পথে লইয়া যাইবে।

* . *

(৩) মনুষ্যের মঙ্গল-সাধনে জগদীশ্বরের প্রযত্ন।

[মনুষ্যের কল্যাণ-সাধনে জগদীশ্বরের প্রয়াস,—তাঁহাতে নিষ্ঠুরতার আরোপ অযৌক্তিক;—জগদীশ্বরের করুণার বিরুদ্ধে বিতর্ক,—তাহাতে মনুষ্যকে তিনি অলৌকিক অসামান্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সপ্রমাণ হয়;—জগদীশ্বরের করুণার নিদর্শন,—যন্ত্রণার বা দুঃখের বোধাবোধে;—মানুষের দুঃখ ও কারণ,—মানুষের দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষ নিজে;—মানুষের দুঃখনাশে জগদীশ্বরের প্রযত্ন,—তাঁহার করুণার অপার নিদর্শন।]

মানুষের চরিত্রের আলোচনায় মনুষ্যের যেমন কতকগুলি বিশেষ গুণ-ধর্ম্মের পরিচয় পাই; ঈশ্বরের চরিত্র অনুসন্ধানে, ঈশ্বরের সেইরূপ কতকগুলি গুণ-ধর্ম্মের পরিচয় পাইতে পারি না কি? আর সে অনুসন্ধানে, মনুষ্যের মঙ্গল-সাধনে তাঁহার প্রযত্ন সপ্রমাণ হয় না কি? মানুষের গুণ-ধর্ম্মের বিষয় বিবেচনা করিলে, তদ্রূপ গুণ-ধর্ম্মবিশিষ্ট শক্তি হইতেই যে মানুষ সঞ্জাত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে। স্বাধীন শক্তির প্রভাবে স্বাধীন-শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। স্বভাবজাত শক্তি—অন্ধ শক্তি—কোনও স্বাধীন শক্তির সৃষ্টিকারী বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেই আদি স্বাধীন-শক্তি হইতেই মনুষ্য স্বাধীন শক্তি লাভ করিয়াছে, প্রতি-

কল্যাণ-সাধনে জগদীশ্বরের প্রয়াস।

শীর হয়। মানুষের স্বাধীন শক্তি আছে, সে আপনার স্বাধীনতার বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সেই অভিজ্ঞতার জন্যই তাহার নীতি-জ্ঞান। নীতিজ্ঞান বশতঃই সদসৎ ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। মানুষের স্বাধীন শক্তির ফলে মানুষ যে সদসৎ-জ্ঞানসম্পন্ন নৈতিক জীব বলিয়া পরিগণিত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি। সুতরাং, সেই মানুষের দৃষ্টান্তেই প্রতিপন্ন হয়,—সৃষ্টিকর্ত্তা যখন স্বাধীন-শক্তিসম্পন্ন, তখন তাঁহার মধ্যেও সদসৎ ভালমন্দ নৈতিক জ্ঞান বিদ্যমান আছে। যাহার যাহা নাই, সে তাহা অন্যকে দিতে পারে না। অতএব, মনুষ্যের যে গুণধর্ম্ম আছে, ঈশ্বরেও সে গুণ-ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সদসৎ জ্ঞান কখনই দৈহিক ও মানসিক শক্তিসঞ্জাত নহে। সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা হইতেই সেই গুণ মানুষে সঞ্চারিত হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা স্বাধীন-জ্ঞানের, নৈতিক জ্ঞানের—সকল জ্ঞানের কেন্দ্র-স্বরূপ। এই দৃষ্টান্ত আমাদের বিবেক দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়। বিবেক যদিও ভাল-মন্দ কোনও কার্য্য স্বয়ং করে না, কিন্তু কোন্ কাজ ভাল, কোন্ কাজ মন্দ, সে আমাদিগকে তাহা বলিয়া দেয়। সে যেন মধ্যস্থ-স্থানীয়। যাঁহা হইতে আমরা বিবেক পাইয়াছি, বিবেক যেন তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ-রক্ষার সূত্রস্বরূপ; সে যেন মধ্যস্থ রূপে ব্যবধানের মধ্যে দণ্ডায়মান আছে। তাই মনে হয়, বিবেক যেন ঈশ্বরের বাণী। সে আমাদিগকে যখন সৎকার্য্যে উৎসাহিত করে, তখন মনে হয়,—যেন ভগবানই বিবেক-বাণী-রূপে আমাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন। এইরূপে বুঝা যায়, আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা সদসৎ কার্য্যের নির্দ্দেশ-কর্ত্তারূপে নীতিপরায়ণ প্রাণীর আদর্শ স্থানে অধিষ্ঠিত আছেন। যখন তাঁহাতে ব্যক্তিত্বের ও নীতিপরায়ণতার আরোপ করি, তখন তিনি যে সৃষ্ট প্রাণীর কল্যাণ-কামনায় অনুপ্রাণিত আছেন, তাহা অবশ্যই প্রতিপন্ন হয়। প্রমাণ-পরম্পরা কত দিকে কত মতে প্রত্যক্ষীভূত, কে তাহার পরিমাণ করিতে পারে? সৃষ্টি সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তার একটা স্বাভাবিক যত্নের বিষয় স্বতঃই মনে আসে। মনুষ্যকে তিনি যখন আপনার ঐ গুণধর্ম্ম প্রদান করিয়া প্রাণিপর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, তখন তাহাদের প্রতি তাঁহার করুণার বিষয়ই মনে আসে। সংসারের যেটী শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, সেইটীর প্রতিই মানুষের মমতাধিক্য দৃষ্ট হয়। এ দৃষ্টিতে বিচার করিলেও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের প্রতি জগদীশ্বরের করুণাধিক্য আপনা-আপনি বুঝিতে পারি। সকল সৃষ্টপদার্থে, বিশেষতঃ মনুষ্যে, তাঁহার করুণার অশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলেই বিষয়টী বোধগম্য হইবে। পূর্ব্বে যে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের নির্ম্মাণ-কৌশলের বিষয় বিবৃত করিয়াছি, মনে করিয়া দেখুন দেখি, সে কৌশল কাহার মঙ্গলের বা আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য? জীব-দেহে ইন্দ্রিয়াদির সমাবেশ—তাহাদেরই সুখসাধক নহে কি? মনুষ্যের নয়নযুগল প্রকৃতির চারু-চিত্র দর্শন করিবে; মনুষ্য রসনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অমৃত-মধুর রস আস্বাদন করিবে, তাহার কর্ণ-কুহরে সুস্বর-লহরী লীলা করিবে, তাহার স্পর্শনেন্দ্রিয়ে সে কত সুখস্পর্শ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবে! এতাদৃশ সুখসাধক দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা যিনি মনুষ্যকে এবং প্রাণিসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার করুণার নিদর্শন কি আর অনুসন্ধান করিবার

আবশ্যক হয়? কূটতার্কিক এবম্বিধ পরিদৃশ্যমান করুণার বিষয়েও সন্দিহান হইয়া বিতর্ক উপস্থিত করে; বলে যে,—'তিনি যখন চক্ষু দুইটী দিলেন, তাহার অসম্পূর্ণতা রাখিলেন কেন? কেন সম্মুখে পশ্চাতে—দুই দিকে চক্ষু বিন্যস্ত করিলেন না? কেন দিবায় নিশায়—সর্ব্বক্ষণ সমদৃষ্টি রহিল না? কেন পীড়ায় বা দুর্ঘটনায় চক্ষুহানি ঘটে?' স্রষ্টার সৃষ্টিকার্য্যে ত্রুটি বটে! পাশ্চাত্যে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়,—'যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহাদের ক্ষয় ও ভঙ্গ প্রবণতা অবশ্যম্ভাবী। ঘটিকা-যন্ত্র নির্ম্মাতা যতই সন্তর্পণে উহা নির্ম্মাণ করুন, উহার অংশবিশেষের কার্য্যকারিতার অপচয় অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বরের সৃষ্ট কোমল কারু-কৌশল সেইরূপ ব্যর্থ হইতে পারে। নেত্রাদির বিকৃতি বা পীড়া ঐ কারণেই ঘটিতে পারে।' কিন্তু এ উত্তরের উপরেও এক প্রকৃষ্ট উত্তর আছে। সে উত্তরের বিষয় মানুষ অল্পই অনুধাবন করে। সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার কোন্ মহান্ উদ্দেশ্য-সাধন জন্য এই বিশাল সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, মানুষের কল্পনায় তাহার স্থান নাই। মানুষ যে কোনও কার্য্য সম্পন্ন করে, সকলেরই মূলে কোন-না-কোনও উদ্দেশ্য থাকে। তুমি অট্টালিকা প্রস্তুত করিতেছ;—পুত্রপরিজন সহ সুখে বসবাস করিবে বলিয়া। এইরূপ যে কোনও কার্য্যই কর না কেন, সকলেরই মূলে একটা লক্ষ্য আছে। যখন পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি, আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার ভূবিষ্যফলাভিজ্ঞতার ও কল্পনা-কৌশলের নিদর্শন পদে পদে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন প্রাণী মাত্রের—বিশেষতঃ মনুষ্যের, সৃষ্টিকল্পনা মধ্যে তাঁহার এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছেই আছে, স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানের পথে যিনি একটু অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি হয় তো কতকটা বুঝিতে পারিবেন, কি উদ্দেশ্যে তিনি কোন্ অঙ্গের কিরূপ সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন। কোন্ অঙ্গের দ্বারা কোন্ কার্য্য সম্পাদানে কি উদ্দেশ্য সম্পাদিত হয়, তাহার রহস্য উদ্ঘাটনে সাধারণ মানুষের চিন্তাশক্তি কূল-কিনারা অনুসন্ধান করিয়া পায় না; তাই মানুষ নানা বিতর্ক নানা ভাবে উত্থাপন করিয়া থাকে। এই অজ্ঞতা-নিবন্ধনই মানুষ সেই করুণার ঠাকুর দয়াল ভগবানকে অনেক সময় নিষ্ঠুরতার হেতুভূত বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে,—'ঈশ্বর যে প্রাণিসমূহের উপকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে; হিংস্র বন্য পশ্বাদির নখর ও দন্ত প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া তিনি নিষ্ঠুরতারই পরিচয় দিয়াছেন।' কিন্তু এ ভাবে যাহারা জগদীশ্বরে নিষ্ঠুরতা আরোপ করে, তাহাদের যুক্তি আদৌ ভিত্তিহীন। তিনি যে জন্তুকে যেরূপ নখর ও দন্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাহাদের উপকারক ভিন্ন কখনই অপকারক নহে। সকল জন্তুর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় তাহাদের উপকার-সাধনের জন্যই বিন্যস্ত আছে, প্রতিপন্ন হয়। তবে যে একের দেহ বা ইন্দ্রিয় যন্ত্র অন্যের পীড়াদায়ক হয়, তাহার কারণ অন্যরূপ। সে দুঃখদায়ক কর্ম্ম, তাঁহার কৃত কর্ম্ম বলা যাইতে পারে না; পরন্তু তাঁহার উৎপন্ন পদার্থই সে কর্ম্মের জন্য দায়ী। মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্মের দৃষ্টান্তে বিষয়টী বোধগম্য হইতে পারে। মনুষ্যকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিয়া ঈশ্বর এই জগতীতলে প্রেরণ করিয়াছেন। মনুষ্য যদি আপন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির সদ্ব্যবহার না করে, তাহা হইলে তাহার কৃত কর্ম্মের ফলভাগী কে হইবে? মনুষ্যেতর জন্তুর কার্য্যাকার্য্যের সুতরাং পাপপুণ্যের বিষয় বিচার করিবার ক্ষমতা

মানুষের নাই। মানুষের কৃত কার্য্যে সদসৎ পাপ-পুণ্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, প্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট পদার্থের কর্ম্মাকর্ম্মের ফলের সহিত ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। ঈশ্বর যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলই জীবের মঙ্গল-সাধনের উদ্দেশ্যে বিহিত হইয়াছে, বুঝিতে পারি। হিংস্র জন্তুর দন্ত-নখরাদির দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, তাহাদের আহার-সংগ্রহে ও আত্মরক্ষায় ঐ সকলের উপযোগিতা আছে। সুতরাং তাঁহার কার্য্য জীবের মঙ্গল-সাধক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

জগদীশ্বরের করুণার বিরুদ্ধে আর একবিধ প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। সে প্রশ্ন—তিনি যদি এতই করুণাময়, তবে মনুষ্যকে এমন সামান্য-শক্তিশালী করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? পৃথিবীতে মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া স্বীকার করিলেও এবং মনুষ্য বহু স্বর্গীয় গুণে গুণান্বিত হইলেও, সৃষ্টিকর্ত্তার তুলনায় তাহার সে গুণ বা শ্রেষ্ঠত্ব 'কিছুই নয়' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন মনে হয়,—আমাদের এই সৌরমণ্ডলের ন্যায় কত অসংখ্য অগণ্য সৌরমণ্ডলে বিশ্ব বিগঠিত হওয়াও অসম্ভব নয়, তার পর আরও যখন মনে হয়—এই সৌরমণ্ডলের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রাদির তুলনায় আমাদের এই বাসস্থলী পৃথিবী কি অকিঞ্চিৎকর, তখন, তদন্তর্গত—তুলনায় অণুপরমাণুর স্বরূপ—এই মনুষ্যের প্রতি জগদীশ্বরের কতটুকু লক্ষ্য থাকা সম্ভবপর? সুতরাং যতই যাহা হউক, মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের করুণার নিদর্শন সপ্রমাণ হয় না। যাঁহার এরূপ বিশাল সৃষ্টি, তিনি কেমন করিয়া একমাত্র মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হইবেন? এ সংশয়-সন্দেহেরও উত্তর আছে। যিনি আমাদের অননুভবনীয় অচিন্তনীয় অনন্ত অসীম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে আপন সৃষ্ট-বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন না, ইহা বড়ই অযৌক্তিক মন্তব্য! মানুষ সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, অট্টালিকার কোন্ অংশে কোন্ অবস্থায় কোন্ সামগ্রী অবস্থিত আছে, আর কিরূপ যত্নে রক্ষা করিলে সে সকল সামগ্রী সুরক্ষিত থাকিবে, অট্টালিকার অধিকারীর সে জ্ঞান সে লক্ষ্য সর্ব্বথা দৃষ্ট হয়। এবম্বিধ দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত। তথাপি কেন সংশয় হয়—সৃষ্টিকর্ত্তা আপন সৃষ্ট-সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে সমর্থ নহেন? মানুষের কি ভ্রান্তি! সৃষ্টির অতি-ক্ষুদ্র অতি তুচ্ছ পদার্থটীর মধ্যেও স্রষ্টার যখন কারু-কৌশলের অসদ্ভাব দৃষ্ট হয় না, তখন কেমন করিয়া সৃষ্ট পদার্থে তাঁহার উপেক্ষার বিষয় মনে করিব? ঐ অতি-ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, কি অনুপম কারুকার্য্যের নিদর্শন উহার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, অবশ্যই প্রত্যক্ষীভূত হইবে! যিনি অতি বড় অতি মহান্, তিনি কখনই অতি-ক্ষুদ্রকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করেন না। যাঁহার মহিমার অন্ত নাই, তাঁহার নিকট অতি-ক্ষুদ্র ও অতি বৃহৎ উভয়ই সমান। অতএব যেটী যেমন, তাহার প্রতি তাঁহার তেমনই দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়। যে মহাপ্রাণ বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছেন, বিশ্বের অন্তর্গত লক্ষ লক্ষ গ্রহাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন; তাঁহার শক্তি-সামর্থ্য নিশ্চয়ই মনুষ্যের ধ্যান-ধারণার অতীত। তিনি যখন আমাদের বাসস্থলী পৃথিবীরূপ ক্ষুদ্র গ্রহটিকে ও ইহার অধিবাসিগণকে লক্ষ্য করিতেছেন এবং তাহাদের প্রত্যেকের মঙ্গল কামনায় যত্নবান্

করুণার বিরুদ্ধে বিতর্ক।

আছেন, তখন তাঁহার মহত্ত্ব অনুভাবনার অতীত নহে কি? মানুষ যতই তুচ্ছ হউক, যতই হীন হউক, মানুষের প্রত্যেকের অদ্বিতীয়ত্ব সপ্রমাণ হয়। দুই জন মনুষ্যে কখনও ঠিক সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে না; শারীরিক, মানসিক, নৈতিক,—কোনও বিষয়েই দুইটী মানুষের অভিন্ন সাদৃশ্য নাই। আমাদের যে সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের প্রত্যেককে বিশেষ বিশেষ চরিত্র ও বিশেষ বিশেষ গুণ-ধর্ম্ম দিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার কি সে শক্তি নাই যে, তিনি আমাদের প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন? সে বিশ্বাস নিশ্চয়ই ভ্রান্ত! সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে যাঁহার দৃষ্টি আছে, অধিক কি—আপনার দেহের বিষয়ে যাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি কখনই জগদীশ্বরের কার্য্যে অসম্ভাব্য কিছুই দেখিতে পাইবেন না। যতই আমরা আমাদের নেত্রযুগলের সৃষ্টি বিষয়ে এবং আমাদের শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি-পরিপুষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করিব, ততই আমরা বুঝিতে পারিব—আমাদের সেই সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের জন্য কত যত্নই লইতেছেন। সেই সঙ্গে আরও মনে হইবে,—তিনি আমাদের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নীতিপরায়ণ, অর্থাৎ—আমাদিগের মধ্যে যে গুণ ধর্ম্ম সীমাবিশিষ্ট, তাঁহাতে তাহা অসীম অনন্ত। এই অনুভাবনার ফলে মানুষ আপনার সৃষ্টিকর্ত্তাকে অনন্ত রূপ গুণে বিভূষিত করিয়া লয়। বিজ্ঞান এখন বিশ্বের বিশালতা বিষয়ে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছে; বিজ্ঞান সাহায্যে মানুষ এখন জানিতে সমর্থ হইয়াছে—কত লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে কত লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র কেমন ভাবে পরস্পর সমসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে! অধুনা পদার্থতত্ত্বদর্শন যন্ত্র (Spectroscope) সাহায্যে তারকামণ্ডলের অন্তর্বর্ত্তী প্রজ্বলিত বাষ্পরাশি বিশ্লেষণ করিয়া কোন্ নক্ষত্রলোকে কি উপাদান নিহিত আছে, নির্দ্ধারিত হইতেছে। * অল্পদিন পূর্ব্বে যাহা অভাবনীয় কল্পনাতীত ছিল, বিজ্ঞানের বলে তাহা যখন প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে; তখন, যিনি সেই গ্রহ-নক্ষত্রাদির নিয়মকর্ত্তা-রূপে বিদ্যমান আছেন, প্রতিপন্ন হয়, মানুষের কল্যাণ-কামনায় তিনি যে যত্নবান্ আছেন, আমাদের জ্ঞান আমাদিগকে তাহা বলিয়া দিবে। এ বিশ্বাস কখনই অন্ধ-বিশ্বাস নহে। বিজ্ঞান

---

* বস্তু-তত্ত্ব-দর্শন-যন্ত্র (Spectroscope) সাহায্যে রসায়নবিদ্‌গণ পার্থিব পদার্থ-সমূহের স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। এমন কি, সূর্য্যমণ্ডলে এবং চন্দ্রমণ্ডলে যে যে পদার্থ আছে, এই যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ তাহারও রহস্য উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হইয়াছেন। চরম উত্তাপের অবস্থায়, বিভিন্ন পদার্থের আলোক-রশ্মি বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হয়। স্পেকট্রস্কোপ যন্ত্র সাহায্যে আলোক রশ্মির সেই বর্ণ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ঐ যন্ত্র-সাহায্যে সেই বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখিয়াই বস্তু-তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হয়। স্পেকট্রস্কোপ যন্ত্রে (ক) ত্রিকোণাকৃতি কাচ, (খ) টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র, (গ) কলিমেটর বা রশ্মি-পরিমাণোপযোগী নল, প্রভৃতি একসূত্রে স্থাপিত হয়। সেই নলের মধ্য দিয়া রশ্মি আসিয়া ত্রিকোণ-কাচে পতিত হয়। তাহা হইতে দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়া সেই রশ্মি পরদার (Screen) উপর প্রতি-ঘাত হয়। তাহাতে বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন অবস্থা দেখিয়া বস্তু-তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্র সাহায্যে প্রথম রাসায়নিক-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। বুনসেন্ (Bunsen) এবং কিরচোফ (Kirchhoff) এই যন্ত্রের সাহায্যে নানা তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে রস্কো এবং শরিমার প্রণীত রসায়ন-সংক্রান্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। *A Treatise on Chemistry* by H. E. Roscoe, F. R. S. and C. Schorlemmer, F. R. S.—*Spectrum Analyses.*

যখন প্রতিপন্ন করিতেছে, সৃষ্টির ক্রমবিকাশের ফলে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পৎ মনুষ্য উদ্ভূত হইয়াছে, আর মনুষ্যেই ক্রমবিকাশের সীমারেখা শেষ হইয়াছে; তখন কি প্রতিপন্ন হয় না—সৃষ্টির আদিতে যখন কল্পনা করিয়া তিনি সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার যে লক্ষ্য ছিল, মনুষ্যে সেই লক্ষ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে! যখন মনে হয়—এ পৃথিবীতে মনুষ্যেই তাঁহার সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ, আর যখন বুঝিতে পারি—মনুষ্যের উৎকর্ষ-সাধনের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য; তখন মনুষ্যের উপযোগিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অতএব ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনুষ্য কখনই তুচ্ছাদপি তুচ্ছ নহে। মনুষ্যের যে মন আছে ও দেহ আছে, সেই মনের ও দেহের যে সকল তত্ত্ব মনুষ্য এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে; অপিচ, যে সকল আবিষ্ক্রিয়ায় মনুষ্য আপন জ্ঞান-গবেষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে; তাহাতে মনুষ্যকে কখনই তুচ্ছ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। মনুষ্যের যে মন দূর নক্ষত্রের গতি-ক্রিয়া আবিষ্কার করিতে সমর্থ; মনুষ্যের যে চিত্তে সেই দূর-স্থিত নক্ষত্রাদির উপাদান-সমূহ প্রতিফলিত; সে মনুষ্য কি সামান্য জীব? কেবল মন বা চিত্তের জন্য নহে; মনুষ্যের যে আত্মা বা স্বাধীন চিন্তাশক্তি তাহাকে সদসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে সমর্থ,—তাহারই জন্য মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব। সৎ বা অসৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার শক্তি যাহার আছে, সে যদি অসৎ পথ পরিত্যাগ করিয়া সৎপথে সৎকার্য্যে প্রাণ উৎসৃষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার নৈতিক জীবনের পূর্ণতা সাধিত হয়। শারীরিক শক্তি—শক্তি নহে; মানসিক শক্তিই—শক্তি। মানুষের সেই শক্তি যদি সৎপথে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে পূর্ণতা কি আর অবশিষ্ট থাকে? মানুষ কি, মানুষ হয় তো তাহা ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু যিনি তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি তাহা অবশ্যই অবগত আছেন। তাই মনে হয়,—যে সন্তানকে তিনি দেহাতীত চিত্ত-বৃত্তি (মন) ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিয়াছেন, আর যাহাকে তিনি কিয়ৎ-পরিমাণে আপন প্রতিকৃতি-রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, সে সন্তান—সে মানুষ—নিশ্চয়ই নৈতিক জীবনের পূর্ণতা-সাধনে সমর্থ হইবে, আর তদ্দ্বারা বিরাট জড়-বিশ্বের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইয়া আসিবে। যে মনুষ্যকে জগদীশ্বর এতাদৃশ উন্নত অবস্থায় পরিণত করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি যে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে, তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হয়। এই পৃথিবী-রূপ গ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রাণী মনুষ্যের প্রতিই যে জগদীশ্বরের একমাত্র দৃষ্টি আছে, তাহা নহে; পৃথিবী ভিন্ন যদি অন্য কোনও গ্রহে, মনুষ্যের ন্যায় প্রাণী বিদ্যমান থাকা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে সেই সকল প্রাণীর প্রতিও তাঁহার সমান দৃষ্টি প্রতিপন্ন হয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞান যখন প্রমাণ করিতেছে—আলোক উত্তাপ মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতির একই প্রকার নিয়ম বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রতিপন্ন হয়, তখন একই প্রকারের প্রাণীর বিদ্যমানতা অন্যান্য গ্রহেও অসম্ভব নহে। আজি পর্য্যন্ত যদিও সে প্রমাণ মানুষ কিছুই আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু যদি অন্য গ্রহে কোথাও এই পৃথিবীর ন্যায় জল বায়ু প্রভৃতির সমাবেশ থাকে, তাহা হইলে সেখানেও মনুষ্যের ন্যায় উন্নত শ্রেষ্ঠ প্রাণীর বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। নীহারিকা-বাদ ও ক্রমবিকাশ-বাদ যুগপৎ আলোচনা করিলে মনে হয়, হয় তো

কোনও গ্রহে নীহারিকার আদি অবস্থা অতীত হইয়া সৃষ্টি-ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, অথবা হয় তো কোনও গ্রহে ক্রমবিকাশের সূত্রপাত চলিয়াছে মাত্র, অথবা কোথাও সৃষ্টির পূর্ণ পরিণতি সাধিত হইয়া গিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত যখন আমাদের জ্ঞান তত্দূর পৌঁছিতে পারে নাই; আমাদের এই সৌরমণ্ডলের ন্যায় আরও কত সৌরমণ্ডল, কত চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি সমন্বিত হইয়া, বিরাজ করিতেছে—তাহা যখন আমাদের ধ্যান-ধারণার অতীত বস্তু; তখন আর তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনাই বা আমরা কি করিতে পারি! তবে যখন বুঝি—তাঁহার শক্তি অনন্ত, কার্য্যকারিতা অনন্ত, আর তাহা বুঝিতে আমাদের কোনই সংশয় ঘটিতেছে না, তখন সৃষ্টপ্রাণী অসংখ্য অনন্ত হইলেও তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত যে কেহই নহেন, তাহা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হয়। আর সেই হিসাবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পৎ এই মানুষের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিতে পারে, তাহা অবশ্যই অনুভব করা যায়। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সর্ব্বশক্তিমান,—তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব অসম্ভব কি থাকিতে পারে?

জীবের প্রতি জগদীশ্বরের করুণা সম্বন্ধে আর এক প্রকার বিশেষ বিতর্ক উঠিয়া থাকে। সে বিতর্ক—পাপের বিদ্যমানতা বিষয়ক। এই পৃথিবী যে দারুণ দুঃখের ও যন্ত্রণার আলয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ—ঐ পাপ। জগদীশ্বর যদি জীবের শুভসাধন উদ্দেশ্যেই প্রণোদিত থাকিবেন, তবে কেন পাপকে সৃষ্টি করিলেন? যদি তিনি পাপের সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে আধিব্যাধি-শোক-তাপের যন্ত্রণাময় জীবন লইয়া জীবকে পরিত্রাহি ডাক ডাকিতে হইত না। এ যন্ত্রণার কারণ তিনি কি নিবারণ করিতে পারিলেন না? যদি তিনি না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান বিশেষণের সার্থকতা কোথায়? আর যদি ক্ষমতা সত্ত্বেও পাপের সৃষ্টির পক্ষে তাঁহার চেষ্টার বিরতি সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সৎ-স্বরূপ করুণাময় বলিই বা কি করিয়া? প্রশ্ন বড়ই জটিল। তথাপি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক, এ সকল বিষয়েই বা তাঁহার নিগূঢ় অভিসন্ধি কি সপ্রমাণ হয়? যদি কেহ মনে করেন—সৎ-স্বরূপ করুণাময় ঈশ্বর এ জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা নহেন, পরন্তু সৃষ্টির মূলে একজন অসৎ দুঃখপ্রদ সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব অনুভূত হয়, সে সিদ্ধান্তও বিতর্কে তিষ্ঠিতে পারে না। জীবের প্রতি সুখ-সাধক অবস্থাই সে যুক্তির প্রতিকূল মনে করিতে পারি। তার পর, জগদীশ্বর যে জীবের সুখদুঃখ বিষয়েই উদাসীন, মানুষ সুখীই হউক বা দুঃখীই হউক, তদ্বিষয়ে যে তাঁহার দৃষ্টি নাই, তাহাও বলিতে পারি না। যখন তিনি আমাদিগকে সুখদুঃখের অনুভূতি প্রদান করিয়াছেন, তখন সে অনুভূতি তাঁহার মধ্যেও যে ক্রীড়া করিতেছে, তাহা স্বতঃই মনে হয়। তবে কেন বিপরীত ভাব মনে আসে। নিগূঢ় কারণ, কর্ত্তাই পরিজ্ঞাত; সীমাবদ্ধ বুদ্ধি, তাহা কি নির্দ্ধারণ করিবে? তবে যতটুকু যুক্তির অধিগম্য, ততটুকু সন্ধান করিলেই বা কি বুঝিতে পারি? কি পাপ কি কষ্ট কেমনভাবে প্রাণিসমূহে ও মনুষ্য-মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে, তাহার বিষয় একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। মনুষ্যেতর প্রাণীর দুঃখ-যন্ত্রণা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে—'তাহাদের যন্ত্রণার কারণ কি? তাহাদের যখন নৈতিক-জ্ঞান নাই, তাহারা

করুণার নিদর্শন নহে কি?

কেন কষ্টের ভাগী হইবে?' এ প্রশ্নের উত্তর প্রাচ্যে একরূপ, পাশ্চাত্যে অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। অদৃষ্ট ও জন্মান্তর স্বীকার করিলে, এ সকল প্রশ্নের সমাধানে আদৌ সংশয় উপস্থিত হয় না। কিন্তু পাশ্চাত্য এ বিষয়ে অন্যরূপ উত্তর দেয়। পাশ্চাত্যের মতে—মনুষ্যেতর প্রাণীর যন্ত্রণার পরিমাণ সাধারণতঃ বড়ই অল্প। লক্ষ লক্ষ প্রাণী যে যন্ত্রণা সহ্য করে—মনে করি, তাহা যন্ত্রণাদায়ক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় না; হইলেও যন্ত্রণার অনুপাত অল্পমাত্র, সন্দেহ নাই। অনুভূতির উপরই যন্ত্রণার ন্যূনাধিক্য নির্ভর করে। অসভ্য বর্ব্বর বন্যমনুষ্যের যন্ত্রণার বা কষ্টের সহিত সুসভ্য সুশিক্ষিত জনের কষ্টের বা যন্ত্রণার তুলনা করিলে বিষয়টী বেশ বোধগম্য হইতে পারে। যাহাদের মানসিক উন্নতি যত অধিক, তাহাদের কষ্টের অনুভূতিও তত অধিক। এ যুক্তিতে নিম্ন পর্য্যায়ের প্রাণীর যন্ত্রণা ক্রমশঃ হ্রস্বতা প্রাপ্ত। এই জন্যই মনে হয়, বিড়াল যখন ইন্দুর ধরিয়া খায়, ইন্দুরের যন্ত্রণা তখন বড় বেশী হয় না। এই মতে, অতি নিম্নস্তরের প্রাণীর যন্ত্রণা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেক প্রাণী আপন সন্তান-সন্ততিকে গ্রাস করে। কোনও কোনও বিড়াল আপন শাবককে খাইয়া ফেলিয়াছে, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। মৎস্য মৎস্যকে গ্রাস করিতেছে; বৃহৎ কর্কট ক্ষুদ্র কর্কটকে ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে,—এবম্বিধ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। এক জাতীয় সর্প দৃষ্ট হয়, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাহারা বিকট চীৎকার করিলে, অন্য জাতীয় ক্ষুদ্র সর্প আসিয়া তাহার মুখবিবরে আপনিই প্রবেশ করে। প্রথমোক্ত সর্প বদন ব্যাদান করিয়া থাকে, তাহাকে আর কোনই চেষ্টা করিতে হয় না। এই সকল ব্যাপারে অনেক প্রাণীর মধ্যে যন্ত্রণার অনুভূতি সপ্রমাণ হয় না। অপিচ, আহারে আনন্দ অনুভব করিতে হইলে, ধ্বংসের বা বিনাশের কষ্ট অবশ্যম্ভাবী। নিম্নস্তরের কোনও কোনও প্রাণীর যন্ত্রণা লক্ষণ দেহ-সঙ্কোচন প্রভৃতিতে প্রকাশ পায় বটে; কিন্তু সে যন্ত্রণা অতি সামান্য; কেন-না, ঐ সকল প্রাণীকে দ্বিখণ্ডিত করিলেও উহারা চলিতে ফিরিতে অসমর্থ হয় না। কীট-বিশেষের অর্দ্ধাংশ, লাঙ্গুলের দিক, কর্ত্তিত হইলে, সামান্য অঙ্গ-সঙ্কোচন ভিন্ন তাহাদের অন্যবিধ কষ্টের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। আবার অন্যদিকে গৃহপালিত কতকটা শিক্ষাপ্রাপ্ত জীবের যন্ত্রণার জ্ঞান, যেন অধিক বলিয়া প্রতীত হয়। যাহাদের চিন্তাশক্তি যত অধিক কেন্দ্রীভূত, তাহারা তত অধিক সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারে। মানুষের অনুভূতি শক্তি অধিক। তাই তাহার সুখদুঃখ অধিক। পীড়ার যন্ত্রণায় বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর অপেক্ষা আকস্মিক মৃত্যু যে অল্প কষ্টপ্রদ, তাহা স্বতঃই অনুভূত হয়। এ হিসাবে, ইন্দুর যে বিড়ালের কবলে প্রাণ-বিসর্জ্জন দেয়, তাহাতে তাহার কষ্ট অনেক কম বলিয়া মনে হইতে পারে। ফলতঃ, মনুষ্যেতর প্রাণীর কষ্ট অতি সামান্য;—নিম্নস্তরে তাহার একেবারে অভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সিদ্ধান্ত কতকাংশে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও মনুষ্যেতর প্রাণিগণ যে যন্ত্রণার কবল হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পায় নাই, তাহার কারণ কি? তাহাদের যখন নৈতিক জ্ঞান নাই, তাহাদের মধ্যে যখন দায়িত্ব-বোধের অভাব, তখন তাহারা কেন কষ্ট অনুভব করে? এ কি জগদীশ্বরের অবিচার নয়? না—অবিচারই বা কেমন করিয়া বলি! সুখের ও দুঃখের

দুই দিকের অনুপাত ধরিয়া বিচার করিলে জগদীশ্বরের অবিচার কথনই প্রতিপন্ন হইবে না। সুখ ও দুঃখ পারস্পারিক সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। যে স্নায়ু-সমবায়ে সুখের অনুভূতি, সেই স্নায়ু-সমষ্টিই দুঃখের উৎপাদক। যে জীবে সে স্নায়ু সমবায়ের অভাব, তাহার সুখও নাই, দুঃখও নাই। সুখ থাকিলেই দুঃখ থাকিবে। সুতরাং এ বিষয়ে জগদীশ্বরকে দায়ী করিতে পারা যায় না। যদি সুখ চাও, তাহা হইলে দুঃখ পাইতেই হইবে। যত দুঃখ তত সুখ। দুঃখীর সুখানুভূতি অনেক অধিক। আরও, মনুষ্যেতর প্রাণিগণ যে তুলনায় অধিক আনন্দ উপভোগ করে, তাহা বলাই বাহুল্য। কি স্বাস্থ্য বিষয়ে, কি অন্যান্য বিষয়ে, এক এক শ্রেণীর জীবের মধ্যে কতগুলি সুখ স্বচ্ছন্দে আছে, অনুপাত লইলেই তাহা বুঝা যায় না কি? তদৃষ্টেই বুঝিতে পারি, সুখ-স্বাস্থ্যই যেন প্রাণিগণের নিত্য-ভোগ্য, পীড়া ও কষ্ট সাময়িক মাত্র। একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে, আমরা আরও বুঝিতে পারি,—জীবের যে যন্ত্রণা বা কষ্ট, তাহাও অনাবশ্যক নহে। প্রাণিগণের মধ্যে যদিও উৎকর্ষ-সাধ্য নৈতিক চরিত্রের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয় না, কিন্তু তাহাদের শারীর-ধর্ম্ম প্রভৃতির জন্য কষ্টের অনুভূতি একান্ত আবশ্যক। জীবদেহে যন্ত্রণার অনুভূতি অনেক সময় প্রাণনাশসম্ভব বিপদে শান্ত্রীর কার্য্য করে। দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। যদি উত্তাপে যন্ত্রণা অনুভব না হইত, তাহা হইলে অরণ্যে দাবানল উপস্থিত সময়ে, প্রাণিগণ পলায়নে প্রাণ-রক্ষার প্রয়াস পাইত কি? আরও দেখুন, ক্ষুধার যন্ত্রণা যদি অনুভব না হইত, অনাহারে মৃত্যু ঘটিত না কি? এইরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন হইতে পারে, জীবদেহে যন্ত্রণার বা কষ্টের অনুভূতি আবশ্যক। ফলতঃ, জীবন-রক্ষার জন্যই কষ্টের বা যন্ত্রণার প্রয়োজন। অতএব, প্রাণিগণ যে কষ্ট অনুভব করে, তাহারও সার্থকতা আছে।

মনুষ্যের দৈহিক ও নৈতিক দুঃখ প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করিলেই বা কি বুঝিতে পারি? এই যে ভীষণ জীবন-সংগ্রাম, এই যে যন্ত্রণাময় জরাব্যাধি, এই যে বহুদিনব্যাপী কষ্টের পর মৃত্যু, আর এই যে অসংখ্য অননুভাব্য দৈবদুর্বিপদ,—জগদীশ্বর মানুষের জন্য কেন স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন? তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি যদি মানুষের মঙ্গল সাধনে প্রযত্নপর, তবে কেন তিনি এমনভাবে যন্ত্রণার পেষণে মানুষকে পিষ্ট করিতেছেন? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে এ সকল বিষয়েও স্রষ্টার কোনই ত্রুটি লক্ষিত হয় না। ভক্ত রামপ্রসাদ বড় সত্য কথাই বলিয়াছেন—'স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!' মানুষের যত কিছু কষ্ট, যত কিছু দুঃখ—সকলই তাহার আপনার বা স্বগণের কুকর্ম্মের বা নির্ব্বুদ্ধিতার ফল মাত্র। দোষ—জগদীশ্বরের নহে, দোষ—মানুষের নিজের। আরও, কতকগুলি দুঃখ—প্রকৃত পক্ষে দুঃখ মধ্যেই গণনীয় নহে। অনেক সময় মানুষ সুখের অসদ্ভাবকে বা অসম্পূর্ণতাকে দুঃখ বলিয়া মনে করে। কিন্তু বাস্তব তাহা দুঃখশব্দবাচ্য নহে। মনে করুন,—এক জনের একটী চক্ষু নাই। কিন্তু সে জন্য তাঁহার কষ্ট কি? যদি তিনি একেবারে অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ঐ এক চক্ষু লাভই তাঁহার পক্ষে অমূল্য সুখের হইত না কি? মানুষের দুইটী চক্ষু আছে বলিয়াই তো এক জনের অনুশোচনা বা কষ্ট অনুভব! বহুবিধ

মানুষের দুঃখ ও কারণ।

অভাবের সৃষ্টি আপনা-আপনি করিয়া লইয়া মানুষ যে কষ্ট অনুভব করে, তাহা বলাই বাহুল্য। তার পর মানুষ জীবনে যতই কষ্ট অনুভব করুক, সে তুলনায় তাহার সুখের পরিমাণ কত অধিক! মানুষের অজ্ঞাতসারে কত সুখের হিল্লোল তাহার হৃদয়ে প্রবাহিত হয়! কিন্তু অসুখের অবস্থা কখনও কাহারও অপরিজ্ঞাত থাকে না। অপিচ, মনুষ্যেতর প্রাণীর দুঃখ-যন্ত্রণার যেমন আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয়, মনুষ্য সম্বন্ধেও তাহাদের সে আবশ্যকতার অসদ্ভাব নাই। অনেক যন্ত্রণা বা কষ্ট মনুষ্যকে বিবিধ প্রাণঘাতী বিপদের ও পীড়ার কবল হইতে রক্ষা করে। আমাদের আবাস-ভূমি জড় পদার্থে বিগঠিত এই পৃথিবীতে, নৈসর্গিক নিয়মের প্রভাবেও, আমাদের বিপদ-পরম্পরা অনিবার্য্য। যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সৌরমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছে, সে শক্তির বিদ্যমানতা নিবন্ধন অট্টালিকা ভূপতিত হইতে পারে, আর তদ্দরুণ মানুষের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। এ ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হই, সে জগৎপাতার করুণার নিদর্শন মাত্র। তিনি যদি শক্তিকে সংযত না করেন, তিনি যদি অলৌকিক ক্রিয়া না দেখান, তাহা হইলে কে নিরাপদ থাকে? ইহাই তাঁহার অলৌকিক লীলা। তিনি শক্তি-সমষ্টিকে নিয়মবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই, মানুষ বহু বিপদকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে। ভূকম্পনে বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গিরণে যখন অসংখ্য প্রাণী মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, তখন জগদীশ্বরের রশ্মি অসংযত হইয়াছে মনে করিতে পারি। কিন্তু তাহা হইলেও সে যে মৃত্যু, সে মৃত্যু, দীর্ঘকাল-ব্যাপী রোগ যন্ত্রণায় অবিভূত হইয়া মৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয়ঃ নহে কি? কল্পনা হইতে পারে; কিন্তু যন্ত্রণা যে এ মৃত্যুতে অল্প হয়, অনেকেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। এইরূপে বুঝিতে পারা যায়, মানুষ আপনার অপকর্ম্মের জন্য যে কষ্টভোগ করিয়া থাকে, সে কষ্টের তুলনায়, নৈসর্গিক নিয়মে সঞ্জাত কষ্ট অনেক অল্প। নৈসর্গিক নিয়মের ফলে মানুষ যে সুখ প্রাপ্ত হয়, সে তুলনায়ও তজ্জনিত কষ্ট সামান্য। বুঝিলাম— সংসারে কতক পরিমাণ দুঃখের আবশ্যক আছে; আরও বুঝিলাম—আমাদের আবাস-ভূমির ন্যায় এই পৃথিবীতে কতক প্রকার দুঃখ-সহন অনিবার্য্য। কিন্তু তাহাতেই বা সমস্যার সমাধান হয় কি প্রকারে? এই আধিব্যাধি-শোকতাপ-পূর্ণ সংসারে মানুষের যে কত প্রকার দুঃখ-দুর্দ্দৈব আছে, তাহার ইয়ত্তা আছে কি! কিন্তু তৎসম্বন্ধেই বা কি যুক্তি পাই, অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। যদিও স্বীকার করি, ঈশ্বরের সৃষ্টি-কার্য্যে দুঃখের উৎপত্তি তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল; কিন্তু তদ্দ্বারা কখনও প্রমাণ হয় না যে, তিনি মানুষকে দুঃখার্ণবে নিমগ্ন করিতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন! বলিতে পারি,—তিনি ফলাফলে অভিজ্ঞ ছিলেন; বলিতে পারি,—তিনি সমষ্টিভাবে দুঃখমূলক কল্পনা অনুমোদন করিয়াছিলেন; সেই সঙ্গে সঙ্গে হয় তো আরও বলিতে পারি,—এবম্বিধ দুঃখপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান তিনি না করিলেও না করিতে পারিতেন। এ বিষয়ে বিবিধ উত্তর প্রদান করা যাইতে পারে। তিনি সৃষ্টি-কৌশলের সার্থকতা সমষ্টিভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন; কিন্তু অংশ-বিশেষের ফলাফল-বিচারের আবশ্যকতা তাঁহার অনুভূত না হইতে পারে। আমার উদ্দেশ্য— অট্টালিকা প্রস্তুত; ইট, কাঠ, চুণ, সুরকি ব্যয় হইবে, তাহাতে কি আসে যায়?—কারিকর

পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবে, তাহা ভাবিবারই বা আমার কি প্রয়োজন? আমার লক্ষ্য—অট্টালিকা প্রস্তুত; তজ্জন্য অর্থব্যয় পরিশ্রম হইবেই হইবে। লক্ষ্য রাখিয়া কোনও কার্য্য করিতে হইলে, আনুষঙ্গিক আয়োজন না করিলে চলিবে কেন? এইরূপ, জগদীশ্বর যে এক মহান্ লক্ষ্য লইয়া সৃষ্টি-কার্য্য আরম্ভ করেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার পথে কোথায় কাহার কোন্ সামান্য সুবিধা-অসুবিধা ঘটিবে, তাহা দেখিলে চলিবে কেন? উদ্দেশ্য—সৃষ্টির পূর্ণতা-সাধন। সে পক্ষের সকল অন্তরায় আপনিই দূর হইবে—দূর করার প্রয়োজন হইবে। এ ক্ষেত্রে তাঁহার কার্য্যে দুঃখের উৎপত্তি ঘটিতে পারে; কিন্তু তিনি যে কাহাকেও সে দুঃখে অভিভূত করিবার জন্য প্রযত্নপর আছেন, তাহা কদাচ মনে হয় না। অপিচ, মনুষ্যের দুঃখের সহিত আর এক অভাবনীয় সামগ্রীর সম্বন্ধ আছে। সে সামগ্রী এতই মূল্যবান যে, পার্থিব সকল দুঃখের তুলনায় তাহার গুরুত্ব অনেক অধিক। বুঝিয়াছেন কি—সে কি সামগ্রী? সে সামগ্রী—মানুষের উন্নত অমূল্য সচ্চরিত্রতা। এই পৃথিবীতে দুঃখের দহন যদি না থাকিত, তোমার হৃদয়ের দৃঢ়তা কোথায় পলাইত! সংসারে দুঃখের দহনে যদি দগ্ধীভূত না হইতে, তোমার স্থৈর্য্য, তোমার সৎসাহস, পরের মঙ্গল-সাধনে তোমার আত্ম-ত্যাগ—সঙ্ক্ষেপতঃ যে যে উপাদানে মানুষ মহত্ত্বের উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢ় হয়, সে সকল উপাদান—কোথায় থাকিত? সহিষ্ণুতাই মানুষকে সম্পূর্ণতার প্রতি প্রচালিত করে। অতএব সৃষ্টি-কার্য্যের মধ্যে এই যে দুঃখের দহন, ইহা কখনই স্রষ্টার সৃষ্টি-নৈপুণ্যে অসম্পূর্ণতার লক্ষণ নহে। মানুষ কিসে অত্যুন্নত মহত্তম চরিত্র লাভ করিয়া মহত্তম স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে, সেই উদ্দেশ্যেই জগদীশ্বর ইহ-সংসারে দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন। অগ্নি-সংস্কারে কাঞ্চন যেমন দ্যুতিমান হয়, দুঃখের দহনে পড়িয়া মানুষ সেইরূপ সদ্‌গুণ-সমন্বিত হউক। দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে উল্লম্ফনে আরোহণ অসম্ভব; শীর্ষস্থানে উপনীত হইবার আশা করিলে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে হয়। মহত্ত্ব-লাভের পথও তদনুরূপ দুর্গম বন্ধুর বলিয়া মনে করিবে। ধীরে ধীরে—পাপের প্রলোভন হইতে দূরে সরিয়া ধীরে ধীরে—অগ্রসর হইতে হইবে। সেই কষ্টই তো কষ্ট!—সেই যন্ত্রণাই তো যন্ত্রণা!—পাপের সহিত দ্বন্দ্বের যে কষ্ট যে যন্ত্রণা মানুষকে সহ্য করিতে হয়! যতই আমরা মনুষ্যের কষ্টের কারণ অনুধাবন করিয়া দেখিব, ততই বুঝিতে পারিব, মানুষকে দুঃখ-পারাবার হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই করুণাময় কত বিচিত্র বহিত্র প্রেরণ করিয়াছেন! যে সামগ্রী প্রাপ্তির পক্ষে যত কষ্ট—যত উদ্বেগ, সে সামগ্রী তত উৎকৃষ্ট, তত মূল্যবান। দুঃখের পর দুঃখ সহ্য করিয়া মানুষ যে সেই অমূল্য বস্তু লাভ করিবে, তাহার বিধান করিয়া দিয়া জগদীশ্বর অশেষ কৃপার পরিচয় দিয়াছেন। পরমুখাপেক্ষী না থাকিয়া আপন চেষ্টায় আপন কর্ম্মের দ্বারা মানুষ উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইবে, সংসারে দুঃখ-কষ্টের বিধানে জগদীশ্বরের ইহাই অভিপ্রায়। ফলতঃ তিনি যে সৎ, তিনি যে মানুষের মঙ্গল-সাধনে অনুপ্রাণিত, তিনি যে মনুষ্যকে মহত্ত্বের উচ্চস্তরে উপনীত করিবার জন্য নিত্য প্রযত্নপর, মানুষের দুঃখ-কষ্টের কারণ অনুসন্ধানেও তাহা প্রতিপন্ন হয়।

মনুষ্যের নৈতিক পাপ সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত যুক্তির অনুসরণ করা যাইতে পারে। কি শারীরিক পাপ, কি নৈতিক পাপ—সকল প্রকার পাপই মানুষ আপন ইচ্ছানুসারে করিয়া থাকে।

নৈতিক পাপ-প্রসঙ্গে।

যদি কেহ বলেন—ঈশ্বর পাপকে একেবারে পৃথিবী হইতে দূর করিলেন না কেন? তাহারও উদ্দেশ্য আছে বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, মানুষ অনেকাংশে স্বাধীনতাসম্পন্ন। সংসারে যদি পাপ পুণ্য না থাকিত, সংসারে যদি সদসৎ ভাল-মন্দ কার্য্য-বিভাগ না থাকিত, তাহা হইলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আদৌ বিকাশ পাইত না। সংসারে পাপ-পুণ্যের দুই পথ প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করিবার অবসর পাইতেছে। জগদীশ্বর পাপের স্রষ্টা হইতে পারেন; কিন্তু মানুষ পাপে প্রবৃত্ত হউক—এ কল্পনা তাঁহাতে কদাচ আরোপ করা যায় না। মানুষকে কলের পুতুলটির মত না গড়িয়া, তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিয়া, জগদীশ্বর মানুষকে প্রকৃষ্টতম স্থানে আরূঢ় করাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, সদসৎ জ্ঞান এবং বিবেক এই তিনের দ্বারা জগৎপাতার লক্ষ্য উপলব্ধি হইতে পারে। সদসৎ পাপ-পুণ্য প্রভৃতির যুগপৎ উপযোগিতা এই সূত্রে বেশ বোধগম্য হয়। পাপ-পুণ্যের সৃষ্টি কেন? পাপের কষ্ট এবং পুণ্যের সুখ দেখাইয়া, পাপে বিরতি ও পুণ্যে আসক্তি-সঞ্চার তাঁহার উদ্দেশ্য নহে কি? সৎকর্ম্মের শুভফল এবং অসৎকর্ম্মের অশুভ ফল—কাহার না প্রত্যক্ষীভূত? কি শারীরিক, কি নৈতিক—সর্ব্ববিধ সদসৎ কর্ম্মফল দ্বারা মানুষকে যে সৎপথে পরিচালিত করিবার প্রযত্ন রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। তোমার ইচ্ছা—স্বাধীন; তুমি ইচ্ছা মাত্র সৎ বা অসৎ যে কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ। কিন্তু তথাপি এক এক প্রকার কর্ম্মের ফল দেখাইয়া তোমাকে সৎকর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করা হইয়াছে। তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নাই; অথচ, তুমি আপন পথ আপনিই চিনিয়া লও, তৎপক্ষে ইঙ্গিত আছে। মানুষের প্রতি কত করুণাময় তিনি, এই দৃষ্টান্তেই তাহা বোধগম্য হয়। তার পর তিনি যে আমাদিগকে বিবেক দিয়াছেন, তাহাও তাঁহার অশেষ করুণার নিদর্শন। তিনি কেমন এবং কোন্ পথে মানুষকে অগ্রসর হইতে বলিতেছেন, এই সকল বিষয়ের আলোচনায় সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে। অন্যায় আচারে বা পাপ-কর্ম্ম করণে স্বাধীনতা আছে; অথচ তাহার ফল বিষময় দেখান হইয়াছে; এ দেখিয়াও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা সৎপন্থা পরিগ্রহ করিবে না কি? এক হিসাবে বেশ বুঝিতেই পারা যায়—তাঁহার কি অভিপ্রেত! সম্মুখে পাপীর পরিতপ্ত জীবন; পুরোভাগে অসৎকর্ম্মের অন্তর্জ্বালা; আর অন্যদিকে সাধু-সজ্জনের অনন্ত আনন্দ! এ সকল দৃশ্য সম্মুখে উপস্থাপিত সত্ত্বেও তিনি কি আমাদের গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করেন নাই বলিতে হইবে? সংসারে পাপ আছে বলিয়া, অথবা অসৎকর্ম্মে মন স্বতঃপ্রলুব্ধ হয় বলিয়া, পাপকর্ম্ম অসৎকর্ম্ম কখনই তাঁহার প্রীতিসাধক ও আপনার শ্রেয়স্কর নহে। দণ্ডধর নৃপতি, রাজবিধির উল্লঙ্ঘনে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝা যায়, পাপ-কর্ম্ম কখনই তাঁহার অভিপ্রেত নহে। পিতা যদি পুত্রকে স্বাধীনভাবে আপন বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন,

আর পুত্র যদি ব্যভিচার-দোষ দুষ্ট হইয়া সে সম্পত্তি উড়াইয়া দিতে চেষ্টান্বিত হয়; তাহা হইলেই পুত্রের প্রতি পিতার কিরূপ ক্রোধের ভাব সঞ্জাত হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জগদীশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ মনে করা কর্ত্তব্য। তিনি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই কি তাহার অপব্যয় করিবে? কদাচ না! তার পর, মনুষ্যেরই শ্রেয়ঃ-সাধন জন্য পাপের ও পাপীর উৎপত্তি হইয়াছে, বুঝিতে পারি না কি? সংসারে যদি পাপ না থাকিত, অন্যের অপরাধে উপেক্ষা করিয়া তুমি কি তোমার ক্ষমা-গুণের পরিচয় দিতে পারিতে! সংসারে যদি পাপ না থাকিত, অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে অসহায় জনকে রক্ষা করিবার জন্য যে সৎসাহসের প্রয়োজন, তাহা কি প্রকারে বিকাশ পাইত? আঁধার না থাকিলে আলোকের দীপ্তি যেমন গৌরবের হইত না; পাপ না থাকিলে সেইরূপ পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইত না। অতএব, পাপের সৃষ্টি, পাপীর উৎপত্তি—মানুষের মঙ্গলসাধন জন্য। জগদীশ্বরের নির্দ্দেশ—সৎ হও, সৎকার্য্য কর। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, সে কার্য্য করিতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু যাহার স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বরের কার্য্য বুঝিয়া সেই কার্য্যের অনুসরণ করে, সেই তাঁহার অনুকম্পা-লাভে সমর্থ হয়। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানবের চরিত্র সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অপরিজ্ঞাত নহে। কিন্তু তিনি স্বাধীনতা দিয়াছেন; সুতরাং কাহাকেও কোনও কার্য্য করিতে আদেশ করিতে-ছেন না। মানুষ আপনার স্বাধীনতার অপব্যবহার না করে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। মানুষ সৎকর্ম্ম সাধনে বাধ্য নয় বটে; কিন্তু সৎকর্ম্মই তাহার মোক্ষের হেতু।

মানুষের কল্যাণ-সাধনে জগদীশ্বরের প্রযত্ন বিষয়ে এ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে যাহা আলোচনা করা হইল, তাহাতে জগদীশ্বরের স্বরূপ-তত্ত্ব কথঞ্চিৎ বিবৃত করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। তিনি মানুষের মঙ্গলসাধনে কিয়ৎপরিমাণে যত্ন লন, সে আলোচনায় সে আভাষ অনেকটা পাইয়াছি। মানুষ যে সৃষ্টির মধ্যে তুচ্ছ প্রাণী নহে, পরন্তু মনুষ্যে যে প্রাণিপর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ পরিণতি, তাহাও কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। সংসারে পাপের প্রবর্ত্তনার মধ্যে যে নিগূঢ় শুভ উদ্দেশ্য বিদ্যমান আছে, তাহাও বুঝা গিয়াছে। তাহাতে আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা সৎস্বরূপ, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। মনুষ্যের মঙ্গল-সাধনের জন্যই তিনি যে মনুষ্যকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ন্যায়-অন্যায়-জ্ঞান এবং বিবেক প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে মনুষ্যের প্রতি তাঁহার একটু অধিক করুণারই নিদর্শন পাইয়াছি। আবার মানুষের মঙ্গলসাধনের প্রয়াস মধ্যেও তাঁহার ন্যায়ানুবর্ত্তিতার বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সৎ-স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারি। যখন দেখিয়াছি—তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা; তখনই বুঝিয়াছি—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। যখন দেখিয়াছি,—তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে একটা কল্পনা-কুশলতায় অর্থাৎ ভবিষ্যকলাভিজ্ঞতার নিদর্শন আছে, তখনই বুঝিয়াছি—তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তার পর যখন দেখিলাম—তিনি সকলের হিতসাধনে প্রযত্নপর, তখন অবশ্যই বুঝিলাম—তিনি মঙ্গলময় সৎ-স্বরূপ। মানুষকে সচ্চিন্তায় সৎপথে প্রবর্ত্তিত করার পক্ষে পরোক্ষ ভাবে তাঁহার প্রযত্ন দেখিয়া তাঁহাকে সৎ-স্বরূপ বলিয়াই মনে করি। ফলতঃ, তাঁহার শারীরিক শক্তির কল্পনায় তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার মানসিক অভিজ্ঞতার নিদর্শনে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ

জগদীশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধ।

এবং তাঁহার সচ্চরিত্রতার সদাদর্শের অনুধ্যানে তাঁহাকে সৎ-স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারি। সৃষ্টির কারণরূপে তাঁহার বিদ্যমানতায় তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা, সৃষ্টিমূলে কল্পনা-কৌশলে তাঁহার সর্ব্বাভিজ্ঞতা এবং মনুষ্যের বিবেক-বাণীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সৎ-স্বরূপত্তা।

* * *

(৪) ঈশ্বরের দেহ-ধারণ।

[মানবের অমরত্ব ;—মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব—তাহার অমরত্বের পরিচায়ক ;—ঈশ্বরের অত্যাচার প্রসঙ্গে মানুষের অমরত্ব-তত্ত্ব ;—মানুষের অমরত্ব বিষয়ে অন্যান্য কথা ;—মনুষ্য সম্বন্ধে স্রষ্টার প্রযত্ন ;—শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার সাফল্য—মানবের শ্রেষ্ঠ পরিণতি।]

মানবের অমরত্ব।

জগদীশ্বরের শক্তি জ্ঞান ও গুণ প্রভৃতির বিষয় জানিতে পারিলে, তাঁহার মহিমা অনুধাবন করিতে সমর্থ হইলে, তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই আর অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু, মনে হয়,—তাঁহাতে সকলই সম্ভব, অসম্ভব তাঁহাতে কিছুই নাই। তিনি যে নরদেহ-ধারণে জন-সমাজে বিচরণ করিতে পারেন, তিনি যে মানুষকে উচ্চতর উচ্চতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে উপদেশ ও শিক্ষার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া যাইতে পারেন, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। কয়েকটী বিশেষ কারণে মানুষের প্রতি তাঁহার অনুকম্পার বিষয় বিশেষভাবে মনোমধ্যে অঙ্কিত হইতে পারে। মানুষের প্রকৃতি এবং জগদীশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে যাহা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতেই বিষয়টা বোধগম্য হওয়া সম্ভব। অধিকন্তু মানুষে ও ঈশ্বরে এমন আরও কয়েকটী গুণ-ধর্ম্ম লক্ষিত হয়, যদ্দ্বারা মানুষকে শ্রেষ্ঠ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার পক্ষে জগদীশ্বরের প্রযত্ন বিশেষভাবেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। মানুষের এক বিশেষ গুণ-ধর্ম্ম—অমরত্ব। মর মানুষ, অমরত্বের অধিকারী,—কথাটা শুনিতে বড়ই বিসদৃশ বোধ হয়। বিসদৃশ বোধ হইলেও মানুষের অমরত্বে সংশয়ান্বিত হইবার কোনই কারণ নাই। মানুষের স্বরূপ কি? আমাদের আপন আপন অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর পাইতে পারি। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন দেখি—আমি মানুষ—আমি কি? আমার পঞ্চভূতাত্মক দেহ—তাহাই কি আমি? অথবা দেহের অতীত কোনও বস্তু আছে—যাহাকে আমি অর্থাৎ মানুষ বলে? সকল দেশের সকল মানুষই এ বিষয়ে প্রায় এক মত। দেহাতীত যে এক বস্তু আছে—যাহা আমার স্বরূপ, সকল জ্ঞানী মনুষ্যই তাহা স্বীকার করে। সেই বস্তুর নাম—আত্মা। আত্মার জন্ম নাই, নাশ নাই। সুখ-দুঃখ, আরাম-যন্ত্রণা—ভোগ করে কে? এক হিসাবে, সে সেই আমি বা আত্মা! সকল দেশের সকল জাতির জ্ঞানী মাত্রেই আত্মাকে অবিনশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন। আত্মা আমাদের দেহ ও মন উভয়কে পরিচালিত করে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে; দেহের উপাদানভূত অণু-পরমাণু সমূহ পর্য্যন্ত বিছিন্ন বিক্ষিপ্ত ও অবস্থান্তর-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কিছুই একেবারে লোপ পায় না। আত্মার সম্বন্ধেও সেই ভাব অন্তরে জাগরূক হয়। দেহের উপাদানভূত দ্রব্যাদি বিভিন্ন হইয়া পড়িলে, দেহাতীত আত্মা পৃথক হইয়া

পড়ে। কোনও পদার্থের বা ভূত-সমূহের সংযোগ-বিয়োগে দেহাদির ন্যায় আত্মার সৃষ্টি-পুষ্টি সাধিত নহে; সুতরাং ভূত-সঙ্ঘের সংযোগ-বিয়োগে তাহার বিনশ্বরত্ব সম্ভাবিত হয় না। পরন্তু দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও আত্মা অবিনশ্বর থাকে। আত্মাই যখন আমার আমিত্ব, আত্মাই যখন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, তখন আত্মার অবিনশ্বরত্বে মনুষ্যের অবিনশ্বরত্ব বা অমরত্ব প্রতিপন্ন হয়।

মানুষের অবিনশ্বরত্ব বা অমরত্ব সম্বন্ধে চতুর্ব্বিধ যুক্তির অবতারণা করা হয়। এ পক্ষের প্রথম যুক্তি,—মনুষ্যের অদ্বিতীয়ত্ব। পৃথিবী-গ্রহে,—অন্যান্য গ্রহাদির বিষয় মানুষ যতটুকু জানিতে পারিয়াছে, তাহাতে সকল গ্রহের—সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য উচ্চতম ও শ্রেষ্ঠ প্রাণী। সুতরাং ক্রমবিকাশবাদের যুক্তি অনুসারে যোগ্যতমের জীবন-সংরক্ষণ (Survival of the fittest.) সিদ্ধান্ত মানিতে হইলে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যের অমরত্ব স্বীকার করিতে হয়। অথচ, আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যের মৃত্যু আছে; এবং বুঝিতে পারি, মনুষ্য-জাতি এই পৃথিবীতে কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বিজ্ঞান বলে,—এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, কিছু কাল পরে সকলই সূর্য্যমণ্ডলে বিলীন হইয়া যাইবে; সুতরাং তখন প্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট কোনও পদার্থেরই অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকিবে না। তাহা হইলে, কত সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী ক্রম-বিকাশের ফলে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পৎ এই যে মানুষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার গতি কি হইবে? তাহা হইলে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে যে আদর্শ সৃষ্টির কল্পনা অনুভূত হয়, তাহাও ব্যর্থ হইয়া যায় না কি? শেষ সীমায় যখন মনুষ্যের উৎপত্তি সপ্রমাণ হয়, তখন তাহাও স্থায়িত্ব লাভ করিবে না কি? পূর্ণতা-সাধন করিয়াও যে পূর্ণতা রক্ষা করিতে পারিবেন না,—সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধে তেমন ভাব কখনই মনে আসিতে পারে না। কোনও যুক্তিমূলেও এ নশ্বরতার কল্পনা স্থান পায় না। ক্রমবিকাশবাদের কর্ত্তা অনন্তশক্তি জগদীশ্বর বিবর্ত্তনের একটা স্থায়ী ফল রাখিবেন না, এ কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া কখনই মনে স্থান পায় না। কিন্তু যদি বুঝিতে পারি—মনুষ্যে অমরত্ব আছে, তাহা হইলে, সকল সিদ্ধান্তই দৃঢ় যুক্তি মূলে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি বুঝিতে পারি,—মনুষ্য আত্মা রূপে অমর, সদসৎ কর্ম্মমিশ্র সংসার তাহার পরীক্ষা-ক্ষেত্র; যদি বুঝিতে পারি,—এখানে নানা প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও সে যদি আপন চরিত্র রক্ষা করিতে পারে, এবং কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করিয়াও স্রষ্টার প্রতি আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হয়; তাহা হইলে তাহার উদ্ধারের উপায় আছে, তাহাতে সকল সমস্যার নিরসন হইয়া যায়। তাহা হইলে, ক্রমবিকাশ-তত্ত্বেরও একটা মূল সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়, প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনের প্রহেলিকাও বিশদীকৃত হইয়া আসে। তাহা হইলে, উপলব্ধি হয়—প্রাকৃতিক কি কার্য্যের দ্বারা কি ফল—স্থায়ী ফল—সঞ্জাত হইতেছে! তাহা হইলে, আরও বেশ বুঝিতে পারি—জগদীশ্বর মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিয়া, তাহার সম্মুখে সদসৎ দুই পথ বিস্তৃত রাখিয়া, কেমন ভাবে তাহাকে অমরত্বের পথে অগ্রসর করাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন! সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষকে সদ্গুণসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই সত্য; কিন্তু তিনি তাহাকে এমন

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব—অনন্তত্বের পরিচায়ক।

একটী সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন যন্ত্র রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সে যন্ত্র ইচ্ছা করিলে, সদ্‌গুণ-সম্পন্ন হইতে পারে। সে যন্ত্রের স্বাধীনতা আছে, তদনুসারে সদসৎ যে কোনও পথে সে অগ্রসর হইতে পারে বটে; কিন্তু জ্ঞান ও বিবেক সতত তাহাকে সাবধান করিতেছে। সে সাবধানতা সত্ত্বেও আপন স্বাধীন ইচ্ছার বশে মনুষ্য যদি অসৎপথাবলম্বী হয়, তাহার পতন কে রোধ করিবে? এই সকল বুঝিয়া মানুষ যদি সৎপথে অগ্রসর হয়, তাহার উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী। এ সংসার পরীক্ষা-ক্ষেত্র; এই পরীক্ষা-পারাবারে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা।

প্রাণি-জগতে মানুষের অদ্বিতীয়ত্বের বিষয় এবং ইহসংসার যে তাহার পরীক্ষা-ক্ষেত্র তাহা বুঝিতে পারিলে, মানুষের বা আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রতিপন্ন হয়; মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অযথা অত্যাচার প্রভৃতির বিষয়ে মানুষ যে সকল যুক্তি-জাল বিস্তার করিয়া থাকে, তৎসমুদায়েরও তথ্যানুসন্ধানে মানুষের (আত্মার) অবিনশ্বরত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে। জগদীশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে মানুষকে প্রায়ই সন্দিহান দেখি। কেহ বা জন্মিয়াই বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়; কাহাকেও বা আজীবন দারিদ্র্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত বর্দ্ধিত হইতে হয়। জগদীশ্বরের এ কি অন্যায়াচার? এক জন সারা জীবন পাপকর্ম্ম করিয়াও সুখে জীবন পাত করিতেছে; আর এক জন সদা সৎপথে থাকিয়াও কষ্টের একশেষ সহ্য করিতেছে। জগদীশ্বরের এ কি অবিচার? আত্মার অবিনশ্বরত্ব বা জন্মান্তরবাদ স্বীকার ভিন্ন এ প্রশ্নের সমাধানে কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য—কেহই এ পর্য্যন্ত সমর্থ হন নাই। পাশ্চাত্য দেখান—ভবিষ্য জীবন। প্রাচ্য কহেন—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ ও পরজন্মের জন্য প্রস্তুত হউন। এক হিসাবে দুই মতেই সামঞ্জস্য আছে। পূর্ব্বজন্ম ছিল না, ক্রমবিকাশের ফলে দুর্ল্লভ মানব জন্মে অমরত্ব লাভ ঘটিয়াছে, পাপ-পুণ্যের পরীক্ষায় সে জন্মের সার্থকতা অসার্থকতা কর্ম্মফলে সুখ-দুঃখ জন্য অনন্ত জীবন পড়িয়া আছে। এক পক্ষ এই মতের পরিপোষক; অন্য পক্ষ বলিয়া থাকেন,—'পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ এ জন্মে চলিতেছে; আবার এ জন্মের কর্ম্মাকর্ম্মের ফলে পরজন্মের সুখ-দুঃখ সঞ্চিত হইতেছে।' মানব-জীবনে পরীক্ষার অন্ত নাই। যাহাকে অতি-বড় সুখী বলিয়া মনে হয়, তিনিও পরীক্ষার অনলে দগ্ধীভূত হইতেছেন; আবার যাহাকে অতি-দুঃখী বলিয়া মনে করিতেছি, তিনিও পরীক্ষার দহনে নিষ্কৃতিলাভ করেন নাই। পরীক্ষা কত জনের উপর কত ভাবেই ক্রিয়া করিতেছে! দরিদ্র যেখানে একটী পয়সার জন্য প্রলুব্ধ—চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী; ধনী সেখানে লক্ষ মুদ্রার জন্য প্রলুব্ধ—অন্যায়রূপে পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত। ইহাই পরীক্ষা! গরীবের পরীক্ষা—এক পয়সায়, ধনীর পরীক্ষা—লক্ষ মুদ্রায়। প্রলোভনের আকর্ষণ অবস্থার অনুপাতে উভয়ত্র একই প্রকার। সে ক্ষেত্রে দরিদ্র এক পয়সার প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া যে সততার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়, ধনবানের লক্ষ মুদ্রার প্রলোভন পরিত্যাগে সেই সততা! বালকের প্রতি, বৃদ্ধের প্রতি, প্রতি জনের প্রতি এইরূপ পরীক্ষা চলিয়াছে। সেই পরীক্ষায় যিনি উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, এ সংসার

ঈশ্বরের অন্যায়াচারের প্রসঙ্গে।

পরীক্ষার ক্ষেত্র; সে পরীক্ষা এই প্রকারের। মানুষের যে কষ্ট ও যন্ত্রণা, সকলই তাহার ভবিষ্য সুখসাধনের উদ্দেশ্যে পরীক্ষার ক্ষেত্রে সূচিত হইয়াছে। পাপ যদি মানুষকে প্রলুব্ধ না করিত, পাপ-প্রলোভন-দমন-জনিত সুখ মানুষ কোথায় পাইত? অত্যাচারে ও নিগ্রহে যদি মানুষকে প্রপীড়িত না করিত, তাহা হইলে অত্যাচার নিবারণ জনিত আনন্দ মানুষ কিরূপে লাভ করিত? যদি পাপ ও যন্ত্রণা সংসার হইতে একেবারে দূর হইত, তাহা হইলে কত আনন্দে কত সুখে মানুষকে বঞ্চিত হইতে হইত না কি? পাপের সহিত অনবরত যুদ্ধে মানুষের ভবিষ্য সুখের পথই প্রশস্ত করিয়া দেয়। সে সুখ আর কোনও পথে প্রাপ্ত হইবার নহে। সে দ্বন্দ্ব কি আনন্দ, তাহা বুঝি কল্পনায়ও ধারণা করা যায় না। অতএব কোনও কষ্ট বা কোনও যন্ত্রণা অকারণ বিহিত হয় নাই; অথবা কোনও অবস্থাতেই মানুষ ঘৃণার্হ নহে। ভবিষ্যে যিনি বিশ্বাসবান হইয়া কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহারই জীবন ধন্য বলিয়া মনে করি। আর সে বিশ্বাসে বিশ্বাসবান হইতে পারিলে, জগদীশ্বরের কোনও কার্য্যে অন্যায়াচার কদাচ প্রত্যক্ষ হয় না। পরন্তু, ভ্রমবশে তোমার চক্ষে তাঁহার যে সকল কার্য্য এখন অন্যায় বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সে সকলই তখন ন্যায়ানুগত বলিয়া বিশ্বাস জন্মিবে। যদি বুঝিয়া থাক—এ জীবনেই লীলাখেলার অবসান নহে, আর তাই বুঝিয়া যদি সৎপথে সচ্চিন্তায় চিত্ত ন্যস্ত করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার জীবন ধন্য।

সংসারের কতকগুলি ঘটনায় যেমন মানুষের প্রতি জগদীশ্বরের অন্যায় ব্যবহারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় এবং সেই সকল ঘটনার মূল-তত্ত্ব অনুসন্ধানে যেমন বুঝিতে পারি, মনুষ্যের মঙ্গল-সাধন জন্যই সেই সকল ঘটনার সঙ্ঘটন হইয়াছে, আর সেই সূত্রে যেমন মানুষের অমরত্বের বিষয় মনোমধ্যে জাগরূক হয়; সেইরূপ আরও দুই কারণে মনুষ্যের অবিনশ্বরত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে।

মনুষ্যের অমরত্ব বিষয়ে।

মানুষের অসাধারণ যোগ্যতা এবং জন্মান্তরের বিশ্বাস দ্বারাও মানুষের অমরত্ব সপ্রমাণ হয়। মানুষ এ জীবনে সম্পূর্ণ-রূপ সন্তুষ্ট নয়। এ জীবনের অতীত এক অব্যক্ত অবস্থার প্রতি তাহার আকাঙ্ক্ষা চির-অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। একটু অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়, মানুষের শক্তি নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত স্ফূর্ত্তির দিকে প্রধাবমান। মানুষ মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা—অমরত্ব লাভ। এ জীবনে তাহার সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইতে পারে না। তাই সে পরজীবনে আশায় আশান্বিত। বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞান-বারিধির সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছেন না; নূতন নূতন জ্ঞানের স্ফূর্ত্তিতে নূতন নূতন জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট রহিয়া যাইতেছে। যদি এই জীবনেই মানুষের শেষ হয়, তাহা হইলে যোগ্যতা সত্ত্বেও সে যে বহু বিষয়ের অধিকারী হইল না, তাহা বেশ বুঝিতে পারি। জগদীশ্বর মানুষকে যে যোগ্যতা দিয়াছেন, তাহার কি তবে কোনও সার্থকতা নাই? তিনি তো কখনও অনাবশ্যক অপ্রয়োজন বিষয়ে পুষ্টি-সাধন করেন না! সৃষ্ট-পদার্থ মাত্রেরই একটা পরিণতির সীমা আছে। প্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট প্রায় সকল পদার্থেরই প্রাথমিক অবস্থা দেখিয়া, পরিণতির অবস্থার বিষয় মনে আসিয়া থাকে। একটী পক্ষীর ডিম্বের

বিষয় দৃষ্টান্ত ক্ষেত্রে উত্থাপিত করিতে পারি। ডিম্বের আদি অবস্থা দেখিয়া প্রমাণ পাইতে পারি, ঐ ডিম্বের অন্তর্গত অস্ফুট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিস্ফুট হইয়া পক্ষিরূপে বহির্গত হইবে। ডিম্ব দেখিয়া যেমন তাহা হইতে পক্ষী উৎপন্ন হইবে বুঝিতে পারি; পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন পক্ষী দেখিয়া তাহার পূর্ব্বোক্ত-রূপ কোনও পরিণতির বিষয় মনে আসে না। ডিম্বের পরিণতি যে পক্ষী বলিয়া বুঝিতে পারি, পক্ষীর সম্বন্ধে সেরূপ কোনও উচ্চতর বিকাশের ভাব মনে উদয় হয় না। মনুষ্যেতর কোনও প্রাণীরই মনে উচ্চতর পরিণতির আকাঙ্ক্ষা সপ্রমাণ হয় না। কিন্তু মানুষের সে আকাঙ্ক্ষা আছে, মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে—তাহার পুরোভাগে উচ্চ উচ্চতর উচ্চতম অবস্থা অবস্থিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান জীবনে মানুষ কখনই আপনাকে আকাঙ্ক্ষাশূন্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। যখন আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে, তখন তাহা পূর্ণ হইবার উপায় আছে। সুতরাং জীবন শেষ হইলে, সকল লীলাখেলা শেষ হইল বলিয়া মনে করা যায় না। মানুষের জীবনের প্রতি, মানুষের চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারি, সে যেন সারাজীবন কিসের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। চরিত্রোৎকর্ষের জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা সারাজীবনই দেখিতে পাই। সে সকলই কি বৃথা? মরিলেই ফুরাইয়া যাইবে—এই যদি অবস্থা হইত, তাহা হইলে কেন মানুষ চরিত্রোৎকর্ষের জ্ঞানোন্নতির দিকে আকৃষ্ট থাকিবে? অপরিসীম যোগ্যতা, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং সারাজীবন উদ্যোগ আয়োজন—সকলই কি বৃথা? অসীম কল্পনা-কুশলতার পরিচয় দিয়া যিনি এই বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি করিলেন, আর যাঁহার প্রতি কার্য্যেই মনুষ্যের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার ক্ষমতা কি এখানেই পর্য্যুদস্ত হইল? কখনই সেরূপ মনে করা যাইতে পারে না। এ জীবনের পরপারে অমর আত্মা কি অবস্থায় অবস্থিত রহিবে, এ জীবনে সে যেন সেইজন্য প্রস্তুত হইতেছে। মানুষের জন্মান্তরীণ বিশ্বাসও সেই সাক্ষ্যই প্রদান করে। সকল দেশে শিক্ষিত অশিক্ষিত, সভ্য অসভ্য, সকল সমাজে আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে একটা বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে। অনেক অসভ্য জাতি, মৃতদেহ কবরের সময়, অস্ত্র শস্ত্র ও খাদ্যাদি প্রোথিত করে। হিন্দুর শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াই বা কি শিক্ষা দেয়? প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের দার্শনিকগণও অনেকে আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করেন। যাহারা অজ্ঞ অসভ্য, তাহারাও মরণের পরের অবস্থা স্বীকার করে? আবার যাঁহারা বহুদর্শিতা-লব্ধ জ্ঞানে গরীয়ান, তাঁহারাও এ বিষয়ে সন্দিহান নহেন। বিজ্ঞ অবিজ্ঞ—সকল মানুষের মধ্যে যে বিশ্বাস চিরবদ্ধমূল, তাহা কি কখনও মিথ্যা হইতে পারে? মিথ্যা হইলে, এ বিশ্বাস এমন ভাবে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে জগদীশ্বর কখনই বিস্তার করিতেন না। ফলতঃ, মানুষের অদ্বিতীয়ত্ব, তাহার প্রতি ঈশ্বরের অন্যায় ব্যবহারের বিষয়, তাহার যোগ্যতা এবং তাহার জন্মান্তরীণ বিশ্বাস—এই চতুর্ব্বিধ কারণে মানুষের অমরত্ব প্রতিপন্ন হয়। মনুষ্যেতর প্রাণীর পক্ষে এবম্বিধ কারণ-চতুষ্টয়ের সংশ্রব নাই। সুতরাং মনুষ্য ভিন্ন অন্য প্রাণীর অমরত্ব প্রতিপন্ন হয় না। মনুষ্যের ন্যায়ান্যায় জ্ঞান আছে, বিবেক আছে, সুতরাং কর্ম্মাকর্ম্মের ফলভোগের জন্যও তাহার অনন্ত জীবন স্বীকার করিতে হয়। তবে মনুষ্যের অমরত্ব

সম্বন্ধে একটা বড় গুরুতর আপত্তির কথা উঠে। শরীরের সহিত আত্মার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ; বুঝিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, দেহের সহিত উহার জন্ম, পৈত্রিক ব্যাধি প্রভৃতির ন্যায় উহা পিতামাতার নৈতিক চরিত্রের পর্য্যন্ত অধিকারী; সুতরাং শরীর ধ্বংসে উহার ধ্বংস হওয়াই সম্ভবপর। শরীরের ও আত্মার উভয়েরই নাশ যুগপৎ সাধিত হওয়ার এবম্বিধ বিতর্ক প্রায়ই উঠিয়া থাকে সত্য; কিন্তু এ বিতর্কেরও ভিত্তি দৃঢ় নহে। আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, আমাদের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত আমাদের স্মৃতি-শক্তি জড়াতীত। জড় শরীরে পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া প্রতিনিয়ত চলিয়াছে; কিন্তু স্মৃতি অপরিবর্ত্তিত। জড়-সম্বন্ধ-যুক্ত জড়াতীত স্মৃতির বিদ্যমানতা যখন সপ্রমাণ হয়; তখন মৃত্যুরূপ পরিবর্ত্তনের পর আত্মার বিদ্যমানতা কেন না সপ্রমাণ হইবে? শরীর এক হিসাবে আত্মার বিকাশ-প্রাপ্তির যন্ত্র-বিশেষ। যন্ত্র বিকৃত হইলে, বিকাশ-প্রাপ্তির পক্ষে বিঘ্ন ঘটিতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা আত্মার বিলোপ-সাধন সপ্রমাণ হয় না। একটী দৃষ্টান্তে এ বিষয়টী কেহ কেহ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাড়িত-বার্ত্তা-যন্ত্রপরিচালক এক নিভৃত পল্লী-প্রকোষ্ঠে বসিয়া সংবাদ আদান-প্রদান করিতেছেন। সহসা তাঁহার যন্ত্র বিকলতা প্রাপ্ত হইল। তখন, তাড়িত-বার্ত্তা-যন্ত্রের সাহায্যে তিনি আর সংবাদ আদান-প্রদানে সমর্থ হইলেন না। যুদ্ধের সময়ে এরূপ অবস্থা প্রায়ই উপস্থিত হয়। দুর্গাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ জন তাড়িত-বার্ত্তা-যন্ত্রের বৈকল্য-হেতু অনেক সময়ে সংবাদ-প্রেরণে অসমর্থ হয়। এ সকল স্থলে সংবাদ আদান-প্রদানের যন্ত্র নষ্ট হইলেও সংবাদদাতার অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয় না। সেইরূপ, দেহধ্বংসে জীবাত্মার ধ্বংস স্বীকার করিতে পারা যায় না। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানুষের জ্ঞান ও স্মৃতি প্রবল দেখা যায়। শরীর ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্মৃতি ও আত্মা যে সর্ব্বথা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রমাণ নাই। এই সকল কারণে বেশ বুঝা যায়, জীবনের পরে এক অবস্থা আছেই আছে। মানুষের প্রতি জগদীশ্বরের অনুকম্পার নিদর্শন ইহলোকে দৃষ্টিগোচর না হইলেও পরলোকে প্রত্যক্ষীভূত হইবার সম্ভাবনা স্বতঃই অনুভূত হয়। জগদীশ্বর যে মানুষের মঙ্গলসাধন জন্য প্রযত্নপর আছেন, এই প্রসঙ্গেই তাহা আমাদের বোধগম্য হইতে পারে। অনন্ত জীবনে তাঁহার করুণা লাভের অবসর একদিন না একদিন আসিবেই আসিবে।

এ পর্য্যন্ত আমরা যে আলোচনা করিয়া আসিলাম, তাহাতে বুঝিলাম—আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা অনন্ত শক্তিশালী; আরও বুঝিলাম—মানুষকে তিনি শ্রেষ্ঠ প্রাণিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং মনুষ্যের মঙ্গল-সাধনে তাঁহার প্রযত্ন আছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও বুঝিতে পারিলাম,—মনুষ্যে সদসৎ জ্ঞান ও বিবেক প্রদান করিয়া মনুষ্যের উৎকর্ষ-সাধনে তিনি মনুষ্যকে আপনার নিকটে আকর্ষণ করিতেছেন। পিতা যেমন পুত্রের উৎকর্ষ-সাধনে প্রযত্নপর থাকেন, জগদীশ্বরও মনুষ্যের উৎকর্ষ-সাধনে সেইরূপ প্রযত্নপর রহিয়াছেন, বুঝিতে পারি। তিনি সত্য-স্বরূপ, তিনি ন্যায় স্বরূপ; মনুষ্যও সত্য-স্বরূপ ন্যায়-স্বরূপ হউক, ইহাই তাঁহার ক্রিয়া-কৌশল। তাঁহার এই বিশ্ব-সৃষ্টির কল্পনা-মূলে, ক্রমবিকাশের ফলে, তাঁহারই স্বরূপ প্রাণী সৃষ্ট হউক,—ইহাই

স্রষ্টার মনুষ্য-বিষয়ে প্রযত্ন।

তাঁহার লক্ষ্য। যখন বুঝিয়াছি, সৃষ্টির মূলে তাঁহার কল্পনা-কৌশল ক্রিয়া করিতেছে; যখন বুঝিয়াছি, সে কল্পনার মূল লক্ষ্য—মনুষ্য এবং মনুষ্যের উৎকর্ষ-সাধন; তখনই বুঝিতে পারা যায় না কি—মনুষ্যের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া, তিনি মনুষ্যকে আপনার স্বারূপ্য সাযুজ্য প্রভৃত প্রদান করিতে পারেন! শ্রীভগবানের মর্ত্ত্যে অবতরণ আর কিসের জন্য? দুষ্কৃতের দমন আর সজ্জনের উদ্ধার—ইহাতে কি শিক্ষা প্রাপ্ত হই? সদসৎ জ্ঞান প্রদান করিয়া যখন দেখিলেন—মানুষের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না; বিবেক-বাণী রূপে হৃদয়ে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াও যখন মানুষের উদ্দাম চিত্ত-বৃত্তিকে সংযত করিতে পারিলেন না; তখন স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া, শ্রেয়ঃপথ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। সৃষ্ট সামগ্রীর প্রতি স্রষ্টার করুণার বা যত্নের নিদর্শন প্রত্যেক পদার্থে অল্প-বিস্তর সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। মানুষ আমরা, মানুষের দৃষ্টান্তেই বুঝিতে পারি, আমাদের সৃষ্ট-সামগ্রীর মধ্যে যেটি যত মূল্যবান্, সেটির প্রতি আমাদের তত যত্ন। সে যত্নের সামগ্রীর উৎকর্ষ সাধন পক্ষে যাদৃশ চেষ্টার প্রয়োজন, সে চেষ্টায় আমরা কখনই পরাঙ্মুখ হই না। পুত্র—পিতার স্নেহের ও যত্নের সামগ্রী। মানুষ আপনার পুত্রকে সদ্গুণসম্পন্ন করিবার পক্ষে কি চেষ্টাই না করে! এখানেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। সৃষ্টিকর্ত্তার লক্ষ্য—সৃষ্টি-প্রবাহের মধ্য দিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রাণী উৎপন্ন হউক। তিনি যেমন সৎ-স্বরূপ, তাঁহার সৃষ্ট প্রাণীতে সে সৎ-স্বরূপতা বিকাশপ্রাপ্ত হউক। তিনি যেমন সর্ব্বজ্ঞানের আধার জ্ঞান-স্বরূপ, তাঁহার সৃষ্ট-প্রাণীতে সেই জ্ঞান বিকাশপ্রাপ্ত হউক। যিনি যেমন গুণসম্পন্ন, তাঁহার প্রিয় বস্তুটিকে সেইরূপই গুণসম্পন্ন করিতে প্রয়াস পান। ইহাই সাধারণ রীতি। প্রিয় পদার্থ মনুষ্যের সৃষ্টিতে জগদীশ্বরেরও সেই প্রযত্ন—তাঁহার কার্য্য-পরম্পরায় উপলব্ধি হয়। তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান, তখন নরদেহ ধারণে ও নরলোকে অবতরণে অসম্ভবতার কোনই কারণ কল্পনা করা যাইতে পারে না। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—যাঁহার ইচ্ছামাত্রে অসংখ্য সৌরমণ্ডল সৃষ্ট হইতে পারে; মনুষ্যের জন্য তাঁহার অবতার-গ্রহণের কোনই আবশ্যকতা ছিল না, তিনি ইচ্ছামাত্রেই তো আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিতেন! ইহার একটি নিগূঢ় কারণ আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সকলই যদি তিনি আপন ইচ্ছার উপর রাখিতেন, তাহা হইলে শিক্ষার বিষয় উৎকর্ষ-সাধনের প্রয়াস কিছুই থাকিত না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আঁধার না থাকিলে, আলোকের সার্থকতা উপলব্ধি হয় না; দুঃখ কষ্ট-যন্ত্রণা না থাকিলে, সুখের বা আনন্দের অনুভবে পূর্ণতা আসে না,—এ সকল ব্যাপারেও তাঁহার সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়। দিয়াছেন—স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, দিয়াছেন—ন্যায়ান্যায় জ্ঞান, দিয়াছেন—বিবেকের সহায়তা। সংসারে পাপ আছে, পুণ্য আছে, ধর্ম্ম আছে, অধর্ম্ম আছে; সকলেরই আবশ্যকতা সপ্রমাণ হয়। এ ক্ষেত্রে, পরীক্ষার অনলে দগ্ধীভূত হইয়া, আপনার সুবর্ণ-দ্যুতি প্রকাশ করিতে হইবে—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। সৃষ্টিমূলে ইহাই তাঁহার এক কল্পনা-কৌশল। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হইয়া, সদসৎ জ্ঞান লাভ করিয়াও, তাঁহার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ কেন বিভ্রান্ত হয়?—কেন প্রলোভনের কবল হইতে পরিত্রাণ না পায়? যেন উদ্ভ্রান্ত না হয়, যেন পরিত্রাণ পায়,—এই উদ্দেশ্যই তাঁহার

যত কিছু লীলা-খেলা। যে দেশে যেখানে যে ভাবে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে, সর্ব্বত্রই তাঁহার ঐ এক লক্ষ্য দেখিতে পাই। সংস্বরূপ হইয়াও তিনি যে জন্ম-জরা-মরণ-শীল দেহ ধারণ করেন, সৃষ্টির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, সর্ব্বথা তাহা হৃদগম্য হয়। শ্রীভগবানের মর্ত্ত্যে অবতরণ সম্বন্ধেও এই ভাব এই যুক্তি প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীকৃষ্ণ যে নররূপে নারায়ণ, জীবের উদ্ধার-সাধন জন্য তাঁহার যে মর্ত্তলোকে অবতরণ; শাস্ত্রোক্তিতে তাহা যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, সে বিষয় আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে যে সকল যুক্তির অবতারণায় সাধারণতঃ ভগবানের অবতার-গ্রহণ-তত্ত্ব স্বীকৃত হয়, তদ্দ্বারাও ভূভার-হরণে শ্রীকৃষ্ণের ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় বোধগম্য হইবে। বড় বিপ্লবের সময় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল! বড় বিষম বিপদের দিনে শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বড় প্রতিকূল স্রোতে তিনি সমাজ-তরণীর কর্ণধার হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন! সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, যুগযুগান্তর অতীত হইবে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার প্রভাব কখনও লোপ পাইবে না। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম-তত্ত্ব চিরদিন মানুষকে দিব্য-তত্ত্ব প্রদান করিবে; শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পীযূষ-ধারায় চিরদিন পাপী-তাপীর বিশুষ্ক মরুময় হৃদয় শান্তি-শীতলতায় স্নিগ্ধ করিবে; শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান-গবেষণার আলোক-রশ্মিতে অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞান সংসার দীপ্তিমান রহিবে। শ্রীকৃষ্ণ তারস্বরে পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষায় সাফল্য।

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত সমস্ত কর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"

অর্থাৎ,—"মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, আমার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়, নিশ্চয় তখন অমৃত লাভ করিয়া আমার সহিত এক হইবার যোগ্য হইয়া থাকে।" পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, মানুষকে যোগ্যতা লাভ করাইবার লক্ষ্যই সৃষ্টিকার্য্যে স্রষ্টার চরম লক্ষ্য। সেই যোগ্যতা মানুষ কিসে লাভ করে, তাহা শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভাব। যোগ্য হও—যোগ্যতা লাভ কর, অমরত্ব শ্রেষ্ঠত্ব সকলই অধিগত হইবে। সে যোগ্যতা কিসে লাভ হয়? শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষায় শিক্ষিত হও; শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মনঃপ্রাণ সমর্পণ কর; পাইবে—মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। এই মানুষই যে ভগবানের স্বারূপ্য সাযুজ্য লাভ করিতে পারে, নরদেহেই যে সে পদপ্রাপ্তির উপাদান-সমূহ অবস্থিত আছে, তাহা দেখাইবার জন্যই—তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই, শ্রীভগবান নরদেহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সকল দেশের সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অথবা সকল দেশের সকল মনীষিগণ শ্রীভগবানে যে গুণ-ধর্ম্মের বিকাশ দেখিতে পান, শ্রীকৃষ্ণে সেই গুণধর্ম্মের সম্যক বিকাশ প্রতিপন্ন হয়। আমরা দেখাইয়াছি—তিনি জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলবীর্য্যসম্পন্ন; আমরা দেখাইয়াছি—তিনি অনন্ত কর্ম্মী, তিনি অনন্ত জ্ঞানী, তিনি অনন্ত মঙ্গলময়। অতএব, কি প্রাচ্যের দৃষ্টিতে, কি পাশ্চাত্যের দৃষ্টির মধ্য দিয়া, সর্ব্বভাবেই শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। প্রতিপন্ন হয়—জীবের উদ্ধারের জন্য—মানুষকে পরাগতির পথ দেখাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব।

ভগবানের অবতার।

[বুদ্ধ অবতার,—তাঁহার অবতারত্ব সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি প্রভৃতি; তিনি কখনই বিপরীত পন্থাবলম্বী ছিলেন না,—বৌদ্ধধর্ম্মে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম,—বৌদ্ধধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্মেরই অংশভূত, তৎসম্বন্ধে আলোচনা;—তাঁহার অবতারত্ব সংক্রান্ত কারণ অনুসন্ধানের উপাদান।]

শ্রীকৃষ্ণ ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন। মনুষ্যের গণনায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্রাধিক বৎসর অতীত হইল। নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর অঙ্কে পরিবর্ত্তনের প্রবল প্রতিঘাত চলিতে লাগিল।

বুদ্ধ অবতার।

পার্থিব অণুপরমাণুর সঙ্গে সঙ্গে, সমাজে ধর্ম্মে আচারে ব্যবহারে, সে পরিবর্ত্তনের বা অবস্থান্তরের ক্রিয়া পরিদৃশ্যমান্ হইয়া আসিল। ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান প্রভৃতি যে যে কারণে শ্রীভগবানের অবতার-গ্রহণের আবশ্যক হয়, পৃথিবীতে আবার সেই অবস্থা উপস্থিত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে বিপ্লবের কবল হইতে সংসারকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন, আবার সেই সকল বিপ্লব ঘনীভূত হইয়া আসিল। সুতরাং আবার ভগবানের অবতার গ্রহণের আবশ্যক হইল। মর্ত্ত্যভূমে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইলেন। *

এইখানে কেহ হয় তো বলিতে পারেন,—'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রযত্ন দেখিতে পাই, কিন্তু বুদ্ধদেবে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয়, তিনি বর্ণাশ্রম-বন্ধন বিচ্ছিন্নকারী। সুতরাং উঁহাদের পরস্পরের লক্ষ্য কখনও এক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না।' কিন্তু এ বিতর্ক—এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক।

বুদ্ধদেব বিপরীত পন্থা নহেন।

কার্য্য দেখিয়া বা ফল দেখিয়া—কি দেখিয়া উদ্দেশ্য নির্ণীত হয়? গন্তব্য পথ বিভিন্ন হইলেও যাত্রী যখন একই তীর্থে একই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়, তখন পথের বিভিন্নতায় কিবা আসে-যায়? † তার পর, একটু ধীর স্থির চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলে, পথও ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় না। বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্ত এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-তত্ত্ব যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া দেখি, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারি,

---

* 'ললিতবিস্তর' এবং 'মহাবংশ' গ্রন্থদ্বয়ে বুদ্ধদেবের যে জীবনচরিত বর্ণিত আছে, তাহাতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (৪র্থ অধ্যায়, ৭ম-৮ম শ্লোক) শ্রীকৃষ্ণোক্তির ন্যায় উক্তি দৃষ্ট হয়। সেই অংশের ইংরাজী অনুবাদ,—'I am one of a long series of Buddhas. Many were born before and many will be born in future. When the wickedness and violence rule over the earth, Buddha takes his birth to establish the kingdom of righteousness on earth.' *Vide* Rhys David's *Buddhism.* যীশু-খৃষ্টেরও এইরূপ উক্তি আছে। *Vide* St. Mathew, *Chap.* XXIV. 7-24.

† লক্ষ্য এক বলিতেছি এই জন্য,—বৌদ্ধধর্ম্মের 'নির্ব্বাণ' হিন্দুধর্ম্মেরই নিঃশ্রেয়স, মোক্ষ বা কৈবল্য প্রভৃতির নামান্তর মাত্র। ঐ সকল অবস্থা যে অভিন্ন, পরবর্ত্তী অংশে 'নির্ব্বাণ'-প্রসঙ্গে তদ্বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধদেব কোনও বিপরীত পন্থার অনুসরণ করেন নাই বা কোনও নূতন ধর্ম্ম প্রচারেও অগ্রসর হন নাই। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি রূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীভগবান্ বহু ভাবে বহু দিক দিয়া মানবের উদ্ধারের পথ নির্দ্দেশ করিয়া যান; বুদ্ধদেব তাহারই কয়েকটী বিশেষ বিশেষ পন্থার অনুসরণ করেন। *

কাল-বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রকৃতি-পদ্ধতি স্বভাবতঃই কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে। তদনুসারে মানুষের ধ্যান-ধারণা-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আর তদনুসারে মোক্ষের বা মুক্তির পন্থাও, কিয়ৎপরিমাণে সময়ের ও শক্তির অনুসারী হইয়া থাকে। বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী কর্ম্মানুষ্ঠান আবহমান কাল বিহিত আছে। তাহার মধ্যে যে কর্ম্মানুষ্ঠান যে সময়ের উপযোগী, শ্রীভগবান সময়ে সময়ে তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বুদ্ধদেব তাহারই একতম কর্ম্মানুষ্ঠান-পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব কখনও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। পরন্তু তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিতেন বলিয়াই প্রমাণ পাওয়া যায়। যাঁহারা জ্ঞানমার্গের অত্যুচ্চ সোপানে অধিরূঢ়, তাঁহাদের জন্য তিনি পূর্ণ জ্ঞানের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; আবার যাহারা নিম্নস্তরে অবস্থিত, তাহাদিগকে তিনি সেই স্তরের উপযোগী উপদেশই প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবারও বলিতেছি, তাঁহার প্রচলিত ধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নহে। তিনি নিজে হিন্দু ছিলেন; তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের এক অংশের বিকাশ মাত্র। সাধারণ জন-শ্রেণীর মধ্যে যাহারা তাঁহার অনুসরণকারী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও হিন্দু ছিলেন; আবার যাঁহারা তাঁহার প্রধান শিষ্য মধ্যে পরিগণিত ছিলেন,

বৌদ্ধধর্ম্মে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম।

* প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসলেখক রিজ্ ডেভিড্স্ লিখিয়াছেন—"Buddhism was the child,—the product of Hinduism. Goutama's whole training was Brahmanism..." *Vide*, Rhys David's *Buddhism*. ডাক্তার ওল্‌ডেনবর্গও এই কথারই প্রতিধ্বনি করেন। তিনি বলেন,—"We now proceed to trace step by step the process of that self-destruction of the Vedic religious thought which has produced Buddhism as its positive outcome."—*Buddha: His Life, His Doctrine, His Order* by Dr. Oldenburg. ওল্‌ডেনবর্গ অন্য আর এক স্থলে বলিয়াছেন,—"People are accustomed to speak of Buddhism as opposed to Brahmanism, somewhat in the way that it is allowable to speak of Lutherism as an opponent of Papacy. But if they mean, as they might be inclined from this parallel to do, to picture to themselves a kind of Brahmnical hierarchy which is assailed by Buddha, which opposed its resistance to its operations like the resistance of the party in possession to an upstart, they are mistaken.' বাইগাণ্ডেট প্রণীত ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থেও ঐ মত পরিব্যক্ত—"Buddhism has originated to a considerable extent from Brahminism." *The Life or Legend of Gaudama: The Buddha of the Burmese* by Rt. Rev. P. Bigandet. অধিক মন্তব্য উদ্ধারের আবশ্যক নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব যে অংশে আলোচিত হইবে, সেইখানেই এ সকল বিষয় বিশেষভাবে বুঝান যাইবে।

তাঁহারাও হিন্দু দর্শনেরই অনুসরণকারী হইয়াছিলেন। তিনি যে মনস্তত্ত্ব ও ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূলতত্ত্ব হিন্দু-শাস্ত্রের মধ্যে আছেই আছে। প্রতিমা চিরদিনই মূর্ত্তিমতী ছিলেন; কেহ বা তাঁহাকে অলঙ্কারে সাজাইয়াছেন; কেহ বা তাঁহার অঙ্গরাগ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন; কেহ বা তাঁহার জ্যোতিঃ-বিভূতি লক্ষ্য করাইয়াছেন; কেহ বা তাঁহার মহিমা-মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া আছেন। হিন্দুধর্ম্মের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিষয়ে এবম্বিধ ভাবই মনে আসিতে পারে। আদিভূত বৌদ্ধধর্ম্ম—নূতন ধর্ম্ম নহে; উহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরই অঙ্গ-বিশেষ; কালবশে বিকৃত হইয়া পড়ায় উহা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে মাত্র। পরবর্ত্তী কালে বুদ্ধদেবের শিষ্য-পরম্পরা কর্ত্তৃক সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নানারূপ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার নিজের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী কোনও উপদেশ আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। * বিকৃতিপ্রাপ্ত যে বৌদ্ধধর্ম্ম, তাহা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতিকূল হইতে পারে; কিন্তু সে প্রতিকূলতা—বিকৃতিপ্রাপ্ত হিন্দুধর্ম্মের অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর নহে। † বিশেষতঃ বিকৃতির আতিশয্য-হেতুই প্রায় পনের শত বৎসরের পর বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। ব্যভিচারের রাজত্ব কখনই স্থায়ী হয় না; বৌদ্ধ-প্রভাব তাই লোপ পাইয়াছিল। নচেৎ, বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম—সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ বুদ্ধদেবকে তাই ভগবানের অবতার মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন; ‡ বুদ্ধদেব তাই ভারতের গৃহে গৃহে সম্পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন। অধুনা বৌদ্ধধর্ম্মে ও হিন্দুধর্ম্মে যে প্রকার পার্থক্য সঞ্জাত হইয়াছে, উভয় সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহারে ক্রিয়া-কর্ম্মে যেরূপ স্বাতন্ত্র্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে উভয় ধর্ম্মকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতে অনেকেই কুণ্ঠা বোধ করেন। হিন্দুধর্ম্মের সহিত অধুনা খৃষ্টান-ধর্ম্মের ও মুসলমান-ধর্ম্মের যে পার্থক্য প্রত্যক্ষীভূত হয়, এক হিসাবে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিতও সেইরূপ পার্থক্য আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে এ পার্থক্য ছিল না; বুদ্ধ-অবতারে সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরই বিভাগ-বিশেষের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম তাই হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ মধ্যে এক সময়ে পরিগণিত ছিল। বুদ্ধদেব তাই হিন্দুর অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছিলেন।

---

* সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী কোনও নূতন মত যে বুদ্ধদেব প্রচার করিতে অবতীর্ণ হন নাই, তদ্বিষয় আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। "পৃথিবীর ইতিহাস," তৃতীয় খণ্ড, ১২শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বুদ্ধদেবের উক্তিতে পরবর্ত্তী অংশেও এতদ্বিষয়ক প্রমাণ দেখিতে পাইবেন।

† হিন্দুধর্ম্মে বিকৃতির প্রমাণ-স্বরূপ কাপালিকগণের তান্ত্রিক-ধর্ম্ম এবং বৈষ্ণবগণের কর্ত্তাভজা, নেড়ানেড়ী প্রভৃতির বীভৎস কাণ্ড স্মরণ করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মেও ঐরূপ বিকৃতির অন্ত নাই। কিন্তু সে ত্রুটি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নহে। তাঁহার অনুবর্ত্তিগণই সে জন্য দায়ী।

‡ শ্রীমদ্ভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়ে, বুদ্ধাবতারের বিষয় লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে, 'মায়ামোহ' সংজ্ঞায় বুদ্ধদেবের বিষয় বিবৃত আছে। অগ্নিপুরাণে ষোড়শ অধ্যায়ে এবং বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতে বুদ্ধের উল্লেখ আছে। হিন্দুশাস্ত্রে যিনি ভগবানের অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, কালবশে তাঁহার ধর্ম্মমত কি ভিন্ন মূর্ত্তিই পরিগ্রহ করিয়াছে।

কি কারণেই বা বুদ্ধদেব ভগবানের অবতার-রূপে হিন্দুর নিকট পূজাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর কি কারণেই বা তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম্মমত ভারতবর্ষ হইতে একেবারে উচ্ছেদ-প্রাপ্ত হইয়াছিল; বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলে তাহা বোধগম্য হয়। সে আলোচনায় দেখিবার আবশ্যক—যখন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভারতের সমাজনৈতিক রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল! সে আলোচনায় আরও দেখিবার আবশ্যক—কি অবস্থা হইতে বুদ্ধদেব কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, আর তদ্দ্বারা আমরা কি শিক্ষা পাইতে পারি! সে আলোচনায় আরও দেখা আবশ্যক—কোথায় কোথায় কিরূপভাবে তাঁহার জীবনবৃত্তের ও ধর্ম্মমতের উপাদান-সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়? এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হইলেই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও উচ্ছেদপ্রাপ্তির সকল তত্ত্বই অবগত হওয়া যাইবে। অপিচ, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির কি আবশ্যক হইয়াছিল, তাহাতে তাহাও বেশ বোধগম্য হইবে। প্রশ্ন কয়েকটীর মধ্যে শেষোক্ত প্রশ্নের সমাধান প্রথম আবশ্যক বলিয়া মনে করি। সুতরাং প্রবন্ধ-সূচনায় প্রথমেই দেখিবার চেষ্টা পাইতেছি—কোথায় কোথায় কিরূপভাবে বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তের ও ধর্ম্মমতের উপাদান-সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কারণ অনুসন্ধানে।

* *

বৌদ্ধ-ইতিহাসের উপাদান

[ত্রিবিধ ভাষার উপাদান,—পালি-ভাষার ত্রিপিটকাদি,—ত্রিপিটকান্তর্গত গ্রন্থ-সমূহের পরিচয়;—পালি-ভাষার অন্যান্য গ্রন্থ,—পালিভাষার ত্রিবিধ রূপ;—সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ;—ধর্ম্মগ্রন্থের আবিষ্কার,—বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসমূহের আবিষ্কারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রাণপাত প্রযত্ন।]

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত ও জীবন-চরিত অধুনা পৃথিবীর বহু ভাষায় লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু সে সকল গ্রন্থের উপাদান প্রধানতঃ ত্রিবিধ প্রাচীন ভাষার মধ্যে নিহিত ছিল দেখিতে পাই;—(১) পালি ভাষা, (২) সংস্কৃত ভাষা, (৩) বাঙ্গালা ভাষা। এই তিন ভাষার অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সাহিত্যে যে সকল উপাদান প্রাপ্ত হই; তন্মধ্যে পালি-ভাষার অন্তর্নিহিত উপাদান-সমূহই অধুনা বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে। সেই পালি-ভাষার উপাদান-সমূহের ত্রিবিধ রূপ পরিদৃষ্ট হয়;—(১) সাধারণ প্রচলিত পালি, (২) গাথা আকারে প্রচলিত পালি, (৩) অশোকের খোদিত লিপিতে প্রচলিত পালি। বুদ্ধদেব স্বয়ং কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। তাঁহার উপদেশ-পরম্পরা তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে—ইহাই প্রচার। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর তাঁহার শিষ্যগণ একত্র সমবেত হইয়া তৎপ্রবর্তিত বা তদনুসৃত ধর্ম্মমত আবৃত্তি করিয়াছিলেন। প্রথম বৌদ্ধ সঙ্ঘে যে ধর্ম্মমতের আবৃত্তি হইয়াছিল, তাহা "থেরাবেদ" নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু সে "থেরাবেদ" এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধগণ তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র

উপাদান গ্রন্থ-সমূহ।

'ত্রিপিটককে' সেই "থেরাবেদ" বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু ত্রিপিটকের আকার যেরূপ সুবৃহৎ, তাহাতে তাহাকে কখনই বৌদ্ধসঙ্ঘে উচ্চারিত 'থেরাবেদ' বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কেহ কেহ তাই বলেন, ত্রিপিটকের মধ্যে 'থেরাবেদ' মিশিয়া আছে। এ বিষয়ে কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। আমাদের মনে হয়, ত্রিবেদান্তর্গত জ্ঞানকাণ্ডমূলক অংশসমূহ বুদ্ধদেব মান্য করিতেন, আর তাহাই প্রথম বৌদ্ধসঙ্ঘে আবৃত্ত বা গীত হইয়াছিল। ত্রৈয়ী বা ত্রিবেদ বিকৃতিবশে 'থেরাবেদ'রূপ নাম পরিগ্রহ করিয়া থাকিবে। বুদ্ধদেব বেদ-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া অধুনা যে লোকসমাজে কিংবদন্তী আছে, তাহা সর্ব্বথা অভ্রান্ত নহে। বেদ-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিলে, তিনি কখনই হিন্দুর অবতার মধ্যে পরিগণিত হইতেন না। সুতরাং বুঝিতে পারা যায়, বেদবিহিত ধর্ম্মের একাঙ্গ তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার পর, তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ কর্তৃক সে ধর্ম্মমত রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে। ফলতঃ, 'থেরাবেদ' বলিতে ত্রিবেদ ('ত্রয়ী') বলিয়া মনে হয়; এবং বুদ্ধদেব প্রচারিত ধর্ম্মমতের সারতত্ত্ব নিষ্কাষণে তিনি বেদোক্ত জ্ঞানমার্গের অনুসরণকারী ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তবে যখন 'থেরাবেদ' দুর্ল্লভ ও দুষ্প্রাপ্য, তখন অধুনা যে সকল গ্রন্থের অস্থি-কঙ্কাল পাওয়া যাইতেছে, তদনুসারেই 'থেরাবেদের' পরিচয় দিতে হইতেছে। 'দ্বীপবংশের' মতে, 'থেরাবেদ' নয় ভাগে বিভক্ত;—(১) 'সুত্ত'—উপদেশ, (২) 'গেয়'—গদ্য পদ্য মিশ্রিত, (৩) 'ব্যাকরণ'—ব্যাখ্যা, (৪) 'গাথা'—শ্লোক, (৫) 'উদান'—উন্নত অবস্থার সঙ্গীত, (৬) 'ইত্যুক্ত' বা 'ইতিবুত্তক'—শাস্তিময়ের বাক্য, (৭) 'জাতক'—বুদ্ধদেবের জন্মবৃত্তান্তমূলক গল্পসমূহ, (৮) 'অভূত' বা 'অদ্ভুতধর্ম্ম'—গূঢ়-তত্ত্ব বিষয়ক, (৯) 'বেদল্ল'—প্রবন্ধ। বলা বাহুল্য, এ সকলের অধিকাংশ এক্ষণে ত্রিপিটকান্তর্গত সুত্ত-গ্রন্থের পর্য্যায়ভুক্ত আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। 'থেরা' শব্দের অর্থ 'ভিক্ষু' বা বৌদ্ধসন্ন্যাসী এবং 'বেদ' শব্দে 'জ্ঞান' বুঝায়; সুতরাং 'থেরাবেদ' বলিতে, ভিক্ষুগণ বুদ্ধদেবের নিকট যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু তাহা কখনই জাতকাদির গল্পমূলক বলিয়া মনে হয় না। সে জ্ঞান—বেদমূলক জ্ঞান বলিয়াই বিশ্বাস হয়। পরবর্ত্তিকালে তাহা রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সংক্রান্ত এখন দুই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক শ্রেণীর গ্রন্থ উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণের নিকট সমাদৃত এবং অন্য শ্রেণীর গ্রন্থ দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণের নিকট সম্মান-প্রাপ্ত।

বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ।

নেপাল তিব্বত চীন জাপান প্রভৃতি প্রথমোক্ত (উত্তর-দেশীয়) সম্প্রদায়-ভুক্ত; সিংহল (লঙ্কাদ্বীপ), দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধগণ শেষোক্ত (দক্ষিণ-দেশীয়) বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত। দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণ ত্রিপিটকান্তর্গত গ্রন্থ-সমূহকে সমাদর করিয়া থাকেন। উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণের গ্রন্থাদি সাধারণতঃ 'মহাবৈপুল্য' বা 'নবধর্ম্ম' গ্রন্থ নামে পরিচিত। এই নবধর্ম্ম পর্য্যায়ভুক্ত গ্রন্থাদির সংখ্যা (নেপাল-দেশীয় বৌদ্ধগণের মতে) অন্যূন আশী হাজার। ললিতবিস্তর, সুবর্ণপ্রভাস, অষ্টসাহস্রিক, কারণ্ডব্যূহ, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ-সমূহ এই

পর্য্যায়ভুক্ত। এই মতে বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, বৈপুল্য, অভিধর্ম্ম, গাথা, ধার্ম, নিদান, অবদান, উপদেশ, ইত্যুক্ত, জাতক—এই দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। উত্তর-দেশীয় ও দক্ষিণ-দেশীয় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই 'থেরাবেদের' সম্মান দৃষ্ট হয়।

দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধগণের ধর্ম্মগ্রন্থাদি।

ত্রিবিধ ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থাদির মধ্যে পালিভাষার গ্রন্থসমূহকেই দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃষ্ট উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই উপাদান-সমূহকে পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন; প্রথম,—প্রাচীনতম বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসমূহ—যাহা এখন বিদ্যমান আছে; দ্বিতীয়,—বুদ্ধঘোষ-বিরচিত টীকা-টিপ্পনী; যদিও উহা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর রচনা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, কিন্তু অতি প্রাচীন গ্রন্থাদির উপর যে উহা লিখিত, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই; তৃতীয়তঃ—ইতিহাস ব্যাকরণ প্রভৃতি পালি ভাষার অন্যান্য গ্রন্থ; ঐ সকল গ্রন্থ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে বিভিন্ন সময়ে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ ত্রিপিটক্ (তেপেটক) বিশেষ প্রসিদ্ধ। ত্রিপিটক শব্দের অর্থ—তিনটী আধার বা রত্ন-ভাণ্ডার। ত্রিপিটকান্তর্গত সেই তিন রত্নভাণ্ডারের নাম,—(১) সুত্ত (সূত্র) অর্থাৎ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সত্য মত, (২) বিনয় অর্থাৎ শিক্ষা বা আজ্ঞাধীনত্ব; (৩) অভিধম্ম অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান। সূত্রপিটকে গৌতম বুদ্ধের প্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশসমূহ স্থান পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাঁহার শিষ্যপরম্পরা-প্রদত্ত কোনও কোনও উপদেশও উহাতে লিপিবদ্ধ আছে সপ্রমাণ হয়। কথিত হয়,—সূত্র-পিটকের প্রথমাংশে কর্ত্তা ও বক্তা বুদ্ধদেব স্বয়ং; তাঁহারই বাক্যাবলি যথাযথ ঐ অংশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য স্থলে প্রায়ই তাঁহার শিষ্য উপদেষ্টা রূপে অবস্থিত; এবং কোথায় কোথায় কি ভাবে কখন গৌতম ও তাঁহার শিষ্যগণ উপদেশ প্রচার করেন, তাহার অনুক্রমণিকা আছে। সূত্রপিটকের অন্যান্য অংশের মধ্যে 'জাতক' উপাখ্যান-সমূহ, নিদেশ (গৌতম-শিষ্য সারিপুত্র কর্ত্তৃক টিপ্পনী রূপে লিখিত এবং বিভিন্ন সময়ে উচ্চারিত গাথা-সমূহ—থেরাগাথা) উহাতে স্থান পাইয়াছে। 'বিনয়-পিটক' অংশে বৌদ্ধধর্ম্মযাজকগণের প্রতিপাল্য বিধি-বিধান এবং সঙ্ঘের নিয়মাদি লিখিত আছে; গৌতমের জীবনের বহু কাহিনী এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠার বিষয় এই অংশে স্থান পাইয়াছে। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ কি ভাবে জীবন-যাপন করিবেন, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ এই অংশে প্রদত্ত হইয়াছে। বিনয় পিটকের নিয়মাবলি অধিকাংশই গৌতম কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে শিষ্যগণ কতক নিয়ম পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করেন; কিন্তু তাহা হইলেও বিনয় পিটকের সকল নিয়মই বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। 'অভিধম্ম-পিটকে' মনোবিজ্ঞানের বিবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। লোকান্তরে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আত্মা কি ভাবে অবস্থিতি করে, ভূত-সমূহের স্বরূপ-তত্ত্ব, বিদ্যমানতার কারণ-পরম্পরা, ব্যক্তিগত গুণধর্ম্ম প্রভৃতি নানা বিষয় অভিধম্ম পিটকে স্থান পাইয়াছে। যদিও অভিধম্ম পিটকে কোনও নূতন মত প্রবর্ত্তিত হয় নাই, কিন্তু সাররত্ন সত্য তত্ত্ব বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় উহাতে নানা পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে;

তাহাই উহার অভিনবত্ব। ত্রিপিটক—বৌদ্ধগণের পবিত্র পুস্তক। ভগবান বুদ্ধের বাক্যাবলি যথাযথ ত্রিপিটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে;—এই বিশ্বাসে উহার সম্মানের অবধি নাই। বৌদ্ধগণের জীবনের সকল অবস্থার সকল সমস্যার সমাধান ত্রিপিটকে সন্নিবিষ্ট আছে। কালবশে পরিবর্তন-প্রবাহে পড়িয়া যদিও আদিগ্রন্থ কতক কতক পরিবর্তিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও ত্রিপিটকের মধ্যেই যে বৌদ্ধধর্ম্মের সাররত্ন নিহিত আছে, এবং ত্রিপিটক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় কর্তৃক সর্ব্বথা যে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সংক্ষেপতঃ ত্রিপিটকান্তর্গত গ্রন্থ-সমূহের পরিচয় এইরূপ প্রদত্ত হয়;—

(১) সুত্ত-পিটক—ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আছে।

১। দীঘ্‌ঘনিকায়।—এই গ্রন্থে ৩৪টী প্রসঙ্গ আছে। তাহার একটী প্রসঙ্গ "মহা-পরিনিব্বাণ সুত্ত" নামে পরিচিত। সেই অংশে বুদ্ধদেবের জীবনের শেষ তিন মাসের ঘটনাবলী ধারাবাহিক বিবৃত আছে।

২। মজ্‌ঝিমনিকায়।—ইহাতে ১৫২টী প্রসঙ্গ আছে।

৩। সংযুত্তনিকায়।—ইহা পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত কতকগুলি সূত্রে গ্রথিত।

৪। অঙ্গুত্তর নিকায়।—পিটক-সমূহের মধ্যে এইখানিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে নানা বিষয়ের আলোচনা আছে।

৫। খুদ্দক-নিকায়।—এই নিকায়ের মধ্যে পনের খানি পুস্তক আছে। যথা,—(১) খুদ্দক-পাঠ,—ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি পাঠ আছে; (২) ধম্মপদ,—ইহাতে নীতি ও ধর্ম্মভাবোদ্দীপক কবিতা আছে; (৩) উদান,—ইহাতে বুদ্ধদেব কর্তৃক গীত উচ্চভাবমূলক কয়েকটী সঙ্গীত আছে; (৪) ইতিবুত্তক,—ইহাতে বুদ্ধদেবের ১১০টী উপদেশ আছে; (৫) সুত্তনিপাত,—ইহাতে ধর্ম্মবিষয়ক ৭০টী কবিতা আছে, (৬) বিমানবত্থু,—ইহাতে স্বর্গধামের বিবরণ বর্ণিত আছে; (৭) পেতবত্থু,—ইহাতে প্রেতগণের বিষয় বর্ণিত আছে; (৮) থেরাগাথা,—ইহাতে ভিক্ষুগণের রচিত কতকগুলি কবিতা আছে; (৯) থেরীগাথা,—ইহাতে ভিক্ষুণীগণের রচিত কতকগুলি কবিতা আছে; (১০) জাতক,—ইহাতে বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধে ৫৫০টী গল্প আছে; (১১) নিদেশ,—ইহাতে সুত্তনিপাতের উপর টিপ্পনী আছে; (১২) পতিসম্ভিদা,—ইহাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের জ্ঞানলাভ দর্শনের বিষয় বিবৃত আছে; (১৩) অবদান,—বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প আছে; (১৫) চারিয়পিটক, জাতক-গল্পান্তর্গত কতকগুলি কবিতা এতন্মধ্যে স্থান পাইয়াছে; (১৪) বুদ্ধবংশ—গৌতম-বুদ্ধ সহ বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্ব্বিংশ বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে পরিবর্ণিত আছে।

(২) বিনয়-পিটক—ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আছে।

১। সুত্তবিভঙ্গ।—এই অংশে টীকা-সহ পতিমোখ গ্রন্থ আছে। বৌদ্ধভিক্ষুগণ সম্বন্ধে যে সকল কঠোর বিধি-বিধান আছে, এই গ্রন্থে তাহা পরিদৃষ্ট হয়। পতিমোখ গ্রন্থে পাপকর্ম্মের ও শাস্তির লক্ষণাদি লিখিত আছে। প্রতি পূর্ণিমায় ও প্রতিপদে সঙ্ঘভুক্ত ভিক্ষুগণকে এই গ্রন্থান্তর্গত পাপের ও শাস্তির লক্ষণাদি শুনান হয়। তদনুসারে বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত

জনগণ যিনি যেরূপ পাপ করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করেন। পাপের স্বীকারে পাপভার লাঘব হয়, ইহাই বৌদ্ধগণের ধারণা।

২। খণ্ডকসমূহ।—মহাবগ্‌গ এবং চুল্লবগ্‌গ খণ্ডক গ্রন্থের অন্তর্গত। এই দুই গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের জীবনের বহু কাহিনী বিবৃত আছে।

৩। পরিবারপাঠ।—ইহাতে বিনয়পিটকের নির্ঘণ্ট এবং সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩) অভিধম্মপিটক—ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আছে।

১। ধম্ম-সঙ্গনি।—বিভিন্ন লোকে জীবনের অবস্থার বিষয় ইহাতে বিবৃত আছে।

২। বিভঙ্গ।—বিভিন্ন বিষয়ক অষ্টাদশ প্রবন্ধে এই গ্রন্থ বিরচিত।

৩। কথাবত্থু।—বিচার-বিতর্কমূলক সহস্র সন্দর্ভে সংগ্রথিত।

৪। পুগ্‌গল-পন্নত্তি।—ব্যক্তিগত গুণ-ধর্ম্মের বিষয় এই গ্রন্থে বিবৃত আছে।

৫। ধাতুকথা।—ইহাতে ভূত সমূহের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

৬। যমক।—পৃথিবীতে যে পরস্পর-বিরোধী দুই ভাব পরিদৃষ্ট হয়, তাহার বিষয় ইহাতে বিবৃত আছে।

৭। পঠন্।—ইহাতে অস্তিত্বের বা সত্তার বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

ত্রিপিটকান্তর্গত পালিভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহ ভিন্ন, আর দুইখানি গ্রন্থ বৌদ্ধধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাসের প্রকৃষ্ট উপাদান মধ্যে পরিগণিত হইয়া আছে। সেই দুইখানি গ্রন্থও পালি ভাষায় লিখিত। সেই গ্রন্থদ্বয়ের নাম,—(১) দ্বীপবংশ ও (২) মহাবংশ। ঐ দুই গ্রন্থ বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস বলিয়া সাধারণতঃ পরিকীর্ত্তিত হয়। বুদ্ধদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত যে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, দ্বীপবংশে ও মহাবংশে তাহার প্রমাণ পাই। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে বৈশালী-সঙ্ঘের ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক যথাক্রমে দুইটী বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশন হয়। প্রথম সভায় প্রাচীন মতাবলম্বী গোঁড়া বৌদ্ধগণ যোগদান করিয়াছিলেন। শেষোক্ত সম্মিলনে অধিক লোকের সমাগম হয়। শেষোক্ত সম্মিলন "মহাসঙ্গীতি" নামে প্রসিদ্ধ। এই দুই মহাসম্মিলনের ফলে বৌদ্ধগণ দুই ভাগে (উত্তরদেশীয় ও দক্ষিণদেশীয়) বিভক্ত হয়। শেষোক্ত মহাসভার ফলে যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণ আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বহু পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন সাধন করিয়াছিলেন, দ্বীপবংশে তাহা স্পষ্টতঃ লিখিত আছে। যাহা হউক, পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন প্রভৃতি সত্ত্বেও বৌদ্ধগণ বুদ্ধের উপদেশে কখনই অনাস্থাবান নহেন। মহাপুরুষের মহান্ আদেশ প্রতিপালন পক্ষে তাঁহারা নিয়ত প্রযত্নপর। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের গ্রন্থসমূহ বহুদিন পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই; শ্রুতির ন্যায় তৎসমুদায় কণ্ঠে কণ্ঠে আবৃত্ত হইয়া আসিতেছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে, সম্ভবতঃ ৮৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, বুদ্ধদেবের উপদেশসমূহ প্রথম লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। দ্বীপবংশে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, টীকাসহ মূল ত্রিপিটক গ্রন্থ ভিক্ষুগণ পূর্ব্বাপর স্মৃতিমূলে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং বংশের পর বংশ-পরম্পরায় উহা মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় আপন ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যদি তিনি বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষায়ই

পালি-ভাষার পরিবর্ত্তন।

তিনি অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন মনে হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কিংবদন্তী অন্যরূপ। প্রচার এই যে, সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে বুদ্ধদেব দেশ-প্রচলিত ভাষায় আপন মত প্রচারিত করিয়া যান। যদিও এ সম্বন্ধে নানা প্রমাণ-পরম্পরা দেখিতে পাই, কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি বেদবিহিত ধর্ম্মই মান্য করিতেন, এবং কখনই সংস্কৃত ভাষাকে উপেক্ষা করেন নাই। তবে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আপন ধর্ম্মমত প্রচারের আবশ্যকতা অনুভব করায়, তিনি প্রাদেশিক বিভিন্ন ভাষায় সে মতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রচার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, মনে করা যাইতে পারে। যে সকল প্রমাণ উপলক্ষে পালি ভাষায় তিনি আপন ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সেই সকল প্রসঙ্গের আলোচনাতেই আমাদের উক্তির ভিত্তিভূমি দৃঢ় হইতে পারে। "চুল্লবগ্‌গ' পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—যামেলু ও তেকুলা নামক ব্রাহ্মণ-বংশীয় ভ্রাতৃদ্বয় ভিক্ষুধর্ম্মাবলী ছিলেন। তাঁহাদের বাক্য আবৃত্তি বড়ই প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহারা একদিন গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন,—'ভগবন্! এখন বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন বংশের, বিভিন্ন জাতির ভিক্ষুত্ব গ্রহণ দেখিতে পাইতেছি। বুদ্ধদেবের বাক্যসমূহ তাহাদের আপন আপন ভাষার উচ্চারণে বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। অতএব প্রভুর বাক্য ছন্দে (সংস্কৃত ভাষায়) গ্রথিত থাকাই বাঞ্ছনীয়।' বুদ্ধদেব তাহাতে উত্তর দেন,—'আমি সকলকেই নিজ নিজ ভাষায় বুদ্ধের উপদেশসমূহ শিক্ষা দিতে অনুমতি দিই।' ফলতঃ, দেশ-প্রচলিত বিভিন্ন ভাষায় আপন ধর্ম্মমত প্রচার করিতে অনুমতি দেওয়ায়, মূল বাক্য নানা ভাবে নানা আকারে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। তবে যে পালি-ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিই এখন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এবং পূর্ব্বের অন্য কোনও ভাষায় নিবদ্ধ কোনও গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে না, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ ইহাও হইতে পারে যে, পালি ভাষা যখন রাজভাষা ছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম তখন রাজপরিগৃহীত ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজ-ভাষাতেই ঐ ধর্ম্মের মতসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। মূল বাইবেল হিব্রু ভাষায় লিখিত হইলেও, ইংরেজের রাজ্যে যেমন ধর্ম্মালয়ে ইংরেজী ভাষায় তাহার পঠন-পাঠন হইয়া থাকে, পালি-ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসমূহ লিখিত হওয়ার মূলেও তদ্রূপ প্রভাবের বিষয় মনে করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ যে দেশ বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির স্থান, সে দেশে ত্রিপিটকাদি ধর্ম্ম-গ্রন্থের যখন অস্তিত্বাভাব ঘটিয়াছিল, তখন মূল ভাষা বা মূল সূত্র যে ভাষান্তরিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। সিংহলবাসীরা যে আকারে বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাই আদিভূত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহাই যুক্তিযুক্ত। বাইবেল যে আকারে অধুনা ভারতবর্ষে পঠিত ও আলোচিত হয়, পূর্ব্বাপর ইতিহাস লোপ পাইলে, সেই বাই-বেলকেই পরবর্ত্তিকালে লোকে আদি বাইবেল বলিয়া মনে করিবে না কি? ব্রাহ্মণের আরাধ্য গায়ত্রী প্রভৃতির মন্ত্র আবহমান-কাল অপরিবর্ত্তিত ভাবে উচ্চারিত হইয়া আসি-তেছে। ভাষান্তরে মন্ত্রাদি উচ্চারণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে, কোন্ কালে আদিভূত মূল মন্ত্র বিকৃত ও লোপ প্রাপ্ত হইত! পালি-ভাষার স্তরগত পার্থক্যের বিষয় অনুধাবন করিলে, এ সমস্যা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অধুনা পালি-ভাষার যে সকল প্রকার-ভেদ আবিষ্কার

হইয়াছে, তদ্দৃষ্টান্তে বিষয়টী বিশদীকৃত হয়। এক্ষণে আমরা প্রধানতঃ পালিভাষার ত্রিবিধ মূর্ত্তির পরিচয় পাইতেছি। প্রথম,—গাথা; গাথার পালিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পালি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। * দ্বিতীয়,—অশোক-লিপি। প্রস্তর-গাত্রে রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের যে অনুশাসন-পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত। সেই খোদিত লিপি সমূহের ভাষা, পালি ভাষা বলিয়া সিদ্ধান্ত হইলেও, গাথাকারে প্রচলিত পালি-ভাষা হইতে উহা স্বতন্ত্র। † তৃতীয়,—ত্রিপিটকান্তর্গত গ্রন্থ-সমূহের ভাষা। ত্রিপিটকের কোনও কোনও

* গাথার ভাষাও বিবিধ প্রকার দৃষ্ট হয়। কয়েকটী গাথা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে ভাষার বিভিন্নত্ব উপলব্ধি হইবে। যথা,—

১। জাতং ভূতং সমুপ্পন্নং কতং সঙ্খতমদ্ধুবং,
জরা মরণ সংঘটং রোগ নিড্ডং পভঙ্গুনং।
আহার নেত্তি পভাব নালং তং অভিনন্দিতুং,
তস্স নিস্সরণং সন্তং অতক্কাবচরং ধুবং।
অজাতং অসমুপ্পন্নং অসোকং বিরজং পদং।।
নিরোধো দুক্খ ধম্মানং সঙ্খারূপসমো সুখো।

অর্থাৎ,—"জাত, ভূত, সমুৎপন্ন, কৃত, (কর্ম্ম, চিত্ত, ঋতু, আহার প্রভৃতি হেতু কৃত) সংস্কারজনিত দেহ (পঞ্চস্কন্ধ-রূপ স্থূলদেহ), অধ্রুব (নশ্বর) জরা-মৃত্যু উপদ্রুত, রোগাগার, ভঙ্গশীল (ক্ষয়ধর্ম্মী) ও আহার-প্রসূত স্থূল দেহকে আদর যত্ন করা (ভালবাসা) উচিত নয়। সেই স্থূল দেহের গণ্ডীর বাহির হইবার হেতুভূত অতর্কচর (লৌকিক চিন্তার বহির্ভূত), ধ্রুব অকৃত (কর্ম্ম, চিত্ত, ঋতু, আহার প্রভৃতি হেতুচতুষ্টয় অকৃত), অসমুৎপন্ন (স্থূল দৃষ্টির বহির্ভূত) পরমার্থবশে একান্ত সত্য নির্ব্বাণ, শোক দুঃখহীন, ও নির্ম্মল (রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মলরহিত) ও দুঃখ-ধর্ম্মের নিরোধকারী এবং সংস্কার-ধর্ম্ম উপশান্ত হওয়া হেতু অতি সুখকর।

ললিত-বিস্তরে বিম্বিসারের উক্তি মূলক একটা গাথা,—

"পরম প্রমুদিতোঽস্মি দর্শনাত্তে
অবচিষু স মাগধরাজ বোধিসত্ত্বম্।
ভব হি সম সহায়ু সব রাজ্যং
অহ তব দাস্তে প্রভূতং ভুঙ্ক্ষ কামাম্।
মা চ পুনর্বনে বসাহি শূন্যে
মা ভূয়ু তৃণেষু বসাহি ভূমি বাসং।
পরম সুকুমার তুভ্য কায়ঃ
ইহ মম রাজ্যি বসাহি ভুঙ্ক্ষ কামাম্॥"

ইহা অনেকাংশে সংস্কৃতের অনুসারী। প্রথম ছত্র পুরাপুরি সংস্কৃত। উহার অর্থ, আপনার দর্শনে পরম প্রমুদিত হইয়াছি। দ্বিতীয় ছত্রে এক 'অবিচিষু' শব্দ ভিন্ন অন্য কোনও গোল নাই। ঐ ছত্রের অর্থ, সেই মাগধ-রাজ (বিম্বিসার) বোধিসত্ত্বকে বলিয়াছিলেন। তৃতীয় ছত্রে 'সহায়ু', ও 'সব' শব্দ দ্বয় সহায়ঃ ও সর্ব্ব শব্দের পরিবর্ত্তে এবং চতুর্থ ছত্রের 'অহ' শব্দ 'অহং' শব্দের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে প্রতিপন্ন হয়। তাহা হইলে ঐ দুই ছত্রের অর্থ হয়,—'আপনি আমার সহায় হউন, আমি আপনাকে সমস্ত রাজ্য দান করিতেছি। আপনি প্রভূত-কাম্য বস্তু ভোগ করুন।' ইত্যাদি। পঞ্চম পংক্তির 'বসাহি' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বসক, ষষ্ঠ পংক্তির 'ভূয়ু' শব্দের পরিবর্ত্তে 'ভূয়ঃ' সপ্তম পংক্তির 'সুকুমার' স্থলে 'সুকুমারঃ' ও 'তুভ্য' স্থলে 'তব' এবং অষ্টম পংক্তির 'রাজ্যি' স্থলে 'রাজ্যে' ইত্যাদি হওয়া সংস্কৃতে সঙ্গত ছিল। যাহা হউক, 'ললিত-বিস্তরে' যে সকল গাথা দেখিতে পাই, তাহা প্রায়ই সংস্কৃতের অনুসারী। প্রথমোক্ত গাথা হইতে এ সকল গাথার পার্থক্য বেশ অনুভূত হয়।

† অশোক-লিপির একটী আদর্শ নিম্নে প্রদর্শিত হইল;—

"দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং আহা, কয়নং মেব দেখতি, ইয়ং মে কয়ানে কটেতি' নো মিন পাপং দখতি, ইয়ং মে পাপে কটেতি। ইয়ং বা আসিনবে নামাতি দুপটিবেখে চু খো এসা হেবং চু মা খো এস দেখিয়ে, ইমানি আসিনব গামীনি নাম, অথ চংডিয়ে নিঠূলিয়ে কোধে মানে ইর্ষ্যা কালনেন ব হকং পলিভসয়িসম, এষ বাঢ় দেখিয়ে, ইয়ং মে হিদতি-কায়ে ইয়ং ম নাম পালতি কায়ে।"

অংশ খোদিত লিপির মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং সেই সেই অংশ যে অশোকের খোদিত লিপি প্রচারের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহা স্বতঃই সপ্রমাণ হয়। ত্রিপিটক এবং দ্বীপবংশ ও মহাবংশ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণের নিকট সম্যক সমাদরপ্রাপ্ত। *

অর্থাৎ,—'দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ বলেন। (মনুষ্য) আপনার সুকার্য্যই কেবল দেখে, (এবং বলে) এই সুকার্য্য আমি করিয়াছি। (সে) কিঞ্চিন্মাত্রও পাপ দেখে না, (এবং বলে না) এই পাপ আমি করিয়াছি। অথবা এইটীর নাম দোষ—ইহাও বস্তুতঃ দুষ্প্রতিবেক্ষ্য। তাহার এইরূপ দেখা উচিত যে, এই-গুলি দোষগামী, এবং আমি চণ্ডতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, অভিমান ও ঈর্ষ্যার কারণে নিজকে পরিভ্রষ্ট করিব না। ইহা পুনঃপুনঃ দেখা উচিত—এইটী আমার ঐহিক (প্রয়োজন); এইটী আমার পারত্রিক (প্রয়োজন)।"

সংস্কৃতের সহিত এই পালির কি পার্থক্য, মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহা এইরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা,—

অশোক লিপি।	সংস্কৃত শব্দ।	অশোকের লিপি।	সংস্কৃত শব্দ।
দেবানং	দেবানা'	দুপটিবেখে	দুষ্প্রতিবীক্ষ্য
পিয়	প্রিয	চু	চ
পিযদসি	প্রিয়দর্শী	খু	খলু
লাজ	রাজা	এসা	এষা
হেবং	এবং	খো	খলু
আহা	আহ	দেখিয়ে	দ্রষ্টব্য
কয়ন	কল্যাণ	ইমানি	ইমানি
মেব	এব	চ ডিয়	চণ্ডতা
দেখতি	পশ্যতি	নিঠু এযে	নৈষ্ঠুর্য্য
ইয়ং	ইয়ং	কোধ	ক্রোধ
মে	মে	ইস্যা	ঈর্ষ্যা
কয়াণে	কল্যাণ	কাল.নন	কারণেন
কটেতি	কৃতেতি	ব	বা
নো	ন	হক	আত্মানং
মিন	মনাক্	এস	এষঃ
পাপং	পাপং	বাঢ়	বাঢং
দথতি	পশ্যতি	হিদতিকায়ে	ঐহিকায়
পাপ	পাপং	পলিভসয়িসম্	পরিভ্রংশয়িষ্যামি
আসিনবে	আদীনব	ম	মে
নামাতি	নামেতি	পালতিকায়ে	পারত্রিকায়

সংস্কৃতের সহিত অশোক পালির যে পার্থক্য, ততটা পার্থক্য ত্রিপিটকের পালির সঙ্গে নহে। পুস্তক পাঠ হইতে সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধগণ যে প্রতিজ্ঞা পাঠ করেন, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেও কতকটা সংস্কৃতের অনুসরণ দেখিতে পাইবেন,—

"নম তস ভাগবত অইত সম সমবুদ্ধসঃ
বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
ধম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।
দ্যুতম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
দ্যুতম্পি ধম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
দ্যুতম্পি সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি ধম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি সঙ্ঘম্ শরণম্‌গচ্ছামি।"

উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণ সংস্কৃত ভাষায় ও গাথা-ভাষায় লিখিত গ্রন্থ-সমূহের আদর করেন। তাঁহাদের মতে বুদ্ধদেবের উপদেশ-সমূহ, প্রথমে সংস্কৃত ও 'গাথা' ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল এবং সেই সকল ক্রমশঃ তিব্বতীয়, চীনা ও জাপানী ভাষায় অনুদিত হয়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত। 'ললিত-বিস্তর'—বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্ত। উহাতে গৌতমের জন্ম হইতে তাঁহার নির্ব্বাণ-লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের:বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ঐ গ্রন্থের কিয়দংশ গদ্যে এবং কিয়দংশ পদ্যে লিখিত। উহার অন্তর্গত পদ্যাংশ, গদ্যাংশ হইতে প্রাচীন-কালের বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। * 'ললিত-বিস্তর' ভিন্ন, সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত বুদ্ধদেবের আর এক জীবনবৃত্ত আছে। সে গ্রন্থের নাম—বুদ্ধ-চরিত। অশ্বঘোষ বোধিসত্ত্ব সেই

উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণের ধর্ম্মগ্রন্থ।

অন্য আর একটি—

"নিধিং নিধেতি পুরষো গম্ভীরে ওদকন্তিকে।
অত্থে কিচ্চে সমুপ্পন্নে অত্থায়ে মে ভবিসসতীতি।
সব্বে তসন্তি দণ্ডসস সব্বে ভায়ন্তি মচ্চ নো,
অত্তন্তো উপমংকত্বা ন হনেয্য ন ঘাতেয্য।
সো সহসসং সহসসেন সঙ্গমে মানুষে জিনে,
একঞ্চ জেযমত্তানং সবে সঙ্গমে জুত্তমো।
একেকাধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনাজিনে,
জিনে কদরিয়ং দনেন সচ্চেন অলিকবাদিনং।
ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তধী কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মমন্তি এস ধম্মো সনন্তনো॥"

অর্থাৎ,—সকলেই শাস্তিকে ভয় করে, সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে। এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে নিজের সহিত উপমা করিয়া কাহাকেও হত্যা করা ও আঘাত করা উচিত নহে। যিনি সংগ্রামে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে পরাজিত করেন, তাঁহার অপেক্ষা যিনি আপনাকে জয়লাভ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শ্রেষ্ঠ বীর। ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা, অসাধুকে সাধুতার দ্বারা, কৃপণকে দানের দ্বারা, মিথ্যাকে সত্যের দ্বারা জয় করিবে। শত্রুতায় শত্রুতা যায় না; মিত্রতায় শত্রুতা নষ্ট হয়,—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।"

পালি গদ্য:—"চতুসচ্চ-নিদ্দেসং—পুন চ পরং ভিক্‌খবে ভিক্‌খু ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি চতুসু অরিয়-সচ্চেসু,—কথঞ্চ ভিক্‌খবে ভিক্‌খু ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি চতুসু অরিয়-সচ্চেসুং—ইধ ভিক্‌খবে ভিক্‌খ ইদং দুক্‌খান্ত যথাভূতং পজানাতি, অয়ং দুক্‌খ সমুদয়োতি যথাভূতং পজানাতি, অয়ং দুক্‌খ নিরোধোতি যথাভূতং পজানাতি, অয়ং দুক্‌খ নিরোধগামিনী পটিপদাতিযথাভূতং পজানাতি।"

অর্থাৎ,—"চারি সত্য নির্দ্দেশ। হে ভিক্ষুগণ! তিনি কিরূপে চারি আর্য্য সত্যধর্ম্ম ধর্ম্মদর্শী হইয়া অবস্থান করেন? এখানে হে ভিক্ষুগণ! ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখসমুদায়, ইহা দুঃখনিরোধ ও ইহা দুঃখ-নিরোধের উপায়, ইহা তিনি যথাযথভাবে জানেন।"

* ললিতবিস্তর কিরূপ সমাদৃত প্রাচীন গ্রন্থ, বিভিন্ন ভাষায় উহার অনুবাদাদির বিষয় অনুধাবন করিলে, বুঝিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য দেশে এম ফোকস্ (M. Foucaux) ফরাসি-ভাষায় প্রথম এই গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিব্বতীয় ভাষা হইতে তাঁহার অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি প্রমাণ পান যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিব্বতীয় ভাষায় ললিতবিস্তরের অনুবাদ প্রচলিত ছিল। তাহা হইতে, ললিতবিস্তর সংস্কৃত গ্রন্থ কত প্রাচীন, অনেকটা অনুভব হইতে পারে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ললিতবিস্তরের মূল ও ইংরাজী অনুবাদ কতক অংশ প্রকাশ করেন। হেডেলবার্গ সহরের প্রফেসার লেফম্যান (Prof. Lefmaun) জর্ম্মাণ ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন। *Vide* Rhys David's *Buddhism*.

ইঁহার রচয়িতা। 'ললিত-বিস্তরের' পরই সে গ্রন্থের প্রামাণ্য প্রতিপন্ন হয়। সংস্কৃত ভাষার আরও বহু গ্রন্থে বুদ্ধদেবের ও তাঁহার ধর্ম্মের বিষয় লিখিত আছে। * সেই সকল গ্রন্থও তিব্বতীয়, চৈন ও জাপানী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অনুবাদ গ্রন্থাদি ভিন্নও চীন-ভাষায় বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত সংক্রান্ত চোদ্দখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। † বোধিসত্ত্বের গ্রন্থ তিব্বতীয় চৈন ও জাপানী ভাষায় এবং পালি সিংহলী ব্রহ্মদেশীয় প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ধর্ম্মরক্ষা নামক জনৈক ভিক্ষু কর্ত্তৃক চীনা ভাষায় ইহার অনুবাদ সম্পন্ন হয়। স্যামুয়েল বীল ইংরাজী ভাষায় ঐ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'চীনদেশে বুদ্ধদেবের যত জীবন-চরিত আছে, তাহার মধ্যে বুদ্ধচরিতের ঐ অনুবাদ-গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।' ‡ বুদ্ধচরিত-রচয়িতা বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষ—বুদ্ধের পরবর্ত্তী দ্বাদশ সংখ্যক বৌদ্ধাচার্য্য। তিনি কণিষ্কের সমসাময়িক বলিয়া কথিত হন। 'অশ্বঘোষের উপদেশ' নামক আর একখানি গ্রন্থ চীনা-ভাষায় ('কা-চোয়ং-য়ান-কিং-লিন' নামে) অনুবাদিত হয়। কুমারজীব নামক জনৈক চৈন ঐ গ্রন্থের অনুবাদ করেন। তিনি ভারতীয় ভাষা প্রভৃতিতে এতই অভিজ্ঞ ছিলেন যে, তাঁহাকে লোকে সাধারণতঃ ভারতবর্ষের অধিবাসী বলিয়া মনে করিত। ধর্ম্মরক্ষা কিন্তু ভারতের অধিবাসী বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। বৌদ্ধ-সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। উভয়ের গ্রন্থই ৪০০ খৃষ্টাব্দে সমসময়ে অনুবাদিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ মহাকাব্য প্রভৃতি প্রণয়নের জন্য এবং বৌদ্ধদর্শন সংক্রান্ত গ্রন্থাদি রচনার জন্য ও পালি গ্রন্থাদির টীকার জন্য অশ্বঘোষ চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

---

* সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কয়েকখানি বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থের নাম;—(১) প্রজ্ঞাপারামিতা, (২) সুবর্ণ প্রভাস, (৩) তথাগত গুহ্যক, (৪) অষ্টসাহস্রিক, (৫) দশভূমীশ্বর, (৬) সমাধিরাজ, (৭) লঙ্কাবতার, (৮) সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরিক, (৯) অভিধর্ম্ম (১০) সাবর্ণ-সূত্র, (১১) ধর্ম্ম বোধ, (১২) ধর্ম্ম সংগ্রহ (১৩) বিনয় সূত্র (১৪) মহাবিনয়-সূত্র, (১৫) অবদান খণ্ড, (১৬) চেত্য-মাহাত্ম্য, (১৭) বুদ্ধশিক্ষাসমুচ্চয়, (১৮) বুদ্ধকপাল তন্ত্র, (১৯) সংকীর্ণ তন্ত্র, (২০) জাতক-মালা, (২১) কারণ্ডব্যূহ ইত্যাদি। হজসন সাহেব (Mr. Hodgson) নেপালে অবস্থান কালে ঐ সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। হজসনের সংগৃহীত আর দুই খানি পুস্তক বিশেষ প্রসিদ্ধ। সে দুইখানিই অশোকের জীবনচরিত,—(১) অশোক অবদান, (২) দিব্য অবদান। বৌদ্ধ ধর্ম্মসংক্রান্ত অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয়—অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, সঙ্ঘ, বসুবন্ধু, আর্য্যদেব প্রভৃতির গ্রন্থাদির বিবরণ—পরবর্ত্তী অংশে 'মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থকারগণ' প্রসঙ্গে পরিবর্ণিত আছে। তিব্বতে এবং চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থাদি অনূদিত ও সংরক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই এখন আমরা ঐ সকল গ্রন্থের সন্ধান পাইতেছি।

† চীনা-ভাষায় লিখিত বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত সংক্রান্ত গ্রন্থাদির নাম —(১) ফো পেন-হিং-কিং, (২) সিন-হিং-পেন-কি-কিং, (৩) সিযান-পেন-কে-কিং, (৪) টা-সেন সুত হিং পেন কু-কিং, (৫) কু-পেন কি কিং, (৬) ফি-আন-কিং, (৭) কো ও যিন-কো কিং, (৮) কৌ ও হিয়েন সাই যিন কো কিং, (৯) ফো-পন হি-কিং, (১০) ফাং-কোয়াং-তাই-কোয়া-য়ান-কিং, (১১) সা বিযা-লো চা-শো-সি ফো হি-কিং, (১২) ফো-পেন-হিং-সি-কিং, (১৩) ফো-শো-চা-ই-মো কে টি-কিং, (১৪) শিন লুন য়ায়োন-হ কিং। এ দেশে বুদ্ধদেবের জীবনচরিত সংক্রান্ত গ্রন্থাদি লোপ পাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু অন্য দেশ তাহা আদর করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল।

‡ Mr. Samuel Beal—*Sacred Books of the East* Vol XXX, P P, XXX—XXXI.

ভিন্ন ভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ যত্নসহকারে রক্ষিত ও সমাদৃত হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান ভারতবর্ষে ঐ সকল গ্রন্থ একেবারে লোপপ্রাপ্ত হইতে বসিয়াছিল।

ধর্ম্মগ্রন্থের আবিষ্কার।

ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপিটকাদি গ্রন্থের বিদ্যমানতা বিষয়ে ভারতবর্ষের অনেকের জ্ঞান ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মার্সম্যান যখন এ দেশে আসিয়া (১৮২৪ খৃষ্টাব্দে) ভারতের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে মিশরের আমদানী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণেরই প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে, সত্যের নবীন আলোক বিকাশ পাইয়াছে। কি উদ্যোগ, কি অধ্যবসায়—ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসমূহ আবিষ্কারে সফলপ্রযত্ন ও সিদ্ধকাম করিয়াছে! সে অধ্যবসায় আত্মোন্নতি-অভিলাষী জাতি-মাত্রেরই অনুকরণীয়। সুতরাং তদ্বিষয়ক কয়েকটী বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। এ পক্ষে ইংরেজের চেষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় এবং মিষ্টার হজ্‌সনের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ইংরেজের রেসিডেন্ট-রূপে নেপালে অবস্থিতি করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত যে সকল হস্তলিখিত পুঁথি তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় বৌদ্ধধর্ম্মের ও তৎসংক্রান্ত ইতিহাসের এক প্রধান উপাদান। তাড়াবন্দি করিয়া সেই সকল পাণ্ডুলিপি তিনি বিভিন্ন দেশের পাঠালয়ে ও সাহিত্য-সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে তিনি একটী প্রবন্ধও প্রকটন করিয়াছিলেন। * ফরাসী পণ্ডিত ইউজিন বার্ন্থফ সেই সকল পাণ্ডু-লিপিতে প্রাণসঞ্চার করেন। 'ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্তের উপক্রমণিকা' সংক্রান্ত তাঁহার যে গ্রন্থ ১৮ ৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিজ্ঞানসঙ্গত যুক্তি-সম্মত সারতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। নেপালে হজসন যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, তিব্বতে সোমা কোরোসি নামক জনৈক হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত সেইরূপ সাফল্য লাভ করেন। হাঙ্গেরী-দেশীয় এই পণ্ডিতের অনুসন্ধিৎসার বিষয় স্মরণ করিলে, বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে হয়। প্রাচ্যের ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বুখারেষ্ট সহর হইতে তিনি একাকী বহির্গত হন। সাহায্যকারী বন্ধু অথবা অর্থ-সম্পৎ কিছুই ছিল না। কখনও পদব্রজে, কখনও বা নৌ-যানে তিনি প্রথমে বোগদাদ্‌ সহরে উপনীত হন। পরিশেষে, বণিকদলের সহিত মিশিয়া, তিহারাণ ও খোরাসান হইয়া, তিনি বোখারায় আসেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কাবুলে ও পরে লাহোরে তাঁহার উপস্থিতি ঘটে। সেখান হইতে কাশ্মীর হইয়া তিনি লাদকে যান। লাদকে অবস্থিতি-পূর্ব্বক তিনি নিকটস্থ নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। কেবল অধ্যয়নই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার বেশভূষায় পারিপাট্য না থাকায় এবং পথ-

---

* He (Mr Hodgson) sent 85 bundles to the Asiatic Society of Bengal, 85 to the Royal Asiatic Society of London, 30 to the India Office Library, 7 to the Bodlian Library of Oxford, and 174 to the Societi Asiatique in Paris, or to M. Burnouf presonally.—*Civilisation in Ancient India* by R. C. Dutt.

পর্য্যটনাদির পরিশ্রম-কাতরতায় দেহ মাধুর্য্যহীন হওয়ায়, ইউরোপীয়গণ প্রায় তাঁহার সহিত মিশিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। অধ্যয়নই জীবনের সার লক্ষ্য মনে করায়, তিনিও কাহারও সহিত মিশিতে ব্যগ্র ছিলেন না। কিন্তু বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি সমাদর-প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মিঃ কোরোসি যখন কলিকাতায় আসেন, ডক্টর উইল্‌সন ও জেমস্ প্রিন্‌সেপ বিশেষভাবে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে তিব্বত গমনের পথে দার্জ্জিলিঙে তাঁহার মৃত্যু হয়। এসিয়াটিক সোসাইটি তাঁহার সম্মানার্থ দার্জ্জিলিঙে এক স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সুদূর হাঙ্গেরী হইতে ভাষা শিক্ষার জন্য এদেশে আসিয়া যিনি এমনভাবে প্রাণদান করিতে পারেন, তাঁহার আদর্শ অনুকরণ-যোগ্য নহে কি? তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত যে সকল পাণ্ডুলিপি ছিল, তিনি তাহার সন্ধান প্রথম প্রদান করেন। তাঁহার পর হইতেই তিব্বত-দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের প্রতি পাশ্চাত্য-দেশীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা যে এখন তিব্বতের সাহিত্য-বিষয়ে আলোচনা করিবার অবসর পাইতেছি, ধরিতে গেলে, তাহার মূল—সেই হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত। চীনদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থাদি যে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা রেভারেণ্ড স্যামুয়েল বীলের চেষ্টার ফল। জাপানের রাজদূত, ইংলণ্ড-দর্শনে গমন করিলে, বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। সেই অনুরোধের ফলে, টোকিও সহরে প্রত্যাগমনের পরই, তিনি ত্রিপিটকান্তর্গত গ্রন্থসমূহের এক প্রস্থ ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সংগ্রহ গ্রন্থ দুই সহস্রাধিক খণ্ডে বিভক্ত। শতাব্দীর পর শতাব্দীর চেষ্টার ফলে, ভারতবর্ষ হইতে চীন-দেশে ক্রমান্বয়ে যে সকল গ্রন্থতত্ত্ব সংগৃহীত হয় এবং চীন-দেশের ধর্ম্মযাজকগণ তদুপলক্ষে যে সকল গ্রন্থ ও টীকা প্রণয়ন করেন, এই সময় ইংলণ্ডে তাহার প্রায় সকলগুলিই সংগৃহীত হইয়াছিল। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্ব-কালে, অনুমান ২৪২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে, বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থাদি সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল। পালি-ভাষায় লিখিত ত্রিপিটকাদি গ্রন্থ এখন যে সিংহলে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, সকলই সেই সময়ের সম্পৎ। দুই সহস্রাধিক বৎসর কাল যে সকল রত্ন আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে ছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার প্রভাবে তৎসমুদায় এখন আমাদের অধিগত হইতেছে। টার্ণার, ফাস্‌বোল, ওল্ডেনবর্গ, চাইল্ডার্স, স্পেন্স হার্ডি, রিজ্ ডেভিড্‌স্, ম্যাক্সমূলার এবং ওয়েবার প্রমুখ পণ্ডিতগণ পালি ভাষার ঐ সকল গ্রন্থ উদ্ধারের পক্ষে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যে সকল উপাদান ছিল, তৎসমুদায় সংগ্রহ পক্ষে বাইগাণ্ডেৎ প্রভৃতির যত্নের বিষয় উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত সংক্রান্ত তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ায় বৌদ্ধ ইতিহাসে নূতন আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়াছে। ভারতের বাহির্ভাগে চারিদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের উপাদান-সমূহ বিক্ষিপ্ত-ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণা প্রভাবে তাহা পুনরায় একত্রীভূত হইল। রত্নখনি রত্নশূন্য হইয়া ছিল; আবার তাহার রত্নরাজি সে বুঝি ফিরিয়া পাইল।

* * *

আদি বৌদ্ধধর্ম্মে পরিবর্ত্তন।

[বৌদ্ধসম্মিলন ও পরিবর্ত্তন—চারিটী বৌদ্ধ মহাসম্মিলনে পরিবর্ত্তনের আভাষ,—অশোক রাজের বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তন,—অশোক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে বিদ্বেষী,—সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার—ভারতীয় রাজগণের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আসক্তি, বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণগণের সম্মানস্থানীয়,—তদ্বিষয়ে অপরাপর যুক্তি;—বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বজনীনত্ব,—সে হিসাবে বৌদ্ধ সকলেই হইতে পারে—উত্তর দশায় বৌদ্ধধর্ম্মে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব।]

আদিভূত বৌদ্ধধর্ম্ম এখন যে নানা আকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের উপর দিয়া পরিবর্ত্তনের যে প্রবল প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বজনসুবিদিত। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের অব্যবহিত পরে রাজগৃহে যে প্রথম বৌদ্ধ-সঙ্ঘ আহূত হইয়াছিল, পরিবর্ত্তনের লক্ষণ সেখানেই প্রকাশ পায়।

বৌদ্ধ সম্মিলন ও পরিবর্ত্তন।

বুদ্ধদেবের অনুচরগণের মধ্যে মহাকাশ্যপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সম্মানার্হ ছিলেন। তাঁহারই অধিনায়কত্বে রাজগৃহে সপ্তপাণি গুহাভ্যন্তরে প্রথম সঙ্ঘের অধিবেশন হইয়াছিল। পাঁচ শত বৌদ্ধ ভিক্ষু ঐ সঙ্ঘে যোগদান করেন। ধর্ম্মসঙ্ঘ সংক্রান্ত নিয়মাবলি অর্থাৎ বিনয় নির্দ্ধারণ করাই এই অধিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উপলক্ষে ভিক্ষুগণ সমস্বরে বুদ্ধদেবের উচ্চারিত গাথাসমূহ গান করেন। শিষ্য উপালী কর্ত্তৃক 'বিনয়' স্থির হয়। শিষ্য আনন্দ ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করেন। এই প্রথম সঙ্ঘে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় থেরাবেদের বা ত্রিবেদের অন্তর্গত বলিয়া উক্ত হয়। কিন্তু সে সকল যে কি বস্তু, তাহার স্বরূপ এখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং মহাকাশ্যপের সময় হইতেই ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। এই প্রথম বৌদ্ধ সম্মিলনীতে বিনয় ও সূত্র সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। কাশ্যপের শিষ্যগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, উপালীর এবং আনন্দের শিষ্যগণও যথাক্রমে তিন ও চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। তিব্বত দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যে সকল সম্প্রদায়-ভেদ আছে, তাহা অনুধাবন করিলে বিষয়টী বেশ বোধগম্য হইতে পারে। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের পর এক শত বৎসরের মধ্যে সহস্র সহস্র স্ত্রী-পুরুষ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তখন বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ধর্ম্মের, লোকসকল বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময় রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে নীচ জাতিগণের সম্বন্ধ-সংস্রব সূচিত করে। ফলে পুরাতন রীতি-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, এবং পুরাতনের স্থান নূতন আসিয়া অধিকার করে। এই সময় চন্দ্রগুপ্ত নামা নীচবংশীয় শূদ্র নৃপতি মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্মে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বত্রই নীচসম্প্রদায়ের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত বিধি বিধানের ও নিয়মাবলির কঠোরতা বহু পরিমাণে শ্লথ হইয়া আসিয়াছিল। অল্পসংখ্যক লোকই এখন বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত কঠোর বিধিবিধান মান্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, নচেৎ, অধিকাংশ লোকই নিয়মাবলির পরিবর্ত্তনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এবম্বিধ

মতপার্থক্যের মীমাংসার জন্য দ্বিতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের এক শত বৎসর পরে বৈশালী নগরে এই দ্বিতীয় সঙ্ঘের অধিবেশন হইয়াছিল। এই সঙ্ঘে বা মহাসভায় সাত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। থগুহের পুত্র যশ এই সঙ্ঘের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই দ্বিতীয় বৌদ্ধ-সম্মিলনী বিনয়ের পুনঃসঙ্কলন জন্য এবং বিনয়ের অর্থ প্রকাশ অভিপ্রায়ে তাহার 'অথকথা' নামক টীকা রচনার জন্য প্রখ্যাত। একাদিক্রমে আট মাস কাল দ্বিতীয় মহাসভার অধিবেশন চলিয়াছিল; আর সেই সূত্রে ধর্ম্মমতের ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিয়মাবলি নির্ণীত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ভিক্ষু সে সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিতে সম্মত হন নাই। তদনুসারে তাঁহারা আর এক নূতন মহাসভার অধিবেশন করেন। সেই সভা 'মহাসঙ্গীতি' নামে পরিচিত হয়। পূর্ব্বোক্ত সভা যে সকল প্রাচীন মতের অনুসরণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, শেষোক্ত সভা সে দৃঢ়তা শিথিল করিতে প্রযত্নপর হইয়াছিলেন। বৈশালী নগরের মহাসভায় ফলে যে সকল কঠোর বিধিবিধান শ্লথ হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ১০টী বিষয়ে প্রশ্রয়-দান বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে,—

১। বিনয় পিটকের অনুশাসনক্রমে লবণ বা অন্যান্য ভক্ষ্য-দ্রব্য ভিক্ষুগণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। কিন্তু এক্ষণে নিয়ম হইল যে, শিঙার মধ্যে তাঁহারা লবণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিবেন।

২। ইতিপূর্ব্বে অন্নাদি আহার্য্য দ্রব্য দ্বিপ্রহরের পর গ্রহণের নিয়ম ছিল। কিন্তু এখন নিয়ম হইল যে, মানুষের ছায়া যখন দুই হাঙ্গি পরিমিত হইবে, ভিক্ষুগণ তখন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৩। বিহার হইতে দূরে কোথাও গমন করিলে বিনয় পিটকের নিয়ম সর্ব্বথা রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না; সুতরাং এই উপলক্ষে সে বন্ধন শ্লথ করা হইল।

৪। ধর্ম্মগ্রহণ, কৃতপাপের স্বীকার ও তজ্জন্য অনুতাপ প্রভৃতি কার্য্য পূর্ব্বে কেবল-মাত্র বিহার-সংলগ্ন উপস্থ ভবনে সম্পন্ন হইত। এক্ষণে নিয়ম হইল যে, নিভৃতে লোকের বসত-বাটীতেও উহা সম্পন্ন হইতে পারিবে।

৫। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল—কোনও একটী কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ভিক্ষুগণকে সম্প্রদায়ের মত লইতে হইত; কিন্তু এখন নিয়ম হইল যে, কার্য্য সম্পাদনের পরেও সে মত অনুমোদন করাইয়া লইলে চলিবে।

৬। নিয়মাবলি শ্লথ করিবার পক্ষে অন্যের কৃতকার্য্যের দৃষ্টান্ত গ্রহণীয় হইতে পারিবে।

৭। কেবল দুধ বা জল বলিয়া নহে; দ্বিপ্রহরের পর ছানার জল বা ঘোল পান করিতে বাধা থাকিবে না।

৮। জলবৎ দৃশ্যমান চোলাই করা পানীয় পান নিষিদ্ধ হইবে না।

৯। ঝালরযুক্ত বস্ত্র ভিন্ন অন্যবিধ বস্ত্রে আসন আবৃত করিতে বাধা থাকিবে না।

১০। সম্প্রদায়ের সদস্যগণ স্বর্ণ এবং রৌপ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

উল্লিখিত দশবিধ সুবিধা সম্বন্ধে অধিকাংশ ভিক্ষুর ঐকমত্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু

অল্পসংখ্যক ভিক্ষু এবম্বিধ পরিবর্ত্তনে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন। তাহাতে বিষম দলাদলি উপস্থিত হয়। এইরূপে, ভগবানের নির্ব্বাণ-লাভের দেড় শত বৎসরের মধ্যে ভারতের বৌদ্ধগণ দুইটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। সেই দুই প্রধান বিভাগের বা সম্প্রদায়ের এক সম্প্রদায় বুদ্ধদেব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের যথাযথ অনুসরণকারী বলিয়া পরিচিত হন এবং অন্ত সম্প্রদায় কিছু স্বাধীন-ভাবাপন্ন ও সংস্কারের পক্ষপাতী বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ যে উত্তর-দেশীয় ও দক্ষিণ-দেশীয় দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তাহার মূল—এই বৌদ্ধ-সঙ্ঘ। 'দ্বীপবংশের' মতে দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণই প্রকৃত পক্ষে অপরিবর্ত্তিত ভাবে বুদ্ধের মতানুবর্ত্তী ছিলেন, আর উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণ পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। 'দ্বীপবংশের' এ মত যে সর্ব্বথা অবিসম্বাদিত, কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। কেন-না, যে দেশ বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান, সে দেশের সহিত উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণের সম্বন্ধ অনেক দিন অক্ষুণ্ণ ছিল; কিন্তু দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণের সহিত সে সংস্রব পূর্ব্বেই ছিন্ন হইয়াছিল। উত্তর-দেশীয় ও দক্ষিণ-দেশীয় দুই বৌদ্ধ-সম্প্রদায় অল্প দিনের মধ্যেই আঠারটী উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণের প্রাচীন গ্রন্থে ঐ অষ্টাদশ বিভাগের বিষয় লিখিত আছে। কিন্তু ফা হিয়ানের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ছিয়ানব্বইটী উপসম্প্রদায়ের পরিচয় পাই। উত্তর-দেশীয় ও দক্ষিণ-দেশীয় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে ধর্ম্মমতের ও আচার-ব্যবহারের অশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, উভয় সম্প্রদায়ের রীতিনীতি ও ক্রমবিকাশের পদ্ধতি স্মরণ করিলেই তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। মহাসঙ্গীতি হইতেই যে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত, দ্বীপবংশের চতুর্থ অধ্যায়ে, তাহার এইরূপ উল্লেখ আছে;—

'মহাসঙ্গীতির ভিক্ষুগণ প্রাচীন ধর্ম্মমত একেবারে উল্টাইয়া দেন। তাঁহারা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহের পরিবর্ত্তন করেন, এবং মূলের নূতন সংস্করণ প্রচার করিয়া যান। এক স্থানের প্রসঙ্গ অন্য স্থানে গ্রথিত করা হয়। সেই সূত্রে পঞ্চনিকায়ের অন্তর্গত নীতি সমূহ এবং ভাবসমূহ বিকৃত হইয়া যায়। সেই ভিক্ষুগণ বুঝিতেন না যে, ভগবানের বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি অথবা তাঁহার সারভূত বাক্যে কি উচ্চ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ইহা না বুঝিয়া তাঁহারা বুদ্ধদেবের উক্তির নূতন অর্থ প্রচার করিতেন এবং বর্ণমাত্রের অনুসরণ করিয়া আদি উক্তির লক্ষ্য নষ্ট করিতেন। তাঁহারা সুত্তপিটকের ও বিনয়পিটকের অন্তর্গত গভীর ভাবমূলক অংশসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন সুত্ত, নূতন বিনয়, নূতন ভাষা, নূতন পরিভাষা, নূতন নিদেশ ও নূতন জাতকাংশ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক মতের পরিবর্ত্তে অন্য মত প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ধর্ম্মমতের দারুণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল।'

আদিধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সাধন সম্বন্ধে এইরূপ অশেষ নিদর্শন বিদ্যমান আছে। কি অবস্থা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে বিষয়টী বিশদ ও বোধগম্য হইতে পারে। তৃতীয় বৌদ্ধসম্মিলনীতে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থ পুনরায় সঙ্কলিত হইয়াছিল। চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মিলন সম্রাট কণিষ্কের সময়ে আহুত হয়। কাশ্মীরে সেই সম্মিলন আহুত হইয়াছিল। বসুমিত্র, অশ্বঘোষ প্রভৃতিকে লইয়া পাঁচ শত বৌদ্ধ-

শাঁগাসীর সহিত কণিষ্ক ঐ সম্মিলনে মিলিত হন। অভিধর্ম্মপিটক ঐ সম্মিলনের ফলে রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শক-বংশীয় রাজা কণিষ্কের অধিনায়কত্বে যে সম্মিলন পরিচালিত হইয়াছিল, তাহাতে যে আদিধর্ম্মের বহু সংস্কার বা পরিবর্ত্তন সাধন হইবে, তাহা স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়।

প্রথমে বহুদিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম কতকগুলি ধার্ম্মিক ও জ্ঞানিজনের ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত ছিল। তখন উহা জনসাধারণের ধর্ম্ম বা রাজকীয় ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয় নাই।

অশোক-রাজত্বে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তন।

দেশের ভূস্বামিবর্গ বা রাজন্যগণ বৌদ্ধ ভিক্ষুকদিগকে আদর-যত্ন করিতেন বটে; কিন্তু শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণকে তাঁহারা যেরূপ সমাদর করিতেন, তাহার অধিক কোনরূপ অনুগ্রহ ভিক্ষুগণের প্রতি কখনও প্রদর্শন করেন নাই। অপিচ, ব্রাহ্মণগণের ও বৌদ্ধশ্রমণগণের মধ্যে কোনরূপ শত্রুতার লক্ষণও তখন প্রকাশ পায় নাই। সুতরাং তাৎকালিক রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অনুসরণকারী থাকিলেও বৌদ্ধশ্রমণগণের স্বধর্ম্ম-পালনে কোনরূপ অসুবিধা উপস্থিত হয় নাই। তখন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উভয় সম্প্রদায়ই সমাজের নিকট সমভাবে আদর-যত্ন পাইয়া আসিতেছিলেন। বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্ত আলোচনায় বুঝিতে পারি, তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুসরণকারী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। কিন্তু রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের প্রাধান্য সময়ে বিপরীত বায়ু প্রবাহিত হইল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে রাজকীয় ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত করিয়া লইলেন, তিনি আপনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং প্রজাগণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টান্বিত রহিলেন। অশোকের এই কার্য্যে ব্রাহ্মণগণ ঘোর আপত্তি উপস্থিত করেন। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত ফল সংঘটিত হয়। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার প্রভৃতির জন্য তিনি এক রাজকীয় বিভাগ সৃষ্টি করেন। সেই বিভাগের

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণা প্রভাবেও এখন এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞ ডেভিডস্ লিখিয়াছেন,—"There was not much in the Metaphysics and Psychology of Goutama which cannot be found in one or other of the orthodox systems, and a great deal of his morality could be collected from earlier or later Hindu books. Such originality as Goutama possessed lay in the way in which he adopted, enlarged, ennobled and systematised that which had already been well said by others; in the way in which he carried out to their logical conclusion principles of equity and justice already acknowledged by some of the most prominent Hindu thinkers. The difference between him and other teachers lay chiefly in his deep earnestness and in his broad public spirit and philanthrophy. Even these differences are probably much more apparent now than they were then, and by no means deprived him of the support and sympathy of the best among the Brahmans. Many of his chief disciples, many of the most distinguished members of his Order, were Brahmans. He always classed them with the Buddhist mendicants as deserving of respect, and he used the name Brahmans as a term of honour for the Buddhist Arhats and Saints."

প্রধান অমাত্য "ধর্ম্মমহামাত্য" নামে পরিচিত হন। তাঁহার অধীনে বিভিন্ন প্রদেশের জন্য বিভিন্ন উপবিভাগ সৃষ্ট হইয়াছিল; তদ্দ্বারা সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধিকল্পে চেষ্টা চলিতে থাকে। অশোকের রাজত্ব-কালের অষ্টাদশ বর্ষে পাটলিপুত্র নগরে আর এক বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশন হয়। এই সময়ে বহু নাস্তিকের এবং ছদ্মবেশী ভিক্ষুকের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থের বহু বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়। সেই সকল বিপর্য্যয়, নিরাকরণের জন্য ঐ মহাসভা আহূত হইয়াছিল। সহস্র ভিক্ষু সেই মহাসভায় মিলিত হন। তিস্‌সা (তিষ্য) সেই মহাসভায় সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমাগত নয় মাস কাল মহাসভার অধিবেশনের ফলে ধর্ম্মসম্প্রদায় পুনর্গঠিত এবং ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহের পুনঃসংস্কার সাধিত হয়। এই মহাসভায় ধর্ম্মমত পুনরাবৃত্ত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। * এই মহাসভায় সিদ্ধান্তের পর অশোক-প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারকগণ বিভিন্ন দেশে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণ যে ত্রিপিটকাদি গ্রন্থ-সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা এই মহাসভারই ফল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র, একদল বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ এই সময়ে লঙ্কা দ্বীপে গমন করেন। † পুঁথিপত্র সমস্ত তাঁহারই সঙ্গে লঙ্কায় গিয়াছিল। তবেই বুঝা যায়, এখন যে ত্রিপিটকাদি লঙ্কাদ্বীপ হইতে উদ্ধার হইয়াছে; তৎসমুদায় কখনই বুদ্ধদেবের প্রচারিত আদিভূত গ্রন্থ নহে। পরিবর্ত্তনের পর অশোকের রাজত্বকালে—তাঁহারও রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষ পরে—ভাষান্তর-ভাবান্তর সম্বলিত যে গ্রন্থরাজি লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছিয়াছিল, কি দুঃখের বিষয়, তাহাই এখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃষ্ট উপাদান মধ্যে পরিগণিত! বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান ভারতবর্ষে সে উপাদান সকলই লোপপ্রাপ্ত; তাই এখন নকলের নকল লইয়া পরিতৃপ্ত হইতে হইতেছে।

দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অশোক-পুত্র মহেন্দ্র প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়া তিনি যাঁহার সহায়তা লাভ করেন, তিনিও কোনও অংশে অল্প-প্রখ্যাত নহেন। তাঁহারও নাম—তিস্‌সা। তিস্‌সা সিংহলের অধিপতি ছিলেন। জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের প্রতিনিধিরূপে তাঁহার পুত্র যখন সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ উপস্থিত হইলেন, তিস্‌সা তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। তদুপলক্ষে সিংহলের তাৎকালিক রাজধানী অনুরুদ্ধপুরে 'আপারানা দাগোবা' নামে একটী বৌদ্ধ-স্তূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ-বক্ষে সেই স্তূপ আজিও বিদ্যমান আছে। কথিত হয়, এই স্তূপে বুদ্ধদেবের দক্ষিণ-গ্রীবার অস্থি প্রোথিত হইয়াছিল। এই স্তূপের পার্শ্বে মহিন্‌তেল পর্ব্বতে এক সুন্দর সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হয়। ঐ পর্ব্বত নগরের পূর্ব্ব দিকে চারি ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে অবস্থিত ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মহেন্দ্রের এবং তাঁহার সঙ্গিগণের

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম।

---

* মহাবংশে ও দ্বীপবংশে দ্বাদশ ও অষ্টম অধ্যায়ে এবং বারবার খোদিত লিপিতে এই বৌদ্ধ মহাসভার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

† যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু মহেন্দ্রের (মাহিন্দ) সঙ্গে লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন, তাঁহাদের ছয় জনের নাম মহাবংশে লিখিত আছে; যথা,—ইত্থিয়, উত্থিয, সম্বল, ভদ্দসাল, সমন, পাণ্ডু।

জন্ত পর্ব্বতোপরি ঐ সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা পক্ষে এবম্বিধ উৎসাহ-দানের জন্ম রাজা তিস্‌সা দেবগণের প্রিয় (দেবানাম্ পিয়) বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রের জন্ম পর্ব্বতোপরি যে সঙ্ঘারাম প্রস্তুত হইয়াছিল, দুই সহস্রাধিক বৎসরের প্রাকৃতিক বিপ্লব সহ্য করিয়াও তাহার যে ধ্বংসাবশেষ আজিও লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইতেছে, সেই ধ্বংসাবশেষ এই বৈজ্ঞানিক বিকাশের দিনেও মানুষকে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া তুলিতেছে। সে বিহার এতই মনোরম হইয়াছিল যে, রাজকুমার মহেন্দ্র সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বনে শেষজীবন সেখানেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রের সিংহলে অবস্থিতিকালে তত্রত্য স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। রাজা তিস্‌সা, রাজ্ঞীকে এবং রাজপরিবারভুক্ত মহিলাগণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে মহেন্দ্রের অভিমত-ক্রমে মগধ হইতে কতকগুলি ভিক্ষুণীসহ ভিক্ষুবৃত্তিধারিণী মহেন্দ্রের ভগিনী 'সঙ্ঘমিত্রা' সিংহলে যাত্রা করেন। যে বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ-লাভ করেন, সঙ্ঘমিত্রা বুদ্ধগয়া হইতে সেই পবিত্র বোধি-বৃক্ষের একটী শাখা সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং সেই অমূল্য বৃক্ষশাখা মহাসমারোহে অনুরুদ্ধপুরে রোপিত হইয়াছিল। † রাজা তিস্‌সা কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই মহেন্দ্রের দেহান্তর ঘটে। এই সময়ে তামিলগণ আসিয়া সিংহল অধিকার করিয়াছিল। ষাট বৎসর কাল সিংহল তামিলগণের অধিকার-ভুক্ত ছিল। সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম কিছুকাল উন্নতির পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরিশেষে ১৬৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে দত্তগামিনী সিংহাসন লাভ করেন। তিনি তিস্‌সার ভ্রাতার পৌত্র বলিয়া পরিচিত। তাঁহার রাজত্বকালে পুনরায় সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হয়। তিনি অনুরুদ্ধপুরে দুইটী বৃহত্তম 'দাগোবা' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই দুইটী দাগোবার একটীর নাম—'মিরিসবালি' ও অন্যটীর নাম—'মহাথুক'। ঐ দুইটী দাগোবার উচ্চতা যথাক্রমে ১৫০ ও ২০০ ফিট। রাজা দত্তগামিনী একটী সুবৃহৎ বিহার প্রস্তুত করেন। সেই বিহার 'পিত্তল প্রাসাদ' বলিয়া পরিচিত। ঐ প্রাসাদের ছাদ ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। গ্রেনাইট প্রস্তর নির্ম্মিত ঐ ভবনের সহস্র স্তম্ভ এখনও দৃষ্ট হয়।

* এই বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া পুলক-রোমাঞ্চ প্রাণে রিস্‌ ডেভিডস্‌ কি লিখিয়াছেন, দেখুন.—"I shall not easily forget the day, when I first entered that lonely cool and quiet chamber so simple and yet so beautiful where more than 2000 years ago the great teachers had sat and thought and worked through the long years of his peaceful and useful life. On that hill he afterwards died and his ashes still rest under the Dagoba which is the principal object of reverence and a care of the few monks who still reside in the Mahintale Wihaw (Mahendra Vihare)"—*Buddhism* by Rhys Davids.

† সেই বৃক্ষ এখনও সিংহলে বিদ্যমান। রিস্‌ ডেভিডস সেই বৃক্ষ দর্শন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার বর্ণনায় এবং সার এমার্সন টেনেটের সংগৃহীত প্রমাণ-পরম্পরায় বৃক্ষটীকে তিস্‌সার রাজত্বকালে রোপিত বৃক্ষ বলিয়াই সপ্রমাণ হয়। ভিক্ষুগণের যত্নের গুণেই বার্দ্ধক্যের পরিচয়-চিহ্ন বহন করিয়া বৃক্ষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

বোধিবৃক্ষের সীমানার বাহিরে ঐ সকল স্তম্ভ বিদ্যমান আছে। দস্তগামিনীর মৃত্যুর ৩৪ বৎসর পরে পুনরায় তামিলগণ সিংহল দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল। তাহাতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পক্ষে কিছু অন্তরায় ঘটে। কিন্তু অল্প দিন পরেই, ৮৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, দস্তগামিনীর ভ্রাতুষ্পুত্র বত্তগামিনী কর্ত্তৃক তামিলগণ বিতাড়িত হয়। বত্তগামিনী বৌদ্ধ-ধর্ম্মের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি 'অগ্নিগিরি দাগোবা' নামে ২৯০ ফিট উচ্চ একটি দাগোবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই দাগোবা সিংহলের উচ্চতম দাগোবা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বত্তগামিনীর রাজত্বকালে, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের ৩৩০ বৎসর পরে, পবিত্র ত্রিপিটক গ্রন্থসমূহ প্রথম পুঁথির আকারে লিখিবার আবশ্যক হয়। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্ঞানী ভিক্ষুগণের মুখে মুখে ত্রিপিটক প্রচারিত ছিল। কিন্তু জীবন ক্ষণবিধ্বংসী জানিয়া, সহসা ত্রিপিটকাভিজ্ঞ ভিক্ষুগণকে জীবলীলা সংবরণ করিতে দেখিয়া, রাজা বত্তগামিনী ত্রিপিটক গ্রন্থকে লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দেন। * রাজা বত্তগামিনীর পর সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য বুদ্ধঘোষ প্রতিষ্ঠান্বিত হন। কিবা সংস্কৃত ভাষায়, কিবা পালি ভাষায়, কিবা সিংহলী-ভাষায়, অধিক কি—ব্রহ্মদেশের শ্যামদেশের ভাষা প্রভৃতিতেও বুদ্ধঘোষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি মহাকবি, প্রসিদ্ধ টীকাকার ও একজন সুদক্ষ ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। বুদ্ধগয়ার নিকট তাঁহার জন্ম হয় এবং ৪৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহলে গমন করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি ও মূলতত্ত্ব প্রচার কল্পে তিনি "বিশুদ্ধিমার্গ" নামে একখানি কোষগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতি ও পাণ্ডিত্য দর্শনে সিংহলের প্রধান ধর্ম্ম-যাজক তাঁহাকে ধর্ম্মগ্রন্থাদির টীকা-প্রণয়ন কার্য্যে নিযুক্ত করেন; ইতিপূর্ব্বে সিংহলী ভাষায় টীকা প্রচলিত ছিল। মহেন্দ্র যখন সিংহলে ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ লইয়া যান, তাঁহার উপদেশক্রমে তখন তদ্দেশপ্রচলিত সিংহলী ভাষায় টীকা লিখিত হইয়াছিল। বুদ্ধঘোষ এখন পালিভাষায় সেই সকল ধর্ম্মগ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিলেন। † ৪৫০ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধঘোষ ব্রহ্মদেশে গমন করেন। সেখানে তিনি তিন বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মগগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধঘোষকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিল। শ্যাম-রাজ্য অল্প দিন পরেই ব্রহ্মদেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ৯০৮ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে শ্যামরাজের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে যব-দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্মযাজকগণের গতিবিধি আরম্ভ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময়েই যবদ্বীপে বোরোবোদার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন। যবদ্বীপ হইতে তৎসংলগ্ন বলীদ্বীপে

---

* দ্বীপবংশে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। মহাবংশ এ বিষয়ে দ্বীপবংশের অনুসরণ করিয়াছেন।

† বুদ্ধঘোষ লিখিত পালি-ভাষার সেই টীকা-সমূহের মধ্যে ২০ খানি টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। তদ্রচিত বিনয়-পিটকের টীকার নাম—সামন্তে পাশাদিক, পতিমোখের টীকার নাম—কঙ্খবিতারণি। দীগ্‌ঘ নিকায়ের টীকা—সুমঙ্গলবিলাসিনী. অঙ্গুত্তরনিকায়ের টীকা—মনোরথপূরণি, ধম্মপদের টীকা—ধম্মপদ অথকথা, জাতকের টীকা—জাতক অথকথা ইত্যাদি। চাইলডার্স প্রণীত অভিধানে বুদ্ধঘোষ বিরচিত "অথকথা"-সমূহের উল্লেখ আছে। *Vide* Childers's *Pali Dictionary.*

এবং সুমাত্রা দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সকল দেশের বৌদ্ধধর্ম্মই দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়।

নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ "উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধ" বলিয়া পরিচিত। উত্তর দেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার (প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষারও বটে) গ্রন্থাদি আদরণীয়। উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণের ক্রিয়া-কর্ম্ম ও লক্ষণাদির প্রতি লক্ষ্য করিলে বৌদ্ধধর্ম্ম যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সন্ততি-স্থানীয়, তাহা বেশ উপলব্ধি হইতে পারে। অধিক বলিব কি, উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে অনেক হিন্দু-দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতি পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত আছে। অথচ, দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে সে সকল দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতির প্রথা কচিৎ দেখিতে পাই। উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণের পুরাণ, ত্রি-তত্ত্ব, বুদ্ধের উপাধি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিলে, বৌদ্ধগণ যে হিন্দু-ধর্ম্মের সম্পূর্ণরূপ অনুসরণকারী ছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের মধ্যে যে তান্ত্রিকাচার ও যোগাচার প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপ হিন্দুধর্ম্মের অনুসরণ। দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণের সহিত উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণের আচার-ব্যবহারের ও ক্রিয়াকর্ম্মের যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, নানা জনে তাহার নানারূপ কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ও তাঁহাদের অনুসরণকারীদিগের মত এই যে, দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে আদিভূত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তিতভাবে বিদ্যমান আছে; আর উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাব প্রবেশ করিয়া তাহাতে বিকৃতি আনিয়াছে। তাঁহাদের পক্ষের যুক্তি এই যে, উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণের উৎপত্তিকাল—খৃষ্টজন্মের পরবর্ত্তী শতাব্দী সমূহ। কিন্তু লঙ্কাদ্বীপে সে ধর্ম্মের প্রাধান্য—খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে। এ পক্ষের যত প্রকার যুক্তিই প্রাধান্য বিস্তার করুক, আমরা কিন্তু অন্য প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি, অশোকের রাজত্বকালের মধ্যে, আদি বৌদ্ধধর্ম্মের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। আরও আমরা প্রমাণ পাই যে, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ঘোর প্রতিবাদী ছিলেন; তিনি যত গুণে গুণবান থাকুন, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষরূপ কলঙ্ক কথনই স্খালন হইবার নহে। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার কল্পে তিনি যে দেশে বিদেশে ধর্ম্মযাজকগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট সাধিত হওয়ার আশা করা যায় না। তাঁহারা যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের একাঙ্গ সন্ন্যাসাঙ্গ মাত্র। দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে সেই ভাবই পরিপুষ্ট। অশোকের প্রাধান্য-লোপের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত লঙ্কাদ্বীপের সহিত উত্তর-ভারতের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছিল। সুতরাং অশোকের প্রচারিত ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম—বৌদ্ধধর্ম্মের অন্য ভাব ঐ সকল দেশে প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু উত্তর দেশে—বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি স্থানে—অশোকের চেষ্টা সর্ব্বথা ফলবতী হয় নাই। কেন-না, আদিভূত স্থানে মূল-ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অধিক দিন অন্ধকারাবৃত থাকিতে পারে নাই। হিন্দু বুঝিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব তাঁহাদেরই একাংশ অনুসরণ করিয়া, তৎপথে জনসাধারণকে পরিচালিত করিতে চেষ্টান্বিত ছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সন্ততিস্থানীয়।

তাই তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্মের লীলা দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই লীলা প্রত্যক্ষ করাই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব প্রত্যক্ষীকরণ।

বৌদ্ধ সকলেই হইতে পারে।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব কি—বিষয়টী একটু বিশদভাবে আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করি। আজিও যে পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তাহার কারণ কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? সাধারণতঃ একটা বিশ্বাস আছে—"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" যাহাদের মূল মন্ত্র, তাহারাই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু বাস্তব পক্ষে কি "অহিংসা পরমধর্ম্ম" মার্গাবলম্বী জনগণই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত? ইতিহাস সে সাক্ষ্য প্রদান করে না। চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা যত অধিক, অন্য কোথাও তেমনটী পরিদৃষ্ট হয় না। অথচ, চীনারা মাংসাশী ও ঘোর হিংসাপরায়ণ। জাপানেও হিংসার—পশুহননের অবধি নাই। আবার লঙ্কাদ্বীপে, তিব্বত প্রভৃতি দেশে অধিকাংশ বৌদ্ধের মধ্যে পাপাবহ বলিয়া হিংসাকার্য্য পরিত্যক্ত। এইরূপে বুঝিতে পারি, পরস্পর বিপরীত-আচরণশীল জনগণও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত আছেন। সুতরাং হিংসা বা অহিংসার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম যে প্রাধান্য বিস্তার করিল, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, পারস্য, তাতার, তিব্বত, চীন, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্ম, যবদ্বীপ, সুমাত্রাদ্বীপ, লঙ্কাদ্বীপ প্রভৃতি ভারতের চতুর্দ্দিকে যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তাহার কি কোনও গূঢ় কারণ নাই? আমাদের মনে হয়, আত্মোৎকর্ষ-সাধনই বৌদ্ধধর্ম্মের মুখ্য উপদেশ। আপন জীবনে বুদ্ধদেব দেখাইয়াছেন, এবং আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, কর্ম্ম-প্রবাহের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে কেমনভাবে আত্মোৎকর্ষ সাধনে মানুষ নির্ব্বাণ-লাভে সমর্থ হয়। একটু অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারি, হিন্দুর জন্মান্তর-বাদে যে শিক্ষা নিহিত আছে, বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তে ও কার্য্য পরম্পরায় সেই শিক্ষাই প্রত্যক্ষীভূত। তাঁহার জীবনের সহস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে মাত্র দুই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। বিষয়টী, বোধ হয়, তাহাতেই বিশদীকৃত হইবে। তিনি দুঃখ-নিবৃত্তির অষ্টবিধ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—সচ্চিন্তা, সদ্ভাব, সচ্চরিত্রতা, সত্যবাক্ প্রভৃতি, তাঁহার মতে, দুঃখ-নিবৃত্তির পন্থা-সমূহ। এ সকল পথের যাহারা অনুসরণ করিবে, তাহারাই বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইবে। তাহা হইলে, যে কোনও দেশের যে কোনও জাতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে পারে না কি? ফলতঃ, সচ্চিন্তা, সত্যবাক্য প্রভৃতির অনুষ্ঠানে আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সকল জাতিই বোধ হয় এক সময়ে বৌদ্ধ হইবার অধিকার পাইয়াছিল। আর, তাই বুঝি, পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারী আজিও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ফলতঃ, আত্মোৎকর্ষসাধনই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল উপাদান। * তবে যাদৃশ

---

* মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই, মহাশয়ের মত অনেকটা এইরূপ। তিনি লিখিয়াছেন,—'এখন যেমন থিওজফিষ্ট মহাশয়েরা বলেন, 'তোমরা যে ধর্ম্মে থাক, যে দেবতার উপাসনাই কর, ধর্ম্মে এবং চরিত্রে বড় হইবার চেষ্টা করিলেই, তোমরা থিওজফিষ্ট এবং যে কেহ থিয়জফিষ্ট হইতে পারে।' এও কতকটা সেইরূপ * * *,'—নারায়ণ, প্রথম বর্ষ।

আত্মোৎকর্ষ-সাধনে মানুষ নির্ব্বাণ-লাভের অধিকারী হয়, এক জন্মে যে সে অবস্থায় উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর নহে, বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের কাহিনীর সহিত শেষ জীবনের অবস্থার সামঞ্জস্য সাধন করিলে সে ভাব উপলব্ধ হইতে পারিবে। অনেক জন্ম অনেক কষ্ট সহ্য করার পর দিব্যজ্ঞানলাভে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন,—তাঁহার উক্তিতে নানা স্থানেই তাহা প্রকাশমান। আমাদের শাস্ত্র মতে, কর্ম্মফলে উচ্চ নীচ যোনিতে জন্ম-গ্রহণ হয়। সেই হিসাবে মনুষ্য জন্মেরও স্তর আছে। সকল মনুষ্যই কখনও সমান নহে। স্তরের পর স্তর অতিক্রমণান্তে মানুষ শ্রেষ্ঠ-পদবীতে উন্নীত হয়। সেই পদবীতে উন্নীত হইলে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মফলে নির্ব্বাণ বা মোক্ষ-লাভ ঘটে। বুদ্ধদেবের জীবন-চরিত আলোচনায় এই শিক্ষাই প্রাপ্ত হই। সৎকর্ম্মের ফলে, জন্মজন্মান্তরের প্রবাহের মধ্য দিয়া জীব নির্ব্বাণ লাভ করে। সুতরাং সকল জাতির সকল ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া আসিয়াছিল। তখন, হিন্দু ও অহিন্দু যে কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিল। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম রাজকীয় ধর্ম্ম হওয়ায় রাজপুরুষগণের মনস্তুষ্টির জন্যও অনেক বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। তবে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব যে স্বভাবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের উপর সকল সময়ই অল্প-বিস্তর ক্রিয়াশীল ছিল, তাহাও নিঃসন্দেহ।

উত্তরদেশীয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব যে অতিমাত্রায় বিস্তৃত ছিল, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিয়াছি। বৌদ্ধধর্ম্মের কয়েকটী তত্ত্বের আলোচনায় বিষয়টী বোধগম্য হইতে পারে। প্রথম, বৌদ্ধগণের পৌরাণিক কাহিনী। হিন্দুর দেবদেবী বিভিন্ন আকারে তাঁহাদের পৌরাণিকী কাহিনী সমূহে স্থান লাভ করিয়াছে। সঙ্ক্ষেপে সে কাহিনীর একটু আভাষ দিতেছি।

উত্তরদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব।

সে মতে, ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে মেরু-পর্ব্বত অবস্থিত। তাহার উর্দ্ধভাগে আটটি প্রধান পাহাড় আছে। তাহার নিম্নে পৃথিবীতে প্রাণিগণ, ভূতগণ, প্রেতগণ এবং মনুষ্যগণের বসতি। সেই অষ্ট গিরিশৃঙ্গের অব্যবহিত উপরে নিম্নতম স্বর্গধামে দেবগণের অবস্থান। সেখানে চারি জন 'মহারাজ' এবং দেবদূতগণ প্রাণিগণকে রক্ষার জন্য অবস্থিতি করিতেছেন। সেই নিম্নতম স্বর্গ চারি ভাগে বিভক্ত ও চারি জন নৃপতির অধিকারভুক্ত। তাহারা বর্ম্মাবৃত দেহে উন্মুক্ত কৃপাণ-হস্তে দৈত্য-দানবের কবল হইতে সংসারকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। যিনি পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত, তাঁহার নাম—ধৃতরাষ্ট্র; তিনি গন্ধর্ব্বরাজ বলিয়া পরিচিত। পশ্চিমদিকাধিপতি বিরুধব; তিনি কবন্ধরাজ। দক্ষিণ দিকে নাগরাজ বিরূপাক্ষ, উত্তর দিকে যক্ষরাজ কুবের। এই নিম্নতম স্বর্গের উপরে মেরুর সর্ব্বোচ্চ শিখরে ইন্দ্রের স্বর্গ। একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু এবং দ্বাদশ আদিত্য প্রভৃতি তেত্রিশ দেবতা সহ তিনি সেখানে অবস্থিতি করিতেছেন। তদুপরি তৃতীয় স্বর্গ। সেখানে যম বাস করেন। তদুপরি চতুর্থ স্বর্গ,—তাসিতগণের (বোধিসত্ত্বগণের) অবস্থান। পঞ্চম স্বর্গে নির্ম্মাণী-রাত্রি দেবালী অবস্থিত। ষষ্ঠ স্বর্গে মার বা কামদেব বাস করেন। এই ছয় স্বর্গের উপরে তিনটী স্বর্গ আছে। সেই তিন স্বর্গে ধ্যানীদিগের স্থান। ধ্যানের তারতম্যানুসারে ধ্যানিগণ ঐ তিন স্থান প্রাপ্ত হন। এই তিন স্বর্গে মহাব্রহ্মের বা ব্রহ্ম-সহাম্পতির অধিনায়কত্বে ব্রহ্মদেবগণ

অবস্থিতি করেন। এই সকলের উপরে জ্ঞানিগণের চতুর্থ স্বর্গ। সেখানে অর্হৎগণ ও বুদ্ধগণ অবস্থিত। এই হিসাবে ইন্দ্র, মার ও মহাব্রহ্ম প্রভৃতি হইতেও বুদ্ধের প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত। এই পৌরাণিক কাহিনী যে হিন্দু-পুরাণ হইতে রূপান্তরিত, এবং তাহার উপর বৌদ্ধ-প্রধান্য বিঘোষিত, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। তার পর, ত্রি-তত্ত্ব বা ত্রি-সত্য। বুদ্ধদেবের উক্তিতে ত্রিতত্ত্বের বা ত্রিসত্যের কোনও আভাষ পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রবর্ত্তিত "বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ" কালক্রমে হিন্দুধর্ম্মের 'তিনেই এক' বা ত্রিমূর্ত্তির ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে। বুদ্ধদেবের লোকান্তরের অল্পদিন পরেই উত্তরদেশীয় বৌদ্ধসম্প্রদায় ত্রি-তত্ত্বে ত্রিমূর্ত্তির (বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ) কল্পনা করিয়া লন। তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব রূপান্তরে প্রকটিত হন। বৌদ্ধগণের ত্রিমূর্ত্তির নাম—মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি। পুরাণেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ঐ তিন নাম পরিদৃষ্ট হয়। শব্দার্থের অনুসরণেও মঞ্জুশ্রীকে (জ্ঞানাধার) ব্রহ্মা, অবলোকিতেশ্বরকে (যাঁহার দৃষ্টি দূর-প্রসারিত) 'পদ্মপাণি' অর্থাৎ বিষ্ণু এবং বজ্রপাণিকে (সংহার-কারণ বজ্রধারীকে) শিব ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ফলতঃ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র বা রুদ্র প্রভৃতির প্রাধান্যে বৌদ্ধধর্ম্মে যে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। নানা দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতিতেও এ প্রভাব পরিদৃশ্যমান্। যোগী, মহাযোগী, মহাকাল, ভৈরব, ভীম এবং পার্ব্বতী, দুর্গা প্রভৃতি উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণের নিকট বিভিন্ন আকারে পূজা প্রাপ্ত হন। কোথাও কোথাও বলিদানের প্রথাও প্রচলিত আছে। তারা মূর্ত্তি বৌদ্ধগণ প্রায়ই উপাসনা করেন। * উত্তর দেশীয় বৌদ্ধগণের বিশ্বাস যে, প্রত্যেক ধ্যানিস্বর্গে এক এক জন ধ্যানী বুদ্ধ অধিপতি রূপে বিদ্যমান আছেন। ধ্যানী বুদ্ধগণের, বোধিসত্ত্বগণের এবং নরদেহধারী বুদ্ধগণের নাম এইরূপ পরিদৃষ্ট হয়;—

ধ্যানী বুদ্ধ; যথা,—(১) বিরোচন, (২) অক্ষোভ্য, (৩) রত্নসম্ভব, (৪) অমিতাভ, (৫) অমোঘসিদ্ধ।

বোধিসত্ত্ব,—(১) সামন্তভদ্র, (২) বজ্রপাণি, (৩) রত্নপাণি, (৪) পদ্মপাণি—অবলোকিতেশ্বর, (৫) বিশ্বপাণি।

নরদেহধারী বুদ্ধগণ,—(১) ক্রকুচন্দ, (২) কনহমুনি, (৩) কাশ্যপ, (৪) গৌতম, (৫) মৈত্রেয়—ইনি ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবেন, প্রসিদ্ধি আছে।

উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে এই সকল বৌদ্ধ-মূর্ত্তির ও বহু দেবদেবীর উপাসনার প্রথা

---

* স্যার মনিয়র উইলিয়মস্ তৎপ্রণীত বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থে (Sir M. William in his Buddhism) লিখিয়াছেন—"Maha-Brahma is often named, whereas Bishnu the popular God of the Hindus is, we have seen, represented by Padmapani (Avolokiteswara) who seems to have taken his place. Turning to God Siva, we may note that he was adopted by Buddhism in his character of Yogi or Maha Yogi. Then as the Buddhism of the North very soon became corrupted with Shavism and its accompaniments Sactism, Tantrism and Magic, so in the Northern countries various forms of Siva such as Mahakala, Bhairava, Bhima, and of his wife Parvati, Durga, &c, are honoured and their images are found in temples. Sometimes bloody sacrifices are offered amongst the Female Deities, the forms of Tara are chiefly worshipped and regarded as Saktis of the Buddhas,"

প্রবর্ত্তিত আছে। * বহু মন্দির ও দাগোবা এই সকল দেবতার জন্য উৎসর্গীকৃত দেখিতে পাই। † হিন্দুগণের আদি-ব্রহ্ম যেমন অনন্ত অদ্বিতীয় প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত, উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণের সেইরূপ এক "আদিবুদ্ধ" আছেন। এ বিষয়ে গৌতম নিজে কোনও মত প্রকাশ করেন নাই। অথচ তাঁহার অনুবর্ত্তিগণকেও তদনুসরণে প্রতিনিবৃত্ত করেন নাই। এ সকল ভিন্ন বৌদ্ধগণের মধ্যে তান্ত্রিক মত বিশেষভাবে প্রচলিত দেখিতে পাই। তান্ত্রিক-ধর্ম্মে দুর্গা কালী তারা প্রভৃতির উপাসনা বিহিত আছে। উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণ এ সকল উপাসনার বোল আনা অনুসরণ করিয়াছেন। তান্ত্রিকাচার ভিন্ন যোগাচার ক্রিয়ার অনুসরণও বৌদ্ধগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণগণের এবং বৌদ্ধগণের যোগ-পদ্ধতি প্রায় একই প্রকার। তিব্বতে বৌদ্ধগণের মধ্যে তান্ত্রিকাচার ও যোগাচার বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

* * *

বুদ্ধগণ।

[বুদ্ধের সংখ্যা অনেক,—চব্বিশ জন বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ,—৫৫৫ জন বুদ্ধের উল্লেখ,—বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বুদ্ধের বিষয়ে বিচার-বিতর্ক,—পাশ্চাত্য মত ও প্রাচীন কিংবদন্তী প্রভৃতির আলোচনা।]

সিদ্ধার্থ গৌতম যে একমাত্র বুদ্ধদেব এ ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি প্রথম বুদ্ধও নহেন এবং শেষ বুদ্ধও নহেন; কেন-না, তাঁহার পূর্ব্বে বহু বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পরেও বহু বুদ্ধ আবির্ভূত হইবেন। মহাবগ্‌গ গ্রন্থে বুদ্ধের একটী উক্তি আছে। তাহাতে তিনি বলিতেছেন,— 'সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান আমিই, সকল পদার্থে বিদ্যমান আছি। আমি কলঙ্কপরিশূন্য এবং কামনা-বিবর্জ্জিত। আমার জ্ঞানের মূল—আমিই স্বয়ং। সুতরাং

বুদ্ধের সংখ্যা অনেক।

* উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণের সকল দেবদেবীর মূর্ত্তির পরিচয় দেওয়া এস্থলে সম্ভবপর নহে। সুতরাং কয়েকটী প্রধান প্রধান মূর্ত্তির একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র এখানে করা যাইতেছে। তাঁহাদের প্রধান ত্রিমূর্ত্তির অন্তর্ভুক্ত মঞ্জুশ্রীর পরিচয়,—বাম হস্তে একটী পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তে একখানি তরবারি ধারণ করিয়া তিনি উপবিষ্ট আছেন। তরবারির চাকচিক্যে বা ঔজ্জ্বল্যে জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইতেছে। অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তির বর্ণনায় প্রকাশ,—তিনি একাদশ-স্কন্ধ, সহস্রবাহু ও সহস্র নেত্র সমন্বিত। তাঁহার স্ত্রীও সহস্রবাহু সহস্রচক্ষু বিশিষ্ট। সেই স্ত্রীমূর্ত্তির নাম চীনারা কোয়াঙ-জিন এবং জাপানীরা কোং-নোঙ ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করে। বজ্রপাণি মূর্ত্তির বিশেষত্ব—এক হস্তে বজ্রধারণ। তাঁহারা যে তারা বা শক্তি মূর্ত্তির উপাসনা করেন, তাহার বর্ণ হরিৎ; সে মূর্ত্তি উপবিষ্ট, তাহার দক্ষিণ হস্ত জানূপরি অবস্থিত এবং বাম হস্তে একটী পদ্ম প্রস্ফুটিত। এ সকল এবং আরও বহুবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি তিব্বতে, মঙ্গোলিয়ায়, চীনে, জাপানে এবং বিভিন্ন স্থানে সম্পূজিত হইয়া থাকে। মৈত্রেয় বুদ্ধ (যিনি ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবেন) দুই বাহু উত্তোলন করিয়া আছেন। সেই বাহুদ্বয়ের অঙ্গুলির দ্বারা পদ্মাকার মুদ্রা গঠিত হইয়াছে। তাঁহার বর্ণ হরিদ্রাভ বা সুবর্ণপ্রভ; কোঁকড়ান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশদামে তাঁহার মস্তক সুশোভিত। ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আসিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি হইতে উজ্জ্বল আলোক নির্গত হইতেছিল। হুয়েন-সাঙও সেই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেন।

† উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণের দেব-দেবীর মূর্ত্তির ও পূজা-পদ্ধতির পরিচয়-মূলক এক বিস্তৃত গ্রন্থ সম্প্রতি অক্স-ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আর কাহাকে আমি গুরু বলিয়া স্বীকার করিব? আমার কেহ গুরু নাই; আমার সমতুল্যও কেহ নহেন। স্বর্গাদি-সমন্বিত এই বিশ্বে আমার সমান কাহাকেও দেখিতে পাইবে না। আমিই বিশ্বের একমাত্র পবিত্র, আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভু। পূর্ণ বুদ্ধ বলিতে এক আমাকেই বুঝায়। শিখা-সমূহ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি।' তাঁহার শিষ্যগণের মুখেও তাঁহার সম্বন্ধে এই বাণী বিঘোষিত দেখি। অঙ্গুত্তরনিকায় ঘোষণা করিতেছে,—"একমাত্র তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনিই আনন্দদাতা, তিনিই আনন্দ-বিতরণকর্ত্তা। মনুষ্যের মুক্তির জন্য ও মনুষ্যের আনন্দ-বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে অনুকম্পা পুরঃসর তিনি সংসারে আবির্ভূত হন। মনুষ্যকে ও দেবগণকে আনন্দ, মুক্তি ও আশীর্ব্বাদ দান জন্য তাঁহার মর্ত্ত্যে আবির্ভাব।" এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, অতীতে ও অনাগতে নানা বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই বুদ্ধগণের সংখ্যা নানা মতে নানা প্রকার। চুল্লবগ্‌গ অনুসারে ২৪ জন বুদ্ধের পরিচয় প্রাপ্ত হই। ললিতবিস্তর মতে ৫৫ জন বুদ্ধের আবির্ভাব পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। প্রথমোক্ত মতে প্রথম বুদ্ধের নাম—দীপঙ্কর। তাঁহার পর এক 'অসংখ্যেয়' অতীত হইলে কোন্দন্ন আবির্ভূত হন। তাঁহার বাসস্থান—রমাবতী; পিতা—ক্ষত্রিয়-বংশীয় সুনন্দ; মাতা—সুজাতা। ভদ্দ ও সুভদ্দ নামে তাঁহার দুই জন প্রধান শিষ্য ছিলেন। অনুমদ্ধ নামক তাঁহার একজন অনুচর এবং তিস্সা ও উপতিস্সা নাম্নী দুই শিষ্যা ছিল। তাঁহার বোধি-বৃক্ষ—শালকাল্যায়ন। তাঁহার দেহ আট হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ; লক্ষ বৎসর কাল তিনি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার পর আর এক 'অসংখ্যেয়' অতীত হইলে মঙ্গল, সুমন, রেবত ও শোভিত নামে চারি জন বুদ্ধ অবতীর্ণ হন। মঙ্গল বুদ্ধের রাজধানীর নাম—উত্তর। তাঁহার পিতা—ক্ষত্রিয়-বংশজ উত্তর; মাতা—উত্তরা। সুদেব ও ধামসেন নামে তাঁহার দুই শিষ্য ছিলেন। তাঁহার অনুচরের নাম—পালিত। শিবালী ও অশোকা নাম্নী তাঁহার দুই শিষ্যা ছিল। তাঁহার বোধিবৃক্ষের নাম—নাগ। তাঁহার শরীর ৮৮ হস্ত দীর্ঘ; নব্বই হাজার বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার দেহান্তর-কালে দশ সহস্র পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় এবং সকল পৃথিবীই মনুষ্যের ক্রন্দনে ও হাহাকারে পূর্ণ হইয়াছিল। মঙ্গল বুদ্ধের লোকান্তরের পর, দশ সহস্র পৃথিবী যখন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, সেই সময়ে সুমন আবির্ভূত হন। তাঁহার রাজধানীর নাম—ক্ষেমা। পিতার নাম—সুদত্ত; মাতা—শ্রীমানা। তাঁহার প্রধান শিষ্যদ্বয় শরণ ও ভ্রাভিতত্ত, অনুচর—অদীন, শিষ্যা—সনা ও উপাসনা। তাঁহারও বোধিবৃক্ষের নাম—নাগ। তাঁহার শরীরের দৈর্ঘ্য ৯০ হাত এবং জীবনকাল—নব্বই হাজার বৎসর। তাঁহার পর রেবত আবির্ভূত হন। তাঁহার রাজধানীর নাম—সুধন্নাবতী। তাঁহার পিতা ক্ষত্র বিপুল, মাতা বিপুলা; বরুণ ও ব্রহ্মদেব—তাঁহার প্রধান শিষ্যদ্বয়। অনুচর—সম্ভব। ভদ্রা ও সুভদ্রা প্রধানা শিষ্যা, বোধিবৃক্ষ—নাগ-তরু। তাঁহার দেহ ৮০ হস্ত দীর্ঘ এবং জীবন-কাল ষাট হাজার বৎসর। রেবতের পর শোভিত বুদ্ধ আবির্ভূত হন। তাঁহার রাজধানীর নাম—সুধর্ম্মা; পিতা সুধর্ম্ম, মাতা সুধামা; অসম ও সুনেত্ত নামক তাঁহার প্রধান শিষ্য-দ্বয়। অনোমা নামক অনুচর এবং নকুলা ও সুজাতা নাম্নী শিষ্যা ছিল। তাঁহার বোধিবৃক্ষ—নাগ-তরু। তাঁহার দেহের উচ্চতা ৮০ হস্ত এবং জীবনকাল ৯০ হাজার বৎসর।

শোভিতের পর আবার এক 'অসংখ্যেয়' অতীত হয়। তার পর এক কল্পে তিন জন বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম,—অনোমাদর্শিন্, পদ্ম ও নারদ। এই তিন বুদ্ধেরও পূর্ব্বরূপ পিতা-মাতার ও শিষ্যাদির পরিচয় আছে। ইঁহাদের দুই জনের দেহের দীর্ঘতা ৫৮ হস্ত এবং অবস্থিতিকাল এক লক্ষ বর্ষ; শেষোক্তের দৈর্ঘ্য ৮৮ হস্ত ও অবস্থিতিকাল নব্বই হাজার বৎসর। নারদ বুদ্ধের পর -লক্ষ-কালাবর্ত্ত অতীত হয়। তৎপরে যে কল্প আসে, সেই কল্পে পদমুত্তর বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। হংসাবতী তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পিতা আনন্দ যোদ্ধৃপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম—সুজাতা। তাঁহার দেহের উচ্চতা ৮৮ হস্ত। তাঁহার দেহ হইতে যে জ্যোতিঃ স্খলিত হইত, তাহা অষ্টাদশ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনিও লক্ষ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই পাদমুত্তর বুদ্ধের পর তেত্রিশ সহস্র কালাবর্ত্ত অতীত হইলে এক কল্পে সুমেধ ও সুজাত নামে দুই বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। সুমেধের রাজধানীর নাম—সদসন। তাঁহার বোধিবৃক্ষ—চম্পক-তরু। তাঁহার দেহ ৮৮ হাত উচ্চ এবং তিনি নব্বই হাজার বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার পর সুজাত আবির্ভূত হন; তাঁহার নগরের নাম—সুমঙ্গল। তাঁহার বোধি-তরু—বংশ বৃক্ষ। বৌদ্ধগণ বলেন,—তাঁহার সে বোধিবৃক্ষ সাধারণ বাঁশ গাছ নহে। সে বাঁশের ছিদ্র অতি ক্ষুদ্র এবং তাহার শাখায় ময়ূরপুচ্ছ-সমূহ সুশোভিত ছিল। তাঁহার দেহ ৫০ হস্ত পরিমিত, এবং তাঁহার জীবনকাল—নব্বই হাজার বৎসর। সুজাতের পর আঠার শত কালাবর্ত্ত অতীত হইলে যে কল্প আসে, সেই কল্পে তিন জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন,—পিয়দশিন, অত্থদশিন, ধম্মদশিন। তাঁহাদের তিন জনেরই দেহের দৈর্ঘ্যতা ৮০ হস্ত পরিমিত ছিল। প্রথমোক্ত জন নব্বই হাজার বৎসর এবং শেষোক্ত দুই জন লক্ষ বৎসর হিসাবে জীবিত ছিলেন। পিয়দশিন প্রভৃতি বুদ্ধত্রয়ের আবির্ভাবে যথাক্রমে অনোমা, শোভিতা, শরণা রাজধানীত্রয় প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। এই তিন বুদ্ধের পর ৯৪ কালাবর্ত্ত অতীত হইলে এক কল্পে সিদ্ধার্থ নামা বুদ্ধ আবির্ভূত হন। তিনি ষাট হস্ত দীর্ঘ ও লক্ষ বৎসর পরমায়ুবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পর ৯২ কালাবর্ত্ত অতীত হইলে আর এক কল্পে তিস্সা ও ফুস্সা নামে দুই জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষেমা ও কাশী যথাক্রমে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। তিস্সা ষাট হস্ত ও ফুস্সা পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ ছিলেন। তিস্সা লক্ষ বৎসর এবং ফুস্সা নব্বই হাজার বৎসর বিদ্যমান থাকেন। তাঁহা-দের পর ৯০ কালাবর্ত্ত অতীত হয়। সেই সময় বিপাশিন্ বুদ্ধ আবির্ভূত হন। বন্ধুমতী তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার দৈর্ঘ্য আশী হস্ত; জীবনকাল লক্ষ বর্ষ; তাঁহার দেহ-জ্যোতিঃ দেড় শত ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার পর ৩১টী কালাবর্ত্ত অতীত হইলে, শিখিন ও বেস্সাভূ নামক দুই জন বুদ্ধ অবতীর্ণ হন। শিখিনের রাজধানী—অরুণাবতী; তাঁহার দেহের দৈর্ঘ্য ৩৭ হস্ত; তাঁহার দেহজ্যোতিঃ সাড়ে চারি ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি ৩৭ হাজার বর্ষ জীবিত ছিলেন। বেস্সাভূ বুদ্ধের রাজধানীর নাম—অনোপমা; তাঁহার দেহ ষাট হস্ত দীর্ঘ এবং বয়ঃক্রম ষাট হাজার বৎসর ছিল। ঐ সকল কালাবর্ত্তের পর বর্ত্তমান কালাবর্ত্তে চারি জন বুদ্ধ আবির্ভূত হন। সেই

চারি জন বুদ্ধের নাম—কাকুসন্দ, কোনাগমন, কাশ্যপ ও বুদ্ধ। কাকুসন্দের রাজধানী—ক্ষেমা। কোনাগমনের রাজধানীর নাম—শোভাবতী। কাশ্যপের জন্মস্থান—বারাণসী এবং বুদ্ধের জন্মস্থান—কপিলাবস্তু। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন জন ব্রাহ্মণ-বংশে এবং শেষোক্ত বুদ্ধ ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাকুসন্দ চল্লিশ হস্ত দীর্ঘ ও চল্লিশ সহস্র বর্ষকাল জীবিত ছিলেন। কোনাগমন বুদ্ধের দৈর্ঘ্য—কুড়ি হস্ত এবং জীবিত কাল ত্রিশ হাজার বৎসর। কাশ্যপ—বিশ হস্ত দীর্ঘ ও কুড়ি হাজার বৎসর জীবিত ছিলেন। শেষোক্ত বুদ্ধ দীপঙ্কর প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশ বুদ্ধের শীর্ষস্থানীয়। * আমরা অধুনা যে বুদ্ধের বিষয় আলোচনা করিতেছি, এই হিসাবে তিনি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোধিসত্ত্ব। †

বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বুদ্ধ।

হিন্দুশাস্ত্রে যেমন কল্প-কল্পান্তর যুগ-যুগান্তর প্রভৃতির বিবরণ দৃষ্ট হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগ-কল্পে যেমন ভিন্ন ভিন্ন অবতারের প্রাধান্য দেখিতে পাই; বুদ্ধদেবের অতীত ও অনাগত জন্ম-বিবরণের বিষয় আলোচনা করিলেও তন্মধ্যে সেই ভাব দেদীপ্যমান দেখি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে এই সৌরজগতের ও পৃথিবীর সৃষ্টি সে দিনের ঘটনা মাত্র। পুঞ্জায়মান নীহারিকা ব্যোম-পথে বিঘূর্ণিত হইতে হইতে পিণ্ডাকার প্রাপ্ত হয়; তাহাতে ক্রমশঃ প্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট

* দীপঙ্কর প্রমুখ ২৪ জন বুদ্ধের নাম ও পরিচয় ত্রিপিটকান্তর্গত বহু গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। খুদ্দকনিকায়ের উপসংহার ভাগে বুদ্ধবংশ অংশে পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হই। জাতক-গ্রন্থের অন্তর্গত পালিভাষায় লিখিত টিপ্পনী মধ্যে চতুর্ব্বিংশ বুদ্ধের বিশদ বিবরণ বিবৃত আছে। নিদানকথা তদ্বিবরণ যে ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, এখানে আমরা তাহারই অনুসরণ করিলাম। নিম্নলিখিত ইংরাজী গ্রন্থে এতদ্বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য। *Compare.* Fausball's *Jataks* and *Sutta Nipata*; Turner's *Mahavansa*; Hardy's *Manual of Buddhism* and Rhys David's *Translation of Nidan Katha.*

† কত জন বুদ্ধের পর এই বুদ্ধের আবির্ভাব হয়, তদ্বিষয়ে নানা মত আছে। শম্ভুপুরাণ নামে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এক পুরাণ-গ্রন্থ নেপালী বৌদ্ধগণের নিকট সমাদৃত আছে। ঐ পুরাণ-মতে আরও ছয় জন বুদ্ধের পরিচয় পাই। তাঁহাদের এক জনের নাম—বিপশ্চিত। কথিত হয়, নেপালরাজ্য পূর্ব্বে মনুষ্যবাসের অযোগ্য জল-ভূমি ছিল। বিপশ্চিত বুদ্ধ অসংখ্য অনুচর সহ ঐ স্থানে আগমন করেন; আর তাঁহারই অনুগ্রহে নেপালরাজ্য সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন উর্ব্বর ভূমিতে পরিণত হয়। শম্ভুপুরাণের মতে আর এক বুদ্ধের নাম—শিখি। নেপালে গমন করিয়া তিনি নির্ব্বাণ-লাভ করেন। বিশ্ববাহু প্রভৃতি তাঁহার পরবর্ত্তী বুদ্ধ-চতুষ্টয় তাঁহারই ন্যায় নির্ব্বাণ-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ললিতবিস্তরে গৌতম বুদ্ধসহ ৫৫ জন বুদ্ধের নাম লিখিত আছে। পর পর সেই ৫৫ জন বুদ্ধের নাম;—পাদমোত্তর, ধর্ম্মকেতু, দীপঙ্কর, গুণকেতু, মহাকর, ঋষিদেব, শ্রেতজ, সত্যকেতু, বজ্রসংহত, সর্ব্বাভিয়ন, হেমবর্ণ, অত্যুচ্চগামী, প্রবাশয়, পুষ্পকেতু, বররূপ, সুলোচন, ঋষিগুপ্ত, জিনবক্ত্র, উন্নত, পুষ্পিত, ঊর্ণিতজ, পুষ্কর, সরশ্মি, মঙ্গল, সুদর্শন, মহাসিংহতেজ, স্থিতবুদ্ধিদত্ত, বসন্তবন্ধি, সত্যধর্ম্মবিপুলকীর্ত্তি, পুষ্য, বিস্তারণবিন্দ, রত্নকীর্ত্তি, উগ্রতেজ, ব্রহ্মতেজ, সুঘোষ, সুপুষ্য, সুমনোজ্ঞঘোষ, সুচারুরূপ, প্রহসিতনেত্র, গুণরশ্মি, মেঘেশ্বর, সুন্দরবর্ণ, আয়ুস্তেজ, সলিলগজগামী, লোকাভিলষিত, জিতশত্রু, সম্পূজিত, বিপশ্চিত, শিখি, বিশ্ববাহু, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, সুমনকাশ্যপ, সিদ্ধার্থ, গৌতম। আর্য্যশূর প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'জাতকমালা' গ্রন্থে ৩৪ জন বুদ্ধের পরিচয় আছে। এতদ্ভিন্ন পালিভাষায় যে 'জাতকমালা' প্রচলিত, তদনুসারে বুদ্ধদেবের ৫৫০টী পূর্ব্বজন্মের বিষয় অবগত হওয়া যায়। ফলতঃ, নানা মতে বুদ্ধের নানারূপ পূর্ব্বজন্মের বিষয় উল্লেখ আছে। বোধিসত্ত্বাবদান বা বোধিসত্ত্বাবদানমালা নামক সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থেও বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের বিষয় অনেক অবগত হওয়া যায়। অবদানের আখ্যায়িকাগুলির জাতক আখ্যায়িকার সহিত অনেক অংশে সাদৃশ্যসম্পন্ন।

পদার্থে। তথা জীব-সংহতির ক্রম-বিকাশ সংসাধিত হইয়া থাকে, আর সেই নৈসর্গিক সৃষ্টি-ক্রিয়ার ফলে, ক্রমশঃ মানুষের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক এখন এবম্বিধ মতের পরিপোষক। সুতরাং বুদ্ধের পূর্ব্বে যে আবার বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অবতারের পূর্ব্বে যে আবার অবতারের কার্য্যকলাপ ছিল, তাহা তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতে পারেন না। সে মতে, গৌতম বুদ্ধই আদি বুদ্ধ, গৌতম বুদ্ধই শেষ বুদ্ধ, আর যত বুদ্ধের কথা পিটকাদিতে দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় কল্পিত উপাখ্যান মাত্র। * এই দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াই পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ হিন্দুর শাস্ত্র-গ্রন্থাদিকে পুরাণ-পরম্পরাকে অতি আধুনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু কেবল হিন্দুর বলিয়া নহে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উত্থান-পতনের যে ধারাবাহিক কিংবদন্তী সংসার বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, তাহার কি কোনই মূল্য নাই? সকল দেশের, সকল জাতিই কি আপনাদের পূর্ব্ব পরিচয়ে শুধুই মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন? † কখনই সেরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। বিজ্ঞান এখনও যে সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। সুতরাং সৃষ্টি-সম্বন্ধে অধুনা যে সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে, তাহা আংশিক সত্য হইলেও পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তি, অন্ধের হস্তি-দর্শনের ন্যায়, একদেশদর্শিত্বতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার সম্যগ্দর্শনের দাবী কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। যেমন, ভৌতিক দেহের পর সূক্ষ্ম দেহ আছে, কেহ দেখিতে পায়, কেহ দেখিতে পায় না, ইহাও সেইরূপ মনে করিতে হইবে। তুমি যদি কোনও দেশ, জনপদ বা নগর না দেখিয়া থাক, অথবা যদি কাহারও নিকট তদ্বিবরণ অবগত হইতে না পার, তাহাতে সেই দেশ-জনপদাদির অনস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। অতএব, যুগ মন্বন্তরের পর যুগ মন্বন্তর অথবা কাল্পান্তের পর কল্পান্ত যে আসিয়াছিল,

---

* রিজ ডেভিডস্ ও ওল্‌ডেনবর্গ প্রমুখ অধুনাতন পণ্ডিতগণ পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধাবতারের বিষয় অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ডেভিডস্ বলেন,—"It is sufficiently evident that nearly all these details are merely imitated from the corresponding details of the legend of Gautama; and it is to say the least, very doubtful whether the tradition of these legendary teachers has preserved us any grains of historical fact. If not, the list is probably later than the time of Goutama for while it is scarcely likely that he should have deliberately invented these names, it may well have seemed to later Buddhists very edifying to give such lists and very reasonable to exclude in them the names held in the highest honour by the Brahmans themselves." ডাক্তার ওল্‌ডেনবর্গের মত,—It could scarcely be otherwise than that the historical form of the one actual Buddha multiplied itself under dogmatic treatment to a countless number of past and coming Buddhas."

† ভারতবর্ষের ন্যায় চীনের ও মিশরের প্রাচীন ইতিহাসেও দূর অতীতের কিংবদন্তী আছে। মিসরে প্রথমে দেবগণের রাজত্ব ছিল, পরিশেষে মেনেস্ (Menes) রাজা হন। চীন দেশ সম্বন্ধেও ঐরূপ উক্তি আছে। ফো হি, চিন-নঙ এবং হোয়াংটি—এই তিন জন চীনের ইতিহাসে প্রথম তিন জন রাজা বলিয়া অভিহিত হইলেও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণও চীনাদের প্রাচীন ইতিহাসে অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুনঃপুনঃ আসিয়া যে পুনঃপুনঃ চলিয়া গিয়াছে এবং আবার আসিবে ও যাইবে, তাহাতে মনে কোনই দ্বিধা আসিতে পারে না। প্রাচীন জাতিমাত্রেই একবাক্যে যে একটা বিষয় ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন, তাহা কখনই ফুৎকারে উড়াইবার বিষয় নহে। অতএব, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বুদ্ধের বিষয় অস্বীকার করা কদাচ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু বিভিন্ন কালে বিভিন্ন নামধেয় বুদ্ধের আবির্ভাবে এবং তাঁহাদের আকৃতি, গঠন ও বিদ্যমানতার পরিমাণ বিষয়ে আলোচনা করিলে জৈন তীর্থঙ্করগণের স্মৃতি মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে। জৈনগণের চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের * যে পরিচয় জৈন-শাস্ত্রে লিপি আছে, তাহাও এই সিদ্ধান্তের প্রতিপোষক। কালাবর্ত্ত যে অসংখ্য এবং বিভিন্ন কালাবর্ত্তে যে বিভিন্ন অবতার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সকল শাস্ত্রমতে সর্ব্বপ্রকারেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত কোনক্রমেই আদরণীয় হইতে পারে না।

* * *

বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে যান-বিভাগ।

['যান' শব্দের অর্থ,—মহাযান, হীনযান শ্রাবকযান, বজ্রযান প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ,—ভিন্ন ভিন্ন যানের গুরু,—কল্যাণমিত্র প্রভৃতি গুরুর পরিচয় ;—মহাযান ও হীনযান সৃষ্টির আদি,—মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থকারগণ—অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, বসুবন্ধু, অসঙ্গ, আর্য্যদেব প্রভৃতি।]

উত্তর-দেশীয় ও দক্ষিণ-দেশীয় প্রধানতঃ এই দুই বিভাগে বৌদ্ধগণ বিভক্ত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে আরও বহু প্রকারের স্বাতন্ত্র্য আছে। সেই স্বাতন্ত্র্যের এক প্রধান বিভাগ—'যান'। যান শব্দের প্রকৃত অর্থ—যদ্দ্বারা যাওয়া যায়। তদনুসারে যান শব্দে কেহ 'শকট', কেহ বা 'পথ' অর্থ নির্দ্দেশ করেন। অর্থাৎ,—'যে পথ অবলম্বন করিলে বা যে যানের আশ্রয় পাইলে, জন্ম-জরা-মৃত্যুর কবল অতিক্রম করিতে পারা যায়, নির্ব্বাণ অধিগত হয়,—তাহাই 'যান' শব্দের প্রকৃত বাচ্য। যেমন নানা মত, বৌদ্ধগণ তেমনই নানা যানে বিভক্ত। মহাযান, হীনযান, শ্রাবকযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানা যানের পরিচয় পাই। এই সকল যানের মধ্যে মহাযান ও হীনযান প্রধান এবং আদিভূত। বৌদ্ধধর্ম্ম যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রাধান্য-লাভ করিয়াছিল, এই যান-তত্ত্ব অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। প্রথম প্রথম তিব্বতের ও নেপালের বৌদ্ধগণ, অর্থাৎ উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণ, আপনাদের অনুসৃত পন্থাকে 'মহাযান' বলিয়া ঘোষণা করিতেন; এবং সে মতে সিংহল-দ্বীপের বৌদ্ধগণ হীনযান পন্থার অনুসরণকারী বলিয়া অভিহিত হইতেন। আর তদনুসারে উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণ 'মহাযানী' এবং দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণ 'হীনযানী' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের ঐ দুই সংজ্ঞার একটু নিগূঢ় কারণও ছিল। মহাযান শব্দে বৃহৎ যান বা বিস্তৃত পথ বুঝাইয়া থাকে। যে যানে বা যে পথে অনেকের স্থান সঙ্কুলান আছে, তাহাই মহাযান। আর যে পথ বা যে যান অল্পের জন্ম নির্দ্দিষ্ট, তাহাই হীনযান। সিংহ-

মহাযান, হীনযান, প্রভৃতি।

* জৈন তীর্থঙ্করগণের বিবরণ "পৃথিবীর ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

লাদি দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধগণ যে হীনযানের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহার কারণ,—তাঁহারা একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন এবং ত্রিপিটকের বিধি যথারীতি মান্য করিতেন। সংসারত্যাগী বিহারবাসী ভিক্ষুগণই যে প্রকৃত বৌদ্ধ, হীনযানী বৌদ্ধগণের ইহাই প্রকৃষ্ট মত। অপিচ, অহিংসাদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল মন্ত্র বলিয়া মান্য করায় তাঁহাদের সংখ্যাও সুতরাং সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। আর তাই তাঁহাদের পথ 'হীনযান' অর্থাৎ 'সীমাবদ্ধ' বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া অভিহিত হইত। মহাযানের কর্ম্মক্ষেত্র এই হিসাবে অনেক বিস্তৃত। তাঁহাদের মতে, বৌদ্ধধর্ম্ম কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট লোকের উদ্ধারের জন্য প্রবর্ত্তিত হয় নাই, বৌদ্ধধর্ম্ম জনসাধারণের সকলের সম্পত্তি, সকল দেশের সকল জাতি, সকল দেশের সকল ধর্ম্মাবলম্বী, এই হিসাবে, বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধদেব সকলকেই নির্ব্বাণ দান করিবেন। খৃষ্টানগণের যীশুখৃষ্ট যেমন সকলের পাপ-ভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; মহাযানী বৌদ্ধগণের মতে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধদেবও সেইরূপ সকলের উদ্ধার করিতে আসিতেছেন। তদনুসারে আপন আপন ধর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া, সেই ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন দ্বারাও বৌদ্ধ হওয়া যাইবে এবং সেরূপভাবে বৌদ্ধ হইলেও নির্ব্বাণ-লাভ ঘটিবে। এ বড় অল্প প্রলোভন নহে। চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, তাতার, তিব্বত, পারস্য প্রভৃতির মাংসভুক জাতিরাও তাই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই এক দেশে হীনযানে 'অহিংসা' বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূল মন্ত্র থাকিলেও, অন্য দেশে মহাযানে বৌদ্ধধর্ম্মে বলিদান প্রথা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। মহাযানে ও হীনযানে এতটাই পার্থক্য দেখি। শ্রাবকযান প্রভৃতি অন্যান্য যান, এক হিসাবে ঐ দুই যান হইতে স্বতন্ত্র এবং এক হিসাবে ঐ দুই যানের শাখা-প্রশাখা বিশেষ বলা যাইতে পারে। গুরুকরণ উপলক্ষে ঐ সকল যানের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। শ্রাবকযানের গুরু-শিষ্যে বন্ধুত্ব-ভাব; গুরু আপন শিষ্যকে বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দেন। মহাযানে গুরু, শিষ্যের কল্যাণ কামনা করেন। মন্ত্রযানে গুরু মন্ত্রদান করেন। বজ্রযানে গুরু, বজ্রধর বা দেবতা মধ্যে গণ্য। সহজযানে গুরুর উপদেশ ভিন্ন কোনও কর্ম্মেই মুক্তি নাই। কালচক্রযানে, গুরুই বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরস্থানীয়। সুতরাং সেখানে গুরু ও জগদীশ্বর অভিন্নভাবাপন্ন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন যানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে গুরুর অনুসরণ করার উপদেশ প্রাপ্ত হই। * ভিন্ন ভিন্ন যানের

---

* ভিন্ন ভিন্ন যানের গুরু ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় পরিচিত। শ্রাবকযানের গুরু—'উপাধ্যায়।' শিক্ষকের ও ছাত্রের যে সম্বন্ধ, এখানে সেই সম্বন্ধ মাত্র উপলক্ষ। মহাযানের গুরুর নাম—'কল্যাণমিত্র'। তিনি শিষ্যের কল্যাণকামী। এই কল্যাণমিত্র' গুরুর লক্ষণ অঙ্গুত্তর নিকায়ে' এইরূপ লিখিত আছে;—

> "দুদ্দদং দদাতি মিত্তং দুক্করঞ্চাপি কুব্বতি।
> অথোপিস্স দুরুত্তানি খমতি দুক্খমানি চ।
> গুয়হঞ্চ তস্স আক্খাতি গুয়্হস্স পরিগূহতি।
> আপদাসু ন জহতি খীণেনাপি নাতিমঞ্ঞতি॥
> যস্মিং এতানি ঠানানি স বিজ্জন্তি চ পুগ্গলে।
> সো মিত্তো মিত্তকামেন ভজিতব্বো তথাবিধো॥"

অর্থাৎ,—'(১) কষ্টলব্ধ ধনসম্পত্তি বন্ধুকে দান, (২) বন্ধুর জন্য অসাধ্য সাধন, (৩) বন্ধুর গুরুতর দোষ ও দুর্ব্বাক্য সহ্য করা, (৪) গুপ্ত বিষয় অসঙ্কোচে বন্ধুকে বলা, (৫) বন্ধুর গুপ্ত বিষয় গোপন রাখা, (৬) বন্ধু

অনুসরণকারিগণ তত্তৎ যানের গুরুর সাহায্যে নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হন। এবম্বিধ যান-বিভাগেও বৌদ্ধধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে উপ-বিভাগের অন্ত নাই। দিনের পর যতই দিন কাটিয়াছে, শাখার পর ততই উপশাখার সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত, অপিচ ক্রিয়া-কর্ম্মে আচারে-ব্যবহারে সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন, অসংখ্য সম্প্রদায় তাই এখন বিদ্যমান দেখি।

মহাযান ও হীনযান সৃষ্টির আদি।

'মহাযান' এবং 'হীনযান'— এই দুই 'যান' কোন্ সময়ে কিরূপভাবে সৃষ্ট হয়, তাহার একটা ইতিহাসও আছে। তদনুসারে রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্বকালেই ঐ দুই যানের উৎপত্তি। সেই সময় অশোকের ভক্তিপাত্র একজন ব্রাহ্মণ মহাস্থবির ছিলেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষুগণ এবং বৈশালীর ভিক্ষুগণ তাঁহাকে গুরু বলিয়া মান্য করিতেন। সাধারণ বৌদ্ধগণের সহিত পাঁচটি বিষয়ে তাঁহার মতবিরোধ উপস্থিত হয়। তদনুসারে বৌদ্ধগণ দুইটী দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। মহাদেবের দল তখন 'মহাসাঙ্ঘিক' সম্প্রদায় নামে পরিচিত হন এবং তৎসম্প্রদায়-বহির্ভূত বৌদ্ধগণ 'মহাস্থবির' সম্প্রদায় সংজ্ঞা লাভ করেন। মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের মত উদার-নৈতিক ভাবাপন্ন ছিল। পরবর্ত্তিকালে সেই সম্প্রদায়ই 'মহাযান' নাম পরিগ্রহ করে। অশোকের সাহায্যে এই সম্প্রদায় পরিপুষ্ট ও চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন মহাস্থবির সম্প্রদায় কাশ্মীরে মাত্র আশ্রয় পায়। মহাস্থবির ও মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায় দ্বয় প্রত্যেকে নয়টি করিয়া শাখায় বিভক্ত হয়। বিবিধ গ্রন্থে সেই শাখার অষ্টাদশ নাম ভেদ দৃষ্ট হয়। তবে প্রধানতঃ মহাস্থবির সম্প্রদায়ে—সর্ব্বাস্তিবাদিন্ (মৌলাস্তিক), বৎসি-পুত্রীয় (হিমবন্ত), ধর্ম্ম উত্তরীয়, ভদ্রয়ানিক, সম্মিতীয় ষণ্ণাগরিক, কাশ্যপিক (কাশ্যপীয়), মহীশাসক, সূত্রবাদিন এবং মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ে—পূর্ব্বশৈল, অপরশৈল, রাজগিরিক, হৈমবন্ত, চৈত্যিক, সংক্রান্তিক, গোকুলিক, ধর্ম্মগুপ্তিক, তাম্রশাটীয় প্রভৃতি শাখার নাম দৃষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে নামের পরিবর্ত্তন হেতু অনেক স্থলে কোন্ শাখা কোন্ কাণ্ডের অন্তর্গত, তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন হইয়া পড়ে। এ সকল বিভাগ দৃষ্টে, পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় এখন মহাযান ও হীনযান মধ্যে পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে বলিয়াই

দরিদ্র হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ না করা, (৭) সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বদা বন্ধুকে ভালবাসা,—এই সপ্তগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রকৃত মিত্র; আর তিনিই 'কল্যাণমিত্র' নামে অভিহিত। যাঁহার ঐ সপ্তবিধ গুণ আছে, মিত্রকামী ব্যক্তির তাঁহাকে ভজনা করা উচিত। কল্যাণমিত্র সম্বন্ধে আরও লিখিত আছে,—

"অলমেব মিত্তং ভজিতুং সিঁচিনিতুং সুসিক্তং।
বুত্তমথং বিজানিত্বা কো মিত্তং ন ভজিস্সতি॥"

অর্থাৎ,—কল্যাণমিত্রের স্বরূপ জানিয়া কল্যাণমিত্রের ভজনা করা যে কর্ত্তব্য, সেই বিষয়ই এখানে বলা হইয়াছে। তার পর আরও কথিত হয়,—"কল্যাণমিত্তাতো কিং নাম ন হেস্সতীতি।" অর্থাৎ—সকল মঙ্গলই 'কল্যাণমিত্র' দ্বারা সাধিত হয়। কল্যাণমিত্র যেরূপভাবে উপাস্য মধ্যে গণ্য, অস্মাক যানের গুরুও সেইরূপভাবে সর্ব্ব গুরুর উচ্চ ও উচ্চতর স্থানে অধিরূঢ়। মূলেই সে আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

প্রতিপন্ন হয়। আর সেই হেতু মহাযান সম্প্রদায়ের কোনও কোনও গ্রন্থ হীনযান সম্প্রদায় কর্তৃক সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থকারগণ।

মহাযান সম্প্রদায়ে অনেক বড় বড় গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষ এক সময়ে এই সম্প্রদায়ের নেতৃস্থান লাভ করিয়াছিলেন।† তিনি কণিষ্কের গুরু পদে বরিত হন। সুতরাং কণিষ্কের প্রতিপত্তি কালে তাঁহার প্রভাবের অবধি ছিল না। অশ্বঘোষ বিরচিত 'সৌন্দরানন্দ', বুদ্ধচরিত প্রভৃতি কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ঐ দুই গ্রন্থ ভিন্ন, মহাযান শ্রাদ্ধোৎপাদক শাস্ত্র, মহাযান ভূমিগুহ্যবাচামূল শাস্ত্র, দশদুষ্টকর্ম্মমার্গ শাস্ত্র, সূত্রালঙ্কার শাস্ত্র প্রভৃতি সংস্কৃত-ভাষায় রচিত তাঁহার দর্শন গ্রন্থাদিও বৌদ্ধ-সমাজে এক সময়ে বিশেষ সমাদৃত ছিল। অশ্বঘোষের অনেক গ্রন্থই এখন এ দেশে লোপপ্রাপ্ত। ৪০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অশ্বঘোষের ঐ সকল গ্রন্থ চীনা-ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল বলিয়াই এখন সন্ধান পাইতেছি। অশ্বঘোষের পর নাগার্জ্জুন মহাযান-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব অধিকার করেন। তিনিও ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অনেকে অনুমান করেন, তিনি দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। কি হিন্দু-দর্শনে, কি বৌদ্ধ দর্শনে, সকল দর্শনেই তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয়,—ধর্ম্মধাতুস্তোত্র, মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র, প্রজ্ঞামূলশাস্ত্র, দশভূমিবিভাষা শাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রদীপ শাস্ত্র, দ্বাদশনিকায় শাস্ত্র, অষ্টাদশ কামশাস্ত্র, দ্বারতর্কশাস্ত্র, মধ্যান্তানুশাস্ত্র, বিবাদশমন-শাস্ত্র, কৌশল-হৃদয় শাস্ত্র, লক্ষণবিমুক্ত বোধিহৃদয় শাস্ত্র, মহাযান ভবভেদ শাস্ত্র, গাথাসংগ্রহপার্থ শাস্ত্র, মহাযানগাথাবিংশতি শাস্ত্র, বুদ্ধমাতৃকা প্রজ্ঞাপারমিতা মহার্থসঙ্গীতি শাস্ত্র, বোধিকার্য্যসূত্র, মহাপ্রণিধানোৎপাদ গাথা, নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্ব সুহৃল্লেখ ইত্যাদি। এ সকল গ্রন্থও প্রায় এ দেশে বিলুপ্ত। চীনাভাষায় এ সকল গ্রন্থ ৪০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ে অনুবাদিত হইয়াছিল। নাগার্জ্জুনের পর অসঙ্গ ও বসুবন্ধু দুই ভ্রাতা মহাযান সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠান্বিত হন। তাঁহারা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গান্ধার দেশে পুরুষপুরে ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁহাদের জন্ম হয়। তাঁহারা প্রথমে শ্রাবকযানের সর্ব্বাস্তি-

---

* মিলিন্দ-প্রশ্ন (মিলিন্দ পঞহো) প্রভৃতি গ্রন্থ মহাযানসম্প্রদায়ের, কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ হীনযান সম্প্রদায় কর্ত্তৃকও আদৃত হয়। কেহ কেহ কহেন, কণিষ্কের সময় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি রচনা আরম্ভ হয়। আর তাহাতে পালিভাষা চাপা পড়িয়া যায়।

† খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫০ অব্দে অশ্বঘোষ সাকেত নগরে (অযোধ্যা) ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুবর্ণাক্ষীর পুত্র। তাঁহার সৌন্দরানন্দ কাব্যের উপসংহারে তাঁহার ঐ পরিচয় দৃষ্ট হয়। যথা,—

"আর্য্যসুবর্ণাক্ষীপুত্রস্য সাকেতস্য ভিক্ষোরাচার্য্যঃ;
ভদন্তাশ্বঘোষস্য মহাকবের্মহাবাদিনঃ কৃতিরিয়মিতি।"

এই অশ্বঘোষের বিষয় এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বাংশে এবং পৃথিবীর ইতিহাস চতুর্থ খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার কাব্য মহাকাব্যের পরিচয় প্রসঙ্গে কিছু কিছু আলোচনা আছে।

বাদ শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেষে মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত হন। অসঙ্গের ও বসুবন্ধুর রচিত বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ও টীকা সমুদায় ৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনভাষায় অনুদিত হয়। অসঙ্গরচিত গ্রন্থাদি,—বজ্রচ্ছেদিকাসূত্র, প্রকরণার্য্য শাস্ত্র, মহাযান-সম্পরিগ্রহ শাস্ত্র, সূত্রালঙ্কার টীকা, মহাযান-বিধর্ম্ম সঙ্গীতি শাস্ত্র, বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র, শাস্ত্রকারিকা, মধ্যান্তানুগম শাস্ত্র, মহাযান-সম্পরিগ্রহ শাস্ত্র, যথারোপদিষ্টধ্যান-ব্যবহার শাস্ত্র। বসুবন্ধু রচিত গ্রন্থাদি,—বজ্রচ্ছেদিকাসূত্র শাস্ত্র, মহাযান-সম্পরিগ্রহ শাস্ত্র ব্যাখ্যা, পঞ্চস্কন্ধক শাস্ত্র, শতশাস্ত্র, গয়াশীর্ষসূত্র, দিসভূমিকাশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ-পরিপৃচ্ছাসূত্র টীকা, ত্রিপূর্ণসূত্রোপদেশ, অপরিমিতায়ুস্ সূত্র শাস্ত্র, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন সূত্রোপদেশ, মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র শাস্ত্র, নির্ব্বাণসূত্র পূর্ব্বভূতোত্পন্না ভূতগাথাশাস্ত্র, সর্ব্বশেষ উপদেশ-শাস্ত্র, মহাযান শতধর্ম্ম বিদ্যোদ্ধার শাস্ত্র, বিজ্ঞামাত্র সিদ্ধি ত্রিদশ শাস্ত্র, বোধিচিত্তোৎপাদন শাস্ত্র, বুদ্ধগোত্রশাস্ত্র, কর্ম্মসিদ্ধি প্রকরণ শাস্ত্র, বিজ্ঞামন্ত্রসিদ্ধি শাস্ত্র, মধ্যান্ত বিভাগ শাস্ত্র, তর্ক শাস্ত্র, অভিধর্ম্ম কোষশাস্ত্র, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরিকশাস্ত্র, বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতাশাস্ত্র, ধ্যান ব্যবহার শাস্ত্র ইত্যাদি। অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর পূর্ব্বে আর্য্যদেব প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হন। তিনি নাগার্জ্জুনের শিষ্য বলিয়া প্রখ্যাত। দ্বিতীয় খৃষ্ট-শতাব্দীর শেষভাগে তিনি দক্ষিণ-ভারতে মান্দ্রাজ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি (৩৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) চীনাভাষায় অনুদিত হয়; যথা,—প্রজ্ঞামূল শাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রদীপশাস্ত্রকারিকা, শতশাস্ত্র, বৈপুল্যশাস্ত্র, মহাপুরুষশাস্ত্র, শতাক্ষরশাস্ত্র, চারিটি প্রাথকযান সম্প্রদায়ের ভিন্নমত খণ্ডন শাস্ত্র, নির্ব্বাণের ব্যাখ্যা ও কুড়িটি শ্রাবকযান সম্প্রদায়ের মত শাস্ত্র ইত্যাদি। * এই যে সকল গ্রন্থ ও টীকা ইঁহারা প্রণয়ন করিয়া যান, চীন-দেশ যদি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ না করিত এবং ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন না করাইত, তাহা হইলে আমরা হয় তো এ সকলের সন্ধানই পাইতাম না। মহাযান সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়েরও এইরূপ গ্রন্থাদি ছিল। কিন্তু সে সকলের সন্ধান লইতে গেলে, এখন ইংরাজী ভাষার দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃত ও পালি ভাষার গ্রন্থ-সমূহের পরিচয়মূলক যে সকল গ্রন্থ-তালিকা (ক্যাটালগ) প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই এখন এ পক্ষের প্রধান সহায়। †

---

* অশ্বঘোষের, নাগার্জ্জুনের, আর্য্যদেবের, অসঙ্গের ও বসুবন্ধুর গ্রন্থাদির এই পরিচয় জাপানী পরিব্রাজক ভিক্ষু রিউখান কিমুরা প্রথম আমাদিগকে প্রদান করেন। তাঁহার অনুসরণেই ঐ পরিচয় এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল।

† এসকল গ্রন্থের সন্ধানে ডি আলউইজের গ্রন্থ (D. Alwis—*Sanskrit, Pali, and Sinhalise Works of Ceylon*) এবং ব্রিটিশ মিউজিয়মের ক্যাটালগ (British Museum—Department of Oriental Printed Books and Mss.—*Catalogue of Sanskrit and Pali books in the British Museum*) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। চাইল্ডার্স সাহেবের পালি অভিধানেও (Childer's Dictionary of the Pali Language) এ বিষয়ের অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। তিব্বতীয় ভাষায় তেঙ্গুর (কেঙ্গুর) গ্রন্থও এ বিষয়ের সহায়তা করে।

* * *

বৌদ্ধধর্ম্মে—আত্মা, পরমাত্মা।

[আত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ে বৌদ্ধগণের মত,—মিলিন্দপ্রশ্নে রাজা মিলিন্দের ও নাগসেনের প্রশ্নোত্তর,—আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে ক্ষেমা ও প্রসেনজিতের আলোচনা,—আত্মা ও পরমাত্মার প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের মত,—হিন্দু-দর্শনের এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সংজ্ঞার সহিত বৌদ্ধমতের সাদৃশ্যতত্ত্বালোচনা।]

আত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ে বৌদ্ধগণ।

জানি-না, কি কারণে জনসাধারণের মনে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে একটা ভ্রমধারণা বদ্ধমূল আছে। 'তিনি আত্মা ও পরমাত্মা স্বীকার করিতেন না, তিনি কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ মানিতেন না, নীতি মাত্র তাঁহার ধর্ম্মের ভিত্তি ছিল; তৎকথিত নির্ব্বাণ—শূন্যবাদ মাত্র।' কিন্তু এ সকল ভ্রান্ত ধারণা। বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম ও উপদেশ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিলে, এ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়। বৌদ্ধ-দর্শন-সমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গবেষণা-প্রভাবে পরিপুষ্ট হওয়ায় বিষয়-বিশেষে মতান্তর ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু মূলতঃ বুদ্ধদেব যে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, অনুসন্ধান করিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কঠোর দার্শনিক-তত্ত্ব প্রকটন না করিয়া, আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে বুদ্ধদেবের ও তাঁহার শিষ্যগণের কয়েকটী সিদ্ধান্ত এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। তাহাতে বৌদ্ধগণ আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে কিরূপ ভাব পোষণ করিতেন, বুঝিতে পারা যাইবে।

এক দিন রাজা মিলিন্দ, ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, আপনার পরিচয় জানিতে পারি কি? আপনি কি নামে পরিচিত?"

নাগসেন কহিলেন,—"রাজন্! আমার নাম—নাগসেন। কিন্তু নাগসেন একটী সংজ্ঞা মাত্র, একটী শব্দ মাত্র। উহার মধ্যে পদার্থ কিছুই নাই।"

পাঁচ শত যবনের ও আশী হাজার ভিক্ষুর সমক্ষে রাজা মিলিন্দ ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সুতরাং উত্তরের যাথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য রাজা পুনরায় কহিলেন,—"আমি এই পাঁচ শত যবনের এবং আশী হাজার ভিক্ষুর সমক্ষে আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি নিশ্চয় করিয়া বলুন।"

নাগসেন কহিলেন,—"আমি সত্যই বলিয়াছি।"

রাজা তখন কহিলেন,—"মহাশয়, ইহাই যদি সত্য হয়, যদি আপনার মধ্যে অপর কেহ না থাকেন, তাহা হইলে আপনার অভাবপূরণ কে করিতেছে? কে বলুন—পরিধেয় বস্ত্র দেয়, আহার যোগায়, পীড়ার সময় ঔষধ সংগ্রহ করে? এই ভোগ-সুখেরই বা কে অধিকারী? ধর্ম্মপথে কে বিচরণ করে? কে পরিশ্রম করে? কে হনন করে, চুরি করে, বঞ্চনা করে, পান করে, ভ্রমণ করে? সৎকর্ম্মের ফল কে প্রাপ্ত হয়? নির্ব্বাণই বা কাহার অধিগত? তবে কি সংসারে ভালমন্দ কর্ম্মাকর্ম্ম কিছুই নাই? সৎকর্ম্মের পুরস্কার ও অসৎকার্য্যের দণ্ডবিধান তবে কি সকলই বৃথা? যদি কেহ আপনাকে এখনই হত্যা করে, সে তাহা হইলে কি হত্যাকারী নয়!" বলিতে বলিতে নাগসেনের মস্তক প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"নাগসেন, ঐ চুলগুলি কি আপনার মস্তকের নহে?"

নাগসেন উত্তর দিলেন,—"না, মহারাজ।"

"তবে কি আপনার দন্ত, চর্ম্ম, মাংস বা অস্থিই নাগসেন?"

"না—মহারাজ।"

"তবে কি বেদনার নাম নাগসেন? তবে কি অনুভূতি, গঠন, সংজ্ঞা প্রভৃতি নাগসেন?"

"না—মহারাজ।"

"তবে কি এই অস্থি-মাংস-মেদ মজ্জা-সম্বলিত ভৌতিক দেহ এবং বেদনা-অনুভূতি-গঠন-সংজ্ঞা প্রভৃতি লইয়া নাগসেন?"

"না—মহারাজ, তাহাও নয়।"

"যে দিকে দৃষ্টিপাত করি? কোনও খানেই নাগসেনকে দেখিতে পাই না। তবে কোথায় নাগসেন? মহাশয়, আপনি তবে মিথ্যা বলিয়াছেন! নাগসেন আদৌ নাই।"

অতঃপর রাজা মিলিন্দকে সম্বোধন করিয়া, নাগসেন কহিলেন,—"মহারাজ! আপনি রাজোচিত সুখৈশ্বর্য্য-পালিত; আপনাকে যদি কখনও দ্বিপ্রহরে উত্তপ্ত বালুকাকীর্ণ কঙ্করময় পথে নগ্নপদে ভ্রমণ করিতে হয়, আপনার পদদ্বয় আঘাতপ্রাপ্ত, শরীর ক্লিষ্ট এবং মন বিপর্য্যস্ত হয় না কি? সে অবস্থায় শারীরিক কষ্টজনিত আপনার একটা বিতৃষ্ণার উদয় হয় না কি?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"আমি পদব্রজে কখনও পরিভ্রমণ করি নাই। আমি শকটারোহণে আগমন করিয়াছি।"

"যদি তাহাই হয়, হে রাজন্, শকটের বিশ্লেষণ করুন। বলুন দেখি—মেরুদণ্ডকেই কি শকট বলিবেন?"

"না, মহাশয়।"

"তবে কি সুসজ্জিত আচ্ছাদনটিই শকট? অথবা চক্রগুলি, অথবা রশ্মি-সমূহ, অথবা সর্ব্বসমবায়ে শকট? যদি এ সকলকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে শকট বলিতে কোন্‌টী অবশিষ্ট রহিল?"

"কিছুই না।"

"হে রাজন্, আমি যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, কোনদিকেই শকট দেখিতে পাই না। শকট একটী শব্দ উচ্চারণ করিলেন; কিন্তু শকট কৈ? হে ভারতেশ্বর, কাহার ভয়ে আপনি এ মিথ্যা কথা কহিলেন? আপনারা শুনুন, পাঁচ শত যবন এবং আশী হাজার ভিক্ষু, আপনারা শুনুন,—রাজা কি বলিলেন! রাজা বলিলেন—তিনি শকটারোহণে আসিয়াছেন; কিন্তু শকট কি, তিনি তাহা দেখাইতে পারিলেন না। এ অবস্থায় তাঁহার বাক্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কেহ সম্মত আছেন কি?"

রাজা মিলিন্দ কহিলেন,—"পূজ্য নাগসেন, আমি অসত্য বলি নাই। অক্ষদণ্ড, চক্র, উপাদানভূত কাষ্ঠাদি নাম সংজ্ঞা আখ্যা উপাধি প্রভৃতি লইয়া শকট শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।"

"মহারাজ, উত্তম কথা! বুঝিলাম, আপনি শকট কি, তাহা চিনিয়াছেন। হে রাজন্, আমিও এই হিসাবে আমার চুল-চর্ম্ম-অস্থি-সম্বলিত ভৌতিক দেহকে, বেদনা-অনুভূতি

অকৃতি-জ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্ব-সমবায়ে, নাগসেন শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। কিন্তু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে ঐ শব্দ-বাধক পদার্থ কিছুই নাই। যেমন চক্রাদি বিভিন্ন অংশের সমবায় বুঝাইবার উদ্দেশ্যে শকট শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেইরূপ যেখানে রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান পঞ্চ স্কন্ধের সংযোগ ঘটিয়াছে, সেখানেই ব্যক্তি, মানুষ, আমি, নাগসেন প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দিতে হইতেছে।"

আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে যখনই কোনও প্রশ্ন উঠিয়াছে, তখনই অভিনব উত্তর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কোশলের অধিপতি পাশনদ (প্রসেনজিৎ) ক্ষেমা (খেমা) নাম্নী এক বৌদ্ধ-ভিক্ষুণীকে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। 'সম্যুত্তনিকায়' গ্রন্থে রাজার প্রশ্ন ও ক্ষেমার উত্তর নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিখিত আছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে পূজার্হা! সেই পূর্ণ-স্বরূপ বুদ্ধ মৃত্যুর পর কি বিদ্যমান থাকেন?" ক্ষেমা উত্তর দিলেন,—"হে রাজন্! সেই পূর্ণস্বরূপ মৃত্যুর পর যে বিদ্যমান থাকেন, তাহা তো কে কাহারও নিকট কখনও ঘোষণা করিয়া যান নাই!"

আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়।

"মহোদয়ে! সেই পূর্ণ-স্বরূপ তবে কি মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকেন না?"

"হে মহারাজ! সেই পূর্ণ-স্বরূপ সে কথাও তো কিছু প্রকাশ করিয়া যান নাই!"

"তবে কি, মহোদয়ে, সেই পূর্ণস্বরূপ মৃত্যুর পর থাকেনও এবং থাকেনও না? তবে কি মৃত্যুর পর সেই পূর্ণ-স্বরূপের বিদ্যমানতা আছেও এবং নাইও?"

"হে রাজন্! সেই পূর্ণ স্বরূপ যে মৃত্যুর পর বিদ্যমান আছেনও এবং নাইও, তাহাও তো তিনি প্রকাশ করিয়া যান নাই?"

"মহোদয়ে, সেই অত্যুন্নত পুরুষ কি কারণে এ তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন না?"

ভিক্ষুণী কহিলেন,—"আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অনুমতি চাহিতেছি। সেই প্রশ্নের উত্তরেই আপনার প্রশ্নের সমাধান দেখিবেন। আপনার কি এমন একজন গণনানিপুণ হিসাব-পটু ধনাধ্যক্ষ আছেন, যিনি নদীতীরস্থ বালুকারাশি গণনা করিয়া বলিতে পারেন যে, নদীতটে কত লক্ষ কত কোটী বালুকা আছে?"

"না, তেমন কেহই নাই।"

'অথবা আপনার এমন কি, কোনও হিসাব-রক্ষক ধনাধ্যক্ষ বা মুদ্রাধ্যক্ষ আছেন যিনি বিশাল মহাসমুদ্রের জলরাশির পরিমাণ করিতে সমর্থ?"

"না মহোদয়ে, সেরূপ কেহই নাই।"

"কেন নাই, মহারাজ?"

"যেহেতু, ঐ বিশাল সমুদ্রের গভীরতা অপরিমেয় অতলস্পর্শী।"

"হে রাজন্! সেই পূর্ণ স্বরূপের সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ভৌতিক পদার্থের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার অবস্থা নির্ণয় করা যায় না। ভৌতিক পদার্থের মূল বিচ্ছিন্ন হইতে পারে; কুঠার-ছিন্ন তালতরুর ন্যায় তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিতে পারে; এবং তাহাদের মধ্যের উৎপত্তি-মূল জীবাংশ একেবারে ধ্বংস পাইতে পারে। কিন্তু সেই পূর্ণস্বরূপ এ সকল অবস্থা হইতে বিমুক্ত; সুতরাং ভৌতিক পদার্থের

তাঁহার পরিমাণ সম্ভবপর নহে। তিনি মহাসমুদ্রের ন্যায় গভীর, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ। অতএব সেই পূর্ণ-স্বরূপ যে মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকেন, তাহাও ঠিক নহে; আবার তিনি যে মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকেন না, তাহাও ঠিক নহে। অপিচ, তাঁহার বিদ্যমানতা অবিদ্যমানতা কিছুই ঠিক নহে। তিনি বিদ্যমান আছেন বা বিদ্যমান নাই; ইহার কোনও সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে।" *

সে এক অব্যক্ত অচিন্তানীয় অবস্থা। স্বয়ং বুদ্ধদেবকে ভিক্ষু বচ্ছগোত্ত এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াও এ বিষয়ে বিশেষ কোনও উত্তর পান নাই। ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করেন,—

আত্মা-পরমাত্মার প্রসঙ্গে।

"পূজার্হ গৌতম! বলুন দেব, পদার্থ কি ভাবে অবস্থিত! উহাতে কি আত্মা আছেন?" ভিক্ষুর প্রশ্নে বুদ্ধদেব নিরুত্তর রহিলেন। ভিক্ষু আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে কি, প্রভু, উহাতে আত্মা নাই?" এ প্রশ্নেরও মহাপুরুষ কোনও উত্তর দিলেন না। ভিক্ষু বচ্ছগোত্ত ম্রিয়মাণ হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। তখন আনন্দ আসিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসিলেন,—"হে মহাপ্রভু। বচ্ছগোত্ত আপনাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার উত্তর না দিবার কারণ কি কিছু আছে?" বুদ্ধদেব কহিলেন,—"আনন্দ, আমি কি উত্তর দিব? বচ্ছগোত্ত যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—'আত্মা কি আছেন?' আমি যদি তখন উত্তর দিতাম,—'আত্মা আছেন;' তাহা হইলে শ্রমণগণ ও ব্রাহ্মণগণ আত্মার চিরবিদ্যমানতা সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, তাহারই প্রতিধ্বনি করা হইত মাত্র। † আবার আমি যদি ভিক্ষু বচ্ছগোত্তের প্রশ্নের উত্তরে বলিতাম,—'আত্মা নাই', তাহা হইলেও যে সকল ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ 'মৃত্যুই শেষ' বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহাদেরই মতের সমর্থন করা হইত না কি? ‡ তার পর, বচ্ছগোত্ত আমায় যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—'আত্মা আছে কি?' তাহাতেও আমি উত্তর দিই নাই। যদি বলিতাম—'আত্মা আছে;' তাহা হইলে বলা হইত না কি—'বিদ্যমানতায় আত্মা নাই,' আবার যদি তাঁহার 'আত্মা কি নাই' প্রশ্নের, 'আত্মা নাই' বলিয়া উত্তর দিতাম; তাহা হইলে পরিব্রাজক ভিক্ষুকে মহাবর্ত্তে নিক্ষেপ করা হইত না কি?" এইরূপে দেখিতে পাই, বুদ্ধদেব প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিবারই চেষ্টা পাইয়াছেন। এ সকল বিষয়ে সকল সময় তাঁহার স্পষ্ট উত্তর না পাওয়ায়, অথচ এ সকল বিষয় হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত

---

* ক্ষেমা ও প্রসেনজিৎ প্রসঙ্গ "পৃথিবীর ইতিহাস" তৃতীয় খণ্ডে বিষয়-বিশেষের উদাহরণে সংক্ষেপে উল্লেখ আছে।

† এখানে 'সোহহং'-বাদিগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। উপনিষদের 'সোহহং'-বাদ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন—এই ভাবের ভাবুক হইয়া, এক শ্রেণীর লোক এই সময় আপনাকে 'ঈশ্বর' বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন। তদ্দ্বারা যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় ঘটয়াছিল। বুদ্ধদেবের ঐরূপ উত্তরে সেই সম্প্রদায় পাছে উৎসাহ পায়, এই আশঙ্কায় তিনি প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। অনধিকারীর নিকট সত্য-তত্ত্ব প্রকাশেও যে বিপত্তি আছে—ঐ উক্তিতে তাহাই উপলব্ধি হয়।

‡ এ উক্তি চার্ব্বাক মতাবলম্বিদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। মৃত্যুই যদি শেষ বলা হয়, তাহা হইলে ব্যভিচারের বৃদ্ধি পায়। "খাও দাও মজা কর, নাহি তাই জন্মান্তর"—এ মত ভাল নহে তাই তিনি এই প্রশ্নেরও উত্তর দেন নাই।

থাকায়, অনেকে বুদ্ধদেবকে হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, তাঁহারা ভগবানের নিগূঢ় উদ্দেশ্য অনুধাবন করেন নাই। সকলের পক্ষে সকল তত্ত্ব আয়ত্ত করা সম্ভব নহে। হিন্দুধর্ম্মে তাই অধিকার-ভেদ। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বোক্ত উক্তিতে বুঝিতে পারি, তিনি অধিকার-ভেদ মানিতেন। সুতরাং, সকল প্রশ্নের উত্তর সকলকে প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন।* আত্মার ও পরমাত্মার সম্বন্ধে একস্থলে বুদ্ধদেবের নিজের উক্তিতে একটি পরিচয় আছে। সম্যুত্তনিকায় গ্রন্থে প্রকাশ,—একদা বুদ্ধদেব শিষ্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া এই বিষয়ে বড় সুন্দর একটী উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন,—'একটা অবস্থার বিষয় বলিতেছি। শিষ্যবর্গ! সেই অবস্থায় মৃত্তিকার সহিত সম্বন্ধ নাই, জলের সহিত সম্বন্ধ নাই, কিবা আলোক, কিবা বায়ু, অনন্তস্থান বা অনন্তজ্ঞান কিছুরই সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। আবার তাহা শূন্য নয়, অনুভাব্য বা অননুভাব্যও নয়। সূর্য্যে নয়, চন্দ্রে নয়, এ পৃথিবীতে নয়, অন্য পৃথিবীতে নয়। হে শিষ্যবর্গ! সে অবস্থাকে আগমনের, গমনের, দণ্ডায়মানের, মৃত্যুর অথবা জন্মের কোনও অবস্থাই বলিতে পারি না। তাহার ভিত্তি নাই, শ্রেণী নাই, নিবৃত্তি নাই, অর্থাৎ, সেই অবস্থাই দুঃখের শেষ। শিষ্যবর্গ! আছেন—এক অজ, অনাদি, অসৃষ্ট, নিরাকার। তিনি না থাকিলে, যে পৃথিবীতে জন্ম আছে, আদি আছে, আকার আছে, সৃষ্টি আছে, সে পৃথিবী হইতে জীব কখনও পরিত্রাণ-লাভে সমর্থ হইত কি?" এই একটা উক্তিতেই বুদ্ধদেব যে আত্মা পরমাত্মা স্বীকার করিতেন, তাহা উপলব্ধি হয়। কে বলে—বুদ্ধদেব আত্মায়-পরমাত্মায় বিশ্বাসবান ছিলেন না? কে বলে—বুদ্ধদেব নাস্তিক্য মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন? হিন্দু দর্শন শাস্ত্রে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থে আত্মার যে সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেখানে যেমন আত্মার পরিচয়ে—'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ" এবং "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"—প্রভৃতি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, বৌদ্ধশাস্ত্রেও অনুরূপ উক্তি দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী কালে মত বিকৃত হইতে পারে, অথবা, হিন্দু-সমাজেও যেমন কেহ আত্মাকে অবিনাশী এবং কেহ বিনাশশীল বলিয়া জ্ঞান করেন, বৌদ্ধ-

---

* বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম যে বিকৃতি-প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার উক্তিতে তাহা বোধগম্য হয়। এই সময়ে উপনিষদের দোহাই দিয়া এক শ্রেণীর লোক ঈশ্বর ও জীব অভিন্ন মনে করিয়া নানা অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সকল আত্মা এক, সুতরাং মানুষের আত্মা ও ঈশ্বরের আত্মা অভিন্ন—এই মত প্রচারে এক শ্রেণীর লোক এ সময়ে সমাজে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিয়াছিল। বুদ্ধদেবের উক্তিতে সেই শ্রেণীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝা যায়। তিনি যে আত্মতত্ত্ব বর্ণন করিতে বিরত হইলেন, তাহারও নিগূঢ় উদ্দেশ্য ঐ উক্তিতে পরিব্যক্ত। যে অধিকারী অনধিকারীর প্রসঙ্গ লইয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম আন্দোলিত, তাহারই পোষকতা এখানে দেখিতে পাই। আত্মতত্ত্বজ্ঞানে অনধিকারী বুঝিয়া বুদ্ধদেব বচ্ছগোত্রের নিকট সে তত্ত্ব বিবৃত করিলেন না। এতদ্দ্বারা অধিকারী অনধিকারী বিষয় বুদ্ধদেবের লক্ষ্য ছিল, উপলব্ধি হয়। বুদ্ধদেবের ঐ উক্তিতে এই সময়ে চার্ব্বাকমতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়। মৃত্যুর পর সব ফুরাইয়া গেল বলিলে লোকে মানব ইহ-জীবনে কেবল অনাচার করিয়া বেড়াইবে। তাই বুদ্ধদেব অনধিকারীর নিকট সে প্রসঙ্গও উত্থাপন করিলেন না। কি অর্থে কি উক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, যাঁহারা তাহার মর্ম্মানুধাবন করিতে অসমর্থ, বুদ্ধদেব তাঁহাদের নিকট সেরূপ উক্তি কখনও প্রকাশ করেন নাই।

সমাজেও সেইরূপ দুই শ্রেণীর লোক থাকিতে পারে। কিন্তু বুদ্ধদেবের শিক্ষায় বুঝি, আত্মা-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পূর্ব্বোক্ত মতই প্রবল ছিল। এ সম্বন্ধে একটী নিদর্শন;—

> "তত্থ নত্থি হন্তা বা ঘাতেতা বা সোতা বা সাবেতা বা বিঞ্ঞাতা বা বিঞ্ঞাপেতা বা। যো পি তিণ্হেন সত্থেন সীসং ছিন্দতি ন কোচি কিঞ্চি জীবিতা বোরোপেতি, সত্তন্নং ত্বেব কায়ানং অন্তরেন সত্থ-বিবরং অনুপততীতি।"

'সামঞ্ঞফলসুত্তন্তে' এই উক্তি দৃষ্ট হয়। ইহার মর্ম্মার্থ;—"তাহার (আত্মার) হন্তা নাই, হনন নাই, শ্রোতা নাই, শ্রোত্র নাই, জ্ঞাতা নাই, জ্ঞাত নাই। তীক্ষ্ণ শস্ত্রে শিরশ্ছেদ করিলেও, কেহ তাহার হনন বা নাশ করিতে পারে না; সপ্ত কায়ের মধ্যে শস্ত্র-বিবরেই নিপতিত হয়।" যিনি বলিয়াছেন—'আছে এক অজ অনাদি অস্পৃষ্ট'; যাঁহার ধর্ম্মমতে—'শস্ত্রে তাহা ছেদ্য নয়, তাহার হন্তা বা হন্য কেহই নাই'; তাঁহাকে কি না বলি—তিনি আত্মায় পরমাত্মায় অবিশ্বাসবান্ ছিলেন?* হায় ভ্রান্তি! আরও ভ্রান্তি এই যে, তাঁহার প্রতি একদেশদর্শিতার আরোপ! ভিক্ষু-সম্প্রদায়ে যে দুই শ্রেণীর লোকই ছিলেন, ভগবান্ বুদ্ধদেব তাহা সম্যক্ জানিতেন; এবং তাঁহার বাক্যে ইহাও উপলব্ধি হয় যে, তিনি অস্তি-নাস্তি দুইয়েরই মুখ্য লক্ষ্য অবগত ছিলেন। অধিকারী-অনধিকারী বিভেদে দুই জ্ঞানই যে উদিত হইতে পারে, আত্মা-সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশে তাহাই বোধগম্য হয়।

* * *

কর্ম্ম, জন্মান্তর, পরলোক।

[কর্ম্ম ও জন্মান্তর,—বৌদ্ধধর্ম্ম মতে আত্মার অস্তিত্ব-প্রসঙ্গ;—কর্ম্ম ও জন্মান্তর বিষয়ে মিলিন্দ ও নাগসেনের প্রশ্নোত্তর;—শিষ্যবর্গ সমীপে বুদ্ধের কর্ম্ম ও পূর্ব্ব-জন্ম সম্বন্ধে উক্তি;—ধম্মপদাদির আভাষ।]

বৌদ্ধ-দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকেই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু কর্ম্মবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের অস্থি-মজ্জায় শিরা-ধমনীতে ক্রিয়া করিতেছে। সে হিসাবে আত্মা ও জন্মান্তর ওতঃপ্রোত বিজড়িত হইয়া আছে। অধিকন্তু, একটু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, আত্মা ও জন্মান্তর-বাদ উভয়েরই প্রভাব বৌদ্ধধর্ম্মে পরিলক্ষিত হয়। আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বাদ-বিতণ্ডা পরিহার পক্ষে, বুদ্ধদেব সর্ব্বথা চেষ্টা পাইয়াছেন দেখিতে পাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন,—"দৃশ্যমান বিশ্ব অচিরস্থায়ী। কি স্থাবর, কি অস্থাবর, কি অচল, কি গতিশীল,—সকলেই পরিবর্ত্তনের এবং

কর্ম্ম ও জন্মান্তর।

---

* আত্মার অস্তিত্বানস্তিত্ব সম্বন্ধে ভগবানের কয়েকটী উক্তি 'ব্রহ্মজাল সুত্তন্ত' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতেই বিষয়টি বোধগম্য হইবে। যথা—"সন্তি ভিক্খবে একে সমণ ব্রাহ্মণা একচ্চ সস্সতিকা একচ্চ অসস্সতিকা, একচ্চ সস্সতং একচ্চ অসস্সতং অত্তানঞ্চ লোকঞ্চ পঞ্ঞপেন্তি।" অর্থাৎ, শাশ্বতিক ও অশাশ্বতিক দুই দুই দল। এক দলের মত,—"সো নিচ্চো ধুবো সস্সতো অবিপরিণামধম্মো সস্সতি সমং তথেব ঠস্সতি।" অন্য দলের মত,—"অত্তা রূপী চাতুম্মহাভূতিকো মাতাপেত্তিক সম্ভবো কায়স্স ভেদা উচ্ছিজ্জতি বিনস্সতি ন হোতি পরম্মরণা।" অর্থাৎ, এক পক্ষ বলেন—"তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনশীল ও চিরকাল এক" এবং অপর পক্ষ বলেন—"অত্মারূপী দেহী চারিমহাভূতে নির্ম্মিত এবং মাতাপিতার সম্মিলনে উৎপন্ন। দেহের বিনাশ হইলে ইহা উচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট হয়। মৃত্যুর পর উহার অস্তিত্ব থাকে না।" ফলতঃ, তাঁহাতে সকল জ্ঞানেরই সমাবেশ ছিল। সুতরাং তিনি কি জানিতেন বা না জানিতেন—সে বিতণ্ডা বৃথা।

ক্ষয়ের অধীন। কিবা দেবতা, কিবা মনুষ্য—কেহই অমর নহে। সকলকেই মরিতে হইবে। কিছুই চিরস্থায়ী নয়।" এই বলিয়া বুদ্ধদেব মনুষ্যের জন্মকাহিনী বিবৃত করেন; বলেন,—"অজ্ঞান হইতে সংস্কার উদ্ভূত হয়। সংস্কার হইতে বিজ্ঞান; বিজ্ঞান হইতে নাম ও ভৌতিক দেহ। নাম ও ভৌতিক দেহ হইতে ষড়ক্ষেত্র; তাহা হইতে ইন্দ্রিয়-গ্রাম ও বিষয়নিবহ সমুৎপন্ন হয়। বিষয়ের ও ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ—বেদনা। বেদনা হইতে তৃষ্ণা; তৃষ্ণা হইতে উপাদান; উপাদান হইতে ভব; ভব হইতে জন্ম; জন্ম হইতে বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, দুঃখ, অনুশোচনা, যন্ত্রণা, উদ্বেগ, নৈরাশ্য। দুঃখ-যন্ত্রণার রাজ্য এইরূপে উৎপন্ন হয়। বুদ্ধদেবের এই উক্তিতে অজ্ঞতাই আমাদের উৎপত্তির মূল বলিয়া বুঝিতে পারি। কিন্তু সে অজ্ঞতার স্বরূপ-তত্ত্ব সম্বন্ধেই বা তিনি কি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, দেখা যাউক। বুদ্ধশিষ্য সারীপুত্রের মুখে প্রকাশ,—"দুঃখ কি—তাহা না জানা, দুঃখের মূল কি—তাহা না জানা, দুঃখ-নিবৃত্তি হয় কিরূপে—তাহা না জানা, এবং দুঃখ-নিবৃত্তির পথ কি—তাহা না জানা,—ইহাই অজ্ঞতা।" আর একজন প্রধান ভিক্ষু বলেন,—"সত্য-চতুষ্টয় না দেখিতে পাইয়া, আমি জন্মের পর জন্মরূপ বহু পথ পর্য্যটন করিলাম। সেই পথ দেখিতে পাইলে জীবপ্রবাহ বন্ধ হইবে। তদ্দ্বারা দুঃখের মূল বিধ্বস্ত হয়। সুতরাং আর পুনর্জ্জন্মের আশঙ্কা থাকে না।" অজ্ঞতাই মানুষের জন্মজন্মান্তরের হেতুভূত। পরম-প্রাজ্ঞ বুদ্ধদেব তাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—'ইহজন্মের কর্ম্মই পরবর্ত্তী জন্মজন্মের কারণ। যত দিন আমরা আমাদের অজ্ঞতা বিনাশ করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা কোনক্রমেই আমাদের জন্ম-বন্ধন-হইতে মুক্ত হইতে পারিব না।' তিনি আরও বলিয়াছেন,—"যদি সম্পূর্ণরূপ কামনা পরিত্যাগ দ্বারা অজ্ঞতাকে দূর করিতে পারি, তাহা হইলে সংস্কার দূর হয়, সংস্কার দূর হইলে বিজ্ঞান দূর হয় এবং তদ্দ্বারা উপাধি এবং ভৌতিক-দেহ অর্থাৎ ক্ষেত্র নাশ হইতে পারে; ক্ষেত্র-নাশে দেহেন্দ্রিয়াদির সংশ্রব দূরীভূত হয়; তাহাতে বেদনা সুতরাং বিদ্যমানতা বিষয়ে তৃষ্ণা নাশ হয়। তৃষ্ণানাশে 'ভব'-নাশ, ভবনাশে জন্মনাশ এবং জন্মনাশে বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, যন্ত্রণা, অনুতাপ, দুঃখ, উদ্বেগ, নৈরাশ্য সব দূর হইয়া যায়। এই সকল লইয়াই দুঃখের রাজত্ব সংগঠিত হয়।" বুদ্ধদেব এক স্থলে জীবের সহিত অগ্নিশিখার তুলনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"প্রতি পদার্থই অগ্নিশিখার স্বরূপ। অগ্নি কিসে প্রজ্জ্বলিত হয়? কামনার অনল, অজ্ঞতার অনল, মোহের অনল, সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে; সত্য-মিথ্যা, বার্দ্ধক্য মৃত্যু, যন্ত্রণা শোচনা, দুঃখ নৈরাশ্য ইন্ধনরূপে সে শিখাকে প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছে। বিশ্ব-সংসার সে অনলে জ্বলিতেছে; তদুত্থিত ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাতে ভস্মীভূত হইতেছে, সর্ব্বদা প্রকম্পিত রহিয়াছে। প্রাণী মাত্রই যে অনল-শিখা স্বরূপ—তাহাদের অবস্থিতি, উপস্থিতি, পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই উপলব্ধি হয়। অনল যেমন আপনি জ্বলে, অপরকে জ্বালায়; জীবেরও সেই অবস্থা। অনল-শিখা, বায়ু-সংলগ্ন হইয়া, দূরস্থিত পদার্থ-সমূহকে প্রজ্বালিত করে; অগ্নিশিখারূপী জীব পুনর্জ্জন্ম মুহূর্ত্তে কোথায় কোন্ দূরে গিয়া ক্রিয়াশীল হয়! এখানে সে অনলে পুরাতন দেহ দগ্ধীভূত হইতেছিল; সেখানে সে অনলে নবীন দেহ জর্জ্জরীভূত

করিয়া তুলিল। কি সে বায়ু প্রবাহ? তৃষ্ণারূপ বায়ু-প্রবাহে সংলগ্ন হইয়াই জীব যন্ত্রণার পর যন্ত্রণাময় জীবন ভোগ করিতেছে।" 'আত্মা' শব্দটী প্রয়োগ না করুন; কিন্তু বস্তুপক্ষে কে সে জীব—চির-প্রজ্জ্বলিত অনল-শিখায় দগ্ধীভূত হয়? সংজ্ঞা নাই মিলিল; কিন্তু লক্ষ্য যে অভিন্ন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

কর্ম্ম ও জন্মান্তর সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহে নানা স্থানে নানা-রূপ আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যেখানেই সে আলোচনার মূলতত্ত্ব অনুশীলন করি, সর্ব্বত্রই কর্ম্মফলে আত্মার পুনর্জ্জন্মের বিষয় মনোমধ্যে উদ্ভাসিত হয়। মিলিন্দপ্রশ্নে নাগসেনের সহিত রাজা মিলিন্দের যে আলোচনা হয়, তাহাতেও লোকান্তর ও দেহান্তর বিষয়ে বৌদ্ধগণের মত অনেকটা স্পষ্ট-ভাবে বুঝিতে পারা যায়। বিভিন্ন অবস্থায় বা বিভিন্ন জীবনে একই জীব ক্রিয়াশীল কিনা, রাজা তদ্বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। নাগসেন তাহাতে উত্তর দেন।

মিলিন্দ ও নাগসেন জন্মান্তর-প্রসঙ্গে।

নাগসেন বলেন,—"এই ধারাবাহিক জন্মের শ্রেণী চলিয়াছে। ইহাতে জীবপ্রবাহ যে অভিন্ন, তাহাও বলা যায় না, আবার উহা যে অভিন্ন নয়, তাহাও বলা যায় না।"

রাজা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝাইবার জন্য অনুরোধ করেন। নাগসেন উত্তর দেন,—"মনে করুন, একজন দীপালোক জ্বালিলেন, সে আলোক সারারাত্র জ্বলিতে পারে না কি?

"হাঁ জ্বলিতে পারে।"

"সে ক্ষেত্রে, মহারাজ, আপনি কি বলিতে পারেন—প্রথম রাত্রির আলোক-শিখা ও মধ্য-রাত্রির আলোক-শিখা অভিন্ন।"

"না মহাশয়, তাহা বলিতে পারি না।"

"তাহা হইলে, মধ্য রাত্রির দীপশিখা ও শেষ রাত্রির দীপশিখা নিশ্চয়ই অভিন্ন নয়?"

"না মহাশয়, তাহাও বলিতে পারি না।"

"ভাল, তবে কি রাজন্, আপনি বলিবেন—প্রথম রাত্রির আলোক স্বতন্ত্র, রাত্রি দ্বিপ্রহরের আলোক স্বতন্ত্র এবং শেষ রাত্রির আলোক স্বতন্ত্র?"

"না মহাশয়, তাহাও তো বলিতে পারি না! কেননা, একই ইন্ধন সারা-রাত্রি জ্বলিয়াছে। সুতরাং স্বতন্ত্র অনল-শিখা কি প্রকারে বলিব?"

"মহারাজ, জীব-প্রবাহও সেইরূপ মনে করিবেন। এক আসিতেছে, অন্য যাইতেছে; আদি নাই, অন্ত নাই, চক্র ঘুরিতেছে। অতএব ইহা অভিন্নও নয়, অথবা ইহা অভিন্নও বটে।"

ফলতঃ কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সকলই সংঘটিত হইতেছে। প্রবাহ সমান চলিয়াছে। বুদ্বুদ কখনও উঠিতেছে, কখনও লয় পাইতেছে। অগ্নিকুণ্ডোত্থিত অগ্নিশিখা যেমন আশ্রয় অন্বেষণ করে, এবং আশ্রয় পাইলেই আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠে, জীবেও সেই অবস্থা। 'অনুভব বেদনা দুঃখ' প্রভৃতি পঞ্চ স্কন্ধ মৃত্যুর পরও আশ্রয়ান্তর অন্বেষণ করে। সুতরাং মৃত্যুই শেষ নয়। যতক্ষণ পঞ্চ স্কন্ধ আছে, ততক্ষণ জন্মজরা-মৃত্যুর অধীন থাকিতে হইবে। এইরূপে বেশ বুঝিতে পারা যায়, নামান্তরে ভাবান্তরে ব্যক্ত

হইলেও কর্ম্ম ও আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। যে প্রকার বিরুদ্ধ যুক্তির অবতারণাই হউক না কেন, বুদ্ধদেব যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অনুসরণকারী ছিলেন; কর্ম্ম ও জন্মান্তর সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধদেব বলিতেছেন,—"হে শিষ্যবর্গ, এমনও হইতে পারে, কোনও ভিক্ষু বিশ্বাস-বলে বলীয়ান, সত্যপর, ধার্ম্মিক, ত্যাগী ও জ্ঞানী; কিন্তু মনে মনে কামনা করিতেছেন,—'আমি যেন মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্মে বহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন রাজসংসারে জন্মগ্রহণ করি।' যাঁহার এই জ্ঞান, এই ধ্যান, এই চিন্তা, তাঁহার সংস্কার বিহার প্রভৃতি মনোগতি, তাঁহাকে পুনর্জ্জন্মের সেই পথেই লইয়া যাইবে। কিন্তু তিনি যদি অন্যরূপ চিন্তা করেন, তিনি অন্যগতি লাভে সমর্থ হন। তিনি যদি মনে করেন—'আমি যেন আমার এই পাপময় জীবন ধ্বংস করিয়া জ্ঞান ও কার্য্য প্রভাবে মুক্তির নিষ্পাপ অবস্থায় উপনীত হইতে পারি;' এই জীবনেই তিনি তাঁহার মুক্তির পথ দেখিতে পান। তদ্রূপ জ্ঞানসম্পন্ন নিষ্পাপ জন পুনর্জ্জন্মের কবল হইতে নিষ্কৃতি পান।" দৃশ্য হউক অদৃশ্য হউক, প্রতি কর্ম্মেরই ফল আছে। ভৌতিক দেহ বিনষ্ট হইলেও সংস্কার রূপে জীবকে সে ফল ভোগ করিতে হয়। দেবদূতসুত্ত ও যমরাজের উক্তিতে এই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল-ভোগের একটী দৃষ্টান্ত আছে। যমরাজ বলিতেছেন,—"হে মনুষ্য, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বার্দ্ধক্য-কালেও তুমি কি কখনও মনে মনে চিন্তা করিয়াছ যে, তুমি জন্ম-জরা-বার্দ্ধক্যের অধীন? সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তুমি কি কখনও সৎকথায় সচ্চিন্তায় সৎকার্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলে?" মনুষ্য উত্তর করিল,—"না মহাশয়, আমি সেরূপ কিছু করিতে পারি নাই। আমি চপলতা বশতঃ সকলই অবহেলা করিয়া আসিতেছি।" যমরাজ তাহাতে কহিলেন,—"তোমার এই অন্যায় কার্য্যের জন্য তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু বা পরামর্শদাতা কেহই দায়ী হইবেন না; কোনও আত্মীয়-স্বজনকে, যোগি-ঋষিকে বা কোনও দেবতা-ব্রাহ্মণকে দায়ী করিতে পারিবে না। অপকর্ম্ম-সমূহ তুমি আপনিই করিয়াছ; সুতরাং তাহার ফলভোগ একা তোমাকেই করিতে হইবে।" সংযুক্তনিকায় অঙ্গুত্তরনিকায় এবং ধম্মপদ প্রভৃতিতে এই কর্ম্মফলের বিষয় পুনঃপুনঃ পরিকল্পিত হইয়াছে। যথা অঙ্গুত্তরনিকায়ে,—"যে কর্ম্ম করিবে, তাহারই ফলভাগী হইবে। কর্ম্ম আমার অধিকার, কর্ম্ম আমার উত্তরাধিকার; কর্ম্ম দ্বারাই আমার জন্মস্থান নির্দ্দিষ্ট। কর্ম্ম দ্বারাই আমার জাতি; কর্ম্ম দ্বারাই আমার আশ্রয়।" যথা সংযুক্তনিকায়ে,—"মানুষের যে দেহধারণ, বাস্তবপক্ষে তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম। তাহার জন্মান্তরীণ প্রয়াস মূর্ত্তিমান হইয়া, তাহার এই অনুভাব্য বিদ্যমানতা সৃষ্টি করিয়াছে।" যথা ধম্মপদে,—"অসৎ কর্ম্মের ফলভোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোনই উপায় নাই। স্বর্গে তেমন স্থান নাই; সমুদ্রে তেমন স্থান নাই, গিরি-গহ্বরে তেমন স্থান নাই, সারা পৃথিবীতে কোথাও তেমন স্থান খুঁজিয়া পাইবে না,—যেখানে গিয়া লুকাইলে কর্ম্মফল-ভোগের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে।" এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ, কর্ম্মফল বিষয়ে বৌদ্ধমত যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মমতের অনুসরণকারী, কর্ম্ম-জন্মান্তর-পরলোক যে বুদ্ধদেব মানিতেন, তাহা নানারূপে প্রতিপন্ন হয়।

তার পর, যাঁহারা বলেন—'বুদ্ধদেব পরলোকে বিশ্বাসবান ছিলেন না, অর্থাৎ পরলোক মানিতেন না'; তাঁহাদের প্রতীতির জন্য বুদ্ধদেবের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আত্মা, জন্মান্তর ও পরলোক প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে। হিন্দুশাস্ত্র-সমূহের মধ্যেই যখন আত্মা, পরমাত্মা, জন্মান্তর ও পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের তদ্বিষয়ে যে নানা বিরোধ থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু বুদ্ধদেব যে পরলোক স্বীকার করিতেন, তিনি যে পরলোক-বিশ্বাস-বিষয়ের উপযোগিতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন, তাঁহার জীবনে, চরিত্রে, কর্ম্মে—নানা স্থানে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয়। যাহারা পরলোকে বিশ্বাসবান নহে, তাহারা অকর্ম্মকারী হয়। তাহাদের অকর্ম্ম কিছুই থাকিতে পারে না, তাঁহার একটী উক্তিতে এই কথা প্রকাশমান দেখি। বুদ্ধদেব বলিতেছেন,—"বিতিণ্ণ পরলোকস্স নত্থি পাপং অকারিয়ং।" অর্থাৎ,—"যাহারা পরলোক মানে না, তাহাদের অকার্য্য পাপ কিছুই নাই।" ইহার উপর আর অধিক কথা কি আছে? ফলতঃ, কর্ম্মফলে যে স্বর্গাপবর্গ লাভ হয় এবং জন্ম-জরা-মৃত্যুর কবলিত হইতে হয়, সে সকল ভাবই বুদ্ধদেবের উপদেশে প্রকট দেখি। এইরূপে বুঝিতে পারি, রূপ-বেদনাদি পঞ্চ স্কন্ধই * জন্ম-জরা-মৃত্যুর মূল।

বুদ্ধদেব পরলোক মানিতেন।

* * *

নির্ব্বাণ।

[নির্ব্বাণ শব্দার্থ,—কামনা-ত্যাগ, তৃষ্ণাত্যাগ অর্থে উহার সার্থকতা ;—তৃষ্ণাত্যাগই নির্ব্বাণের মূল,—দীপ-শিখার তুলনায় সে ভাব প্রকাশ ;—নির্ব্বাণের অবস্থা,—পিটকাদির মতে তাহার লক্ষণ ;—মিলিন্দ ও নাগসেনের প্রশ্নোত্তরে নির্ব্বাণাবস্থার স্বরূপ তত্ত্বের আভাষ ;—নির্ব্বাণের স্বরূপ,—আনন্দময় অবস্থা।]

বৌদ্ধধর্ম্মের সার লক্ষ্য—নির্ব্বাণ। বৌদ্ধধর্ম্মের যেখানে যে কিছু উপদেশ আছে, সকলই নির্ব্বাণ-পথ প্রদর্শন জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, নির্ব্বাণ-তত্ত্ব উদ্ঘাটন প্রধান আবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। শব্দার্থের অনুসরণে (নিঃ+বাণ) শব্দে অগ্নিহীন, জ্বলনহীন অর্থাৎ প্রশান্ত অবস্থা বুঝায়।† হিন্দু শাস্ত্রকারগণ যে অবস্থাকে মুক্ত অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, নির্ব্বাণ সেই অবস্থা। বৌদ্ধগণ পঞ্চস্কন্ধোপেত জীবনকে অনল-শিখার সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। রূপাদিরূপ সেই পঞ্চ স্কন্ধ লোপ পাইলে জন্ম জরা-মরণের অবস্থায় আসিতে হয় না,—অগ্নিশিখা নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হয়। এইরূপে অগ্নি-প্রবাহ বা জ্বলন নিবৃত্ত হইলে যে প্রশান্ত অবস্থা আসে, তাহাই নির্ব্বাণ।

নির্ব্বাণ মুখ্য অর্থ।

---

* বৌদ্ধদর্শন মতে পঞ্চ স্কন্ধ; যথা,—(১) রূপ, (২) বেদনা, (৩) সংজ্ঞা, (৪) সংস্কার, (৫) বিজ্ঞান। ইহার রূপ ভৌতিক পদার্থের অন্তর্গত। তাহার সংখ্যা অষ্টাবিংশ। এইরূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার প্রভৃতিরও বহু বিভাগ আছে।

† কোষকারগণ 'নির্ব্বাণ' শব্দের এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—পাণিনি—"নির্ব্বাণোঽবাতে"; অর্থাৎ বাত্যাবিরহিত আন্দোলনবিরহিত অবস্থাই নির্ব্বাণ; মেদিনী—"নির্ব্বাণং অস্তগমনম্ নিবৃত্তিঃ", অর্থাৎ

তৃষ্ণা বা কামনা হইতে জন্ম-জরা-মরণ-রূপ অনলের ইন্ধন সমাবেশ হয়। সুতরাং বৌদ্ধগণ 'নির্ব্বাণ' শব্দে তৃষ্ণার বা কামনার বিনাশ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেব গয়া-সন্নিধানে বোধিবৃক্ষমূলে ছয় বৎসর কাল তপস্যার ফলে এই নির্ব্বাণ লাভ করেন। কি অনলের নিবৃত্তিতে—কি তৃষ্ণার ক্ষয়ে, সেই নির্ব্বাণ অধিগত হয়, তাঁহার তাৎকালিক উক্তিতে তাহার প্রথম পরিচয় পাই। তপস্যা-ভঙ্গে বুদ্ধদেব বলিতেছেন,—

"অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং॥
গহকারক দিট্ঠোহসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসংকিতং।
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্হান খয়মজ্ঝগা॥" *

অর্থাৎ,—"আমি এই দেহ-রূপ গৃহের নির্ম্মাণকারিণী তৃষ্ণার অন্বেষণ করিতে করিতে, অনেকবার পৃথিবীতে পরিভ্রমণ ও নানা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। হায়, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করা কি দুঃখময়! হে গৃহনির্ম্মাত্রি, আজ আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি। তুমি

অস্তগমন ভাব; হেমচন্দ্র—"বিশ্রান্তিঃ", অর্থাৎ শ্রমরাহিত্য; বোপদেব,—"নির্ব্বাণং মুক্তিঃ", অর্থাৎ—মুক্তিই নির্ব্বাণ; অমরকোষ—"মুক্তিঃ কৈবল্য নির্ব্বাণং শ্রেয়োঃ নিঃশ্রেয়সামৃতং, মোক্ষোপবর্গোহথাজ্ঞানমবিদ্যাহংনিতিস্ত্রিয়াঃ"—অর্থাৎ মুক্তি, কৈবল্য, নির্ব্বাণ, শ্রেয়ঃ, নিঃশ্রেয়স, অমৃত, মোক্ষ, অপবর্গ, অজ্ঞান-অবিদ্যা-নাশ প্রভৃতি একই পর্যায়ভুক্ত। অভিধানপ্রদীপিকায় নির্ব্বাণ-পর্যায়ে লিখিত আছে,—"মোক্খো নিরোধো নিব্বাণং দীপো তণহক্খয়ো (পরং) তাণং লেণমরূপং (চ) সন্তং সচ্চমনালয়ং। অসংখতং সিবমমৃতং সুদুদ্দসং পরায়ণং সরণমনীতিকং (তথা)। অনাসবং ধুবমনিদস্সনাকতা পলোকিতং নিপুণমনন্তমক্খরং দুক্খক্খয়ো ব্যাপজ্ঝং (চ) বিবট্টং খেমং কেবলং। অপবগ্গো বিরাগো (চ) পনীতং অচ্চুতং পদং। যোগক্খেমো পারমপিমুত্তি সন্তি বিসুদ্ধি যো। বিমুত্যাসংখতা ধাতু সুদ্ধি নিব্বুতিয়ো (সিযুঃ)।" অর্থাৎ,—মোক্ষ, নিরোধ, দীপ-নির্ব্বাণ, তৃষ্ণানাশ, ত্রাণ, অরূপ, শান্ত, সত্য, অনালয়, অনন্ত, শিব, অমৃত, সুদৃষ্টিসম্পন্ন, অনীতিক, অনাসব, ধ্রুব, অনিদর্শ, অনাত্মক, অপ্রলোকিত, নিপুণ, অনন্ত, অক্ষর, দুঃখক্ষয়, অব্যাপিত, বৈবর্ত্ত, ক্ষেম, কৈবল্য, অপবর্গ, বৈরাগ্য, প্রণীত, অযুতপদ, যোগক্ষেম, পার, মুক্তি, শান্তি, বিশুদ্ধি, বিমুক্তি, অসংস্কৃত ধাতুশুদ্ধি, নিবৃত্তি।" আগমতত্ত্ববিলাসে নির্ব্বাণ—যোগক্রিয়া বিশেষ। শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য।

* ধর্ম্মপদ, জরাবগ্গ, ৮-৯ শ্লোকে এই উক্তি দেখিতে পাই। এই উক্তির একটী ইংরাজী পদ্যানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেও বিষয়টী বেশ বোধগম্য হইবে; যথা,—

"Long have I wandered! Long
Bound by chain of desire
Through many births,
Seeking thus long in vain,
Whence comes this restlessness in man?
Whence his egotism, his anguish?
And hard to bear is *samsara*
When pain and death encompasses,
Found! it is found!
The cause of selfhood.
No longer shalt thou build a house for me,
Broken are the beams of sin;
The ridge pole of care is shattered
Into Nirvan my mind has passed
The end of cravings has been
reached at last.

যে দিক দিয়াই দৃষ্টিপাত করি, কামনার নাশ (end of cravings) হইলেই নির্ব্বাণ অধিগত হয়। তাঁহারাই জীবন্মুক্ত, তাঁহারাই ইহজীবনেও নির্ব্বাণ লাভে অধিকারী, যাঁহারা কামনার পাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পুনরায় আর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। গৃহের স্তম্ভ ও উহার পার্শ্বদণ্ডনিচয় আমি সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন করিয়াছি। আমার বাসনা-বিমুক্ত চিত্ত, তৃষ্ণার ক্ষয়সাধন করিয়াছে।" কি কারণে জন্মজরামৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হয়, আর কেমন করিয়াই বা তাহার কবল হইতে মুক্ত হওয়া যায়, বুদ্ধদেবের উক্তিতে তাহা সুব্যক্ত—সুপরিস্ফুট! তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা বা কামনাই—সর্ব্বনাশের মূল। একস্থলে নহে, বুদ্ধদেব নানাস্থলেই এ ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কামনাত্যাগ তৃষ্ণাত্যাগ যে নির্ব্বাণের মূল,—এ উক্তি এ দৃষ্টান্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান। ভগবান্ নিজ জীবনের দৃষ্টান্তে যেমন এ শিক্ষা শিখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের জীবনেও এই দৃষ্টান্ত তেমনই বিশদীকৃত। যে গাথা উচ্চারণে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে গৌতমী তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়াছিলেন, সেই গাথাটি এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে গৌতমীর নির্ব্বাণসাক্ষাৎকারের অবস্থা বিবৃত।

"বুদ্ধবীর নমোত্থু তে সব্বসত্তানমুত্তম।
যো মং দুক্খা পমোচেসি অঞ্ঞঞ্চ বহুকং জনং।
সব্ব দুক্খং পরিঞ্ঞাতং হেতুতণ্হা বিসোসিতা।
অরিয়ট্ঠঙ্গিকো মগ্গো নিরোধো ফুসিতো ময়া॥
মাতা পুত্তো পিতা ভাতা অয্যিকা চ পুরে অহুং।
যথা ভুচ্চং অজানন্তী সংসরিসং অনিব্বিসং॥
দিট্ঠোহি মে সো ভগবা অন্তিমোযং সমুস্সযো।
নিক্খীণো জাতি সংসারো নত্থি দানি পুনব্ভবো॥"

অর্থাৎ,—'হে বুদ্ধদেব! হে সর্ব্বজীবশ্রেষ্ঠ! আপনাকে নমস্কার। কেবল আমাকে নহে, বহুজনকে আপনি দুঃখমুক্ত করিয়াছেন। এখন আমি সর্ব্বদুঃখপরিজ্ঞাত এবং দুঃখের হেতুভূত তৃষ্ণাও এখন আমার বিশুষ্ক—বিদূরিত। আমি এখন আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গ অবলম্বনে নির্ব্বাণ-সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমি মাতা, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, আর্য্যা হইয়া কত বারই সংসারে আসিয়াছি। যথাজ্ঞানের অভাবে বার বার আমায় সংসারে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু এবার আমি জ্ঞাননেত্রে আপনাকে দর্শন করিয়াছি। সুতরাং এই আমার শেষ দেহ-ধারণ। এইবার আমার জন্ম শেষ, আর আমার পুনরুৎপত্তি নাই। বহু জন্মজন্মান্তরের পর জন্মের হেতু তৃষ্ণাকে চিনিয়াছি, আর তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সুতরাং আমি এখন মুক্ত—অর্হৎ।" বুদ্ধের উক্তিতে এবং গৌতমীর মুখে এই যে ভাব পরিব্যক্ত, এ উপদেশ সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। নির্ব্বাণ অবস্থায় তৃষ্ণা বিমুক্তির ভাব, ভগবান বুদ্ধদেব আরও কত স্থলে কত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা,—

(২) "সব্বাভিভূ সব্ববিদূহমস্মি সব্বেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো,
সব্বংজহো তণ্হাক্খয়ে বিমুত্তো সয়ং অভিঞ্ঞায় কং উদ্দিসেয্যন্তি।"
(৩) "যতো যতো মনো নিবারয়ে ন দুক্খমেতি নং ততো ততো,
স সব্বতো মনো নিবারয়ে সব্বতো দুক্খা পমুচ্চতি।"

অর্থাৎ,—"আমি সর্ব্বপাপজয়ী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিরহিত, সর্ব্বত্যাগী, তৃষ্ণাক্ষয়হেতু বিমুক্ত,

সকল জ্ঞানে আমি জ্ঞানী, সুতরাং আমার আর উপদেষ্টা কে আছে? মন বা চিত্ত যে যে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই সেই বিষয়ে আর দুঃখোৎপত্তির কারণ থাকে না। সর্ব্ব বিষয় হইতে চিত্ত নিবৃত্ত করিতে পারিলে সকল দুঃখের অবসান হয়।" তিনি আরও বলিয়াছেন—'ব্রাহ্মণ বলিতো তাঁহাকে,—যাঁহার তৃষ্ণা দূর হইয়াছে! ব্রাহ্মণে বলিতো তাঁহাকে যিনি রতি অরতি উভয়কে ছিন্ন করিয়াছেন।" তিনি বলিয়াছেন—"অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং।" তিনি বলিয়াছেন—"অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেষু অত্ত দণ্ডেসু নিব্বুতং। সদানেসু অনাদানং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং।" তিনি বলিয়াছেন—"হিত্বা রতিঞ্চ অরতিঞ্চ সীতিভূতং নিরুপাধিং। সব্বলোকাভিভুং বীরং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং।" আর বলিয়াছেন—সকল কথার সার কথা—"ছিন্দ সোতং পরক্কম্ম কামেসনু ব্রাহ্মণ। সঙ্খারানং খয়ংঞত্বা অকতঞ্ঞূসি ব্রাহ্মণ।" অর্থাৎ,—"হে ব্রাহ্মণ! পরাক্রম দ্বারা তৃষ্ণাস্রোতের গতিরোধ কর। হে ব্রাহ্মণ! পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ অবধারণ করিয়া নির্ব্বাণপদ জ্ঞাত হও।"

এইরূপে বুঝিতে পারা যায়, আসক্তি বা তৃষ্ণা পরিত্যাগ-পক্ষেই তাঁহার পুনঃপুনঃ উপদেশ; আসক্তি বা তৃষ্ণা দূর করিতে পারিলেই নির্ব্বাণ অধিগত হয়। কোন্ পথে কিরূপভাবে অগ্রসর হইলে নির্ব্বাণ-লাভে সমর্থ হওয়া যায়, অতি সরল কথায় বুদ্ধদেব তাহাও প্রদর্শন করাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই সকল কথার সার-তত্ত্ব—আর্য্য অষ্টমার্গের বিষয় অবগত হইলে বুঝিতে পারা যায়। সেই অষ্টমার্গের মূল-সূত্র এই যে, নির্ব্বাণাভিলাষী জনকে সরল শুভ মৃদুস্বভাব হইতে হইবে; তাঁহাকে মিতাহারী, মিতাচারী, নির্লিপ্ত, অল্পে তুষ্ট, সদাসন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে; ইন্দ্রিয়দমন, প্রজ্ঞাবুদ্ধি, অপ্রগল্ভ, সংসারে অনাস্থা প্রভৃতি তাঁহার লক্ষণ হইবে। শীলবান, সম্যকদৃষ্টি, ভোগবাসনা পরিত্যাগ, নিন্দনীয় কার্য্য পরিবর্জ্জন প্রভৃতি তাঁহার নির্ব্বাণ-লাভে সহায় হইবে। আর্য্য অষ্টমার্গ—নৈতিক ও মানসিক সর্ব্ববিষয়ক উৎকর্ষের হেতুভূত। এই পথে অগ্রসর হইতে হইতে "সংসার অনিত্য, দুঃখ অনাত্ম" ইত্যাদি জ্ঞান উদয় হইবে। সেই জ্ঞানই বিশুদ্ধি অর্থাৎ নির্ব্বাণের প্রশস্ত মার্গ। এ বিষয়ে বুদ্ধদেবের উক্তি,—

তৃষ্ণাত্যাগ নির্ব্বাণ মূল।

"সব্বে সংখারা অনিচ্চাতি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি।
অথো নিব্বিন্দতি দুক্খে এসো মাগ্‌গো বিসুদ্ধিয়া।
সব্বে সংখারা দুক্খাতি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি।
অথো নিব্বিন্দতি দুক্খে এসো মাগ্‌গো বিসুদ্ধিয়া।"

অনেকে মনে করেন, নির্ব্বাণ অবস্থা—শূন্য অবস্থা। তৈলহীন দীপ নির্ব্বাপিত হইলে, তাহার যেমন শিখা লোপ পায়, অনেকে মনে করেন, নির্ব্বাণ হইলে সেইরূপ সকলই লোপ পায়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে নির্ব্বাণ সে অবস্থা—সে শূন্যের অবস্থা নহে। বুদ্ধদেব যে বলিয়াছেন,—তৃষ্ণা বা আসক্তি-নাশে নির্ব্বাণ অধিগত হয়; তাহাতে ইহজীবনেই মানুষ নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে। সেই হিসাবে নির্ব্বাণ শব্দে অন্তরের পাপ-প্রলোভন সমূহ পরিবর্জ্জন; কিবা সুখের, কিবা দুঃখের, কিবা আনন্দের, কিবা বিষাদের,—সকল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি! শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান যে নিষ্কাম কর্ম্মের

বিষয় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই কর্ম্মই—জন্ম-জরা-মরণ পথ-নিবর্ত্তক কর্ম্মই—নির্ব্বাণ। সেই পাপপরিশূন্য প্রশান্তচিত্ততা, সেই নিষ্কলুষ পবিত্রতা, সেই আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত সৎকর্ম্মনিবহ,—নির্ব্বাণ তাহাকেই বলে। * কেবল মৃত্যুতেই যে নির্ব্বাণ লাভ হয়, তাহা নহে। মৃত্যুর পর নির্ব্বাণ-লাভ নাও হইতে পারে,—কর্ম্ম-বন্ধন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জন্মের পর জন্মান্তরে লইয়া যাইতে পারে। পরন্তু নির্ব্বাণ ইহজন্মেই লাভ হওয়া অসম্ভব নহে; কেন-না, ক্লেশ উপাধি প্রভৃতি হইতে বিমুক্ত হইয়া,—'অর্হৎ' পদ লাভ করিয়া, এই জীবনেই মানুষ ভবিষ্য জন্ম-বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। দীপ-শিখার উপমা এবং সৌরজগৎ উৎপত্তির—নক্ষত্রাদির সৃষ্টি পরিণতির উপমা—বৌদ্ধশাস্ত্র নির্ব্বাণ প্রসঙ্গে প্রায়ই উত্থাপন করিয়া থাকেন। তৈলের অভাব হইলে, পলিতা পুড়িয়া গেলে, দীপ-শিখা আপনিই নির্ব্বাপিত হয়; অসৎ-কর্ম্মরূপ বা কাম্যকর্ম্মরূপ তৈল-পলিতার অভাব ঘটিলে, জীবন-দীপ নিবিয়া যায়। তখন আর জন্ম-গ্রহণ আশঙ্কা থাকে না। সৌরজগদুৎপত্তির মূলে জ্যোতিঃপুঞ্জ যখন বিঘূর্ণিত হয়, তখন তাহার যে অত্যুজ্জ্বল আলোক বিনির্গত হইয়া থাকে, তাহার স্থিরভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে আলোক-রশ্মি মন্দীভূত হইয়া আসে; শেষে এমন হয় যে, সেই পিণ্ড ক্রমশঃ প্রশান্ত আলোকশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই যে প্রথমে যাহাকে রশ্মিপুঞ্জ মাত্র বলিয়া মনে হয়, মধ্যে যাহা হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হইতে দেখিতে পাই, শেষে তাহা অদৃশ্য অন্ধকারে পরিণত—আমাদের এই বাসস্থলী পৃথিবীর অবস্থা প্রাপ্ত হয় দেখি। যাঁহারা নির্ব্বাণ-লাভের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদেরও এই অবস্থা। যতক্ষণ কর্ম্মের ঘোর থাকে, ততক্ষণ তাঁহারা নক্ষত্রবৎ জ্বলনশীল থাকেন। কর্ম্ম-সম্বন্ধ যতই বিচ্ছিন্ন হয়, ততই তাঁহাদের উৎক্ষেপ-উদ্দাম-ভাব মন্দীভূত হইয়া আসে। পরিণতির অবস্থায় কর্ম্ম-সম্বন্ধও থাকে না; সুতরাং তাঁহারা নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হন। †

---

* রিজ ডেভিডস্ এই ভাবটী বড় সুন্দর ধারণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"What then is Nirvana which means simply going out,—extinction; it being quite clear, from what has gone before that this cannot be the extinction of soul? It is the extinction of that sinful grasping condition of mind and heart which would otherwise, according to the great mystery of Karma, be the cause of renewed individual existence."

† অনেকের বিশ্বাস, মুক্তি অর্থে নির্ব্বাণ শব্দ বৌদ্ধগণের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় নাই। পাণিনি সূত্রে "নির্ব্বাণোঽবাতে" বাক্য দেখিয়া গোলড্‌ষ্টুকার 'বাতবিরহিত' অর্থে 'নির্ব্বাণ' শব্দ ব্যবহৃত হইত—এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ডক্টর রামদাস সেন বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'মুক্তি অর্থে 'নির্ব্বাণ' শব্দ পূর্ব্বেও প্রযুক্ত হইত। তিনি লিখিয়াছেন,—"বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণ বলেন, নির্ব্বাণং পরমং সুখং।' আমাদের ব্যাসমুনিও বলিয়াছেন,—'নির্ব্বেদাদেব নির্ব্বাণং ন চ কিঞ্চিদ্বিচিন্তয়েৎ। সুখং বৈ ব্রাহ্মণো ব্রহ্ম নির্ব্বেদনাধিগচ্ছতি॥' বুদ্ধের নির্ব্বাণ এবং হিন্দু যোগীদিগের কৈবল্য একই তত্ত্ব। বুদ্ধদেব যাহাকে নির্ব্বাণ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, হিন্দু যোগীরা তাঁহাকেই কৈবল্য (কেবলভাব) বলিতেন।"

নির্ব্বাণের অবস্থা বুঝাইবার জন্য বহু পণ্ডিতের মস্তিষ্ক বহু রূপে আলোড়িত হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন—নির্ব্বাণ ভস্ম হওয়া, শেষ হওয়া,—কিছু না থাকা। কেহ বলিয়াছেন—অস্তি-নাস্তির † অর্থাৎ থাকা-না-থাকার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। কাহারও মতে,—থাকিয়াও না থাকা বা না থাকিয়াও থাকা। কেহ বা ভাষার দ্বারা সে অবস্থা বুঝান যায় না বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব এবং তাঁহার শিষ্যগণ এই নির্ব্বাণ বুঝাইবার জন্য যে সকল উপমার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন; তাহার কয়েকটী উল্লেখ করিতেছি। তাঁহারা বলিয়াছেন,—'অশ্বরক্ষক যেমন অশ্বকে সংযত করিয়া আনিয়া অভীষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করে; ইন্দ্রিয়গণকে সেইরূপ সংযত করিতে হইবে; এইরূপে যখন দেহের অহঙ্কার, পদমর্য্যাদার অহঙ্কার লোপ পাইবে, কামনা বিসর্জ্জিত হইবে, অজ্ঞতার অপবিত্রতা দূরে যাইবে; তখন দেবতাগণও ঈর্ষান্বিত হইবেন। সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা যেমন সদা অবিচলিত, চরিত্রকে সেইরূপ ন্যায়পথে অবিচালিত রাখিতে হইবে। তোরণ-দ্বারের স্তম্ভ যেমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, স্বচ্ছতোয় সরোবরের যেমন প্রশান্ত বক্ষ, সেইরূপ দৃঢ়তা প্রশান্ততা আবশ্যক। যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত, যাঁহার বাক্য ও কার্য্য প্রশান্ত, তিনি জ্ঞানের দ্বারা প্রশান্ত অবস্থা লাভ করিতে পারেন। তাঁহার আর জন্মমৃত্যুর আশঙ্কা নাই। যাঁহার কামনা ও আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হইয়াছে, যিনি জ্ঞানে উন্নত হইয়াছেন, তিনি এই পৃথিবীতেই নির্ব্বাণ-লাভ করিয়াছেন।" একজন ব্রাহ্মণ-ভিক্ষু একদিন সারিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"নির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ, সকলেই বলে—নির্ব্বাণ! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বাণ কি?" সারিপুত্র তাহাতে উত্তর দেন,—"কামনা-বশীকরণ, ঘৃণাপরিহার, উদ্বেগ-দমন, হে বন্ধু, ইহারই নাম—নির্ব্বাণ।" একজন শিষ্যের দেহান্তরে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন,—'দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। অনুভূতির অবসান হইয়াছে, বেদনা দূরে গিয়াছে। সংস্কার বিশ্রাম লইয়াছে; বিজ্ঞান লয় পাইয়াছে।' যিনি এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন, তিনিই নির্ব্বাণ লাভ করেন। কোন্ জন নির্ব্বাণ পথের পথিক, বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে তাহার লক্ষণ পুনঃপুনঃ পরিকীর্ত্তিত হইয়া আছে। কয়েকটী লক্ষণ 'পিটক' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

নির্ব্বাণের অবস্থা।

"ফুট্‌ঠস্‌স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং।"
"যথিন্দখীলো পঠবিংসিতো সিয়া,
চতুব্‌ভি যাতেভি অসম্পকম্পিয়ো,
তথূপমং সপ্‌পুরিসং বদামি।"

কেবল, অদ্বয়, একরস হওয়া বা অহং-প্রবাহের নিরোধ, বিশ্রান্তি বা বিচ্ছেদ লাভ করা—বুদ্ধাভিমত নির্ব্বাণ। বুদ্ধাভিমত নির্ব্বাণের সহিত 'ব্রহ্মনির্ব্বাণোমৃচ্ছতি', কৈবল্যমশ্নুতে ইত্যাদি কথার মিল বা ঐক্য আছে।"

† সমাধিরাজ-সূত্রে এবং ললিতবিস্তর গ্রন্থে (মহাবৈপুল্য সূত্রে) এই অস্তি-নাস্তি অবস্থার বিষয় এইরূপ উল্লেখ আছে। যথা, সমাধিরাজ সূত্রে,—

সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি।
এবং নিন্দা পসংসাসু ন সমীঞ্জন্তি পণ্ডিতা ॥"

"স্তুতিনিন্দা লাভালাভ প্রভৃতি লোকধর্ম্মে যাঁহার চিত্ত বিকম্পিত নয়, যিনি শোকহীন অহঙ্কার-হীন এবং নিষ্পাপ, তিনিই সুমঙ্গল প্রাপ্ত হন। .....চতুর্দ্দিকের বাত্যা-বিক্ষোভে দৃঢ়প্রোথিত শৈলস্তম্ভ বিচলিত হয় না। সৎপুরুষও সেইরূপ কাম-ক্রোধাদির ঝঞ্ঝাবাতে বিচলিত নহেন।...ঘনসন্নিবিষ্ট শৈলশ্রেণী বায়ু-প্রবাহে কখনও বিচলিত হয় না, পণ্ডিত জনকেও সেইরূপ নিন্দা-প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে না।" ফলতঃ, সর্ব্বত্র সমদর্শী, স্তুতিনিন্দায় সুখ দুঃখে অবিচলিত জ্ঞানিজনই নির্ব্বাণ-মুক্তির অধিকারী।

রাজা মিলিন্দ, নির্ব্বাণ কি—এই বিষয়ে প্রাজ্ঞ নাগসেনকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রশ্নোত্তরে বিষয়টী বিশদীকৃত হইতে পারে। সুতরাং, রাজার প্রশ্ন এবং নাগ-সেনের উত্তর সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। রাজা মিলিন্দ কহিলেন,—"পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর পদার্থ দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর পদার্থ 'কর্ম্মজ' অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন, অন্য শ্রেণীর পদার্থ 'ঋতুজ' অর্থাৎ কালবশে সমুৎপন্ন, তৃতীয় শ্রেণীর পদার্থ 'হেতুজ' অর্থাৎ কোনও 'হেতু' বা কারণ হইতে সমুৎপন্ন। কর্ম্মজ, ঋতুজ অথবা হেতুজ ভিন্ন কিছুই কি থাকিতে পারে?"

নির্ব্বাণ প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর।

নাগসেন উত্তর দিলেন,—"নির্ব্বাণ—কর্ম্মজ, ঋতুজ বা হেতুজ নহে।"

মিলিন্দ কহিলেন,—"কিন্তু বুদ্ধদেবের উক্তিতে সেরূপ প্রমাণ পাই না। নির্ব্বাণলাভের জন্য অর্থাৎ অর্হৎ অবস্থায় প্রবেশের পথের ভিক্ষুদিগকে তিনি কত উপায় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রদর্শিত সেই উপায়-পরম্পরা কি কর্ম্মজ, ঋতুজ বা হেতুজ নহে?"

নাগসেন উত্তর দিলেন,—"বুদ্ধদেব সকলই বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি এমন কথা কোথাও বলেন নাই যে, নির্ব্বাণোৎপত্তির কোনও হেতু আছে।"

রাজা মিলিন্দ কহিলেন,—"মহাশয়, আপনার কথায় বেশ উপলব্ধি হয়, আপনি বলিতেছেন—অর্হৎ-পদ লাভই নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির হেতু। তবে আপনি আবার কেমন

"অস্তীতি নাস্তীতি উভেপি অন্তা। শুদ্ধি অশুদ্ধি ইমেপি অন্তা।
তস্মাদুভে অন্তবিবর্জ্জিতা। মধ্যে হি স্থানং প্রকরোতি পণ্ডিতঃ ॥"

ললিতবিস্তরে,—

'ন চ পুনরিহ কশ্চিদস্তি ধর্ম্ম। সোঽপি ন বিদ্যতি যস্য নাস্তি ভাবাঃ ॥
হেতুক্রিয়া পরম্পরা জানেত। তস্য ন ভোতীহ অস্তিনাস্তিভাবাঃ ॥"

অর্থাৎ,—"অস্তিনাস্তি দুই অন্ত; শুদ্ধি অশুদ্ধি দুই অন্ত। এই হেতু এই দুই অন্ত বর্জ্জন করিয়া জ্ঞানিগণ মধ্যস্থানে অবস্থিতি করিবেন।...' ইহজগতে অস্তি বা নাস্তি নামক কোনও ধর্ম্ম ভাব নাই। যিনি হেতু ক্রিয়াপরম্পরা জ্ঞাত আছেন, তাঁহার অস্তিনাস্তি ভাব আসে না।" অস্তি-নাস্তি-পরিশূন্য এই মধ্য অবস্থা যাঁহারা মান্য করেন, তাঁহারা 'মাধ্যমিক' সম্প্রদায়-ভুক্ত। মাধ্যমিক দর্শন-মতে তাই কথিত হয়,—'অতো ভাবাভাবান্তদ্বয়রহিতত্বাৎ সর্ব্বস্বভাবানুৎপত্তিলক্ষণা শূন্যতা মধ্যমা প্রতিপৎ মধ্যমোমার্গ ইত্যুচ্যতে।' অর্থাৎ,—"ভাবাভাব-অন্তর্দ্বয়-অস্তিনাস্তি বিরহিতার আলোচনাই মাধ্যমিক দর্শনের বিষয়ীভূত। ঐ জন্যই উহার নাম—মাধ্যমিক দর্শন।"

করিয়া বলেন যে, নির্ব্বাণ-লাভের কোনও হেতু বা কারণ নাই? আমি বড় সমস্যায় পড়িলাম। অন্ধকার হইতে যেন গাঢ়তর অন্ধকারে আমাকে নিক্ষেপ করিলেন। যদি নির্ব্বাণের উপাদান-ভূত আনুষঙ্গিক কোনও কারণ থাকে, নির্ব্বাণোৎপত্তির অবশ্যই কারণ থাকিবে। পুত্রের পিতা আছে; পিতারও অবশ্যই পিতা থাকিবে। ছাত্রের শিক্ষক আছে; শিক্ষকেরও অবশ্য শিক্ষক সিদ্ধ। অতএব যখন নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির কারণ আছে, তখন নির্ব্বাণ উৎপত্তির কারণও অবশ্যই থাকিবে।"

নাগসেন কহিলেন,—"নির্ব্বাণ উৎপত্তি-ধর্ম্মাবলম্বী নহে। উহা উৎপন্ন হয় না। সুতরাং বুদ্ধদেব উহার উৎপত্তির কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই।'

রাজা মিলিন্দ কহিলেন,—"সে কথা সত্য। কিন্তু ইহার স্বরূপ কি, আমায় বুঝাইয়া দেন।"

নাগসেন উত্তর দিলেন,—"তবে অবধান করুন। আচ্ছা বলুন দেখি, আপনার স্বাভাবিক শক্তি-প্রভাবে কেহ সাগল নগর হইতে হিমালয়ের অরণ্যে গমন করিতে পারে না কি?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"পারে।"

নাগসেন কহিলেন,—"ইহাও সেই প্রকার। যথানির্দ্দিষ্ট মার্গানুসরণে নির্ব্বাণ অধিগত হয়। নির্ব্বাণ উৎপত্তির কোনও কারণ ঘোষণা করা যায় না। মনুষ্য ভৌতিক শক্তির প্রভাবে অর্ণবযানারোহণে সমুদ্রের পরপারে যাইতে পারে; কিন্তু সে কখনও সমুদ্রকে তীরে আনিতে পারে না। এইরূপ নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পথ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; কিন্তু উহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। কেন-না, নির্ব্বাণ কিসে সঙ্ঘটিত, তাহা ধারণার অতীত;—সে প্রহেলিকা অননুভাব্য।"

রাজা মিলিন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কি তবে বলিতেছেন, গুণ বা নির্গুণ, যোগ্যতা বা অযোগ্যতা—কি হইতে নির্ব্বাণ উৎপন্ন হয়, তাহা ধারণার অতীত!"

নাগসেন কহিলেন,—"হাঁ মহারাজ! যেহেতু নির্ব্বাণ, গুণ বা নির্গুণ কিছু হইতেই সমুৎপন্ন নয়; বৃক্ষ বা তদনুরূপ পদার্থের ন্যায়, যেহেতু উহার উৎপত্তির কোনই হেতু নাই; পর্ব্বতাদির ন্যায়, যেহেতু উহা ঋতুতে বা কালে উৎপন্ন নয়; সেইজন্য উহা 'অসংখ্যাত' বা প্রহেলিকার মধ্যে পরিগণিত। সর্ব্বপ্রকার অসৎ চিন্তা হইতে বিমুক্ত বলিয়াই উহা নির্ব্বাণ আখ্যা প্রাপ্ত। কিবা শক্র কিবা মহাব্রহ্ম, কিবা অন্য কেহই উহার কারণ নহেন। উহা উৎপন্ন হইয়াছে বলা যায় না, আবার উৎপন্ন হয় নাই বলাও যায় না। উহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান; অথচ, উহার সম্বন্ধে বলা যায় না যে, উহাকে চক্ষে দেখিতেছি, কর্ণে শুনিতেছি, নাসিকায় আঘ্রাণ করিতেছি, জিহ্বায় আস্বাদ লইতেছি, অথবা শরীরে স্পর্শ করিতেছি।"

রাজা মিলিন্দ কহিলেন,—"তবে দেখিতেছি, আপনি এমন বস্তুর বিষয় বলিতেছেন, যাহার অস্তিত্বই নাই। আপনি কেবলমাত্র বলিতেছেন—নির্ব্বাণ কিনা নির্ব্বাণ। সুতরাং নির্ব্বাণ বলিয়া কিছুই নাই।"

নাগসেন কহিলেন,—"মহারাজ! নির্ব্বাণ আছে। নির্ব্বাণ—অন্তরের অনুভূতি। পবিত্র আনন্দময় নির্ব্বাণ—অবিদ্যা ও তৃষ্ণা-পরিশূন্য নির্ব্বাণ—রাহৎগণই (অর্হৎগণই) অনুভব করিতে সমর্থ; কেন-না, তাঁহারা মার্গসুখ সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন।"

রাজা মিলিন্দ কহিলেন,—"যদি নির্ব্বাণের গুণ বা প্রকৃতি কিছু প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দেন।"

নাগসেন উত্তর দিলেন,—"বায়ু প্রবহমান, কিন্তু উহার বর্ণের পরিচয় কেহ দিতে পারেন কি? কেহ কি বলিতে পারেন যে, উহা নীলবর্ণ বা উহা অন্য কোনও বর্ণবিশিষ্ট! অথবা কেহ কি বলিতে পারেন,—উহার স্থান, কাল, ক্ষুদ্রত্ব, বৃহত্ব, দৈর্ঘ্য, বিস্তার কিরূপ?"

রাজা মিলিন্দ কহিলেন,—"আমরা অবশ্যই বলিতে পারি না—বায়ুর কি রূপ! হস্তদ্বারা উহা ধারণ করিতে বা নিষ্পেষণ করিতে পারা যায় না। তথাপি বায়ু আছে এবং আমরা উহা জানি,—উহা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে, শরীরে আঘাত করে এবং অরণ্যের বৃক্ষাদি উহার দ্বারা আহত হয়। কিন্তু আমরা বলিতে পারি না বা দেখাইতে পারি না যে, উহা কি?"

নাগসেন কহিলেন,—"নির্ব্বাণও এইরূপ পৃথিবীর অশেষ দুঃখ নাশ করে, এবং পৃথিবীর প্রধান আনন্দ প্রদান করে। কিন্তু ইহার উপাদান বা গুণ কিছুই বর্ণনা করা যায় না।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন—"যে কেহ বুদ্ধের নীতি মান্য করে, তাহারা সকলেই কি নির্ব্বাণে অধিকারী? অথবা, অনধিকারী কেহ আছে?"

নাগসেন কহিলেন,—"নিম্নলিখিত পর্য্যায়ের জীবগণ নির্ব্বাণের অধিকারী নহে,—(১) চতুষ্পদগণ, প্রেতগণ, সংশয়বাদী নাস্তিকগণ, (২) যাহারা পঞ্চবিধ পাপে লিপ্ত, (৩) যাহারা বুদ্ধের নীতির অনুসরণকারী নহে, (৪) যাহারা ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত হয়, (৫) যে সকল ভিক্ষু বা পুরোহিত পত্নী গ্রহণ করে, (৬) যাহারা হীন অর্থাৎ তৃষ্ণানাশ বিষয়ে উদাসীন, (৭) সপ্তম বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক-বালিকাগণ।"

রাজা মিলিন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"বালক-বালিকাগণ কেন নির্ব্বাণের অধিকারী নহে? তাহারা রাগ, দ্বেষ, মোহ ত্রিবিধ পাপ হইতে মুক্ত নহে কি? অহঙ্কার, অবিশ্বাস, ইন্দ্রিয়লিপ্সা, কুবিতর্ক প্রভৃতি হইতে তাহারা বিমুক্ত। তবে কেন তাহাদিগকে নির্ব্বাণ মার্গ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়?"

নাগসেন কহিলেন,—"যদি কোনও বালক ন্যায়কার্য্য বুঝিতে পারে এবং অন্যায় কার্য্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, সে নির্ব্বাণলাভ করিতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ শিশুদিগের ধারণা-শক্তি দুর্ব্বল। তাহার সীমাবদ্ধ অন্তর, অনন্ত অসীমের ধারণা করিতে পারে না। কোনও মানুষই যেমন আপন স্বাভাবিক শক্তিতে মহামেরু উৎপাটন করিতে সমর্থ নহে; কয়েক বিন্দু বারিপাতে সমগ্র পৃথিবী যেমন জলসিক্ত হইতে পারে না; একটী জোনাকি যেমন সারা পৃথিবী আলো করিতে সমর্থ নহে; ইহাও সেইরূপ।"

বহু জ্ঞান বহু কার্য্যকারিতা শক্তির সমাবেশ ভিন্ন নির্ব্বাণ যে অধিগত হয় না, এ প্রসঙ্গে নাগসেন তাহাই খ্যাপন করিলেন।

ইহার পর নির্ব্বাণের স্বরূপ সম্বন্ধে রাজা মিলিন্দ পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। কহিলেন,—"নির্ব্বাণের আনন্দ অবিমিশ্র, অথবা উহার সহিত দুঃখের সংযোগ আছে?"

নির্ব্বাণের স্বরূপ।

নাগসেন কহিলেন,—'সে আনন্দ অবিমিশ্র; তাহার সহিত দুঃখের সম্বন্ধ নাই।' মিলিন্দ কহিলেন,—"বিপদসঙ্কুল যুদ্ধ আনন্দ-উপভোগ নয়। কিন্তু রাজ্য রক্ষায় বা রাজ্য-অধিকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, আনন্দ আছে। রাজপুত্রগণ যখন রাজ্যের আকাঙ্ক্ষায় বিঘূর্ণিত হন, তখন দুঃখের অবস্থা বটে; কিন্তু রাজ্য যখন অধিগত হয়, তখন রাজ্যাধিকারের আনন্দ উপভোগ করে। এই কারণেই রাজ্যাধিকারের আনন্দকে বিমিশ্র আনন্দ বলিয়া অভিহিত করি। এক দিকে যুদ্ধের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম, অন্য দিকে যুদ্ধ-জয়ে ফলভোগের আনন্দ! উভয়ের মধ্যে যেন এক অচ্ছেদ্য পারস্পারিক সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে।"

নাগসেন কহিলেন, "কিন্তু নির্ব্বাণের আনন্দ অবিমিশ্র। তবে যাহারা উহাকে অনুসন্ধান করে, তাহারা দুঃখের অধীন। দুঃখের অবস্থা একরূপ, আনন্দের অবস্থা অন্যরূপ। দুই অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একটী উপমার দ্বারা অবস্থা বুঝান যাইতে পারে। শিষ্য জ্ঞানের অনুসন্ধানে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যে জ্ঞান তিনি লাভ করিতেছেন, তাহা অবিমিশ্র মঙ্গলদায়ক; কিন্তু সেই জ্ঞানার্জ্জনে তাঁহাকে অশেষ কষ্ট ও পরিশ্রম সহ্য করিতে হইয়াছে। নির্ব্বাণের আনন্দ যাঁহারা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদেরও সেই অবস্থা।"

রাজা পুনরায় কহিলেন,—"আপনি নির্ব্বাণের কথা কহিতেছেন। কিন্তু নির্ব্বাণ কাহাকেও দেখাইতে পারেন কি? নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা, অথবা স্থান, বিস্তৃতি, ব্যবহার, সাদৃশ্য, কারণ বা শ্রেণী প্রভৃতি চিহ্ন দ্বারা নির্ব্বাণ কি—বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? একরূপে, অন্যরূপে অথবা যে কোনও রূপে আপনি আমার নিকট নির্ব্বাণের স্বরূপ প্রদর্শন করুন দেখি।"

নাগসেন কহিলেন,—"ঐরূপ কোনও গুণ-ধর্ম্মের আরোপ দ্বারা নির্ব্বাণ বুঝান যায় না।"

মিলিন্দ কহিলেন,—"তবে উহা বিশ্বাস করিতে পারি না।"

নাগসেন উত্তর দিলেন,—"সম্মুখে মহা-সমুদ্র; যদি কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে—'উহাতে কি পরিমাণ জল আছে এবং উহাতে কি পরিমাণ কত জন্তু বাস করে,' আপনি তাহা বলিতে পারেন কি?"

রাজা কহিলেন,—"এরূপ অসঙ্গত প্রশ্নের কেহই উত্তর দিতে পারে না।"

নাগসেন বুঝাইলেন,—"নির্ব্বাণের গুণ, ধর্ম্ম, বর্ণ বা আকৃতি বিষয়েও কেহ উত্তর দিতে পারে না। উহার তত্ত্ব উহাতেই আছে। হয় তো কোনও ঋষি আমার পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইতে পারেন; কিন্তু কি ঋষি, কি দেবতা—কেহই নির্ব্বাণের গুণধর্ম্ম বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিবেন না।"

রাজা কহিলেন—"হইতে পারে, নির্ব্বাণ আনন্দ; সুতরাং উহার বাহ্য গুণধর্ম্ম প্রকাশ করা সম্ভব নহে। কিন্তু উহার প্রকৃষ্টতা বা সুবিধার বিষয় উপমার দ্বারা বুঝান যায় না কি?"

নাগসেন কহিলেন,—"সেই ক্লেশমুক্ত অবস্থা কমল সদৃশ নির্লিপ্ত। পঙ্ক হইতে উদ্ভূত হইলেও কমল যেমন পঙ্কসংস্রবশূন্য, নির্ব্বাণও তদ্রূপ ক্লেশমুক্ত অবস্থা। জল যেমন দেহ-শীতলকারী, নির্ব্বাণের অবস্থাও সেইরূপ ক্লেশাগ্নি-নির্ব্বাপক। জলপানে যেমন স্বাভাবিক তৃষ্ণা দূর হয়, নির্ব্বাণে সেইরূপ পাপের তৃষ্ণা নাশ হয়। ভেষজ যেমন পীড়িত জনের পীড়ানাশক, নির্ব্বাণও সেইরূপ ক্লেশ-কামনা-যন্ত্রণা নিবারক। পুনর্জ্জন্মের যন্ত্রণা উহার দ্বারাই নাশ হয়।"

রাজা কহিলেন,—"এই কারণেই আমি এ সকল বাক্যে বিশ্বাসবান নহি! যাঁহারা নির্ব্বাণের অন্বেষণ করেন, তাঁহারাই শারীরিক ও মানসিক কষ্টের অধীন। সকল অবস্থাতেই দুঃখ তাঁহার অনুসরণ করিয়া আছে। তাঁহার প্রতি ইন্দ্রিয়ে যন্ত্রণা বহন করিয়া আনিতেছে। আত্মীয়,-স্বজনের, বন্ধুবান্ধবের এবং ধন-সম্পদের বিয়োগ-ব্যথা কি যন্ত্রণাপ্রদ! যাহারা পৃথিবীতে ধন-সম্পদের ও আত্মীয় বান্ধবের অধিকারী, তাহারা কত আনন্দময়! কিবা দর্শনের, কিবা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কত আনন্দই তাহারা উপভোগ করিতেছে। অতএব ঐ সকল যখন পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাদের তখন দুঃখের অবধি থাকে না। এই সকল কারণে নির্ব্বাণের আনন্দ কখনই অবিমিশ্র হইতে পারে না।"

নাগসেন কহিলেন,—"তথাপি ইহা সত্য যে, নির্ব্বাণের আনন্দ অবিমিশ্র। দুঃখ-সংস্রবযুক্ত নহে—তেমন কি রাজ্য-সম্পদের আনন্দ আছে?"

মিলিন্দ কহিলেন,—"হাঁ আছে।"

নাগসেন কহিলেন,—"বিনাক্লেশে রাজ্যলাভ হইলেও রাজার অশান্তির অবধি নাই। প্রজাবর্গ তাঁহার আজ্ঞাধীন না থাকিতে পারে; তদ্দরুণ তাহাদিগকে দমনের জন্য তাঁহার কত কষ্ট সম্ভবপর! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে শীতাতপ, ঝড়ঝঞ্ঝাবাত, মশক-মক্ষিকার আক্রমণ কত সহ্য করিতে হয়। অতএব কেমন করিয়া আপনি বলিতে পারেন যে, ভেষজ যেমন পীড়া-নাশক, রাজত্বের আনন্দও সেইরূপ সুখপ্রদ, ঔষধে যেমন ব্যাধির বৃদ্ধি নিবৃত্তি করিয়া স্বাস্থ্য আনয়ন করে, নির্ব্বাণও সেইরূপ মৃত্যুর পথ রোধ করিয়া অমরত্ব প্রদান করে! সে অবস্থা সমুদ্রের ন্যায় অশুচিতাশূন্য, সে অবস্থা বারিধির ন্যায় অতলস্পর্শ। সুতরাং অসংখ্য জীব-জন্তুতেও উহা পরিপূর্ণ করিতে পারে না, অথবা সকল নদ-নদীর জলেও উহা পূর্ণ হয় না। মহাসমুদ্রের বক্ষ যেমন পুষ্প সদৃশ তরঙ্গবিভূষিত; সে অবস্থাও সেইরূপ মুক্তি সৌগন্ধে পুলকিত। আহার্য্য যেমন জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করে, নির্ব্বাণও সেইরূপ অনন্ত জীবন প্রদান করে। আহার্য্য যেমন শারীর-শক্তি বৃদ্ধি-কারক; উহাও সেইরূপ ঋষিদিগের অমানুষিক শক্তির বৃদ্ধিকারী। খাদ্য-দ্রব্যে শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে; কিন্তু উহার দ্বারা গুণ বৃদ্ধি হয়। আহার্য্যে শারীরিক ক্লেশ দূর হয়; ক্ষুধাজনিত কষ্টের ও যন্ত্রণার অবসান হয়। কিন্তু নির্ব্বাণে সর্ব্ববিধ ক্লেশজনিত ক্লান্তি দূর হইয়া থাকে। উহা অনন্ত; সুতরাং উহার কোনও বহির্ব্যবধান নাই। উহার জীবন সত্বাহীন; সুতরাং

উহার উৎপত্তি বিলয় বা মৃত্যু নাই। উহা অর্হৎগণের এবং বুদ্ধগণের আশ্রয়-ভূত। উহা অনন্ত, সুতরাং উহা লুক্কায়িত হইবার ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা নাই। উহা যেন বাজীকরের জহরৎ, যথেচ্ছা সামগ্রী প্রদান করিতে সমর্থ। উহা আনন্দপ্রদ ও আলোকপ্রদ,—যে আলোকে উপকার ও সহায়তা লাভ হয়। উহা দুষ্প্রাপ্য রক্ত-চন্দন তরুসদৃশ; সদ্গন্ধে অতুলনীয় এবং জ্ঞানিগণের প্রশংসিত। সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি পক্ষে উহা ঘৃতসদৃশ। উহার সৌগন্ধে বিশ্ব প্রমোদিত। উহার আস্বাদ পরম আনন্দপ্রদ। মহা-মেরু সদৃশ ত্রিলোকে যেমন মহামেরু উচ্চতায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছে, উহাও তদ্রূপ। উহা মহামেরুর ন্যায় দৃঢ়। উহার শীর্ষদেশে আরোহণ অসাধ্য। পর্ব্বত-প্রস্তরে যেমন বীজের ক্রিয়া হয় না; রাগ-দ্বেষ পরিশূন্য নির্ব্বাণ-অবস্থায় সেইরূপ ক্লেশ কখনও স্থান পায় না।"

রাজা মিলিন্দ কহিলেন,—"আপনি বলিয়াছেন, নির্ব্বাণ ভূত-ভবিষ্য বর্ত্তমান নহে; আরও বলিয়াছেন, উহার উৎপত্তি নাই। তবে কি যিনি নির্ব্বাণ-লাভ করেন, তাঁহার জন্য উহা পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত ছিল? অথবা উহা তাঁহার কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন এবং উহা কেবলমাত্র তাঁহারই জন্য উৎপন্ন?"

নাগসেন কহিলেন,—"নির্ব্বাণের পূর্ব্ব-সত্বাও নাই; আবার উহা উৎপন্নও নহে। অথচ, যে জন নির্ব্বাণের অধিকারী, নির্ব্বাণ তাহার অধিগত।"

মিলিন্দ কহিলেন,—"পৃথিবীতে নির্ব্বাণ সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি, আপনি একটু পরিষ্কার করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এ বিষয়ে আমার মন বিশেষ আন্দোলিত। সুতরাং স্পষ্ট ভাষায় আমায় বুঝাইয়া দেন— নির্ব্বাণের স্বরূপ কি? কিরূপে নির্ব্বাণ অধিগত হয়?"

নাগসেন কহিলেন,—"সে অবস্থায় বিপদ নাই, বিভীষিকা নাই। সুখময়, শান্তিময়, আনন্দ-নিলয়, অনন্দপ্রদ সে এক তৃপ্তিপ্রদ পবিত্র অবস্থা। মনে করুন, একজন মানুষ অগ্নিকুণ্ডে সিদ্ধ হইতেছিল; সহসা তাহাকে মুক্ত করা হইল; তখন সে এক মুক্ত স্থানে পৌছিল; আর তাহাতে তাহার প্রাণে এক আনন্দপ্রদ ভাব উপস্থিত হইল। নির্ব্বাণের অবস্থাও সেইরূপ। অজ্ঞান অহঙ্কার প্রভৃতি কুণ্ডলীকৃত ভাবে তাহাকে ঘিরিয়া ছিল। নির্ব্বাণে সে বন্ধন হইতে সে মুক্ত হইল। অজ্ঞান অহঙ্কার প্রভৃতি অগ্নিস্বরূপ। অগ্নি মধ্যে নিপতিত ব্যক্তির উদ্ধার আকাঙ্ক্ষার ন্যায়, নির্ব্বাণ-লাভে মানুষের ঔৎসুক্য হয়। অজ্ঞানাদি মুক্ত যে অবস্থা, তাহাই মুক্ত স্থান—অগ্নিকুণ্ড-পারস্থিত নির্ব্বাণ অবস্থা। আরও একটী উপমায় নির্ব্বাণ কি—বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি। মনে করুন, কেহ ময়লা-পূর্ণ স্থানে—সরীসৃপ ও কুক্কুরাদির পচ্যমান মৃতদেহ মধ্যে আবদ্ধ আছেন; সে অবস্থা হইতে তিনি যদি মুক্তি পান, কত শান্তি লাভ করেন; পঞ্চস্কন্ধরূপ মল দ্বারা মানুষ আবদ্ধ; নির্ব্বাণ সে বন্ধন ছিন্ন করে। সেই ছিন্ন অবস্থায় যেখানে অবস্থিত হয়, তাহাই নির্ব্বাণ। কাহাকেও একদল সশস্ত্র শত্রু আক্রমণ করিয়াছে। আক্রান্ত ব্যক্তি মুক্তিলাভের জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করিতেছে। সেই চেষ্টার ফলে, সে যদি আশঙ্কা-পরিশূন্য কোনও স্থানে পৌছিতে পারে, তাহার আর আশঙ্কা থাকে না। সেই নির্ভাবনার অবস্থাই নির্ব্বাণ।"

মিলিন্দ কহিলেন,—"তাহা হইলে যে ভিক্ষু নির্ব্বাণ অনুসন্ধানে চেষ্টা পাইতেছেন, তিনি কেমন করিয়া নির্ব্বাণেব অধিকারী হইবেন? কেমন করিয়া কি কার্য্যের দ্বারা সে নির্ব্বাণ অধিগত হইবে?"

নাগসেন কহিলেন,—"যে ব্যক্তি নির্ব্বাণ অনুসন্ধান করেন, যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার সংস্কারাদির গুণধর্ম্ম অন্বেষণ আবশ্যক। তাহাতে তিনি বুঝিতে পাবেন যে, ক্ষয় দুঃখ ও মৃত্যুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আছে। তখন তিনি আরও বুঝিতে পারেন যে, পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণে কোনই শান্তি নাই; কেন-না, পৃথিবীতে চিরস্থায়ী সুখের একান্ত অভাব। লৌহখণ্ড অত্যুত্তাপে যখন আরক্তিম হয়, মানুষ তখন বেশ বুঝিতে পাবে, উহার কোনও অংশই ধারণ করা নিরাপদ নহে। সেইরূপ মানুষ যখন পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণের যন্ত্রণা অনুভব করিতে সমর্থ হয়, সে তখন কোনও অবস্থাতেই অবস্থিত থাকিবার আকাঙ্ক্ষা করে না। সে ক্ষেত্রে জালবদ্ধ মৎসের ন্যায়, সর্প-মুখ-প্রবিষ্ট ভেকেব ন্যায়, মার্জ্জারকবলগত পক্ষীর ন্যায় অথবা রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের প্রায়, মুক্তির জন্য মানুষ দারুণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। দুরদেশ-গত জন, স্বদেশ-প্রত্যাগমনের পথ লক্ষ্য করিয়া যেমন সেই পথে স্বদেশ-প্রত্যাগমনের কল্পনা করে; জ্ঞানী ভিক্ষুগণও চতুর্থ পন্থা অর্থাৎ নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির জন্যও সেইরূপ অনুপ্রাণিত হন।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তব, দক্ষিণ, উর্দ্ধ বা অধঃ—নির্ব্বাণ কোন্ স্থান! নির্ব্বাণ বলিয়া কি কোনও স্থান আছে? যদি থাবে, সে কোথায়?"

নাগসেন কহিলেন,—"উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উর্দ্ধ বা অধঃ—এই অনন্ত বিশ্বের কোথাও নির্ব্বাণ বলিয়া কোনও স্থান নাই।"

মিলিন্দ কহিলেন,—"নির্ব্বাণের যখন সংস্থিতি বা অবস্থান-স্থান নাই, তখন নির্ব্বাণ বলিয়া কোনও বস্তু থাকিতে পারে না। অতএব, কেহ নির্ব্বাণ-লাভ করিয়াছেন—এ কথা কহিলে, সে উক্তি মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। শস্যোৎপত্তির জন্য শস্যক্ষেত্র আছে; সুগন্ধি উৎপত্তির স্থান কুসুমনিকর বিদ্যমান দেখি; ফলোৎপত্তির মূলীভূত বৃক্ষরাজি প্রত্যক্ষ করি; খনিগর্ভ হইতে সুবর্ণ উত্তোলিত হয়, দেখিতে পাই। যদি কেহ পুষ্পের বা ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাদের উৎপত্তি-স্থানে তাঁহাকে যাইতে হইবে; এবং সেখানে যাইলেই তিনি তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইবেন। অতএব, নির্ব্বাণ বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহার সংস্থিতি বা অবস্থান-স্থান থাকা আবশ্যক। যদি সেরূপ স্থান কোথাও না থাকে, তাহা হইলে নির্ব্বাণেরও অস্তিত্বাভাব ঘটে। সুতরাং দেব বা মানব যে কেহ নির্ব্বাণের আকাঙ্ক্ষা করিবেন, তিনিই বঞ্চিত হইবেন না কি?"

নাগসেন উত্তর দিলেন,—"নির্ব্বাণ বলিয়া কোনও স্থান নাই, অথচ নির্ব্বাণ আছে। যে ভিক্ষু সৎপথে উহার অনুসন্ধান করেন, তিনি অবশ্যই উহা প্রাপ্ত হন। দুই খণ্ড কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হইতে পারে; অথচ উহার পূর্ব্ব-সংস্থিতি অপরিজ্ঞাত। নির্ব্বাণও সেইরূপ বুঝিবেন।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "যদি তাই হয়, যে জন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, তাঁহার কি স্বতন্ত্র স্থান আছে?"

নাগসেন উত্তর দিলেন,—"ভিক্ষুগণ যখন নির্ব্বাণ লাভ করেন, তখন অবশ্যই তাঁহাদের স্থান আছে।"

রাজা আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায় সে স্থান?"

নাগসেন কহিলেন,—"সর্ব্বত্রই সে স্থান থাকিতে পারে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে সেই সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ এখনও বিদ্যমান আছেন?"

নাগসেন উত্তর দিলেন,—"হাঁ, ভগবান এখনও আছেন।"

রাজা কহিলেন,—"আপনি কি তাঁহাকে দেখাইতে পারেন?"

নাগসেন কহিলেন,—"প্রভু নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। সে অবস্থায় আর পুনর্জ্জন্ম নাই। সুতরাং তিনি এখানে কি অন্যত্রে আমরা কিছুই বলিতে পারি না। অগ্নি যখন নির্ব্বাপিত হয়, কেহ কি বলিতে পারে—অগ্নি এখানে কি অন্যত্রে, কোথায়?" *

রাজা মিলিন্দের প্রশ্নে এবং নাগসেনের উত্তরে আমরা নির্ব্বাণ সম্বন্ধে কি জ্ঞান লাভ করি? যাঁহারা বলেন—নির্ব্বাণই শেষ, নির্ব্বাণই শূন্য; তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তের ভ্রমপ্রমাদ বুঝিতে পারি। নির্ব্বাণ যে ধ্বংসের অবস্থা নয়, পরন্তু নির্ব্বাণ যে এক অনুপম অচিন্ত্যনীয় শান্তির অবস্থা, আর জীবনে ও মরণে সদাকাল মানুষ যে অবস্থা লাভ করিতে পারে, নির্ব্বাণ সেই অবস্থা। সে যে কি অবস্থা, তাহা ধারণার অতীত। মহাবগ্‌গ বলিয়াছেন,—'সংস্কার-সমূহ দমন করিতে হইবে, পাপরাশি বিসর্জ্জন দিতে হইবে, স্নেহবাৎসল্যকামনা ধ্বংস করিতে হইবে। সেই অবস্থাই নির্ব্বাণ।" বুদ্ধদেব স্বয়ং বলিয়াছেন,—'জীবন ক্ষণভঙ্গুর। যেখানে জীবন, সেখানেই মৃত্যু, সেখানেই যন্ত্রণা। জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইতে পারে; সুতরাং মানুষ জীবনের পরপারে—মৃত্যু, বার্দ্ধক্য, যন্ত্রণা প্রভৃতির অতীত অবস্থায় যাইতে পারে।' এই যে জীবনাগ্নি নির্ব্বাপনের অবস্থা, সেই অবস্থাকে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। নির্ব্বাণান্তে যে অবস্থা, সে অবস্থায় জীবন নাই, মৃত্যু নাই, যন্ত্রণা নাই, দুঃখ নাই। সেই অবস্থার বিষয়ে ভগবান কখনও বিচার-বিতর্কে প্রবৃত্ত হন নাই, যেহেতু মনুষ্যের ভাষায় সে অবস্থার বর্ণনা অসাধ্য। ফলতঃ, 'নির্ব্বাণ' অর্থে 'জীবনাগ্নি নির্ব্বাপন রূপ যে ভাব উপলব্ধি হয়, তাহা মৃত্যু বা শেষ নয়। সে এক অনুপম অনির্ব্বচনীয় অবস্থা। বেদে যে আদি অবস্থার বিষয় বর্ণিত আছে, নির্ব্বাণকে সে অবস্থা বলিলেও বলা যায়। যথা—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং ॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।

অর্থাৎ,—'তখন সদসৎ অস্তিনাস্তি ছিল না, ব্যোম বা বায়ু ছিল না, মৃত্যু ছিল না, অমরত্ব ছিল না, দিন-রাত্রির ভেদাভেদ ছিল না; ছিল—'এক অদ্বৈত প্রাণময়।'

---

* এখানে নাগসেন প্রকারান্তরে পরব্রহ্ম স্বীকার করিলেন। যদিও বিশ্বের কোথাও অস্তিত্ব ব্যক্ত করিলেন না; কিন্তু প্রকারান্তরে সেই বেদান্ত-বেদ্য সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের বিষয়ই এখানে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য নির্ব্বাণষট্‌কে সে অবস্থার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং, ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞা।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তাশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং॥
ন মে দ্বেষ রাগৌ, ন মে লোভ-মোহৌ, মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্য ভাবঃ।
ন ধর্ম্ম ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং॥
ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদা, পিতা নৈব মে, নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং॥
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো, বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তি র্ন ভীতিশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং॥"

* * *

নির্ব্বাণের পথ।

[নির্ব্বাণ-মার্গ,—বিভিন্ন বিভাগ ;—চতুর্ম্মার্গ,—তাহার মূল তত্ত্ব ;—বিভিন্ন বিভাগ,—তাহার নয়টী স্তর ;—আর্য্য অষ্টমার্গ,—তাহার স্বরূপ ;—অষ্টমার্গ ও তাহার মূল তত্ত্ব ;—বৌদ্ধ-দর্শনের মূল ভিত্তি।]

নির্ব্বাণ মার্গ।

নির্ব্বাণের পথ বা মার্গ (মাগ্‌গ) বিষয়ে বৌদ্ধ-শাস্ত্রে নানা মত দেখিতে পাই। কোথাও অষ্টমার্গের বিষয় লিখিত আছে ; কোথাও চারিমার্গের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, কোথাও অন্য মত দৃষ্ট হয়। আবার অষ্টমার্গ বা চারিমার্গ প্রভৃতির রূপভেদও দেখিতে পাই। অষ্টমার্গের বিষয় (সম্যগ্‌দৃষ্টি প্রভৃতি) পূর্ব্বে কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি।* এক্ষণে চতুর্ম্মার্গাবলম্বিগণের কথিত চারি মার্গের একটু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। সেই চারি মার্গের নাম,—(১) স্রোতাপত্তি, (২) সকৃদাগামী, (৩) অনাগামী, (৪) আর্য্য বা অর্হৎ। নির্ব্বাণ-সাগরে যে প্রথম স্রোত প্রবিষ্ট হয়, তাহাই স্রোতাপত্তি। এই পথে চব্বিশটী বিভাগ আছে। এই পথে যিনি প্রবেশ করিয়াছেন, যে কোনও পৃথিবীতে তাঁহাকে সাত বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে ; তৎপরে নির্ব্বাণের আশা। সকৃদাগামী মার্গে প্রবেশ করিতে পারিলে, আর এক জন্মের কার্য্য অবশিষ্ট থাকিবে। এই মার্গে বারটী বিভাগ আছে। ইহলোক হইতে মানুষ এই মার্গে প্রবেশ করিতে পারে। তার পর দেবলোকে এক জন্ম অতিবাহিত হয়। অর্থাৎ, মনুষ্যাবাস পৃথিবী হইতে জন্মান্তরে দেবলোকে গমন করিয়া মানুষ নির্ব্বাণ-লাভ করে। অনাগামী পথে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে কর্ম্মলোকে (মনুষ্য বা দেবতা হইয়া) আর আসিতে হয় না। ইঁহারা ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন এবং সেখান হইতে নির্ব্বাণলাভ করেন। এই পথ আটচল্লিশ ভাগে বিভক্ত। আর্য্য বা অর্হৎ পথ শ্রেষ্ঠমার্গ। সকল ক্লেশ বা দুঃখ এই পথে অবসান হয়। এ পথের পথিকদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। বারটি বিভাগে এই পথ বিভক্ত। কোনও ফলবান বৃক্ষকে যদি ছেদন করা হয় ; তাহার যে ফলটি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা অঙ্কুরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বৃক্ষ কর্ত্তিত না হইলে, সে ফল উৎপন্ন হইত। বৃক্ষের

* পৃথিবীর ইতিহাস তৃতীয় খণ্ডে নির্ব্বাণ-প্রসঙ্গে ১৬২ পৃষ্ঠায় ও পরবর্ত্তী অংশে এই বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মূলোচ্ছেদের ন্যায় কর্ম্মের মূলোচ্ছেদ হইয়া থাকে। এই প্রকারে এই পথে সকল দুঃখ নিবৃত্ত হয়; তাহাতে জন্মগ্রহণের দায় হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই চারি মার্গের দুইটি করিয়া স্তর আছে। এক স্তর—মার্গানুভূতি; দ্বিতীয়—মার্গফল। এই দুই স্তর অতিক্রম করিয়া অর্হৎ (রাহৎ) নির্ব্বাণ-লাভ করেন। অর্হৎগণ পঞ্চবিধ মহতী শক্তির—অধিকারী হন। যাহা মনুষ্য চক্ষুর অদৃশ্য, স্বর্গে হউক, মর্ত্ত্যে হউক, অথবা দেবলোকে হউক, অর্হৎগণ তাহা দেখিতে পান। সকলে সমান শক্তিশালী না হউন, কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে তাঁহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন। আর তাঁহারা অন্য জীবের মনোভাব অবগত হইতে পারেন, আর তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের ও ভবিষ্যজ্জন্মের বিবরণ অবগত হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের পঞ্চ অভিজ্ঞান, তাঁহাদিগকে মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র স্তরে প্রতিষ্ঠিত করে।

স্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গ সম্বন্ধে এবং অন্যান্য মার্গ বিষয়ে যে সকল মতান্তর আছে, তাহারও একটু আভাষ দেওয়া এ প্রসঙ্গে আবশ্যক মনে করি। কথিত হয়, বুদ্ধদেব স্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গাসংশ্রবে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে প্রকাশ এই যে, সাধনার নয়টী স্তর। স্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গ-চতুষ্টয়ের পূর্ব্বে ও পরে কয়েকটী স্তর আছে। তদনুসারে প্রথম স্তরের নাম—গোত্রভু। সমাধির চতুর্থ অবস্থায় এই গোত্রভু স্তরে উপনীত হইতে পারা যায়। তার পর স্রোতাপত্তি মার্গ। অর্থাৎ, সমাধির চারি অবস্থা * অতিক্রম করিয়া প্রথমে গোত্রভু স্তরে উপনীত হইতে হয়। কামনাদি বিবর্জ্জিত হইয়া একাগ্রচিত্তের নাম—ধ্যান ও সমাধি। উহার প্রথম অবস্থায় বিচার-বিতর্ক প্রীতি-সুখ ও একাগ্রতা থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় বিচার-বিতর্ক দূরীভূত, তখন শুধুই সমাধির আনন্দ। তৃতীয় অবস্থায় সুখ-দুঃখে সমভাব। চতুর্থ অবস্থায় ব্রহ্মধ্যান। এই চতুর্থ অবস্থায় রূপব্রহ্ম ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে অরূপ ব্রহ্মধ্যান আরম্ভ হয়। ইহার পর গোত্রভু স্তর। তখন অজ্ঞান, তৃষ্ণা, আমিত্ব প্রভৃতি দূর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। (১) গোত্রভু স্তরের পর যথাক্রমে (২) স্রোতাপত্তি মার্গ, (৩) স্রোতাপত্তি ফল, (৪) সকৃদাগামী মার্গ, (৫) সকৃদাগামী ফল, (৬) অনাগামী মার্গ, (৭) অনাগামী ফল, (৮) অর্হত্ত্ব মার্গ, (৯) অর্হত্ত্ব ফল। স্রোতাপত্তি স্তরে, স্রোতাপন্ন অবস্থায় সাধক কতকাংশে নির্ব্বাণের আনন্দ লাভ করিতে পারেন। সংকার দৃষ্টি, সংশয়, শীলব্রত প্রভৃতি এই অবস্থায় সম্পূর্ণরূপ উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় উপনীত হইলে পিতৃমাতৃহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপ কার্য্যে স্বতঃবিরতি ঘটে এবং প্রেতাদি যোনিতে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কায়মনোবাক্যে কৃতপাপ এ অবস্থায় সাধক আপনিই প্রকাশ করেন। সকৃদাগামী প্রভৃতি অন্যান্য স্তর ক্রমেই পাপকর্ম্মের বিরতির দ্বারা পুনর্জ্জন্ম-গ্রহণের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। অর্হৎ অবস্থায় উপনীত হইলে সাধক নির্ব্বাণ-রূপ ফল প্রাপ্ত হন। এই হিসাবে অর্হত্ত্ব ফলই শেষ স্তর। স্রোতাপত্তি প্রভৃতি চারি মার্গের ও তাহার স্তর-সমূহের ন্যায় বৌদ্ধ-শাস্ত্রে নির্ব্বাণমার্গের আরও দুই প্রকার সংজ্ঞা সুপ্রসিদ্ধ।

মার্গ স্তর সমূহ।

---

* সমাধির চারি অবস্থার বিষয় যোগ-সাধনা প্রসঙ্গেও আলোচনা করা হইয়াছে।

এক ক্ষেত্রে মার্গ না বলিয়া ধর্ম্ম বলা হইয়াছে ; তদনুসারে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দ্বিবিধ সুখসাধন-কল্পে চারিটী করিয়া ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট দেখি। সে মতে, ইহলৌকিক চারিটী ও পারলৌকিক চারিটী ধর্ম্ম। ইহলৌকিক ধর্ম্ম, যথা,—উট্‌ঠান-সম্পদা, অরকৃখসম্পদা, কল্যাণমিত্তা, সমজীবিতা ; অর্থাৎ,—উদ্যমশীলতা, রক্ষণশীলতা, কল্যাণমিত্রতা বা সৎসঙ্গসমজীবিতা বা মিতব্যয়িতা। পারলৌকিক ধর্ম্ম, যথা,—সদ্ধাসম্পদা, শীলসম্পদা, চাগসম্পদা, পঞ্ঞাসম্পদা ; অর্থাৎ,—শ্রদ্ধাসম্পন্নতা, শীলসম্পন্নতা, ত্যাগসম্পন্নতা ও প্রজ্ঞা-সম্পন্নতা। এই হিসাবে নির্ব্বাণ-লাভের পথ চারিটি নির্দ্দিষ্ট হইলেও সাধারণ মনুষ্য হইতে অর্হত্ব লাভ পক্ষে আটটী পথ বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। প্রথম,—মোক্ষার্থী মাত্রকেই উদ্যমশীল হইতে হইবে। উদ্যমশীলতাই ইহলৌকিক সকল উন্নতির মূল। উদ্যমশীল না হইলে অর্থ-সম্পদের অধিকারী হইতে পারা যায় না ; উদ্যমশীল না হইলে, দশের গণ্য দেশের মান্য হইতে পারা যায় না ; আবার উদ্যমশীলতা ভিন্ন কিবা চরিত্রে কিবা ধর্ম্মে কোনও বিষয়েই উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। সুতরাং ইহসংসারে সুখ সম্পৎ লাভ করিতে হইলে উদ্যমশীলতা প্রথম প্রয়োজন। তার পর রক্ষণশীলতা প্রভৃতি একে একে কার্য্যকরী হয়। ভগবান বুদ্ধদেব উদ্দমশীল হইবার জন্য এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,—'ইহলোকে মনুষ্য ধন-সম্পত্তির দ্বারা প্রাধান্য লাভ করেন ; সুতরাং বিজ্ঞব্যক্তিগণ উদ্যমশীল, কল্যাণমিত্রসম্পন্ন ও মিতব্যয়ী হন।' * পারলৌকিক সুখস্বচ্ছন্দতা সাধন জন্য যে চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট, তাহার প্রথম ধর্ম্ম—শ্রদ্ধাসম্পন্নতা। যাঁহারা বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই তিন বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল হইতে পারেন, তাহারাই ধর্ম্মের প্রথম স্তরে অর্থাৎ সাধনার প্রথম মার্গে উপনীত হন। শ্রদ্ধাশীল জন যে অশেষ পুরস্কার লাভ করেন, বুদ্ধদেবের উক্তিতে তাহা নানা স্থানে ব্যক্ত আছে। বুদ্ধে ধর্ম্মে ও সঙ্ঘে শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পর শীলবান হইতে হইবে। শীলবান শব্দ বহু অর্থদ্যোতক। প্রাণিহত্যা, মিথ্যাবাক্য, ব্যভিচার প্রভৃতি পরিহার এবং গুরুসেবাপরায়ণ, সত্যপর ও ধর্ম্মপথে বিচরণ প্রভৃতি কার্য্য শীলসম্পন্নতার পরিচায়ক। তার পর, তৃতীয় ধর্ম্ম—ত্যাগশীলতা। দানে মুক্তহস্ত প্রাণী মাত্রের উপকারী ও সুখদাতা হইয়া এ পথে অগ্রসর হইতে হয়। পরবর্ত্তী ধর্ম্ম—প্রজ্ঞাসম্পন্নতা। এ অবস্থায় শরীরের প্রতি নশ্বর জ্ঞান জন্মিয়াছে, প্রজ্ঞাই নির্ব্বাণলাভের পন্থা বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে। উদ্যমশীলতাদি চারি ধর্ম্মের ফল নির্ব্বাণলাভ সম্বন্ধে ভগবানের এইরূপ উক্তি আছে,—

"উট্‌ঠাতা কর্ম্মধেয্যেসু অপ্পমত্তো সুমিত্তবা, সমং কপ্পেতি জীবিতং সম্ভতং অনুরক্‌খতি।
সদ্ধো সীলেন সম্পন্নো বদঞ্ঞূ বীত মচ্ছরো, নিচ্চং মগ্‌গং বিসোধেতি সোত্থানং সম্পরায়িকং।
ইচ্চেতে অট্‌ঠধম্মাচ সদ্ধস্‌স ঘর মেসিনো আক্‌খাতা সচ্চনামেন উভয়ত্থ সুখাবহাতি।"

---

* উয্যোজন গাথা ; যথা,—

"নীচকুলী নিপঞ্ঞ্‌বা নিরূপং নিবলং সমং
তং কালং ছুত্তকাল ধনমেব বিসেসকং।
তস্মাহি পণ্ডিতো পোসো সম্পসসং অত্থমত্তনো
উট্‌ঠহেয়্য সুগোপেয়্য সুমিত্তো সমজীবয়েন্তি।"

অর্থাৎ,—উদ্যমশীলতা, রক্ষণশীলতা, কল্যাণমিত্রতা, মিতব্যয়িতা, শ্রদ্ধাশীলতা, শীলসম্পন্নতা, ত্যাগশীলতা ও প্রজ্ঞাশীলতা—এই আটটী ধর্ম্মের দ্বারা মনুষ্য আপনার সুখের পথ পরিষ্কার করে। সত্য-স্বরূপ বুদ্ধদেব ঐ আট ধর্ম্মকে ইহ-পরলোকের সুখসাধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই আট ধর্ম্মের মধ্যেই মানুষের কর্ত্তব্যপালনের সর্ব্ববিধ উপদেশ সংবদ্ধ আছে। ঐ আট ধর্ম্মের মধ্যে শেষোক্ত চারি ধর্ম্ম পারলৌকিক সুখপ্রদানকারী অর্থাৎ নির্ব্বাণ মোক্ষপ্রদ। স্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গে যে কর্ম্ম দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ হয় বুঝিয়াছি, এখানেও নামান্তরে ও রূপান্তরে সেই সকল কর্ম্মেরই উপদেশ দেখিতে পাই।

নির্ব্বাণলাভ পক্ষে সম্যগ্‌দৃষ্টি প্রভৃতি আর এক অষ্টমার্গের বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সে অষ্টমার্গ,—(১) সম্যক্ দৃষ্টি, (২) সম্যক্ সঙ্কল্প, (৩) সম্যক্ বাক্য, (৪) সম্যক্ কর্ম্ম, (৫) সম্যক্ জীবিকা, (৬) সম্যক্ ব্যায়াম, (৭) সম্যক্ স্মৃতি, (৮) সম্যক্ সমাধি। এই অষ্ট মার্গ যোগ সাধনার অঙ্গবিশেষ। দার্শনিকগণ এই অষ্ট মার্গকে তিন স্কন্ধে বিভক্ত করেন। সেই স্কন্ধত্রয়ের নাম,—(ক) শীল, (খ) সমাধি, (গ) প্রজ্ঞা। সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ দৃষ্টি—প্রজ্ঞাস্কন্ধে, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি,—সমাধি স্কন্ধে, এবং সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ জীবিকা—শীলস্কন্ধে ন্যস্ত হয়। সম্যক্ দৃষ্টির দ্বারা উৎপত্তির ও নিরোধের হেতু অবগত হওয়া যায়। এ হিসাবে দুঃখ ও দুঃখ-নিরোধের উপায় অবগত হওয়াই সম্যক্ দৃষ্টি।* সম্যক্ সঙ্কল্প বলিতে অহিংসা নৈষ্ক্রম্য অব্যাপদ—এই তিন বিষয়ে সঙ্কল্প বুঝাইয়া থাকে। সম্যক্‌বাক্য বলিতে চতুর্ব্বিধ মিথ্যাবাক্য পরিবর্জ্জন বুঝাইয়া থাকে। চতুর্ব্বিধ মিথ্যার মধ্যে, সত্যগোপন ও অসত্য প্রচার প্রথমবিধ 'মিথ্যাকথা' মধ্যে গণ্য, দ্বিতীয়—পিশুন-বাক্য, অর্থাৎ একস্থানের বাক্য অন্যস্থানে উচ্চারণ এবং তদ্দ্বারা একের প্রতি অন্যের ক্রোধ-বৃদ্ধির চেষ্টা। তৃতীয়,—পরুষ বাক্য, অর্থাৎ,—উত্তেজনাবশে কাহারও প্রতি গালিবর্ষণ। চতুর্থ—অব্যাপদ, অর্থাৎ,—অলীক উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়া অপরের মনস্তুষ্টির চেষ্টা। সম্যক্ কর্ম্ম,—প্রাণিহত্যা, পরস্বাপহরণ ও মৈথুন ভেদে ত্রিবিধ। প্রাণী মাত্রের প্রতি করুণা, পরদ্রব্যাপহরণে বিরতি, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন,—'সম্যক্ কর্ম্ম' বলিয়া অভিহিত হয়। সম্যক্‌জীবিকা বলিতে জীবিকাধর্ম্মে অসদুপায়ার্জ্জিত অর্থ কদাচ ব্যবহৃত না হয় অর্থাৎ সৎকার্য্যের দ্বারা জীবনযাপন করা হয়,—এই ভাব বুঝাইয়া থাকে। সম্যক ব্যায়াম বলিতে, পাপ নাশ, পাপ উৎপন্ন না হওয়ার পক্ষে চেষ্টা, পুণ্য উৎপাদন ও পুণ্যবর্দ্ধন প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। আত্মজয়ই ব্যায়ামের কার্য্য। সম্যক্ স্মৃতি বলিতে, কায়বিষয়ে কায়-দর্শন, বেদনাবিষয়ে বেদনা দর্শন, চিত্ত বিষয়ে চিত্তদর্শন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে ধর্ম্মদর্শন বুঝাইয়া থাকে।† সম্যক্ সমাধি বলিতে, চতুর্ব্বিধ ধ্যানের অবস্থা বুঝাইয়া থাকে। এই

আর্য্য অষ্টমার্গ।

---

* 'প্রতীত্য-সমুৎপাদ' দার্শনিক মত এই সম্যক্ দৃষ্টি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সম্যক্-দৃষ্টিরই নামান্তর প্রতীত্য-সমুৎপাদ। এতদ্বিষয়ক আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য। ঐ মতে অবিদ্যা হইতে সংস্কার, তাহা হইতে বিজ্ঞান;—এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে বিবিধ দুঃখের উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

† এই সকল বিষয় স্থানান্তরে আলোচিত হইয়াছে।

ধ্যান বা সমাধির দ্বারাই নির্ব্বাণ অধিগত হয়। ফলতঃ, সেই চিত্তস্থৈর্য্য, সেই কামনা-ত্যা সেই সচ্চিন্তা—সকলেরই মূলাধার।

* * *

অর্হৎ।

[অর্হৎ কাহাকে কহে,—মিলিন্দ ও নাগসেনের প্রশ্নোত্তর,—অর্হৎপদপ্রাপ্তির মূল;—ভাবনা পঞ্চক; অর্হতের অশুভা ও উপেক্ষা ভাবনা,—অর্হতের শিক্ষণীয় বিষয়,—কঠোর অনুশীলন,—যোগ সাধনা।]

অর্হৎ (রাহৎ) বলিতে বৌদ্ধগণ কি ভাব অনুভব করিতেন? রাজা মিলিন্দ এ ভিক্ষু নাগসেন তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁহাদের আলোচনার মর্ম্ম নিম্নে প্রকা

অর্হৎ কাহাকে কহে। করিতেছি। তদ্দ্বারা অর্হৎ (রাহৎ) সম্বন্ধে কতকটা আভাষ পাও যাইতে পারে। রাজা মিলিন্দ কহিলেন,—"সম্মানভাজন মহাশ আপনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, সাধারণ মনুষ্য যখন অর্হৎ হন, তখ তিনি হয় ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন, নয় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন। কিন্তু মনে করুন, কোন সাধারণ মনুষ্য কর্ম্মগুণে অর্হৎ হইয়াছেন। অথচ, তাঁহাকে ভিক্ষুপদে নিয়োগ করিব উপযোগী কোনও ব্যক্তি উপস্থিত নাই। এরূপ ক্ষেত্রে, সেই অর্হৎ নিজেই ভিক্ষুত্ব-গ্রহ সমর্থ হইবেন, অথবা সাধারণ লোক হইয়াই থাকিবেন, কিম্বা তিনি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবেন তাঁহার কি অবস্থা ঘটিবে?"

নাগসেন কহিলেন,—"তিনি নিজে ভিক্ষুত্ব গ্রহণে সমর্থ হইবেন না; কেন-ন উহা নিয়ম-বিরুদ্ধ। পরন্তু তিনি বিষয়ী সাধারণ লোকের মধ্যেও পরিগণিত হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে, হয় তাঁহাকে ভিক্ষুপদে বরণ করিবার জন্য কোনও মহাত্মার আবির্ভা হইবে, নয়—তিনি আপনিই নির্ব্বাণলাভ করিবেন।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"ইহার কারণ কি?"

নাগসেন কহিলেন,—"বিষয়ী সাধারণ লোকের অবস্থার সঙ্গে বহু অসৎ-পদার্থের সংশ্র আছে। সুতরাং সে অবস্থাকে অসৎ অবস্থা বলিতে হয়। অতএব যিনি অর্হৎ অবস্থ উপনীত, তাঁহাকে আর বিষয়ী সাধারণ লোকের অবস্থায় থাকিতে হইবে না। অর্হ হওয়া মাত্রই তিনি ভিক্ষুত্ব লাভ করিবেন বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন।"

রাজা মিলিন্দ কহিলেন,—"কেহ কি এই দেহে দেবলোকে ব্রহ্মলোকে অথবা উত্ত কুরুতে গমন করিতে সমর্থ হয়?"

নাগসেন উত্তর দিলেন,—"যাঁহার দেহ ভূতচতুষ্টয়ে সংগঠিত, তাঁহার পক্ষে ঐ সক স্থান দর্শন অসম্ভব নহে।"

মিলিন্দ আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কি প্রকারে সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে?"

নাগসেন কহিলেন,—"আপনি কি ঐ ভূমিখণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, এক হ ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান করিতে পারেন?"

মিলিন্দ কহিলেন,—"স্বচ্ছন্দে আমি আট হস্ত ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান করিতে পারি।"

নাগসেন কহিলেন,—"আপনি কি প্রকারে এ কার্য্য সম্পন্ন করেন?"

মিলিন্দ কহিলেন,—"প্রথমে আমি লম্ফ-প্রদানে সঙ্কল্প করি। সেই সঙ্কল্পের ফলে আমার দেহ যেন লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন আমি ভূতল হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হই।"

নাগসেন কহিলেন,—"ভিক্ষুও সেইরূপ ইদ্ধি-প্রভাবে মনন-মাত্রেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারেন। তাঁহার মানসিক সঙ্কল্পে তাঁহার দেহ ভারবিহীন বস্তুতে অর্থাৎ লঘুত্বে পরিণত হয়। সুতরাং, তিনি তখন বায়ু-পথে গতিবিধি করিতে সমর্থ হন।"

মিলিন্দ কহিলেন,—"আপনি বলিয়াছেন, অর্হৎগণ যদিও শারীর ক্লেশের অধীন বটে, তাঁহাদের মানসিক দুঃখানুভূতি নাই। কিন্তু শারীরিক ক্লেশের সহিত কি মানসিক ক্লেশ সম্বন্ধযুক্ত নহে? দেহের উপর অর্হতের কর্তৃত্ব আধিপত্য বা প্রাধান্য প্রভৃতি সম্বন্ধ কি কিছুই নাই?"

নাগসেন উত্তর দিলেন,—"সম্বন্ধ নাই বটে!"

মিলিন্দ কহিলেন,—"এ উক্তি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আপন কুলায়ের উপর একটি বিহঙ্গেরও আধিপত্য থাকে।"

নাগসেন কহিলেন,—"জন্মসূত্রে দেহের সহিত দশটী পদার্থের সম্বন্ধ থাকে; যথা,—(১) বর্ণ, (২) তাপ, (৩) ক্ষুধা, (৪) তৃষ্ণা, (৫) মল, (৬) মূত্র, (৭) নিদ্রা, (৮) ব্যাধি, (৯) ক্ষয়, (১০) মৃত্যু। এই দশ বিষয়ের উপর অর্হৎগণ কোনই ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন না।"

মিলিন্দ কহিলেন,—"কেন এরূপ হয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দেন।"

নাগসেন কহিলেন,—"পৃথিবী প্রাণী মাত্রের আশ্রয়স্থল। আশ্রয়ভূত প্রাণীর, পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব সম্ভবপর কি? সেইরূপ মন দেহের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং মন দেহকে আয়ত্তাধীন করিতে বা পরিচালাধীন রাখিতে সমর্থ নহে।"

মিলিন্দ কহিলেন,—"তবে কেন অপরাপর জন শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ ক্লেশ উপভোগ করেন।"

নাগসেন কহিলেন,—"যদ্দ্বারা মন বশীভূত হয়, তাহাদের তেমন অনুশীলন বা জ্ঞান-স্ফূর্ত্তি নাই। ক্ষুধার্ত্ত বৃষ জীর্ণ রজ্জুতে আবদ্ধ থাকিলে রোষভরে সে রজ্জু ছিন্ন করিয়া দূরে পলায়ন করে। সেইরূপ মন যখন সুশিক্ষায় নিয়মনিবদ্ধ না হয়, চাঞ্চল্যবশে সংযম-বন্ধন ছিন্ন করে। তদ্দ্বারা দেহ আন্দোলিত ব্যথিত হয়; তখন ক্রন্দন, বিভীষিকা ও আর্ত্তনাদ উত্থিত হয়। এইরূপে, দেহ ও মন উভয়েই ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু অর্হৎগণের চিত্ত উপযুক্তরূপ সংযম-শিক্ষাধীন। তাহাতে দেহ আন্দোলিত হয় না। সমাধি বা তদনুরূপ ক্রিয়ার দ্বারা, উহা যেন স্তম্ভে দৃঢ়বদ্ধ থাকে। অন্তর নির্ব্বাণের আনন্দে পরিপূর্ণ; সুতরাং, দৈহিক ক্লেশের অধীন থাকিলেও অর্হতের চিত্ত সর্ব্ববিধ ক্লেশবিমুক্ত।"

মিলিন্দ কহিলেন,—"দেহ প্রশান্ত বা উদ্বিগ্ন হইলে মন বিচলিত হইবে না, সর্ব্বদাই শান্তি লাভ করিবে,—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? কিরূপে ইহা সম্ভবপর, আমায় অনুগ্রহপূর্ব্বক বুঝাইয়া দেন।"

নাগসেন কহিলেন,—"মহীরুহের শাখা-পল্লব বায়ুভরে বিচলিত হয় বটে; কিন্তু

স্তম্ভ অবিচলিত থাকে। সেইরূপ, অর্হৎগণের চিত্ত চতুর্ম্মার্গ রূপ ডোরে সমাধিরূপ দৃঢ় স্তম্ভে আবদ্ধ থাকে। সুতরাং, দেহ ক্লেশক্লিষ্ট হইলেও তাঁহাদের চিত্ত অবিচলিত।"

কিন্তু সেই অর্হৎ-অবস্থা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়? বৌদ্ধ-শাস্ত্র মতে ভাবনা ও সমাধির দ্বারা সে অবস্থায় উপনীত হইতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে যে ধ্যান-ধারণা-সমাধির উপদেশ আছে, বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত ভাবনা, ধ্যান ও সমাধি তাহা হইতে অভিন্ন নহে। বৌদ্ধমতে ভাবনার পঞ্চবিধ প্রক্রিয়া আছে। সেই প্রক্রিয়া-পঞ্চকের নাম,—(১) মৈত্রী, (২) মুদিতা, (৩) করুণা, (৪) উপেক্ষা ও (৫) অশুভা। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি বা উপদেশ-পালনে অভ্যস্ত নহেন, তাঁহারা ভাবনার অনুশীলনে কখনই সমর্থ নহেন। যদি কেহ সে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন, দিবাশেষে অথবা উষা সমাগমে বিঘ্ন বিবর্জ্জিত নিভৃত স্থানে আসন পরিগ্রহ করুন; সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেবের মহিমা, তাঁহার উপদেশের উৎকর্ষ এবং ভিক্ষুগণের ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় অনুধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হউন। সেই ভাবনা বা ধ্যান, সেই উপবেশন বা আসন—যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য আর কি বলিতে পারি? 'ধ্যান' শব্দে অসৎ আকাঙ্ক্ষা ভস্মীকরণ; 'ধ্যান' শব্দে বিদ্যমানতার মূলোৎপাটন। সমাধি তাহারই নামান্তর। এই ধ্যান বা সমাধির অবস্থাই নির্ব্বাণের তোরণ-দ্বার। সেই অবস্থাতেই দেহ যে অনিত্য অসত্য ও ক্লেশপ্রদ, তাহা উপলব্ধি হয়। ভাবনার পরিণতিই সেই সমাধি—নির্ব্বাণ।

অর্হৎ অবস্থা প্রাপ্তির মূল।

ভাবনা-পঞ্চকের প্রকৃতি-পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করিবার প্রয়াস পাইতেছি। প্রথম, মৈত্রী-ভাবনা। ভিক্ষু যখন যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হন; তখন তাঁহার একটী অনুশীলন আবশ্যক। সে অনুশীলন—জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ভিক্ষুকে অনুধ্যান করিতে হইবে,—'উচ্চ স্তরের প্রাণিপর্য্যায় সকলই আনন্দ-লাভ করুন; তাঁহারা সকলেই যেন ক্লেশ, পীড়া, ও অসৎ আকাঙ্ক্ষার কবল হইতে মুক্তিলাভ করেন। ভিক্ষুই হউন, অথবা বিষয়ী সাধারণ মনুষ্যই হউন—সকল মনুষ্যই, সকল দেবতাই যেন সুখী হন,—সকলেরই নরক-যন্ত্রণার যেন অবসান হয়।' কেবল মনুষ্য বা দেবগণ সম্বন্ধে নহে; যেখানে যে প্রাণী আছে, স্থাবর জঙ্গম চরাচর সকলের সম্বন্ধে যিনি মঙ্গলকামনায় অনুপ্রাণিত হইবেন, তাঁহারই ভাবনা সার্থক; তিনিই মৈত্রী-ভাবনার যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ। শত্রু বলিয়া নয়, মিত্র বলিয়া নয়, সম্পর্কিত বলিয়া নয়, অসম্পর্কিত বলিয়া নয়, সমানভাবে সকলের মঙ্গল চিন্তন করাই মৈত্রী-ভাবনার লক্ষ্য। দ্বিতীয়,—'করুণা ভাবনা'; এই অবস্থায় ভিক্ষু সর্ব্বান্তঃকরণে জীবের দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য অনুধ্যান করেন। 'দরিদ্রের দারিদ্র্য-দুঃখ দূরীভূত হউক, দরিদ্র অগাধ বিত্ত লাভ করুক,—ইহাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য হইতে করুণার উদ্রেক। যখন আমরা কাহাকেও দারুণ দুঃখে নিমগ্ন দেখি; তখন আমাদের মন আন্দোলিত হয়। সেই আন্দোলনই করুণার উৎপত্তি মূল। দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিয়া, করুণায় কাতর হইয়া, আমরা যখন সেই দুঃখ-দারিদ্র্য মোচন জন্য চেষ্টা করি, সেই

ভাবনা-পঞ্চক।

অবস্থাই করুণা ভাবনা'। তৃতীয়—মুদিতা ভাবনা। মুদিতা শব্দের অর্থ—আনন্দিতা। পার্থিব ধন-সম্পদের অধিকারে যে আনন্দ, এ সে আনন্দ নয়; এ আনন্দ—স্বর্গীয় আনন্দ। 'সমুন্নতির সৌভাগ্য সকলেই লাভ করুক, সকলেই আপন আপন প্রাপ্য পুরস্কার প্রাপ্ত হউক,—মুদিতা-ভাবনার অবস্থায় ভিক্ষু এই চিন্তায় অনুপ্রাণিত থাকেন।" কৃষক যেমন প্রথমে কৃষির উপযোগী ক্ষেত্রখণ্ড নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয় এবং তাহার পর সেই ক্ষেত্রে লাঙ্গল পরিচালনা করে, ভিক্ষুও সেইরূপ মৈত্রী করুণা মুদিতা ভাবনা-ক্রমে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রথমে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রতি শুভ-দৃষ্টিপাত করেন। পরিশেষে তাঁহার সেই দৃষ্টি ক্রমশঃ পল্লী, গ্রাম, রাজ্য, লোকসকল এবং লোকাতীত স্থানসকলে পরিব্যাপ্ত হয়।

অপরের সম্বন্ধে—অপরের শুভসূচনা উদ্দেশ্যে যেমন মৈত্রী করুণা মুদিতা ভাবনা কার্য্য করে; সেইরূপ অর্হতের বা সাধকের আত্মসম্পর্কে অশুভা ও উপেক্ষা ভাবনা প্রযুক্ত হয়।

অর্হতের অশুভা ও উপেক্ষা ভাবনা।

অশুভা ভাবনা—সৌভাগ্যের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব—তৎপ্রতি নিরানন্দের ঘৃণার, বিরক্তির উৎপাদন। এই ভাবনায় সাধক ভাবিবেন,—তাঁহার দেহ দ্বাত্রিংশৎ অপবিত্র অশুদ্ধ পদার্থে বিগঠিত। গোময়রূপে যেমন কীট পুষ্ট হয়, এ দেহও তদ্রূপ। ক্লেদপূর্ণ দুর্গন্ধময় ঘৃণাকারজনক পদার্থে বিগঠিত এই দেহ,—ইহার অপেক্ষা অশুভ কি আছে! অশুভ ভাবনা অনুশীলনের পূর্ব্বে ভিক্ষু গুরুর নিকট গমন করিবেন। গুরু তাঁহাকে কবরস্থানে লইয়া গিয়া মৃত-দেহের অবস্থা প্রত্যক্ষ করাইবেন। সেই বিগলৎ মেদ-মাংস-অস্থি, সেই কৃমি-কীটের আবাসস্থল পচনশীল দেহ প্রদর্শন করাইয়া নরদেহের পরিণতির বিষয় বুঝাইয়া দিবেন। এবম্বিধ শিক্ষার ফলে, এরূপভাবে দেহের পরিণতি প্রত্যক্ষ করিয়া, সাধক অশুভ ভাবনায় সিদ্ধিলাভ করিবেন। অতঃপর উপেক্ষা ভাবনা। এই ভাবনার অনুধ্যানে জীবমাত্রকে সমান বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে। তখন সকলের প্রতি সমভাব আসিবে, তখন আর কাহাকেও ভালবাসার পাত্র অথবা কাহাকেও ঘৃণার পাত্র বলিয়া মনে হইবে না। তখন উপেক্ষা অর্থাৎ কামনা-পরিশূন্য অবস্থা। এই অবস্থাকে সর্ব্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। উপেক্ষা-ভাবনাই অর্হৎগণের প্রধান অনুশীলনীয়। সকলই অনিত্য, সকলই অসত্য, সকলই দুঃখপ্রদ—উপেক্ষা ভাবনায় দেহ-সম্পর্কে এই ভাবই বিকাশপ্রাপ্ত হয়।

মৈত্রী, উপেক্ষা প্রভৃতি ভাবনার সহিত ধ্যান বা সমাধির একটা সম্বন্ধ আছে। ধ্যান বা সমাধির পাঁচটী বিভাগের বিষয় কথিত হয়। সেই পাঁচটী বিভাগের নাম;—(১) বিতর্ক অর্থাৎ

ধ্যান বা সমাধি।

বিচারপূর্ব্বক বিষয়-বিশেষে মনঃসংযোগ; (২) বিচার অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা বিষয়-নির্ণয়; (৩) প্রীতি অর্থাৎ আনন্দলাভ; (৪) সেবা অর্থাৎ উপাসনা আনন্দ; (৫) চিত্তের একাগ্রতা অর্থাৎ মনঃস্থৈর্য্য। ধ্যানের এই পঞ্চ বিভাগকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যান কহিয়া থাকে। প্রথম ধ্যানের অবস্থায় মন জলের উপর তরঙ্গের ন্যায় ভাসমান হয়। তখনও ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা চিন্তা মনোমধ্যে জাগরূক থাকে। অস্বচ্ছ সলিলে মৎস্য যেমন ভাসমান থাকে, এ অবস্থায়

মনে সেইরূপ নানা বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। সমাধির ইহাই নিম্নতম স্তর। ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায় বিতর্ক বিচার দ্বারা মনের মলিনতা দুরীভূত হয়। প্রথম ধ্যানের ও দ্বিতীয় ধ্যানের অবস্থায় উপেক্ষা ভাবনা কতকটা সঞ্চিত হয় বটে; কিন্তু পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। প্রথম ধ্যানের অবস্থার সহিত তীক্ষাগ্র প্রস্তরাবৃত স্থানে পরিভ্রমণের উপমা এবং দ্বিতীয় ধ্যানের অবস্থায় সরল সমতল পথে .বিচরণের সাদৃশ্য কীর্ত্তিত হয়। তৃতীয় ধ্যানের অবস্থাতেও চিত্ত সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত হয় না। তখনও পরিত্যক্ত প্রীতির সামগ্রীর প্রতি .চিত্ত প্রধাবিত থাকে। গো-বৎস দূরে রজ্জুবদ্ধ; সে যেমন নিয়ত রজ্জু ছিন্ন করিতে এবং রজ্জু ছিন্ন করিয়া মাতার নিকট পৌছিয়া দুগ্ধপানের জন্য চেষ্টান্বিত; ধ্যানের তৃতীয় অবস্থায়ও সাধকের সেই ভাব। চতুর্থ অবস্থা বেদনার সহিত সংশ্রব-যুক্ত। অবাধ্য বৃষকে আবদ্ধ করিবার জন্য, কৃষক যেমন সমগ্র পশুপাল পরিচালন করে, এবং পালের মধ্যে ফেলিয়া বৃষকে যেমন ধরিতে সমর্থ হয়; সেই প্রকার বেদনাকে বুঝিবার জন্য এই সময় সকল বেদনার অবস্থাকে একত্র করিয়া পরীক্ষা করা হয়। তাহার ফলে বেদনাকে চিনিতে পারা যায়। তখন উপেক্ষার দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধি লাভ করে। সেই বিশুদ্ধি অবস্থাই ধ্যানিগণের উন্নতির পরিচায়ক। ধ্যান দ্বারা চিত্তের যে অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহাকে পরিক্রম কহে। এই অবস্থার লক্ষণ এই যে, নয়ন স্বর্গীয় দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। বৌদ্ধমতে সমাধির দুই অবস্থা; যথা,—উপচারী ও অর্পণ। উপচারী সমাধির অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণরূপে দৃঢ় বা প্রশান্ত হইতে পারে না। চলচ্ছক্তি-হীন শিশু যেমন দাঁড়াইতে গিয়া পুনঃপুনঃ পড়িয়া যায়; উপচারী সমাধির অবস্থায় সাধকের সেই আশঙ্কা। সুতরাং, এ অবস্থায় বিশেষ সাধনার আবশ্যক। অর্পণ-সমাধি অধিক ক্ষমতাশালী। শিশু এখন পূর্ণতা পাইয়াছে। সে এখন উপবেশনে ও ভ্রমণে সমর্থ। তাহার চিত্ত এখন অচঞ্চল অবিক্ষুব্ধ। অর্পণ সমাধি লাভের পক্ষে বাসস্থান, সঙ্গ, খাদ্য, কাল এবং দেহের অবস্থাদি সম্বন্ধে সাধককে কতকগুলি নিয়মের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে। সমাধির দ্বারা চিন্তা-সমূহকে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখে। সমাধি—সকল সদ্গুণের প্রধান মূল। আর যত কিছু আছে, সকলই ইহার নিকট হেয়; সকলই ইহার অনুসরণকারী; সকলই ইহার সহিত নিবদ্ধ। বৌদ্ধগণের ধ্যান বা সমাধি যে হিন্দুগণের যোগাঙ্গেরই রূপান্তর, তাহা বলাই বাহুল্য। পতঞ্জলির যোগ- শাস্ত্রের অনুসরণে বৌদ্ধগণের ধ্যান সমাধি-যোগ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি হয়।

"পৃথিবীর ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ডে এ বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। বৌদ্ধগণের ধ্যান ও সমাধি যে হিন্দুগণের শিক্ষার অনুসরণ, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণও তাহা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে ওলডেনবর্গের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—"Buddhism, following a common feature of all Indian religious life which preceded it, regards as stages preparatory to the victory is won, certain exercises of spiritual abstraction, in which the *religieux* withdraws his thoughts from the external world with its motley crowd of changing forms, to anticipate in the stillness of his own Ego, afar from pain

অর্হত্ত্ব-লাভ বড় কঠোর সাধনা-সাপেক্ষ। তেমন সাধনা, তেমন অনুশীলন, তেমন শিক্ষা লাভ করিতে হইলে, যেরূপ অশেষ পরিশ্রম, অশেষ অধ্যবসায়, অশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তাহার তুলনা নাই। সংসারে যত জীব-জন্তু বা পদার্থ আছে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট কিছু-না-কিছু শিক্ষণীয় বিষয় থাকিতে পারে। অর্হৎ হইতে হইলে বিবিধ প্রাণী ও পদার্থের নিকট হইতে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা করিয়া আপন জীবনে তাহার ক্রিয়া দেখাইবার আবশ্যক করে। এক এক পদার্থে শিক্ষণীয় বিষয় অনেক প্রকার থাকিতে পারে। অর্হৎকে তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়। কোন্ জন্তু বা কোন্ পদার্থ হইতে অর্হৎ কি কি বিষয় শিক্ষা করিবেন, মিলিন্দপ্রশ্নে তাহার একটা আভাষ আছে। ভিক্ষুর কয়টী বিষয়ে পূর্ণত্ব লাভ করা উচিত,—রাজা মিলিন্দ এই প্রশ্ন নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নাগসেন তাহাতে যে উত্তর দেন, তদনুসারে কার্য্য করা বড়ই কঠিন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধ্য। তিনি বলেন,—'অর্হত্ত্বলাভ করিতে হইলে গর্দ্দভ হইতে একটী, কুক্কুট হইতে পাঁচটী, দ্বীপি হইতে দুইটী, মর্কট হইতে দুইটী, পৃথিবী হইতে পাঁচটী, সমুদ্র হইতে পাঁচটী, মাকড়সা হইতে পাঁচটী ইত্যাদি ইত্যাদি প্রাণী বা পদার্থ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে।' সকল প্রকার শিক্ষণীয় বিষয় বিবৃত করা সম্ভবপর নহে। মাত্র শিক্ষণীয় বিষয়ের আভাষ দিবার জন্য দুই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। বলিয়াছি, অর্হৎকে গর্দ্দভের নিকট একটী বিষয় শিখিতে হইবে। সে কি বিষয়? গর্দ্দভ যেখানে সেখানে শয়ন করে, কিন্তু কখনও অধিকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকে না। গর্দ্দভের এই একটী বিশেষ লক্ষণ। অর্হৎও সেইরূপ বিশ্রামের স্থান অস্থান জ্ঞান করিবেন না। আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানই হউক বা পরিচ্ছন্ন স্থানই হউক, তাঁহার পক্ষে সকলই সমান। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়াই তিনি আপন কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী হইবেন। গর্দ্দভ হইতে অর্হতের এইরূপ শিক্ষাই প্রয়োজন। কুক্কুট হইতে পাঁচটী বিষয় শিক্ষার উপদেশ আছে। সে শিক্ষার বিষয়,—(১) কুক্কুট যেমন যথাসময়ে শয়ন করে, (২) কুক্কুট যেমন যথাসময়ে নিদ্রা-ত্যাগ করে, (৩) কুক্কুট যেমন মাটী আঁচড়াইয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাদ্যদ্রব্য আহরণ করে, (৪) কুক্কুট যেমন চক্ষু থাকিতেও রাত্রিকালে দৃষ্টি-শক্তিহারা হয়, (৫) পুনঃপুনঃ লোষ্ট্র-দণ্ডাদির দ্বারা বিতাড়িত হইলেও কুক্কুট যেমন স্বগৃহ পরিত্যাগ করে না; অর্হৎগণও সেইরূপ, (১-২) যথা সময়ে চৈত্য পরিষ্কার ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে চৈত্য-বন্দনার জন্য প্রবৃত্ত হইবেন, (৩) তাঁহার আহারে শরীর-পুষ্টি বা আনন্দ-উল্লাস লক্ষ্য না থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালন ও অহিংসাদি ধর্ম্মসাধন উদ্দেশ্য মাত্র থাকিবে, (৪) ভিক্ষান্ন-সংগ্রহে রূপরসগন্ধস্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বিষয়ে উদাসীন বা অন্ধ থাকিয়া তিনি প্রাণধারণ মাত্র-লক্ষ্য রাখিবেন; (৫) সকল বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া তিনি চীবরকর্ম্ম নবকর্ম্ম ও গুরুসেবায় ব্রতী থাকিবেন। ফলতঃ, যত

অর্হতের শিক্ষণীয় বিষয়।

---

and pleasure, the cessation of the impermanent. The devotion of abstraction is to Buddhim what prayer is to other religions."

প্রকার আত্মসংযম বিহিত হইতে পারে, যত প্রকারে সদ্‌বৃত্তি সমূহ পরিচালনা করা যাইতে পারে, যত প্রকারে সদ্‌গুণের বিকাশ সম্ভবপর হয়, সর্ব্বপ্রকার আচরণ অনুশীলন জন্য প্রাণিপর্য্যায় পদার্থসকল হইতে শিক্ষা লাভ কবিতে হইবে। মিলিন্দপ্রশ্নের অন্তর্গত 'ঔপম্যকথাপ্রশ্ন' অংশ, অর্হত্ব লাভ শিক্ষা বিষয়ে এক প্রকৃষ্ট উপাদান। ভিক্ষু হওয়া বা অর্হৎ হওয়া বা নির্ব্বাণ লাভ কবা—কথার কথা নহে, বহু জন্মজন্মান্তরের বহু কঠোর সাধনাব ফলে ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মে যোগ-সাধনা।

যোগসাধনা সমন্ধে বৌদ্ধগণেব যে সকল গ্রন্থ আছে, তন্মেধ্য "মহাসতিপট্‌ঠানসুত্তন্ত" বিশেষ আদরণীয়। পালি-ভাষায় লিখিত ঐ গ্রন্থ সুত্ত-পিটকের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সুত্তপিটকের দীগ্‌ঘনিকায় অংশে সিগালোবাদসুত্ত, ধম্মচক্ক-পবত্তনসুত্ত ও মহাসতিপট্‌ঠানসুত্তন্ত গ্রন্থত্রয় অতি প্রয়োজনীয়। 'সিগালোবাদসুত্ত' গৃহিগণের প্রয়োজনীয় বিধায়, 'গৃহী বিনয়' নামেও উহা অভিহিত হয়। 'ধম্মচক্কপবত্তনসুত্ত' গৃহী এবং যোগী উভয়েরই প্রয়োজনীয়। মহাসতিপট্‌ঠানসুত্তন্ত—যোগমার্গাবলম্বিগণেব প্রধান আশ্রয়ভূত। মজ্‌ঝিমনিকায়ে সতিপট্‌ঠানসুত্ত' নামে উহার সদৃশ কতকগুলি সুত্রসমন্বিত অংশ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সে সুত্রগুলি অপেক্ষা মহা-পট্‌ঠানসুত্তন্তগুলি বিশদ ও বিস্তৃত। বিশদ ও বিস্তৃত বলিয়াই উহা 'মহা' বিশেষণ সমন্বিত। এই মহসতিপট্‌ঠান সুত্তন্তে ভিক্ষুগণকে উপদেশছলে যোগের তত্ত্ব বিবৃত আছে। প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মসভার সভাপতি মহাকাশ্যপের নির্দ্দেশক্রমে ভিক্ষু আনন্দ এই যোগতত্ত্ব বিবৃত করেন। গ্রন্থের সূচনায় লিখিত আছে,—'ভগবান এক সময়ে কুরুদিগের নগরে অবস্থান-কালে এই যোগতত্ত্ব ভিক্ষুগণের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন।' ভগবান উপদেশ দেন—চারি পথ বা চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ হয়। সেই চারি পথ "চত্তারো সতিপট্‌ঠানো" অর্থাৎ চারি 'স্মৃত্যুপস্থান' বা 'স্মৃতি প্রস্থান' নামে অভিহিত হয়। সেই চারি পথ বা উপায় এই যে,—(১) কায়বিষয়ে কায়দর্শী হইতে হইবে, (২) বেদনা বিষয়ে বেদনাদর্শী হইতে হইবে, (৩) চিত্তবিষয়ে চিত্তদর্শী হইতে হইবে, (৪) ধম্মবিষয়ে ধর্ম্মদর্শী হইতে হইবে। লোভ, দুঃখ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া উদ্যমশীল হইয়া ভিক্ষু যখন ঐ উপায়-চতুষ্টয়ের অনুশীলন করিতে সমর্থ হইবেন, তখনই তাঁহার নির্ব্বাণ লাভ ঘটিবে। ইহার পর কায়দর্শী কি প্রকারে হওয়া যায়, চিত্তদর্শীই বা কি প্রকারে হওয়া যায়—প্রভৃতি বিষয় বুঝান হইয়াছে। কায়দর্শন বিষয়ে বিবিধ বিভাগ আছে। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে অভিজ্ঞতা, গমনাগমনে অভিজ্ঞতা, অশনে বসনে আস্বাদনে শয়নে জাগরণে সতর্কতা, পুরীষলিপ্ত শ্লেষ্মা পূজ রক্ত স্বেদ মেদ মল মূত্র প্রভৃতি সমন্বিত দেহের অশুচিতা প্রত্যবেক্ষণ, দেহস্থ ধাতুর স্বরূপ-তত্ত্ব অবধারণ প্রভৃতি কায়বিষয়ে কায়দর্শিতাব নিদর্শন। এইরূপ বেদনা বিষয়ে চিত্ত বিষয়ে, ধর্ম্ম বিষয়ে বিবিধ জ্ঞাতব্য আছে। ধর্ম্ম বিষয়ে ধর্ম্মদর্শী হইতে হইলে,

* দীগ্‌ঘনিকায়ের মহাবগ্‌গের অন্তর্গত সুত্তসমূহ সকলেই "মহা" বিশেষণে নির্দ্দিষ্ট। যথা,—মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্ত, মহাপধান-সুত্ত, মহানিদান-সুত্ত ইত্যাদি। 'সুত্ত' ও 'সুত্তন্ত' একই অর্থবাচক। তবে কাহারও কাহারও মতে দীর্ঘ বা বিস্তৃত সুত্ত 'সুত্তন্ত' নামে অভিহিত হয়।

পন্ন নীবরণ বুঝিতে হইবে, পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধ-দর্শী হইতে হইবে; ষড়ায়তন ধর্ম্ম, সপ্তবোধ্যাঙ্গ, চারি সত্য এবং দুঃখ কি, জন্ম কি, জরা কি, মরণ কি, শোক কি, পরিবেদন কি, দৌর্ম্মনস্য কি, বুঝিতে হইবে। শেষ বুঝিতে হইবে—মার্গসত্য কি? কি ভাবে এই সকল বিষয় 'মহাসতিপট্‌ঠানসুত্তন্ত' মধ্যে আলোচিত হইয়াছে, ঐ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। সাধক কিরূপে কায়-বিষয়ে কায়দর্শী হন, তাহার একটু পরিচয়,—"তিনি নিম্নে পদতল হইতে উর্দ্ধে কেশাগ্র পর্য্যন্ত চর্ম্মাবৃত দেহপুরে নানা প্রকার অশুচি প্রত্যবেক্ষণ করেন; যথা,—এই দেহের কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক্, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, বুক্ক, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, ক্ষুদ্র অন্ত্র, উদর, পুরীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, রক্ত, মেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষেড়, সীকৃনী, লসিকা, মূত্র আছে। হে ভিক্ষুগণ! যেমন শালি, ব্রীহি, মুগ, মাষ, তিল, তণ্ডুল প্রভৃতি নানাবিধ ধান্যপূর্ণ দুই দিকে মুখবিশিষ্ট "মুতোলি"র (এক প্রকার থলিয়ার) মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ প্রত্যবেক্ষণ করেন—এইগুলি শালি, এইগুলি ব্রীহি, এইগুলি মুগ, এইগুলি তিল, এইগুলি তণ্ডুল; সেইরূপ তিনি এই দেহে কেশ, লোম, নখ··লসিকা ও মূত্র প্রভৃতি অশুচি প্রত্যবেক্ষণ করেন। "এইরূপ ধর্ম্ম বিষয়ে ধর্ম্মদর্শী হইতে হইলে তাঁহাকে যে সকল বিষয় জানিতে হয়, তাহার মধ্যে দুঃখসত্য নির্দ্দেশ, সমুদায়সত্য নির্দ্দেশ এবং নিরোধসত্য নির্দ্দেশ প্রধানতঃ বুঝিতে হয়। দুঃখসত্য কি? জন্মও দুঃখ, জরাও দুঃখ, ব্যাধিও দুঃখ, মরণও দুঃখ, শোক-পরিবেদন দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ও নিরাশা দুঃখ। ঈপ্সীত বস্তুর অপ্রাপ্তিও দুঃখ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ। আর তিনি দেখিবেন, ঐ পঞ্চস্কন্ধাত্মক দুঃখের কারণ কি? যে তৃষ্ণা পুনর্জ্জন্মের কারণ, যাহার সহিত আনন্দ ও আসক্তি থাকে, যাহা যেখানে সেখানে উপভোগ করিতে চাহে, তাহাই দুঃখের কারণ। তৃষ্ণা ত্রিবিধ, যথা,—কাম তৃষ্ণা (বিষয়বাসনা), ভবতৃষ্ণা (আস্তিক্য বাসনা), বিভবতৃষ্ণা (নাস্তিক্য বাসনা)। তার পর দেখিবেন,—এ দুঃখ নিবারণ হইতে পারে কি প্রকারে? সে সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—যাহা সেই তৃষ্ণার অশেষ বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, নিবৃত্তি, মুক্তি ও আলয়হীনতা (অনাশক্তি) তাহাই দুঃখ-নিরোধ। কিন্তু সে নিরোধ কিরূপে সম্ভবপর? রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্ম্মতৃষ্ণা— নানা তৃষ্ণায় মানুষকে ব্যাকুল করিয়া রাখিয়াছে। সে তৃষ্ণা নিরোধের উপায় কি? মহাসতিপট্‌ঠানসুত্তন্ত ঘোষণা করিলেন,—'সেই উপায়—আর্য্য অষ্টমার্গ; যথা,—সম্যক্-দৃষ্টি, সম্যক্-সঙ্কল্প, সম্যক্-বাক্য, সম্যক্‌জীবিকা, সম্যক্‌ব্যায়াম, সম্যক্‌স্মৃতি, ও সম্যক্‌সমাধি। এতদ্দ্বারাই দুঃখনিরোধ হয়, নির্ব্বাণলাভ ঘটে। এই চতুর্ব্বিধ স্মৃত্যুপস্থান 'যোগ' ভিন্ন আর কি? এ কায়-দৃষ্টি, বেদনা-দৃষ্টি, চিত্তদৃষ্টি, ধর্ম্ম-দৃষ্টি—তাই যোগাঙ্গের অন্তর্গত 'অভ্যাস যোগ' বলিয়া অভিহিত হয়। * এইরূপ বুদ্ধ যে যোগতত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই আমাদিগের যোগশাস্ত্রসম্মত।

* মহাসতিপট্‌ঠান সুত্তন্ত গ্রন্থের যে সুন্দর অনুবাদ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম-এ মহোদয় সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহারই অনুসরণে এতদ্বিষয় লিখিত হইল।

পাতঞ্জল দর্শনের সহিত বৌদ্ধগণের যোগাঙ্গের কিরূপ সম্বন্ধ আছে, নিম্নলিখিত আলোচনায় তাহা বোধগম্য হইতে পারে;—"বুদ্ধ বলেন, সমাধির আবস্থিক ফল চতুর্ব্বিধ। বিবেক, একোতীভাব, উপেক্ষকত্ব ও স্মৃতিপরিশুদ্ধি। আমাদের প্রাচীন যোগশাস্ত্রেও ঐ চতুর্ব্বিধ ফলের উপদেশ আছে; কেবল নাম কএকটী নাই। স্মৃতিপরিশুদ্ধি ও উপেক্ষকত্ব, এ দুটী প্রকারান্তরে অভিহিত আছে বলিলেও বলিতে পারি। বুদ্ধ যে বলিয়াছিলেন—'প্রথমাবস্থায় প্রকৃত তত্ত্বের প্রকাশ ও অসৎ পদার্থের মূল। পরিদর্শন হয় অর্থাৎ নির্ব্বাণ, মোক্ষ, শান্তি ও সমাধির প্রকৃত জ্ঞান প্রতীত বা উপলব্ধ হয়, তৎপরে অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, মোহ, অনিত্যতা, ক্ষণনশ্বর বিষয়ে অসারতা প্রতীত হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান পরিষ্কার নির্ম্মল চক্ষুর স্বরূপ এবং তাহা এক প্রকার লোকোত্তর জ্ঞান বা অলৌকিক জ্যোতিঃ। এই জ্যোতিঃতে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল আলোকিত হয়, তাবৎ সন্দেহ তিরোহিত হয় ও অত্যুজ্জ্বল প্রত্যক্ষ বিশ্বাস সমাগত হয়।' বুদ্ধের এ কথা পাতঞ্জলের 'তারকং সর্ব্ববিষয়ম্" "তৎসর্ব্বার্থম্" ইত্যাদি কথার সহিত সমান। তিনি আরও বলিয়াছেন, ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্ত বহুত্ব হইতে একত্বে অর্থাৎ ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে পরিণতি হয়। ইহারই অন্য নাম বা পরিভাষা—একোতীভাব। তৎকালে ভিন্ন বস্তুর জ্ঞান থাকে না। তাহা একই পরম পদার্থ, একই ধ্যান, একই জ্ঞান, একই প্রতীতি, একই ইচ্ছা, একেতেই অনুরাগ ও প্রতীতি। তদ্ব্যতীত বস্ত্বন্তরে দৃষ্টি থাকে না, জ্ঞানও থাকে না, সুতরাং ভাবাভাব বা ভাবনা থাকে না। বুদ্ধের এ কথাও পাতঞ্জলোক্ত যোগশাস্ত্রোক্ত 'একাগ্রতা পরিণাম' ও 'সমাধি পরিণাম' কথার সহিত সমান। তৃতীয় প্রকার সমাধিতে চিত্ত উদাসীন হয়। জ্ঞান অজ্ঞান, ভাব অভাব, রাগ বৈরাগ্য, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, সম্পদ বিপদ, নিত্য অনিত্য, এ সমুদয় বোধাতীত হয়। আত্মা এ অবস্থায় মধ্যব্যবস্থায় অবস্থিতি করে। নির্লিপ্ত, উপেক্ষক, অস্পৃষ্ট, অক্রিয় ও অস্পন্দ হয়। আত্মা তখন কোন প্রকার বোধে আসক্ত নহে, অধীন নহে ও ক্রিয়াহীন। বুদ্ধের এ উক্তিও যোগশাস্ত্রসম্মত নিরোধ পরিণামের ফল বা নামান্তর মাত্র। শাক্যসিংহ ব্যুত্থিত হইয়া অর্থাৎ সমাধিভঙ্গের পর বা বোধিজ্ঞান লাভের পর—আর একটী কথা বলিয়াছিলেন; তাহা এই—'চতুর্থ সমাধিতে অর্থাৎ সমাধির চরমাবস্থায় আত্মস্মরণ তিরোহিত হয়, আমিত্ব বা অহংভাব (ইহাই বুদ্ধমতের-আলয় বিজ্ঞান ও জীবাত্মা) বিদূরিত হওয়াতে চিত্ত যৎপরোনাস্তি নির্ম্মল হয়, না থাকার ন্যায় হয়। অহঙ্কারই পাপের ও সংসারের মূল, তাহার অভাবে পুণ্যের উদয়, পাপ জীবনের ও সংসারের মৃত্যু এবং ধর্ম্মজীবনের যা মনুষ্যোত্তর জ্ঞানের লাভ, ইহাই চরম। এই অবস্থা আসিলেই দুঃখের অবসান, মুক্তিলাভ, শান্তির উদয়, নির্ব্বাণরূপ পরম তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। অনন্ত জ্ঞান ও সত্ত্বদর্শন হয়। সত্ত্ব তখন প্রকৃতিস্থ ও অমর। ইহাই অমরত্ব। আর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, জীবন নাই, জরা নাই, বন্ধমোক্ষ নাই। সত্ত্ব অচ্যুত রাজ্যে বিচরণ, পরমানন্দপ্রাপ্ত ও অমর হয়। বুদ্ধের এ কথা আর হিন্দুযোগীদিগের নির্ব্বীজ সমাধির ফল আত্মবিমোক্ষ সমান। হিন্দুযোগীদিগের কৈবল্যলাভের লক্ষণ, বুদ্ধের

পাতঞ্জল দর্শন ও বৌদ্ধগণ।

সত্ত্বদর্শন, বেদান্তের ব্রহ্মদর্শন, এ সমস্ত সমান। সত্ত্বশব্দও হিন্দুমতে পরমাত্মবাচী ও ব্রহ্মবাচী। বৌদ্ধের বোধিসত্ত্ব আর হিন্দুমতের জীবন্মুক্ত পুরুষ একই কথা। বুদ্ধ বলেন, শেষাঙ্গ সম্যক্ সমাধি, তাহা হইতে শান্তি ফল উৎপন্ন হয়, সেই শান্তি সর্ব্বপ্রকার রিপু বশীভূত হওয়ার পর উদিত হয়। চিত্ত তখন স্থির, অচঞ্চল, প্রতিকূল অনুকূল কোনও ব্যাপারে বিকৃত হয় না। চিত্ত তখন নিরন্তর একই অবস্থায় অবস্থিতি করে। ইহাই শম অর্থাৎ শান্তি। এই শান্তি নির্ব্বাণজ্ঞানের স্বাদু ফল। চিত্ত নির্ব্বাণজ্ঞানের প্রভাবে পারমিতার অধিকার বশীভূত করে এবং হৃদয় পারমিতার উপরেই সর্ব্বদা অবস্থিতি করে। দান, শীল, শান্তি, ধ্যান, বল, বীর্য্য, উপায়, প্রণিধি-প্রজ্ঞা, সমুজ্জ্বল সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান, এই সকল পারমিতা আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। বুদ্ধের এ কথাও আমাদের বেদান্তাদি শাস্ত্রোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের অনুরূপ।"*

* * *

বৌদ্ধনীতি।

[নীতি-বিষয়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা,—পঞ্চ শীল প্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে নীতির উপদেশ;—বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি,—নীতিশব্দের অর্থ ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থে নীতির প্রাধান্য,—বুদ্ধদেবের জীবনে নীতির দৃষ্টান্ত—দশ পারমিতায় তাহার পরিচয়;—গৃহী বিনয়ে নীতিশিক্ষা,—সিগালোবাদ সুত্তে গৃহীর কর্ত্তব্য নীতি-তত্ত্ব;—ধম্মপদে শ্রেষ্ঠ নীতি—সে নীতির পরিচয়;—জনশিক্ষাপ্রদ নীতিবাক্য—বিবিধ নীতিকথা।]

বৌদ্ধধর্ম্মে নীতির প্রাধান্য সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। সেই জন্য অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মকে নীতিমূলক বা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করেন। সদ্ধর্ম্মের লক্ষণই সন্নীতির প্রাচুর্য্য।

নীতি বিষয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে—হিন্দুধর্ম্মে তাই সন্নীতির অশেষ প্রাধান্য দেখিতে পাই। হিন্দুশাস্ত্র-সমুদ্রের অনন্ত গর্ভে যে অনন্ত নীতি-রত্ন নিহিত রহিয়াছে, কে তাহা উদ্ধার করিতে সমর্থ? বৌদ্ধনীতি-সমূহ তাঁহাদের শাস্ত্রাকাশে তারামালার ন্যায় জ্যোতিষ্মান রহিয়াছে। সুতরাং অনেকেরই এখন তাহা লক্ষ্যস্থল হইয়াছে। গৌতমের নীতি, কি গৃহী কি ভিক্ষু প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বিহিত দেখি। প্রথম, তিনি সাধারণভাবে কি ভিক্ষু কি বিষয়ী সকল বৌদ্ধের প্রতি পাঁচটী আদেশ প্রদান করিয়া যান। সেই পাঁচ আদেশ 'পঞ্চ শীল' নামে অভিহিত হইতে পারে। 'সুত্ত নিপাত' উপদেশ দিতেছেন,—'(১) প্রাণিহত্যা করিও না, অথবা তাহাতে কাহাকেও উৎসাহ দিও না; (২) পরদ্রব্য অপহরণ করিও না এবং তদ্বিষয়ে অপরকে সাবধান করিয়া দিও; (৩) ব্যভিচার করিও না এবং অন্যকে তৎপথে বিরত রাখিও; (৪) মিথ্যা পরিহার করিবে, অপরকে তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া দিবে; (৫) মদ্যপানে আপনি বিরত হইবে এবং অপরকে বিরত করিবে।' সাধারণভাবে এবম্বিধ উপদেশ প্রদত্ত হওয়ার পর প্রতি গৃহস্থের, প্রতি জনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পিতা পুত্রের প্রতি কিরূপ দৃষ্টি রাখিবেন, পুত্র পিতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন; শিক্ষকের ও

* ডক্টর রামদাস সেন মহাশয় গভীর গবেষণার সহিত এ বিষয় আলোচনা করিয়া পাতঞ্জল দর্শনের ও বৌদ্ধ-দর্শনের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া গিয়াছেন।

ছাত্রের, পতির ও পত্নীর, প্রভুর ও ভৃত্যের, বিষয়ী ও ভিক্ষুর এবং মিত্রের ও সহচরের কর্ত্তব্য কি প্রকার, তদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। দুই একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। পিতার কর্ত্তব্য,—'(১) সন্তানকে পাপকর্ম্মে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন, (২) পুণ্যকর্ম্মে অভ্যস্ত রাখিবেন, (৩) শিল্প বা বিজ্ঞানে শিক্ষিত করিবেন, (৪) যথোপযুক্ত বর কন্যায় বিবাহ দিবেন, (৫) তাহাদিগকে উত্তরাধিকারী করিয়া যাইবেন।' এইরূপ, পুত্রের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ আছে, পুত্র সদা স্মরণ করিবে,—'(১) যে পিতা-মাতা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, আমি অবশ্য তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিব, (২) সংসারের প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য, তাহা অবশ্য পালন করিব, (৩) আমি আমার পারিবারিক সম্পত্তি প্রহরীর ন্যায় রক্ষা করিব, (৪) আমি আমার পিতামাতার উপযুক্ত সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে প্রযত্নপর রহিব, (৫) পিতামাতার লোকান্তরের পর তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিব।' প্রত্যেকের জন্য পাঁচটী করিয়া শীল বা উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, আর সেই জন্যই ঐ উপদেশাবলী 'পঞ্চ শীল' নামে অভিহিত হয়। পতি-পত্নীর পরস্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ; পত্নীর প্রতি পতি '(১) যথাযোগ্য সম্মান দেখাইবেন, (২) সদয় ব্যবহার করিবেন, (৩) অনুরক্ত থাকিবেন, (৪) অপরের দ্বারা সম্মানিত করাইবেন, এবং (৫) উপযুক্তরূপ বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিবেন।' পতির প্রতি পত্নী ঐকান্তিকতা প্রদর্শন উদ্দেশ্যে—'(১) গৃহস্থালী সুনিয়ন্ত্রিত রাখিবেন, (২) আত্মীয়-স্বজনে ও বন্ধু-বান্ধবে আতিথেয়তা প্রদর্শন করিবেন, (৩) তিনি সতীত্বের আদর্শ হইবেন, (৪) তিনি সংসার পরিচালনে পরিমিতব্যয়িতার পরিচয় দিবেন, (৫) সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য-সম্পাদনে নৈপুণ্য ও অধ্যবসায়ের চিহ্ন দেখাইবেন।' পঞ্চশীলরূপ উপদেশ ভিন্ন বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রে বিবিধ প্রকারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ আছে। গৃহীকে কিরূপ নিয়মাবলী পালন করিতে হইবে, ভিক্ষুকে কিরূপ কঠোর নিয়মাধীন থাকিতে হইবে,—সে সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ রহিয়াছে। সে সকল উপদেশ সময়বিশেষে সকল সমাজেরই উপযোগী বলিয়া মনে করি। লোকশিক্ষার পক্ষে সে সকল উপদেশ আদর্শস্থানীয়।

সকল ধর্ম্মে নীতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মে সে প্রাধান্য যেন উহার প্রাণস্থানীয় হইয়া আছে। 'নীতি' শব্দের সাধারণ অর্থ—হিতাহিত বিবেচনার শাস্ত্র। 'নীত' শব্দের উত্তর 'তি' (ক্তি) প্রত্যয়ে উহা নিষ্পন্ন। 'নীত' শব্দের অর্থ—'প্রাপিত' 'গৃহীত'। সূক্ষ্ম আলোচনায় বুঝিতে গেলে, 'নীতি' শব্দের অর্থ আমরা তাই বুঝিতে পারি,—'হিতাহিত বিবেচনায়' যাহা 'গৃহীত' হয়, তাহাই 'নীতি'; অর্থাৎ,—হিত কি ও অহিত কি, তাহা অনুধাবনপূর্ব্বক, হিত-ভাগ গ্রহণ ও অহিত-ভাগ পরিবর্জ্জন, ইহাই নীতি শব্দের লক্ষণ। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বহু বিভাগে নীতি তাদৃশ পরিস্ফুট নহে। অধিকারী ভিন্ন অনেক স্থলে সে নীতি অপরের বোধগম্য হইবে না।* বুদ্ধদেবের জীবনে মাত্র দুই-একটি ক্ষেত্রে

বৌদ্ধধর্ম্মে নীতি।

* মনে করুন, যজ্ঞার্থ পশু হনন, শক্তিপূজায় বলিদান প্রভৃতির উদ্দেশ্য কি—না বুঝাইয়া দিলে, কয় জন তাহা বুঝিয়া থাকেন? আবার বুঝাইয়া দিলেও কয় জন তাহার ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন! এই

সে জটিলতা উপলব্ধ হয়।* কিন্তু সাধারণতঃ সকল স্থলেই বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি পরিস্ফুট। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যত গ্রন্থ আছে, তাহার প্রায় সকল গ্রন্থেই কোন্ কর্ম্ম পরিবর্জ্জনীয় কোন কর্ম্ম গ্রহণীয়,—তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি দেখিতে পাই। বুদ্ধদেবের জীবনে নীতির প্রাচুর্য্য দেখি; গাথাকারে নীতি গীত হইতে দেখি, পিটকের মধ্যে নীতি স্তরে স্তরে সজ্জীকৃত দেখি। বৌদ্ধগণের যে যোগশাস্ত্র দেখি, তাহাতেও নীতি উদ্ভাসিত। তাঁহাদের যে দর্শন-সমুচ্চয়, তাহাও নীতির তরঙ্গে প্রবমান। ভিক্ষুদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ, তাহাই বা নীতি শিক্ষা-দান ভিন্ন অন্য কি অভিধায়ে অভিহিত হইতে পারে? ধম্মপদের অন্তর্গত প্রতি 'বগ্‌গ'—শ্রেষ্ঠ নীতি-কথায় পরিপূর্ণ। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কয়েকটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। তাহাতে সিদ্ধান্ত বিশদীকৃত হইবে।

বুদ্ধদেবের জীবনে নীতির দৃষ্টান্ত।

আপন জীবনে বুদ্ধদেব নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। পুর্ব্বে দেখাইয়াছি,—পঞ্চাশদধিক পাচ শত জন্মের পর ভগবান 'বুদ্ধত্ব' লাভ করেন। কি প্রকারে তাঁহার 'বুদ্ধত্ব' (পূর্ণতা) লাভ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে একটী গাথা আছে; সেই গাথায় প্রকাশ,—দশটী বিষয়ে পূর্ণতা লাভে তিনি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সেই দশ বিষয়ের অনুশীলন চলিয়াছিল; কিন্তু তাহা পূর্ণরূপ আয়ত্ত হয় নাই। শেষ জীবনে সেই পূর্ণত্ব তিনি লাভ করেন। সেই পূর্ণতা লাভের নাম—পারমিতা (পারমী)।† (৩) যে দশ বিষয়ে পূর্ণতা-লাভ, 'পারমিতা' বলিয়া অভিহিত হয়, সে দশটী বিষয়,—(১) দান, (২) শীল, (৩) নৈষ্ক্রর্ম্ম্য, (৪) প্রজ্ঞা, (৫) ক্ষমা, (৬) ক্ষান্তি, (৭) সত্য, (৮) অধিষ্ঠান, (৯) মৈত্রী, (১০) উপেক্ষা। দানে পূর্ণতা দেখাইয়া, তিনি 'দান-পারমী' সংজ্ঞা লাভ করেন; শীলতায় পূর্ণতা দেখাইয়া, তিনি 'শীল-পারমী' সংজ্ঞা লাভ করেন; এইরূপে দশ বিষয়ে পূর্ণতা দেখাইয়া তিনি তৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন। এ সম্বন্ধে গাথা ও শ্লোক এইরূপ দৃষ্ট হয়, যথা,—

"ভিক্‌খায় উপগতং দিস্বা সকত্তানং পরিচ্চজিং।
দানেন মে সমো নত্থি এসা মে দানপারমীতি॥ ১।
স্থূলেহি বিজ্‌ঝয়ন্তেপি কোট্টয়ন্তেপি সত্তিহি।
ভোজপুত্তে ন কুপ্পামি এসা মে সীলপারমীতি॥ ২।

যে যোগাঙ্গ—প্রাণায়াম প্রত্যাহারাদি ক্রিয়া—কি উদ্দেশ্যে বিহিত হয়, তাহা না বুঝাইয়া দিলে, বুঝিবার উপায় নাই। স্ত্রী-শূদ্রকে বেদপাঠে বিরত রাখা হইয়াছে। তাহারও কারণ বুঝিতে কিছু গবেষণার প্রয়োজন। 'প্রাণিহত্যা করিও না', 'দরিদ্রে দান কর' প্রভৃতি বাক্যে উপদেশের সাফল্য স্বতঃপ্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারে নীতির উপযোগিতা বুঝাইবার আবশ্যক করে।

* আত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উক্তিতে (৩৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) এ বিষয়ে একটু আভাষ দেওয়া হইয়াছে। অধিকারী অনধিকারী ভেদ বৌদ্ধধর্ম্মেও যে নাই, তাহাও নহে। ভিক্ষু বা অর্হৎ যে তত্ত্ব অবগত হন, সাধারণ বিষয়ী লোকে তাহা কখনও ধারণা করিতে পারে না।

† এই পারমী বা পারমিতা হইতেই বৌদ্ধদর্শন 'প্রজ্ঞাপারমিতা' প্রভৃতির সৃষ্টি। প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ কিসে সাধিত হয়, 'প্রজ্ঞা-পারমিতা' দর্শনের তাহাই লক্ষ্য, প্রজ্ঞাপারমিতা দর্শনের তাহাই উদ্দেশ্য।

মহারজ্জং হত্থগতং খেলপিণ্ডংব ছড্ডয়িং।
চজতো ন হোতি লগনং এসা মে নেক্খম্মপারমীতি॥ ৩।
পঞ্‌ঞায় বিচিনন্তোহং ব্রাহ্মণং মোচয়িং দুখা।
পঞ্‌ঞায় মে সমো নত্থি এসা মে পঞ্‌ঞাপারমীতি॥ ৪।
অতীরদস্‌সী জলমজ্ঝে হতা সব্বেব মানুসা।
চিত্তস্‌স অঞ্‌ঞথা নত্থি এসা মে বিরিয়পারমীতি॥ ৫।
অচেতনং চ কোট্টেন্তে তিণ্‌হেন ফরসুনা মম।
কাসিরাজে ন কুপ্পামি এসা মে খন্তিপারমীতি॥ ৬।
সচ্চবাচং অনুরক্খন্তো চজিত্বা মম জীবিতং।
মোচয়িং একসতং খত্তিয়ে পরমত্থসচ্চপারমীতি॥ ৭।
মাতাপিতা ন মে দেস্‌সা ন পি মে দেস্‌সং মহাযসং।
সব্বঞ্‌ঞু তং পিয়ং ময়্‌হং তস্‌মা বতমধিট্‌ঠহিন্তি॥ ৮।
ন মং কোচি উত্তসতি নপিহংভায়ামি কস্‌সচি।
মেত্তাবলেনুপত্থদ্ধো রমামি পবনে সদাতি॥৯।
সুসানে সেয়্যং কপ্পেমি ছবট্‌ঠিং উপধায়হং।
গোমণ্ডলা উপগন্ত্বা রূপং দস্‌সেন্ত ন প্পকন্তি॥ ১০।
অচেতনায়ং পুথবী অবিঞ্‌ঞায় সুখং দুখং।
সাপি দানবলা ময়্‌হং সত্তক্খত্তুং পকম্পথাতি॥ ১১।”

অর্থাৎ,—“ভিখারীকে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত দেখিয়া স্বীয় আত্মাকে পর্য্যন্ত অকাতরে প্রদান করিয়াছি। দানের সমান আমার কিছুই নাই। ইহাই আমার দানপারমী। ১। শূলের দ্বারা বিদ্ধ এবং শস্ত্রের দ্বারা পুনঃপুনঃ আঘাত করিলেও, আমি ভোজপুত্রের প্রতি কোপ প্রকাশ করি নাই, ইহাই আমার শীল-পারমী *। ২। স্বাধিকারভুক্ত বিলাস-সাম্রাজ্যকে নিষ্ঠীবনবৎ দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি। ত্যাগে আসক্তি থাকে না—ইহাই আমার নৈষ্ক্রম্য (বা নৈষ্কম্য) পারমী। ৩। আমি জ্ঞানবলে অনুধাবন করিয়া ব্রাহ্মণকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম। প্রজ্ঞার সমান আমার কিছুই নাই—ইহাই আমার প্রজ্ঞাপারমী। ৪। অপার সমুদ্রের মধ্যে সঙ্গী সকল বিনাশপ্রাপ্ত হয়; তথাপি আমার বিন্দুমাত্র চিত্তবিকৃতি ঘটে নাই। ইহাই আমার বীর্য্যপারমী। ৫। তীক্ষ্ণ পরশুর দ্বারা প্রহার করিতে করিতে আমাকে অচেতন করিলেও, আমি কাশীরাজের প্রতি কোপ প্রকাশ করি নাই; ইহাই

* অনেকের ধারণা, যীশুখৃষ্ট যে ক্ষমাগুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমন দৃষ্টান্ত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। যাহারা তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে (৬ষ্ঠ খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাস ২২৮ পৃষ্ঠায়) আমরা সে ক্ষমার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আবার এখানে বুদ্ধদেবের জীবনে সে প্রমাণ প্রত্যক্ষ করি। পুনঃপুনঃ শূলের দ্বারা বিদ্ধ এবং শাস্ত্রের দ্বারা আহত হইয়াও, তিনি আঘাতকারী ভোজপুত্রের প্রতি কোপ প্রকাশ করেন নাই। এ দৃষ্টান্ত অমানুষিক।

আমার ক্ষান্তিপারমী।৬। সত্যবাক্য পালন করিবার কালে আমি স্বীয় জীবন উৎসর্গ করতঃ এক শত ক্ষত্রিয়কে মুক্ত করিয়াছিলাম; ইহাই আমার পরমার্থ সত্যপারমী। ৭। মাতাপিতা আমার উদ্দেশ্যগত নয়, সুখাতিলাভ আমার উদ্দেশ্যগত নয়, সর্ব্বজ্ঞতাই আমার প্রিয় বস্তু; সেই কারণেই আমি ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম; ইহাই আমার অধিষ্ঠানপারমী। ৮। কেহ আমাকে ভয় প্রদর্শন করে না, আমিও কাহাকেও ভয় করি না, মৈত্রীবলে বলীয়ান্ হইয়া আমি উপবনে মনোসুখে বিচরণ করিয়াছিলাম, ইহাই আমার মৈত্রীপারমী। ৯। শবাস্থিকে উপাধান করিয়া আমি শ্মশানে শয়ন করি। গোমণ্ডল আসিয়া আমাকে অল্প সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করে না; ইহাই আমার উপেক্ষাপারমী।১০।" এই দশবিধ পারমী দ্বারা তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চমকিত করিয়াছিলেন। প্রতি জন্মেই তাঁহার ঐ সকল ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। এক জন্মে—বেস্‌সন্তর-রূপে যখন তিনি আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার দানের প্রভাব দেখিয়া ধরণী প্রকম্পিত হইয়াছিল, শেষোক্ত শ্লোক (১১শ) তাহাই অবগত হই। বেস্‌সন্তর-রূপে আবির্ভূত হইয়া তিনি পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন; অসাধারণ সত্যপরায়ণতা এবং অমানুষিক দানশীলতা দেখাইয়া যান। সে জীবনে তাঁহার অতুলনীয় আত্মত্যাগ তাঁহাকে দানপারমিতায় সিদ্ধ করিয়াছিল। ফলতঃ, নীতির যাহা সার, শিক্ষার যাহা মূল, কর্ম্মের যাহা প্রধান, 'দশ পারমীর' মধ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ করি। কি ভাবে, কীদৃশ কঠোর ব্রতাবলম্বনে মানুষ অর্হত্ব, বুদ্ধত্ব বা নির্ব্বাণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উল্লিখিত পারমিতার দৃষ্টান্তে তাহা বোধগম্য হইতে পারে।

সাধারণভাবে সরল ভাষায় যে সকল উপদেশ বা নীতি প্রচারিত আছে, তৎসমুদায় যেমন জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রে আরও কতকগুলি উপাদেয় নীতিকথা উপমার অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া আছে। সেগুলি সকল দেশে সকল কালে রত্নের ন্যায় কণ্ঠে কণ্ঠে শোভিত থাকিবে। এক দিকে ভাবের প্রবাহ অন্যদিকে শিক্ষার প্রস্রবণ! 'সিগালোবাদসুত্ত'—'গৃহী বিনয়' বলিয়া অভিহিত হয়। গৃহস্থ মাত্রের শিক্ষার মূলতত্ত্ব উহার মধ্যে নিহিত আছে। 'সিগালোবাদ-সুত্ত' প্রবর্ত্তনার মূল তথ্য অবগত হইলে, উহার অন্তর্গত গভীর শিক্ষার বিষয় উপলব্ধি হইতে পারে। সিগালক নামে এক ধনিসন্তানের চরিত্র-পরিবর্ত্তন উপলক্ষে বুদ্ধদেবের যে উপদেশ, সিগালোবাদ-সুত্তের তাহাই প্রাণভূত। সিগালক্ সর্ব্বদা মস্তক উন্নত করিয়া থাকিত। শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কাহারও প্রতি সে কখনও সম্মান প্রদর্শন করে নাই। তাহার পিতা তজ্জন্য বড়ই অনুতপ্ত ছিলেন; তিনি পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াও তাহার মতি পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে মৃত্যুকালে তিনি পুত্রকে একটী উপদেশ দিয়া গেলেন; কহিলেন,—'পুত্র! তুমি উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ঊর্দ্ধ অধঃ দিকছয়কে প্রতিদিন প্রভাতে নমস্কার করিও; তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।' মুমূর্ষু পিতার সেই উপদেশ পুত্র পালন করিতে সম্মত হইল। তখন, পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় বুঝিয়া পিতা নিশ্চিন্তমনে ইহজীবন পরিত্যাগ করিলেন। দিকসমূহকে নমস্কার করিতে বলায় পিতার এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন,

গৃহী বিষয়ে নীতিগল্প।

অভ্যাসের উহাই প্রথম স্তর; দিক-সমূহকে নমস্কার করিতে করিতে, পুত্র ক্রমশঃ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-সাধুসজ্জনকে নমস্কার করিতে শিখিবে; আর তাহার ফলে, তাহার প্রতি ভগবানের দৃষ্টি পড়িবে।' কালে তাহাই ঘটিয়াছিল; পিতার ভবিষ্য-আশা পূর্ণ হইয়াছিল। দিক-সমূহকে নমস্কার করিতে দেখিয়া, ভগবান বুদ্ধদেব তাহাকে দিক-সমূহের স্বরূপ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; তাহাতে সিগালক্ সাধু-সজ্জনের প্রতি ভক্তিমান হইতে শিখিয়াছিল। সিগালকের সহিত ভগবানের কথোপকথন প্রসঙ্গে যে সকল অমূল্য নীতিকথা ভগবৎ-মুখে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা গৃহীর পক্ষে অমূল্য। তাহারই কয়েকটী নীতিবাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। কি শিক্ষাপ্রদ মধুর সে নীতিকথাগুলি! যথা,—

পাণাতিপাতো অদিন্নাদানং মুসাবাদো পবুচ্চতি।
পরদার গমনঞ্চেব নপ্পসংসন্তি পণ্ডিতাতি॥ ১।
ছন্দা দোসা ভয়া মোহা যো ধর্ম্মং অতিবত্ততি।
নিহীয়তি তস্‌স যসো কালপক্‌খেব চন্দিমা॥ ২।
ছন্দা দেস্‌সা ভয়া মোহা যো ধম্মং নাতিবত্ততি।
আপূরতি তস্‌স যসো সুক্কপক্‌খেব চন্দিমাতি॥ ৩।
হোতি পাপ-সখা নাম হোতি সম্মিয়সম্মিয়ো।
যো চ অত্থেসু জাতেসু সহায়ো হোতি সো সখা॥ ৪।
উস্সুরসেয়্যা পরদার সেবনং। বেরপ্পসঙ্গো চ অনত্থাতা চ॥
পাপ চ মিত্তাসু কদরিয়তা চ। এতে ছ ঠানা পুরিসং ধ্বংসয়ন্তি॥ ৫।
পাপমিত্তো পাপসখো পাপ-আচার-গোচরো।
অস্‌সা লোকা পরম্‌হা চ উভয়া ধ্বংসয়তে নরো॥ ৬।
অক্‌খিত্থিয়ো বারুণী নচ্চগীতং। দিবাসোপ্পং পাপচরিয়া অকালে॥
পাপা চ মিত্তাসু কদরিয়তা চ। এতে ছ ঠানা পুরিসং ধ্বংসয়ন্তি॥৭।
অক্‌খেহি দিব্বন্তি সুরং পিবন্তি। সন্তিত্থিয়ো পাণসমা পরেসং।
নিহীনসেবী ন চ বুদ্ধিসেবী। নিহীয়তি কালপক্‌খেব চন্দো॥ ৮।
অতিসীতং অতিউণ্‌হং অতিসায়মিদং।
ইতি বিস্‌সট্‌ঠকম্মন্তে অত্থা অচ্চেন্তি মানবে॥ ৯।
যো চ সীতঞ্চ উণ্হঞ্চ তিণভীয়ো ন মঞ্‌ঞতি।
করং পুরিস কিচ্চানি সো সুখা ন বিহায়তীতি॥ ১০।
অঞ্‌ঞদত্থুহরো হোতি, অপ্পেন বহুমিচ্ছতি।
ভয়স্‌স কিচ্চং করোতি, সেবতি অত্তকারণাতি॥ ১১।
অঞ্‌ঞদত্থুহরো মিত্তো, যো চ মিত্তো বচীপরো।
অনুপ্পিয়ঞ্চ যো আহ, অপায়েসু চ যো সখা॥ ১২।
এতে অমিত্তে চত্তারো—ইতি বিঞ্‌ঞায় পণ্ডিতো।
আরকা পরিবজ্জেয়্য মগ্গং পটিভয়ং যথাতি॥ ১৩।

উপকারো চ যো মিত্তো, যো চ মিত্তো সুখে দুখে।
অত্থকৃথায়ী চ যো মিত্তো, যো চ মিত্তানুকম্পকো॥ ১৪।
এতে খো মিত্তে চত্তারো—ইতি বিঞ্ঞায় পণ্ডিতো।
সক্কচ্চং পরিরুপাসেয়্য মাতা পুত্তং ব ওরসং॥ ১৫।
পণ্ডিতো সীলসম্পন্নো জলমগ্গীব ভাসতি।
ভোগে সংহংমানস্স ভমরস্সেব ইরীয়তো॥ ১৬।
ভোগা সন্নিচয়ং যন্তি বম্মিকো বুপচীয়তি॥
এবং ভোগে সমাগন্ত্বা অলমত্থো কুলে গিহী।
চতুধা বিভজে ভোগে স বে মিত্তা নিগন্থতি॥ ১৭।
একেন ভোগে ভুঞ্জেয়্য দ্বীহি কম্মং পয়োজয়ে।
চতুত্থঞ্চ নিধাপেয়্য আপদাসু ভবিস্সতীতি॥ ১৮।
মাতাপিতা দিসা পুব্বা আচরিয়া দক্খিনা দিসা।
পুত্তদারা দিসা পচ্ছা মিত্তামচ্চা চ উত্তরা॥ ১৯।
দাসকম্মকরা হেট্‌ঠা উদ্ধং সমণ-ব্রাহ্মণা।
এতা দিসা নমস্সেয়্য অলমত্থো কুলে গিহী॥ ২০।
পণ্ডিতো সীলসম্পন্নো সণ্হো চ পটিভাণবা।
নিবাত বুত্তি অত্থদ্ধো তাদিসো লভতে যসং॥ ২১।
উট্‌ঠানকো অনলসো আপদাসু ন বেধতি।
অচ্ছিদ্দবুদ্ধি মেধাবী তাদিসো লভতে যসং॥ ২২।
সঙ্গাহকো মিত্তকরো বদঞ্ঞু বীতমচ্ছরো।
নেতা বিনেতা অনুনেতা তাদিসো লভতে যসং॥ ২৩।
দানঞ্চ পেয়্যবজ্জঞ্চ অত্থচরিয়া চ যা ইধ।
সমানত্ততা চ ধম্মেসু তত্থ তত্থ যথারহং॥ ২৪
এতে খো সঙ্গহা লোকে রথস্সাণীব যায়তো।
এতে খো সঙ্গহা নস্সু ন মাতা পুত্তকারণা॥
লভেথ মানং পূজং বা পিতা চ পুত্তকারণা॥ ২৫।
যস্মা চ সঙ্গহা এতে সমবেক্‌খন্তি পণ্ডিতা।
তস্মা মহত্ত পপ্পোন্তি পসংসা ভবন্তি তেতি॥ ২৬।"

উদ্ধৃত শ্লোককয়েকটীতে গৃহীর জ্ঞাতব্য বিবিধ তত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে। কোন্ কর্ম্ম ক্লেশজনক, প্রথম শ্লোকে তাহার পরিচয় আছে। তদনুসারে চারি কর্ম্ম সাধু-গৃহস্থের ক্লেশজনক; যথা,—'প্রাণাতিপাত, অদত্ত গ্রহণ, মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ, পরদারগমন,—এই চারি কর্ম্ম ক্লেশপ্রদ; পণ্ডিতগণ এ কার্য্যে কখনও প্রশংসা করেন না।' ১। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে সাধু গৃহস্থের পরিবর্জ্জনীয় চারি প্রকার অপকর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'ছন্দ, দ্বেষ, ভয় ও মোহ এই চারি কারণে ধর্ম্ম-নাশ হয়। ইহাতে যশোভাতি কৃষ্ণপক্ষের

চন্দ্রের স্থায় লোপপ্রাপ্ত হয়, আর ঐ ছন্দ ভয়ে ভয় মোহে যে জন অভিভূত না হন, শুক্লপক্ষের চন্দ্রের স্থায় তাঁহার যশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।' ২-৩। চতুর্থ প্রভৃতি শ্লোকে (৪—১০) মিত্র সম্বন্ধে ও কর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ আছে। 'যে জন কেবল মুখে বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়, সে পাপসখা বা কুমিত্র। কিন্তু যিনি বিপদে সহায়তা করেন, তিনিই মিত্র। ৪। প্রভাত-নিদ্রা, পরদারগমন, বৈরসঙ্গ, শঠের সহিত মিত্রতা, কুব্যবহার,—এই ছয় কারণে পুরুষের ধ্বংসসাধন হয় ৫। পাপীর সহিত মিত্রতায় পাপে রত হয়, সেই হেতু ইহপরলোকে নর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ৬। অক্ষক্রীড়া বারুণী সংগম, নৃত্য-গীত মত্ত, দিবানিদ্রা, অকালে পাপাচার, কুমিত্র। সংবাস, কার্পণ্য—এই ছয় কারণে নর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ৭। অক্ষক্রীড়া, সুরাপান পরস্ত্রীয়ার প্রাণসম জ্ঞান, হীনসেবা, জ্ঞানী সেবায় বিরত,—এই সকল কারণে মানুষের যশ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের স্থায় বিলুপ্ত হয়। ৮। অতি শীত, অতি উষ্ণ, অতি সায়াহ্ন মনে করিয়া যে জন কর্ম্মে বিরত হয়, তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। আর যে জন শীত উষ্ণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া আপন কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনি কখনও সুখভোগে বঞ্চিত হন না।' ৯-১০। একাদশ আদি (১১-১৩) শ্লোকে মিত্ররূপী অমিত্রের বিষয় বিবৃত। ভগবান বলিতেছেন,—'যে মিত্র অপরের ধনহরণকারী, অল্প কর্ম্ম করিয়া অধিক ফল আশা করে, ভয়ে ভয়ে কিছু-কাজ করে, নচেৎ সকল কার্য্যে স্বার্থসিদ্ধির আশা রাখে, মিত্র হইলেও সে অমিত্র। পরস্বাপহারী, বাকসর্ব্বস্ব, তোষামোদকারী এবং কুকাজে উৎসাহদাতা,—এই চারি প্রকার মিত্রকে পণ্ডিতগণ অমিত্র বলিয়া জানেন। ভয়পূর্ণ পথের স্থায় উহাদিগকে দূর হইতে পরিবর্জ্জন করা বিধেয়।' ১১-১৩। যেমন চারি কারণে মিত্র অমিত্র পদবাচ্য, তেমনই আবার চারি কারণে মিত্র সুহৃৎ মধ্যে পরিগণিত হন। 'মিত্র—উপকারকারী, মিত্র, সুখে দুঃখে সদা সঙ্গী, মিত্র—সৎপরামর্শদাতা, মিত্র—অনুকম্পক অর্থাৎ সুখে সুখানুভব-কারী ও দুঃখে দুঃখানুভবকারী। এই প্রকার মিত্রচতুষ্টয়কেই পণ্ডিতগণ মিত্র বলিয়া জ্ঞান করেন। মাতা যেমন পুত্রকে পালন করেন, ঐরূপ মিত্রকে সেইরূপভাবে, সেবা করিবে। ১৪—১৫। সচ্চরিত্র পণ্ডিত জন জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দীপ্তিমান হন। তিনি ভ্রমরের স্থায় আচরণে ধনসঞ্চয় করেন। বল্মীকনাকৃত স্তূপের স্থায় ধীরে ধীরে তাঁহার ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত হয়। বিপুল ধনসঞ্চয় দ্বারা প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়া, চারি অংশে তিনি সে বিত্তব বণ্টন করেন, আর তাহাতে আত্মীয়স্বজন তাঁহার বাধ্য হয়। এক ভাগ ভোগের জন্য, দুই ভাগ কর্ম্মে প্রয়োগ জন্য এবং চতুর্থ ভাগ ভবিষ্য বিপদে সহায়তার জন্য সঞ্চিত রাখিবেন। ১৫-১৬।' সাধু গৃহস্থের ষড়দিক রক্ষা বিষয়ে, ভগবান অতঃপর বুঝাইতেছেন,—'মাতা-পিতা পূর্ব্ব দিক, আচার্য্য দক্ষিণ দিক, দারাপুত্র পশ্চিম দিক, আত্মীয় স্বজন উত্তর দিক, দাসদাসী অধঃ দিক, শ্রমণ ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধ দিক, এই ছয় দিকে যে গৃহী নমস্কার করে, অর্থাৎ যে গৃহী এই ছয় দিকের তুষ্টিসাধনে সমর্থ হয়, সে গৃহীর গৃহ ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হয়। সচ্চরিত্র সুপণ্ডিত সুজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি নম্র অধ্যাত্মিক ব্যক্তি যশস্বী হন। যিনি বিপদে অটল, কর্ম্মে অপরাঙ্মুখ, পরিশ্রমে অকাতর—যিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেধাবী, তিনি নিশ্চয়ই যশস্বী হন। যিনি সংগ্রাহক অর্থাৎ সাধু সদাশয়, যিনি মিত্রাকর অর্থাৎ সকলের

প্রতি মিত্রভাবাপন্ন, বাদজ্ঞ অর্থাৎ বাক্যরক্ষায় সদা যত্নপর, যিনি নেতা অর্থাৎ প্রভু অথচ বিনেতা অর্থাৎ বিনয়কর্ত্তা, অপিচ অনুনেতা মাৎসর্য্যবিহীন, তিনি নিশ্চয়ই যশোভাজন হন। দান, প্রিয়-আচরণ, মঙ্গল-সাধন, আত্মবৎ জ্ঞান,—এই চতুর্ব্বিধ সংগ্রহ-নাম-বাচ্য। রথ যেমন খিল সাহায্যে পরিচালিত হয়, সাধুগণ সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সংগ্রহের দ্বারা সংসার-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান্বিত হন। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সংগ্রহ যাহার নাই, তাহার জনক-জননীও পুত্রের জন্য সুখী নহে। বিজ্ঞজন সংগ্রহ-পালনে মহত্ব লাভ করেন এবং যশস্বী হন। ১৯—২৬।' সিগোলোবাদ সুত্তের কয়েকটী কবিতা মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু উহার গদ্যাংশও ঐরূপ উপদেশপূর্ণ। সুত্ত কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র, কিন্তু রত্নখনি।*

ধম্মপদ—বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ নীতিগ্রন্থে সুশোভিত। উহা সাধারণভাবে সকল সম্প্রদায়ের উপযোগী নীতি-কথায় পরিপূর্ণ। উহার কতক বুদ্ধদেবের নিজের উক্তি এবং কতক পূজার্হ স্থবির-গণের উক্তি বলিয়া কথিত হয়। ধম্মপদের ভিন্ন ভিন্ন বগ্‌গে (পরিচ্ছেদে) ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপিত। ব্রাহ্মণবগ্‌গ,—ব্রাহ্মণ কিরূপ হওয়া আবশ্যক এবং কি কারণে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব লোপ পায়, উপমার দ্বারা তাহা বিবৃত করা হইয়াছে। 'কোধ বগ্‌গে' ক্রোধের উৎপত্তি ও পরিহারের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 'মলবগ্‌গে, কতপ্রকার মল কি ভাবে মানুষকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, আর কি উপায়ে সে মল দূরীভূত হইতে পারে,—তাহার উপদেশ দেখিতে পাই। এইরূপ, দণ্ডবগ্‌গ, পুপ্‌ফবগ্‌গ, বুদ্ধবগ্‌গ, ভিক্খুবগ্‌গ, পিয়বগ্‌গ, তণ্‌হা বগ্‌গ প্রভৃতি বিবিধ বগ্‌গে বিবিধ নীতি সংগৃহীত আছে।

ধম্মপদে ব্রাহ্মণ ভিক্খু স্থবির-প্রসঙ্গ।

প্রথম, ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব কি মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত অংশে তাহার কয়েকটী পরিচয় দিতেছি। যথা,—

"যস্স পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি।
বীতদ্দরং বিসংযুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥ ১।
ঝায়িং বিরজমাসীনং কতকিচ্চং অনাসবং।
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥ ২।
যস্স কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কটং।
সংবুতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥ ৩।
ন জটাহি ন গোত্তেহি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো।
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচি সো চ ব্রাহ্মণো॥ ৪।
গম্ভীর পঞ্ঞং মেধাবিং মগ্গামগ্গস্স কোবিদং।
উত্তমত্থ অনুপত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥ ৫।
যস্স রাগো চ দোসো চ মানো মক্খো চ পাতিতো।
সাসপোরিব আরগ্গা তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥ ৬।
ছিন্দ সোতং পরক্কম্ম কামেপনুদ ব্রাহ্মণ।
সঙ্খারানং খযং ঞত্বা অকতঞ্ঞূহসি ব্রাহ্মণ॥ ৭।"

---

* শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম-এ মহাশয় সম্পাদিত গৃহী-বিনয় এ সম্বন্ধে উপাদেয় গ্রন্থ

অর্থাৎ,—"যাঁহার আধ্যাত্মিক চক্ষু ইত্যাদি ছয় আয়তন (এই যে পার) এবং বাহির রূপাদি ছয় আয়তন (এই যে অপার) অহঙ্কার এবং মমাকার নাই, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।" ১। ধ্যানশীল, রজোমুক্ত, একাকী অবস্থিত, কর্ত্তব্যানুষ্ঠায়ী, পাপবিমুক্ত এবং অর্হৎপদপ্রাপ্ত লোককে আমি ব্রাহ্মণ বলি। ২। যাঁহার কায়, মন ও বাক্য এ তিন স্থানে পাপ নাই; যিনি অতিশয় সংযমশীল,—সেই লোককে আমি ব্রাহ্মণ বলি। ৩। জটাজুট পরিধান দ্বারা, গোত্র দ্বারা এবং জাতি দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না; কিন্তু যিনি ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও শুচি, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ৪। যিনি অতি প্রগাঢ় জ্ঞানী, মেধাবী, সত্যাসত্য পথের সূক্ষ্মদর্শী এবং যিনি উত্তম-পদ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। ৫। যাঁহার রাগ, দ্বেষ, মান ও অকপট সূচ্যগ্রস্থিত সর্ষপের ন্যায় পতিত হইয়াছে, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি। ৬। হে ব্রাহ্মণ! পরাক্রম দ্বারা তৃষ্ণা-স্রোতের গতিরোধ করিয়া কামনা-সমূহ পরিত্যাগ কর। হে ব্রাহ্মণ! তুমি পঞ্চস্কন্ধসমূহের বিনাশ অবধারণ করিয়া নির্ব্বাণ-পদ জ্ঞাত হও।"

স্থবিরের ও ভিক্ষুর কিরূপ শীলগুণসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী নীতিতত্ত্ব নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—

"ন তেন থেরো হোতি যেনস্স পলিতং সিরো,
পরিপক্কো বয়ো তস্স মোঘ জিন্নোতি বুচ্চতি। ১।
যম্‌হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ অহিংসা সঞ্ঞমো দমো,
সবে বন্তমলো ধীরো থেরোতি পবুচ্চতি। ২।"

পলিত কেশে শির শুভ্রবর্ণ ধারণ করিলেই কেহ স্থবিরপদবাচ্য হয় না। বয়সে পরিপক্ক বলিয়া সে বৃথা জীর্ণ (বৃদ্ধ) নামে কথিত হয়। সে স্থবিরপদবাচ্য হইবার উপযুক্ত নহে। ১। যিনি চতুরার্য্য সত্য ও নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্ম সম্যক্ জ্ঞাত আছেন, হিংসা পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রী আদি ভাবনায় রত থাকেন, ভিক্ষুগণের জন্য ভগবান্ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট শীল (চরিত্র বিশুদ্ধির নিয়ম) সমূহ প্রতিপালন ও ইন্দ্রিয় দমন করিয়া পাপমলহীন হইয়াছেন এবং যিনি পাণ্ডিত্যগুণেও বিভূষিত হইয়াছেন, তিনিই স্থবির (থের) পদবাচ্য হইবার উপযুক্ত।"

"হত্থসঞ্ঞতো পাদসঞ্ঞতো বাচায সঞ্ঞতে সঞ্ঞতুত্তমো।
অজ্‌ঝত্তরতো সমাহিতো একো সন্তুসিতো তমাহু ভিক্‌খুং॥ ১।
সব্বসো নাম রূপস্মিং যস্স নত্থি মমায়িতং,
অসতা চ ন সোচতি সবে ভিক্‌খুতি বুচ্চতি। ২।
তত্রায়মাদি ভবতি ইধ পঞ্ঞস্স ভিক্খুনো,
ইন্দ্রিয়গুত্তী সন্তুট্‌ঠী পাতিমোক্‌খে চ সংবরো।
মিত্তে ভজস্সু কল্যাণে শুদ্ধাজীবে অতন্দ্রিতে॥ ৩।
বস্‌সিকা বিয পুপ্‌ফানি মদ্দবানি পমুঞ্চতি।
এবং রাগঞ্চ দোসঞ্চ বিপ্পমুঞ্চেথ ভিক্‌খবো॥ ৪।

সন্তকাযো সন্তবাচো সন্তবা সুসমাহিতো।
বন্ত লোকামিসো ভিক্‌খু উপসন্তোতি বুচ্চতি॥" ৫।

অর্থাৎ,—"যাঁহারা হস্ত পদ ও বাক্যকে সংযত করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রধান সংযমী। সেই সংযতোত্তম আধ্যাত্মিক বিষয় চিন্তনে রত সমাধিসম্পন্ন সঙ্গরহিত ও সন্তুষ্টচিত্ত লোকই ভিক্ষু নামে অভিহিত হন। ১। সমস্ত বাহ্য ও মানসিক বিষয়ে যাঁহার আসক্তি নাই, সেই সকল বিষয়ের ক্ষয়েও যিনি শোক করেন না, তাঁহাকেই ভিক্ষু বলিয়া জানিবে। ২। ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তসন্তোষ ও শীলাদি ধর্ম্ম প্রতিপালন, ইহাই প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ভিক্ষুর আদি কর্ত্তব্য। আর যাঁহার জীবিকা পবিত্র, যিনি নিরালস্য ও কুশলবর্দ্ধক, এরূপ মিত্রের সেবা কর। ৩। যেমন পুষ্পিত বৃক্ষসকল ম্লান পুষ্প ত্যাগ করে, সেইরূপ ভিক্ষুগণও রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিবেন। ৪। যে শান্ত দেহ, শান্ত বাক্য, শান্তচিত্ত (যিনি দৈহিক, বাচনিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ পাপ হইতে বিরত) ও সমাধিসম্পন্ন ভিক্ষু সংসারাভিলাষ সকল উদ্গীরণ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাকেই উপশান্ত (নির্ব্বাণপ্রাপ্ত) বলিয়া জানিবে। ৫।"

শ্রমণ, ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষুগণ—কি কার্য্যের ফলে প্রতিষ্ঠান্বিত হন, তৎসম্বন্ধে কত কথা কত ভাবে পরিব্যক্ত। একস্থলে (ধম্মপদ—দণ্ডবগ্‌গে) আছে,—

'ন নগ্‌গ চরিয়া ন জটা ন পঙ্কা নানাসকা থণ্ডিল সায়িকা বা।
রজো বা জল্লং উক্কুটিকপ্পাধানং সোধেন্তি মচ্চং অবিতিন্নকঙ্খং।
অলঙ্কতো চেপি সমং চরেয্য সন্তো দন্তো নিয়তো ব্রহ্মচারী।
সব্বেসু ভূতেসু নিধায় দণ্ডং সো ব্রাহ্মণো সো সমনো স ভিক্‌খু।'

অর্থাৎ,—'নগ্নচর্য্যা কিম্বা জটা কিম্বা পঙ্ক কিম্বা অনশন কিম্বা স্থণ্ডিল শয়ন কিম্বা ধূলিমর্দ্দন কিম্বা নিশ্চলভাবে অবস্থিতি, কিছুই অতৃপ্তাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিকে শোধন করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অলঙ্কৃত হইয়াও শান্ত দান্ত নিয়ত ও ব্রহ্মচারী হন এবং সকল প্রাণীর উপর অত্যাচার হইতে বিরত হইয়া শম আচরণ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ, তিনিই ভিক্ষু।'

জনশিক্ষাপ্রদ নীতিবাক্য।

আর আর নীতি-কথার মধ্যে প্রতি জনের প্রতিপাল্য কতকগুলি নীতি-বাক্যের পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক মনে করি। সে সকল নীতি সমাজের সকলের কণ্ঠমালা-রূপে শোভমান থাকা আবশ্যক। একটী নীতির মর্ম্ম এই যে,—'অক্রোধ দ্বারা অর্থাৎ ক্ষমাগুণ দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুতার দ্বারা অসাধুকে বশীভূত করিবে, দানের দ্বারা কৃপণকে এবং সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে পরাজিত করিবে। অন্য আর একটী নীতি-বাক্যে প্রকাশ,—"শত্রুতা শত্রুতার দ্বারা নিবারিত হয় না, শত্রুতাকে মিত্রতার দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে; সনাতন ধর্ম্ম বলিতে ইহাই বুঝায়।' অপিচ, 'সংগ্রামে সহস্র সহস্র মনুষ্যকে জয়লাভ করিলেও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বীর বলা যায় না; কিন্তু যিনি আত্মজয়ে সমর্থ, তিনিই শ্রেষ্ঠ বীর।' যথা,—

"অক্কোধেন জিনে কোধং, অসাধুং সাধুনা জিনে;
জিনে কদরিয়ং দানেন, সচ্চেন অলীকবাদিনং।

নহি বেরেন বেরানি সম্মস্তিধ কুদাচনং।
অচেচেন চ সম্মন্তি এস ধর্ম্মো সনন্তনো!
যো মহস্‌সং সহস্‌সেন সঙ্গামে মানুষে জীনে,
একঞ্চ জেয্যমত্তানং সবে সঙ্গাম জুত্তমো।"

যে অহিংসা পরম ধর্ম্মের উপর বৌদ্ধনীতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত, এ ক্ষেত্রে তাহারও কয়েকটি পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। যথা,—

'সব্বপাপস্‌স অকরণং কুশলস্‌স উপসম্পদা।
সচিত্ত পরিয়োদপনং এতং বুদ্ধানুসাসনং॥'
সোয়্যথাপি নাম একং পুগ্‌গলং প্রিয়ং মনাপতে।
দিস্বা মেত্তায়েয়্য, এবমেব সব্বে সত্তে মেত্তায় চরতি।
মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে।
এবম্পি সব্ব ভূতেষু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
এবঞ্চ সত্তা জানেয়্যুং দুক্‌খায়ং জাতি সম্ভবো,
ন পাণো পাণিনং হঞ্‌ঞে, পাণঘাতীতি সোচতীতি।"

অর্থাৎ,—'শুধু পাপ হইতে বিরত ও নিজের চিত্ত নির্ম্মল রাখিলেই হইবে না; জগতের মঙ্গল, বিশ্বের হিতকামনাও করিতে হইবে। 'লোকে যেমন কোনও প্রিয় ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া মৈত্রী করিয়া থাকে, এইরূপ সমস্ত জীবকে মৈত্রীর দ্বারা প্রকাশিত করিতে হইবে। প্রাণী হইয়া প্রাণি-হত্যা করিলে অনুশোচনার অবধি থাকে না। উহাই জন্ম ও দুঃখের হেতুভূত, নিশ্চয় জানিবে।'

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় যে কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দৃষ্ট হয়, কাম্য কর্ম্ম পরিবর্জ্জনই যে মোক্ষের হেতুভূত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত আছে; বুদ্ধোক্তিতে তাহার প্রতিধ্বনি দেখি। যথা;—

"পুত্তামহত্থি ধনমহত্থি ইতি বালো বিহঞ্‌ঞতি।
অত্তা হি অত্তনো নত্থি কুতো পুত্তো কুতো ধনং॥ ১।
নত্থি রাগসমো অগ্‌গি নত্থি দোষ সমো গহো।
নত্থি মোহসমং জালং নত্থি তণ্‌হাসমা নদী॥ ২।
পুপ্‌ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্ত মনসং নরং।
সুত্তং গামং মহবোহব মচ্চু আদায় গচ্ছতি॥ ৩।
সকিকেলেসো মহারাজ পটিসন্দহতি।
নিক্‌কিলেসো ন পটিসন্দহতীতি॥ ৪।
ন তং দলহং বন্ধনমাহু ধীরা যদায়সং দারুজং পব্‌বজঞ্চ।
সারত্তরত্তা মণিকুণ্ডলেসু পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেক্‌খাঃ॥
সরিতানি সিনেহিতানী চ সোমনস্‌সনি ভবন্তি জন্তুনো।
তে সাতসিতা সুখেসিনো তে বে জাতি জরূপগানরা॥ ৬।
তঞ্চ কম্মং কতং সাধু যং কত্বা নানুতপ্পতি।
যসস পতীতো সুমনো বিপাকং পটিসেবতি॥ ৭।

মুঞ্চ পুরে মুঞ্চ পচ্ছতো মজ্‌ঝে মুঞ্চ ভভস্‌স্‌ পারগূ।
সব্বথ বিমুত্তমান সো ন পুন জাতিজরং উপোহিসি॥" ৮।

অর্থাৎ,—"আমার পুত্র আছে, আমার ধন আছে, মূর্খেরাই এই চিন্তা করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করে। যখন আপনিই আপনার নহে, তখন পুত্র কিম্বা ধন কিরূপে আপনার হইবে? ১। আসক্তির ন্যায় অগ্নি নাই, বিদ্বেষের ন্যায় হিংস্র জন্তু নাই, মোহের ন্যায় জাল নাই, তৃষ্ণার সমান নদী নাই। ২। ক্লেশ অর্থাৎ তৃষ্ণা কামাদি আসক্তি যাঁহার থাকে, তিনিই জন্মগ্রহণ করেন; আর যাঁহার আসক্তির বিনাশ হয়, তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ৩। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ লৌহ, কাষ্ঠ বা তৃণনির্ম্মিত বন্ধনকে দৃঢ় বলিয়া বর্ণন করেন না, মণিকুণ্ডল, পুত্রপত্নী ইত্যাদিকে সারবান্ পদার্থ মনে করিয়া সেই সকলের প্রতি যে আসক্তি, পণ্ডিতেরা তাহাকেই দৃঢ়বন্ধন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ৪—৫। দেহীর পক্ষে সুখ অতি স্নিগ্ধ বলিয়া বোধ হয়। যে সর্ব্ববস্তুতেই সুখ অন্বেষণ করে, এই প্রকারের মনুষ্যেরাই সুখ-স্রোতনিমগ্ন সুখান্বেষী হইয়া বারম্বার জন্ম ও জরা ভোগ করিয়া থাকে। ৬। যে কার্য্য করিলে লোকের অনুতাপ করিতে হয় না এবং যাহার ফল আনন্দে ও প্রফুল্ল মনে গ্রহণ করিতে পারা যায়, সেই কর্ম্মই ভাল। ৭। সম্মুখে, পশ্চাতে বা মধ্যভাগে তোমার যাহা কিছু আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া সংসারের পরপারে গমন কর। সর্ব্বপ্রকারে বিমুক্ত চিত্ত হইলে পুনরায় তোমাকে আর জন্ম জরা ভোগ করিতে হইবে না। ৮।"

"মা পিয়েহি সমাগচ্ছি অপ্‌পিয়েহি কুদাচনং।
পিয়ানং অদস্‌সনং দুক্‌খং অপিপয়ানঞ্চ দস্‌সন॥ ১।
অত্তনাহব কত্তং পাপং অত্তজং অত্তসম্ভবং।
অভিমন্থতি দুম্মেধং বজিরং ব মহ্‌মং মণিং॥ ২।
যথাপি পুপ্‌ফ রাসিম্‌হা করিয়া মালাগুণে বহু।
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং॥" ৩।

অর্থাৎ,—"প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় বস্তুর সহিত কখনও সঙ্গত হইবে না, প্রিয় বস্তুর অদর্শন বা অপ্রিয় বস্তুর দর্শন উভয়ই দুঃখজনক। ১। হীরক যেমন প্রস্তরময় মণিকে খণ্ড খণ্ড করে; আত্মকৃত, আত্মজ ও আত্মসম্ভব পাপ সেইরূপ নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে মথিত করে। ২। যেমন রাশিকৃত পুষ্প হইতে অনেক প্রকার মালা গাঁথা যাইতে পারে, তেমনি যে মানব জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার দ্বারা অনেক সৎকর্ম্ম সাধিত হইতে পারে।" ৩।

বুদ্ধদেব যে শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল কথা—কামনাত্যাগ, তৃষ্ণাত্যাগ। তিনি পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন,—দুঃখের কারণ তৃষ্ণা, আর সেই দুঃখ নিরোধের মূল—তৃষ্ণাত্যাগ। ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—

"যো তস্‌সা এব তণ্‌হায় আসেসবিরাগনিরোধো
চাগো পটিনিস্‌সগ্‌গো মুত্তি অনালয়ো।"

অর্থাৎ,—তৃষ্ণার যে নিরোধ, বিরাগ, ত্যাগ বা বিসর্জ্জন, তাহাই মুক্তি ও তাহাই দুঃখ-নিরোধ। কেহ কেহ বলেন,—বুদ্ধদেবের শিক্ষার ইহাই অভিনবত্ব। শিক্ষা অভিনব,

তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে, ঐ শিক্ষা যে হিন্দুধর্ম্মের—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের এক সার শিক্ষা, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তৃষ্ণাত্যাগেরই চরম আদর্শ। উপনিষদও তারস্বরে সেই শিক্ষাই প্রদান করিয়া গিয়াছেন,—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ইতি॥"

* * *

উপাসনা।

[বৌদ্ধধর্ম্মে পূজা উপাসনা,—এক শ্রেণীর বিশ্বাস, বুদ্ধদেব পূজা উপাসনার বিরুদ্ধ ছিলেন,—বৌদ্ধধর্ম্মে পূজা-উপহার প্রথা,—মিলিন্দ ও নাগসেনের প্রশ্নোত্তরে তাহার অভিব্যক্তি,—তৎসম্বন্ধে বুদ্ধদেবের নিজের উক্তি।]

বৌদ্ধধর্ম্মে পূজা-উপাসনা।

বুদ্ধদেবের বিদ্যমান কালে তাঁহার শিষ্যগণ যে কোনরূপ পূজা পদ্ধতির অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, অথবা তখন যে কোনও উৎসব বা উপাসনার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন না। পরন্তু বুদ্ধদেব পূজা উপাসনা বিষয়ে বিরুদ্ধবাদী ছিলেন বলিয়াই বিঘোষিত হয়। কথিত হয়, আত্মোৎকর্ষ এবং আত্মোন্নতিসাধনই তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি; বাহ্যপূজা ও উপাসনা প্রভৃতির সহিত সে ধর্ম্মের সম্বন্ধাভাব। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ যে দুই বিভাগ আছে, এই হিসাবে বৌদ্ধধর্ম্ম তাহারই শেষোক্ত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তখন কেবল সময়ে সময়ে ভিক্ষুগণের ও সাধারণ বৌদ্ধগণের সম্মিলনে আত্মোৎকর্ষসাধন বিষয়ে উপদেশাদি মাত্র প্রদত্ত হইত। নচেৎ, কোনরূপ পূজা উপাসনার সহিত তখন কোনও সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের পর তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। তখন, যে বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের আশ্রয়ভূত স্থানটী তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী আসিয়া, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-ক্ষেত্রে গয়াধামে সমবেত হইয়া, সেই বৃক্ষমূলে পুষ্পাদি নৈবেদ্য প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে, অল্পদিনের মধ্যেই গয়াধাম বৌদ্ধদিগের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। বৌদ্ধদিগের তীর্থস্থান সেই অংশ এখন বুদ্ধগয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ প্রথমে তত্রত্য দশটী ক্ষেত্রে সমাহিত হইয়াছিল, এবং সেই সকল সমাধির স্থানে-বৃহৎ স্তূপ-সমূহ নির্ম্মিত হয়। সেই সকল স্তূপকে 'দাগোবা' বলে। বোধিবৃক্ষের নিকট যে দশটী দাগোবা নির্ম্মিত হইয়াছিল, কালক্রমে সে কয়টীও তীর্থস্থান মধ্যে পরিগণিত হয়। অল্প দিন মধ্যেই বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি-সমূহ নির্ম্মিত হয় এবং তিনি দেবতা-রূপে পূজিত হইতে থাকেন। দেবদেবীর যে পূজা-পদ্ধতি বৌদ্ধধর্ম্মে প্রথমে স্থান পায় নাই, দৃঢ়-ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। কেবল বুদ্ধদেব বলিয়া নহেন; কালক্রমে, তাঁহার দেবত্বের ও পূজার অধিকারী হন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বহু মন্দিরাদি নির্ম্মিত হ কর্ম্মমার্গের অনুসারী হইয়া পড়ে। তখন কর্ম্মমার্গের ও জ্ঞানমার্গের দুই মা লইয়া বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। ফলে, উভয় পথেই বৌদ্ধধর্ম্ম পরিপুষ্ট হইতে

'মিলিন্দ প্রশ্নে' রাজা মিলিন্দের ও নাগসেনের প্রশ্নোত্তরে বুদ্ধদেবের দেবত্ব ও পূজা গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। সে আলোচনায় বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে পূজা প্রদানের সার্থকতা ও অসার্থকতা বিষয়ে সারতত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। রাজা মিলিন্দ বলেন,—"বুদ্ধদেব যদি নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি পূজা গ্রহণ করিবেন কি প্রকারে? নির্ব্বাণ অবস্থায় যখন সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, তখন এ সম্বন্ধ কি প্রকারে থাকিতে পারে? অবিশ্বাসী জন এবম্বিধ বিতর্ক প্রায়ই উত্থাপন করিয়া থাকে। যদি তিনি পূজা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি এখনও পার্থিব পদার্থের সহিত সংশ্রবযুক্ত; সুতরাং বিদ্যমান আছেন, স্বীকার করিতে হয়। পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিলে পার্থিব গুণ-ধর্ম্মও তাঁহাতে আছে না মানিয়া থাকিতে পার যায় না। সুতরাং তাঁহার সহায়তা লাভের আশা বৃথা। তিনি যদি নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন, পৃথিবীর সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধও নাই, তাঁহার বিদ্যমানতাও নাই; সুতরাং তাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত পূজা তিনি কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না। অতএব তাঁহার পূজায় কোনই ফল নাই; কেন-না, তাঁহার প্রাণ নাই, তিনি প্রাণী নহেন। অর্হৎগণ ভিন্ন এ বিতর্কের মীমাংসা কেহই করিতে পারিবেন না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ সমস্যার সমাধান করিয়া দেন।"

বৌদ্ধধর্ম্মে পূজা-উপহার প্রথা।

নাগসেন কহিলেন,—"বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। বিদ্যমানতার সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই। বোধিবৃক্ষমূলে যে সকল উপহার প্রদত্ত হয়, তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। যখন তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, তখনই তাঁহার সকল কামনা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে; তখনই তাঁহার নির্ব্বাণ লাভ ঘটিয়াছে। সুতরাং সে হিসাবে বুদ্ধদেব পূজা গ্রহণ করেন না? তবে এক হিসাবে বলিতে পারি, পার্থিব পদার্থের সহিত সংশ্রবশূন্য থাকিয়াও বুদ্ধদেব পূজা গ্রহণ করিতে পারেন।"

রাজা মিলিন্দ কহিলেন,—"পিতা পুত্রের প্রশংসা করে; পুত্রও পিতার প্রশংসা করে; সুতরাং অবিশ্বাসী জনের নিকট সে প্রশংসার যৌক্তিকতা মান্য হয় না। সকলেই আপনার প্রশংসা করে। সুতরাং অবিশ্বাসী জনকে বিশ্বাস করান যাইতে পারে,—এরূপ কোনও যুক্তি অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদর্শন করুন।"

নাগসেন কহিলেন,—"বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। মনুষ্য তাঁহাকে যে পূজা প্রদান করে, তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। তথাপি যাঁহারা বুদ্ধের দেহাবশেষ উদ্দেশে পূজা প্রদান করেন, অথবা যাঁহারা তাঁহার উপদেশ-সমূহ শ্রবণ করেন, তাঁহারা ভগবানের ত্রিবিধ প্রধান অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন,—'(১) পার্থিব সুখ, (২) দেবলোকের সুখ, (৩) নির্ব্বাণের সুখ। যখন কোনও তৃণ বা কাষ্ঠখণ্ড প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন তাহা গ্রহণে অগ্নির কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে কি?"

রাজা মিলিন্দ কহিলেন,—"অনলের মন নাই; সুতরাং আকাঙ্ক্ষাবশে কিছু গ্রহণ করিতে পারে না।"

নাগসেন কহিলেন,—"চিত্ত না থাকিলেও, কামনা না থাকিলেও যে অনল তৃণ-

কাষ্ঠ গ্রাস করিতে সমর্থ, সে অনল যদি নির্ব্বাপিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবী কি অনল শূন্য হইবে ?"

মিলিন্দ কহিলেন,—"না; যে কেহ অনল লাভে ইচ্ছা করিবে, দুই খণ্ড কাষ্ঠের ঘর্ষণে অনল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইবে।"

নাগসেন কহিলেন,—"সেইরূপ যাহারা বলে, বুদ্ধদেবের উদ্দেশে পূজা প্রদানে কোনও ফল নাই; তাহাদের বাক্য ভিত্তিহীন। বুদ্ধদেব যখন পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার তাৎকালিক গৌরব-গরিমা অত্যুজ্জ্বল অনল-শিখার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু অগ্নিশিখা যেমন আকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়াও তৃণ-কাষ্ঠাদি ভস্মীভূত করে; সেইরূপ বুদ্ধদেব যদিও তাঁহার উপাসকগণের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করেন না; কিন্তু সে সকল পূজার পুরস্কার অবশ্যই আছে। মানুষ যেমন দুই খণ্ড কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদনে সমর্থ হয় এবং সেই অগ্নির সাহায্যে যথেচ্ছ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, ধর্ম্মে বিশ্বাসবান উপাসকগণও সেইরূপ বুদ্ধদেবের উদ্দেশে পূজা প্রদান করিয়া এবং তদীয় ধর্ম্মের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়া, পুরস্কার লাভ করিতে পারে; আর তদ্দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এ বিষয়ে আরও একটী উপমার অবতারণা করিতে পারি। প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইল, বৃক্ষসমূহকে প্রকম্পিত ও ভূপাতিত করিল। তার পর, সে বাত্যার অবসান হইল। এইরূপে চলিয়া গিয়া, বায়ু-প্রবাহ আবার যদি ফিরিয়া আসে, তাহাকে কি তাহার ইচ্ছার কার্য্য বলিব ?"

রাজা কহিলেন,—"তাহা কখনই বলিতে পারি না। কেন-না, বায়ু-প্রবাহের চিত্তবৃত্তি নাই।"

নাগসেন কহিলেন,—"বায়ু-প্রবাহ নিরুদ্ধ হইবার সময় সে কি পুনরাগমনের কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় ?"

মিলিন্দ কহিলেন,—"না, তবে বায়ুর আবশ্যক হইলে যে কেহ পাখা পরিচালনায় বায়ু উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়। উত্তাপ পাইলে, এই উপায়ে মানুষ শীতলতার সঞ্চার করে।"

নাগসেন কহিলেন,—"এইরূপ, যে সকল অবিশ্বাসী মনে করে যে, বুদ্ধদেবের উদ্দেশে পূজা প্রদানে কোনও উপকার নাই, তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিবেন। বায়ু যেমন আপনা আপনি চারি দিকে বিস্তৃত হয়, বুদ্ধদেবের গুণধর্ম্ম সেইরূপ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। যে বায়ু প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনরুৎপত্তি নাই; সেইরূপ বুদ্ধদেবের উদ্দেশে প্রদত্ত পূজা তৎকর্ত্তৃক গৃহীত হয় না। উত্তাপ যেমন মনুষ্যের বিরক্তিকর; কামনা, ঈর্ষা ও অজ্ঞতারূপ ত্রিবিধ পাপাগ্নি সেইরূপ দেবগণের ও মনুষ্যগণের ক্লেশপ্রদ। মনুষ্যগণ যেমন উত্তাপ-ক্লিষ্ট হইলে কোনও উপায়ে বায়ু সঞ্চালনে শান্তি লাভ করে, বুদ্ধদেবের আশ্রয় অনুসন্ধানে মানুষ চিরশান্তি লাভ পক্ষে সেইরূপ করিয়া থাকে। যদিও বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন; যদিও তদুদ্দেশে উৎসৃষ্ট উপহার তিনি গ্রহণ করেন না; তথাপি, তাঁহার অনুসরণে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পাপাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। আর একটী উপমায় বিষয়টী বিশদীকৃত করা যায়। মনে করুন, কেহ অহঙ্কারে আঘাত

করিলেন। তদ্দ্বারা একটা শব্দ উৎপন্ন হইল এবং কিছুক্ষণ পরে সে শব্দ লোপ পাইল। যে শব্দ একবার উৎপন্ন হইল; ঠিক সেইটী কি পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে?"

মিলিন্দ কহিলেন,—"না; যে শব্দ একবার চলিয়া যায়, একই মনুষ্য পুনঃপুনঃ জয়-ঢক্কায় আঘাত করিলেও সে শব্দটী আর ফিরিয়া আসে না।"

নাগসেন কহিলেন,—"বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ বিষয়েও এইরূপ জানিবেন। তিনি কোনও উপহার গ্রহণ না করিলেও তাঁহার উদ্দেশে পূজা প্রদান করিয়া এবং তাঁহার উপদেশ-সমূহ অনুধ্যান করিয়া মানুষ উপকৃত হইতে পারে। এ বিষয়ে বুদ্ধদেবের ভবিষ্যদর্শন ছিল। তিনি আনন্দকে একদিন বলিয়াছিলেন,—'আনন্দ, আমি যখন চলিয়া যাইব, অর্থাৎ নির্ব্বাণ-লাভ করিব, তখনও তুমি মনে করিও না যে, এ পৃথিবীতে বুদ্ধ নাই। যে সকল উপদেশ আমি প্রদান করিয়াছি এবং যে সকল নীতিকথা মৎকর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে; তৎসমুদায়কে আমার উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিবে। তোমা-দের নিকট তাহারাই বুদ্ধস্থানীয়।' অতএব, যাঁহারা বলেন—বুদ্ধদেবের উদ্দেশে পূজা-প্রদান অভিবাদন নিষ্ফল, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপ মিথ্যা কহিয়া থাকেন। তিনি পূজা গ্রহণ না করুন; কিন্তু তিনি বিদ্যমানে পূজাকারী যে ফল প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহার অবিদ্যমানেও সেই ফল লাভ করিতে পারেন।"

* * *

বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ।

[বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্ন,—সঙ্ঘভুক্ত হওয়াই ধর্ম্ম গ্রহণের প্রধান লক্ষ্য;—বৌদ্ধ সঙ্ঘের মূল,—সঙ্ঘভুক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাদি প্রতিপাল্য বিষয় সমূহ;—ভিক্ষুগণের প্রতিপাল্য কঠোর বিধিবিধান;—সঙ্ঘে ভণ্ডের প্রবেশ,—অশোক কর্ত্তৃক ভণ্ডদলন চেষ্টা।]

বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—এই তিন লইয়াই বৌদ্ধধর্ম্ম। ঐ 'ত্রি রত্ন' বৌদ্ধধর্ম্মের দেহ, মন ও প্রাণ; অথবা ঐ তিনকে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, প্রাণ সমস্তই বলা যায়। যাহার ঐ তিনটী নাই, সে কখনও বৌদ্ধ হইতে পারে না। এই ত্রি-রত্নের বা ত্রি-তত্ত্বের বিষয়, আমরা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি-য়াছি। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইলে, দীক্ষাগ্রহণকারীকে ভিক্ষুগণের সমক্ষে প্রথমেই ঐ তিন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে;—বলিতে হইবে, 'আমি বুদ্ধের শরণ লইলাম, আমি ধর্ম্মের শরণ লইলাম, আমি সঙ্ঘের শরণ লইলাম।' দীক্ষাগ্রহণকারীর ঐ ত্রিবিধ প্রতিজ্ঞার মধ্যে শেষোক্ত প্রতিজ্ঞাই তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের প্রধান প্রকাশ্য পরিচয়। 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'—এই প্রতিজ্ঞার সহিত অন্তরের সম্বন্ধ; 'ধর্ম্মের শরণ লইলাম'—এই প্রতিজ্ঞার সহিত কতকটা কর্ম্মের সংশ্রব থাকিলেও অন্তরের সম্বন্ধই অধিক। কিন্তু 'সঙ্ঘের শরণ লইলাম' এই প্রতিজ্ঞার সহিত বাহ্য সম্বন্ধ বড়ই অধিক। এই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব সম্বন্ধ সংশ্রব ছিন্ন করার আবশ্যক হইবে; অশন-বসনের পরিবর্ত্তন ঘটিবে; গৃহ-সংসার পরিত্যাগ করিতে

বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্ন।

হইবে; কায়মনোবাক্যে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধ্য সংযম-সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাই অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্ঘের প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। 'সঙ্ঘ' শব্দে ভিক্ষুদিগের শ্রেণী বা পর্য্যায় বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্ঘভুক্ত হইলেই ভিক্ষু শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হওয়া হইল, বৌদ্ধ হওয়া হইল,—ইহাই বলিতে পারা যায়। এই সঙ্ঘ-সৃষ্টি বৌদ্ধধর্ম্মের অভিনবত্ব।

ভারতবর্ষে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি বিবিধ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বহুদিন হইতে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্ঘভুক্ত ভিক্ষুগণকে নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বুদ্ধদেব চেষ্টান্বিত হন। যখনই যে কাজে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ও ব্যভিচার দেখিতেন, বুদ্ধদেব তখনই তাহার প্রতিবিধানার্থ কঠোর বিধি বিধান প্রবর্ত্তন করিতেন। তাহারই ফলে, ভিক্ষু-সম্প্রদায় নিয়মের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে সময়ে বুদ্ধদেব কঠোর নিয়মে ভিক্ষু-সম্প্রদায়কে আবদ্ধ করেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষে বহু ভণ্ড সন্ন্যাসীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আর সেই সকল সন্ন্যাসী অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সকল সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় হইতে আপন সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বুদ্ধদেব অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ভিক্ষুমাত্রকেই বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের আশ্রয়-গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয়, মস্তকমুণ্ডন পূর্ব্বক হরিৎ বর্ণের পরিচ্ছদে আবৃত হইতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে দশটী প্রতিজ্ঞা পালনে সঙ্কল্প করিতে হয়। 'আমি বুদ্ধের শরণ লইলাম, আমি ধর্ম্মের শরণ লইলাম, আমি সঙ্ঘের শরণ লইলাম,—এই তিন প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুকে সঙ্কল্প করিতে হয়,—'(১) আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কখনও প্রাণিহত্যা করিব না; (২) আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কখনও চুরি করিব না; (৩) আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ব্যভিচার হইতে বিরত থাকিব; (৪) আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কখনও মিথ্যাকথা কহিব না; (৫) আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কখনও মাদকদ্রব্য গ্রহণ করিব না; (৬) আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, নিষিদ্ধ সময়ে আহার করিব না; (৭) আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি গীত বাদ্য নৃত্য ও অভিনয় কার্য্য হইতে সর্ব্বদা বিরত থাকিব; (৮) আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি কখনও মাল্যগন্ধদ্রব্য অথবা বসন-ভূষণ ব্যবহার করিব না; (৯) আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কখনও উচ্চ বা বিস্তৃত শয্যায় শয়ন করিব না; (১০) আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি কখনও স্বর্ণ বা রৌপ্য স্পর্শ করিব না।' ত্রিশরণ গ্রহণের পর উক্ত দশবিধ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলে, বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রহণাভিলাষী আশ্রয় পাইতেন। কিন্তু তখনও তিনি ভিক্ষুর অধিকার পাইতেন না। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের দুইটী স্তর নির্দ্দিষ্ট আছে; প্রথম স্তরের নাম—'পবজ্জ' (প্রব্রজ্যা); দ্বিতীয় স্তরের নাম—'উপসম্পদ'। পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদির দ্বারা প্রথম স্তরে উপনীত হইয়া, পরে ভিক্ষুকে অর্হতের বা শ্রমণের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইত।* প্রথম অবস্থা—ব্রহ্মচর্য্যের। দ্বিতীয় অবস্থা—সন্ন্যাসের। অনুশীলনাদির দ্বারা উপসম্পদের বা

বৌদ্ধসঙ্ঘের মূল।

সন্ন্যাসের অবস্থায় উপস্থিত হইতে হয়। যদিও বুদ্ধদেব মানব-সমাজের মুক্তির জন্য এই পথ নির্দ্ধারিত করেন; কিন্তু 'ভিক্ষুসম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার পক্ষে অনেকগুলি অন্তরায়ও ছিল। যাহারা পীড়িত বা বিশেষরূপ কোনও দৈহিক বিকলতাপ্রাপ্ত, সঙ্ঘে তাহারা স্থান পাইত না; রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী ব্যক্তির সঙ্ঘে স্থান ছিল না; রাজকর্ম্মচারিগণ বিশেষতঃ সৈনিক পুরুষগণ সঙ্ঘে স্থান পাইত না; ঋণগ্রস্তগণ এবং ক্রীতদাসগণ সঙ্ঘভুক্ত হইতে পারিত না; পিতামাতার আদেশ ভিন্ন কাহারও পুত্রকে সঙ্ঘভুক্ত করা হইত না; বার বৎসরের ন্যূনবয়স্কদিগের সঙ্ঘে স্থান ছিল না; বার বৎসর হইতে বিশ বৎসর বয়স্ক যুবকদিগকে শিক্ষার্থী মধ্যে গণ্য করিয়া লওয়া হইত। ফলতঃ বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও সঙ্ঘে আশ্রয় দেওয়া হইত না। ভিক্ষু মধ্যে গণ্য হইলে, গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হইত, কামিনী কাঞ্চন পরিত্যাগ করিতে হইত। তখন, কিসে নির্ব্বাণ লাভ হয়, কিসে জগতের হিতসাধন হয়, এইমাত্র লক্ষ্য থাকিত। এদিকে ভিক্ষুগণ কেহই স্বাধীন ছিলেন না। নিয়ম-নিবদ্ধ সম্প্রদায়ের নিয়মাবলি প্রতি পদে তাঁহাদিগকে মান্য করিয়া চলিতে হইত। ফলতঃ, সে এক আদর্শ সম্প্রদায়; তাঁহারা জ্ঞানের, সত্যের, নীতির, মঙ্গলের ও মুক্তির উপাসক ছিলেন। সেই পবিত্র নীতিপর জ্ঞানালোকসম্পন্ন ভিক্ষু-সম্প্রদায় এই সংসার-সমুদ্রে নিপতিত বিভ্রান্ত জনগণকে মুক্তি-ক্ষেত্রের পথ প্রদর্শন জন্য সমুদ্রমধ্যস্থিত আলোক-গৃহের ন্যায় বিদ্যমান ছিলেন। পথভ্রান্ত পথিক নিশাকালে নক্ষত্র দেখিয়া যেমন দিঙ্‌নির্ণয় করে; পাপী তাপী জন সেইরূপ সঙ্ঘ ও ভিক্ষুগণকে দেখিয়া আপনাদের শান্তিনিলয়ের সন্ধান পাইয়াছিল। জ্যোতিষ্ক যেমন দিনে দিনে উদিত হইয়া জগৎ আলোকিত এবং মানবহৃদয় পুলকিত করেন, জগজ্জ্যোতি বুদ্ধদেব সঙ্ঘ সংগঠন দ্বারা জগৎকে সেইরূপ পুলকিত করিয়াছেন। সঙ্ঘের যে সকল কঠিন কঠোর নিয়মাবলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; তাহার অধিকাংশই বুদ্ধদেবের নিজের প্রবর্ত্তনা। যখনই যে বিষয়ে একটু ব্যভিচার দেখিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে তখনই কঠোর অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছে। এইরূপে নিয়মের পর নিয়মের প্রবর্ত্তনায়, কঠোরতার পর কঠোরতার বন্ধনে সঙ্ঘ দৃঢ়ীকৃত হয়। প্রথমে ষাট জন মাত্র ভিক্ষু বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুসরণকারী ছিলেন। তাঁহাদের পবিত্রতার আকর্ষণে সহস্র সহস্র ভিক্ষুতে সঙ্ঘ পরিবর্দ্ধিত হয়। শেষে এমন হইয়া আসে যে, পৃথিবীর অসংখ্য জাতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের উপযোগী প্রচারকগণ আবির্ভূত হন। ফলে, পৃথিবীর চারি ভাগের তিন ভাগ অধিবাসী বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণে আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করে। তাই এক সময়ে পৃথিবীতে সঙ্ঘ একটী শক্তি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। স্বয়ং বুদ্ধদেবের অথবা কোনও ভিক্ষু-বিশেষের উপর যে সঙ্ঘের কর্তৃত্ব ভার ন্যস্ত ছিল, তাহা নহে; সঙ্ঘ নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত সাধারণতন্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ব্যক্তি-বিশেষের কর্ত্তৃত্ব কখনই সঙ্ঘকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয় নাই। বুদ্ধদেবের নৈতিক শক্তি ভিক্ষুগণের সমবেত শক্তিতে শক্তি প্রদান করিয়াছিল; আর তাহার দ্বারাই সঙ্ঘ পরিচালিত হইয়া আসিয়াছিল। সঙ্ঘরূপ দেহে ধর্ম্মরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুদ্ধ-রূপ প্রাণ যে ক্রিয়া করিয়া যান, তাহা অতুলনীয়।

ভিক্ষুগণকে কি কঠোর ত্যাগশীলতা অভ্যাস করিতে হইত, তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্য-বিভাগের বিষয় অনুধাবন করিলে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে বোধগম্য হইতে পারে। তাঁহাদের খাদ্য, তাঁহাদের পরিচ্ছদ, তাঁহাদের বাসস্থান, তাঁহাদের ভিক্ষুত্ব, তাঁহাদের প্রতিপাল্য বিধি-নিষেধ—তাঁহাদের ত্যাগশীলতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। বৌদ্ধশাস্ত্রে ভিক্ষুদিগের পালনের জন্য তেরটী বিশেষ বিধি আছে। তাহার একটী বিধির নাম,—'পানমুকুলিকাঙ্গ'। অর্থাৎ,—ভূপতিত পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ডসমূহ সংগ্রহ করিয়া অঙ্গাবরণ বিধি। এ বিধি পালনের পূর্ব্বে ভিক্ষুকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, ভিক্ষু কখনও কোনও গৃহীর নিকট হইতে বস্ত্রাদি গ্রহণ করিবেন না। পরন্তু তাঁহার অঙ্গাবরণ জন্য তাঁহাকে নিম্নলিখিত উপায়ে বস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে ;—(১) কবরস্থানে, বা বাজারে পতিত অথবা জানালা হইতে নিক্ষিপ্ত পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি, (২) সন্তানজন্মের পর স্ত্রীলোকের পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি, (৩) স্নানের পর পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি, (৪) মৃতদেহবহনকারীদের পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি, (৫) পশু, উই বা ইন্দুর কর্ত্তৃক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বস্ত্রাদি. এইরূপে পঞ্চদশবিধ উপায়ে সংগৃহীত বস্ত্রাদি ভিন্ন অন্য বস্ত্র পরিধান করিবার তাঁহাদের নিয়ম ছিল না। বাসস্থান সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রতিপাল্য নিয়মের নাম—'রুখামুলিকাঙ্গ'। ইহার অর্থ,—ভিক্ষুকে বৃক্ষতলে বাস করিতে হইবে। সে বৃক্ষ সম্বন্ধেও নিয়ম ছিল যে, (১) দেশের প্রান্তভাগস্থিত বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে হইবে, (২) যে বৃক্ষে দেবগণ বসতি করেন এবং যে বৃক্ষ জনসাধারণের পূজা প্রাপ্ত হয়, সেই বৃক্ষ ভিক্ষুর বাসযোগ্য, (৩) যে বৃক্ষে আটা উৎপন্ন হয় এবং যে বৃক্ষে খাদ্যোপযোগী ফল জন্মে, ইত্যাদি। এইরূপ আহারের, শয়নের চৈত্য-উপাসনার বিবিধ নিয়ম ভিক্ষুকে পালন করিতে হইত। 'পাতিমোখ' প্রভৃতিতে ভিক্ষুদের প্রতিপাল্য কঠোর নিয়মাবলির পরিচয় পাওয়া যায়।

ভিক্ষুগণের প্রতিপাল্য।

সৎ ও অসৎ, সু ও কু, ভাল ও মন্দ—এই লইয়া সংসার। সুতরাং, যতই কঠিন-কঠোর নিয়মের অধীন করিয়া লওয়া হউক, ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের মধ্যেও সৎ ও অসৎ উভয়-বিধ লোকের সমাবেশ ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের জীবন কালেও সেরূপ কয়েকজন ভণ্ড সন্ন্যাসী যে ভিক্ষুমধ্যে গণ্য না হইয়া-ছিল, তাহা নহে। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের পর তাহাদের দুই এক জনের প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। সুভদ্র সেই দলের অন্যতম। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভে তাঁহার শিষ্যগণ শোক প্রকাশ করিতেছিলেন। সুভদ্র তাহাতে মন্তব্য প্রকাশ করেন,—'মহাপরিনির্ব্বাণ হওয়ায় আমরা মহাশ্রমণের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি। সুতরাং শোকের কারণ কিছুই নাই।' অন্যান্য শ্রমণগণ হইতে তাঁহার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য বুদ্ধদেবকে মহাশ্রমণ নামে অভিহিত করা হইত ; আর তাঁহার নির্ব্বাণলাভ 'মহাপরি-নির্ব্বাণ' বলিয়া কথিত হইত। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যে বুদ্ধ শিষ্য মহাকাশ্যপ (মহাকস্সপ) বড়ই ক্ষুব্ধ হন, এবং যাহাতে বুদ্ধদেব-প্রবর্ত্তিত সঙ্ঘসংক্রান্ত নিয়মাবলি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তজ্জন্য চেষ্টান্বিত হন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের তিন মাস পরে রাজগৃহে যে প্রথম বৌদ্ধসভা (মহাসঙ্গীতি) আহূত হইয়াছিল, তাহা মহাকাশ্যপের সেই চেষ্টার ফল। বুদ্ধদেব

সঙ্ঘে ভণ্ডের প্রবেশ।

যে প্রকার নিয়মশৃঙ্খলে সঙ্ঘকে আবদ্ধ করিয়া যান, তাহা আলোচিত হয়। তদ্বিষয়ে পারদর্শী উপালি কর্ত্তৃক বিনয়পিটক আবৃত্ত হইয়াছিল। কোন্ সময়ে কি কারণে বুদ্ধদেব কি নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া যান, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ তাহা বিবৃত করেন। এইরূপে আনন্দ কর্ত্তৃক সূত্তপিটক এবং অনুরুদ্ধ কর্ত্তৃক অভিধম্মপিটক আবৃত্ত হয়। তাঁহারা উভয়েই ঐ দুই বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু এইরূপে ধর্ম্মের নিয়মাবলি প্রতিপালন পক্ষে চেষ্টা হইলেও বৌদ্ধভিক্ষুসম্প্রদায়ে অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী আশ্রয় লইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের আদর বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী আপনাদের আদর বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধভিক্ষু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সুপ্রতিষ্ঠার দিনে ভণ্ড ভিক্ষুগণের সংখ্যা বড়ই বৃদ্ধি পায়। দুই কারণে উহাদের দলবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। অশোক ব্রাহ্মণগণের এবং হিন্দু-সন্ন্যাসিগণের বিদ্বেষ্টা ছিলেন। পরন্তু তিনি বৌদ্ধভিক্ষুমাত্রকেই সমাদর করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রধানতঃ এই দুই কারণে ভণ্ড সন্ন্যাসীর দল আপনাদিগকে বৌদ্ধভিক্ষু বলিয়া পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের সংযোগে অসৎ লোকের প্রাচুর্য্যে সঙ্ঘের বিধি-বিধান নানাস্থলে শ্লথ হইয়া আসে, এবং সে সংবাদ ক্রমশঃ অশোকের কর্ণগোচর হয়। তিনি তখন ভিক্ষু সম্প্রদায়ের সংস্কার-সাধনে প্রবৃত্ত হন। ফলে, ভিক্ষুগণের পরীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ হয়। মোগ্‌গলীপুত্র তিস্‌স এই সময়ে অশোকের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণকে পরীক্ষা করেন। যে সকল ভিক্ষু, ভিক্ষু-ধর্ম্মের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়, তাহাদিগকে লইয়া এই সময়ে একটী দল সংগঠিত হইয়াছিল। ভণ্ড বলিয়া যাহারা প্রতিপন্ন হয়, তাহারা দণ্ডভোগ করে। পরিশেষে, বিশুদ্ধ ভিক্ষুগণকে লইয়া এক মহাসভার অধিবেশন হয়। সেই মহাসভা তৃতীয় মহাসঙ্গীতি নামে অভিহিত।* তবে অশোক যাঁহাদিগকে ভিক্ষু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারাও সকলেই যে বুদ্ধের অনুশাসন সর্ব্বপ্রকারে পালন করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। বুদ্ধদেবের বিদ্যমান কালে যে কীট ধর্ম্মতরু আশ্রয় করিয়াছিল, কালে তাহাদের বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভিন্ন লোপপ্রাপ্ত হয় নাই। আর তাই বৌদ্ধধর্ম্ম আপন জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। যে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ রত্নত্রয় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণভূত, ক্রমেই তাহা বিপরীত-ভাবাপন্ন হইয়া আসিয়াছিল এবং তদ্দরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই তিনের নিগূঢ় লক্ষ্য যে অতি উচ্চ ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সত্য সত্য যাহারা মনে ও মুখে ঐ তিনের শরণ লইতে পারে, নির্ব্বাণ তাহাদের নিশ্চয়ই অধিগত হয়। ঐ তিনের মধ্যেই সকল তত্ত্ব নিহিত আছে। ঐ তিনে বৌদ্ধধর্ম্মের একটী বিশেষত্বের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অন্য ধর্ম্মে যেমন পরলোক ফলপ্রদ, বৌদ্ধধর্ম্ম ইহলোকেই সে ফল প্রদান করে। বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ—এই তিনের মধ্যে সেই ফল প্রত্যক্ষীভূত। বুদ্ধকে ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সঙ্ঘ সরলভাবে চলিয়া থাকে বলিয়া সঙ্ঘের কয়েকটী বিশেষণ প্রযুক্ত হয়। সঙ্ঘ—'সুপটিপন্ন' অর্থাৎ সুপ্রতিপন্ন, 'উজুপটিপন্ন' অর্থাৎ ঋজুপ্রতিপন্ন ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ সর্ব্বত্রই সরল ভাব

* এই খণ্ডের ৩২৪ পৃষ্ঠায় প্রথম বৌদ্ধসঙ্ঘের বিষয় কিছু কিছু লেখা হইয়াছে।

অভিব্যক্ত। সুতরাং সকলের জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের পথ উন্মুক্ত। বিচারপূর্ব্বক স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বুদ্ধদেব আপন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সকলকে উপদেশ দেন। এইজন্য তাঁহার এক নাম—"এহি পস্‌সিকো ;" অর্থাৎ—'এস, দেখ, বুঝিয়া লও' এই বলিয়া তিনি আপন ধর্ম্ম গ্রহণে জনসাধারণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের ও সঙ্ঘের দ্বার তাই সকলের জন্যই উন্মুক্ত হইয়াছিল।

* * *

বুদ্ধদেবের গার্হস্থ্য-জীবন।

[বুদ্ধদেবের জন্মলক্ষণ ;—লুম্বিনী বনে তাঁহার জন্ম ;—জন্মকালে তাঁহার অলৌকিক ব্যাপার ;—শিশুর অলৌকিক দর্শন ;—কুমারের ধ্যান-নিবিষ্টতা ;—নামকরণ ও ভবিষ্য লক্ষণ ;—রাজার সতর্কতা ;—কুমারের বিবাহ-বন্ধন,—কুমারের বিদ্যাবত্তার পরীক্ষা ;—মূর্ত্তিমান জরাব্যাধি দর্শনে কুমারের গৃহত্যাগ।]

ইক্ষ্বাকু-বংশে শাক্যকুলে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন। * সার্দ্ধ দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ধর্ম্মপ্রাণ শুদ্ধোদন বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পুত্র-মুখ-দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন এবং পুত্রলাভ কামনায় বহু যাগ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। মহামায়া (মায়া) ও মহাপ্রজাবতী (প্রজাবতী বা প্রজাপতি) নাম্নী তাঁহার দুই পুণ্যশীলা পত্নী ছিলেন। অপুত্রক রাজার মনঃকষ্টে তাঁহারাও শান্তিহারা হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অশান্তির মধ্যেও রাজা ও রাজ্ঞী দান ধ্যান প্রভৃতি পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা সে অশান্তি কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিতে সমর্থ হন। একদা নক্ষত্রোৎসব উপলক্ষে সপ্তাহ কাল দান-ধ্যানাদির পর আষাঢ়ী পূর্ণিমা নিশীথে রাজ্ঞী মহামায়া স্বপ্ন দেখিলেন,—যেন এক শ্বেত হস্তী শুণ্ডাগ্রে শ্বেতপদ্ম ধারণ করিয়া রাজ্ঞীর কুক্ষিদেশে রক্ষা করিল। রাজার নিকট সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বিবৃত হইলে, দৈবজ্ঞ আনাইয়া তিনি স্বপ্নকারণ নির্ণয় করিলেন। দৈবজ্ঞগণ কহিলেন,—"রাজ্ঞীর গর্ভে কোনও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন—ইহা তাহারই লক্ষণ।" তখন রাজ্ঞী মহামায়ার বয়ঃক্রম চতুস্ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইয়াছিল ; সুতরাং সে বয়সে সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্রসন্তান লাভ হইবে শুনিয়া, রাজার ও রাজ্ঞীর হর্ষের অবধি রহিল না।

বুদ্ধদেবের জন্ম-লক্ষণ।

দিনের পর দিন কাটিল ; মাসের পর মাস অতিবাহিত হইল ; ক্রমশঃ রাজ্ঞীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তখন কৌলিক রীতি অনুসারে রাজ্ঞীকে পিত্রালয়ে প্রেরণের উদ্যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজধানী কপিলাবাস্তু হইতে রাজ্ঞীর পিত্রালয় কোলি নগরীতে গমনাগমনের পথ বড়ই বন্ধুর ও সঙ্কটসমাকুল ছিল। সুতরাং রাজার আদেশে সমতল নূতন পথ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইল। পথের দুই পার্শ্বে পূর্ণকুম্ভ ও কদলী বৃক্ষ সারি সারি সজ্জীকৃত রহিল। বহুমূল্য বিবিধ ভূষণে সেই পথ সুশোভিত হইল। রাজ্ঞীর বাহন-স্বরূপ এক সুবর্ণনির্ম্মিত যান প্রস্তুত হইল

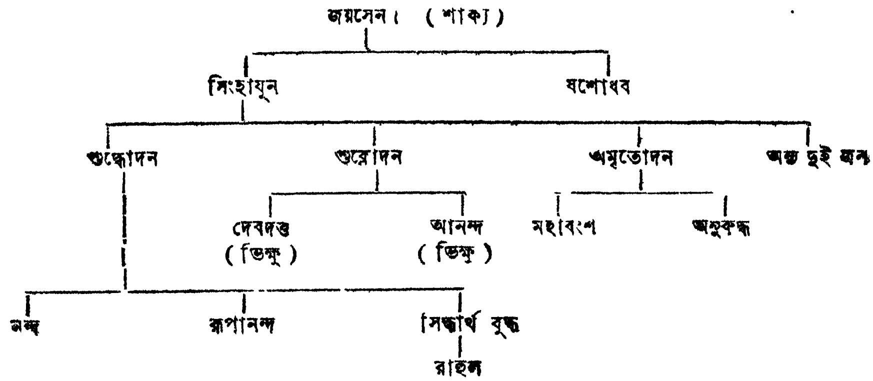
লুম্বিনী বনে তাঁহার জন্ম।

* শাক্যকুল যে ইক্ষ্বাকু বংশ হইতে সমুৎপন্ন, বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার নিদর্শন আছে। বিষ্ণুপুরাণে ইক্ষ্বাকুবংশে ১২২ম পর্য্যায়ে শাক্য নাম দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ঐ বংশের ১১৪ম পর্য্যায়ে শাক্য নাম আছে। সেই শাক্যের পুত্র, শ্রীমদ্ভাগবতে 'শুদ্ধোদ' এবং বিষ্ণুপুরাণে 'ক্রুদ্ধোদন' নামে লিখিত আছে। বর্ত্তমান শুদ্ধোদনই যে লিপিকরপ্রমাদে পূর্ব্বরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, পণ্ডিতগণ এইরূপ

অসংখ্য প্রতিহারী পরিবেষ্টিত হইয়া, সহস্র রাজপুরুষ সহ, রাজ্ঞী পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন। দুই রাজ্যের মধ্যস্থলে অত্যুচ্চ শালবৃক্ষের এক বিশাল অরণ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পার্শ্বচরগণ সহ রাজ্ঞী যখন সেই বনপথে উপনীতা হইলেন; সহসা তরুশাখে কমলদল প্রস্ফুটিত হইল; বিহগগণ কলকণ্ঠে সঙ্গীত আরম্ভ করিল; সেই সঙ্গীতের সুধাস্বরে আর কুসুমসম্ভারের সদ্‌গন্ধে বায়ু পরিপূর্ণ হইল। দেবগণের বাসস্থলী অপরাপর সুদৃশ্য বৃক্ষাবলি ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাব বিষয় অনুভব করিয়া, যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অরণ্যের

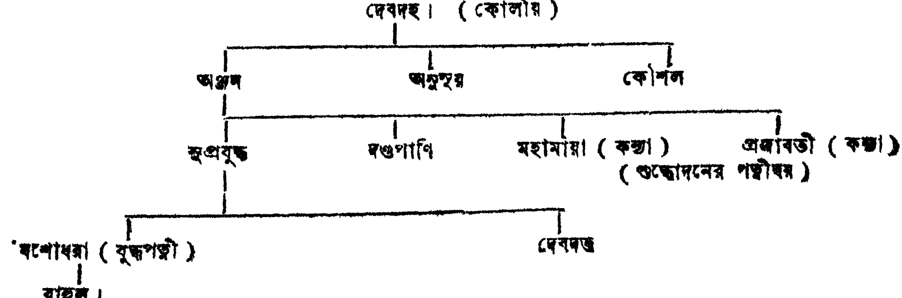
সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহার পরপর্য্যায়ের নাম বিষ্ণুপুরাণে 'রাতুল' এবং শ্রীমদ্ভাগবতে 'লাঙ্গল' রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। রাতুল বা লাঙ্গল নাম যে 'রাহুল' নামের লিপিকরপ্রমাদ, অনেকে এইরূপ মনে করেন। শুদ্ধোদন বিদ্যমানে বুদ্ধদেব গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি রাজৈশ্বর্য্য লাভ না করায়, রাজগণের তালিকায় তাঁহার নাম স্থান পায় নাই। পরবর্ত্তী নামসমূহ যে অধুনা প্রচারিত রাজবংশ-তালিকার সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন নহে, তাহারও কারণ এইরূপ মনে হয় যে, বুদ্ধবংশ সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে, তাঁহাদের জ্ঞাতিগণ (প্রসেনজিৎ) প্রভৃতি সূর্য্যবংশের রাজছত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, অধুনা অনুসন্ধিৎসুগণ বুদ্ধদেবের পিতৃবংশের ও মাতৃবংশের নিম্নরূপ বংশপর্য্যায় নির্দ্ধারণ করেন; যথা,—

১। বুদ্ধদেবের পিতৃবংশ।



* * *

২। বুদ্ধদেবের মাতৃবংশ।



পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উদ্ভাবিত এই বংশলতা যে সর্ব্বথা প্রামাণ্য, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ভ্রাতৃকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ-প্রথা হিন্দুর দৃষ্টিতে বিসদৃশ। শুদ্ধোদন হিন্দু হইয়া, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সেবক হইয়া, ঐ সম্বন্ধ-বন্ধনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন কি? প্রজাবতী—প্রজাপতি বলিয়াও পরিচিতা।

বিশাল বৃক্ষসমূহের সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া রাজ্ঞী সেই বৃক্ষের নিকটস্থ হইবার অভিলাষিণী হইলেন। যে দৃশ্যে তাঁহার নয়ন বিমুগ্ধ, সে সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিবার জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইল। তাঁহার সঙ্গী রাজপুরুষগণ দূরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগ্নী প্রজাপতির সঙ্গে, যানে উপবিষ্ট হইয়া, রাজ্ঞী সেই শালবৃক্ষসন্নিকটে উপনীত হন। ক্ষণপরে যান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভগ্নী প্রজাপতির গলদেশ বেষ্টন করিয়া রাজ্ঞী মহামায়া দণ্ডায়মান হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একটী বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিবার প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার সামান্য আকর্ষণে বৃক্ষশাখাসমূহ যেন রাজ্ঞীকে সংবর্দ্ধনা জানাইবার জন্য অবনত হইল। একটী বৃক্ষশাখা ধারণ পূর্ব্বক রাজ্ঞী তাঁহার অগ্রভাগের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া লইলেন। রাজ্ঞীকে সম্মান-প্রদর্শন জন্য অরণ্যে যেন সহসা মলয় সমীর প্রবহমান হইল। রক্ষিগণ দূরে প্রস্থান করিল। রাজ্ঞীর চতুষ্পার্শ্ব বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করা হইল। রাজ্ঞী তখন বৃক্ষশাখাগ্রভাগ ধারণ পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়, এই অবস্থায়, বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। *

বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণকালে অনেক আশ্চর্য্য অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। তাঁহার জন্মমাত্র প্রধান ব্রহ্মচতুষ্টয় সুবর্ণখচিত শয়নে শিশুকে শয়ন করাইয়া রাজ্ঞীর সম্মুখে উপস্থিত করেন, এবং রাজ্ঞীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলেন,—"মহারাণি, আজ বড় আনন্দের দিন। এই দেখুন, আপনার গর্ভজাত অমূল্য অলৌকিক ফল।" † ব্রহ্মগণের হস্ত হইতে 'নাট'-চতুষ্টয় (দেবতাগণ) শিশুকে গ্রহণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করেন। 'নাট'গণের নিকট হইতে মনুষ্যগণ সেই অপরূপ শিশুকে প্রাপ্ত হন। তখন শিশুকে সুন্দর শ্বেতবস্ত্রের উপর রক্ষা করা হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, শিশু পরিচারকগণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক তখনই দণ্ডায়মান হয়। দণ্ডায়মান হইয়া শিশু যখন পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন সহস্র পৃথিবী সম্পূর্ণ সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া শিশুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। ঐ সকল পৃথিবীতে যে দেবগণ (নাটগণ) অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই পুষ্প ও সুগন্ধ দ্রব্য লইয়া বুদ্ধদেবের পূজায় প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে শিশু অপর দিকত্রয়ে দৃষ্টিপাত করিলে এবং ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে দৃষ্টি ফিরাইলে সর্ব্বত্র তাঁহার প্রাধান্য ও অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপন্ন হয়। আপন শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া শিশু লম্ফপ্রদানে উত্তর দিকে সপ্তপদ অগ্রসর হয় এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে,—'এই আমার শেষ জন্ম। ইহার পর আর আমার কোনরূপ বিদ্যমানতা সম্ভব নহে। আমিই সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ।' অতঃপর তিনি উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে, প্রধান ব্রহ্ম তাঁহার মস্তকে শ্বেতছত্র ধারণ করিলেন। একজন নাট-দেবতা স্বর্ণখচিত ব্যজনী লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য নাটগণ বহুমূল্য প্রস্তরাদি খচিত কোষসমন্বিত সুবর্ণ অসি ও অন্যান্য রাজকীয় চিহ্ন বহন পূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সেই সময়ে আরও বহু আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, আর তদ্দ্বারা স্বয়ং ভগবান যে মহামায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিব্যক্ত

জন্মকালে অলৌকিক ব্যাপার।

* ললিতবিস্তর মতে, মায়াদেবী গর্ভাবস্থায় রাজোদ্যানে—লুম্বিনী বনে—অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। ললিতবিস্তরের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হইয়াছিল। তিনি যে সময়ে ভূমিষ্ঠ হন, ঠিক সেই সময়েই সহচর আনন্দ এবং সহধর্ম্মিণী পরমা সুন্দরী যশোধরা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রিয় অশ্ব কণ্টকেরও, কথিত হয়, ঐ সময়েই জন্ম হইয়াছিল। রাজগৃহের উত্তর-পূর্ব্বে, দুই যোজন অন্তরে, উরুবেলার অরণ্য মধ্যে এই সময়েই বোধিবৃক্ষের অঙ্কুর উদ্গত হয়। চারিটী স্বর্ণপাত্র এই সময়েই সহসা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। কপিলবাস্তুর পার্শ্বস্থিত দেব-নগরের অধিবাসিগণ সদ্যোজাত শিশুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। বোধিবৃক্ষের মূলে রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞানাধার বুদ্ধরূপে মনুষ্যকে নির্ব্বাণের পথ প্রদর্শন করিতে আসিতেছেন,—এই বিষয় ঘোষণা করিয়া, নানা স্থানে নাটদেবতাগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং পুষ্পপত্রপতাকাশ্রেণীতে সে আনন্দ বিঘোষিত হইয়াছিল। রাজা শুদ্ধোদন সন্তানের মঙ্গলকামনায় রাজধানী উৎসব-মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন; দান ধ্যান প্রভৃতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

শিশুর আর এক অলৌকিক ক্রিয়ার কথা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে বিবৃত দেখি। কংস কারাগারে বসুদেব-ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ যে অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া পিতামাতাকে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও অবনতমস্তক করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের শৈশব জীবনে তাদৃশ ঘটনার অসদ্ভাব নাই। প্রতি বৎসর কৃষিকার্য্যের সময়ে কপিলাবাস্তু নগরে কর্ষণোৎসব হইত। রাজা সেই উৎসবে আত্মীয়-স্বজনসহ মহোল্লাসে যোগদান করিতেন। সেই উপলক্ষে জনপদ-সমূহ বিবিধ ভূষণালঙ্কারে সজ্জীকৃত হইত। নগররক্ষিগণ সামর্থ্যানুরূপ নব নব পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, সেই উৎসবে যোগদান করিত। যে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র উৎসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা নানাবিধ পত্রপুষ্প-পতাকায় সুসজ্জিত হইত, এবং সে উৎসব দেখিবার জন্য, বহু নরনারী উৎসব-ক্ষেত্রে সমবেত হইতেন। সে উৎসবের জন্য এক সহস্র লাঙ্গল ও তদনুরূপ বলীবর্দ্দ প্রস্তুত থাকিত। তাহার মধ্য হইতে আট শত লাঙ্গল ও তদনুরূপ বলীবর্দ্দ বাছিয়া লইয়া রাজা স্বয়ং এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী নবনবত্যধিক সপ্তশত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভূমি-কর্ষণে প্রবৃত্ত হইতেন। লাঙ্গল সকল এবং বলীবর্দ্দের শৃঙ্গ ও গলবন্ধসকল রৌপ্যানম্বিত পত্রাবলিতে আচ্ছাদিত থাকিত। যে লাঙ্গল নৃপতি স্বয়ং পরিচালনা করিতেন, তাহার সমস্ত বেশ-ভূষা সুবর্ণে বিখচিত থাকিত। জনসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া রাজা শুদ্ধোদন যে দিন রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই বিস্তৃত উৎসব-ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন; সেই আনন্দোৎসবে যোগদানের জন্য ধাত্রীগণ কুমারকে সঙ্গে লইয়া আসিল। সুদৃশ্য শাখাপল্লব-শোভিত এক বিশাল জম্বুবৃক্ষ সেই মাঠে বিদ্যমান ছিল। তাহার বহুদূর বিস্তৃত শাখা-প্রশাখায় স্থানটীকে শান্তি-শীতল করিয়া রাখিয়াছিল। এই বৃক্ষতলে সুবর্ণখচিত চন্দ্রাতপ বিলম্বিত হয়। তন্নিম্নে কুমারের শয্যা বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই শয্যায় কারু-খচিত সুবর্ণপ্রভ মশারি বিলম্বিত ছিল। কুমারকে শয্যার উপর শায়িত রাখিয়া ধাত্রীগণ হলপরিচালন দর্শন করিতেছিল। কুমারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার উপযুক্ত রক্ষিগণের হস্তে রাখিয়া নৃপতি যখন হলচালনায় প্রবৃত্ত হন; তাঁহার সঙ্গী দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ

অলৌকিক দর্শন।

তাঁহার অনুসরণ করেন। পরিশেষে জনসাধারণও তাঁহাদের আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিল। হলধারণপূর্ব্বক বলীবর্দ্দ পরিচালনায় নৃপতি যখন বিস্তৃত ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক পরিক্রমণ করেন, তাঁহার অনুসরণে হলচালকগণ সকলেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হয়। এই অভিনব দৃশ্য দর্শকগণের সকলেরই প্রাণে অনুপম আনন্দের ও উৎসাহের সঞ্চার করে। জনসঙ্ঘের জয়ধ্বনিতে ও আনন্দনিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সে জীবন্ত আনন্দপ্রদ দৃশ্যে ধাত্রীগণ রাজাদেশ বিস্মৃত হয়। দোলনে দোদুল্যমান কুমারের রক্ষণাবেক্ষণের গুরুতর দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া, নেত্রের কৌতূহল তৃপ্তিসাধন জন্য তাহারা সেই প্রাণোন্মাদকর হলচালনা-দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য দৌড়িয়া যায়। এই সময়ে কুমার একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন,—কেহই আর নিকটে নাই। তখন তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পদদ্বয় যথাবিন্যস্ত করিয়া যোগাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রগাঢ় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। অপরাপর ধাত্রীগণের, যাহারা কুমারের আহার্য্য প্রস্তুতে প্রবৃত্ত ছিল, তাহারাও আপনাপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া উৎসব-দর্শনে অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত করিয়া ফেলিল। ক্রমে বেলা বাড়িয়া গেল। দিনমণি পশ্চিমে চলিলেন। বৃক্ষের ছায়া বিপরীত গতি অবলম্বন করিল। এতক্ষণে ধাত্রীগণের জ্ঞানসঞ্চার হইল। তাহারা যে শিশুকে একাকী ফেলিয়া আসিয়াছে, এ কথা মনে করিয়া তাহারা অনুতাপ করিতে লাগিল। বৃক্ষছায়া পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, শিশু আতপতাপে ক্লিষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিল। তখন তাহারা দারুণ অনুতপ্ত হৃদয়ে শিশুর দিকে দৌড়িয়া আসিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ফিরিয়া আসিয়া তাহারা দেখিল,—সেই জম্বুবৃক্ষের ছায়া তখনও পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত; আরও দেখিল,—কুমার সেই শয্যার উপর যোগাসনে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। অবিলম্বে নৃপতির নিকট সেই সংবাদ উপনীত হইল। রাজা শুদ্ধোদন সবিস্ময়ে দৌড়াইয়া আসিয়া সে এক অনুপম দৃশ্য সন্দর্শন করিলেন। সে দৃশ্য দর্শনে কুমারের সমক্ষে নৃপতির মস্তক অবনত হইল। তিনি বিস্ময়-বিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন,—"প্রিয় বৎস! আমি এই দ্বিতীয় বার তোমাকে নমস্কার করি।"

কুমারের জীবনে এইরূপ ধ্যান-নিবিষ্টতার দৃষ্টান্ত পদে পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি সর্ব্বদাই নির্জ্জনতা অনুসন্ধান করিতেন এবং একটু অবসর পাইলেই ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন।

কুমারের ধ্যান নিবিষ্টতা।

একদিন কুমার কৃষিপল্লী দর্শনে গমন করেন। পল্লী-শোভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহচরগণ দূরে দূরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। সেই অবকাশে কুমার একটী জম্বুবৃক্ষের তলদেশে ধ্যানমগ্ন হন। তাঁহার সেই ধ্যানের প্রভাবে দেবগণ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। কিন্তু তিনি তো কোনও ঐশ্বর্য্যপদের অভিলাষী নহেন! তিনি যে কেবল জীবের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন! সুতরাং তাঁহার ধ্যানে দেবগণের উদ্যোগের কারণ কিছুই রহিল না; পরন্তু তাঁহারা আনন্দ লাভ করিলেন। কুমারের এই ধ্যান-প্রভাব সম্বন্ধে আশ্চর্য্য একটী উপাখ্যান আছে। দৈববলসম্পন্ন পাঁচ জন ঋষি সেই সময়ে দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে যাইতেছিলেন। তাঁহারা যখন আকাশপথে অগ্রসর হন, সেই জম্বুবৃক্ষ সন্নিকটে তাঁহাদের গতি অবরুদ্ধ হয়। তখন তাঁহারা জানিতে পারেন, জম্বুবৃক্ষমূলে কে সে মহাপুরুষ ধ্যাননিবিষ্ট রহিয়াছেন! দৈববাণীতে

তাঁহার পরিচয় বিঘোষিত হয়। তখন ঋষিগণ নিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক বুদ্ধদেবের স্তব আরম্ভ করেন। চারি জন ঋষির কণ্ঠে চারিটী শ্লোক উচ্চারিত হয়। তাঁহাদের স্তবে বিঘোষিত হয়,—

"লোকে ক্লেশাগ্নিসন্তপ্তে প্রাদুর্ভূতোঽয়ং হ্রদঃ।
অয়ং তং প্রাপ্স্যতে ধর্ম্মং যজ্জগন্মোচয়িষ্যতি ॥ ১।
অজ্ঞানতিমিরে লোকে প্রাদুর্ভূতঃ প্রদীপকঃ।
অয়ং তং প্রাপ্স্যতে ধর্ম্মং যজ্জগন্মোচয়িষ্যতি ॥ ২।
শোকসাগরকান্তারে যানশ্রেষ্ঠমুপস্থিতম্।
অয়ং তং প্রাপ্স্যতে ধর্ম্মং যজ্জগত্তারয়িষ্যতি ॥ ৩।
জরাব্যাধিকিলিষ্টানাং প্রাদুর্ভূতোভিষগ্বরঃ।
অয়ং তং প্রাপ্স্যতে ধর্ম্মং জাতিমৃত্যুপ্রমোচকম্ ॥ ৪।

অর্থাৎ,—"লোকসকল ক্লেশরূপ অগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়াছে তাহাদের জন্য এই সুশীতল হ্রদ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম জগৎকে মুক্ত করিবে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন।১। লোকসকল অজ্ঞান অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়াছে। সে অন্ধকার বিনাশের জন্য এই প্রদীপ আবির্ভূত। যে ধর্ম্মে জগতের মুক্তি হইবে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন।২। দুষ্পার শোকসমুদ্রের নৌকা আগত হইয়াছে অথবা দুর্গম সংসার-গহনের যান আগত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম জগৎকে উত্তীর্ণ করিবে, শোকসমুদ্রের পরপারে লইয়া যাইবে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন। ৩। জরাব্যাধিক্লিষ্ট সাংসাররোগীদিগের জন্য বৈদ্যরাজ আবির্ভূত হইয়াছেন। যে ধর্ম্ম জরামৃত হইতে বিমুক্ত করে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন।" ঋষিগণ যখন স্তবস্তুতি করিয়া আকাশপথে উড্ডীন হইলেন, তাঁহার অব্যবহিত পরেই কুমারের অন্বেষণে আসিয়া রাজা শুদ্ধোদন কুমারকে সেই জম্বুবৃক্ষমূলে ধ্যাননিমগ্ন অবস্থায় অবস্থিত দেখিলেন। দেখিলেন,—তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইলেও জম্বুবৃক্ষের ছায়া পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তাহা সমভাবে কুমারের দেহে আতপতাপ নিবারণ করিতেছে। কুমারকে তদ্রূপ ধ্যানস্থ দেখিয়া নৃপতির বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি পুত্র-বাৎসল্য বিস্মৃত হইয়া তাঁহার উদ্দেশে অভিবাদন জানাইলেন। অপরাহ্নে কুমারের সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি তখন পিতৃচরণে প্রণত হইয়া, পিতার নিকট একটী প্রার্থনা জানাইলেন। সে প্রার্থনা,—'হিংসামূলক কৃষিকর্ম্ম পরিত্যাগ।' কৃষিকর্ম্মেও হিংসার প্রভাব আছে, সুতরাং সে কর্ম্ম পরিত্যাগে প্রাণিগণের হিতসাধনে উদ্বুদ্ধ করিয়া কুমার পিতৃসহ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ঘটনায়, কুমারের ভবিষ্য ভাবনায়, নৃপতির প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শিশুর প্রাণে কেন এমন ভাবের উদয় হইল, নৃপতি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। নামকরণের সময় দৈবজ্ঞগণ কুমারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, সেই কথাই তাঁহার মনে পুনঃপুনঃ জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কুমারের চিত্ত যাহাতে অন্য কোনও দিকে চালিত না হয়, তৎপক্ষে তিনি বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিলেন। কুমারকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য তিনি তাঁহার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু অল্প বয়সেই কুমারকে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন।

পঞ্চম দিবসে কুমারের নামকরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণগণ, দৈবজ্ঞগণ, জ্যোতিষিগণ সকলেই কুমারের দেহদ্যুতি সন্দর্শন করিয়া চমকিত হইলেন। রাজা শুদ্ধোদন প্রধান প্রধান জ্যোতিষীকে আহ্বান করিয়া কুমারের ভবিষ্য গণনা করিতে নিযুক্ত করিলেন। ছয় জন দৈবজ্ঞ একবাক্যে কুমারের ভবিষ্য মঙ্গলময় বলিয়া ঘোষণা করেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে একজন (কোণ্ডণ্য) কহিলেন,—'কুমার কখনই গৃহবাসী হইবেন না। তাঁহার যে দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জনা দৃষ্ট হয়, * উহা কুমারের সংসার-ত্যাগের—মায়ামোহ-ছেদের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।' তখন, কিরূপে কি অবস্থায় কুমার গৃহত্যাগী হইবেন, দৈবজ্ঞের নিকট রাজা সবিশেষ জানিতে চাহিলেন। তাহাতে কোণ্ডণ্য উত্তর দেন,—"চারি বিষয়ে কুমারের গৃহত্যাগের আশঙ্কা আছে। কুমার যদি কখনও কোনও জরাজীর্ণ ব্যক্তিকে দর্শন করেন, কুমার যদি কখনও কোনও ব্যাধিগ্রস্তকে সম্মুখে দেখেন, কুমার যদি কখনও কোনও শবদেহ দেখিতে পান, অথবা কুমারের দৃষ্টিপথে যদি কখনও কোনও প্রব্রজিত প্রশান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী নিপতিত হন, কুমার নিশ্চয়ই বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন।" রাজা শুদ্ধোদন, দৈবজ্ঞগণের ভবিষ্যবাণী শ্রবণে কুমারের সম্বন্ধে বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু সে উদ্বেগ দমন করিবার পক্ষে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি রহিল না। কুমারের গৃহত্যাগের হেতুভূত পূর্ব্বোক্ত দৃশ্যাবলি যেন তাঁহার নয়ন পথে নিপতিত না হয়, তৎপ্রতি নৃপতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অব্যাহত রহিল। নৃপতি মহাসমারোহে কুমারের নাম-করণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। কুমারের জন্মহেতু তাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হওয়ায়, তিনি কুমারের 'সিদ্ধার্থ' বা 'সর্ব্বার্থসিদ্ধার্থ' নামকরণ করিলেন। ইহার পর, কুমারের জন্মগ্রহণের সপ্তম দিবসে রাজ্ঞী মহামায়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তখন লুম্বিনী বন হইতে কুমারকে কপিলাবাস্তু নগরে লইয়া যাওয়া হইল। রাজ্ঞী মহাপ্রজাবতী কুমারের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিলেন। বিমাতা হইলেও তিনি গর্ভস্থ সন্তানের ন্যায় স্নেহে কুমারকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। † অধিকন্তু কুমারের পরিচর্য্যার জন্য রাজা দ্বাত্রিংশৎ জন ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। লুম্বিনী বন হইতে কুমারকে রাজধানীতে আনয়ন কালে বিপুল শোভাযাত্রার আয়োজন হইয়াছিল। ললিত-বিস্তরে সেই শোভাযাত্রার এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়;—"পঞ্চ সহস্র সজ্জিত পুরুষ পূর্ণকুম্ভ লইয়া

নামকরণ ও ভবিষ্য লক্ষণ।

---

* দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণের এবং অশীতি অনুব্যঞ্জনার পরিচয় 'ললিত-বিস্তর' প্রভৃতি গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহার একটু মর্ম্ম প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করি। মহাপুরুষ লক্ষণে হস্ত, পদ, অঙ্গুলি, নাসিকা, জিহ্বা, দন্ত, নেত্র, তারা প্রভৃতির পরিচয় পরিবর্ণিত। তাঁহার পদতল ও হস্ততল উচ্চনীচরহিত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মনোহর নীলবর্ণ নেত্রতারা-সমন্বিত তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়, সিংহের ন্যায় হনু ও কটিদেশ, হংসের ন্যায় গতি প্রভৃতি বত্রিশ লক্ষণ তাঁহার মহাপুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। অশীতি অনুব্যঞ্জনার মধ্যে নখ হইতে কেশ পর্য্যন্ত প্রতি অঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। নখের ত্রিবিধ গুণ নিদর্শন (তাম্রবর্ণ, স্নিগ্ধ ও উচ্চ), অঙ্গুলির ত্রিবিধ অনুব্যঞ্জনা (ছত্রচিহ্নাবিশিষ্ট, চক্রবৎ প্রতীয়মান, পূর্ব্বাপর ক্রমে সুবিভক্ত); এইরূপ ভ্রূদ্বয়, জিহ্বা, দন্ত, নাসিকা, কর্ণ, কেশ প্রভৃতির গুণাদি ঐ অশীতি অনুব্যঞ্জনার অন্তর্ভুক্ত।

† অভিনিষ্ক্রমণসূত্রের মতে প্রজাবতী কুমারের মাতৃস্বসা [illegible]। কিন্তু মতান্তরে তিনি কুমারের বিমাতা বলিয়া পরিচিত। আরও সে মতে, কুমারের প্রতিপালিকার নাম—গৌতমী।

অগ্রগামী হইবে, তৎপশ্চাৎ পঞ্চসহস্র পুরকন্যা ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন হস্তে ধারণ করতঃ গমন করিবে, তৎপরে তালবৃন্তধারিণী কন্যাগণ যাইবে, তৎসঙ্গে অন্যান্য কন্যাগণ গন্ধোদকপূর্ণ ভৃঙ্গার হস্তে অবস্থান করিবে, রাজপথ জলসিক্ত করা হইবে, পঞ্চ সহস্র বালিকা পতাকা ধারণ করিবে, পঞ্চ সহস্র কন্যা বিচিত্র প্রলম্বন মালায় বিভূষিতা হইয়া সঙ্গে যাইবে, পঞ্চ শত ব্রাহ্মণ ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে সঙ্গে যাইবেন, বিংশতি সহস্র হস্তী, বিংশতি সহস্র অশ্ব, অশীতি সহস্র রথ, তদ্ভিন্ন চত্বারিংশ সহস্র পদাতি সৈন্য সজ্জীভূত হইয়া কুমারের অনুগমন করিবে। অনন্তর নগরবাসীরা স্ব স্ব গৃহের দ্বারদেশ ও অন্তর্গৃহ সজ্জিত ও সুশোভিত করিতে লাগিল। তাহাদের সকলের ইচ্ছা, কুমারকে তাহারা এক এক দিন নিজ নিজ গৃহে রাখিবে।" * যে দিন শোভাযাত্রা করিয়া কুমারকে রাজধানীতে আনয়ন করা হইয়াছিল, সে দিন আশী সহস্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাজার অনুগমন করিয়াছিলেন। কুমারের পরিচর্য্যার জন্য তাঁহারা প্রত্যেকে আপনার এক একটি পুত্রকে প্রদান করিতে অঙ্গীকার করেন। কুমার যদি গৃহাশ্রমে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পুত্রগণ কুমারের শরীররক্ষী সহচররূপে অবস্থিত থাকিবে। আর যদি কুমার সেই অত্যুচ্চ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধপদ লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানগণ সংসারত্যাগী ভিক্ষুরূপে তাঁহার অনুবর্ত্তন করিবে। ফলতঃ, কুমারের জন্ম উপলক্ষে অনেকেই তাঁহার প্রতি প্রীতি-স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠ সম্পৎসমূহ তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

দৈবজ্ঞগণের ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণে, পুত্রের শুভ-সাধন উদ্দেশ্যে, নৃপতি যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করেন। কৌণ্ডণ্যের কথিত দৃশ্যচতুষ্টয় বুদ্ধদেবের নয়ন সমক্ষে যেন কদাচ পতিত না হয়, সে পক্ষে তাঁহার ব্যবস্থার কোনই ত্রুটি ছিল না। যে ধাত্রীগণ কুমারের পরিচর্য্যায় ব্রতী ছিলেন, তাঁহাদের কাহারও কোনরূপ অঙ্গবৈকল্য ছিল না, পরন্তু, তাঁহারা সকলেই সুন্দরী মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। অপিচ, যে সকল বালকবালিকা কুমারের সহচর-সহচরী রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলেই সুন্দর সুঠাম নবনীতকোমল অঙ্গরাগসম্পন্ন ছিলেন। অধিকন্তু, যে পথে যখনই কুমারের গতিবিধি ঘটিত, তখনই সে পথের সকল বিঘ্ন অমঙ্গল দূরীকরণের পক্ষে রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ নিয়ত প্রযত্নপর থাকিতেন। জরাগ্রস্থ ব্যাধিযুক্ত অথবা মৃত বা প্রব্রজিত কেহ কদাচ কুমারের সম্মুখে নিপতিত না হয়, সে ব্যবস্থার কোনই ত্রুটি ছিল না। কিন্তু, দুর্লঙ্ঘ্য বিধিলিপি কে খণ্ডন করিতে সমর্থ হয়? জন্ম জরা-মরণের বিভীষিকাময় জীবন দর্শন করিয়া যিনি মানবের জন্য মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, আর সেই জন্য যাঁহার মর্ত্ত্যে অবতরণ, মোহের আবরণে কেহ কি তাঁহাকে বিভ্রান্ত রাখিতে পারে? স্নেহ-প্রেমের বজ্র-বন্ধনেও তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। শৈশবের শিক্ষা হইতেই তাঁহাতে গৃহত্যাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ব্যঞ্জনবর্ণের আদি বর্ণ 'ক' অক্ষর উচ্চারণ কালে প্রহ্লাদের প্রাণে কৃষ্ণের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। সিদ্ধার্থেরও সেই অবস্থা ঘটিল। শিক্ষক শিখাইলেন,—'অ'। সিদ্ধার্থ দৈব-

ভবিষ্যজ্জীবনের কর্ম্ম-লক্ষণ।

* ডক্টর রাজেন্দ্র লাল মিত্র ললিতবিস্তরের ঐরূপ মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করেন।

বাণীতে শুনিলেন,—"অনিত্যঃ সর্ব্বঃ সংসারস্কন্ধঃ। শিক্ষক শিখাইলেন,—'আ'। সিদ্ধার্থের হৃদয়ে দৈববাণীতে প্রতিধ্বনিত হইল,—"আত্ম পরহিতঃ কার্য্যঃ।" এইরূপ পঞ্চাশৎ বর্ণ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সংসারবিতৃষ্ণামূলক অম্মোৎকর্ষসাধক মানবহিতবিধায়ক বাক্যসমূহ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষক ও সহপাঠিগণ সেই দৈববাণী শুনিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। কথিত হয়, সেই দৈববাণী সমূহ বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ-স্বরূপ। যাহা হউক, অল্প দিন মধ্যেই কুমার সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠেন। ললিতবিস্তরে প্রকাশ,—তিনি চতুঃষষ্টি লিপিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং সকল জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যা প্রভাবে দেবগুরু বিশ্বামিত্র পর্য্যন্ত স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন; আর সে যে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি, বিশ্বামিত্রের উক্তিতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল। * কুমারের বিদ্যাশিক্ষার বিষয় অবগত হইয়াও নৃপতির চিত্ত কুমারের ভবিষ্য বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। সুতরাং কুমারের ভবিষ্য জীবনগতি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনে রাজা শুদ্ধোদন সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

কুমারের বিবাহ-বন্ধন।

দিনের পর যতই দিন কাটিতে লাগিল, কুমারের অমানুষিক বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা দর্শনে নৃপতি বিচলিত হইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দৈবজ্ঞগণের ভবিষ্য-বাণী তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কুমার যদি গৃহী হন, নরকুলে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবেন; আর তিনি যদি সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন। সংসার আশ্রমে আসক্তপ্রাণ নৃপতি, কুমারকে সংসারী করিবার জন্য তাই অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কুমারের বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কুমারকে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। কুমারের বিবাহের পূর্ব্বে, কথিত হয়, নৃপতি এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। যাঁহার গৃহে সুন্দরী কন্যা আছে, তিনিই পুরস্কৃত হইবেন,—ঘোষণায় এই কথা প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে শাক্যকুলে যত সুন্দরী কুমারী ছিল, রাজা সকলকে সংগ্রহ করিতে সমর্থ

---

* বিশ্বামিত্রের বিস্ময়ের ও অতীত-দর্শনের পরিচয় তৎকর্ত্তৃক উচ্চারিত নিম্নলিখিত গাথায় প্রকাশমান ;—

"শাস্ত্রাণি যানি প্রচরন্তি চ দেবলোকে, সংখ্যা লিপিশ্চ গণনাপি চ ধাতুতন্ত্রম্।
যে শিল্পযোগ পৃথুলৌকিক অপ্রমেয়া স্তেষ্বেষু শিক্ষিতু পরা বহু কল্পকোট্যঃ ॥
কিন্তু জনস্য অনুবর্ত্তনতা' করোতি; লিপিশালমাগন্তং সুশিক্ষিতশিক্ষণার্থম্।
পরিপাচনার্থং বহুদারক অগ্রযানে, অন্যাংশ্চ সত্ত্বনিযুতানমৃতে বিনেতুম্।
নৈতস্য আচরিতু উত্তরি বা ত্রিলোকে, সর্ব্বেষু দেবমনুজেষয়মেব জ্যেষ্ঠঃ।
নামানি তেষু লিপিনাং নহি বেথ যুয়ং, যত্রৈব শিক্ষিতু পুরা বহুকল্পকোট্যঃ।"

অর্থাৎ,—'ইহলোকে দুষ্প্রাপ্য দেবলোকে যে সকল শাস্ত্র সংখ্যা লিপি গণনা ধাতুতন্ত্র প্রচলিত ছিল, বহু কোটিকল্প কাল হইতে লোকশিক্ষার জন্য তিনি তাহা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি যে জনগণের অনুবর্ত্তনে লিপিশালায় আগমন করিয়াছেন, তাহার কারণ—যে সকল বিষয়ে সুশিক্ষিত আছেন, তাহা শিক্ষা দিবেন। জনসাধারণকে সত্ত্ব-নিযুত, বিনীত, সর্ব্ববিদ্যায় পরিপক্ব ও মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ। ত্রিলোক-প্রচারিত সকল শিক্ষাই তাঁহার আয়ত্ত। তিনি দেবগণের ও মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ। তোমরা যে সকল লিপির নাম পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত নহ, তিনি বহুকল্প পূর্ব্বে হইতেই তাহাতে শিক্ষিত আছেন।'

হইয়াছিলেন। একে একে সেই সকল কুমারী কুমারের সম্মুখে আনীতা হইলেন। কিন্তু কুমারী-গণের কেহই কুমারের দেহজ্যোতিঃর নিকট দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইলেন না। কেবল একটী কুমারী—দণ্ডপাণিতনয়া অনিন্দ্যসুন্দরী গোপা—সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন। সিদ্ধার্থের সহিত গোপার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। * গোপার সহচারিণী-রূপে বহু সুন্দরী কুমারী কুমারের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। † কুমারের চিত্ত সংসারের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করিবার জন্য সুন্দরীগণের নৃত্য-গীত-বাদ্যের মধ্যে কুমারকে নিমজ্জমান রাখা হইল। কুমারের সুখাবাসের জন্য নৃপতি তিনটি প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। তাহার প্রত্যেক প্রাসাদ নবতল-বিশিষ্ট বলিয়া কথিত হয়। কুমারের চিত্তবিনোদনের জন্য সর্ব্ববিধ পার্থিব সুখের সামগ্রী সেই প্রাসাদত্রয়ে সযত্নে রক্ষিত ছিল। কুমারের চিত্ত কোনপ্রকারে উন্মার্গগামী না হয়, রাজার ও তাঁহার অমাত্যবর্গের সর্ব্বদা তৎপ্রতি লক্ষ্য রহিল।

---

* সিদ্ধার্থের সহধর্ম্মিণীর নাম কোথাও বা 'গোপা', কোথাও বা 'যশোধরা' বলিয়া উল্লেখ আছে। কেহ কেহ কহেন,—তিনি একই দেবী, দুই নামে পরিচিতা ছিলেন। কিন্তু পিতামাতার পরিচয় দেখিয়া গোপাকে ও যশোধরাকে দুইটী ভিন্ন নারী বলিয়া উপলব্ধি হয়। গোপার পিতা শাক্যবংশীয় দণ্ডপাণি নামে এবং যশোধরার পিতা ও মাতা সুপ্রবুদ্ধ ও অমিতা বলিয়া অভিহিত হন।

† কুমারকে প্রলুব্ধ রাখিবার জন্য নৃত্য-গীত-বাদ্য-নিপুণা চল্লিশ সহস্র যুবতীকে তাঁহার সহচরীরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছিল বলিয়া কোনও কোনও গ্রন্থে প্রকাশ আছে। কোনও কোনও মতে আবার কুমারের বিবাহিতা পত্নীর সংখ্যাই সহস্রাধিক বলিয়া কীর্ত্তিত দেখি। কোনও মতে তাঁহার বহু বিবাহ, কোনও মতে তিনি একপত্নীক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ওল্‌ডেনবর্গ এবং রিজ্ ডেভিডস শেষোক্ত মতের অনুসরণকারী। তবে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম সম্বন্ধে নানা বিতণ্ডা দেখিতে পাই। দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধ-সম্প্রদায় তাঁহার এক পত্নীর বিষয় স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে নানা নামে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। বাইগাণ্ডেৎ (Bigandet's *The Life and Legend of Gaudama*) যশোধরা নামই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। হার্ডি (Hardy's *Manual of Buddhism*) ঐ নামই স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি যশোধরাকে সুপ্রবিদ্ধের কন্যা বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। বিনয়পিটকে এবং জাতকগ্রন্থে, তিনি 'রাহুল-মাতা' বলিয়া পরিচিত। (*Vide* Venaya Texts, vol I, P. 108 and Jatakas 54, 6-58, 18-90, 24) কেহ কেহ সুভদ্রাসনা বলিয়া যশোধরাকে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। চীনদেশীয় জীবনচরিতে বুদ্ধদেবের তিন পত্নীর নাম পরিদৃষ্ট হয়; যশোধরা (রাহুলের মাতা), গৌতমী, মনোহরা। তবে ঐ তিন জনের মধ্যে মনোহরাকে কেহ দেখিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ নাই। সুতরাং ঐ নাম কল্পনা মাত্র। গৌতমী নাম একটী উপাখ্যানে উল্লেখ আছে। কিন্তু গৌতম-বংশীয়া বলিয়া, ঐ নামে বুদ্ধপত্নী পরিচিতা ছিলেন, কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। কেন-না, প্রজাপতি (প্রজাবতী) অনেক সময়ে গৌতমী নামে অভিহিত আছেন। এদিকে আবার গৌতমী দণ্ডপাণির কন্যা বলিয়া পরিচিতা। কিন্তু যশোধরার পিতার নাম—কোথাও দেখ—মহানাম। ললিত-বিস্তরে বুদ্ধদেবের একই পত্নীর উল্লেখ আছে। তিনি দণ্ডপাণিতনয়া—গোপা। যশোধরার সম্বন্ধে যে সকল উপাখ্যান প্রচলিত, গোপার সম্বন্ধেও সেই উপাখ্যান দেখিতে পাই। ললিতবিস্তরের টীকায় ফানকক্স (Fancaux) লিখিয়াছেন—বুদ্ধদেবের তিনটী পত্নী ছিলেন; তাঁহাদের নাম,—যশোধরা, মৃগয়া বা গোপা, এবং উৎপলবর্ণা। তাঁহার বর্ণনানুসারে, যশোধরা ও উৎপলবর্ণা অভিন্ন প্রতিপন্ন হয়। কেন-না, তিনি এবং প্রজাপতি প্রথম বৌদ্ধভিক্ষুণী হইয়াছিলেন।

কুমার যখন সুখৈশ্বর্য্যে বিভোর হইয়া আছেন, তাঁহার অকর্ম্মণ্যতা বিষয়ে আত্মীয়-স্বজন রাজার নিকট অনুযোগ করিতে লাগিলেন। কুমার যদি আমোদ-উল্লাসেই জীবনাতিবাহিত করেন, তিনি যদি কলাবিদ্যায় বিশারদ হইতে না পারেন, তাহা হইলে শাক্যরাজ্যের ভবিষ্যৎ যে ঘোর অন্ধকারময়, আত্মীয়জন নৃপতির নিকট সর্ব্বদা সেই বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। শুদ্ধোদন আত্মীয়-জনের অনুযোগের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন। তখন, আত্মীয়গণের পরামর্শানুসারে নৃপতি একদিন কুমারকে নিকটে আহ্বান করিলেন। কুমার নিকট আসিলে, নৃপতি আত্মীয়জনের মনের ভাব বুঝাইয়া বলিলেন। কুমার সুবুদ্ধিমান, পিতৃবাক্যে বিচলিত না হইয়া, বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিলেন,—'আপনি ঢক্কানিনাদে ঘোষণা করিয়া দেন, আগামী সপ্তাহের এই দিবসে আমি কলাবিদ্যার পরীক্ষা দিব। আমি যে অষ্টাদশ কলা-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি, বিশেষজ্ঞগণকে তাহার পরীক্ষা গ্রহণ জন্য আহ্বান করিবেন।' যথানির্দ্দিষ্ট দিনে কুমার পরীক্ষা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যিনি যে বিষয়েই পারদর্শী হউন, কুমারের নিকটে সকলেরই প্রভাব পর্য্যুদস্ত হইল। তিনি দেখাইলেন—অলৌকিক রণ-কুশলতা, তিনি দেখাইলেন—অসাধারণ শিল্পনিপুণতা, তিনি দেখাইলেন—দেবদুর্ল্লভ বিদ্যাবত্তা।* আত্মীয়-স্বজন এবং জনসাধারণ সর্ব্ববিষয়ে কুমারের পারদর্শিতা অবলোকন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, কুমারের জয়নিনাদে দিগন্ত মুখরিত হইল।

কুমারের বিদ্যাবত্তা।

কিছুদিন অতীত হইলে, কুমার একদিন উদ্যানবিহারের মনস্থ করিলেন। দৈবজ্ঞগণের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া, অধিকন্তু কুমারের গৃহত্যাগ বিষয়ক স্বপ্ন-দর্শনে, নৃপতি নিয়ত অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতেছিলেন। কুমারের গতিবিধি পথে সর্ব্বদা নৃপতির খরদৃষ্টি ছিল। সুতরাং কুমারের উদ্যানযাত্রার সংবাদে তিনি কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বনের ত্রুটি করিলেন না। উদ্যান-গমনের পথ সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত হইল। যেন কোনও উৎসব-সমারোহের আয়োজন হইতেছে, পল্লীপথ সেই দৃশ্য ধারণ করিল। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে, সুসজ্জিত ঘোটকচতুষ্টয়-সংবাহিত সুশোভন শকটে আরোহণ পূর্ব্বক, শোভাযাত্রা সহ কুমার উদ্যান-বিহারে গমন করিলেন,—যেন দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ-সহ নন্দন-অভিমুখে আনন্দ করিতে চলিয়াছেন। অলক্ষ্যে অবস্থিত পুষ্পক নাটগণ† এই শোভাযাত্রার ব্যাপার দর্শন করিলেন। এইবার তাঁহাদের

মূর্ত্তিমান্ জরা ব্যাধি-দর্শনে।

* কত বিদ্যার কুমারের পারদর্শী ছিলেন, 'ললিতবিস্তরে' দ্বাদশ অধ্যায়ে তাহার পরিচয় আছে। তাহাতে দেখিতে পাই—একদিকে যেমন তিনি "ছেদ্যে, ভেদ্যে, স্বরণে, স্ফালনে, ব্যাখ্যাকরণে, বাহুনৃত্যে, প্রস্তরচিত্রে, হাস্যে, লাস্যে নাট্যে" পারদর্শী ছিলেন; অন্য দিকে তেমনি,—"নির্ঘণ্টে, নিগমে, পুরাণে, ইতিহাসে, বেদে, ব্যাকরণে, নিরুক্তে, শিক্ষায়াং, ছন্দসি, যজ্ঞকল্পে, জ্যোতিষি, সাংখ্যে, যোগে, ক্রিয়াকল্পে, বৈশেষিকে, বৈশিকে, অর্থবিদ্যায়াং, বার্হস্পত্যে, আশ্চর্য্যে, আসুরে, মৃগপক্ষিরুতে, হেতুবিদ্যায়াং, জতুযন্ত্রে—সর্ব্বত্র বোধিসত্ত্ব এব বিশিষ্যতে স্ম।" কুমারের এই কলাবিদ্যার পরীক্ষার বিষয় 'ললিত-বিস্তরে' তাঁহার পরিণয়-উপলক্ষে কীর্ত্তিত আছে। তিনি যেন স্বয়ম্বর-সভায় বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া গোপাকে লাভ করেন, সেখানে সেই ভাব প্রকাশ।

† দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে নাট-দেবতার বিষয় বিশেষভাবে প্রচারিত আছে। নাটগণ বুদ্ধের আবির্ভাবের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেন ইহলোকের ও পরলোকের মধ্যস্থানীয়। খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে

প্রাণে বহুদিনের সঞ্চিত আশা ফলবতী হইবার অবকাশ পাইল। যে দৃশ্যচতুষ্টয় দর্শন করিলে, রাজকুমারের গৃহত্যাগ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া দৈবজ্ঞগণ ঘোষণা করিয়াছিলেন, এখন একে একে নাটদেবগণ সেই সকল দৃশ্য কুমারের সম্মুখ আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিলেন। একজন নাট বার্দ্ধক্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। দেহ—কুব্জভাবাপন্ন, কেশ—শুভ্রতা-প্রাপ্ত, চর্ম্ম—অধিলুলিত,—সেই বার্দ্ধক্যনমিত দেহ দৃঢ় যষ্টি অবলম্বনে কুমারের শকট-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব জরাগ্রস্ত বার্দ্ধক্যক্লিষ্ট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কিং সারথে! পুরুষদুর্ব্বল অল্পস্থাম উচ্ছুষ্কমাংসরুধিরত্বচস্নায়ুনদ্ধঃ।
শ্বেতশিরো বিরলদন্তকৃশাঙ্গরূপঃ আলম্ব্য দণ্ডং ব্রজতেঽসুখংস্খলন্তঃ॥"

'হে সারথি! এই পুরুষ এত দুর্ব্বল ও এত অবসন্ন কেন? উহার মাংস, রুধির, ত্বক্, স্নায়ু এমন বিশুষ্ক কেন? শির শ্বেতবর্ণ, মুখ দন্তহীন, অঙ্গ ক্ষীণ,—এ ব্যক্তি কেন যষ্টি অবলম্বন করিয়া এত কষ্টে পথ চলিতেছে?'

সারথি উত্তর দিলেন,—

"এষ হি দেব পুরুষো জরয়াভিভূতঃ ক্ষীণেন্দ্রিয়ঃ সুদুঃখিতো বলবীর্য্যহীনো।
বন্ধুজনেন পরিভূত অনাথভূতঃ কার্য্যাসমর্থ অপবিদ্ধ বনেব দারু॥"

'হে দেব! এ যে বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত, ক্ষীণেন্দ্রিয়, অতিদুঃখী, বলবীর্য্যহীন। এ এখন অনাথ, আত্মীয়স্বজনপরিত্যক্ত। কার্য্যে অসমর্থ বলিয়া, পশুপক্ষী-পরিত্যক্ত বিশুষ্ক বৃক্ষের ন্যায়, এ এখন আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত।'

কুমার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কুলধর্ম্ম এষ অয়মস্য হিতং ভণাহি অথবাপি সর্ব্বজগতোঽস্য ইয়ং হ্যবস্থা।
শীঘ্রং ভণাহি বচনং যথভূতমেতৎ শ্রুত্বা তথার্থমিহ যোনি সঞ্চিন্তয়িষ্যে॥'

'এ অবস্থা কি উহার কুলধর্ম্ম অথবা সর্ব্বজগতেরই এই অবস্থা? আমাকে শীঘ্র সত্য করিয়া বল। আমি উহার কারণ চিন্তা করিয়া দেখিব।'

সারথি উত্তর দিলেন,—

"নৈতস্য দেব কুলধর্ম্ম ন রাষ্ট্রধর্ম্মঃ সর্ব্বে জগস্য জরযৌবন ধর্ষয়তি।
তুভ্যংপি মাতৃপিতৃবান্ধবজ্ঞাতিসঙ্ঘো জরয়া অমুক্ত ন হি অন্যগতির্জনস্য॥'

'না, দেব! উহা কুলধর্ম্ম বা রাষ্ট্রধর্ম্ম নয়। জগতের সকলেই যৌবন জরা দ্বারা

এমন বা ন দৃত দোষিত [illegible] স্বর্গ নম্বা উভয়ত্র ই হারা যেমন স্বাভাবিক নিয়ম, সাত দিন বক্তকতা নেই [illegible] তবে শুভ ও অশুভ [illegible] কার্য্যে নাটগণের প্রভাব দেখিতে পাই। লোকে [illegible] স্থান কালে সদাত্মা সৎকার্য্যে এবং অসদাত্মা অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে। নাটগণের মধ্যেও সেইরূপ [illegible]। তাঁহারা অশরীরী অথচ শরীরী; যথেচ্ছবিচরণশীল, অথচ নির্দ্দিষ্টস্থানাবলম্বী। বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত এই নাটদেবগণের প্রতিচ্ছায়া মিল্টনের মহাকাব্যে পরিদৃষ্ট হয়। বাইগাণ্ডেৎ তাই লিখিয়াছেন,—"A Hindu Milton might have found two thousand years ago a ready theme for writing, in Sanskrit or Pali, a poem similar to that more recently composed by the immortal English Bard."—*The Life and Legend of Gaudama* by Rev. Bigandet.

জর্জ্জরীভূত হয়। আপনার পিতা মাতা আত্মীয় বান্ধব কেহই জরার কবল হইতে বিমুক্ত নহেন। জরাগ্রাস হইতে মুক্তিলাভের কোনই উপায় নাই।'

কুমারের হৃদয়ে প্রতিধ্বনি উঠিল,—'জরাপি দুঃখা।'

কুমারের আর উদ্যান-বিহারের আকাঙ্ক্ষা রহিল না। যে জীবনের এই পরিণতি, সে জীবনে আবার আনন্দ উপভোগ কি? কুমার সারথিকে রথ ফিরাইতে কহিলেন। সে দিন আর প্রমোদ-উদ্যানে যাওয়া হইল না। কুমার প্রত্যাবৃত্ত হইলে, রাজা সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা এত শীঘ্র কেন ফিরিয়া আসিলে?" সারথি আনুপূর্ব্বিক সকল বিবরণ বিবৃত করিলেন। পথিমধ্যে একজন বৃদ্ধকে দেখিয়া, বিচলিত হইয়া, কুমার যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া, রাজার উদ্বেগের অবধি রহিল না। কুমারের চিন্তার গতি ফিরাইবার জন্য রাজা নৃত্য-গীত প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিলেন।

কিছুদিন পরে আবার একদিন কুমারের উদ্যান-বিহারের আকাঙ্ক্ষা হইল। পূর্ব্বরূপ পরিচ্ছদাদিতে বিভূষিত হইয়া, কুমার উদ্যানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এ দিনও অনুরূপ অন্তরায় উপস্থিত হইল। সেই নাট আজ পীড়িত ব্যক্তির প্রতিরূপ গ্রহণ করিলেন। সহসা শকট সম্মুখে সেই মূর্ত্তি উপস্থিত হইল।

চকিত বিস্মিতভাব-প্রকাশে কুমার সারথিকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কিং সারথে! পুরুষরূপবিবর্ণগাত্রঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়েভিবিকলো গুরুপ্রশ্বসন্তঃ।
সর্ব্বাঙ্গশুষ্ক উদরাকুলপ্রাপ্তকৃচ্ছ্র মূত্রে পুরীষ স্বকি তিষ্ঠতি কুৎসনীয়ে॥"

'হে সারথি! এই সর্ব্বেন্দ্রিয়বিকল রূপহীন বিবর্ণগাত্র পুরুষ কে? কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ বিশুষ্ক হইয়াছে; দারুণ কষ্টে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে; কুৎসিৎ মূত্রে ও পুরীষে দেহ অনুলিপ্ত রহিয়াছে;—এ কে?'

সারথি উত্তর দিলেন,—

"এষোহি দেব পুরুষঃ পরমং গিলানো ব্যাধিভয়ং উপগতো মরণান্তপ্রাপ্তঃ।
আরোগ্যতেজরহিতো বলবীর্য্যহীনো অত্রাণ বিপ্রশরণো হ্যপরায়ণশ্চ॥"

'দেব! এ ব্যক্তি ব্যধিভয়গ্রস্ত, পরমগ্লানিযুক্ত। এ ব্যক্তি আসন্নমৃত্যু, বলবীর্য্যহীন, আরোগ্য-তেজশূন্য। ইহার আর এ যাত্রা পরিত্রাণ নাই। শীঘ্রই ইহার মৃত্যু ঘটিবে।'

কুমার কহিলেন,—

"আরোগ্যতা চ ভবতে যথা স্বপ্নক্রীড়া ব্যাধির্ভয়ঞ্চ ইম ঈদৃশ ঘোররূপং।
কো নাম বিজ্ঞপুরুষো ইম দৃষ্টবস্থাং ক্রীড়া রতিঞ্চ জনয়েৎ শুভসংজ্ঞিতাং বা॥"

'ইহার আরোগ্যলাভ স্বপ্নক্রীড়াবৎ। এই ব্যাধিভয় ও দুর্দ্দশা দেখিয়া কোন্ বিজ্ঞ পুরুষ রতিক্রীড়াকে শুভজনক বলিয়া মনে করিতে পারে?'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনি উঠিল,—'ব্যাধিপি দুঃখা।' কুমার সারথিকে রথ ফিরাইতে কহিলেন; বলিলেন,—"আর আমার উদ্যান-বিহারের আকাঙ্ক্ষা নাই; চল, গৃহে ফিরিয়া যাই।"

তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় দিবস ঐরূপে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া, রাজার হৃদয় দ্বিগুণতর উদ্বেলিত হইল। কুমারের চাঞ্চল্য-দূরীকরণ মানসে তিনি যথাযোগ্য ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন।

আবার কিছুদিন অতিবাহিত হইল। আবার একদিন কুমার উদ্যান-ভ্রমণে বহির্গত হইবার কল্পনা করিলেন। সারথি যথারীতি রথ-পরিচালনায় আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু কি বিধিলিপি! এ দিন পথে আর এক নূতন বিঘ্ন উপস্থিত হইল। কুমার শকট হইতে দেখিলেন, একটী শবদেহ স্কন্ধে লইয়া তাহার রোরুদ্যমান আত্মীয়গণ শ্মশানাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

সেই অভাবনীয় দৃশ্য দর্শনে কুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কিং সারথে! পুরুষ মঞ্চোপরি গৃহীতো উদ্ধৃত কেশনখপাংশু শিরে ক্ষিপন্তি।

পরিচারয়িত্ব বিহরন্ত বক্ষাড়য়ন্তো নানা বিলাপবচনানি উদীরয়ন্তঃ।"

'এ কি, সারথি? ঐ যে বিশৃঙ্খলকেশ পাংশুনখ পুরুষ—উহাকে মঞ্চোপরি শয়ান করাইয়া, বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে পথের ধুলি উড়াইয়া, উহারা কোথায় লইয়া যাইতেছে? কেনই বা উহাদের মুখ হইতে নানা বিলাপ-বাক্য নির্গত হইতেছে?'

সারথি উত্তর দিলেন,—

"এষোহি দেব পুরুষো মৃত্যু জম্বুদ্বীপে নহি ভুয় মাতৃপিতৃ দ্রক্ষ্যতি পুত্রদারাম্।

অপহায় ভোগগৃহ মাতৃপিতৃমিত্রজ্ঞাতিসঙ্গং পরলোক প্রাপ্তু নহি দ্রক্ষ্যতি ভুয় জ্ঞাতিম্।"

'হে দেব! এই পুরুষের জম্বুদ্বীপে মৃত্যু হইয়াছে। এ ব্যক্তি আপন পিতা মাতা দারা পুত্র প্রভৃতিকে আর দেখিতে পাইবে না। এই ভোগগৃহ, পিতৃমাতৃজ্ঞাতিমিত্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এ ব্যক্তি এখন পরলোকগত হইয়াছে। আত্মীয়গণ কেহই ইহাকে দেখিতে পাইবে না।'

কুমার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

"ধিক্ যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন, আরোগ্য ধিগ্বিবিধব্যাধিপরাহতেন।

ধিক্ জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন, ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গৈঃ॥

যদি জরা ন ভবেয়া নৈব ব্যাধির্ন মৃত্যুঃ তথাপিচ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।

কিং পুনঃ জরাব্যাধিমৃত্যুনিত্যানুবদ্ধাঃ, সাধু প্রতিনিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচং॥"

'যে যৌবন জরাগ্রস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সে যৌবনে ধিক্! যে আরোগ্য বিবিধ ব্যাধির দ্বারা পরাহত হয়, সে আরোগ্যে ধিক্! পুরুষের যে জীবনে স্থায়িত্ব নাই, সে জীবনে ধিক্! এ অনিত্যত্ব দেখিয়াও যে পণ্ডিত জন রতিপ্রসঙ্গে আসক্ত হন, তাঁহাকেও ধিক্! যদি জরা না আসে, ব্যাধি না হয়, অথবা মৃত্যু না হয়, তথাপি পঞ্চস্কন্ধ আশ্রয়-ভূত দেহীর মহা কষ্ট। সুতরাং জরাব্যাধিমৃত্যুর নিত্য অধীনতাতেই বা কি আসে যায়! সারথি! রথ প্রতিনিবৃত্ত কর। আমায় মুক্তির চিন্তার অবসর দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে ধ্বনিত হইল,—"মরণম্পি দুক্খম্।"

কুমার বিষণ্ণমনে গৃহে ফিরিলেন। নৃপতি অত্যধিক উদ্বিগ্ন হইয়া কুমারের চিত্ত-বিনোদনের পক্ষে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু এ যাত্রা কুমার এতই চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন যে, দিবসত্রয় তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে কষ্ট অনুভব করিলেন।

আবার কিছু দিন কাটিয়া গেল। পরিবর্ত্তনশীল কালপ্রবাহ কুমারের চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত করিল। কুমার আবার একদিন উদ্যান-ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আবার শকট সজ্জীকৃত হইল। আবার কুমার উদ্যান-বিহারে যাত্রা করিলেন। কিন্তু এ দিন

সম্মুখে এক অনুপম অভিনব দৃশ্য! কুমার দেখিলেন,—কাষায়-বসন-পরিহিত প্রশান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী সম্মুখে দণ্ডায়মান।

কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কিং সারথে! পুরুষ শান্তপ্রশান্তচিত্তো নোৎক্ষিপ্তচক্ষু ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী।

কাষায়বস্ত্রবসনো সুপ্রশান্তচারী পাত্রং গৃহিত্বং ন চ উদ্ধত উন্নতো বা।"

'সারথি! কে এই মহাপুরুষ? শান্তপ্রশান্তচিত্ত, অচঞ্চলদৃষ্টি, কাষায়বসনপরিহিত, সুপ্রশান্তচারী—ভিক্ষাপাত্র করে—কে ইনি চলিয়াছেন? অনুদ্ধত, অনুন্নত,—সমজ্ঞান-সম্পন্ন—কে ইনি মহাপুরুষ?'

সারথি কহিলেন,—

"এষোহি দেব পুরুষ ইতি ভিক্ষু নামা অপহায় কামরতয়ঃ সুবিনীতচারী।

প্রব্রজ্যাপ্রাপ্তঃ সমমাত্মন এষমানো সংরাগদ্বেষবিগতো তিষ্ঠতি পিণ্ডচর্য্যা।"

'হে দেব! এই পুরুষ ভিক্ষু নামে পরিচিত। ইনি কামরতি সমূহ বিসর্জ্জন দিয়া সুবিনীতাচারী হইয়াছেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক ইনি আত্মার সমত্ব বা শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন। রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া, সামান্যমাত্র ভিক্ষালব্ধ আহারে ইনি জীবন-ধারণ করিতেছেন।'

কুমারের বদনমণ্ডলে হাস্যরেখা বিকশিত হইল। হাস্যমুখে কুমার কহিলেন,—

"সাধু সুভাষিতমিদং মম রোচতে চ, প্রব্রজ্যা নাম বিদুভিঃ সততং প্রশস্তা।

হিতমাত্মনশ্চ পরসত্ত্বহিতঞ্চ যত্র সুখজীবিতং সুমধুরমমৃতং ফলঞ্চ।"

'সাধু! আমার রুচিকর এ বড় উত্তম কথা। এই প্রব্রজ্যাই জ্ঞানিগণ প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ইহাতে আত্মহিত, পরসত্ত্বহিত, সুখজীবন এবং সুমধুর অমৃতফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

এই বলিয়া কুমার আবার রথ ফিরাইতে আদেশ করিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"প্রব্রজ্যাই শ্রেষ্ঠ পথ।"

চতুর্থ দিবস উদ্যান-যাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, কুমারের চিত্ত বিষম চিন্তায় উদ্বেলিত হইল। সংসারের সেই বিষম বন্ধন—স্নেহের বন্ধন, প্রেমের বন্ধন, সৌহার্দ্দ্যের বন্ধন, আত্মীয়তার বন্ধন, কর্ত্তব্যের বন্ধন—শত শত ডোরে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কেমন করিয়া—কোন্ অস্ত্র কোথায় আছে, তাহার দ্বারা—সে বন্ধন ছিন্ন করিবেন? বন্ধনের তীব্র যাতনায় অস্থির হইয়া প্রমাদ গণিতেছেন, সহসা আর এক নূতন বন্ধন আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। উদ্যান-যাত্রার চতুর্থ দিবস, রথ হইতে অবতরণ কালে দূত আসিয়া এক শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।*

বন্ধন মোচন চিন্তা।

* গৃহত্যাগের পূর্ব্বে এই চতুর্ব্বিধ দৃশ্য-দর্শন সম্বন্ধে ত্রিপিটক মধ্যে বিশেষভাবে কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। জাতক গ্রন্থে ঐ বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা পরবর্ত্তী কালের সংযোজনা বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন। ঐ ব্যাপার কবি-কল্পনা বলিয়াও কাহারও কাহারও ধারণা। ওলডেনবর্গ বলেন,—"Later traditions concocted this narrative preparatory to the flight of Gautama from his home..."

সে সংবাদ—গোপাদেবী এক সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র-সন্তান লাভ করিয়াছেন। দেখিলেন,—সেই আনন্দ উৎসবে রাজপুরী আনন্দমুখরিত হইয়াছে। দূতমুখে সংবাদ শুনিয়া, বন্ধন-চিন্তান্দোলিত কুমারের চিত্তে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার হইল, কুমার গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—'রাহুলং জাতন্তি বন্ধনং জাতন্তি।'' কুমারের মুখ হইতে কি ভাবে এ উত্তর নির্গত হইয়াছিল, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। কিন্তু রাজা শুদ্ধোদন ঐ উপলক্ষে নব-কুমারকে 'রাহুল' নামে অভিহিত করিলেন। নবকুমারের জন্ম উপলক্ষে নগর আনন্দ-স্রোতে নিমগ্ন হইল। সিদ্ধার্থ যখন নগরে প্রবেশ করিলেন, চারি দিকের আনন্দধ্বনিতে তাঁহার কর্ণ পরিপুরিত হইল। কৃশা গৌতমী নাম্নী এক সুন্দরী শাক্যকুমারী প্রাসাদ চূড়া হইতে কুমারের প্রত্যাবর্ত্তন লক্ষ্য করেন। সিদ্ধার্থের রূপে তাঁহার নয়ন মুগ্ধ চিত্ত দ্রবীভূত হয়। প্রাসাদ-শীর্ষে বসিয়া কুমারী কলকণ্ঠে একটী সঙ্গীতালাপ করেন। সিদ্ধার্থের রূপে তিনি যে মুগ্ধা হইয়াছেন, সেই সঙ্গীতে সেই ভাব প্রকাশ পায়। সেই সঙ্গীতের চুইটী চরণ,—

"নিব্বুতা নূন সা মাতা, নিব্বুতো নূন সো পিতা।
নিব্বুতা নূন সা নারী যস্সায়ং ঈদিসো পতীতি॥"

'সেই জননীই প্রকৃত সুখী, সেই পিতাই প্রকৃত সুখী, সেই স্ত্রীই প্রকৃত সুখী, যাঁহারা এই প্রভুকে আপনার বলিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন।' কৃশা গৌতমীর গীত শ্রবণে বুদ্ধদেব আপনার কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য রত্নহার উন্মোচন পূর্ব্বক উপহার দিলেন। সে উপহার প্রাপ্তে হর্ষোৎফুল্লচিত্তে গৌতমী মনে মনে কুমারকে পতিত্বে বরণ করিলেন। তাঁহার রূপ-প্রভায় ও সঙ্গীত-মাধুর্য্যে কুমার তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া কুমারীর আর আনন্দের অবধি রহিল না। কিন্তু এ দিকে কুমার ভাবিতে লাগিলেন,—"আনন্দ! আনন্দ কোথায় পাই? সঙ্গীত যে আনন্দের—যে সুখের বিষয় কীর্ত্তন করিল, সে আনন্দ—সে সুখ কোথায় আছে?" আনন্দের অনুসন্ধানে—শান্তির অনুসন্ধানে, কুমারের চিত্ত অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিল। নবকুমারের জন্মোৎসবে নগর আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু সিদ্ধার্থ সে আনন্দে কোনই আনন্দ দেখিতে পাইলেন না। সে আনন্দের পরপারে যে অনন্ত আনন্দ আছে, তিনি তাহারই অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইলেন। কৃশা-গৌতমী যে সঙ্গীত আলাপ করিলেন, সেই সঙ্গীত হইতে নির্ব্বাণের বীজ কুমারের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল। গৌতমীর সঙ্গীতে কুমারের পিতামাতার আনন্দের ও সুখের বিষয় বিঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইতে কুমারের প্রাণে প্রশ্ন উঠিল,—'প্রকৃত সুখ কি? কোথায় সে সুখ দৃষ্ট হয়? কি উপায়েই বা সেই অমূল্য রত্ন লাভ করিতে পারা যায়? কোনও বাহ্য পদার্থের সাহায্যে তাহা মানুষের অধিগত হইতে পারে কি? তাঁহার

The history of these excursions has been transferred to the later legends as is almost expressly stated in the Jatak in page 59 from the Mahapadhanasutta (Diggha Nikaya) where it is introduced as referring to the Buddha Vipassi. Of Goutama Buddha the excursions are, as far as I know, never narrated in the Tripitaka" *Vide*, Oldenburg's *Buddha*.

ব্যক্তিত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাঁহার পিতামাতা অথবা সহধর্ম্মিণী সত্যই কি সুখী? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। সংসারের বিষম সংগ্রামে তৃষ্ণাকে পরাভূত করিতে না পারিলে, কখনই সুখ নাই। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত কামনাকে সম্পূর্ণরূপ ধ্বংস করিতে না পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিতেই হইবে। এইরূপে সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া বিজয়ী আত্মা যখন মৃতশত্রুর ধ্বংসাবশেষের উপর প্রশান্তভাবে উপবেশন করিতে সমর্থ হইবে, তখনই প্রশান্ত সত্যের অনুধ্যানে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিব।' কৃশা গৌতমীর গীতে যে 'নিব্বুত' (নিবৃত) শব্দ শ্রুত হইয়াছিল, সেই শব্দ এখন তাঁহার হৃদয়ে ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল। তিনি মনে মনে কহিলেন,—'নিব্বুত! নিব্বুতই আনন্দ!' অতঃপর কি উপায়ে 'নিব্বুত' অবস্থা লাভ করিতে পারেন, তাহাই তাঁহার অনুধ্যান হইল। * সে দিন তাঁহার প্রাসাদে নৃত্য-গীত আনন্দের প্রচুর বন্দোবস্ত ছিল। কৃশা গৌতমী প্রভৃতি কুমারীগণ সঙ্গীতের সুধাতরঙ্গে তাঁহার কক্ষ উচ্ছ্বসিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কুমারের চিত্ত তৎপ্রতি আদৌ আকৃষ্ট হইল না। যে চিন্তাকীট তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই জ্বালায় অস্থির হইয়া তিনি অবসন্ন অচৈতন্য অবস্থায় নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। নর্ত্তকীগণ ও গায়িকাগণ তাঁহাকে নিদ্রাতুর দেখিয়া বিশ্রামের অবসর গ্রহণ করিল। কুমার নিদ্রিত হইলে, তাহারাও নিদ্রিত হইয়া পড়িল। যে কক্ষে নৃত্যগীত আমোদ চলিতেছিল, সেই কক্ষ সুগন্ধ তৈলের দীপাবলিতে আলোকিত ছিল। সঙ্গীত-নিপুণা সুন্দরীগণ নিদ্রিতা হইলে, রাত্রি দ্বিপ্রহরে কুমারের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি একবার কক্ষের চারি ধারে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাতে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। সুন্দরীগণের প্রতি চাহিতেই তিনি দেখিলেন,—যেন তাঁহার সম্মুখে শব-কঙ্কাল-সমূহ বিস্তৃত রহিয়াছে। যাহাদের সৌন্দর্য্যসুষমায় চিত্ত বিমুগ্ধ করিয়াছিল, জীবন সত্ত্বেও তাহাদের এ কি শোচনীয় অবস্থা! বস্ত্রাদি অঙ্গ হইতে বিচ্যুত অবিন্যস্ত; কাহারও দন্তে দন্তে ঘর্ষণ হওয়ায় বিকট স্বর উত্থিত হইতেছে; কাহারও বা মুখনিঃসৃত লালাক্ষরণে শয্যা-উপাধান সিক্ত ও বিবর্ণ হইয়াছে; কাহারও বা বদন-ব্যাদানে মুখগহ্বরের বিকট আকার দৃষ্ট হইতেছে। এইরূপ বিষম বিভীষিকাপ্রদ ঘৃণা-উৎপাদক অঙ্গ-ভঙ্গিসমূহ লক্ষ্য করিয়া কুমারের বড়ই অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি আপনাকে আপন মনে ধিক্কার দিয়া আপনিই কহিলেন,—'হায়, আমি কি ঘোর ভ্রমাবর্ত্তে নিপতিত রহিয়াছি। এই ক্লেদকৃমিপূর্ণ দেহ—ইহারই প্রতি আমার এত অনুরাগ? যে সৌন্দর্য্য এত ক্ষণস্থায়ী, যে সৌন্দর্য্যের মূলে আদৌ সত্য নাই—যাহা মিথ্যা ছায়াবাজি মাত্র, তাহারই মোহে আমি মুগ্ধ হইয়াছি! যাহা সত্য, যাহা নিত্য, তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল না! সে অপরিবর্ত্তনশীল নিত্যস্বরূপ সত্যকে

* কৃশাগৌতমীর উচ্চারিত 'নিব্বুত' শব্দ নির্ব্বাণের বীজস্বরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। বাইগাণ্ডেতের মতে,—'It is as it were the embryo of the whole system'. রিজ ডেভিডস্ বলেন,—'The force of the passage is due to the fulness of meaning which to the Buddhists the word Nibbuta and Nibbana convey.'

ভুলিয়া আমি এই সদাপরিবর্ত্তনশীল মিথ্যার পশ্চাতে চলিয়াছি! ধিক্ আমার মানব-জন্ম গ্রহণ।' কুমারের চিত্ত যখন এইরূপ আত্মগ্লানিতে জর্জ্জরীভূত, তখন আকাশে দৈববাণী হইল, দেবগণ একটী 'গাথা' আবৃত্তি করিলেন,—

"কর্ম্মক্ষেত্রেকৃতং তৃষ্ণাসলিলজং সৎকায় সংজ্ঞীকৃতং
অশ্রুস্বেদকফাংমূত্রবিকৃতং শোণিতবিন্দ্বাকুলং
বস্তি পূয বসাস্থমস্তকরসৈঃ পূর্ণং তথা কিল্বিষৈঃ
নিত্য প্রস্রবিতং হ্যমেধ্যসংকুলং দুর্গন্ধি নানাবিধং
অস্থী দন্ত সকেশরোমবিকৃতং চর্ম্মাবৃতং লোমশং
অন্তঃপ্লীহযকৃৎ বসোদকসৈনৈ রেভিশ্চিতং দুর্বলম্
মজ্জাস্নায়ুনিবদ্ধ যন্ত্রসদৃশং মাংসেন শোভীকৃতং
নানাব্যাধিপ্রকীর্ণ শোককলিলং ক্ষুত্তর্ষসম্পীড়িতং
জন্তুনাং নিবয়ং অনেকসুষিরং মৃত্যুজরাক্রান্তিতং
দৃশ্যা কোহি বিচক্ষণে রিপুনিভং মন্যে শরীরং স্বকং।"

"কর্ম্মক্ষেত্রে তৃষ্ণাসলিলসেচনে সঞ্জাত, সৎকায় সংজ্ঞায় অভিহিত, এই যে দেহ, এ দেহ অশ্রু স্বেদ পুরীষ মূত্র দ্বারা বিকৃত, শোণিতবিন্দুসমাকুল, বস্তি পূয বসা মস্তক প্রভৃতি রসে ও পাপে পরিপূর্ণ, সদা প্রস্রবিত, অমেধ্যসঙ্কুল, দুর্গন্ধপূর্ণ, নানাবিধ অস্থি দন্ত কেশ রোম দ্বারা বিকৃত, চর্ম্মাবৃত, লোমযুক্ত, প্লীহা যকৃৎ রসরক্ত প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, মজ্জাস্নায়ু-নিবদ্ধ যন্ত্রের অনুরূপ মাংসের দ্বারা সজ্জিত, নানাপ্রকার ব্যাধিপ্রপীড়িত, শোক-নিলয়, ক্ষুৎপিপাসা কাতর, জীবগণের নিরয়স্থান, বহু ছিদ্রসমন্বিত, জরামৃত্যুর আবাসস্থান, এই যে দেহ,—কোন্ বিজ্ঞজন ইহাকে শত্রু মনে না করিয়া, আপনার মনে করিতে পারে?' অর্থাৎ,—ক্লেদ কৃমি-কীটপূর্ণ দেহকে যে জন আপনার বলিয়া মনে করে এবং তৎপ্রতি মমত্বপরায়ণ হয়, তাহার ন্যায় ভ্রান্ত আর কে আছে? সেই অবস্থায় এবম্বিধ দৈববাণীতে সিদ্ধার্থের প্রাণ অধিকতর ব্যাকুল হইল। যে জীবন তৃষ্ণার অধীন, যে জীবন কামনার বশবর্ত্তী, শরীরীই হউক আর অশরীরীই হউক, ইহলোকেই অবস্থিতি করুক, আর পরলোকেই আশ্রয়গ্রহণে সমর্থ হউক, সে জীবন নিয়ত যেন দহ্যমান অগ্নিশিখার মধ্যে আশ্রয় লইয়া আছে। কুমারের মনে হইতে লাগিল,—'আবাসভবন অগ্নিসংযুক্ত হইয়াছে; এখনই ভস্মসাৎ হইবে।' কুমার অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—'যন্ত্রণা! অসহ্য যন্ত্রণা! আজই, এই মুহূর্ত্তেই, আমি এ সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনতার অনুসন্ধান করিব।'

কুমার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ত্বরিতপদে কক্ষ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন,—"কে আছ এখানে?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাইলেন,—"আপনার ভৃত্য ছন্দক আজ্ঞাধীন রহিয়াছে।"

কুমার উদ্বেলিত-কণ্ঠে কহিলেন,—"উঠ ছন্দক, শীঘ্র উঠ, আর বিলম্ব করিও না। এখনই আমি সংসার হইতে বিদায় লইব; নির্জ্জনতার অনুসন্ধানে যাইব। যাও, অশ্বশালায় যাও, আমার জন্য সেই দৃঢ়কায় অশ্বটীকে সজ্জিত করিয়া আন।"

ছন্দক প্রভুকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। অবিলম্বে অশ্ব সজ্জিত হইয়া আসিল। প্রভুকে তাঁহার কর্ত্তব্য সাধনের পথে বহন করিয়া লইয়া যাইবে; সুতরাং তাঁহার প্রিয় অশ্ব কণ্টকের দেহ আনন্দে আপ্লুত হইল।

অশ্ব সজ্জিত হইয়া আসিলে কুমার একবার ধীরে ধীরে আপন শয়নগৃহের দ্বার উন্মোচন করিলেন; দেখিলেন—তাঁহার প্রাণসম প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী সদ্যোজাত শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া নিদ্রাভিভূতা রহিয়াছেন,—তাঁহার একটী বাহু শিশুর উপাধান রূপে অবস্থিত, অপর বাহু দ্বারা তিনি শিশুর অঙ্গ বেষ্টন করিয়া আছেন। দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাদের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ক্ষণকাল কি-যেন কি চিন্তা করিলেন। পরক্ষণেই চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিলেন,—"না! আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করা হইবে না! আর বিলম্ব করিলে, আমার দেহ-সঞ্চালন শব্দে হয় তো শিশুর জননী জাগিয়া উঠিতে পারে! তাহা হইলে, আমার শুভ-যাত্রার পথে দারুণ অন্তরায় উপস্থিত হইবে। দেখিব,—সন্তানের মুখ দেখিব;—যদি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারি। দেখিবার সেই উপযুক্ত সময়।" কুমার ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিলেন; ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ছন্দক অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। নাটগণের মায়ামোহে আচ্ছন্ন থাকায় প্রহরিগণ সে সংবাদ অবগত হইতে পারিল না। কুমার কণ্টক সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অশ্বকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"কণ্টক! তুমি ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট। তোমার সহায়তায় আমার লক্ষ্য সত্বর সুসিদ্ধ হউক। মনুষ্যগণ ও দেবগণ অশেষ ক্লেশের অধীন হইয়া আছেন। তাঁহাদের মুক্তির জন্য আমায় বুদ্ধ হইতে হইবে। তাঁহাদিগকে নির্ব্বাণ-জলধির শান্তিময় ক্রোড়ে লইয়া যাইবার জন্য আমায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে।"

ছন্দক পুনঃপুনঃ প্রভুকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যাত্রার সময় পুনরায় অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

অবিলম্বে কুমার ঘোটকে আরোহণ করিলেন। কণ্টক নিঃশব্দে নগর-তোরণ অতিক্রম করিল। * রাজকুমার গার্হস্থ্য-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস পথের পথিক হইলেন।

---

* ললিতবিস্তরে আছে, বুদ্ধদেব গৃহত্যাগের পূর্ব্বে একদিন গভীর রাত্রে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। পিতা তাঁহাকে গৃহত্যাগের অনুমতি দেন, ইহাই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল। সাক্ষাৎ করিয়া তিনি পিতার নিকট চারিটী বর প্রার্থনা করেন। পিতা তাঁহাকে গৃহবাসী করিবার জন্য নিয়ত ব্যাকুল ছিলেন। কুমার তাই পিতাকে বলেন,—'আমায় চারিটী বর দেন; তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত মনে সংসারে বাস করি।' পিতা বরের বিষয় জানিতে চাহিলে, কুমার বলেন,—'আমি যেন জরায় অভিভূত না হই, আমায় যেন ব্যাধি আক্রমণ না করে, আমার যেন মৃত্যু না হয়, আর আমি যেন অনন্ত সম্পত্তি লাভ করি।' কিন্তু সে অসম্ভব প্রার্থনা রাজা পূরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কুমার কহিলেন,—'তবে আমায় এই বর দেন যে, আমি সংসার ত্যাগ করিলে আপনি কাতর হইবেন না।' পুত্র-স্নেহের মোহে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাহাতে সম্মত হন। সেই সম্মতি পাইয়াই কুমার গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের প্রব্রজ্যা।

[প্রব্রজ্যার পথের অন্তরায়;—প্রব্রজ্যায় দৃঢ়তা;—সিদ্ধার্থের সন্ন্যাসী বেশ;—সন্ন্যাসী বেশে বিম্বিসারের রাজধানীতে প্রবেশ;—বিম্বিসারের নিকট বিদায় গ্রহণ;—পথে যোগ শিক্ষা;—নৈরঞ্জনা নদীর তীরে ছয় বৎসর কঠোর সাধনা;—বোধিবৃক্ষমূলে নির্ব্বাণ-লাভ;—মার বিজয়,—মারগণের সহিত ঘোর সংগ্রাম ও সে সংগ্রামে তাঁহার জয়লাভ;—উপসংহার।]

মহা মায়ার প্রভাবে নগরী সুষুপ্তিঘোরে আচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং ছন্দকসমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে অনায়াসে কুমার নগরের তোরণ-দ্বার অতিক্রম করিলেন। এ পর্য্যন্ত কোনই অন্তরায় আসিয়া পথ অবরোধ করিল না। এখন অভিনব অন্তরায়-সমূহ তাঁহার গতিপথে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। পবিত্রাত্মার পরম পবিত্র সঙ্কল্পের পথে প্রথম প্রতিবাদী হইল—প্রলোভন। মার বা মান নামক নাটদেবতা মূর্ত্তিমান প্রলোভনরূপে কুমারের সম্মুখীন হইয়া কহিলেন,—"কেন সিদ্ধার্থ, কি কারণে তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে? আর সপ্তাহকাল অপেক্ষা কর; তুমি সার্ব্বভৌম সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত হইবে। মহাদ্বীপ চতুষ্টয়ে তোমার প্রাধান্য বিস্তৃত হইবে; কেন তুমি সন্ন্যাসী হইবে? এস,—প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন কর।"

পথে অন্তরায়।

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি? কেন আমার শুভ-সঙ্কল্পে প্রতিবাদী হইতেছ?"

প্রতিনিবৃত্তকারী উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিল,—"আমি তোমার শুভানুধ্যায়ী।"

সিদ্ধার্থ কহিলেন,—"আমি জানি যে, আমি সার্ব্বভৌম সম্রাট পদ লাভ করিতে পারি; কিন্তু পার্থিব সম্মানে আমার আদৌ আসক্তি নাই। আমার উদ্দেশ্য, আমি বুদ্ধত্ব লাভ করিব।"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিলেন বটে; কিন্তু তাহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপ মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। কাম, ক্রোধ, অজ্ঞানতা তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। ছায়া যেমন কায়ার অনুসরণ করে, উহারাও সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভের পথে কণ্টক বিস্তারে প্রবৃত্ত হইল। এক দিকে সিদ্ধার্থের গতিপথে ইন্দ্রাদি দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, সদ্ভাবসম্পন্ন নাটগণ তাঁহার গন্তব্য-পথ পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; অন্য দিকে অসৎ নাটগণ নানা মায়াজাল বিস্তার করিয়া, তাঁহাকে পশ্চাতের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কখনও বা পিতৃস্নেহ মূর্ত্তিমান হইয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইল; কখনও বা সহধর্ম্মিণীর প্রেম-প্রীতি আসিয়া তাঁহার গন্তব্য পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল; কখনও বা পুরদেবতা আসিয়া গৃহপ্রত্যাগমনের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। কখনও বা প্রেত-পিশাচের বিভীষিকা, সন্ন্যাস-জীবনের কষ্টের সহিত মিশিয়া, তাঁহার অন্তর আক্রমণ করিবার চেষ্টা পাইল; কখনও বা প্রাসাদের—রাজৈশ্বর্য্যের মনোমোহিনী-মূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে প্রতিভাত হইয়া অভীষ্ট দৃশ্য দর্শনে অন্তরায় আনয়ন করিল। সিদ্ধার্থের অন্তর ইষ্টানিষ্টের ঘাত-প্রতিঘাতে, সদ্বৃত্তি-অসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্ব-

---

'মার' বা 'মান' নাটদেবতার অন্যতম। ভারতবর্ষে 'মার' এবং ব্রহ্মদেশে 'মান' নামে পরিচিত। বুদ্ধদেবকে ধ্যানে প্রতিনিবৃত্তি করিবার জন্য প্রলোভন বিভীষিকা প্রভৃতি রূপে মারের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

কোলাহলে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সিদ্ধার্থ সকল প্রলোভন সকল বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিলেন। রাজৈশ্বর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

"নাহং প্রবেক্ষি কপিলবস্তু পুর অপ্রাপ্য জাতি মরণান্তকরম।
স্থানাসনং শয়ন চংক্রমণং ন করিষ্যেহং কপিলবস্তু মুখং
যাবন্ন লব্ধং বরবোধি ময়া অজরামরং পদবরং হ্যমৃতম॥"

'আমি আর এই কপিলবস্তু নগরে উপবেশন, শয়ন বা ভ্রমণ করিব না। যতদিন পর্য্যন্ত অজর অমর অমৃতপ্রাপ্তিরূপ জ্ঞানলাভ না করি, তত দিন আর এ নগরের প্রতি ফিরিয়া চাহিব না।' সিদ্ধার্থের সঙ্কল্পের নিকট প্রলোভন পরাভূত হইল; ভয়, বিভীষিকা দেখিল। তখন দেবগণ তাঁহার গন্তব্য পথের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সহায়-রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার গন্তব্য পথ দিব্য-আলোকে উদ্ভাসিত হইল; পথের সকল বাধা-বিঘ্ন সরিয়া গেল।

ত্রিশ যোজন পথ অতিক্রমের পর তাঁহারা একটী নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "এ নদীর নাম কি?"—সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলে, ছন্দক উত্তর দিলেন। তখন তাঁহারা ত্রিশ যোজন অন্তরে অনোমা-নদীর তীরে উপস্থিত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিলেন। সিদ্ধার্থের ইঙ্গিতক্রমে কণ্টক লম্ফ-প্রদানে অনোমা উত্তীর্ণ হইল। অনোমার পরপারে আসিয়া, ছন্দককে সম্বোধনপূর্ব্বক কুমার কহিলেন,—"ছন্দক! এইবার তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও।" এই বলিয়া আপনার অঙ্গাভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। পুনরপি কহিলেন,—"যাও ছন্দক! তুমি আর কণ্টক গৃহে ফিরিয়া যাও। আমার এই আভরণগুলি আমার পিতামাতাকে দেখাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিও—আমার জন্ত তাঁহারা যেন শোক-সন্তপ্ত না হন। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিও—আমি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া আবার তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইব। তখন তাঁহাদের সকল আশা নিবৃত্ত হইবে; তাঁহারা শান্তি-সুখে সুখী হইতে পারিবেন।' *

প্রব্রজ্যার লক্ষণ।

ছন্দক অশ্রুগদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—"প্রভু! এই অধম ভৃত্যকে কেন পরিত্যাগ করেন? আমিও আপনার সঙ্গে, সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতিপ্রার্থী।"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিলেন,—"না ছন্দক, তাহা হইবে না। তোমার এখনও সে সময় উপস্থিত হয় নাই।"

ছন্দক পুনঃপুনঃ মিনতি জানাইলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ কোনক্রমেই সম্মতি প্রদান করিলেন না। অতঃপর ছন্দকের হস্তে আপনার বহুমূল্য বসনভূষণ অর্পণ করিয়া, কুমার আপনা-আপনি কহিলেন,—"এখনও একটু অবশিষ্ট আছে। আমার মস্তকের এই সুবিন্যস্ত কেশদাম, আর আমার এই শ্মশ্রু-গুম্ফ—প্রব্রজ্যার পক্ষে এ সকলই অনাবশ্যক।" এই বলিয়া, অসি কোষমুক্ত করিয়া, এক হস্তে কোমল কেশগুলি আকর্ষণ পূর্ব্বক অন্য হস্তে কর্ত্তন করিলেন। এইরূপে শ্মশ্রুগুম্ফও কর্ত্তন করিয়া, আপনার শিরস্ত্রাণ ও কেশগুলি এক হস্তে

* ললিতবিস্তরে বুদ্ধদেবের এই উক্তিটী এই ভাবে লিখিত আছে,—"ছন্দো গৃহীত্ব কপিলপুরং প্রযাহি, মাতাপিতৃণাং মম বচনেন পৃচ্ছেঃ, গতঃ কুমারো ন চ পুনঃ শোচথাঃ বুদ্ধিত্ব বোধি পুনঃ মাগমিষ্যে, ধর্ম্মং শুনিত্ব ভবিষ্যথ শান্তচিত্তাঃ।"

ধারণ করিলেন। পরিশেষে হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"যদি আমি বুদ্ধ হইবার উপযুক্ত পাত্র হই, আমার এই শিরস্ত্রাণ ও কেশরাশি আকাশে ভাসমান হউক। যদি আমি বুদ্ধত্ব লাভে অসমর্থ হই, শিরস্ত্রাণ ও কেশরাশি ভূপতিত হউক।" এই বলিয়া সিদ্ধার্থ যেমন শিরস্ত্রাণ সহ কেশরাশি ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলেন, উহারা যোজন ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান রহিল। অবশেষে একজন নাটদেবতা একটি বহুমূল্য পাত্র আনয়া তাহাতে সেই শিরস্ত্রাণ সহ কেশ-রাশি স্থাপন করিলেন। অতঃপর সেগুলি দেবলোকে সংবাহিত হইল।* ছন্দক ও কণ্টক যখন তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগে বাধ্য হইল, তখন তাহাদের উভয়েরই শোকের ও পরিতাপের অবধি রহিল না। কথিত হয়, সেই শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া কণ্টক সেইখানেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। প্রভু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ছন্দকও প্রাণ-পরিত্যাগে মনস্থ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রভুর বসন-ভূষণ তাঁহার পিতামাতার নিকট বহন করিয়া লইয়া যাইবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হওয়ায়, ছন্দক তখন আত্মত্যাগে সমর্থ হন নাই। কেননা, তাহা করিলে প্রভুর আদেশপালনরূপ কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইত। সুতরাং অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বিদায় লইয়া ছন্দক কপিলাবাস্তু অভিমুখে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ছন্দকের অবস্থা দর্শনে এবং অশ্বের আত্মবিসর্জ্জনে সিদ্ধার্থের মন একটু চঞ্চল হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে চাঞ্চল্য অল্পক্ষণ মধ্যেই দূরীভূত হয়। তিনি যখন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, সদ্যোজাত স্নেহের শিশুকে, প্রিয়তমা পত্নীকে এবং অতুল ঐশ্বর্য্যকে অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া আসেন, তখন তাঁহার যে দৃঢ়তা ছিল, এখনও তাঁহার সেই দৃঢ়তা প্রত্যক্ষীভূত হইল। তখন তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ়তা দেখিয়া, সঙ্কল্পের অবিচলতা দেখিয়া, হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে তাঁহার উদ্দেশে পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে দেবগণ গাহিয়াছিলেন,—

"ন রজ্যতে পুরুষবরস্য মানসং নভো যথা তম রজঃ ধূমকেতুভিঃ।
ন লিপ্যতে বিষয়সুখেষু নির্ম্মল জলে যথা নবনলিনং সমুদ্গতম্॥"

অর্থাৎ,—'পুরুষশ্রেষ্ঠের চিত্ত পৃথিবীর কোনও বস্তুতে আকৃষ্ট নহে। অন্ধকার, ধূলা, ধূম-কেতু প্রভৃতি আকাশের সহিত লিপ্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আকাশ নির্লিপ্ত। জলে নব-নলিন প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু জলের সহিত তাহা নির্লিপ্ত। পুরুষবরের চিত্তও সেইরূপ কোনও বিষয়সুখে লিপ্ত নহে।' বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা ঐ গাথা গাহিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন তাঁহার পথপ্রদর্শক হইলেন। সিদ্ধার্থ একাগ্রচিত্তে বুদ্ধত্ব-লাভের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার একাগ্রচিত্ততা, তাঁহাকে অনুকূল অবস্থায় লইয়া চলিল। সন্ন্যাসে কাষায়-বস্ত্র প্রয়োজন। সিদ্ধার্থ এখনও তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখনই সে ভাব তাঁহার মনোমধ্যে জাগরূক হইল, তখনই তিনি এক উপায় দেখিলেন। কাষায়বস্ত্রপরিহিত এক ব্যাধ † সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিল। সিদ্ধার্থ তাহাকে

* যেস্থলে বুদ্ধদেব ছন্দককে বিদায় দেন ও কেশকর্ত্তন, করেন, সেখানে একটী চৈত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চূড়াচ্ছেদ হওয়ায় সেই চৈত্যের নাম "চূড়া প্রতিগ্রহণ" হয়।

† কোনও গ্রন্থে ব্রহ্মা তাঁহাকে কাষায়-বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে; কোনও গ্রন্থে ব্যাধ-রূপী দেবতার প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। অন্য মতে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের মিত্র তাঁহাকে সন্ন্যাসের উপকরণ-

ডাকিয়া বস্ত্র-বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। কুমারের মূল্যবান পরিচ্ছদ দর্শনে, ব্যাধ তৎক্ষণাৎ বস্ত্রপরিবর্ত্তনে স্বীকার পাইল। আপন বস্ত্র ব্যাধকে প্রদান করিয়া, ব্যাধের বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, কুমার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

সারথিকে বিদায় দিয়া, সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান পূর্ব্বক, সিদ্ধার্থ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। পথশ্রমে দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল। সম্মুখে সুবিস্তৃত আম্রকানন। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ একটী বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় লইল। ক্ষণকাল বৃক্ষতলে উপবেশনানন্তর ক্লান্তি অপসৃত হইল। তখন নির্জ্জনতার পবিত্র আনন্দে হৃদয় অধিকার করিল। অনাহারের বা অনিদ্রার কোনও ক্লেশ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। তিনি সপ্তাহকাল পরমানন্দে সেই আম্রকাননে অবস্থিতি করিলেন। ভয়-ভাবনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা এখন যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তবে যে আনন্দ-লাভের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা, সে আনন্দ কোথায়? নির্জ্জনতার আনন্দ মিলিল বটে; কিন্তু যে আনন্দের পর আর আনন্দ নাই, সে আনন্দ কোথায় মিলিবে? সপ্তাহ পরে সিদ্ধার্থ আম্রকানন পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। আম্রকানন পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থ পাদব্রজে ত্রিশ যোজন পথ অতিক্রম করিলেন। পথে দুই তিন স্থানে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইল। অবশেষে সিদ্ধার্থ রাজগৃহে উপনীত হইলেন। ঐ নগর রাজা বিম্বিসারের রাজধানী। নগরের তোরণ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া সিদ্ধার্থের মনে এক অভিনব চিন্তার উদয় হইল। "রাজা বিম্বিসার নিশ্চয়ই আমার আগমনের সংবাদ জানিতে পারিবেন। মহারাজ শুদ্ধোদনের পুত্র তাঁহার রাজধানীতে আসিয়াছেন জানিলে, তিনি নিশ্চয়ই নানাবিধ উপঢৌকন প্রদান করিতে আসিবেন। কিন্তু

সিদ্ধার্থের সন্ন্যাসি-বেশ।

সমূহ প্রদান করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যখন সন্ন্যাসের উপযোগী বস্ত্রাদির বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে কিরূপে তিনি সেই সকল উপাদান প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে তাহা এইরূপ প্রচার আছে,—"While his (Buddha's) attention was taken up with this consideration, a great B hama, named Gatigara, who in the days of the Buddha Kathaba had been an intimate friend of our Phralaong (Buddha) and who during the period that elapsed between the manifestation of that Buddha to present time, had not grown old, discovered at once the perplexity of his friend's mind. "Prince Theiddat", said he, "is preparing to become a Rahan, but he is not supplied with dress and other implements essentially required for his future calling. I will provide him now with thinbaing, the kowot, the dogout, the patta, the leathern girdle, the hatchet, the needle and filter." He took with him all these articles, and in an instant arrived in presence of Phralaong, to whom he presented them." বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের (কাথাবা বুদ্ধের) মিত্র 'গতিগর' ব্রহ্মা তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের উপযোগী দ্রব্যাদি প্রদান করেন। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে সূচ, কুঠার, জলপরিষ্কারক পাত্র (ফিল্টার) ও চর্ম্মের কটিবন্ধ প্রভৃতির পরিচয় পাই। ব্রহ্মদেশীয় ভিক্ষুগণের ঐ সকল সম্বল আজিও দৃষ্ট হয়। সূচের প্রয়োজন—ছিন্নবস্ত্র যুক্ত করিবার জন্য; কুঠারের প্রয়োজন—কাষ্ঠ-সংগ্রহের জন্য, ফিল্টারের প্রয়োজন—জল পরিষ্কারের জন্য, ইত্যাদি। সিদ্ধার্থ পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছদ ব্যবহারে অনভ্যস্ত ছিলেন। সুতরাং গতিগর ব্রহ্মাই তাঁহাকে সজ্জিত করাইয়াছিলেন।

আমি এখন সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। সুতরাং আমি তাঁহার সে উপঢৌকন কোনও প্রকারে গ্রহণ করিতে পারিব না। আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য আমাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া জীবনধারণের উপযোগী অন্ন মাত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। সুতরাং কোনরূপে এ নগর পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই এখন সর্ব্বপ্রকারে শ্রেয়ঃ।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বুদ্ধদেব পূর্ব্ব দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজগৃহের সন্নিকটে গিরিগুহায় বহু সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল। তাঁহাদের নিকট যোগ-শিক্ষা করাই সিদ্ধার্থের উদ্দেশ্য। সেইজন্যই তাঁহাকে রাজগৃহে প্রবেশ করিতে হয়। কিঞ্চিৎ ভিক্ষা সংগ্রহ করাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এখন, অল্প কিছু খাদ্য সংগ্রহ হইলেই সে নগর পরিত্যাগ করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প হইল। যদি কোনও দয়ার্দ্র গৃহস্থ কিছু খাদ্যসামগ্রী ভিক্ষাদান করেন,—এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধার্থ নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন; সহসা একটা কোলাহল উপস্থিত হইল। বুঝি ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া কোনও দেবতা মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইলেন! বুঝি বা কোনও দেবতা রাজগৃহবাসীর প্রতি কোনও ছলনা-জাল বিস্তার করিতে আসিলেন! সহসা সন্ন্যাসীকে দেখিয়া জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। অবিলম্বে রাজার নিকট সে সংবাদ পৌঁছিল। রাজা বিম্বিসার প্রথমে অমাত্যগণকে প্রেরণ করিলেন, এবং আপনি অন্তরাল হইতে ভিক্ষুর ভাবগতিক লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। রাজাদেশে ভিক্ষু সামান্য কিছু আহার প্রাপ্ত হইলেন বটে; কিন্তু রাজপুত্র তিনি, সেরূপ কদর্য্য আহার কখনও তাঁহার সম্মুখে তো আসে নাই! সুতরাং আহার্য্য-সামগ্রী দেখিয়াই প্রথমে তাঁহার চিত্ত একটু চঞ্চল হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ পূর্ব্বক তিনি সে আহার্য্য গলাধঃকরণ করিলেন। মনে মনে আপন চিত্ত-বৃত্তিকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন,—"মন! তুই নয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিস্! তোর আবার সুখস্পৃহা কেন? রসনা! সারাজীবন সুমিষ্ট সুস্বাদু সামগ্রী আস্বাদন করিয়াও কি তোর সাধ মিটে নাই? উদর! আবাল্য প্রচুর রাজভোগ পাইয়াও তোর গহ্বর পূরিল না?" সেই হইতে সিদ্ধার্থ যে কোনও আহার্য্যই প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই অমৃতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া ভোজন করিতেন।

সিদ্ধার্থের আচরণ প্রভৃতি আপনি লক্ষ্য করিয়া এবং অমাত্যগণের মুখে শ্রুত হইয়া, রাজা বিম্বিসার স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই দেব-দুর্ল্লভ সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। সেই ভিক্ষুবেশধারী রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া রাজা কহিলেন,—"মহাশয়! ভিক্ষুবেশধারী কে আপনি? তরুণ বয়স, নবনীতকোমল সুন্দর সুঠাম দেহ; আপনাকে দেখিয়া মনে হয়, যেন আপনি বহু সদ্‌গুণের আধার। আরও মনে হয়,—আপনি কোনও সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের বংশধর। আমার বিশাল রাজ্য, অতুল ধনসম্পত্তি, অসংখ্য দাস দাসী, হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি আপনার আনন্দ-বিধানের ও সুখ-সাধনের জন্য প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি আমার এই অসংখ্য পরিচারকগণকে গ্রহণ করুন, এই রাজ্যে অবস্থান কালে, আপনার যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে; সকলেই সে প্রয়োজন সাধনে যত্নবান থাকিবে।" এই

সন্ন্যাসী বেশে বিম্বসারের রাজধানীতে।

বলিয়া, রাজা বিম্বিসার ভিক্ষুর পরিচয়প্রার্থী হইলেন; কোন্ দেশ হইতে তিনি আসিয়াছেন, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

সিদ্ধার্থ বুঝিলেন, রাজা বিম্বিসার তাঁহার কোনও পরিচয় অবগত নহেন। সুতরাং সন্ন্যাসীর পক্ষে যতটুকু পরিচয় দেওয়া বিধেয়, তিনি তদনুরূপ উত্তর দিলেন; কহিলেন,—"আমি যে রাজ্য হইতে আসিয়াছি, সে রাজ্য এখন পবিত্র কোশল-বংশীয় কোনও পুণ্যশ্লোক নৃপতির শাসনাধীন। রাজবংশেই আমার জন্ম বটে; কিন্তু এখন আমি আমার রাজকীয় অধিকার সমস্ত বর্জ্জন করিয়াছি; আমি এখন সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী। এখন আর পার্থিব পদার্থে আমার প্রীতি নাই; এখন আমি কামনা-বাসনাকে অন্তর হইতে অন্তরিত করিয়াছি।"

উত্তর শুনিয়া রাজা একটু শিহরিয়া উঠিলেন; ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আপনিই কি তবে কুমার সিদ্ধার্থ! শুনিয়াছি, মহারাজ শুদ্ধোদনের পুত্র কুমার সিদ্ধার্থ, জন্ম-জরা-মৃত্যু-সন্ন্যাস দৃশ্য-চতুষ্টয় দর্শন করিয়া, সংসারত্যাগী হইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। আপনিই কি তিনি? দৈবজ্ঞগণের গণনার প্রথম অংশ সফল হইয়াছে; দ্বিতীয় অংশ যখন সফল হইবে, আপনি যখন পূর্ণত্ব লাভে সমর্থ হইবেন; আমার প্রার্থনা,—"আমার প্রতি, আর আমার এই প্রজাবর্গের প্রতি, একবার করুণা-নেত্রে চাহিবেন। পূর্ণ-জ্ঞান লাভ করিয়া আপনি যখন প্রত্যাবৃত্ত হইবেন; আমি ভরসা করি, আমার রাজ্য আপনার প্রথম পদধূলি-লাভে কৃতার্থ হইবে।" বিম্বিসারের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে প্রত্যাগমন কালে সিদ্ধার্থ রাজগৃহে পুনরাগমনে সম্মত হইলেন।

রাজা বিম্বিসার কি সহজে সিদ্ধার্থকে প্রব্রজ্যায় গমনে অনুমতি দিয়াছিলেন? মহারাজ শুদ্ধোদন তাঁহার একজন প্রধান অমাত্য-অন্তরঙ্গস্থানীয়। তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার একমাত্র পুত্র সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে চলিয়াছেন। সেই কুমারকে আপন রাজ্য-মধ্যে পাইয়া তিনি কি তাঁহাকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারেন? কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন, সংসারে সিদ্ধার্থকে বাঁধিবার উপযোগী বন্ধন আদৌ নাই; তিনি যখন বুঝিলেন, মায়ামোহের যত দৃঢ়-বন্ধনেই কুমারকে আবদ্ধ করা হউক না কেন, তাঁহার শাণিত বৈরাগ্য-অস্ত্র সকল বন্ধনই ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে; তখন আর কুমারের গতিপথে বাধা দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। নচেৎ, মহারাজ বিম্বিসার তো প্রথম সাক্ষাতেই বলিয়াছিলেন,—

বিম্বিসারের নিকট বিদায় গ্রহণ।

> "ভবহি মম সহায়ু সর্ব্বরাজ্যং। অহ তব দাস্যে প্রভূতং ভুঙ্ক্ষ্ব কামান্॥
> মা চ পুনর্ব্বনে বসাহি শূন্যে মাতুশ্চ তৃণেষু বসাহি ভূমিবাসং।
> পরম সুকুমার তুভ্যকায়ঃ ইহ মম রাজ্যে বসাহি ভুঙ্ক্ষ্ব কামান্॥"

'আপনি আমার সর্ব্বরাজ্য গ্রহণ করুন; আপনার ভোগের জন্য প্রভূত কাম্য-দ্রব্য প্রদান করিব, আপনি তাহা ভোগ করিবেন। জনশূন্য অরণ্যে বাস করিবেন না; তৃণাসনে বা ভূমিতলে বাস করিবারও প্রয়োজন নাই। এই পরম সুকুমার দেহ—সে কষ্টের উপযোগী নহে। আপনি আমার রাজসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সকল কাম্য উপভোগ করুন।'

কিন্তু সিদ্ধার্থ যে উত্তর দিয়াছিলেন, বিম্বিসার তাহাতে আর কোনও কথাই কহিতে পারেন নাই। সিদ্ধার্থ উত্তর দিয়াছিলেন,—

"স্বস্তি ধরণিপাল তেস্ত নিত্যং ন চ অহং কামগুণেভিরর্থীংকোস্মি। ১।
কামং বিষসমা অনন্ত-দোষা নরকে প্রপাতন প্রেততির্য্যকৃযোনি।
বিদুভির্বিগর্হিতা চাপ্যনার্য্যকামাঃ জহিত ময়া যশ্চ পক্কখেট পিণ্ড॥ ২।
কাম ক্রমফলা যথা পতন্তি যথা ইব অভ্র বলাহকা ব্রজন্তি।
অধ্রুব চপলগামি মারুতং বা বিকিরণ সর্ব্বশুভস্য বঞ্চনীয়াঃ॥ ৩।
কাম অলভমানা দহ্যন্তে তথাপি লব্ধা ন তৃপ্তি বিন্দবন্তি।
যদা পুরে অবশস্য তজ্জয়ন্তে তদ মহদ্দুঃখ জনেন্তি ঘোর কামা॥ ৪।
কাম ধরণিপাল যে চ দিব্যাঃ তথ অপি মানুষ কাম যে প্রণীতাঃ।
একু নর লভেতি সর্ব্বকামাং ন চ সো তৃপ্তি লভতে ভূয় এষঃ॥ ৫।
যে তু ধরণিপাল শান্তদান্তাঃ আর্য্যা নাশ্রব ধর্ম্মপূর্ণ সংজ্ঞাঃ
প্রজ্ঞ বিদুষ তৃপ্ত তে সুতৃপ্তাঃ ন চ পুন কামগুণেষু কাচি তৃপ্তিঃ॥ ৬।
কাম ধরণিপাল সেবমানা পূর্বি মনু ন বিন্ততি কোটি সংস্কৃতস্য।
লবণজল যথাহি নর পিত্বা ভূয় তৃষু বর্দ্ধতি কাম সেবমানে॥ ৭।
অপিচ ধরণিপাল পশ্য কায়ং অধ্রুব সংসারকু দুঃখযন্ত্রমেতৎ।
নবভির্ব্রণমুখৈঃ সদা শ্রবন্তং ন মম নরাধিপ কাম ছন্দরাগঃ॥ ৮।
অহমপি বিপুলান্ বিজহ্য কামান্ তথ পিচ ইস্ত্রি সংস্রান্ দর্শনীয়ান্।
অনভিরত ভবেষু নির্গতো হ্যহং পরমশিবা বরবোধি প্রাপ্তু কাম॥ ৯।"

অর্থাৎ,—'হে ধরণিপাল। আপনার চিরমঙ্গল হউক। কিন্তু জানিবেন, আমি কোনরূপ কামনার অধীন হইয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হই নাই। ১। কামনা বিষসমা, কামনা অনন্তদোষা, কামনা প্রেত-তির্য্যক যোনিতে ও নরকে পাতিত করে। বিদ্বজ্জন কামকে নিন্দনীয় অপদার্থ মনে করেন। দূষিত পিণ্ডের ন্যায় উহা মৎকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে। ২। বৃক্ষের ফল যেমন ভূপতিত হয়, মেঘপুঞ্জ যেমন অপসৃত হয়, মরুৎ যেমন অধ্রুব ও চপলগতিবিশিষ্ট, কামও সেইরূপ সর্ব্বশুভবঞ্চনাকারক। ৩। কামনা পূর্ণ হইলেও তৃপ্তি নাই, অপূর্ণ থাকিলেও দগ্ধ হইতে হয়। কাম ঘোর শত্রু, তাহাকে জয় করাও যায় না; আবার জয় করিতে না পারিলেও মহদ্দুঃখ উপস্থিত হয়। ৪। হে ধরণিপাল! দিব্য ও মানুষ ভেদে কামের বহু মূর্ত্তি। কিন্তু কোনও মানুষ কখনও সর্ব্বকাম লাভে সমর্থ হয় নাই এবং কাম দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করিতেও পারে নাই। ৫। হে ধরণিপাল! কামগুণে কোনও তৃপ্তি নাই, পরন্তু যিনি শান্ত, দান্ত, মুক্ত, আর্য্য, ধর্ম্ম-প্রাণ, জ্ঞানবান, প্রাজ্ঞ, বিদ্বান, তৃপ্ত, তিনিই সুতৃপ্ত—সুখী। ৬। হে ধরণিপাল! মানুষ যেমন লবণাক্ত জলপানে তৃষ্ণা দূর করিতে সমর্থ হয় না, পরন্তু তাহাতে তাহার তৃষ্ণাই বৃদ্ধি পায়, কামসেবা-পরায়ণ জনেরও সেই অবস্থা। কোটি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও কেহ কখনও কাম-কলায় পূর্ণতা লাভে সমর্থ হয় নাই। ৭। হে ধরণিপাল! দেখুন, দেহ

অনিত্য, অসার, দুঃখ-যন্ত্রবৎ; উহার নব-ব্রণমুখে নিয়ত স্রাব বহির্গত হইতেছে। হে নরাধিপ! এই সকল কারণে কামের প্রতি আমার আর আসক্তি নাই। ৮। বিপুল ভোগরাজ্য কাম, সহস্র নয়নানন্দদায়িনী নারী আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন পরম-মঙ্গলময় বোধিজ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছা। কোথায় তাহা পাইব, সেই সন্ধানে চলিয়াছি। ৯।'

সিদ্ধার্থের এই উত্তর শুনিয়া নৃপতি আর কি বলিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন? যিনি কাম-রূপ শত্রুকে প্রাণে প্রাণে চিনিতে পারিয়াছেন, তিনি আর তাহার কবলে পতিত হইবেন কেন? সিদ্ধার্থের দৃঢ়তা দেখিয়া, রাজা বিম্বিসার মনে মনে তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সিদ্ধার্থের ন্যায় মহাপুরুষের অনুকম্পা পাইলে তাঁহারও জীবন সার্থক হইবে, এই ভাবিতে ভাবিতে তিনি সিদ্ধার্থকে বিদায় দিলেন। কবে সিদ্ধার্থ আবার আসিবেন, কতদিনে তাঁহার সে সৌভাগ্যের উদয় হইবে,—বিম্বিসার আশাপথ চাহিয়া রহিলেন।

সাধন-পথে।

বিম্বিসারের রাজধানী হইতে বিদায় লইয়া সিদ্ধার্থ একে একে বহু সন্ন্যাসীর আশ্রম পর্য্যটন করিলেন। পথে এক যোগী পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নাম—আরাড় কালাম (আলার)। তিনি ধ্যানমার্গের চতুর্থ সোপানে "অকিঞ্চনায়তন" সাধনমার্গে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণে, কিছুকাল তাঁহার আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক সিদ্ধার্থ সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। কিন্তু সে সাধনার পরবর্ত্তী স্তর—নির্ব্বাণ-লাভের সন্ধান তাঁহার নিকট মিলিল না। সুতরাং সে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে আশ্রমান্তরের সন্ধানে ফিরিতে হইল। রাজগৃহের অল্প দূরে রামপুত্র রুদ্রক সাত শত শিষ্য সহ অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিদ্ধার্থ তাঁহার নিকট গিয়া, আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সেখানে আর পাঁচ জন ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত সিদ্ধার্থের পরিচয় হইল।* সিদ্ধার্থের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহারা যোগাভ্যাসে রত হইলেন। রুদ্রকের আশ্রমে অবস্থিতিকালে সিদ্ধার্থ সাধনার আর এক স্তরে উন্নীত হন। বৌদ্ধমতে, সে স্তরের নাম—"নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন।" কিন্তু এখানেও নির্ব্বাণ মিলিল না। সুতরাং রুদ্রকের (উদ্দক) আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, সিদ্ধার্থ উরুবিল্ল গ্রামে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে গমন করিলেন। পথে বহু সাধুসন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। কিন্তু কেহই প্রকৃত পথের বিবরণ বলিতে পারেন নাই। পরিশেষে কে যেন তাঁহাকে কহিল—'পথ অন্যে কি দেখাইবে? আপনার পথ আপনি না দেখিলে, অন্যের দেখাইবার সাধ্য কি?' সিদ্ধার্থ আপনা-আপনি কহিলেন,—'আপন পথ আপনি না দেখিলে অন্যে দেখাইবে কি? বড় সত্য কথা! আমার আপন পথ আপনাকেই দেখিতে হইবে। শিক্ষক শিক্ষার সোপান মাত্র প্রদর্শন করেন; শিশুকে আপন ধী-শক্তি প্রভাবে সোপান অতিক্রম করিতে হয়। আমি গুরুর সাহায্যে সাধনার পঞ্চম স্তরে উপস্থিত হইয়াছি। অবশিষ্ট পথ আপন শক্তিতে আমায় অতিক্রম করিতে হইবে।' এবম্বিধ চিন্তার পর, আত্মসামর্থ্যে নির্ভর করিয়া নৈরঞ্জনা নদীর তীরে সিদ্ধার্থ ধ্যান-নিমগ্ন হইলেন। সেখানে অনাহারে, অনিদ্রায়, কঠোর

---

* ব্রাহ্মণ-পঞ্চক উত্তরকালে পঞ্চবর্গীয় 'ভিক্ষু' বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহাদের নাম,—কৌণ্ডিন্য, ভদ্দিয়, বপ্প, মহানাম, অসজি।

সাধনায় ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল। * দেহ কঙ্কালসার বিবর্ণ হইয়া আসিল, হস্তপদ শিথিল অবসন্ন বৈকল্য প্রাপ্ত হইল, নেত্রদ্বয় কোটরে প্রবেশ করিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া আসিল, যে দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জনা সিদ্ধার্থকে অলোকসামান্য রূপ-লাবণ্যসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, একে একে সে সকলই অন্তর্হিত হইল। কিন্তু বিনিময়ে নূতন তো কিছুই মিলিল না। যে নির্ব্বাণ-লাভের জন্য সিদ্ধার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প, সে নির্ব্বাণ তো তাঁহার অধিগত হইল না! তখনও কি যেন অবশিষ্ট আছে, এই ভাব উপলব্ধি হইল। অবসন্ন দেহে বিষণ্ণ মনে সিদ্ধার্থ নৈরঞ্জনায় অবগাহন করিলেন। এই সময় ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহাকে বড়ই কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। সুজাতা নাম্নী এক শ্রেষ্ঠী-কন্যা সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে আহার্য্য দানে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি যখন শুনিলেন—সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে, শশব্যস্তে কিছু পায়সান্ন আনিয়া সিদ্ধার্থের সম্মুখে ধারণ করিলেন। তাহাতে মনে হইল, তাঁহার কষ্ট দেখিয়া, করুণার্দ্র হইয়া, যেন কোনও স্বর্গের দেবী আসিয়া, তাঁহাকে পায়সরূপ সুধা প্রদান করিয়া গেলেন। সিদ্ধার্থের প্রাণে এইবার এক নূতন চিন্তার উদয় হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, কি কারণে এখনও তাঁহার সিদ্ধিলাভ ঘটিল না। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলেন,—এখনও তিনি কামনাকে সম্যক্ পরাভূত করিতে পারেন নাই। তাই আবার প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"শরীর শুকাইয়া যায়, যাউক, অস্থি মাংস ত্বক বিলুপ্ত হয়, হউক, কিন্তু কামনাকে জয় করিবই করিব। কামনা জয় ভিন্ন আমার সম্যক্ বুদ্ধত্বলাভ কদাচ সম্ভব নহে।" † এইবার অভিনব পন্থা গ্রহণ পূর্ব্বক নৈরঞ্জনা-তীরের অপর অংশে বোধিবৃক্ষমূলে সিদ্ধার্থ আসন পরিগ্রহ করিলেন।

আবার ভীষণ পরীক্ষা আরম্ভ হইল। সাধনার পথে যত প্রকার বিঘ্ন-বিপত্তির সম্ভাবনা ছিল, সকল প্রকার বিঘ্ন-বিপত্তি এইবার মূর্ত্তিমান হইয়া উপস্থিত হইল। সাধনার উদ্দেশ্য—মায়ামোহ প্রভৃতি বন্ধনব্যূহ ছেদ করিয়া কাম-জয়। সে কাম বা কামনা বৌদ্ধ-শাস্ত্রে 'মার' বা মান বলিয়া পরিচিত। তাঁহার সৈন্যগণ, কখনও বা বিভীষিকারূপে কখনও বা স্নেহ-মায়া-মমতা প্রভৃতি রূপে আবির্ভূত হয়। সেই বিশ্ব-বিজয়ী মার-সৈন্যগণ সিদ্ধার্থকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

মার-বিজয়।

* কোনও মতে প্রকাশ—রুদ্রকের নিকট যোগ-শিক্ষার সময় যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ যুবক সিদ্ধার্থের সহচর মধ্যে গণ্য হন, তাঁহারা রুদ্রকের আশ্রম পরিত্যাগে সিদ্ধার্থের অনুসরণ করিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ যোগাবলম্বন করিলে তাঁহারা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার প্রাণরক্ষার উপযোগী খাদ্যাদি প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য মতে প্রকাশ,—নাট দেবগণ তাঁহার অঙ্গ বিদ্ধ করিয়া জীবনরক্ষার উপযোগী খাদ্যরস তাঁহার দেহে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা যোগক্রিয়ার অলৌকিক শক্তির বিষয় অবগত আছেন,—তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, যোগবলে মানুষ অসাধ্য-সাধনে সমর্থ হয়। 'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে, যোগসাধনা-প্রসঙ্গে, হরিদাস সাধু প্রভৃতির বিষয় দ্রষ্টব্য।

† এ সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থে এইরূপ উক্তি লিখিত আছে—

"কামং তচো চ নহারু চ অট্ঠি চ অবসিস্সতু উপসুস্সতু শরীরে মাংস
লোহিতং নত্বেব সম্মাসম্বোধিং অপত্বা ইমং পল্লঙ্কং ভিন্দিস্সামীতি।"

প্রথমে তাহারা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সঙ্ঘটন করিল। কুচক্রী মারদেব, দুর্দ্দম ঝঞ্ঝাবাত্যাবর্ত্ত-রূপে প্রবাহিত হইলেন। জলস্থল কাঁপিয়া উঠিল, গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল; শাখাপল্লবসহ বিশাল বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সিদ্ধার্থের আসন টলিল না! সিদ্ধার্থ যে বৃক্ষমূলে আসন গ্রহণ করিয়া ছিলেন, সে বৃক্ষ অবহেলায় সকল উপদ্রবে উপেক্ষা দেখাইল। বাত্যাবর্ত্ত বিফল হইলে, মার দেবতা বারুণ-তেজ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন, মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল, আর সেই বারি-প্রপাতে বসুন্ধরা দীর্ণবিদীর্ণ হইতে লাগিলেন, ভীষণ প্লাবনে প্রলয়কালের বিভীষিকা আনয়ন করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এক বিন্দু বারিও সিদ্ধার্থের অঙ্গ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না। অতঃপর অগ্নি-বৃষ্টি প্রস্তর-বৃষ্টি ধূলিবৃষ্টি আরম্ভ হইল। কিন্তু সিদ্ধার্থের কি যোগ-প্রভাব!—সেই প্রস্তর-ধূলি-অগ্নিরাশি পুষ্পস্তবকে পরিণত হইয়া তাঁহার চরণ চুম্বন করিতে লাগিল। অতঃপর শাণিত খড়্গ রূপে, ক্ষুরধার অস্ত্রাদি রূপে, ধূমাগ্নি-সম্বলিত প্রাণঘাতী পদার্থ নিচয় নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; কিন্তু সকলই সিদ্ধার্থের চরণতলে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইল। উত্তপ্ত বালুকা এবং ভস্মরাশি নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু তৎসমুদায়ে পুষ্পপরাগের সুগন্ধি বিস্তৃত হইল। কর্দ্দম বৃষ্টির সূচনায়, চতুর্দ্দিকে পুষ্পসারের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। প্রগাঢ় অন্ধকারে মারসেনা দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু সে চেষ্টা স্মিতশুভ্র চন্দ্রমা-রূপে সিদ্ধার্থ সমীপে প্রতিভাত হইল। ক্রোধকম্পান্বিত মার-দেবতা, অনুচরগণকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—"এখনও তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া কি দেখিতেছ? দ্রুতগতি দুরন্তকে আক্রমণ কর; শীঘ্র আমার সম্মুখ হইতে দূরীভূত করিয়া দেও।" পরিশেষে, আপনার বিরাট গজে আরোহণ করিয়া আপন অজেয় অস্ত্র বিঘূর্ণিত করিতে করিতে, মারদেবতা ক্রোধকম্পিত কলেবরে সিদ্ধার্থের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং রূঢ়স্বরে কহিলেন,—"সিদ্ধার্থ! এ আসন তোমার জন্য নহে। এ আসন আমার অধিকারভুক্ত। অবিলম্বে এ আসন পরিত্যাগ কর।" এই বলিয়া মারদেবতা আপন সৈন্যদলকে কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন। তাহাদের যাহার যেমন শক্তি, তদনুসারে তাহারা সিদ্ধার্থকে যোগভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। সেই মার-সৈন্যগণ কখনও প্রলোভন রূপ পরিগ্রহ করিয়া অলীক পুণ্যপথ দেখাইতে চেষ্টা পাইল; কখনও বা পিতৃমাতৃস্নেহ রূপে আবির্ভূত হইয়া, সিদ্ধার্থকে মমতা-রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিল; কখনও বা পত্নীর প্রেমরূপে মূর্ত্তিমান হইয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সংসারে যত প্রকার বন্ধন সম্ভবপর, মার সৈন্যগণ তত প্রকার বন্ধনে সিদ্ধার্থকে বাঁধিবার চেষ্টা পাইল; অপিচ, সিদ্ধির পথে যত প্রকার অন্তরায় সম্ভবপর, সকল প্রকার অন্তরায় আনিয়া উপস্থিত করিল। * মার দেবতার এই আক্রমণ, তাঁহার সহিত সিদ্ধার্থের সংগ্রাম এবং

---

* মার দেবতার সহিত সিদ্ধার্থের সংগ্রামের বিষয় বৌদ্ধ-গ্রন্থের নানা স্থানে দৃষ্ট হয়। সুত্ত-নিপাতের 'পধান সুত্তে' যে বর্ণনা আছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অভিহিত হয়। জাতক অথকথার 'নিদানকথায়' মার-বিজয়-কাহিনী বর্ণিত আছে। ললিতবিস্তরের অষ্টাদশ ও একবিংশ অধ্যায়ে মার দেবতার সহিত সংগ্রাম-বর্ণনায় পরিপূর্ণ। অশ্বঘোষ বিরচিত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মার-বিজয় বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। *Vide*

মার দেবতার পরাজয় সম্বন্ধে সুত্তনিপাতের 'পধান-সুত্তে' যে বর্ণনা আছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে মার-বিজয়-সম্বন্ধে বেশ একটী চিত্র হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে পারে।

নমুচি করুণ-কণ্ঠে কহিলেন,—

"কিসো ত্বমসি দুব্বণ্ণো, সন্তিকে মরণং তব,
সহস্সভাগো মরণস্স, একং স্নো তব জীবিতং।
জীবং ভো জীবিতং সেয়্যো, জীবং পুঞ্ঞানি কাহসি॥
চরতো চ তে ব্রহ্মচরিয়ং অগ্গিহুত্তং চ জুহতো।
পহূতং চীয়তে পুঞ্ঞং, কিং পধানেন কাহসি,
দুগ্গো মগ্গো পধানায় দুক্করো দুরতিসম্ভবো॥"

অর্থাৎ,—'তুমি কৃশ ও বিবর্ণ হইয়াছ। তোমার মরণ নিকট, তোমার মরণের আশঙ্কা সহস্র ভাগ, জীবনের আশা এক ভাগ মাত্র। তুমি এখনও বাঁচিবার চেষ্টা কর; বাঁচিবার চেষ্টা করাই তোমার পক্ষে এখন শ্রেয়ঃ; বাঁচিতে পারিলেই পুণ্যানুষ্ঠান হইবে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে অগ্নিহোত্র যজ্ঞে অশেষ পুণ্য। 'পধান' বা বুদ্ধত্বলাভে তোমার কি ফল আছে? সে পথ দুর্গম, দুষ্কর, দুরতিসম্ভব।'

নমুচির (মারের) এবম্বিধ নিষেধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সিদ্ধার্থ কহিলেন,—

"পমত্ত বন্ধু পাপিম য়েনত্থেন ইধাগতো?
অনুমত্তেনপি পুঞ্ঞেন অত্থো মষ্হং ন বিজ্জতি।
য়েসঞ্চ অত্থো পুঞ্ঞানং তে মারে বত্তুমরহতি॥ ১।
অত্থি সদ্ধা ততো বিরিয়ং পঞ্ঞা চ মমবিজ্জতি।
এবং মং পহিতত্তম্পি কিং জীব মম পুচ্ছসি॥ ২।
নদীনমপি সোতানি অয়ং বাতো বিসোসয়ে।
কিং চি মে পহিতত্তস্স লোহিতং নুপসুস্সয়ে? ৩।
লোহিতে সুস্সমানম্ হি পিত্তং সেম্হঞ্চ সুস্সতি।
মংসেসু খীয়মানেসু ভিয়্যো চিত্তং পসীদতি॥
ভিয়্যো সতি চ পঞ্ঞা চ সমাধি মম তিট্ঠতি॥ ৪।
তস্স মেবং বিহরতো পত্তস্সুত্তমবেদনং।
কামে না পেক্খতে চিত্তং পস্স সত্তস্স সুদ্ধতং॥ ৫।"

অর্থাৎ,—'রে প্রমত্ত জনের বন্ধু পাপিষ্ঠ! তুই এখানে কি জন্য আসিয়াছিস্? অণুমাত্র

Mohavagga, *Sutta Nipata*, Sacred Books of the East, Vol X. Page 71, and also *Buddha Charita*, 13th Sarga, and *Fo-Sho-Hing-Tsan-King* as translated by Samuel Beal in the *Sacred Books of the East*, Vol XX. বুদ্ধদেবের এই মার-বিজয়ের সাদৃশ্যের কথা, 'ইডেন' উদ্যানে আদম ও ইভের কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকবি মিল্‌টনের 'প্যারাডাইস রিগেইণ্ড' (Paradise Regained) গ্রন্থে প্রাকৃতিক উপদ্রব ও যীশুখৃষ্টের প্রতি প্রলোভন প্রদর্শন প্রভৃতি ব্যাপার বুদ্ধ-চরিতের মার-বিজয় ঘটনার সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন।

পুণ্যে আমার আবশ্যক নাই। যাহারা পুণ্যের জন্য লালায়িত, মার! তুই তাহাদিগকে এই সকল উপদেশ দিস্। ১। শ্রদ্ধা, বীর্য্য, প্রজ্ঞা আমাতে বিদ্যমান আছে। সুতরাং আমি যখন একাগ্রচিত্ত, আমায় কি জন্য তুই জীবনের মমতা দেখাইতেছিস্? ২। বায়ু নদীর স্রোত শুষ্ক করে। আমার ধ্যাননিবিষ্টতা, আমার শোণিতকে কেন না শুষ্ক করিতে সমর্থ হইবে? ৩। শোণিত শুষ্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিত্ত-শ্লেষ্মা শুষ্ক হইয়া আসিবে। এইরূপে মাংসও ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। তখন চিত্ত প্রশান্ততা লাভ করিবে। আর তাহাতে স্মৃতি প্রজ্ঞা সমাধি সর্ব্বথা আমার সহচর হইয়া থাকিবে। ৪। এবমাবস্থায় আমার বেদনা তিরোহিত, চিত্ত কামে অনাসক্ত, আমার সেই সত্ত্ব-অবস্থা এই তুই দর্শন কর। ৫।'

ইহার পর সিদ্ধার্থ কামের সেনাগণের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে তাহাদিগকে চিনিয়াছেন এবং চিনিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, সে পরিচয়ে তাহাই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। যথা,—

"কামা তে পঠমা সেনা, দুতিয়া অরতি বুচ্চতি।
ততিয়া খুপ্পিপাসা তে, চতুত্থী তণ্হা পবুচ্চতি॥
পঞ্চমী থীনমিদ্ধন্তে, ছট্‌ঠাভীরূপ বুচ্চতি॥
সত্তমী বিচিকিচ্ছা তে, মক্খো থম্ভো তে অট্‌ঠমো॥
লাভো সিলোকো সক্কারো, মিচ্ছা লদ্ধো চ যো যসো।
যো চত্তানং সমুক্কংসে পরে চ অবজানতি॥
এষা নমুচি তে সেনা কণ্হস্সাভিপ্পহাবনী।
ন তং অসুরো জিনাতি, জেত্বা চ লভতে সুখং॥"

অর্থাৎ,—'কাম তোমার প্রথম সেনা, অরতি দ্বিতীয়, ক্ষুৎপিপাসা তৃতীয়, তৃষ্ণা চতুর্থ, আলস্য ও তন্দ্রা পঞ্চম, ভীরুতা ষষ্ঠ, সংশয় (বিচিকিৎসা) সপ্তম, জড়তা ও ক্রোধ অষ্টম। এ সকল ভিন্ন লাভ, আত্ম-শ্লাঘা, আত্মসৎকার, মিথ্যা যশ, আপনার শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন, অপরের অপযশ ঘোষণা প্রভৃতি তোমার কলঙ্ক স্বরূপ সৈন্যদল। যে বীর নহে, সে তোমায় জয় করিতে পারে না; পরন্তু যে তোমায় জয় করিতে সমর্থ, সেই বীর—সেই সুখী।'

পরিশেষে সিদ্ধার্থ কহিলেন,—

"এস মুঞ্জং পরিহরে ধীরত্থু ইধ জীবিতং।
সঙ্গামে মে মতং সেয়্যো যঞ্চে জীবে পরাজিতো॥
যং তে তং নপ্পসহতি সেনং লোকো সদেবকো।
তং তে পঞ্ঞায় ভঞ্জামি আমং পত্তং বা অম্হনা
বসিং করিত্বা সঙ্কপ্পং সতিঞ্চ সুপ্পতিট্‌ঠিতং।
রট্‌ঠা রট্‌ঠং বিচরিস্সং সাবকে বিনয়ং পুথু॥
তে অপ্পমত্তা পহিতত্তা মম সাসনকারকা।
অকামস্স তে গমিস্সন্তি যথ গন্ত্বা ন সোচয়ে॥"

অর্থাৎ,—'মার সৈন্যগণকে মুঞ্জতৃণবৎ পরিহার করা কর্ত্তব্য। নচেৎ জীবন বৃথা। সংগ্রামে

বৃক্কা শ্রেয়ঃ; তথাপি পরাজিত হইয়া জীবন-ভার বহন করা কর্ত্তব্য নহে। বাহনসহ সজ্জীভূত হইয়া, মার যুদ্ধার্থ অগ্রসর। আমিও তাহার সম্মুখীন হইতেছি। আমায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করিও না। স্বর্গমর্ত্ত্যবাসী সকলে একযোগে মিলিত হইলেও মার-সৈন্যের প্রতিরোধে অসমর্থ। আমি কিন্তু প্রজ্ঞার দ্বারা তাঁহার সৈন্যদলকে চূর্ণবিচূর্ণ করিব। প্রস্তরাঘাতে যেমন আম্র-পাত্র বিচূর্ণীত হয়, তাহাদের সেই অবস্থা হইবে। সকলকে বশ করিয়া, স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, দেশ-দেশান্তরে শিক্ষা প্রচার করিব। অপ্রমত্ত ধ্যানবন্ত আমার যাহারা অনুগমন করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই শোকাতীত স্থান প্রাপ্ত হইবে।'

ক্রমাগত সাত বৎসর কাল অদম্য উৎসাহে অনুসরণ করিয়াও মার-সৈন্য জয়লাভ করিতে পারিল না। সিদ্ধার্থের নিকট বিশ্ববিজয়ী মারদেব পরাজিত হইলেন। পরাজিত হইয়া, পরিশেষে ক্ষোভ-প্রকাশে কহিলেন,—

"সত্তবস্সানি ভগবন্তং অনুবন্ধিং পদাপদং।
ওতারং নাধিগচ্ছিস্সং সম্বুদ্ধস্স সতীমতো॥
মেদবণ্ণং ব পাসাণং বায়সো অনুপরিয়গা।
অপেত্থ মুদুং বিন্দেম অপি অস্সাদনা সিয়া॥
অলদ্ধা তত্থ অস্সাদং বায়সেত্তো অপক্কমি।
কাকো ব সেলং আসজ্জ নিব্বিজ্জাপেম গোতমং॥"

অর্থাৎ,—'আমি সাত বৎসর কাল প্রতি পদক্ষেপে ভগবানের অনুসরণ করিলাম। কিন্তু সম্বুদ্ধের স্মৃতি অণুমাত্র চাঞ্চল্যযুক্ত দেখিলাম না। মেদবর্ণ পাষাণের নিকট, বায়স ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল, বর্ণ দেখিয়া মনে করিয়াছিল, বুঝি বা কোনও স্থানে মৃদুত্ব সুতরাং সুস্বাদু বস্তু মিলিবে। কিন্তু তাহা না মিলায় তাহাকে হতাশ হইয়া প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। আমারও সেই অবস্থা। আমি পাষাণের নিকটে প্রত্যাবৃত্ত বায়সের ন্যায় গোতমকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি।' এইরূপে মার পরাজয় স্বীকার করিলে, দিঙ্মণ্ডল সিদ্ধার্থের জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল।

মার-বিজয়ের পর সিদ্ধার্থ নিশ্চিন্ত মনে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দ্বিতীয় বার সাধনার একোনপঞ্চাশৎ দিবসে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহার প্রাণে জ্ঞানের নবীন আলোক উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। এই সময়ের নিশার প্রথম যামে, সিদ্ধার্থ 'পূর্ব্বজন্মজ্ঞান' লাভ করিলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর অভিনব বিতর্ক উঠিল। তিনি দেখিলেন, তিনি বুঝিলেন,—'দুঃখ—সর্ব্ববিধ দুঃখ, পৃথিবীতে চিরদিনই আছে। কিন্তু তাহাদের এ বিদ্যমানতার মূল কি? মূল—জন্ম (জাতি)। জন্ম কেন হয়? কারণ—আসক্তি অনুরাগ ('উপাদান')। আবার বিদ্যমানতা আছে বলিয়াই উপাদানের কার্য্যকারিতা। কার্য্যাকার্য্যের ফলে, বিদ্যমানতা সংঘটিত হয়। বিদ্যমানতার মূলই উপাদান। কামনা বা তৃষ্ণা তাহার প্রধান কারণ। কামনার মূল—বেদনা। বেদনার মূল স্পর্শ অর্থাৎ সম্মিলন-সংযোগ। সংযোগের মূল—ইন্দ্রিয়ষট্‌ক। ষড়েন্দ্রিয় 'নামরূপের' উপর অবস্থিত। নাম-রূপের মূল—অজ্ঞান (বিজ্ঞান)। বিজ্ঞান সংস্কার হইতে উৎপন্ন। সংস্কারই অবিদ্যার কারণ।' জন্ম-

সাধনায় সিদ্ধ।

জরা মৃত্যুর পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ হেতু ও ফল উপলব্ধি করিয়া, চিন্তার পর চিন্তার ফলে, মধ্য যামে সিদ্ধার্থ প্রাণিগণের 'চ্যুতি-উৎপত্তি-জ্ঞান' লাভ করিলেন। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"অবিদ্যা বা অজ্ঞান এই দৃশ্যমান বিশ্বের আদিভূত। অবিদ্যা হইতে এই সর্ব্বপ্রাণিপূর্ণা বসুন্ধরার উৎপত্তি। যে বিশ্বব্যাপী বিভ্রমে মনুষ্য এবং প্রাণী সকল বিভ্রান্ত, তাহার কারণই অবিদ্যা। কি উপায়ে অজ্ঞানতা অবিদ্যা দূরীভূত হয়? সত্যজ্ঞান লাভই তাহার একমাত্র উপায়। সত্যজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাই,—সকলই অসৎ, বস্তুমাত্রই অবাস্তব। এইবার আমার ভ্রম অন্ধকার দূর হইয়াছে, আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি,—বস্তু মাত্রকে যে বাস্তব বলিয়া মনে করি, তাহা ভ্রান্তি। সেই কল্পনা, সেই অনুভূতি,—যদ্দ্বারা আমি অসৎকে 'সৎ' বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, সে কল্পনা—সে সংস্কার আমার এখন দূর হইয়াছে। বুঝিয়াছি,—নাম-রূপ কি, বুঝিয়াছি,—ষড়েন্দ্রিয় কি; বুঝিয়াছি,—স্পর্শ বা সংযোগ কি, বুঝিয়াছি,—বেদনা কি; বুঝিয়াছি,—তৃষ্ণা কি, বুঝিয়াছি,—উপাদান কি, বুঝিয়াছি,—ভব (বিদ্যমানতা) কি, বুঝিয়াছি,—জাতি (জন্ম) কি; বুঝিয়াছি,—দুঃখ বা যন্ত্রণা কি?" চিন্তায় রজনী অবসানপ্রায়। শেষ যামে শুভক্ষণে সিদ্ধার্থের চিত্তে "প্রতীত্যসমুৎপাদ" তত্ত্ব প্রতিভাত হইল। তিনি আপনা আপনি কহিলেন,—'সত্য-চতুষ্টয়ের উজ্জ্বল আলোকে অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতে পারে। সে জ্ঞান-লাভ হইলে, জন্ম-জরা-মরণের চক্রাবর্ত্তে আঁধারের পথে আর বিঘূর্ণিত হইতে হইবে না। সেই সত্য-চতুষ্টয়,—(১) ভব বা বিদ্যমানতা জনিত দুঃখ, (২) দুঃখোৎপত্তির কারণ—তৃষ্ণা, যে তৃষ্ণা বা কামনা পুনঃপুনঃ সঞ্জাত হইয়াও পুনঃপুনঃ আনন্দ-বিধানে প্রলোভন দেখাইয়াও তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হয় না, (৩) কামনার ধ্বংস সাধন, অর্থাৎ কামনার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ, আর সেই মুক্তিলাভ পক্ষে প্রাণপণ প্রয়াস; (৪) তৃষ্ণা-নিবারণের বা নির্ব্বাণের চতুর্ব্বিধ পন্থা প্রাপ্তির উপায়। সে চতুর্ব্বিধ পন্থা—সচ্চিন্তা, সদনুষ্ঠান প্রভৃতি।* জীবনে মানুষ যদি কখনও আচারে ব্যবহারে, বাক্যে বা চিন্তায় সদ্ভাবহারা না হয়, নির্ব্বাণ তাহার অধিগত হইবেই হইবে।' যখন সত্য-তত্ত্ব অধিগত হইল, সিদ্ধার্থের হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—"পাইয়াছি! অনেক জন্ম পরিভ্রমণের পর, জন্ম-জরা-মৃত্যুর অশেষ ক্লেশ সহ্য করার পর, হে গৃহ-নির্ম্মাতা, তোমায় চিনিয়াছি।" বিশ্বব্যোম প্রতিধ্বনিত করিয়া অমৃত-বাণী বিঘোষিত হইল,—

"অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খ জাতি পুনপ্পুনং॥
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং॥
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা।"

সাধনা সিদ্ধ হইল। সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইলেন। তাঁহার ভেদজ্ঞান দূরীভূত হইল। তিনি সর্ব্বজীবে সমদর্শিতা লাভ করিলেন।

* চারি সত্য ও অষ্ট মার্গ এই সময়ে তাঁহার অধিগত হয়, ইহাই প্রশস্ত মত। পূর্ব্বে এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে।

* * *

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচার।

[জ্ঞানালোক বিতরণ,—ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন,—বৌদ্ধসঙ্ঘ গঠন,—বারাণসী অবস্থান কালে বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম প্রচার,—যস্ প্রভৃতির শিষ্যত্ব-গ্রহণ;—রাজগৃহে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচার,—কপিলাবাস্তু নগরে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার;—বিবিধ অলৌকিক দর্শন;—বিবিধ কেন্দ্রে বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা বিস্তার;—উপসংহার।]

জ্ঞানালোক বিতরণ।

বুদ্ধত্ব-লাভ করিয়া সিদ্ধার্থের প্রাণে এক অভিনব আন্দোলন উপস্থিত হইল। যে জ্ঞানালোকে তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত, সে জ্ঞানালোক সেইখানেই আবদ্ধ থাকিবে, অথবা তাহার গতিপথ তিনি মুক্ত করিয়া দিবেন! দীপালোক অস্বচ্ছ আবরণে আবৃত থাকিলে, তদ্দ্বারা অন্ধকার নিবারণের পক্ষে কোনই সহায়তা হয় না। কিন্তু যদি তাহার আবরণ উন্মোচিত হয়, তাহা হইলে সে আলোক বহু দূরের অন্ধকার নাশ করিতে পারে। সুতরাং বুদ্ধদেব ভাবিলেন,—অশেষ সাধনা-প্রভাবে যে জ্ঞান তিনি লাভ করিলেন, তাহা তাঁহাতেই আবদ্ধ থাকিবে, না—তদ্দ্বারা জগতের অন্ধকার দূরীকরণের প্রয়াস পাইবেন? বড় কঠোর সমস্যার বিষয়! অন্ধকার যেরূপ ঘনীভূত, আর তৎসহ অবিশ্বাসের বায়ু-প্রবাহ যেরূপ প্রচণ্ড বেগে প্রবহমান, তাহাতে জ্ঞানদীপ কতক্ষণ কাহার হৃদয়ে কে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? সেই কঠোর সত্য-তত্ত্ব প্রচারের জন্য সংসারে বহির্গত হইলে, কেহ তাহা ধারণা করিতে সমর্থ হইবে কি? বুদ্ধদেব আপনিই সে প্রশ্নের সমাধান করিলেন। সে জ্ঞানালোকে জগতের অন্ধকার যদি বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে তাহার সার্থকতা কোথায়? তবে ইহাও বুঝিলেন, যেখানে সেখানে এ আলোক বিতরণ করিতে যাইলে, উহার কার্য্যকারিতায় বিঘ্ন ঘটিবে। সুতরাং যে হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে প্রশান্ত অবস্থা প্রাপ্ত, এ আলোক রশ্মির কার্য্যকারিতা সেই হৃদয়েই সম্ভবপর। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, সিদ্ধার্থ প্রথমে যোগমার্গাবলম্বী আরাড়কালাম গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইবার মনস্থ করিলেন। সে মহাপুরুষ সাধনমার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে বোধি-জ্ঞানের ধারণা অসাধ্য নহে। কিন্তু সহসা সংবাদ পাইলেন, তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভের সাত দিবস পূর্ব্বে সেই যোগী পুরুষ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। অন্তরে বিষণ্ণতার ছায়াপাত ঘটিল। পরক্ষণেই অপর যোগী-পুরুষের স্মৃতি হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইল। তিনি রুদ্রক; সিদ্ধার্থকে যোগাঙ্গের পঞ্চম সোপান শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধেও দুঃসংবাদ আসিল। পূর্ব্বদিন মধ্য রাত্রে, সে মহাপুরুষও ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। সুতরাং আর কোথায় যাইবেন? কাহার নিকট শুভবারতা ঘোষণা করিবেন? কেই বা এ ভীষণ জীবন-সংগ্রামে জয়-লাভের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবে! মনে পড়িল,—সেই ব্রাহ্মণ যুবক-পঞ্চকের বিষয়! তাঁহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত সিদ্ধার্থের সহচর-রূপে সাধনার পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহাদিগকে পাইলে, উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। ঐ সময়ে সেই ব্রাহ্মণ সন্তানগণ বারাণসী তীর্থে যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় ব্রতী ছিলেন। সুতরাং বুদ্ধদেব বারাণসী যাত্রায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেখানে আরও বহু নিষ্ঠাবান যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সাক্ষাৎ পাইতে

পারেন। তাঁহারাও অনেকে সাধনমার্গে অগ্রসর। সুতরাং বোধিজ্ঞানতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতে পারেন। এই মনে করিয়া, সিদ্ধার্থ বারাণসী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন; সহসা পথে উপক নামক জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি 'আজীবক' সম্প্রদায়-ভুক্ত। বুদ্ধদেবকে দেখিয়াই সেই সন্ন্যাসী কহিলেন,—"মহাশয়! আপনার বদনমণ্ডলে নির্ম্মল আনন্দের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত দেখিতেছি। আপনাকে সন্ন্যাসাশ্রমে কে দীক্ষিত করিয়াছেন? আপনি কাহার শিষ্য? আপনি কোন্ মতের অনুসরণকারী?" বুদ্ধদেব কহিলেন,—"আমি পরিবর্ত্তনশীল জগতের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াছি। যে বিধি জগৎকে এবং তদন্তর্গত জীব-সমূহকে পরিচালিত করিতেছে, আমি তাহার মূলতত্ত্ব অবগত হইয়াছি। সকল প্রকার কামনা ও বাসনা আমার নিকট পরাজিত হইয়াছে। আমি চতুর্ব্বিধ সত্য তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। সেই চতুর্ব্বিধ সত্য তত্ত্বই পবিত্র মঙ্গলের মূলীভূত। আমার কেহ গুরু নাই। কামজয়ের দ্বারাই আমি নির্ব্বাণ মার্গে উপনীত হইয়াছি।" উপক ঈষৎ হাস্য সহকারে বুদ্ধদেবকে বিদায় দিয়া অন্য পথে গমন করিলেন। উপকের মুখে যদিও উপেক্ষার হাসি প্রকাশ পাইল, কিন্তু তাহার হৃদয়ে সিদ্ধার্থের শিক্ষার বীজ তাঁহার অজ্ঞাতসারে প্রবিষ্ট হইল। উপকের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, বিবিধ বাধা বিপত্তি অতিক্রমের পর বুদ্ধদেব বারাণসী ধামে উপনীত হন।

মৃগদাবে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন।

সে দিন আষাঢ়ী পূর্ণিমা। জ্যোৎস্না-পুলকে ধরণী পুলকরোমাঞ্চ। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বুদ্ধদেব ঋষিপত্তনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মৃগদাব উদ্যানে, তাঁহার সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ব্রাহ্মণ-যুবকপঞ্চক অবস্থিতি করিতেছিলেন। আগন্তুককে দূর হইতে দেখিয়া, জ্যোৎস্নালোকে তাঁহার দেহদ্যুতিঃ লক্ষ্য করিয়া, তাঁহারা সিদ্ধার্থ বলিয়া চিনিতে পারিলেন। পরস্পর বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন,—"যোগসাধনা পরিত্যাগ করিয়া, সিদ্ধার্থের এখন কি সুখসাধনায় মন গিয়াছে! সন্ন্যাসিবেশে যথোপযুক্ত আহার সংগ্রহ হইতেছে; সুতরাং কান্তিপুষ্টিও বর্দ্ধিত হইয়াছে।" কিন্তু তাঁহারা কি চিন্তা করিতেছেন বা না করিতেছেন, যিনি সমদর্শী, তৎপ্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ হইবে কেন? বুদ্ধদেব, আনন্দগদগদকণ্ঠে সেই ব্রাহ্মণ যুবকগণকে কহিলেন,—"বন্ধুগণ! আজি আনন্দের নির্ঝর উন্মুক্ত করিয়াছি। এস ভাই! প্রাণ ভরিয়া সে অমৃত পান কর, সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে।" মহাপুরুষ সম্মুখে আসিবামাত্র, সেই সন্ন্যাসিগণের সকল বিতৃষ্ণা দূর হইল। তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দেবতার চরণতলে নিপতিত হইলেন। এইবার ভগবান, আপনার বহু সাধনার ধন—নির্ব্বাণোপকরণ—সন্ন্যাসিগণকে বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বুঝাইয়া কহিলেন,—"ভিক্ষুগণ! এ সংসারে দুই দিকে দুই আকর্ষণ আছে। দুই আকর্ষণ, দুই দিকের, দুই সীমান্ত অভিমুখে লইয়া যাইতে চায়। এক দিকের আকর্ষণ—কামরূপ দৃঢ় রজ্জু—ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি, ভোগৈশ্বর্য্যের প্রতি, নাম যশ অর্জ্জনের প্রতি সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল। অন্য দিকের আকর্ষণ—সন্ন্যাসের প্রলোভন—কঠোর কৃচ্ছ্র, কষ্টসহিষ্ণুতার দ্বারা দেহকে নিপাতিত করিতে চায়। কিন্তু এ দুইয়ের কোনটিই সম্পূর্ণ শ্রেয়ঃ-সাধক নহে। এই দুই পথের মধ্যবর্ত্তী এক জ্ঞানপথ আছে, তাহাই অবলম্বনীয়। যে পথে চক্ষু উন্মীলিত হয়, বোধশক্তি বিকাশ

যায়, মনে শান্তি আসে, উচ্চ জ্ঞান—পূর্ণ-জ্ঞান—নির্ব্বাণ অধিগত হয়।” এই বলিয়া বুদ্ধদেব তাঁহাদিগের নিকট সেই চতুর্ব্বিধ সত্যের বিষয় বিবৃত করিলেন। বুঝাইলেন,—প্রথম সত্য—দুঃখ, দ্বিতীয় সত্য—দুঃখোৎপত্তির কারণ; তৃতীয় সত্য—দুঃখনিরোধ; চতুর্থ সত্য—দুঃখনিরোধের উপায়। বুঝাইলেন,—প্রথম সত্য যে দুঃখ, তাহা কি? বুঝাইলেন,—জন্ম, বার্দ্ধক্য, ব্যাধি, মৃত্যু,—তাহাদিগকে আমরা অপছন্দ করি, অথচ তাহাদিগের সংস্রবে আসি, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা আবশ্যক, অথচ তাহাদিগে আমরা আসক্ত আছি, এই যে বিভ্রান্তি—অজ্ঞানতার জনয়িতা, ইহাই দুঃখ। তার পর বুঝাইলেন,—দ্বিতীয় সত্য যে দুঃখোৎপত্তির কারণ; তাহাই বা কি? মানুষের কামনা অবিরত কাল্পনিক সুখের অনুসন্ধানে ফিরিতেছে,—যে সুখ কখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই কামনা আবহমানকাল সর্ব্বত্র নূতন আকাঙ্ক্ষায়, নূতন প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া আছে, অথচ, সে আকাঙ্ক্ষা—সে প্রলোভন কখনও পূর্ণ হইবার নহে। এবম্বিধ কামনা বা তৃষ্ণাই দুঃখোৎপত্তির হেতু। সংসারে যত প্রকার দুঃখ আছে, এই কামনাই তাহার মূলীভূত। ইহার পর, বুঝাইলেন, তৃতীয় সত্য—দুঃখনিরোধ কি? যে কামনা, কখনও আনন্দের মধ্য দিয়া, কখনও উদ্বেগের মধ্য দিয়া, নিয়ত আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, সেই কামনার সঙ্গে সম্বন্ধ-শূন্যতাই দুঃখনিরোধ। যে কামনা প্রলোভনের পশ্চাতে নিয়ত প্রধাবমান, অথচ অবিতৃপ্ত, তাহার সম্বন্ধোচ্ছেদ করিতে হইবে। সেই সম্বন্ধ-চ্ছেদের অবস্থাই দুঃখনিরোধ। পরিশেষে বুঝাইলেন—চতুর্থ সত্য—কি করিয়া দুঃখনিরোধ লাভ হইতে পারে। সে উপায়—কার্য্যে, বাক্যে, চিন্তায়, আচারে, ব্যবহারে, নির্ম্মল হইতে হইবে, সর্ব্ববিষয়ে সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে। তিনি আরও কহিলেন,—এই সত্য-চতুষ্টয় ধার্ম্মিকের মনে পুনঃপুনঃ উদিত হয়। চক্র বিঘূর্ণিত হইলে তাহার দণ্ডচতুষ্টয় আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে যেমন উর্দ্ধাধঃ দেশে উপনীত হয়; সাধকের চিত্তে সেইরূপ পর্য্যায়ক্রমে দুঃখ, দুঃখোৎপত্তির কারণ, দুঃখনিরোধ, দুঃখনিরোধের উপায় জাগিয়া উঠে।’ বৌদ্ধশাস্ত্রে এই অবস্থাই “ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন” নামে অভিহিত হয়। কথিত আছে, বারাণসীধামে মৃগদাবে ধর্ম্মচক্র প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের হৃদয়ে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয়। সেই শুভদিনে, প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মসঙ্ঘ, সেই পঞ্চ-ব্রাহ্মণে সুসংগঠিত হইয়াছিল। সেই দিনে, সেই শুভক্ষণে, বিশাল বৌদ্ধসম্প্রদায়-মহীরুহের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়। সেই ব্রাহ্মণপঞ্চক বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, নগরে বুদ্ধদেবের মহিমা দিন দিন প্রচারিত হইয়া পড়িল। পাঁচ দিনের মধ্যে প্রথমে কৌণ্ডিন্য, * তৎপরে যথাক্রমে ভদ্রিয়, বপ্প, অশসাজ্ঞ ও মহানাম অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

---

* এই কৌণ্ডিন্যই—সেই কৌণ্ডিন্য মুনি বলিয়া অভিহিত হন। বুদ্ধদেবের জন্ম-সময়ে ইনিই ভবিষ্য গণনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কেহ কেহ ইঁহাকে কৌণ্ডিন্য-বংশীয় বলিয়া অভিহিত করেন। বৌদ্ধ শুদ্ধ মুণ্ডমুণ্ডন-পূর্ব্বক প্রথম উপদেশ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—ইহাই প্রচার।

বারাণসীধামে অবস্থানকালে, পাঁচ মাসে তত্রত্য ষাট জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যস নামক জনৈক শ্রেষ্ঠিপুত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণের বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রেষ্ঠিপুত্র যস সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত-পালিত হইতেছিলেন। তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য গ্রীষ্মাবাসের, বর্ষাবাসের ও শীতাবাসের উপযোগী অট্টালিকাত্রয় নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং লোকললামভূতা সুন্দরীগণ নিয়ত নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিরত ছিলেন। হঠাৎ একদিন সুন্দরীগণের হাবভাবের মধ্যে ভীষণতা দৃষ্টিগোচর হইল। নর্ত্তকীগণের যে বিকট দর্শন দেখিয়া সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই বীভৎস দৃশ্য সহসা যসের নয়নপথে নিপতিত হইল। 'বিপদ—বিপদ!' বলিতে বলিতে পাগলের ন্যায় দৌড়িয়া যস মৃগদাবের দিকে আসিলেন। যস যখন পথিমধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া 'বিপদ বিপদ' বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন; ভগবান তখন অভয় দিয়া কহিলেন—"ভয় নাই! ভয় নাই! সত্যের শরণ লও, সকল বিপদ দূরে যাইবে।" পিপাসার্ত্ত জন সুশীতল পানীয় প্রাপ্ত হইলে যেমন স্নিগ্ধতা লাভ করে; শান্তিময়ের আশ্বাস বাক্যে যসের প্রাণ সেইরূপ স্নিগ্ধতা লাভ করিল। যস সংসারত্যাগী হইয়া বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পিতা মাতা ও সহধর্ম্মিণী, তাঁহাকে ফিরাইতে আসিয়া, ভগবানের মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহারই অনুসরণে বাধ্য হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবগণও নবধর্ম্মের আশ্রয় লইলেন। সেই সময়ে যাঁহারা নবধর্ম্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত হন, তাঁহাদের সকলকেই বুদ্ধদেব প্রচারক পদে ব্রতী করেন; তাঁহাদের সকলকেই উপদেশ দেন, তাঁহারা যেন দেশে-বিদেশে গমন করিয়া মনুষ্যের চরিত্রোৎকর্ষ-সাধনের পক্ষে চেষ্টা পান। এইরূপে তাঁহাদের সকলকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য অনুমতি দিয়া, বুদ্ধদেব মগধের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মগধাধিপতি রাজা বিম্বিসার, বুদ্ধদেবকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া জনৈক অমাত্যকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মগধে যাইবার পথে, মগধের সন্নিকটে, উরুবেলা গ্রামে কাশ্যপের সহিত ভগবানের সাক্ষাৎ হয়। কাশ্যপ পরম দার্শনিক সন্ন্যাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারে ভগবান আনন্দলাভ করিলেন। কাশ্যপও পরম লাভবান হইলেন। সেই সময়ে কাশ্যপের আশ্রম-সংলগ্ন অরণ্যে ভীষণ দাবানল উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া ভগবান বুঝাইলেন,—"মানুষের হৃদয়ে ঐরূপ দাবানল অহর্নিশ জ্বলিতেছে। মানুষের অশেষবিধ কামনা—রূপের কামনা, অর্থের কামনা, যশের কামনা—তাহাতে ইন্ধন স্বরূপ আহুতি প্রদত্ত হইতেছে। জন্ম-জরা-মৃত্যু, শোক-তাপ প্রভৃতি সে অনলের জ্বালামালা, মানুষকে অহরহঃ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। অরণ্য একেবারে ভস্মীভূত না হইলে যেমন অনলের নিবৃত্তি নাই, উত্তাপের অবসান নাই; সেইরূপ কামনা ভস্মীভূত না হইলে জীবের যন্ত্রণার শেষ নাই।" উরুবেলায় কাশ্যপ, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও শিষ্যগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।* কাশ্যপ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করায়, ঐ প্রদেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। তখন সহস্রাধিক ব্যক্তি বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

বারাণসী অবস্থান কালে।

* কাশ্যপেরা তিন ভ্রাতা ছিলেন,—উরুবেলা কাশ্যপ জ্যেষ্ঠ, নদী কাশ্যপ মধ্যম এবং গয়া কাশ্যপ

"সহস্রাধিক শিষ্য সহ রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলে বুদ্ধদেব গয়া তীর্থে কিছুদিন অবস্থান করেন। গৈয়া-নদীর তীরে ঐ স্থান চিহ্নিত হয়। নিকটে হস্তিমুণ্ডাকৃতি একটী পর্ব্বত ছিল। সেই গিরিশিরে শিষ্যবর্গকে সমবেত করিয়া বুদ্ধদেব ধর্ম্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উপদেশের মর্ম্ম,—"প্রিয় ভিক্ষুগণ! মনুষ্যলোকে দেবলোকে ব্রহ্মলোকে—ত্রিলোকে লেলিহান অনল-শিখা নিয়ত দেখিতে পাইবে। কিন্তু কেহ জান না—সে কিসের অনল! নেত্রদ্বয় জলন্ত অগ্নি-শিখা। পরিদৃশ্যমান্ পদার্থ, তাহাদের আকৃতি ও তদনুভূতি—সকলই জলন্ত অনল-শিখাবৎ। পর্য্যায়ক্রমে আনন্দদায়ক ও কষ্টপ্রদ উভয় প্রকার যে অনুভব দর্শনেন্দ্রিয় সাহায্যে সঞ্জাত হয়, তাহাও জলন্ত অগ্নিশিখাবৎ। এই জ্বালা কি কারণে উৎপন্ন হয়? কামনা, ক্রোধ, অজ্ঞানতা, জন্ম, মৃত্যু, বার্দ্ধক্য, উদ্বেগ প্রভৃতির অনলই সর্ব্বত্র সেই জ্বালার মূল। কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—ইন্দ্রিয়গ্রাম সকলই অনল-সদৃশ। যাহা শ্রবণ করি, যাহার ঘ্রাণ লই, যাহা আস্বাদ করি, যাহার স্পর্শ লই, সকলই সেই অনল সদৃশ। পদার্থও অনল, অনুভূতিও অনল। যাঁহারা এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।" বুদ্ধদেব যে ভাবে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেরই প্রাণের ভিতর নবীন আলোক বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। ইহার পর সেই শিষ্য সহস্র সহ বুদ্ধদেব রাজগৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজগৃহে, রাজধানীর অনতিদূরে, যষ্টিবন নামে একটী উদ্যান ছিল। সেই উদ্যান শ্রেণীবদ্ধ তালবৃক্ষে অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ছিল। সশিষ্য বুদ্ধদেব যষ্টিবনে গিয়া বিশ্রাম লইতেছিলেন। বিম্বিসারের নিকট সেই সংবাদ পৌঁছিবামাত্র, তিনি বুদ্ধদেবকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য উদ্যানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিপুল শোভাযাত্রার আয়োজন হইল। এক লক্ষ বিশ হাজার যোদ্ধৃপুরুষ, নাগরিকগণ, ব্রাহ্মণগণ ও অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া, রাজা বিম্বিসার তাঁহার নিকট গমন করিলেন। বেণুবনে সশিষ্য বুদ্ধদেবের অবস্থানের ব্যবস্থা হইল। সেখানে কিছুদিন ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বুদ্ধদেব আপন জন্মভূমি কপিলাবাস্তু নগরের অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজগৃহে বিম্বিসার এবং তাঁহার আত্মীয় অমাত্যবর্গ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কপিলাবাস্তু যাত্রাকালে যে সকল গ্রামের মধ্য দিয়া ভগবানের গতিবিধি ঘটিয়াছিল, সর্ব্বত্রই তাঁহার অমানুষিক প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

রাজগৃহে বুদ্ধদেব।

রাজা শুদ্ধোদনের প্রাণভরা আশা,—আপনার মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করেন। আশায় আশায় প্রায় আট বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু সিদ্ধার্থ এখনও গৃহে প্রত্যাগত নহেন! তবে কি ভগবানের নিকট বৃদ্ধ পিতার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিবে! পতিগতপ্রাণা গোপা, শিশুটীকে বুকের ভিতর চাপিয়া, দিবসের পর দিবস কাটাইয়াছেন; আশা—তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন! যিনি জগতের জীবকে পরিত্রাণ করিবার জন্য নরদেহ ধারণ করিয়াছেন, তিনি

কপিলবাস্তু নগরে বুদ্ধদেব।

কনিষ্ঠ। উরুবেলায়, নদী তীরে ও গয়া নগরে আশ্রম স্থাপন হেতু তিন ভ্রাতা যথাক্রমে উল্লিখিত তিন নামে পরিচিত হন।

কি আপন পিতামাতার ও পত্নী পুত্রের প্রতি একেবারে উদাসীন থাকিতে পারেন? পিতা আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; সহধর্ম্মিণী পথপানে চাহিয়া আছেন; সে আকর্ষণ ভগবান কিরূপে ছিন্ন করিবেন? বিশেষতঃ, সত্যের যে আলোক তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, সে আলোকে আত্মীয়-অন্তরঙ্গকে পরিস্নাত না করাইলে, কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি থাকিয়া যায় না কি? যাহা হউক, যে কারণেই হউক, বুদ্ধদেব কপিলাবাস্তু নগরে আগমন করিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়াই ভগবানের মনে এক নূতন চিন্তার উদয় হইল। সে চিন্তা—শিষ্যগণের আহার্য্য-সংগ্রহ। তিনি রাজপুত্র; তাঁহার প্রব্রজ্যা-গ্রহণে পিতা শুদ্ধোদন ব্যাকুল হইয়া আছেন; সুতরাং তাঁহার আবার আহার্য্য-সংগ্রহের চিন্তা কেন? যাঁহার জন্য রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত, সহস্র দাসদাসী উদ্‌গ্রীব, তাঁহার আবার ভাবনা কিসের? কিন্তু ভাবনা—তিনি যে ভিক্ষু-ধর্ম্মাবলম্বী। রাজৈশ্বর্য্য—যাহার আছে, তাহারই থাকুক; ভিক্ষুর তাহার সহিত কি সম্বন্ধ? সুতরাং সিদ্ধার্থ কপিলাবাস্তু নগরে ভিক্ষার্থ বাহির হইলেন। আপনার গৃহদ্বারে আপনি ভিখারী! ইহাও এক অপূর্ব্ব লীলা! কিন্তু ভিক্ষার্থ বাহির হইবামাত্র, ভিক্ষুর অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যের প্রতি স্বতঃই নাগরিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। মগধের রাজধানী রাজগৃহে অবস্থিতিকালে, সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির বিষয় কপিলাবাস্তু নগরে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহাকে কপিলাবাস্তু-নগরে ফিরাইয়া আনিবার জন্য রাজদূত প্রেরিত হইয়াছিলেন। তবে কি সিদ্ধার্থই ফিরিয়া আসিলেন? নাগরিকগণের মনে নবীন সন্ন্যাসী সম্বন্ধে এবম্বিধ চিন্তার উদ্রেক হইবা মাত্র নৃপতির নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত হইল। কুমারকে গৃহে লইবার জন্য, তিনি ত্বরিত পদে তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কুমারকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে এক গৃহস্থের দ্বারে দণ্ডায়মান দেখিয়া, নৃপতির আর অনুশোচনার অবধি রহিল না। নৃপতি অশ্রুগদগদ-কণ্ঠে কুমারকে কহিলেন,—"সিদ্ধার্থ! তুমি রাজপুত্র; তোমার হাতে ভিক্ষাপাত্র কেন? তোমার জন্য রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত রহিয়াছে; তুমি ভিক্ষাপাত্র পরিত্যাগ কর; শিষ্যগণকে ভাণ্ডারের দ্বার দেখাইয়া দাও।" সিদ্ধার্থ বিনীতস্বরে কহিলেন,—"পিতঃ! আমি আর রাজপুত্র নহি। বহু জন্মের পর, জন্মজন্মান্তরের তপস্যার ফলে, আমি সত্যের আলোক লাভ করিয়াছি। তুচ্ছ রাজৈশ্বর্য্যে আমার কি প্রয়োজন?" ভিক্ষুর ধর্ম্ম ভিক্ষুর বেশ পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছার ভাব প্রকাশ পাইলে, রাজা শুদ্ধোদন সেই বেশেই কুমারকে রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। ভিক্ষুকের বেশে ভিক্ষাপাত্র হস্তে রাজপুত্র আপন ভবনে প্রবেশ করিলেন। পৌরজন সিদ্ধার্থের সন্ন্যাসিবেশ দেখিয়া আনন্দাশ্রু-জলে বক্ষঃস্থল অভিসিক্ত করিলেন। পৌরজন সকলেই নিকটে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু গোপা অনুপস্থিত। ভগবান কারণ উপলব্ধি করিলেন। তিনি যে দিন প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, গোপাও সেই দিন হইতে সন্ন্যাসব্রতধারিণী। যদি ঐকান্তিক সাধনার কোনও আকর্ষণ থাকে; ভগবান অবশ্যই আকৃষ্ট হইবেন। সেই অনুধ্যানেই রাজবধূ অভিনিবিষ্টা ছিলেন। সুতরাং পতির প্রত্যাগমন সংবাদে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। যাঁহার দেবতা হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, বাহিরে অনুসন্ধান করিবার তাঁহার আর কি প্রয়োজন? গোপা ধ্যাননিবিষ্টা ছিলেন; ধ্যেয় বস্তু আপনিই তাঁহার সমীপস্থ হইলেন। সশিষ্য বুদ্ধদেব

গোপাকে দর্শন দিবার জন্ত তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। আরাধ্য দেবতা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, গোপা ত্বরিতপদে তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া প্রণত হইলেন। নারীদেহ-স্পর্শ ভিক্ষুধর্ম্মের রীতি-বিরুদ্ধ; স্বয়ং ভগবানই সে নীতি প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং ভিক্ষুগণ সেই ঘটনায় কেহ কেহ উদ্বিগ্ন হইলেন। ভগবান ভিক্ষুগণের সে ভাব উপলব্ধি করিলেন। ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী রমণীর পক্ষে যে নির্ব্বাণ মুক্তির দ্বার অবরুদ্ধ নহে, তাহা বুঝাইবার জন্যই সহধর্ম্মিণীকে চরণে স্থান দিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। যশোধরা (গোপা) প্রথম ভিক্ষুণী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। পুত্র রাহুলও অনন্তর পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। এই ঘটনায় শুদ্ধোদন অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া পুত্রের প্রতি এক অনুরোধ জানাইলেন; পিতার বিনা-অনুমতিতে পিতৃ-বর্ত্তমানে কাহারও পুত্র যেন ভিক্ষু-সম্প্রদায়ে স্থান লাভ না করে,—ইহাই তাঁহার অনুরোধ। পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ বুদ্ধদেব তদবধি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মধ্যে সেই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। পিতা-মাতাকে কাঁদাইয়া কেহ কখনও সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ না করে, তদবধি সেই নিয়ম প্রচারিত হইল।

কপিলাবাস্তু রাজ্যে অবস্থান কালে বুদ্ধদেব ন্যগ্রোধ বনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার সঙ্গে বিশ সহস্র শিষ্য অবস্থান করেন। ন্যগ্রোধ বনে অবস্থান কালে বহু অলৌকিক প্রাণস্পর্শী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। প্রথম যে দিন রাজা ও রাজ অমাত্যগণ ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য ন্যগ্রোধ বনে গমন করেন, সে দিন আত্মীয় অন্তরঙ্গগণের কেহ কেহ বুদ্ধদেবের নিকট সম্মান-প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবা মাত্র রাজপুত্র তাঁহাদের চরণে প্রণত হইবেন,—এইরূপ তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ায় তাঁহারা অনেকেই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। অপিচ, ভিক্ষুগণের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন আবশ্যক, তৎপক্ষেও ত্রুটি ঘটিল। বুদ্ধদেব অন্তরে অন্তরে সকলই অনুভব করিলেন। সম্প্রদায়ের অবমাননায় সত্যের অবমাননা হয় দেখিয়া, সত্যসংরক্ষক ভগবানের আসন টলিল। সত্যের নিকট কে না অবনত হইবে? সহসা আকাশে জ্যোতিঃপুঞ্জ উদ্ভাসিত হইল; আর সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ মধ্যে জগজ্জ্যোতিঃ বুদ্ধদেব বিকাশ পাইলেন। সে অভাবনীয় অচিন্ত্যপূর্ব্ব দৃশ্য যখন সকলের নয়নপথে নিপতিত হইল, সকলেই বিস্ময়ে বিহ্বল হইলেন। শুদ্ধোদন সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া মস্তক অবনত করিয়া আবেগপূর্ণ হৃদয়ে কহিলেন,—"বৎস! এই তৃতীয় বার আমি তোমার সম্মুখে মস্তক অবনত করিলাম। তোমার জন্মদিবসে কালদেবতার সম্মুখে তোমাকে প্রণত করাইবার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তখন দেখিয়াছিলাম, তোমার চরণদ্বয় কালদেবতা মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। তার পর তোমার শিশু শয্যায় জম্বুবৃক্ষের ছায়া অপরিবর্ত্তিত দেখি। ঐ দুই দিন তোমার ঐ অলৌকিক ক্রিয়া দেখিয়া বিস্ময়ে মস্তক অবনত করিয়াছিলাম। আর আজ এই তৃতীয় দিন, এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে, বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া তোমার উদ্দেশে মস্তক অবনত করিতেছি। যাঁহাদের প্রাণে অহমিকার সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহাদের সকলেরই অহমিকা পর্য্যুদস্ত হইল। সকলেই ভগবানের

অলৌকিক দর্শন।

উদ্দেশে প্রণতি জানাইলেন। এই সময় এইরূপ অলৌকিক ঘটনা আরও অনেক প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। পুত্র রাহুলকে ভগবান যে দিন ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, সে দিনের ঘটনা বড়ই প্রাণস্পর্শী। ভগবান ভিক্ষার্থ বাহির হইয়াছেন; শিশুর জননী শিশুকে অনুপম বেশভূষায় ভূষিত করিয়া দূর হইতে তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন, কহিলেন,—"ঐ যে দেবতা চলিয়াছেন, তুমি যাইয়া উঁহার শরণাপন্ন হও। পুত্র পৈতৃক ধনের অধিকারী হয়। তুমি উঁহার পুত্র; দেখ যেন, পৈত্রিক ধনে বঞ্চিত হইও না।" পিতার স্মৃতি শিশুর প্রাণে আদৌ সঞ্চিত ছিল না। মাতার নির্দ্দেশ মত সুকুমার শিশু যখন পথিমধ্যে গিয়া পিতার চরণযুগল মস্তকে ধারণ করিল, ভগবান বিচলিত হইলেন। প্রথমে মনে হইয়াছিল, শিশু ভিক্ষু-ধর্ম্মের মর্ম্ম কি বুঝিবে? সুতরাং প্রথমে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু জননীর শিক্ষার প্রভাবে শিশু ঐকান্তিকতা জানাইতে লাগিল। শিশুর ঐকান্তিকতা দেখিয়া ভগবান তাহাকে চরণে আশ্রয় দিলেন। রাহুলের মস্তক মুণ্ডিত হইল। রাহুল ভিক্ষুর বেশ পরিধান করিল। পিতা পুত্রে একত্রে সন্ন্যাসী বেশে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। কেমন করিয়া পৈত্রিক ধনের অধিকারী হয়, রাহুলের জীবনে তাহার আদর্শ দেদীপ্যমান। পিতামহ শুদ্ধোদন যখন রাহুলকে ফিরাইতে আসিলেন, রাহুল আর গৃহে ফিরিতে চাহিল না। রাহুলের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুসরণে আরও অনেকে ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বুদ্ধদেবের বৈমাত্র ভ্রাতা নন্দ এই সময়েই নবধর্ম্মের উপাসক হইলেন। সংসার-সন্ন্যাসের দ্বন্দ্ব কপিলাবাস্তু নগরে অভিনব মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইল।

কপিলাবাস্তু হইতে রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে ভগবান কিছুদিন অনুপিয় নগরে বিশ্রাম লাভ করেন। ঐ নগর মল্ল-রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ঐ নগরে অবস্থান কালে কোলিয় ও শাক্যবংশীয় অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শাক্য-বংশীয় যুবরাজ অনুরুদ্ধ, শাক্যরাজ ভদ্দিয় এবং আনন্দ, দেবদত্ত ও উপালী প্রভৃতি এই সময়েই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইঁহার এক এক জন বৌদ্ধধর্ম্ম-সৌধের এক একটী ভিত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ। * বুদ্ধত্ব-লাভের পর দ্বিতীয় বৎসরের বর্ষাকাল রাজগৃহে অতিবাহিত হয়। সেই বর্ষার শেষে বুদ্ধদেব কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে যাত্রা করেন। তত্রত্য রাজা প্রসেনজিৎ ভগবানের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। জিতবন নামক এক উদ্যান বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের বিশ্রামের জন্য প্রসেনজিৎ কর্তৃক উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া, ভগবান সময় সময় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। এই কারণে, কোশল-রাজ্যের অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় বৎসরের বর্ষাকাল রাজগৃহে অতিবাহিত হয়। চতুর্থ বর্ষে বুদ্ধত্ব লাভের দিনে গঙ্গানদী পার হইয়া ভগবান বৈশালী নগরে গমন করেন। সেখানে

শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি।

---

* দেবদত্ত সম্বন্ধে চুল্লবগ্‌গে (৭ম ২-৩) একটী বিপরীত ঘটনার উল্লেখ আছে। বিম্বিসারের হত্যার জন্য তিনি মগধের যুবরাজ অজাতশত্রুকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, এবং এক সময়ে বুদ্ধদেবকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে সেখানে কোনও প্রমাণ নাই। দেবদত্ত শেষ জীবনে বুদ্ধদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন, এইমাত্র জানিতে পারা যায়।

'মহাবন' উদ্যানে অবস্থান পূর্ব্বক তিনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে শাক্যগণের ও কোলিয়গণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। রোহিণী নদীর সীমানা লইয়া সেই বিবাদের সূত্রপাত। ভগবানের অনুকম্পায় সে বিবাদ মিটিয়া যায়। পর বৎসর ভগবান পুনরায় কাপিলাবাস্তু নগরে গমন করেন। সেই সময় সাতানব্বই বৎসর বয়সে রাজা শুদ্ধোদনের লোকান্তর হয়। মৃত্যুকালে পুত্রকে সম্মুখে পাইয়া রাজা শুদ্ধোদন বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

শেষ জীবনে ধর্ম্মপ্রচার।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভগবান বুদ্ধদেব ৪৫ বৎসর কাল মর্ত্ত্যলোকে বিদ্যমান ছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে ভগবানের অমৃতবাণী পাপী তাপীর পরিতপ্ত প্রাণে যে শান্তি-শীতলতা প্রদান করিয়াছিল, তাহার তুলনা নাই। তিনি তৎকাল-প্রসিদ্ধ বহু নগরে ও বহু জনপদে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, আর তাহার সর্ব্বত্রই আপন ঐশী-শক্তির লীলা প্রদর্শন করেন। কত ঘটনার উল্লেখ করিব? তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভের একাদশ বর্ষে একনালা গ্রামে ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ তাঁহার কি বাণী শুনিয়া কি ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন, নিম্নে তাহারই একটু পরিচয় দিতেছি। হলবর্ষণোৎসবের সময় পাঁচ শত লাঙ্গল লইয়া, ভরদ্বাজ আত্মীয়-স্বজন সহ কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত। উৎসব উপলক্ষে ভরদ্বাজ, দীনদুঃখীগণকে অন্ন বিতরণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে ভগবান বুদ্ধদেব ভিক্ষার্থী হইয়া ভরদ্বাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। দৃঢ় বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ ভিক্ষার্থীর বেশে উপস্থিত দেখিয়া ভরদ্বাজ কহিলেন,—"হে শ্রমণ! তুমি কেন ভিক্ষার্থী হইয়াছ? আমি লাঙ্গল ও বীজ লইয়া কৃষিকার্য্য করি, তাহাতেই আমার উদরান্নের সংস্থান হয়। তুমিও কেন আমার মত লাঙ্গল ও বীজ লইয়া, লাঙ্গল পরিচালনা ও বীজ বপন দ্বারা, আমার মত অন্নের সংস্থান কর না?" ভগবান উত্তর দিলেন,—"মহাশয়। আমিও তো তাই করি! লাঙ্গল ও বীজ লইয়া, লাঙ্গলচালনায় ও বীজবপনে আমার আহার্য্য সংগ্রহ হয়।" ভরদ্বাজ কহিলেন,—"কৈ, তোমার যুগ (জোয়াল) কৈ? তোমার লাঙ্গল কৈ? কৈ, তোমার লাঙ্গলের ফাল কৈ? কৈ, তোমার অঙ্কুশ কৈ? কৈ, তোমার বলীবর্দ্দ কৈ?" ভগবান উত্তর দিলেন,—"কেন, কিছুরই তো আমার অভাব নাই! বিশ্বাস রূপ বীজ আছে, প্রায়শ্চিত্ত রূপ বারিবর্ষণ হইতেছে, জ্ঞান রূপ যুগ ও লাঙ্গল রহিয়াছে, নম্রতা-রূপ লাঙ্গলের মেরুদণ্ড আছে, মন-রূপ বন্ধন-রহিয়াছে, চিন্তাশীলতা-রূপ লাঙ্গলের ফাল ও অঙ্কুশ আছে, আমার উত্তম ভারবাহী বলদের ন্যায় আমাকে নির্ব্বাণ-মার্গে লইয়া চলিয়াছে, যেখানে যাইলে, আর দুঃখের দুয়ারে ফিরিতে হয় না, সে আমায় একমনে সেই পথে লইয়া চলিয়াছে!" ব্রাহ্মণ অধোবদন হইলেন। তাঁহার মনের মধ্যে নূতন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। সেই কৃষিই তো কৃষি! সেই উৎসবই তো উৎসব! সেই শস্যই তো আহার্য্য! সেই আহার্য্যই তো অমরত্ব-লাভ! ভরদ্বাজ ভগবানকে চিনিতে পারিলেন। পরিশেষে ভগবানের উপদেশে ভরদ্বাজ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। পাটলী গ্রামে অবস্থিতিকালে ভগবানের বাক্যপ্রভাবে এইরূপ আর এক শুভ সংঘটন সূচিত হইয়াছিল। তত্রত্য গঙ্গার তীরে, ভগবান দেখিতে পান, অনেকে অনেক রূপ ভেলা প্রস্তুত করিতেছিল। গঙ্গা নদী পার হওয়া, তাহাদের

উদ্দেশ্য। ভগবান তখন একটী উদান গান করেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, নদ-নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য মানুষ নানারূপ নৌ-যান প্রস্তুত করে; কিন্তু ভবনদী পারের জন্য যে যানের প্রয়োজন, তৎপ্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন,—আপনার দ্বারা আপনাকে পার করিতে হইবে, অপরের সাহায্যে নির্ভর করিতে নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার একটী প্রসিদ্ধ উক্তি,—

"অত্ত-দীপা বিহরথ অত্ত সরণা অনঞ্‌ঞসরণা।
ধম্ম দীপা ধম্ম সরণা অনঞ্‌ঞ-সরণা॥"

আত্মোৎকর্ষ সাধনই সর্ব্বসুখের আকর। যিনি আত্মোৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইয়াছেন; নির্ব্বাণের পথ তাঁহারই পক্ষে প্রশস্ত হইয়া আছে। ভগবানের জীবনব্যাপী সাধনায় সেই তত্ত্বই বিশদীকৃত দেখি।

সাধনার সময় মার দেবতার সহিত সংগ্রামে ভগবানকে যেমন বিব্রত হইতে হইয়াছিল; সিদ্ধিলাভের পর সত্যধর্ম্ম প্রচারের সময়ও কুচক্রীর চক্রান্ত-জাল ছিন্ন করিতে তাঁহাকে সেইরূপ উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। সত্যের সহিত মিথ্যার, পুণ্যের সহিত পাপের দ্বন্দ্ব চিরদিনই চলিয়াছে। সুতরাং তাঁহার সত্যপ্রচারে বাধা দিবার পক্ষে পাপের প্রয়াস যে প্রত্যক্ষীভূত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পাপ-পুরুষ যখন দেখিলেন, মানুষ ভগবানকে চিনিতে পারিতেছে, তাঁহার সত্যধর্ম্মে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে; তখন তিনিও বিপরীত খেলা খেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মানুষ যাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে ভ্রম-ধারণা লাভ করে, তৎপক্ষে পাপ-পুরুষের চেষ্টা চলিতে লাগিল। তিনি মনুষ্য-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক-খ্যাপনে চেষ্টান্বিত হইলেন। ধর্ম্মপ্রচারের সপ্তম বর্ষে ভগবান যখন জিতবনে অবস্থান করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে কতকগুলি তীর্থিক তাঁহার বিরুদ্ধে বিষম ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করিয়াছিল। ভগবান কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু তীর্থকগণ তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অনুরক্ত প্রমাণ করিবার যোগাযোগ সংঘটন করিল। চিঞ্চি নাম্নী এক সুন্দরী যুবতী তাহাদের ক্রীড়া-পুত্তলিরূপে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। ধর্ম্মোপদেশ লইবার ভাণ করিয়া, সে এক দিন নিশাকালে বুদ্ধদেবের আশ্রম-পার্শ্বে অবস্থিতি করিল। সুকেশা সুবেশা গন্ধদ্রব্যানুলিপ্তদেহা সেই সুন্দরী প্রত্যুষে যখন আশ্রম হইতে বহির্গত হইল, সংশয়ান্দোলিতচিত্ত ভিক্ষুগণের কেহ কেহ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার পরিচয় লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুন্দরীর হাবভাবে এবং তীর্থকগণের জল্পনা-কল্পনার প্রভাবে, ভগবানের চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা অর্পিত হইল। ভগবান মনে মনে একটু হাসিলেন। হাসির সঙ্গে, তাঁহার নয়ন বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল। হাসির কারণ—ফুৎকারে মিথ্যা উড়িয়া যাইবে; কলঙ্কখ্যাপনকারীরাই কলঙ্কে নিমজ্জিত হইবে। তবে, দুঃখের কারণ—এই মিথ্যার প্রভাবেও মানুষ আচ্ছন্ন হয়, সত্য পথ ভুলিয়া যায়! যাহা হউক, কিছুকাল পরে, অন্তর্ব্বত্নী অবস্থায় সেই সুন্দরী একদিন বুদ্ধদেবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিক্ষুগণের মধ্যে ভগবান্ তখন ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন; সহসা রমণী তাঁহাকে

ছলনার পরিণাম।

সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"এই গর্ভে আপনার সন্তান আছে; কিন্তু আপনি সূতিকাগৃহের কোনই ব্যবস্থা করিতেছেন না। আমি ভরণ-পোষণের দাবী করিতেছি।" ভগবান একবার রমণীর মুখপানে চাহিলেন। সেই তীব্র জ্যোতিঃতে রমণীর মুখমণ্ডল বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইল; তাহার দেহ থর থর কাঁপিতে লাগিল; প্রাণের ভিতর অনুতাপের বিষম অনল জ্বলিয়া উঠিল। সেই অবস্থায় সহসা বিষম বাত্যা উপস্থিত হইয়া রমণীর বস্ত্রাঞ্চল উড়াইয়া দিল; সঙ্গে সঙ্গে, বস্ত্রাবরণে আবৃত, উদরে সম্বিবদ্ধ, এথও কাষ্ঠ বাহির হইয়া পড়িল। রমণী কৃত্রিম গর্ভ প্রস্তুত করিয়া ভগবানকে অপদস্থ করিতে আসিয়াছিল। তাহার ছলনা প্রকাশ পাওয়ায়, ভিক্ষুগণ তাহাকে আশ্রম হইতে দূর করিয়া দিলেন। দেবদত্তের পরিণতির চিত্রও সম-বর্ণে অনুরঞ্জিত। ভগবানকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া, ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া, দেবদত্ত পরিশেষে প্রতিদ্বন্দ্বী ভিক্ষুদল সংগঠনে চেষ্টান্বিত হয়। বুদ্ধদেবের কঠোর বিধি-বিধান মান্য করিতে অসমর্থ হওয়ায় পাঁচ শত ভিক্ষু, সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া, দেবদত্তের দলে যোগদান করে। ভগবান মর্ত্ত্যধামে বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অসত্য প্রচার হইবে? সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন সেই বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়ের মতি পরিবর্ত্তন পক্ষে উদ্‌বুদ্ধ হইলেন। ফলে, সকলে ফিরিয়া আসিল; দেবদত্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। সে যেন এক দৈবলীলা! নয় মাস কাল শয্যাশায়ী থাকিয়া রোগের যন্ত্রণায় তাহার অনুতাপ উপস্থিত হইল। দেবদত্ত তখন বুদ্ধদেবকে দর্শনের জন্য এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া ক্ষমা-প্রার্থনার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সেই অবস্থায় একখানি শিবিকারোহণে দেবদত্ত যখন বুদ্ধদেবের আশ্রম সম্মুখে উপস্থিত হইল; পরিত্রাহি ডাক ডাকিয়া নির্ব্বাণ-মুক্তির প্রার্থী হইল; সহসা পর্ব্বতগাত্র বিদীর্ণ করিয়া লকলক্ অগ্নিশিখা বিনির্গত হইতে লাগিল; আর সেই শিখা-জালে দেবদত্তকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। দেবদত্ত কাতরকণ্ঠে ডাকিল,—"ভগবন্! আপনার প্রতি অনেক অন্যায়-অত্যাচার করিয়াছি। আশ্রিত জ্ঞানে অন্তিমে আশ্রয় প্রদান করুন।" সেই অগ্নিকুণ্ডে দেবদত্তের দেহ, তাহার আকাঙ্ক্ষা অহঙ্কার প্রভৃতি সহ, ভস্মীভূত হইল। ভগবানের অলৌকিক লীলা দিকে দিকে প্রকাশ পাইল।

বুদ্ধদেবের উপদেশ অধিকার-ভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য্যকরী ছিল, পদে পদে সে প্রমাণ প্রত্যক্ষ করি। যেখানে প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে সত্য-তত্ত্ব বিবৃত করিলে অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা, সেখানে তিনি প্রশ্নোত্তরের পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন। যেখানে উপমার অবতারণা আবশ্যক হইত, সেখানে উপমার দ্বারা বিষয়টী বিশদীকৃত করিতেন। আবার যেখানে সদৃশ ঘটনার চিত্র-পট উত্তোলন করার আবশ্যক হইত, তখন তদ্দ্বারা বক্তব্য বিষয় মর্ম্মস্পর্শী করিবার চেষ্টা পাইতেন। যেখানে যেমন ভাবে সত্য-তত্ত্ব বিকাশপ্রাপ্ত হইতে পারে; সেখানে তিনি তেমন ভাবেই বীজ বপন করিতেন। দুই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। কৃশা গৌতমী নাম্নী এক বালিকার একটী সোণার কমল পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। বালিকার নয়নমণি সেই শিশুটী সহসা ক্রোড়ের উপর মৃত্যুমুখে পতিত হইল। শিশুটীকে বুকের মধ্যে ধরিয়া লইয়া অভাগিনী দ্বারে দ্বারে, তাহার প্রাণরক্ষার উপায় জানিতে চাহিল। কিন্তু মৃতের জীবন-

শিক্ষার পদ্ধতি।

দানে কাহার সামর্থ্য আছে? ভৈষজ্য-ভাণ্ডার তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিলেও সে ভেষজ তো মিলে না! পুত্রশোকে পাগলিনীপ্রায় বালিকা যখন দ্বারে দ্বারে ঔষধ অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল; সেই সময় কে যেন কহিল,—'বুদ্ধদেবের নিকট সে ঔষধ মিলিতে পারে।' পুত্র-শোকাতুরা জননী সেই মৃতপুত্র ক্রোড়ে লইয়া বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে দৌড়িল। কপিলাবাস্তুর নিকটে 'সানস্থমার' গিরিচূড়ায় ভগবান তখন অবস্থিতি করিতেছিলেন। বালিকা তাঁহার চরণ-প্রান্তে পড়িয়া, অশ্রুজলে চরণ ভাসাইয়া মৃত পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিল। বালিকাকে প্রবোধ দিয়া ভগবান কহিলেন,—"ঔষধ আছে! আমি সে ঔষধ অবগত আছি। তুমি সামান্য একটা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে পার কি?" বালিকার রোদন থামিল। উৎসাহ-প্রকাশে বালিকা উত্তর দিল,—"কোন্ দ্রব্য প্রয়োজন! বলুন, আমি আনিয়া দিতেছি।" ভগবান কহিলেন,—"তেমন কোনও দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী নহে। কয়েকটা মাত্র সর্ষপ সংগ্রহ করিতে পারিলেই শিশুর জীবন রক্ষা হইবে।" বালিকা ব্যস্তসমস্তে কহিল,—"এ সামান্য জিনিস, আমি এখনই সংগ্রহ করিয়া আনিতেছি।" বুদ্ধদেব কহিলেন,—"ভাল কথা! তবে একটা বিষয় মনে রাখিবে, যে-সে বাড়ী হইতে সর্ষপ আনিলে চলিবে না। সকলের বাড়ী সরিষা মিলিতে পারে, কিন্তু সন্ধান লইবে, সে বাড়ীতে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে কি না? যে বাড়ীতে পুত্র, পতি, পিতা, ভৃত্য বা অন্য কাহারও মৃত্যু হইয়াছে, সে বাড়ীর সর্ষপে কোনই কাজ হইবে না।" বালিকা উৎসাহ প্রকাশে কহিল,—"তার আর ভাবনা কি? সকলের বাড়ীই সরিষা আছে। যে বাড়ীতে কাহারও মৃত্যু হয় নাই, সেই বাড়ীর সরিষা আনিতেছি।" এই বলিয়া, বালিকা সর্ষপ-সংগ্রহে গমন করিল। বালিকা যে গৃহেই সর্ষপ চাহিতে যায়, সকলেই সর্ষপ প্রদান করেন বটে; কিন্তু কেহই বালিকার আশানুরূপ উত্তর দিতে সমর্থ হন না। কেহ বলেন,—'এই বাড়ীতে আমার পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে।' কেহ বলেন,—'আমার আত্মীয় স্বজন মৃত হইয়াছেন।' কাহারও কেহ কখনও যে মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই, তেমন সংবাদ কেহই দিতে পারিলেন না। বালিকা বিষণ্ণ মনে বুদ্ধদেব-সন্নিধানে প্রত্যাবৃত্ত হইল। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈ, সর্ষপ সংগ্রহ হইয়াছে কি?" বালিকা কহিল,—"না প্রভু, সর্ষপ মিলে নাই। সংসারে এমন কেহই নাই,—যাঁহার পিতা, মাতা, পতি বা পুত্র কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই। জীবিতের সংখ্যা, তুলনায় অতি অল্প, মৃতের পরিমাণই অসংখ্য।" ভগবান্ কহিলেন,—"উহাই সত্য, সকলই অনিত্য। যে জন্মিয়াছে, তাহারই মৃত্যু হইবে। যাহার দেহ আছে, সেই জন্ম জরা-মৃত্যুর অধীন। যাহা সত্য—যাহা অনিবার্য্য, তাহার জন্য বৃথা অনুশোচনায় কি ফল আছে?" বালিকার জ্ঞানোদয় হইল,—বালিকা পুত্রশোক ভুলিয়া গেল; বালিকার মোহ টুটিল। বালিকা নির্ব্বাণের পথ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুত্রশোকাতুরা বালিকাকে সান্ত্বনাদানে তাঁহার যে অভিনব পদ্ধতি দেখি, সংসারের শৃঙ্খলা-রক্ষার পক্ষেও তদনুরূপ কৌশল দেখিতে পাই। অনাথপিণ্ড নামক এক ধনী মহাজনের ভবনে, ভগবান একদিন ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। দ্বারদেশে উপস্থিত হইবা-মাত্র, ভীষণ কোন্দল-কোলাহলে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। অনাথপিণ্ডকে সম্বোধন

করিয়া ভগবান কহিলেন,—"আপনার বাড়ীতে এ কিসের কোলাহল শুনিতেছি? হঠাৎ এমন কোন্দল কোলাহল শুনিলে কোনও মৎস্য-বিক্রেতার মৎস্য কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।" অনথপিণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"এক ধনবানের কন্যা আমার গৃহে পুত্রবধূ হইয়া আসিয়াছেন। তিনি আপন পতিকেও মান্য করেন না, শ্বশুরের বাক্যও অগ্রাহ্য করেন। ভগবানের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনেও পরাঙ্মুখ।" অনথপিণ্ডের সেই পুত্রবধূর নাম—সুজাতা। সুজাতাকে সম্বোধন করিয়া ভগবান কহিলেন,—"সুজাতা, সংসারে সাত প্রকার স্ত্রী আছে। তুমি তাহার কোন্ প্রকার স্ত্রী, সুজাতা।" সুজাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সাত প্রকারের স্ত্রী, সে কি প্রকারের ভগবান?" বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন,—"এক প্রকারের স্ত্রী হত্যাকারিণী, অন্য প্রকারের স্ত্রী দস্যুবৃত্তিধারিণী, তৃতীয় প্রকারের স্ত্রী কর্ত্রীস্বরূপিণী, চতুর্থী মাতা, পঞ্চমী ভগ্নী, ষষ্ঠী সখী, সপ্তমী দাসী। সুজাতা! তুমি ইহার মধ্যে কোন্ প্রকারের স্ত্রী?" সুজাতা নিরুত্তর রহিল, কোনও উত্তর দিতে পারিল না। সুজাতার মস্তক অবনত হইল। ভগবান একে একে সপ্তবিধা স্ত্রীর স্বরূপ বর্ণন করিলেন। পরিশেষে জিজ্ঞাসিলেন,—"সুজাতা! বল দেখি, তুমি কোন্ পর্য্যায়ের স্ত্রী?" সুজাতা, ভগবানের চরণতলে পতিত হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিল,—"ভগবন্! আমার অপরাধ হইয়াছে, আমায় ক্ষমা করুন। আর আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আজি হইতে আমি যেন আমার পতির প্রিয় সাধনে দাসীর ন্যায় কার্য্য করিতে পারি।" সেই হইতে সুজাতা সংসারের শান্তিদায়িনী হইয়াছিল। যাঁহারা মনে করেন, বুদ্ধদেব শুধুই সন্ন্যাস মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন, গৃহস্থালীর শান্তি রক্ষা কল্পে তাঁহার এবম্বিধ প্রয়াস দেখিয়া, তাঁহারা নিশ্চয়ই সে ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করিবেন। শান্তিরক্ষাই তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল, বন্ধনে শান্তিহারা হইতে হয় বলিয়াই, তিনি বন্ধন-মুক্তির উপদেশ দিয়াছিলেন। সংসারে সে শান্তির অঙ্কুর যদি উদ্গত না হয়, সন্ন্যাসে অনেক সময় সে অঙ্কুরোদ্গম কঠিন হইয়া পড়ে। সংসারে যদি জলসেক পায়, সন্ন্যাসে তাহার পরিবর্দ্ধন অবশ্যম্ভাবী। তাই সংসার সন্ন্যাস দুই দিকেই ভগবান দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন।

ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে ভগবান সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সাত বৎসর সাধনার ফলে, পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সম্যক্‌সম্বোধি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে তাঁহার মহাপরিনির্ব্বাণলাভ হয়। * হিরণ্যবতী নদীর তীরস্থিত কুশীনগর ভগবানের মহাপরিনির্ব্বাণ লাভের পবিত্র ক্ষেত্র। নানা স্থান পরিভ্রমণের পর, ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া, তিনি শিষ্যবর্গকে আপন মহাপরিনির্ব্বাণ লাভের সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাপন করেন। রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়। ভগবানের অন্তর্দ্ধানে মানুষ তাঁহার অভাব বুঝিতে পারে। যাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া ভ্রমান্ধ মানব তাঁহার সম্যক্ আদর করিতে পারে নাই, তাঁহার মহাপরিনির্ব্বাণ লাভের পর তাঁহার চিতাভস্ম লইয়া তাহারা এখন সম্মানের একশেষ প্রদর্শন করিতে লাগিল। কুশীনগরের মল্লরাজগণ তাঁহার দেহাবশেষ

মহাপরি নির্ব্বাণ।

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নির্দ্দেশ অনুসারে বুদ্ধদেবের জন্মাদি কাল এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়,—

অস্থি লইয়া, আপনাদের মন্ত্রণাগারে রক্ষা করিল এবং সুগন্ধ পুষ্পাদি উপচারে ও গীত-বাদ্য-নিনাদে তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভস্মাবশেষ আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। মগধাধিপতি অজাতশত্রু তাহার এক ভাগ গ্রহণ করিয়া তদুপরি বিশাল স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলাবাস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পের বুলীগণ, রামগ্রামের কোলীয়গণ, পাবগ্রামের মল্লগণ, কুশীনগরের মল্লগণ, পিপ্পলীবনের মৌর্য্যগণ, এবং ব্রাহ্মণ বেতাদীপক ও দোন প্রত্যেকে সেই ভস্মাবশেষ গ্রহণ পূর্ব্বক স্তূপ-সমূহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। চীনে, তিব্বতে, ব্রহ্মদেশে, সিংহলে, জাপানে আজিও কত কল্পিত সামগ্রী তাঁহার স্মৃতির সহিত বিজড়িত ছিল বলিয়া সম্পূজিত হইতেছে। তিনি কত রূপে কত নামে কত ভাবে পূজা পাইতেছেন। *

কপিলাবাস্তু নগরে তাঁহার জন্ম	৫৭৭	পূ খৃঃ
তাঁহার বিবাহ (যশোধরার বা গোপার সহিত)	৫০৮	,,
তাঁহার গৃহ স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ	৫২৮	,,
তাঁহার বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি ও ধর্ম্মপ্রচার	৫২২	,,
গৃহে পুনরাগমন	৫২১	,,
পিতা শুদ্ধোদনের মৃত্যু, বিমাতার ও স্ত্রীর বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ	৫১৭	,,
তাঁহার পুত্র রাহুলের বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ	৫০৮	,,
যশোধরার পিতার মৃত্যু	৫০৭	,,
গৌতমের দেহত্যাগ	৪৭৭	,,

* বুদ্ধদেবের নাম সম্বন্ধে অনেক মতান্তর আছে। অনেক পালি-গ্রন্থে যদিও তাঁহার সিদ্ধার্থ নাম দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে নামও পরবর্ত্তী কল্পনা বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। "Even the name Sidhartha, said to have been given him as a child, may have been a subsequent invention. His family name was certainly Goutama." *Vide* Rhys David's *Buddhism*. তাঁহার অার আর নামের মধ্যে শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি, সুগত, সৎ, জিন, ভাগব, লোকনাথ সর্ব্বজ্ঞ, ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন 'গৌতম' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। (মহাবগ্‌গ প্রথম বগ্‌গ দ্রষ্টব্য)। তদনুসারে তিনি গৌতম বুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহার এক এক প্রকার গুণের বা শক্তির পরিচায়ক-রূপেও তাঁহার এক এক নাম প্রযুক্ত দেখি। যাহা কিছু বুঝিবার, বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হয়—'বুদ্ধ'। সম্যক্ জ্ঞানলাভের জন্যই তিনি 'সম্বুদ্ধ' (সম্মা সম্বুদ্ধ)। প্রজ্ঞা শ্রেষ্ঠ ছিল বলিয়া তিনি 'বরপ্রজ্ঞ' (বরপঞ্‌ঞ)। প্রজ্ঞা যথেষ্ট ছিল বলিয়া তিনি 'ভূরিপ্রজ্ঞ' (ভূরিপঞ্‌ঞ)। সকল দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল বলিয়া, তিনি 'সমন্ত চক্ষু' (সমন্তচক্খু) ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

কোন্ দেশে বুদ্ধদেব কি নামে পরিচিত, বিশপ বাইগান্দেতের উক্তিতে, কতকটা বিকৃত উচ্চারণে, তাহার এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হই,—

"In Burmah the originator of the great Buddhistic system is called Gaudama and this appellation, according to many, appears to be his family name. When he means the ascetic belonging to the family of Gaudama. In Nepaul, the same personage is known under the name of Thakiamuni, that is to say, the ascetic of the Thakia family. Those who refused to believe in Buddha and his doctrines, those who held tenets disagreeing with his own, and professed what,

জানি-না—সেই পূজাই প্রকৃত পূজা কি না! জানি-না—ভগবানের পার্থিব দেহের অণুপরমাণু সংগ্রহ করিয়া অর্চ্চনা করিবার উপদেশ তিনি প্রদান করিয়াছিলেন কি না? জানি-না—তাঁহার দন্তে, তাঁহার পদচিহ্নে অথবা তাঁহার ভস্মাবশেষ মধ্যে তাঁহার পূজার্হ-রূপে তিনি কিছু রাখিয়া গিয়াছেন কি না? জ্ঞানী হয় তো সে তত্ত্ব অবগত থাকিতে পারেন; কেন-না, জ্ঞানীর চক্ষে ভগবান সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কিন্তু সে জ্ঞানে কয় জন জ্ঞানী হইয়াছেন? আর সে ভাবেই বা কয় জন সে পূজায় প্রবৃত্ত হন? সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন—কয় জনে সে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে? সুতরাং, সাধারণ মানুষের পক্ষে শ্রীভগবান কেমনভাবে ক্রিয়াপরায়ণ রহিয়াছেন; তাঁহার উপদেশে, তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীতে, সে পরিচয় কতটুকু প্রাপ্ত হই; তাহাই অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তিনি যেমন তাঁহার পঞ্চভূতাত্মক দেহকে পঞ্চভূতের মধ্যে মিশাইয়া সাধকগণের ধ্যানগোচর হইয়া আছেন; তিনি তেমনই তাঁহার অমৃতবাণী-রূপে, আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যের পথ প্রদর্শনে অগ্রসর রহিয়াছেন। সেই যে সত্য-চতুষ্টয়—দুঃখ, দুঃখোৎপাত্তির কারণ, দুঃখ-নিবৃত্তি, দুঃখনিবৃত্তির উপায়; সেই যে অষ্টমার্গ—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প প্রভৃতি;—আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছে? শিক্ষা দিতেছে না কি,—'আগে সত্য কি বুঝ, পরে পথ অনুসন্ধান কর! যে জন্ম জরা-মৃত্যুর যন্ত্রণায় অহর্নিশ জ্বলিতেছ, তবে সে যন্ত্রণার অবসান হইবে!' যখনই ভগবান যে ভাবে যে রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখনই তিনি ঐ একই শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ভাষার ভিন্নতা থাকিতে পারে; কিন্তু ভাব সর্ব্বত্রই অভিন্ন। কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া তিনি যে বাণী ঘোষণা করিয়াছেন; বুদ্ধাবতারেও তাঁহার মুখে সেই বাণীই বিঘোষিত দেখি। তখনও তিনি বলিয়াছিলেন—'কামনা পরিত্যাগ কর—নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।' এখনও তিনি বলিলেন—'কাম জয় কর—তৃষ্ণা পরিহার কর।' তিনি যে অনাদি অনন্ত সর্ব্বব্যাপী, তিনি যে অতীত অনাগত বর্ত্তমান ত্রিকালাবস্থিত; সে ঐ অমৃতবাণী-রূপেই প্রত্যক্ষীভূত নহে কি? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'নাদ ব্রহ্ম।' নাদরূপী ব্রহ্ম, সহজ দৃষ্টিতে, ভগবদ্বাক্য—আত্মোৎকর্ষবিধায়ক উপদেশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ভগবান উপদেশ দিয়াছেন—'সর্ব্বপ্রকার পাপ কর্ম্ম পরিহার কর'; ভগবান উপদেশ দিয়াছেন—'সর্ব্বপ্রকার কুশল কর্ম্ম সম্পাদনে প্রযত্নপর

তিনি চির-বিদ্যমান।

---

in the opinion of their adversaries, was termed a heretical creed, invariably called Buddha by his family name, placing him on the same level with so many of his contemporaries who led the same mode of life. The Siamese give the appellation of Sammana Khodom to their Buddha, that is to say, Thramana Gaudama or Gautama. The Sanskrit word Thramana means an ascetic who has conquered his passions and lives on alms. Gaudama belonged to the Kchatria caste. Kings and all royal families in those days came out of the same caste. Hence his father Thoodaudana was king of the country of Kapilawot, anciently a small state, north of Goruckpore,"

ব্রহ্মদেশীয়গণ বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাঁহাকে 'ফ্রা' (Phra) এবং বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর 'ফ্রালাওঙ্গ' (Phralaong) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। চীন-দেশে বুদ্ধদেব 'ফো' (Fo) নামে অভিহিত।

হও'; ভগবান উপদেশ দিয়াছেন—'চিত্ত বিশুদ্ধ কর; সকল কালে সকল অবস্থায় ভগবৎ-মুখে এই বাণী বিঘোষিত দেখি। উহাদের অনুসরণই মানবের প্রতিপাল্য ধর্ম্ম। মহাপরি-নির্ব্বাণ লাভ করিয়াও বুদ্ধদেব যে বিদ্যমান রহিয়াছেন; তিনি যে বলিয়া গিয়াছেন—'নির্ব্বাণ একেবারে লয়প্রাপ্তি নহে', তাঁহার ঐ উপদেশ-বাণীর মধ্যেই তাহা উপলব্ধি হয়। 'তিনি আছেন, কি নাই'—এই প্রশ্ন লইয়া যে সকল বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল; আর তাহাতে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন; সেই উত্তরেই বুঝিতে পারি, স্থূল শরীরে তাঁহার অবিদ্যমানতা ঘটিলেও বিবেকবাণী-রূপে—নিত্য সত্য বাক্য-রূপে—অন্তরে অন্তরে তিনি আসন গ্রহণ করিয়া আছেন। তাঁহাকে পাইতে হইলে, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে, তাঁহার সেই উপদেশ বাণীর অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই প্রাপ্তিই নির্ব্বাণ লাভ। অনুধাবন কর—তৎপ্রদর্শিত সত্য তত্ত্ব; অনুসরণ কর—তৎপ্রদর্শিত অষ্টমার্গ তদ্দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। সেই উপদেশ-বাণীর মধ্যেই তিনি অনাদি অনন্ত। যাঁহাদের নেত্র আছে, তাঁহারাই দেখিতে পান,—তিনি কেমন জ্যোতির্ম্মান্ মূর্ত্তিতে বিরাজমান রহিয়াছেন! যাঁহাদের কর্ণ আছে, তাঁহারাই শুনিতে পাইতেছেন,—তাঁহার মধুর বাণী কেমন মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিতেছে! যাঁহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় আছে, তাঁহারা সর্ব্বত্র তাঁহার মহিমার সুবাস আঘ্রাণ করিতেছেন। যাঁহাদের ত্বক স্পর্শশক্তিহীন অসাড় হয় নাই, তাঁহারাই তাঁহার স্পর্শানুভবে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছেন। তবে যাহারা অন্ধ-দৃষ্টিশক্তিহীন, তাহারা তাঁহাকে দেখিবে কি প্রকারে? নিশাপগমে অরুণোদয়ে যে আনন্দ, অন্ধ তাহার কি অনুভব করিবে? বধিরের কর্ণপটহে বজ্রনিনাদ কচিৎ প্রতিহত হইতে পারে; কিন্তু সঙ্গীতের সুধাস্বর সে কদাচ উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং যাঁহাদের ইন্দ্রিয় আছে, ভগবানের আবির্ভাব তিরোভাবের বিষয়, কেবল তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন; তিনি কেমনভাবে চিরবিদ্যমান রহিয়া জীবের উপর ক্রিয়া করিতেছেন, কেবল তাঁহারাই তাহা বুঝিতে পারেন।